প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

প্রবাসী-কার্য্যালয়
২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
মূল্য তিন টাকা ছয় আনা

L-3466
19.4.67

প্রবাসী—১৩৩৭, বৈশাখ হইতে আশ্বিন

৩০শ ভাগ প্রথম খণ্ড

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
অজিতনাথ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫৪
অনাবশ্যক বৈদেশিক প্রভাব বিস্তার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৭০
অনাসক্তি যোগ—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী	৬৮২
অনিচ্ছাকৃত স্বীকারোক্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৭৫
অন্তরে বাহিরে (গল্প) শ্রীআশীষ গুপ্ত	৭১৬
অপরাজিত (উপন্যাস) শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৮, ২২৮, ৩৬৫, ৫০৫, ৬৮৭, ৮৬৮
অপেক্ষায় (কবিতা) শ্রীঅনিলবরণ রায়	৩০
অভিধান—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৮৬২
অহিংস সংগ্রামের ফলাফলের সময় নির্দ্দেশ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৭০
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের কয়েকখানি পত্র শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৩৭৯
"আইনের বাধ্য ও শান্তিপ্রিয়" লোকদের সংখ্যা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬১
আওরংজীবের জীবননাট্য—স্যর যদুনাথ সরকার	১
আওরংজীবের ব্যক্তিত্ব (আলোচনা) শ্রীনীরদকুমার বক্সী	৭০০
আফ্‌গানিস্থানের নবযুগ (সচিত্র) শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৭৯
আধুনিক মনোবিজ্ঞান—শ্রীহরিপদ মাইতি,	৪৫
আমাদের কথা—শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী	১০৮
আর্টের অর্থ—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	৩৯৮
আলোচনা	১২৪, ২৬৪, ৭০০, ৮৫৪
আসামের কুকিজাতি (আলোচনা)	৮৫৫
আসামীর অসাক্ষাতে বিচার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৭৫
আসামের কুকি জাতি (সচিত্র) শ্রীলালতুদাই রায়	৬৫০
আহার্য্য ও বিষাক্ত ছত্রাক (সচিত্র) শ্রীসহায়রাম বসু	৮২৭
ইঙ্গ-ভারতীয় কন্‌ফারেন্সে ঐকমত্যসাধন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১০
ইঙ্গ-ভারতীয় কন্‌ফারেন্সে বিলাতী সভ্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৫৮
ইঙ্গ-ভারতীয় কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬০৯
ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৪২
ইতালীয় চিত্রকলার পরিচয় (সচিত্র) শ্রীমন্মথ চৌধুরী	৯০৩
"ইংলণ্ড স্বরাজের যোগ্য কি না?" (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২২
উড়িষ্যার মণ্ডন শিল্প (সচিত্র) শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ	২৩৭
উপাধান (কবিতা) শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী	২৩
ঋণব্যবসায়ে সংহতি (কষ্টি)	৬৮১
একটা ধিক্কারজনক জঘন্য পুস্তিকা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৭৬
একরাত্রি (গল্প) শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৮৪৪
কণ্টক (কবিতা) শ্রীজগৎ মিত্র	৬৪৪
কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে আমাদের মত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১২
কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ (?) প্রভৃতির মত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৩
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৫১
কলিকাতায় শোচনীয় ও লজ্জাকর দলাদলি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬২
কষ্টিপাথর	৫৮, ২৫৬, ৪৩৮, ৫৩৫, ৬৭৭, ৮৫২
কংগ্রেস কমিটিগুলি বেআইনী ঘোষণা করা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯২৫
কংগ্রেস ও ব্যবস্থাপক সভা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৭১
কংগ্রেস ও লণ্ডনের কন্‌ফারেন্স (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১১
কংগ্রেসের সহিত সন্ধি হইল না (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৪২
কাপড়ের উপর শুল্ক কে দিবে? (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৬২
কামিখ্যের ঠাকুর (গল্প) শ্রীঅরবিন্দ দত্ত	৩৮৮
কার্পাস শিল্পে ব্রিটেনকে বাণিজ্যিক সুবিধাদান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৬১
"কার্য্যতঃ ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস" (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৬২
কালিদাসের বৃক্ষলতা (কষ্টি)	৬৩, ৫৩৮
কিশলয়োৎসব (কবিতা) শ্রীজীবনময় রায়	৪৪
কিশোরগঞ্জ (সচিত্র) শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী	৮৫৬
কিশোরগঞ্জের উপদ্রব (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৬৫
কিশোরগঞ্জ সম্বন্ধে পুস্তিকা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা
"কিশোরগঞ্জের দাঙ্গার কারণ" (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৪০
কুজ্ঝটিকা ও কিরণ (গল্প) শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	৩৩০
কৃষিশিক্ষার প্রয়োজন ও আয়োজন শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৫৫
কৃষ্ণভামিনী নারীশিক্ষা মন্দির (সচিত্র) শ্রীকামিনী রায়	১৩৭
কোথায় পঞ্চজন ? (কবিতা) শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ	৯৬
কানাডার পথে—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭৭
খাজনা না-দিবার পরামর্শদান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৯
খালাস (গল্প) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৫৯৬
খুকীর কাণ্ড (গল্প) শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৯৯
গঙ্গাফড়িং (গল্প) শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়	৬৪২
গান্ধীজীকে ধরিবার প্রণালী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৩
গান্ধীদম্পতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০২
গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে গবন্মেণ্টের কৈফিয়ৎ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৫
গুজরাটী গরবা (সচিত্র) শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৪০২
গুলি দ্বারা চিকিৎসা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৭২
"গোল টেবিল" (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৭
গৌড়ীয় শিল্পে দাক্ষিণাত্য প্রভাব (সচিত্র) শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৯
গ্রামের অবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৭২
ঘনীকৃত তৈল—শ্রীরাজশেখর বসু	৩২৬
ঘোষ, মাননীয় শ্রীযুক্ত এস্, এন্	৭৭০
"চলন্তিকা" (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২১
চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬১
চুনীলাল বসু রায়বাহাদুর (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৭৪
চৈন বিদ্যাপীঠ দ্বারা আহূত হিন্দু অধ্যাপক (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৬
ছাত্র ছাত্রীদের কর্ত্তব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২০
ছাত্রদের কর্ত্তব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬১
ছাত্রসমাজ ও দেশের কাজ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৬
ছায়া (কবিতা) শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৫৫
ছেলেধরা (গল্প) পরশুরাম	৭৮৬
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, পণ্ডিত (সচিত্র) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬০
জনৈক সাবেক লাটের মিথ্যাবাদিতার নমুনা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯২২
জাতক (কবিতা) শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী	৫২২
জাপানীদের উদ্যোগিতা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৫৩
জীবের নিয়তি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৩২১

বিষয়	পৃষ্ঠা
জেলে অল্পবয়স্কদের শিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৩৬
জেলে বালকদের প্রাথমিক শিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৭১
জৈনধর্ম্ম ও আর্য্যপট্ট (সচিত্র) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৮২১
ঢাকাই মসলিন (সচিত্র) শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৪৭
ঢাকা উপদ্রবের সরকারী তদন্ত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৩২
ঢাকা উপদ্রবের সরকারী তদন্তের রিপোর্ট কখন পাইব ? (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৩৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুমুসলমান ছাত্র (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯২৪
ঢাকায় মুসলমানের অবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৩৪
ঢাকায় ও নিকটস্থ গ্রামে উপদ্রব (সচিত্র)	৫৯৩
"ঢাকায় ও নিকটস্থ গ্রামে উপদ্রব" (আলোচনা) গোলাম মোর্ত্তজা	৭০০
ঢাকায় খুন লুট গৃহদাহ (সচিত্র)	৪২৮
ঢাকায় দানবীয় কাণ্ড (বিবিধ প্রসঙ্গ)	[illegible]
ঢাকায় শান্তিরক্ষকগণ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৬৬
ঢাকায় হিন্দুমুসলমান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৬৩
ঢাকার উপদ্রব (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৭৪
ঢাকার ব্যাপারের তদন্ত কমিটি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৬৭
ঢাকার হাঙ্গামা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২৩
তরুণী ভার্য্যা (গল্প) শ্রীসীতা দেবী	৪৪২
তারার মতন (কবিতা) শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	৫৪৬
তিস্তা (কবিতা) শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	৭৪৫
তৃণাঙ্কুর (গল্প) শ্রীশান্তি সেন	৯১৩
দমন নীতির ফল (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৭৯
দুইবারে প্রকাশের কারণ—সাইমন রিপোর্ট (বিবিধ প্রসঙ্গ)	[illegible]
দুটি নূতন অডিনান্স (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৭৭
দুষ্করতার ও বিপদের আহ্বান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫৭
দেশ-বিদেশের কথা (সচিত্র)	১৪২, ২৯৭, ৪৫[illegible], ৫৯১, ৭৩২, ৯০২
দেশরক্ষাসম্বন্ধীয় আপত্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৭০
দেশী কাপড়ের কল (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬৯
দৌড়চক্র ও ব্যায়ামশালা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৩[illegible]
দ্বীপময় ভারত (সচিত্র) শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	৯৭, ২৬৪, ৪০৮, ৫৭৭, ৭৩৫, ৮৭৮
ধানের চাষের উন্নতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৩[illegible]
নক্ষত্র সমাজ (কবিতা) শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	৮৫[illegible]
নাদির শাহের অভ্যুদয়—স্যর যদুনাথ সরকার	৪৮[illegible]
নাম-মাহাত্ম্য—শ্রীনন্দি শর্ম্মা	৫[illegible]
নারীদের দ্বারা পিকেটিং (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৭[illegible]

বিষয়	পৃষ্ঠা
নারীহরণের প্রতিকার (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৯৪১
নাস্তিক (গল্প) শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়	৫৪১
নিরুপায় (কবিতা) শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী …	৭৯৭
নিষ্কলঙ্ক (গল্প) শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬৫৭
"ন্যূনতম বলপ্রয়োগ" (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৪৭৯
পঞ্চশস্য (সচিত্র) ১৪৮, ২৯২, ৪৫১, ৬০৪,	৭৪৬
পঞ্চাশোর্দ্ধম্ (কষ্টি) …	৫৮
পাখী—হাজার বছর পরে (কবিতা) শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য …	১৯৮
পাবনা হিন্দুসম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ (কষ্টি)	৬০
পাটিয়ালার মহারাজা সম্বন্ধে তদন্ত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬০
পিতা নোহসি (কষ্টি) …	৮৫২
পুনশ্চ (গল্প)—শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় …	৩৫৪
পুরাণে রাঢ়ের ইতিহাস (কষ্টি)	২৫৯, ৫০৪
পুস্তক-পরিচয় ১২২, ২৬৩, ৪৪৯, ৫৩৯,	৭০১
প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের (আচার্য্য) বক্তৃতা (কষ্টি) …	৪৩৮
প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্তর (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	১৬৪
প্রয়াগের চিঠি (গল্প) শ্রীক্ষিতীন্দ্রকুমার ভৌমিক …	৬৩১
প্রাচীন ভারতে বন্দুক ছিল না শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি …	৬২৫
প্রাণের দাবী (গল্প) শ্রীসান্ত্বনা দেবী …	৪৮৯
প্রাথমিক শিক্ষা বিল (বিবাধ প্রসঙ্গ) …	১৮৩
'প্রি-র‍্যাফেলাইট' চিত্রকলা (সচিত্র) …	৪৫৩
প্রেম ও জীবন (কবিতা) শ্রীমোহিতলাল মজুমদার …	৭৬
প্রেস ও সংবাদপত্র উপ-আইন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩১৬
বঙ্গনারীর বিশেষত্ব (কষ্টি) …	২৬২
বঙ্গলক্ষ্মী (কবিতা) শ্রীগোপাললাল দে …	৪৯৮
বঙ্গসাগরের ঝড় ও তাহার প্রকৃতি (সচিত্র) শ্রীসুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় …	৪৮৪
বঙ্গসাহিত্যে প্যারীচাঁদ (সচিত্র) শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী …	৫১৮
বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৯০৫
বঙ্গে অত্যাচারের অভিযোগ (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৬১৪
বঙ্গে নারীনির্য্যাতন (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	১৭৩
বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিল (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৭৫৬
বঙ্গের ও অন্যান্য প্রদেশের সংবাদপত্র (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯০৪
বঙ্গে গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষা আইন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯০৮
বঙ্গের মিউনিসিপালিটী-সমূহের আর্থিক অবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৭৬৮
বড়লাটকে লিখিত গান্ধীজীর দ্বিতীয় পত্র (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৩১২

বিষয়	পৃষ্ঠা
বন্দী (গল্প) শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত …	৬৮
বরিশালে বঙ্গীয় শিক্ষক সম্মেলনের অধিবেশন (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৩১৪
বর্ত্তমান অবস্থায় ছাত্রদের কর্ত্তব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫৯
বর্ত্তমান যুগের নারীসমস্যা (কষ্টি) …	৮৫২
বর্ত্তমান সংগ্রামে নারীদের কর্ত্তব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৬৯
বল্লভভাই পটেলের কারাবাস (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	১৬৭
বস্ত্রশিল্প রক্ষা ও উন্নতির উপায় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৬৩
বাংলা ও আসামে অবনত শ্রেণীদের শিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৯০৫
বাঙ্গালার অন্ন-সমস্যা—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ …	২১৭
"বাঙ্গালার প্রথম" শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ …	১৩১
বাণিজ্যে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যকে অধিক সুবিধা দান (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	১৫৯
বাদশাহী বিচারপদ্ধতি ও দণ্ডনীতি—শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু	৬৬৭
বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের ফল (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৭২
বাংলা গদ্য সাহিত্য (কষ্টি) …	২৫৬
বাংলা দেশের অবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৪৭৬
বিদায়ের অর্ঘ্য (কবিতা) শ্রীকামিনী রায় …	৫৭২
বিদেশে বাঙালীর কলঙ্ক (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৯৪০
বিত্তাসাপেক্ষ উপার্জ্জনে অধিকার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৭১
বিলাত যাত্রী ভারতীয় বিমান নাবিক (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	১৭৫
বিলাতী পণ্যবর্জ্জন ও স্বরাজ …	৯২৮
বিলাতী মেডিক্যাল কৌন্সিলের ঔদ্ধত্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	১৭৩
বিলাতে বেকার (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৭৪৩
বিলাতী সংবাদপত্র ও ঢাকার উপদ্রব (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৯
বিলাতে স্বদেশী (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৪৭৭
বিবিধ প্রসঙ্গ (সচিত্র)	১৫৭, ৩০১, ৪৬২, ৬০৭, ৭৫৭, ৯২২
বিশ্ববধূ (কবিতা) শ্রীনীলিমা দাস …	৬৯৯
বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনে পল্লীসেবক-শিক্ষণের ব্যবস্থা	৭৫৭
বিশ্বভারতীর ছাত্রী ও ছাত্রদের পল্লীসেবা (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৭৭০
বিশ্বভারতীর রিপোর্ট (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৬২৪
বোমা নিক্ষেপ সম্পর্কে বালিকা গ্রেপ্তার (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৯০৬
বোম্বাই প্রদেশে রাজস্ব হ্রাস (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৯০৭
ব্রিটিশ রাজত্বে অবনত শ্রেণীর অবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯০৩
বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৭৫৩
বেঙ্গল একাডেমীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের প্রতিবাদের উত্তর (আলোচনা) শ্রীমৃণালবালা দেবী …	১২৫

বিষয় — পৃষ্ঠা

বৈজু বাওরা (আলোচনা) শ্রীআশুতোষ ঘোষ ... ১২৫
বোম্বাই সরকারের সহিষ্ণুতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩১০
বোম্বাইয়ে নেতাদের শাস্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৬৬
ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকটি প্রদেশের প্রতি অবিচার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৬৪
ব্রিটানিকী শান্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৬২
ভাইফোঁটা (গল্প) শ্রীসীতা দেবী ... ৩৫
ভাদ্র-লক্ষ্মী (কবিতা) শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ... ৬৮১
ভারতবর্ষের সত্যাগ্রহের অবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৯২৪
ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যিক ও অসাম্রাজ্যিক বাণিজ্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৬০
ভারত-ভাগ্য—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ৪
ভারতে মুসলমান—স্যর যদুনাথ সরকার ... ৭৭৫
ভারতসচিবের বক্তৃতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৮০
ভারতীয় চিত্রকলা ও বঙ্গীয় পন্থা (সচিত্র) শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ১৫১
ভারতীয় প্রাচ্য কলা-পরিষদ ও বাঙ্গালীর শিল্পশিক্ষা—শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ... ৫৬১
ভারতে ও বিদেশে উচ্চতম সরকারী বেতন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৭৪
ভারতে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৬৩
ভারতের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৬০৯
ভারতে স্বদেশী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৭৭
মতিলাল (গল্প) শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ... ৮
মরুচারিণী (গল্প) শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী ... ২০০
মরুভূমিতে সোনা-ফলন (সচিত্র) আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় ... ২৪
মল্লজগতে ভারতের স্থান—শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী ২৮৭
মহাকাল শর্ব্বরী (কবিতা) শ্রীজীবনময় রায় ... ৩৩৮
মহাত্মা গান্ধী কারাগারে (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩০১
মহাত্মা গান্ধীর কারারোধের ফলাফল (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩১১
মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে উপ-আইন প্রয়োগ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩০৩
মহামায়া (উপন্যাস) শ্রীসীতা দেবী ১২৭, ২৪৮, ৪২১, ৫২৭, ৭০৩, ৮৮৮
মহারাজ ছত্রসাল বুন্দেলা—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো ... ৭৯৩
মহারাণা রাজসিংহ—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো ১৯০
মহিলা-সংবাদ (সচিত্র) ৫৮৯, ৭১৪, ৯২০
মহিষ ও মানুষ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৭১
মহেশচন্দ্র ঘোষ—শ্রীসুবিমল রায় ... ৫২৯
মহেশচন্দ্র ঘোষ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৬২০
মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন (সচিত্র) ... ৫৬৪
মাঝখানে (গল্প) শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ... ৫২৪
মাতৃভূমির সেবা (কবিতা) শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭১১
মানুষের মন—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু ... ৩৩৯
মান্দ্রাজের মহিলাগণ ও বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৬১
মায়ের প্রতি—শ্রীস্নেহসুধা গুপ্ত ... ২১৪
"মিথ্যা বানাইবার কারখানা" ? (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৭৭২
মুসলমান ও নমঃশূদ্রের সহযোগিতা (আলোচনা) শ্রীসন্তোষকুমার রায় ... ৭০০
মুসলমানদের চালের ভুল (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৭৪
মুসলমান ভারতীয় ও অন্যান্য ভারতীয় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৯২৩
মুসলমান সমাজ ও কংগ্রেস (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৬১৬
মুসাফীর (কবিতা) জসীম উদ্দীন ... ৫০৪
মেকী (গল্প) শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ... ১৮৩
মেঘলা সকাল (কবিতা) শ্রীঅশোকবিজয় রাহা ৭৩১
মেঘের মতন (কবিতা) শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী ... ৩২৫
মেডিক্যাল ছাত্র ও অন্য ছাত্র (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৬২৪
মোতীলাল নেহরু দয়া চান না (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৯৩৬
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের "শাস্তি" (বিবিধ প্রসঙ্গ) ১৬৮
যুগাবতার (কবিতা) শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ... ১৮২
যোগ্য ন্যাসরক্ষক বটে ! (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৭৬
রক্তের হাসি (গল্প) শ্রীসান্ত্বনা গুহ ... ৪৩৭
রঙ্গিণী (গল্প) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ... ৫৫৩
রংপুরের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩১৩
রফা ও সন্ধির কথা এবং কংগ্রেসকে আঘাত (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৯২৫
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৭৯
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (সচিত্র) শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ ৬৯৯
রাজনৈতিক বন্দীদের দশা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৬৪
রাঢ়ের কয়েকটি পল্লী ভ্রমণ (সচিত্র) শ্রীহরিহর শেঠ ৬৪৫
রামকালী গুপ্ত, ডাক্তার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৬৭
রাষ্ট্রীয় প্রগতির হিংস ও অহিংস পন্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৯২৯
রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ক্রমবিকাশ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৬৯
রিপোর্টের আরও কতকগুলি কথা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪৭২
রূপ ও রস—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ... ৩১
রূপের ফাঁদ (গল্প) শ্রীসীতা দেবী ... ৮১৮
লণ্ডনের কন্‌ফারেন্স বিষয়ে বড়লাটের বক্তৃতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৬০৭

বিষয় — পৃষ্ঠা

লবণ আইন লঙ্ঘন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫৮
লবণ কাড়িয়া লওয়ায় বাধা দেওয়া (বিবিধ প্রসঙ্গ) ১৫৯
লবণ গোলা "আক্রমণ" (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩০৯
লবণ-রহস্য—শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সাহা ... ৭২৬
লবণের কথা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৯০৬
লর্ড আরুইন ও বর্ত্তমান প্রচেষ্টা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৬১৪
লীলা (কবিতা) শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ... ৬৩০
লেখকদের প্রতি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩১৯
য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি ? (কষ্টি) ... ৬৭৭
'য়্যাড্‌ভান্স' ও 'লিবার্টি' সম্পাদকদের দণ্ড (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৬৯
শক্তি-বিজ্ঞান (কষ্টি) ... ৪৩৮
শব্দ-চয়ন (কষ্টি) ... ৬৭৭
শঙ্খতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ—শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৮৮৮
শাড়ি ও চুড়ি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৫১
শান্নো দেবী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৬৯
শান্তিনিকেতনে "বর্ষামঙ্গল" (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৬২
শান্তিনিকেতনের কারু-সজ্জ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৬১৫
শিশুর ভয় (কষ্টি) ... ৬২
শুভরূপ অমঙ্গল হইতে মঙ্গল সম্ভাবনা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৬৪
শেফালি (গল্প) শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরী ... ২৭৮
সংবাদ প্রকাশিত না হওয়ার অনিষ্টকারিতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৯৩৫
সরকারী কর্ম্মচারীদের দেশসেবা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ১৭০
সরকারী দর কষাকষি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৬২০
সরকারী প্রপ্যাগ্যাণ্ডা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৭২

বিষয় — পৃষ্ঠা

সাইমন কমিশন রিপোর্টের সারসংগ্রহ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৬৮
সাইমন-রিপোর্ট-প্রকাশ পরিহাস (?) (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৬৭
সাইমন রিপোর্ট সম্বন্ধে বড়লাট (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৬১৫
সাইমন রিপোর্টের প্রথম ভাগ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪৬৮
সাইমনের আমেরিকা-যাত্রা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৫৯
সাধারণ কয়েদী খালাস (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৬৪
সাপ্রু-জয়াকর মধ্যস্থতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৪৮
সাবিত্রী ব্রত—শ্রীঅনুরূপা দেবী ... ৮০৭
সামাজিক ভয় প্রদর্শনের অভিযোগ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৩০৮
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিকার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৯৪১
সাংবাদিকদের কন্‌ফারেন্স (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩ ৮
সিন্ধুদেশের দুর্দ্দিন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৬০
সুন্দরের স্থান কোথায় ? শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী ... ৬৫
সেকালের কলিকাতায় লটারি খেলা (সচিত্র) শ্রীহরিহর শেঠ ... ২১৪
সেনেট ও মিউনিসিপালিটীতে বাঙালী মহিলা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৭৫
স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও বর্ত্তমান প্রচেষ্টা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৬১৯
হরির লুট (গল্প) শ্রীদিবাকর মিত্র ... ৮৩০
হালামদের কথা—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র ... ৫৭৩
হিমাদ্রি (কবিতা) শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ... ৯০১
হুগলীর পল্লীকবি রসিক রায়—শ্রীমনোমোহন নরসুন্দর ৬৩৭
ক্ষ্যাপার গান (কবিতা) শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৮৪২

চিত্র-সূচী

বিষয় — পৃষ্ঠা

অজিতনাথ ভট্টাচার্য্য ... ৭৫৪
অভিনন্দন লিপি—শ্রীঅসিতকুমার হালদার ... ১৫৪
শ্রীঅমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৯২১
শ্রীঅরুন্ধতী ও শ্রীরেণুকা মিত্র ... ৫৯০
অর্জ্জুনের তপোভঙ্গের জন্য অপ্সরাগণের প্রয়াস, বলিদ্বীপের পট—(রঙীন) ... ৮৮২
অর্দ্ধনারীশ্বর ... ৯২
অর্দ্ধনারীশ্বর (রঙীন) শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ৮৪

বিষয় — পৃষ্ঠা

শ্রীঅশোকলতা দাস ... ৯২১
অসুরগণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ... ১৫৬
আধুনিক গৃহসজ্জা—আবলুসের উপর ল্যাকার করা কৌটা ... ৭৪৮
আধুনিক গৃহাভ্যন্তর—একটি কক্ষাভ্যন্তর ... ৭৪৯
আধুনিক গৃহসজ্জা—'দিম' কর্ত্তৃক পরিকল্পিত একটি ডাইনিং রুম ... ৭৪৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
আধুনিক গৃহসজ্জা—নক্সা কাটা ইটের তৈরী ফায়ার প্লেস ...	৭৫০
আধুনিক গৃহসজ্জা—প্যারিসের জো-বুর্জোয়া কোম্পানী কর্তৃক পরিকল্পিত ও নির্ম্মিত একটি পড়িবার ঘর ...	৭৪৬
আধুনিক গৃহসজ্জা—পোর্সেলেনে নির্ম্মিত তিনটি বাতি ...	৭৪৯
আধুনিক গৃহসজ্জা—ফ্রেশে ও ভেুরোট কর্তৃক নির্ম্মিত একটি শয়নকক্ষ ...	৭৪৮
আধুনিক গৃহসজ্জা—লৌহ-নির্ম্মিত একটি দরজা ...	৭৪৮
আধুনিক গৃহসজ্জা—শয়নকক্ষ ...	৭৪৭
আধুনিক গৃহসজ্জা—'সাদিয়ে এ ফিজ' কর্তৃক নির্ম্মিত একটি পড়িবার ঘর ...	৭৪৭
আধুনিক গৃহসজ্জা—হাতে বোনা গালিচা ...	৭৫০
আনমনা (রঙীন) শ্রীকিরণময় ধর ...	৭২৪
আফগানিস্থানে গৃহবিবাদ, রুষঋক্ষ ও ব্রিটিশ-সিংহ	২৮২
আফগানিস্থানের একমাত্র রেলপথ ...	২৮৩
আফগানিস্থানের নূতন সরকারী দপ্তরখানা ...	২৮৬
অ্যাগ্যারিকাস্ ক্যাম্পেষ্ট্রিস্ নামক ছাতা ...	৮২৭
আঁশের কাজ—শৃগাল ও দ্রাক্ষাফল ...	১৪০
শ্রীইন্দুমতী গোয়েঙ্কা ...	৭১৫
"ইয়ং ইণ্ডিয়া"র জন্য লেখননিরত মহাত্মাজী ...	২৯৬
উর্ব্বিনোর ডিউক ও ডাচেস্ ...	৯০৪
শ্রীউর্ম্মিলা দেবী ...	৭১৫
উষা ও অরুণ (রঙীন) শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪৪৪
একটি আহার্য্য ও দুইটি বিষাক্ত ছাতা (রঙীন) ...	৮২৭
একটি সিবিল ...	৯০৭
এণ্টোলোমা মাইক্রোকার্পাস্ নামক ছাতা ...	৮২৭
এসাই যুদ্ধের নক্সা ...	২১৪
কস্তুর বাঈ, শ্রীমতী ...	৩০২
কহ মৃত্যু কানে কানে কথা—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫৬
কাবুলের বড় মসজিদ ...	২৮০
কালী (রঙীন) শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ...	৪০৪
কারাঙ্-আসেম—গ্রামের লোক (বলিদ্বীপ) ...	৪১৭
কারাঙ্-আসেমের রাস্তা (বলিদ্বীপ) ...	৪১৭
কিণ্ডামানি হইতে পাহাড়ের দৃশ্য ...	১০২
কিশোরগঞ্জ—কৃষ্ণবাবুর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ ...	৮৬০
কিশোরগঞ্জ—পরলোকগত কৃষ্ণচন্দ্র রায়, তাঁহার পত্নী ও জ্যেষ্ঠপুত্র সুবোধ ...	৮৫৯
কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী ...	৫৯২
কৃত্রিম উপায়ে পাকান নাসপাতি ...	৪৫২
কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দিরের চতুর্থ বাৎসরিক উৎসব-সভা ...	১৩৭
কোপাই (রঙীন) শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ...	৬৮৪
খদির বনীতারা নালন্দায় প্রাপ্ত ...	৯০
খদ্দর-পরিহিত দুইজন ফরাসী সাংবাদিক ...	২৯৯
গালাটিয়া—রাফায়েল ফার্গোজিনা ...	৯১০
শ্রীগিরিবালা রায় ...	৭৭৪
গিয়াঞ্জারের পুরীতে রবীন্দ্রনাথ ...	৮৮৩
গুজরাটী গরবা—আরম্ভ ...	৪০৩
—কলসী হাতে করিয়া নৃত্য ...	৪০৪
—গরবা নৃত্য ...	৪০৫
—নাচের বিভিন্ন ভঙ্গী ...	৪০৫
—নৃত্যের আরম্ভ ...	৪০৪
—মন্দির পথে ...	৪০৭
—শেষ রাত্রে ...	৪০৬
—সম্ভ্রান্ত মহিলারাও যোগদান করেন	৪০৪
গোধূলি রাগিণী (রঙীন) শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ...	৫৭২
চণ্ডীমূর্ত্তি ...	৯৪
চশারের কাব্যগ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা ...	৪৫৮
চিত্রে বন্য হস্তী ধরার দৃশ্য ...	২৯২
ছাতা চাষের জাপানী প্রণালী ...	৮২৯
ছত্রাকে বা ব্যাঙের ছাতার বিভিন্ন অংশ ...	৮২৮
ছাত্রীদের যন্ত্র-সঙ্গীত ...	১৩৯
জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের চণ্ডীমণ্ডপ—ত্রিবেণী ...	৩৬৪
জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বাড়ী—ত্রিবেণী ...	৩৬১
জরি ও রেশমের কাজ—শ্রীকৃষ্ণ ...	১৪০
জাপানের প্রাচীন ও আধুনিক নৃত্য—	
আধুনিক জাপানের বালিকা-নর্ত্তকী ফুজিমা শিজু ...	১৪৯
—ওনোয়ে কিকুগরো, জাপানের বিখ্যাত নর্ত্তকী ...	১৫০
—নর্ত্তকাউ ইশি-ই কোনামি ...	১৪৯
—সাদো দ্বীপের ওকেসা নৃত্য ...	১৫০
শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় ...	৭১৪
জৈনধর্ম্ম—আর্য্যপট্ট ...	৮১২
জৈনধর্ম্ম—আর্য্যপট্ট স্থাপিত ...	৮১৬
জৈনধর্ম্ম—আর্য্যপট্ট—মথুরাবাসীদের দ্বারা উৎসর্গীকৃত ...	৮১৪
জৈনধর্ম্ম—আর্য্যপট্টের ভগ্ন অংশ গোতিপুত্রের পত্নী শিবমিত্রা কর্তৃক স্থাপিত ...	৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
জৈনধর্ম্ম—নট ফগুযশের পত্নী শিবযশা কর্ত্তৃক স্থাপিত আর্য্যাপট্ট ...	৮১৩
জৈনধর্ম্ম—শিবঘোষক পত্নী কর্ত্তৃক স্থাপিত আর্য্যাপট্ট	৮১২
জোভানা টোর্ণাবুয়োনি ...	৯০৬
"টম্যা-পটেটো" গাছ ...	২৯৭
ঢাকা ইন্দুপ্রভা ক্যাবিনেট ওয়ার্কস্, দেওয়ান বাজার	৪৩৪
ঢাকা কায়েতটুলীর একটি বাড়ী ...	৪৩৫
ঢাকা কায়েতটুলীর "মাধবানন্দ-ধাম," বাহিরের ছবি ...	৪৩৩
ঢাকা কায়েতটুলীর "সুশীলা-নিবাসে"র দগ্ধ বিধ্বস্ত দিক ...	৪৩১
ঢাকা নন্দী-পরিবার ...	৪২৯
ঢাকা নবাবগঞ্জের একটি মুদির দোকান ...	৪৩০
ঢাকা "মাধবানন্দ-ধাম," ভিতরের ছবি ...	৪৩৬
ঢাকা "সুশীলা-নিবাসে"র অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষতিগ্রস্ত অংশ ...	৪৩২
ঢাকা—শ্রীমতী অনিন্দ্যবালা নন্দী ...	৪৩৬
ঢাকাই মসলিন ...	৫৫২
—টানা খাটানো ...	৫৪৮
—টানা গাঁথা ...	৫৫০
—টেকোয় সরু সুতা কাটা ...	৫৪৭
—তাঁত বোনা	৫৫১, ৫৫২
—নাটাইয়ে সুতা গুটানো ...	৫৪৯
ঢাকায় উপেন্দ্রনাথ সেনের বাড়ীর দুরবস্থা ...	৫৯৩
ঢাকার বংশালের একটি বাড়ী ...	৫৯৪
ঢাকার বংশালের একটি বাড়ীর লুণ্ঠনান্তে দুরবস্থা	৫৯৫
ঢাকার বংশালের একটি ডিস্পেন্সারীর দুরবস্থা ...	৫৯৫
ঢাকার বংশাল পাড়ায় শ্যামচাঁদ বসাকের আড়তের ধ্বংসাবশেষ ...	৫৯৪
ঢাকায় ও নিকটস্থ গ্রামে উপদ্রব—সুশীলা-নিবাস	৫৯৩
তরুণীর প্রতিকৃতি ...	৯০৬
তাম্পাক্-সোরিঙ-এর গুহার সামনে ...	৮৮০
তাম্পাক্-সোরিঙ-এর মন্দির ...	৮০০
তাম্পাক্-সোরিঙ—গ্রাম ও স্নানাগার ...	৮৭৯
শ্রীতারামতি বাঈ পাটেল ...	৫৯০
তোপেঙ বা মুখস-পরা অভিনেতার দল ...	৮৮৪
দান্তে ...	৯১০
দেবীমূর্ত্তি—গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দিরের নিকট প্রাপ্ত	৯৩
দীপময় ভারত—কারাঙ-আসেম্ প্রাচীন পুরী ...	৫৮৪
—কারাঙ-আসেম্ প্রাচীন পুরীর একটি ঘর ...	৫৮৪
—কারাঙ-আসেম সোনার তৈজস ...	৫৮৭
—কারাঙ-আসেমে রবীন্দ্রনাথ ...	৫৮১
—কারাঙ-আসেমের রাজা কর্ত্তৃক লিখিত পুস্তকের নামপত্র ...	৫৮০
—ক্লুঙ-কুঙ-এর প্রাসাদে দ্বারপাল মূর্ত্তিতে ডচ্ প্রতিকৃতি ...	৭৪৩
—ক্লুঙ-কুঙ-এর বিচারালয় ...	৭৪২
—তোরণ-দ্বারে রাক্ষস দ্বারপাল মূর্ত্তি ...	৭৪২
—দ্বার-পার্শ্বে পদণ্ড ঘরের মেয়ে-মাতাও কন্যা ...	৭৪১
—পদণ্ডগণ কর্ত্তৃক পূজানুষ্ঠান ...	৫৮৫
—পুত্রদ্বয় সহিত কারাঙ-আসেমের রাজা	৫৮২
—বেসাক্কিক্-এর পথের দৃশ্য ...	৭৪১
—বেসাক্কিক্ নৈবেদ্য-বেদি ...	৭৩৭
—বেসাক্কিক্-মন্দিরে উঠিবার সিঁড়ি ...	৭৩৬
—বেসাক্কিক্-এ আরণ্য-বিভাগের আপিস ...	৭৩৫
শ্রীধর্ম্মশীলা জায়সবাল ...	৯২১
নক্শা কাটা পাথর লাগানো ইটের দেওয়াল ...	৪১৮
নগর প্রবেশ (রঙীন) শ্রীকনু দেশাই ...	৬২৫
নারী সত্যাগ্রহ সমিতির নেত্রীগণ ...	৭১৪
নারীর সৃষ্টি—মাইকেল এঞ্জেলো ...	৯০৯
নৌড়রাজি—শ্রীসোভাগমহল হোহ্‌লোট ...	১৫১
নৈবেদ্য শিরে মন্দিরাভিমুখিনী নারীগণের শোভাযাত্রা ...	১০৪
নো—ইশিকাওয়া তাতশুয়েমন শিগেমাসা কৃত কুমোতে মুখোস (১২৮০ খৃঃ অঃ) ...	৬০৫
নো—ফোজো মুখোস (১৩৭০ খৃঃ অঃ) ...	৬০৬
নো—হান্না মুখোস (১২৮০ খৃঃ অঃ) ...	৬০৬
"নো" নৃত্যের মুখোস—ডেমে ইয়োশিমিৎসু কৃত ওতোবিতে মুখোস (১৬১৬ খৃঃ অঃ) ...	৬০৫
পঞ্চম জর্জ্জ কর্ত্তৃক লণ্ডন নৌ বৈঠক উদ্বোধন ...	৩১০
পাঘমানে আমানুল্লার রাজপ্রাসাদ ...	২৮৫
পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান—শ্রীনন্দলাল বসু ...	১৫৬
পাহাড়ের গায়ে ধানের খেত ...	১০৩
প্যারীচাঁদ মিত্র, মর্ম্মর-মূর্ত্তি ...	৫১৯
পুণ্যিপুকুর (রঙীন) শ্রীপ্রভাত নিয়োগী ...	৫৩২
"পিয়েটা" ...	৯০৩
পুঙ্গব-পুত্রী ...	৮৮৬
পুরাতন লটারির টিকিট ...	২১৬
পুরী বা প্রাসাদ দ্বারে দণ্ডায়মান গিয়াঞ্জারের রেখণ্ট	৮৮
পূজার উপচার (দীপময় ভারত) ...	২৯১

চিত্র সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
পূজা-নিরত পদণ্ড হাতে 'মুদ্রা' ক'রেছেন (দ্বীপময় ভারত)	…	২৭৩
পূজা-রত 'পদণ্ড' (দ্বীপময় ভারত)	…	২৬৯
শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বসাক	…	২৯৯
প্রজাদের এক জিরগায় নূতন আমীর নাদির শাহের প্রথম বক্তৃতা	…	২৮১
প্রফুল্লচন্দ্র রায় (আচার্য্য) ও ৭॥ পাউণ্ড ওজনের পেঁপে	…	২৭
প্রবন্ধকার, শ্রীযুক্ত দ্রেউএস্ প্রভৃতি (বলিদ্বীপ)	…	৪২০
(স্যার) প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	…	১৬৫
ফরিদপুর সরকারী কৃষিক্ষেত্রে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রায়সাহেব দেবেন্দ্রনাথ মিত্র এবং শিক্ষাধীন ভদ্র যুবকগণ	…	২৯
"ফলের বাগান"	…	৪৫৩
ফেরিওয়ালা যাত্রী—শ্রীনিশিকান্ত চৌধুরী	…	১৫৫
ফ্রেস্কো—রাফায়েল অঙ্কিত	…	৯১১
বঙ্গসাগরের ঝড়—ঝড়ের বায়ুচক্র	…	৪৮৫
—ঝড়ের বায়ুচক্র (উর্দ্ধ অধঃভাবে)	…	৪৮৬
—ঝড়ের বায়ুচক্র, ১৯১৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর ৮ ঘটিকার সময়	…	৪৮৭
—ঠাণ্ডাবায়ু এবং উষ্ণবায়ুর সংস্পর্শে ঝড়ের উৎপত্তি	…	৪৮৭
—বঙ্গসাগরের বিভিন্ন সময়ের ঝড়ের গতিপথ	…	৪৮৮
বধূ—রসেটী	…	৪৫৪
বন্দী অবস্থায় সপারিষদ বাচ্চা-ই-সাকাও	…	২৮৪
বলিদ্বীপ	…	১০১
বলিদ্বীপ—গ্রামের মেয়ে	…	৪১৬
বলিদ্বীপ—শোভাযাত্রা	…	৪১০
বলিদ্বীপীয় ছতরী	…	৪১৩
বলিদ্বীপে নৈবেদ্য-সাজানো ফল ও তালপাতার সাজ	…	২৬৬
বলিদ্বীপের অভিজাত বংশের কন্যা	…	৮৮০
বলিদ্বীপের স্নানাগার	…	৮৭৯
বলিদ্বীপের নর্ত্তক অভিনেতা	…	৪১৫
বলিদ্বীপের মন্দির তোরণ	…	৯৯
বল্লভভাই পটেল	…	১৬৭
বসন্তকুমারী দেবী	…	৫৯০
বাঙ্গালোরে মলমূত্রাদি হইতে সারপ্রস্তুত-প্রণালীর যন্ত্রাবলী	…	২৫
বাপুজী (রঙীন) শ্রীনন্দলাল বসু	…	৩২১
বাঁশী—শ্রীযামিনী রায়	…	১৫৩

বিষয়		পৃষ্ঠা
বিনা সারে উৎপন্ন একপ্রকার শস্য	…	২৫
শ্রীবিমলপ্রতিভা দেবী	…	৭১৫
বিরাট মানমন্দিরের পরিকল্পনা—যুক্তরাজ্যের আরিজোনা ষ্টেটের অন্তর্গত গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের ধারে	…	৪৫১
বিষ্ণুমূর্ত্তি	…	৯২
বীণাপাণি (রঙীন) শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়		১৭৭
বীর হনুমান—শ্রীরেণু রায়	…	১৫৩
বুদ্ধ পূজা—শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার	…	১৫৬
বুদ্ধমূর্ত্তি	…	৯৩
বুন্দেলা-কেশরী ছত্রসাল প্রাচীন চিত্র—(রঙীন)	…	৭৯৪
বেণু (রঙীন) শ্রীঅবোধ্যালাল	…	৮৫
বেয়াত্রিচে দেস্তে	…	৯০
বোধিসত্ত্ব—পাটনা জেলায় চণ্ডীমৌ গ্রামে আবিষ্কৃত		৯
বোম্বাইয়ে নেতাদের শাস্তি—এস্‌প্লানেড্ হাজত হইতে কয়েদীগাড়ী নেতৃগণকে বাইকুল্লা জেলে লইয়া চলিয়াছে	…	৭৬
বোম্বাইয়ে কারাদ্বারে	…	৭৬৭
বোম্বাইয়ে নেতৃগণকে কয়েদীগাড়ী হইতে নামান হইতেছে	…	৭৬
বোম্বাইয়ে বাইকুল্লা জেলের দ্বারদেশে	…	৭৬
ব্যঙ্গচিত্র		২৯৫, ৪৬১, ৭৩
ব্যাঙের ছাতা-চাষ করিবার প্রণালী	…	৮২
"ব্লেসেড ড্যামোজেল" রসেটী	…	৪১
ভার্জ্জিন মেরীর শৈশব	…	৪৫
মন্দির-দ্বার-বর্ত্তিনী নারীগণ (দ্বীপময় ভারত)	…	২৬
মন্দির দ্বারে (বলিদ্বীপ)	…	১০
মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীযুক্ত আব্বাস তায়েবজী	…	২৯
মহাত্মা গান্ধীর অভিযানের চিত্র—আমেদাবাদ হইতে মহাত্মা গান্ধীর যাত্রা	…	১৪
—উনআশীজন সত্যাগ্রহীসহ মহাত্মা গান্ধীর লবণ আইন ভঙ্গ করিতে যাত্রা	…	১৪
—খেড়া জেলার গ্রামবাসিগণ	…	১৪
—দরবার গোপাল দাস	…	১৪
—নর্ম্মদা পার হওয়া	…	১৪
—মহাত্মা গান্ধী বিশ্রাম করিতে যাইতেছেন	…	১৪
—মহাত্মাজী এক অস্পৃশ্য রমণীর দত্ত মালা গ্রহণ করিতেছেন	…	১৪
—মহাত্মাজীকে দেখিবার জন্য নাড়িয়াতে বিরাট জনতা	…	১৪

বিষয় — পৃষ্ঠা

—মহাত্মাজীর বঙ্গীদ যাত্রা … ১৪৬
—সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল গ্রেপ্তার হইবার পর সবরমতীর তীরে এক বিরাট সভায় মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা … ১৪৪
—হাঁটুতে আঘাত পাইবার পর মহাত্মা গান্ধী দুইজন সঙ্গীর কাঁধে ভর দিয়া চলিয়াছেন … ১৪৫
মহাত্মাজীর পর্ণকুটীর … ২৯৭
মহেশচন্দ্র ঘোষ … ৫৮৫
মা শ্রীএইচ, এল, মেড় … ১৫৭
মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের একটি দৃশ্য … ৪৫২
মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের ১০০ শত ইঞ্চ ব্যাসের দূরবীণ … ৪৫২
মা ও ছেলে—শ্রীসত্যরঞ্জন কর … ১৫২
মা ও ছেলে—শ্রীসুধাংশু কর … ১৫২
মাতা ও শিশু … ৮৯
মাল্যদান (রঙীন) শ্রীসুখলতা রাও … ৩১৮
মুহম্মদ শাহ (রঙীন) … ২২৮
মৃগয়া—প্রাচীন চিত্র হইতে (রঙীন) … ৪৪
মৃত্যু—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর … ১৫৬
শ্রীমোহিনী দেবী … ৭১৫
শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত … ১৬৮
যবদ্বীপের আমন্ত্রণ (রঙীন)—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত … ৭৭৫
যানের বিবর্ত্তন—উনবিংশ শতাব্দীর "ষ্টেজ-কোচ" বা ঘোড়ার গাড়ী … ১৪৮
—একটি বাষ্পচালিত গাড়ী (১৮৬২ সনে নির্ম্মিত) … ১৪৮
—পশ্চিম আফ্রিকার পাল্কী … ১৪৮
—"পাফিং বিলি" জর্জ্জ ষ্টিফেনসনের প্রথম ইঞ্জিন … ১৪৮
—ভিক্টোরীয় যুগের "হাউস্ বোট" … ১৪৮
—মোটরকারের প্রথম রূপ … ১৪৯
যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা (রঙীন) শ্রীনন্দলাল বসু … ৪৮১
যীশু ও মেরী … ২০৫
যীশুমাতা—করেজ্জো … ২১২
যীশু, মেরী ও জোসেফ—মাইকেল এঞ্জেলো … ২০৮
যীশু—লিওনার্ডো … ২০৭
রণজিৎ সিংহ (রঙীন) … ২৬০
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় … ৫০১
রাঢ়ে ইন্দ্রেশ্বরের মন্দিরের দ্বারদেশের উপরের প্রস্তরখণ্ড … ৬৪৬
রাঢ়ে দাঁইহাটের বিষ্ণুমূর্ত্তি … ৬৪৮
রাঢ়ে প্রাচীন ঘাট—দাঁইহাট … ৬৪৮
রাঢ়ে বদর সাহেবের আস্তানা … ৬৬৮
রাঢ়ে—শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর প্রস্তরমন্দির জগদানন্দপুর … ৬৪৯
রাঢ়ে রামানন্দ-পূজিত সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের কালীর কাঠাম … ৬৪৬
রাঢ়ে সমাজবাড়ী—দাঁইহাট … ৬০৮
রাঢ়ে সাধক রামানন্দ রায়ের পঞ্চমুণ্ডী আসন … ৬৪৭
রাঢ়ে সুন্দরলাল তেওয়ারীর সমাধিমন্দির-সংলগ্ন প্রস্তরলিপি … ৬৪৭
রাঢ়ের কয়েকটি পল্লীভ্রমণ—রাজাডাঙ্গার প্রাচীন শিবমন্দির … ৬৪৫
'রাণী' পাতিমা … ৯৯
তারামূর্ত্তি—রামপালের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে উৎসর্গীকৃত … ৯০
রেলের কামরার আর একধার—শ্রীইন্দু রক্ষিত … ১৫৬
রেশমের কাজ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি … ১৩৯
লটারির টাকায় নির্ম্মিত কলিকাতার টাউন হল … ২১৫
লক্ষ্মী—শ্রীসুনয়নী দেবী … ১৫৩
"লা গীরলাণ্ডাট"—রসেটী … ৪৫৫
শ্রীলালতুদাই রায় … ৬৫১
শান্নোদেবী, শ্রীমতী … ১৬৯
শ্রীশান্তি দাস … ৯২১
শান্তিনিকেতনে "বর্ষামঙ্গল" বৃক্ষরোপণের শোভাযাত্রা আরম্ভ … ৭৬২
শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণের শোভাযাত্রা গ্রন্থাগারের নিকটস্থ … ৭৬৩
শান্তিনিকেতনে শাল-বীথিকায় বৃক্ষরোপণ শোভাযাত্রা … ৭৬২
শান্তিনিকেতনে শোভাযাত্রা গ্রন্থাগারের সম্মুখে … ৭৬৩
শান্তিনিকেতনে শ্রীভবনের সম্মুখে বৃক্ষরোপণ … ৭৬৪
শিব—শ্রীসুনয়নী দেবী … ১৫৫
শীর্ণ নারীমূর্ত্তি—নদীয়া জেলার বিক্রমপুর গ্রামে প্রাপ্ত … ৯৫
শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রায় মৃতগণের আত্মার প্রতীক (দ্বীপময় ভারত) … ২৬৭
শ্রাদ্ধ-মণ্ডপ (দ্বীপময় ভারত) … ২৭০
শ্রাদ্ধমণ্ডপ—শোভাযাত্রার ছত্র ও অস্ত্রধারী অনুচরগণ (দ্বীপময় ভারত) … ২৭২

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রাদ্ধমণ্ডপে উপচার ও নৈবেদ্য মস্তকে স্ত্রীগণের আগমন (দ্বীপময় ভারত) ...	২৭৫
শ্রীচৈতন্যের টোল—শ্রীনন্দলাল বসু ...	১৫৭
'শ্লট' যন্ত্রের ছাতা বিক্রয় ...	৪৫২
সত্যাগ্রহে বাঙ্গালী মহিলা—বাঁকুড়া জেলার বেতুড় গ্রামের কয়েকজন মহিলা সত্যাগ্রহ করিয়াছেন	১৪৩
সত্যাগ্রহের অন্যান্য চিত্র ..	২৯৮
সন্ন্যাসিনী—শ্রীসুনয়নী দেবী ...	১৫৩
সভানেত্রী—শ্রীযুক্তা কামিনী রায় ও মন্দিরের শিক্ষয়িত্রীগণ ...	১৩৮
সাইকেলে মহাত্মা গান্ধী ...	৩১৮
সাইমন কমিশন ও ভারতবর্ষ ...	৪৬০
সাঁওতালী নৃত্য—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ...	১৫৬
সাটিন ও সুতার কাজ—পুরীর মন্দির ...	১৪১
সার ও বিনা সারে উৎপন্ন বিলাতী বেগুন ...	২৮
সার ও বিনা সারে উৎপন্ন রাগী ...	২৬
সার প্রয়োগে উৎপন্ন শস্য ...	২৬
শ্রীমতী সুলাজিনী দেবী ...	১৪২
সুতা কাটায় নিরত শ্রীযুক্ত আব্বাস তায়েবজী ...	৩১৯
ষ্টান্জা দেলা সেনিয়াতুরার ফ্রেস্কোর একটি অংশ—রাফায়েল ...	৯১১
সোনার সিঁড়ি—বার্ণ জোন্স্ ...	৪৫৬
সেণ্ট জন দি ব্যাপটিষ্ট—লিওনার্ডো ...	৯০৭
স্যার গালাহাড ও "হোলিগ্রেল" ...	৪৫৭
হরপার্ব্বতী—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার ...	১৫৭
হলায়ুধ (রঙীন) শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ...	১

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়	
গঙ্গাফড়িং (গল্প) ...	৬৪২
শ্রীঅনিলবরণ রায়	
অর্চ্চনায় (কবিতা) ...	৩০
শ্রীঅনুরূপা দেবী	
সাবিত্রী ব্রত ...	৮০৭
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	
"বাঙ্গালার প্রথম" ...	১৩১
শ্রীঅরবিন্দ দত্ত	
কাম্বিখ্যের ঠাকুর (গল্প) ...	৩৮৮
শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	
ভারতীয় প্রাচ্যকলা-পরিষদ ও বাঙ্গালীর শিল্প শিক্ষা	৫৬১
স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের কয়েকখানি পত্র ...	৩৭৯
শ্রীঅশোকবিজয় রাহা	
মেঘলা সকাল (কবিতা) ...	৭৩১
শ্রীআশীষ গুপ্ত	
অন্তরে বাহিরে (গল্প) ...	৭১৬
শ্রীআশুতোষ ঘোষ	
বৈজু বাওরা (আলোচনা) ...	১২৫
শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু	
বাদশাহী বিচার-পদ্ধতি ও দণ্ডনীতি ...	৬৬৭
শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	
ক্ষ্যাপার গান (কবিতা) ...	৮৪২
শ্রীকামিনী রায়	
কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দির (সচিত্র) ...	১৩৭
বিদায়ের অর্ঘ্য (কবিতা) ...	৫৭২
শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো	
মহারাণা রাজসিংহ ...	১৯০
মহারাজ ছত্রসাল বুন্দেলা ...	৭৯৩
শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	
ঢাকাই মসলিন (সচিত্র) ...	৫৪৭
ভারতীয় চিত্রকলা ও বঙ্গীয় পন্থা (সচিত্র)	১৫১
শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু	
মানুষের মন ...	৩৩৯
শ্রীগোপাললাল দে	
বঙ্গলক্ষ্মী (কবিতা) ...	৪৯৮
গোলাম মোর্ত্তজা	
"ঢাকায় ও নিকটস্থ গ্রামে উপদ্রব" (আলোচনা)	৭০০
শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়	
শব্দতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ ...	৮৯১
শ্রীজগৎ মিত্র	
কণ্টক (কবিতা) ...	৬৪৪
জসীম উদ্দীন	
মুসাফীর (কবিতা) ...	৫০৪

প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

প্রবাসী-কার্য্যালয়
২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
মূল্য তিন টাকা ছয় আনা

NATION…
L-3466
19.4.67

প্রবাসী—১৩৩৭, বৈশাখ হইতে আশ্বিন

৩০শ ভাগ প্রথম খণ্ড

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
অজিতনাথ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৫৪
অনাবশ্যক বৈদেশিক প্রভাব বিস্তার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৭০
অনাসক্তি যোগ—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী	৬৮২
অনিচ্ছাকৃত স্বীকারোক্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৭৫
অন্তরে বাহিরে (গল্প) শ্রীআশীষ গুপ্ত	৭১৬
অপরাজিত (উপন্যাস) শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৮, ২২৮, ৩৬৫, ৫০৫, ৬৮৭, ৮৬৮
অপেক্ষায় (কবিতা) শ্রীঅনিলবরণ রায়	৩০
অভিধান—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৮৬২
অহিংস সংগ্রামের ফলাফলের সময় নির্দ্দেশ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৭০
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের কয়েকখানি পত্র শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৩৭৯
"আইনের বাধ্য ও শান্তিপ্রিয়" লোকদের সংখ্যা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬১
আওরংজীবের জীবননাট্য—স্যর যদুনাথ সরকার	১
আওরংজীবের ব্যক্তিত্ব (আলোচনা) শ্রীনীরদকুমার বক্সী	৭০০
আফ্‌গানিস্থানের নবযুগ (সচিত্র) শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৭৯
আধুনিক মনোবিজ্ঞান—শ্রীহরিপদ মাইতি,	৪৫
আমাদের কথা—শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী	১০৮
আর্টের অর্থ—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	৩৯৮
আলোচনা	১২৪, ২৬৪, ৭০০, ৮৫৪
আসামের কুকিজাতি (আলোচনা)	৮৫৫
আসামীর অসাক্ষাতে বিচার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৭৫
আসামের কুকি জাতি (সচিত্র) শ্রীলালতুদাই রায়	৬৫০
আহার্য্য ও বিষাক্ত ছত্রাক (সচিত্র) শ্রীসহায়রাম বসু	৮২৭
ইঙ্গ-ভারতীয় কন্‌ফারেন্সে ঐকমত্যসাধন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১০
ইঙ্গ-ভারতীয় কন্‌ফারেন্সে বিলাতী সভ্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৫৮
ইঙ্গ-ভারতীয় কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬০৯
ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৪২
ইতালীয় চিত্রকলার পরিচয় (সচিত্র) শ্রীমন্মথ চৌধুরী	৯০৩
"ইংলণ্ড স্বরাজের যোগ্য কি না?" (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২২
উড়িষ্যার মণ্ডন শিল্প (সচিত্র) শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ	২৩৭
উপাধান (কবিতা) শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী	২৩
ঋণব্যবসায়ে সংহতি (কষ্টি)	৬৮১
একটা ন্যক্কারজনক জঘন্য পুস্তিকা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৭৬
একরাত্রি (গল্প) শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৮৪৪
কণ্টক (কবিতা) শ্রীজগৎ মিত্র	৬৪৪
কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে আমাদের মত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১২
কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ (?) প্রভৃতির মত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৩
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৫১
কলিকাতায় শোচনীয় ও লজ্জাকর দলাদলি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬২
কষ্টিপাথর	৫৮, ২৫৬, ৪৩৮, ৫৩৫, ৬৭৭, ৮৫২
কংগ্রেস কমিটিগুলি বেআইনী ঘোষণা করা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯২৫
কংগ্রেস ও ব্যবস্থাপক সভা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৭১
কংগ্রেস ও লণ্ডনের কন্‌ফারেন্স (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১১
কংগ্রেসের সহিত সন্ধি হইল না (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৪২
কাপড়ের উপর শুল্ক কে দিবে? (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৬২
কামিখ্যের ঠাকুর (গল্প) শ্রীঅরবিন্দ দত্ত	৩৮৮
কার্পাস শিল্পে ব্রিটেনকে বাণিজ্যিক সুবিধাদান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৬১
"কার্য্যতঃ ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস" (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৬২
কালিদাসের বৃক্ষলতা (কষ্টি)	৬৩, ৫৩৮
কিশলয়োৎসব (কবিতা) শ্রীজীবনময় রায়	৪৪
কিশোরগঞ্জ (সচিত্র) শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী	৮৫৬
কিশোরগঞ্জের উপদ্রব (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬৫
কিশোরগঞ্জ সম্বন্ধে পুস্তিকা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা
"কিশোরগঞ্জের দাঙ্গার কারণ" (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৪০
কুজ্ঝটিকা ও কিরণ (গল্প) শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	৩৩০
কৃষিশিক্ষার প্রয়োজন ও আয়োজন — শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় …	৫৫
কৃষ্ণভামিনী নারীশিক্ষা মন্দির (সচিত্র) — শ্রীকামিনী রায় …	১৩৭
কোথায় পঞ্চজন? (কবিতা) — শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ …	৯৬
কানাডার পথে—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর …	১৭৭
খাজনা না-দিবার পরামর্শদান (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৩০৯
খালাস (গল্প) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় …	৫৯৬
খুকীর কাণ্ড (গল্প) শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৯৯
গঙ্গাফড়িং (গল্প) শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায় …	৬৪২
গান্ধীজীকে ধরিবার প্রণালী (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৩০৩
গান্ধীদম্পতি (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৩০২
গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে গবন্মেণ্টের কৈফিয়ৎ (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৩০৫
গুজরাটী গরবা (সচিত্র) শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৪০২
গুলি দ্বারা চিকিৎসা (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	১৭২
"গোল টেবিল" (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৩০৭
গৌড়ীয় শিল্পে দাক্ষিণাত্য প্রভাব (সচিত্র) — শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় …	৮৯
গ্রামের অবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৪৭২
ঘনীকৃত তৈল—শ্রীরাজশেখর বসু …	৩২৬
ঘোষ, মাননীয় শ্রীযুক্ত এস্, এন্ …	৭৭০
"চলন্তিকা" (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৬২১
চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৭৬১
চুনীলাল বসু রায়বাহাদুর (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৭৭৪
চৈন বিদ্যাপীঠ দ্বারা আহূত হিন্দু অধ্যাপক (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৬১৬
ছাত্র ছাত্রীদের কর্ত্তব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৬২০
ছাত্রদের কর্ত্তব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৭৬১
ছাত্রসমাজ ও দেশের কাজ (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৬১৬
ছায়া (কবিতা) শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় …	২৫৫
ছেলেধরা (গল্প) পরশুরাম …	৭৮৬
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, পণ্ডিত (সচিত্র) — শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় …	৩৬০
জনৈক সাবেক লাটের মিথ্যাবাদিতার নমুনা (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৯২২
জাতক (কবিতা) শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী …	৫২২
জাপানীদের উদ্যোগিতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৭৫৩
জীবের নিয়তি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত …	৩২১
জেলে অল্পবয়স্কদের শিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৯৩৬
জেলে বালকদের প্রাথমিক শিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৭১
জৈনধর্ম্ম ও আর্য্যপট্ট (সচিত্র) — রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় …	৮০১
ঢাকাই মসলিন (সচিত্র) শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৪৭
ঢাকা উপদ্রবের সরকারী তদন্ত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৩২
ঢাকা উপদ্রবের সরকারী তদন্তের রিপোর্ট কখন পাইব? (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৯৩৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুমুসলমান ছাত্র (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৯২৪
ঢাকায় মুসলমানের অবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৯৩৪
ঢাকায় ও নিকটস্থ গ্রামে উপদ্রব (সচিত্র) …	৫৯৩
"ঢাকায় ও নিকটস্থ গ্রামে উপদ্রব" (আলোচনা) — গোলাম মোর্ত্তজা …	৭০০
ঢাকায় খুন লুট গৃহদাহ (সচিত্র) …	৪২৮
ঢাকায় দানবীয় কাণ্ড (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	[illegible]
ঢাকায় শান্তিরক্ষকগণ (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৪৬৬
ঢাকায় হিন্দুমুসলমান (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৪৬৩
ঢাকার উপদ্রব (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৪৭৪
ঢাকার ব্যাপারের তদন্ত কমিটি (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৪৬৭
ঢাকার হাঙ্গামা (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৬২৩
তরুণী ভার্য্যা (গল্প) শ্রীসীতা দেবী …	৪৪২
তারার মতন (কবিতা) শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী …	৫৪৬
তিস্তা (কবিতা) শ্রীপ্রমথনাথ বিশী …	৭৪৫
তৃণাঙ্কুর (গল্প) শ্রীশান্তি সেন …	৯১০
দমন নীতির ফল (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৪৭৯
দুইবারে প্রকাশের কারণ—সাইমন রিপোর্ট (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	[illegible]
দুটি নূতন অর্ডিনান্স (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৭৭
দুষ্করতার ও বিপদের আহ্বান (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	১৫৭
দেশ-বিদেশের কথা (সচিত্র)	১৪২, ২৯৭, ৪৫[illegible], ৫৯১, ৭৩২, ৯০২
দেশরক্ষাসম্বন্ধীয় আপত্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৪৭০
দেশী কাপড়ের কল (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৭৬৯
দৌড়চক্র ও ব্যায়ামশালা (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৯৩[illegible]
দ্বীপময় ভারত (সচিত্র) শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	৯৭, ২৬৪, ৪০৮, ৫৭৭, ৭৩৫, ৮৭৮
ধানের চাষের উন্নতি (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৯৩[illegible]
নক্ষত্র সমাজ (কবিতা) শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী …	৮৫[illegible]
নাদির শাহের অভ্যুদয়—স্যর যদুনাথ সরকার …	৪৮[illegible]
নাম-মাহাত্ম্য—শ্রীনন্দি শর্ম্মা …	৫[illegible]
নারীদের দ্বারা পিকেটিং (বিবিধ প্রসঙ্গ) …	৪৭[illegible]

বিষয়	পৃষ্ঠা
নারীহরণের প্রতিকার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৯৪১
নাস্তিক (গল্প) শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়	৫৪১
নিরুপায় (কবিতা) শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ...	৭৯৭
নিষ্কলঙ্ক (গল্প) শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬৫৭
"ন্যূনতম বলপ্রয়োগ" (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৭৯
পঞ্চশস্য (সচিত্র) ১৪৮, ২৯২, ৪৫১, ৬০৪,	৭৪৬
পঞ্চাশোর্দ্ধম্ (কষ্টি) ...	৫৮
পাখী—হাজার বছর পরে (কবিতা) শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য ...	১৯৮
পাবনা হিন্দুসম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ (কষ্টি)	৬০
পাটিয়ালার মহারাজা সম্বন্ধে তদন্ত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬০
পিতা নোহসি (কষ্টি) ...	৮৫২
পুনশ্চ (গল্প)—শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় ...	৩৫৪
পুরাণে রাঢ়ের ইতিহাস (কষ্টি) ২৫৯,	৫০৪
পুস্তক-পরিচয় ১২২, ২৬৩, ৪৪৯, ৫৩৯,	৭০১
প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের (আচার্য্য) বক্তৃতা (কষ্টি) ...	৪৩৮
প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৬৪
প্রয়াগের চিঠি (গল্প) শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভৌমিক ...	৬৩১
প্রাচীন ভারতে বন্দুক ছিল না শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ...	৬২৫
প্রাণের দাবী (গল্প) শ্রীসান্ত্বনা দেবী ...	৪৮৯
প্রাথমিক শিক্ষা বিল (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৮৩
'প্রি-র‍্যাফেলাইট' চিত্রকলা (সচিত্র) ...	৪৫৩
প্রেম ও জীবন (কবিতা) শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ...	৭৬
প্রেস ও সংবাদপত্র উপ-আইন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩১৬
বঙ্গনারীর বিশেষত্ব (কষ্টি) ...	২৬২
বঙ্গলক্ষ্মী (কবিতা) শ্রীগোপাললাল দে ...	৪৯৮
বঙ্গসাগরের ঝড় ও তাহার প্রকৃতি (সচিত্র) শ্রীসুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৪৮৪
বঙ্গসাহিত্যে প্যারীচাঁদ (সচিত্র) শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী ...	৫১৮
বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৯৩৫
বঙ্গে অত্যাচারের অভিযোগ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৬১৪
বঙ্গে নারীনির্য্যাতন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৭৩
বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিল (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৫৬
বঙ্গের ও অন্যান্য প্রদেশের সংবাদপত্র (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৩৪
বঙ্গে গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষা আইন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৩৮
বঙ্গের মিউনিসিপালিটী-সমূহের আর্থিক অবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৬৮
বড়লাটকে লিখিত গান্ধীজীর দ্বিতীয় পত্র (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৩১২
বন্দী (গল্প) শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ...	৬৮
বরিশালে বঙ্গীয় শিক্ষক সম্মেলনের অধিবেশন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৩১৪
বর্ত্তমান অবস্থায় ছাত্রদের কর্ত্তব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫৯
বর্ত্তমান যুগের নারীসমস্যা (কষ্টি) ...	৮৫২
বর্ত্তমান সংগ্রামে নারীদের কর্ত্তব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৬৯
বল্লভভাই পটেলের কারাবাস (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৬৭
বস্ত্রশিল্প রক্ষা ও উন্নতির উপায় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৬৩
বাংলা ও আসামে অবনত শ্রেণীদের শিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৯৩৫
বাঙ্গালার অন্ন-সমস্যা—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ ...	২১৭
"বাঙ্গালার প্রথম" শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ...	১৩১
বাণিজ্যে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যকে অধিক সুবিধা দান (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৫৯
বাদশাহী বিচারপদ্ধতি ও দণ্ডনীতি—শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু	৬৬৭
বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের ফল (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৭২
বাংলা গদ্য সাহিত্য (কষ্টি) ...	২৫৬
বাংলা দেশের অবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৭৬
বিদায়ের অর্ঘ্য (কবিতা) শ্রীকামিনী রায় ...	৫৭২
বিদেশে বাঙালীর কলঙ্ক (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৯৪০
বিদ্যাসাপেক্ষ উপার্জ্জনে অধিকার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৭১
বিলাত যাত্রী ভারতীয় বিমান নাবিক (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৭৫
বিলাতী পণ্যবর্জ্জন ও স্বরাজ ...	৯২৮
বিলাতী মেডিক্যাল কৌন্সিলের ঔদ্ধত্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৭৩
বিলাতে বেকার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৫৩
বিলাতী সংবাদপত্র ও ঢাকার উপদ্রব (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৯
বিলাতে স্বদেশী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৭৭
বিবিধ প্রসঙ্গ (সচিত্র) ১৫৭, ৩০১, ৪৬২, ৬০৭, ৭৫৩, ৯২২	
বিশ্ববধূ (কবিতা) শ্রীনীলিমা দাস ...	৬৯৯
বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনে পল্লীসেবক-শিক্ষণের ব্যবস্থা	৭৫৭
বিশ্বভারতীর ছাত্রী ও ছাত্রদের পল্লীসেবা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৭০
বিশ্বভারতীর রিপোর্ট (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৬২৪
বোমা নিক্ষেপ সম্পর্কে বালিকা গ্রেপ্তার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৯৩৬
বোম্বাই প্রদেশে রাজস্ব হ্রাস (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৯৩৭
ব্রিটিশ রাজত্বে অবনত শ্রেণীর অবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৩৩
বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৫৩
বেঙ্গল একাডেমীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের প্রতিবাদের উত্তর (আলোচনা) শ্রীমৃণালবালা দেবী ...	১২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
বৈজু বাওরা (আলোচনা) শ্রীআশুতোষ ঘোষ	১২৫
বোম্বাই সরকারের সহিষ্ণুতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৩১০
বোম্বাইয়ে নেতাদের শাস্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৬৬
ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকটি প্রদেশের প্রতি অবিচার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৬৪
ব্রিটানিকী শান্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৬২
ভাইফোঁটা (গল্প) শ্রীসীতা দেবী ...	৩৫
ভাদ্র-লক্ষ্মী (কবিতা) শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ...	৬৮১
ভারতবর্ষের সত্যাগ্রহের-অবস্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ)...	৯২৪
ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যিক ও অসাম্রাজ্যিক বাণিজ্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৬০
ভারত-ভাগ্য—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ...	৪
ভারতে মুসলমান—স্যর যদুনাথ সরকার ...	৭৭৫
ভারতসচিবের বক্তৃতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৮০
ভারতীয় চিত্রকলা ও বঙ্গীয় পন্থা (সচিত্র) শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ...	১৫১
ভারতীয় প্রাচ্য কলা-পরিষদ ও বাঙ্গালীর শিল্পশিক্ষা—শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ...	৫৬১
ভারতে ও বিদেশে উচ্চতম সরকারী বেতন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৭৪
ভারতে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৬৩
ভারতের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬০৯
ভারতে স্বদেশী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৭৭
মতিলাল (গল্প) শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ...	৮
মরুচারিণী (গল্প) শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী ...	২০০
মরুভূমিতে সোনা-ফলন (সচিত্র) আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় ...	২৪
মল্লজগতে ভারতের স্থান—শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী	২৮৭
মহাকাল শর্ব্বরী (কবিতা) শ্রীজীবনময় রায় ...	৩৩৮
মহাত্মা গান্ধী কারাগারে (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৩০১
মহাত্মা গান্ধীর কারারোধের ফলাফল (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৩১১
মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে উপ-আইন প্রয়োগ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৩০৩
মহামায়া (উপন্যাস) শ্রীসীতা দেবী	১২৭, ২৪৮, ৪২১, ৫২৭, ৭০৩, ৮৮৮
মহারাজ ছত্রসাল বুন্দেলা—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো ...	৭৯৩
মহারাণা রাজসিংহ—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো	১৯০
মহিলা-সংবাদ (সচিত্র)	৫৮৯, ৭১৪, ৯২০
মহিষ ও মানুষ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৭১
মহেশচন্দ্র ঘোষ—শ্রীসুবিমল রায় ...	৫২৯
মহেশচন্দ্র ঘোষ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৬২০
মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন (সচিত্র) ...	৫৬৪
মাঝখানে (গল্প) শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ...	৫২৪
মাতৃভূমির সেবা (কবিতা) শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৭১১
মানুষের মন—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু ...	৩৩৯
মান্দ্রাজের মহিলাগণ ও বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৬১
মায়ের প্রতি—শ্রীস্নেহসুধা গুপ্ত ...	২১৪
"মিথ্যা বানাইবার কারখানা" ? (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৭২
মুসলমান ও নমঃশূদ্রের সহযোগিতা (আলোচনা) শ্রীসন্তোষকুমার রায় ...	৭০০
মুসলমানদের চালের ভুল (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৭৪
মুসলমান ভারতীয় ও অন্যান্য ভারতীয় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯২৩
মুসলমান সমাজ ও কংগ্রেস (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৬১৬
মুসাফীর (কবিতা) জসীম উদ্দীন ...	৫০৪
মেকী (গল্প) শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ...	১৮৩
মেঘলা সকাল (কবিতা) শ্রীঅশোকবিজয় রাহা	৭৩১
মেঘের মতন (কবিতা) শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী ...	৩২৫
মেডিক্যাল ছাত্র ও অন্য ছাত্র (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২৪
মোতীলাল নেহরু দয়া চান না (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৩৬
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের "শাস্তি" (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৬৮
যুগাবতার (কবিতা) শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ...	১৮২
যোগ্য ন্যাসরক্ষক বটে ! (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৭৬
রক্তের হাসি (গল্প) শ্রীসান্ত্বনা গুহ ...	৪৩৭
রঙ্গিণী (গল্প) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ...	৫৫৩
রংপুরের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৩১৩
রফা ও সন্ধির কথা এবং কংগ্রেসকে আঘাত (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৯২৫
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৭৯
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (সচিত্র) শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ	৪৯৯
রাজনৈতিক বন্দীদের দশা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৬৪
রাঢ়ের কয়েকটি পল্লী ভ্রমণ (সচিত্র) শ্রীহরিহর শেঠ	৬৪৫
রামকালী গুপ্ত, ডাক্তার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৬৭
রাষ্ট্রীয় প্রগতির হিংস ও অহিংস পন্থা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৯২৯
রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ক্রমবিকাশ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৬৯
রিপোর্টের আরও কতকগুলি কথা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৭২
রূপ ও রস—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ...	৩১
রূপের ফাঁদ (গল্প) শ্রীসীতা দেবী ...	৮১৮
লণ্ডনের কন্‌ফারেন্স বিষয়ে বড়লাটের বক্তৃতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৬০৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
লবণ আইন লঙ্ঘন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫৮
লবণ কাড়িয়া লওয়ায় বাধা দেওয়া (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫৯
লবণ গোলা "আক্রমণ" (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৯
লবণ-রহস্য—শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সাহা	৭২৬
লবণের কথা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯০৬
লর্ড আরুইন ও বর্ত্তমান প্রচেষ্টা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৪
লীলা (কবিতা) শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী	৬৩০
লেখকদের প্রতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩১৯
য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি ? (কষ্টি)	৬৭৭
'য়্যাড্‌ভান্স' ও 'লিবার্টি' সম্পাদকদের দণ্ড (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬৯
শক্তি-বিজ্ঞান (কষ্টি)	৪৩৮
শব্দ-চয়ন (কষ্টি)	৬৭৭
শঙ্খতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ—শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৮৮
শাড়ি ও চুড়ি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৫১
শান্নো দেবী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৬৯
শান্তিনিকেতনে "বর্ষামঙ্গল" (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬২
শান্তিনিকেতনের কারু-সজ্জ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৫
শিশুর ভয় (কষ্টি)	৬২
শুভরূপ অমঙ্গল হইতে মঙ্গল সম্ভাবনা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৬৪
শেফালি (গল্প) শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরী	২৭৮
সংবাদ প্রকাশিত না হওয়ার অনিষ্টকারিতা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৩৫
সরকারী কর্ম্মচারীদের দেশসেবা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৭০
সরকারী দর কষাকষি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬২০
সরকারী প্রপ্যাগ্যাণ্ডা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৭২
সাইমন কমিশন রিপোর্টের সারসংগ্রহ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৬৮
সাইমন-রিপোর্ট-প্রকাশ পরিহাস (?) (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৬৭
সাইমন রিপোর্ট সম্বন্ধে বড়লাট (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৫
সাইমন রিপোর্টের প্রথম ভাগ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৬৮
সাইমনের আমেরিকা-যাত্রা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৫৯
সাধারণ কয়েদী খালাস (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬৪
সাপ্রু-জয়াকর মধ্যস্থতা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬৮
সাবিত্রী ব্রত—শ্রীঅনুরূপা দেবী	৮০৭
সামাজিক ভয় প্রদর্শনের অভিযোগ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৮
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিকার (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৯৪১
সাংবাদিকদের কন্‌ফারেন্স (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩ ৮
সিন্ধুদেশের দুর্দ্দিন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৬০
সুন্দরের স্থান কোথায় ? শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী	৬৫
সেকালের কলিকাতায় লটারি খেলা (সচিত্র) শ্রীহরিহর শেঠ	২১৪
সেনেট ও মিউনিসিপালিটীতে বাঙালী মহিলা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৭৫
স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও বর্ত্তমান প্রচেষ্টা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৬১৯
হরির লুট (গল্প) শ্রীদিবাকর মিত্র	৮৩০
হালামদের কথা—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র	৫৭৩
হিমাদ্রি (কবিতা) শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	৯০১
হুগলীর পল্লীকবি রসিক রায়—শ্রীমনোমোহন নরসুন্দর	৬৩৭
ক্ষ্যাপার গান (কবিতা) শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৪২

চিত্র-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
অজিতনাথ ভট্টাচার্য্য	৭৫৪
অভিনন্দন লিপি—শ্রীঅসিতকুমার হালদার	১৫৪
শ্রীঅমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়	৯২১
শ্রীঅরুন্ধতী ও শ্রীরেণুকা মিত্র	৫৯০
অর্জ্জুনের তপোভঙ্গের জন্য অপ্সরাগণের প্রয়াস, বলিদ্বীপের পট—(রঙীন)	৮৮২
অর্দ্ধনারীশ্বর	৯২
অর্দ্ধনারীশ্বর (রঙীন) শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়	৮৪
শ্রীঅশোকলতা দাস	৯২১
অসুরগণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়	১৫৬
আধুনিক গৃহসজ্জা—আবলুসের উপর ল্যাকার করা কৌটা	৭৪৮
আধুনিক গৃহাভ্যন্তর—একটি কক্ষাভ্যন্তর	৭৪৯
আধুনিক গৃহসজ্জা—'দিম' কর্ত্তৃক পরিকল্পিত একটি ডাইনিং রুম	৭৪৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
আধুনিক গৃহসজ্জা—নক্সা কাটা ইটের তৈরী ফায়ার প্লেস	৭৫০
আধুনিক গৃহসজ্জা—প্যারিসের জো-বুর্জোয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিকল্পিত ও নির্ম্মিত একটি পড়িবার ঘর	৭৪৬
আধুনিক গৃহসজ্জা—পোর্সেলেনে নির্ম্মিত তিনটি বাতি	৭৪৯
আধুনিক গৃহসজ্জা—ফ্রেশে ও ভেুরোট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি শয়নকক্ষ	৭৪৮
আধুনিক গৃহসজ্জা—লৌহ-নির্ম্মিত একটি দরজা	৭৪৮
আধুনিক গৃহসজ্জা—শয়নকক্ষ	৭৪৭
আধুনিক গৃহসজ্জা—'সাদিয়ে এ ফিজ' কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি পড়িবার ঘর	৭৪৭
আধুনিক গৃহসজ্জা—হাতে বোনা গালিচা	৭৫০
আনমনা (রঙীন) শ্রীকিরণময় ধর	৭২৪
আফগানিস্থানে গৃহবিবাদ, রুষঋক্ষ ও ব্রিটিশ-সিংহ	২৮২
আফগানিস্থানের একমাত্র রেলপথ	২৮৩
আফগানিস্থানের নূতন সরকারী দপ্তরখানা	২৮৬
অ্যাগ্যারিকাস্ ক্যাম্পেষ্ট্রিস্ নামক ছাতা	৮২৭
আঁশের কাজ—শৃগাল ও দ্রাক্ষাফল	১৪০
শ্রীইন্দুমতী গোয়েঙ্কা	৭১৫
"ইয়ং ইণ্ডিয়া"র জন্য লেখননিরত মহাত্মাজী	২৯৬
উর্ব্বিনোর ডিউক ও ডাচেস্	৯০৪
শ্রীউর্ম্মিলা দেবী	৭১৫
উষা ও অরুণ (রঙীন) শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪৪৪
একটি আহার্য্য ও দুইটি বিষাক্ত ছাতা (রঙীন)	৮২৭
একটি সিবিল	৯০৭
এণ্টোলোমা মাইক্রোকার্পাস্ নামক ছাতা	৮২৭
এসাই যুদ্ধের নক্সা	২১৪
কস্তুর বাঈ, শ্রীমতী	৩০২
কহ মৃত্যু কানে কানে কথা—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫৬
কাবুলের বড় মসজিদ	২৮০
কালী (রঙীন) শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়	৪০৪
কারাঙ্-আসেম—গ্রামের লোক (বলিদ্বীপ)	৪১৭
কারাঙ্-আসেমের রাস্তা (বলিদ্বীপ)	৪১৭
কিণ্ডামানি হইতে পাহাড়ের দৃশ্য	১০২
কিশোরগঞ্জ—কৃষ্ণবাবুর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ	৮৬০
কিশোরগঞ্জ—পরলোকগত কৃষ্ণচন্দ্র রায়, তাঁহার পত্নী ও জ্যেষ্ঠপুত্র সুবোধ	৮৫৯
কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী	৫৯২
কৃত্রিম উপায়ে পাকান নাসপাতি	৪৫২

বিষয়	পৃষ্ঠা
কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দিরের চতুর্থ বাৎসরিক উৎসব-সভা	১৩৭
কোপাই (রঙীন) শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত	৬৮৪
খদির বনীতারা নালন্দায় প্রাপ্ত	৯০
খদ্দর-পরিহিত দুইজন ফরাসী সাংবাদিক	২৯৯
গালাটিয়া—রাফায়েল ফার্পোজিনা	৯১০
শ্রীগিরিবালা রায়	৭৭৪
গিয়াঞারের পুরীতে রবীন্দ্রনাথ	৮৮৩
গুজরাটী গরবা—আরম্ভ	৪০৩
—কলসী হাতে করিয়া নৃত্য	৪০৪
—গরবা নৃত্য	৪০৫
—নাচের বিভিন্ন ভঙ্গী	৪০৫
—নৃত্যের আরম্ভ	৪০৪
—মন্দির পথে	৪০৭
—শেষ রাত্রে	৪০৬
—সম্ভ্রান্ত মহিলারাও যোগদান করেন	৪০৪
গোধূলি রাগিণী (রঙীন) শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত	৫৭২
চণ্ডীমূর্ত্তি	৯৪
চশারের কাব্যগ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা	৪৫৮
চিত্রে বন্য হস্তী ধরার দৃশ্য	২৯২
ছাতা চাষের জাপানী প্রণালী	৮২৯
ছত্রাকে বা ব্যাঙের ছাতার বিভিন্ন অংশ	৮২৮
ছাত্রীদের যন্ত্র-সঙ্গীত	১৩৯
জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের চণ্ডীমণ্ডপ—ত্রিবেণী	৩৬৪
জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বাড়ী—ত্রিবেণী	৩৬১
জরি ও রেশমের কাজ—শ্রীকৃষ্ণ	১৪০
জাপানের প্রাচীন ও আধুনিক নৃত্য—	
আধুনিক জাপানের বালিকা-নর্ত্তকী ফুজিমা শিজু	১৪৯
—ওনোয়ে কিকুগরো, জাপানের বিখ্যাত নর্ত্তকী	১৫০
—নর্ত্তকাউ ইশি-ই কোনামি	১৪৯
—সাদো দ্বীপের ওকেসা নৃত্য	১৫০
শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়	৭১৪
জৈনধর্ম্ম—আর্য্যপট্ট	৮১২
জৈনধর্ম্ম—আর্য্যপট্ট স্থাপিত	৮১৬
জৈনধর্ম্ম—আর্য্যপট্ট—মথুরাবাসীদের দ্বারা উৎসর্গীকৃত	৮১৪
জৈনধর্ম্ম—আর্য্যপট্টের ভগ্ন অংশ গোতিপুত্রের পত্নী শিবমিত্রা কর্ত্তৃক স্থাপিত	৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
জৈনধর্ম্ম—নট ফগুযশের পত্নী শিবযশা কর্তৃক স্থাপিত আর্য্যপট্ট	৮১৩
জৈনধর্ম্ম—শিবঘোষক পত্নী কর্তৃক স্থাপিত আর্য্যপট্ট	৮১২
জোভানা টোর্ণাবুয়োনি	৯০৬
"টম্যা-পটেটো" গাছ	২৯৭
ঢাকা ইন্দুপ্রভা ক্যাবিনেট ওয়ার্কস্, দেওয়ান বাজার	৪৩৪
ঢাকা কায়েতটুলীর একটি বাড়ী	৪৩৫
ঢাকা কায়েতটুলীর "মাধবানন্দ-ধাম," বাহিরের ছবি	৪৩৩
ঢাকা কায়েতটুলীর "সুশীলা-নিবাসে"র দগ্ধ বিধ্বস্ত দিক্	৪৩১
ঢাকা নন্দী-পরিবার	৪২৯
ঢাকা নবাবগঞ্জের একটি মুদির দোকান	৪৩০
ঢাকা "মাধবানন্দ-ধাম," ভিতরের ছবি	৪৩৬
ঢাকা "সুশীলা-নিবাসে"র অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষতিগ্রস্ত অংশ	৪৩২
ঢাকা—শ্রীমতী অনিন্দ্যবালা নন্দী	৪৩৬
ঢাকাই মসলিন	৫৫২
—টানা খাটানো	৫৪৮
—টানা গাঁথা	৫৫০
—টেকোয় সরু সুতা কাটা	৫৪৭
—তাঁত বোনা	৫৫১, ৫৫২
—নাটাইয়ে সুতা গুটানো	৫৪৯
ঢাকায় উপেন্দ্রনাথ সেনের বাড়ীর দুরবস্থা	৫৯৩
ঢাকার বংশালের একটি বাড়ী	৫৯৪
ঢাকার বংশালের একটি বাড়ীর লুণ্ঠনান্তে দুরবস্থা	৫৯৫
ঢাকার বংশালের একটি ডিস্পেন্সারীর দুরবস্থা	৫৯৫
ঢাকার বংশাল পাড়ায় শ্যামচাঁদ বসাকের আড়তের ধ্বংসাবশেষ	৫৯৪
ঢাকায় ও নিকটস্থ গ্রামে উপদ্রব—সুশীলা-নিবাস	৫৯৩
তরুণীর প্রতিকৃতি	৯০৬
তাম্পাক্-সোরিঙ-এর গুহার সামনে	৮৮০
তাম্পাক্-সোরিঙ-এর মন্দির	৮০০
তাম্পাক্-সোরিঙ—গ্রাম ও স্নানাগার	৮৭৯
শ্রীতারামতি বাঈ পাটেল	৫৯০
তোপেঙ্ বা মুখস-পরা অভিনেতার দল	৮৮৪
দান্তে	৯১০
দেবীমূর্ত্তি—গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দিরের নিকট প্রাপ্ত	৯৩
দ্বীপময় ভারত—কারাঙ্-আসেম্ প্রাচীন পুরী	৫৮৪
—কারাঙ্-আসেম্ প্রাচীন পুরীর একটি ঘর	৫৮৪
—কারাঙ-আসেম সোনার তৈজস	৫৮৭
—কারাঙ-আসেমে রবীন্দ্রনাথ	৫৮১
—কারাঙ্-আসেমের রাজা কর্তৃক লিখিত পুস্তকের নামপত্র	৫৮০
—কুঙ্-কুঙ্-এর প্রাসাদে দ্বারপাল মূর্ত্তিতে ডচ্ প্রতিকৃতি	৭৪৩
—কুঙ্-কুঙ্-এর বিচারালয়	৭৪২
—তোরণ-দ্বারে রাক্ষস দ্বারপাল মূর্ত্তি	৭৪২
—দ্বার-পার্শ্বে পদণ্ড ঘরের মেয়ে—মাতাও কন্যা	৭৪১
—পদণ্ডগণ কর্তৃক পূজানুষ্ঠান	৫৮৫
—পুত্রদ্বয় সহিত কারাঙ-আসেমের রাজা	৫৮২
—বেসাক্কিক্-এর পথের দৃশ্য	৭৪১
—বেসাক্কিক্ নৈবেদ্য-বেদি	৭৩৭
—বেসাক্কিক্-মন্দিরে উঠিবার সিঁড়ি	৭৩৬
—বেসাক্কিক্-এ আরণ্য-বিভাগের আপিস	৭৩৫
শ্রীধর্ম্মশীলা জায়সবাল	৯২১
নক্শা কাটা পাথর লাগানো ইটের দেওয়াল	৪১৮
নগর প্রবেশ (রঙীন) শ্রীকনু দেশাই	৬২৫
নারী সত্যাগ্রহ সমিতির নেত্রীগণ	৭১৪
নারীর সৃষ্টি—মাইকেল এঞ্জেলো	৯০৯
নীড়রাজি—শ্রীসোভাগমহল হোহ্লোট	১৫১
নৈবেদ্য শিরে মন্দিরাভিমুখিনী নারীগণের শোভাযাত্রা	১০৪
নো—ইশিকাওয়া তাতসুয়েমন শিগেমাসা কৃত কুমোতে মুখোস (১২৮০ খৃঃ অঃ)	৬০৫
নো—ফোজো মুখোস (১৩৭০ খৃঃ অঃ)	৬০৬
নো—হান্না মুখোস (১২৮০ খৃঃ অঃ)	৬০৬
"নো" নৃত্যের মুখোস—ডেমে ইয়োশিমিৎসু কৃত ওতোবিতে মুখোস (১৬১৬ খৃঃ অঃ)	৬০৫
পঞ্চম জর্জ্জ কর্তৃক লণ্ডন নৌ বৈঠক উন্মোচন	৩১০
পাঘমানে আমানুল্লার রাজপ্রাসাদ	২৮৫
পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান—শ্রীনন্দলাল বসু	১৫৬
পাহাড়ের গায়ে ধানের খেত	১০৩
প্যারীচাঁদ মিত্র, মর্ম্মর-মূর্ত্তি	৫১৯
পুণ্যিপুকুর (রঙীন) শ্রীপ্রভাত নিয়োগী	৫৩২
"পিয়েটা"	৯০৩
পুঙ্গব-পুত্রী	৮৮৬
পুরাতন লটারির টিকিট	২১৬
পুরী বা প্রাসাদ দ্বারে দণ্ডায়মান গিয়াঞ্জারের রেখণ্ট	৮৮১
পূজার উপচার (দ্বীপময় ভারত)	২৯১

চিত্র সূচী

বিষয় — পৃষ্ঠা

পূজা-নিরত পদণ্ড হাতে 'মুদ্রা' ক'রেছেন (দ্বীপময় ভারত) ... ২৭৩
পূজা-রত 'পদণ্ড' (দ্বীপময় ভারত) ... ২৬৯
শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বসাক ... ২৯৯
প্রজাদের এক জিরগায় নূতন আমীর নাদির শাহের প্রথম বক্তৃতা ... ২৮১
প্রফুল্লচন্দ্র রায় (আচার্য্য) ও ৭৷৷ পাউণ্ড ওজনের পেঁপে ... ২৭
প্রবন্ধকার, শ্রীযুক্ত ড্রেউএস্ প্রভৃতি (বলিদ্বীপ) ... ৪২০
(স্যার) প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৬৫
ফরিদপুর সরকারী কৃষিক্ষেত্রে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রায়সাহেব দেবেন্দ্রনাথ মিত্র এবং শিক্ষাধীন ভদ্র যুবকগণ ... ২৯
"ফলের বাগান" ... ৪৫৩
ফেরিওয়ালা যাত্রী—শ্রীনিশিকান্ত চৌধুরী ... ১৫৫
ফ্রেস্কো—রাফায়েল অঙ্কিত ... ৯১১
বঙ্গসাগরের ঝড়—ঝড়ের বায়ুচক্র ... ৪৮৫
—ঝড়ের বায়ুচক্র (উর্দ্ধ অধঃভাবে) ... ৪৮৬
—ঝড়ের বায়ুচক্র, ১৯১৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর ৮ ঘটিকার সময় ... ৪৮৭
—ঠাণ্ডাবায়ু এবং উষ্ণবায়ুর সংস্পর্শে ঝড়ের উৎপত্তি ... ৪৮৭
—বঙ্গসাগরের বিভিন্ন সময়ের ঝড়ের গতিপথ ... ৪৮৮
বধূ—রসেটী ... ৪৫৪
বন্দী অবস্থায় সপারিষদ বাচ্চা-ই-সাকাও ... ২৮৪
বলিদ্বীপ ... ১০১
বলিদ্বীপ—গ্রামের মেয়ে ... ৪১৬
বলিদ্বীপ—শোভাযাত্রা ... ৪১০
বলিদ্বীপীয় ছতরী ... ৪১৩
বলিদ্বীপে নৈবেদ্য-সাজানো ফল ও তালপাতার সাজ ... ২৬৬
বলিদ্বীপের অভিজাত বংশের কন্যা ... ৮৮০
বলিদ্বীপের স্নানাগার ... ৮৭৯
বলিদ্বীপের নর্ত্তক অভিনেতা ... ৪১৫
বলিদ্বীপের মন্দির তোরণ ... ৯৯
বল্লভভাই পটেল ... ১৬৭
বসন্তকুমারী দেবী ... ৫৯০
বাঙ্গালোরে মলমূত্রাদি হইতে সারপ্রস্তুত-প্রণালীর যন্ত্রাবলী ... ২৫
বাপুজী (রঙীন) শ্রীনন্দলাল বসু ... ৩২১
বাঁশী—শ্রীযামিনী রায় ... ১৫৩

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিনা সারে উৎপন্ন একপ্রকার শস্য ... ২৫
শ্রীবিমলপ্রতিভা দেবী ... ৭১৫
বিরাট মানমন্দিরের পরিকল্পনা—যুক্তরাজ্যের আরিজোনা ষ্টেটের অন্তর্গত গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের ধারে ... ৪৫১
বিষ্ণুমূর্ত্তি ... ৯২
বীণাপাণি (রঙীন) শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৭৭
বীর হনুমান—শ্রীরেণু রায় ... ১৫৩
বুদ্ধ পূজা—শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার ... ১৫৬
বুদ্ধমূর্ত্তি ... ৯৩
বুন্দেলা-কেশরী ছত্রসাল প্রাচীন চিত্র—(রঙীন) ... ৭৯৪
বেণু (রঙীন) শ্রীঅযোধ্যালাল ... ৮৫
বেয়াত্রিচে দেস্তে ... ৯০
বোধিসত্ত্ব—পাটনা জেলায় চণ্ডীমৌ গ্রামে আবিষ্কৃত ৯
বোম্বাইয়ে নেতাদের শাস্তি—এস্‌প্লানেড্ হাজত হইতে কয়েদীগাড়ী নেতৃগণকে বাইকুল্লা জেলে লইয়া চলিয়াছে ... ৭৬
বোম্বাইয়ে কারাদ্বারে ... ৭৬
বোম্বাইয়ে নেতৃগণকে কয়েদীগাড়ী হইতে নামান হইতেছে ... ৭৬
বোম্বাইয়ে বাইকুল্লা জেলের দ্বারদেশে ... ৭৬
ব্যঙ্গচিত্র ২৯৫, ৪৬১, ৭৩
ব্যাঙের ছাতা-চাষ করিবার প্রণালী ... ৮২
"ব্লেসেড ড্যামোজেল" রসেটী ... ৪১
ভার্জ্জিন মেরীর শৈশব ... ৪৫
মন্দির-দ্বার-বর্ত্তিনী নারীগণ (দ্বীপময় ভারত) ... ২৬
মন্দির দ্বারে (বলিদ্বীপ) ... ১০
মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীযুক্ত আব্বাস তায়েবজী ... ২৯
মহাত্মা গান্ধীর অভিযানের চিত্র—আমেদাবাদ হইতে মহাত্মা গান্ধীর যাত্রা ... ১৪
—উনআশীজন সত্যাগ্রহীসহ মহাত্মা গান্ধীর লবণ আইন ভঙ্গ করিতে যাত্রা ... ১৪
—খেড়া জেলার গ্রামবাসিগণ ... ১৪
—দরবার গোপাল দাস ... ১৪
—নর্ম্মদা পার হওয়া ... ১৪
—মহাত্মা গান্ধী বিশ্রাম করিতে যাইতেছেন ... ১৪
—মহাত্মাজী এক অস্পৃশ্য রমণীর দত্ত মালা গ্রহণ করিতেছেন ... ১৪
—মহাত্মাজীকে দেখিবার জন্য নাডিয়াতে বিরাট জনতা ... ১৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
—মহাত্মাজীর বঙ্গদীদ যাত্রা ...	১৪৬
—সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল গ্রেপ্তার হইবার পর সবরমতীর তীরে এক বিরাট সভায় মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা ...	১৪৪
—হাঁটুতে আঘাত পাইবার পর মহাত্মা গান্ধী দুইজন সঙ্গীর কাঁধে ভর দিয়া চলিয়াছেন ...	১৪৬
মহাত্মাজীর পর্ণকুটীর ...	২৯৭
মহেশচন্দ্র ঘোষ ...	৫২৫
মা শ্রীএইচ, এল, মেড় ...	১৫৭
মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের একটি দৃশ্য ...	৪৫২
মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের ১০০ শত ইঞ্চ ব্যাসের দূরবীণ ...	৪৫২
মা ও ছেলে—শ্রীসত্যরঞ্জন কর ...	১৫২
মা ও ছেলে—শ্রীসুধাংশু কর ...	১৫২
মাতা ও শিশু ...	৮৯
মাল্যদান (রঙীন) শ্রীসুখলতা রাও ...	৩১৮
মুহম্মদ শাহ (রঙীন) ...	২২৮
মৃগয়া—প্রাচীন চিত্র হইতে (রঙীন) ...	৪৪
মৃত্যু—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৫৩
শ্রীমোহিনী দেবী ...	৭১৫
শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ...	১৬৮
যবদ্বীপের আমন্ত্রণ (রঙীন)—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ...	৭৭৫
যানের বিবর্ত্তন—উনবিংশ শতাব্দীর "ষ্টেজ-কোচ" বা ঘোড়ার গাড়ী ...	১৪৮
—একটি বাষ্পচালিত গাড়ী (১৮৬২ সনে নির্ম্মিত) ...	১৪৮
—পশ্চিম আফ্রিকার পাল্কী ...	১৪৮
—"পাফিং বিলি" জর্জ্জ ষ্টিফেনসনের প্রথম ইঞ্জিন ...	১৪৮
—ভিক্টোরীয় যুগের "হাউস্ বোট"	১৪৮
—মোটরকারের প্রথম রূপ ...	১৪৯
যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা (রঙীন) শ্রীনন্দলাল বসু ...	৪৮১
যীশু ও মেরী ...	৯০৫
যীশুমাতা—করেড্জো ...	৯১২
যীশু, মেরী ও জোসেফ—মাইকেল এঞ্জেলো ...	৯০৮
যীশু—লিওনার্ডো ...	৯০৭
রণজিৎ সিংহ (রঙীন) ...	২৬০
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫০১
রাঢ়ে ইন্দ্রেশ্বরের মন্দিরের দ্বারদেশের উপরের প্রস্তরখণ্ড ...	৬৪৬
রাঢ়ে দাঁইহাটের বিষ্ণুমূর্ত্তি ...	৬৪৮
রাঢ়ে প্রাচীন ঘাট—দাঁইহাট ...	৬৪৮
রাঢ়ে বদর সাহেবের আস্তানা ...	৬৫৮
রাঢ়ে—শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর প্রস্তরমন্দির জগদানন্দপুর ...	৬৪৯
রাঢ়ে রামানন্দ-পূজিত সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের কালীর কাঠাম ...	৬৪৬
রাঢ়ে সমাজবাড়ী—দাঁইহাট ...	৬০৮
রাঢ়ে সাধক রামানন্দ রায়ের পঞ্চমুখী আসন ...	৬৪৭
রাঢ়ে সুন্দরলাল তেওয়ারীর সমাধিমন্দির-সংলগ্ন প্রস্তরলিপি ...	৬৪৭
রাঢ়ের কয়েকটি পল্লীভ্রমণ—রাজাডাঙ্গার প্রাচীন শিবমন্দির ...	৬৪৫
'রাণী' পাতিমা ...	৯৯
তারামূর্ত্তি—রামপালের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে উৎসর্গীকৃত ...	৯০
রেলের কামরার আর একধার—শ্রীইন্দু রক্ষিত ...	১৫৬
রেশমের কাজ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি ...	১৩৯
লটারির টাকায় নির্ম্মিত কলিকাতার টাউন হল ...	২১৫
লক্ষ্মী—শ্রীসুনয়নী দেবী ...	১৫৩
"লা গীরলাণ্ডাটা"—রসেটী ...	৪৫৫
শ্রীলালতুদাই রায় ...	৬৫১
শান্তাদেবী, শ্রীমতী ...	১৬৯
শ্রীশান্তি দাস ...	৯২১
শান্তিনিকেতনে "বর্ষামঙ্গল" বৃক্ষরোপণের শোভাযাত্রা আরম্ভ ...	৭৬২
শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণের শোভাযাত্রা গ্রন্থাগারের নিকটস্থ ...	৭৬৩
শান্তিনিকেতনে শাল-বীথিকায় বৃক্ষরোপণ শোভাযাত্রা ...	৭৬২
শান্তিনিকেতনে শোভাযাত্রা গ্রন্থাগারের সম্মুখে	৭৬৩
শান্তিনিকেতনে শ্রীভবনের সম্মুখে বৃক্ষরোপণ ...	৭৬৪
শিব—শ্রীসুনয়নী দেবী ...	১৫৫
শীর্ণ নারীমূর্ত্তি—নদীয়া জেলার বিক্রমপুর গ্রামে প্রাপ্ত ...	৯৫
শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রায় মৃতগণের আত্মার প্রতীক (দ্বীপময় ভারত) ...	২৬৭
শ্রাদ্ধ-মণ্ডপ (দ্বীপময় ভারত) ...	২৭০
শ্রাদ্ধমণ্ডপ—শোভাযাত্রার ছত্র ও অস্ত্রধারী অনুচরগণ (দ্বীপময় ভারত) ...	২৭১

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রাদ্ধমণ্ডপে উপচার ও নৈবেদ্য মস্তকে স্ত্রীগণের আগমন (দ্বীপময় ভারত)	২৭৫
শ্রীচৈতন্যের টোল—শ্রীনন্দলাল বসু	১৫৭
'শ্লট' যন্ত্রের ছাতা বিক্রয়	৪৫২
সত্যাগ্রহে বাঙ্গালী মহিলা—বাঁকুড়া জেলার বেতুড় গ্রামের কয়েকজন মহিলা সত্যাগ্রহ করিয়াছেন	১৪৩
সত্যাগ্রহের অন্যান্য চিত্র	২৯৮
সন্ন্যাসিনী—শ্রীসুনয়নী দেবী	১৫৩
সভানেত্রী—শ্রীযুক্তা কামিনী রায় ও মন্দিরের শিক্ষয়িত্রীগণ	১৩৮
সাইকেলে মহাত্মা গান্ধী	৩১৮
সাইমন কমিশন ও ভারতবর্ষ	৪৬০
সাঁওতালী নৃত্য—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	১৫৬
সাটিন ও সুতার কাজ—পুরীর মন্দির	১৪১
সার ও বিনা সারে উৎপন্ন বিলাতী বেগুন	২৮
সার ও বিনা সারে উৎপন্ন রাগী	২৬
সার প্রয়োগে উৎপন্ন শস্য	২৬
শ্রীমতী সুলাজিনী দেবী	১৪২
সুতা কাটায় নিরত শ্রীযুক্ত আব্বাস তায়েবজী	৩১৯
ষ্টান্জা দেলা সেনিয়াতুরার ফ্রেস্কোর একটি অংশ—রাফায়েল	৯১১
সোনার সিঁড়ি—বার্ণ জোন্স্	৪৫৬
সেণ্ট জন দি ব্যাপটিষ্ট—লিওনার্ডো	৯০৭
স্যার গালাহাড ও "হোলিগ্রেল"	৪৫৭
হরপার্ব্বতী—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার	১৫৭
হলায়ুধ (রঙীন) শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	১

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়	
গঙ্গাফড়িং (গল্প)	৬৪২
শ্রীঅনিলবরণ রায়	
অপেক্ষায় (কবিতা)	৩০
শ্রীঅনুরূপা দেবী	
সাবিত্রী ব্রত	৮০৭
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	
"বাঙ্গালার প্রথম"	১৩১
শ্রীঅরবিন্দ দত্ত	
কামিখ্যের ঠাকুর (গল্প)	৩৮৮
শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	
ভারতীয় প্রাচ্যকলা-পরিষদ ও বাঙ্গালীর শিল্প শিক্ষা	৫৬১
স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের কয়েকখানি পত্র	৩৭৯
শ্রীঅশোকবিজয় রাহা	
মেঘলা সকাল (কবিতা)	৭৩১
শ্রীআশীষ গুপ্ত	
অন্তরে বাহিরে (গল্প)	৭১৬
শ্রীআশুতোষ ঘোষ	
বৈজু বাওরা (আলোচনা)	১২৫
শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু	
বাদশাহী বিচার-পদ্ধতি ও দণ্ডনীতি	৬৬৭
শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	
ক্ষ্যাপার গান (কবিতা)	৮৪২
শ্রীকামিনী রায়	
কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দির (সচিত্র)	১৩৭
বিদায়ের অর্ঘ্য (কবিতা)	৫৭২
শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো	
মহারাণা রাজসিংহ	১৯০
মহারাজ ছত্রসাল বুন্দেলা	৭৯৩
শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	
ঢাকাই মসলিন (সচিত্র)	৫৪৭
ভারতীয় চিত্রকলা ও বঙ্গীয় পন্থা (সচিত্র)	১৫১
শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু	
মানুষের মন	৩৩৯
শ্রীগোপাললাল দে	
বঙ্গলক্ষ্মী (কবিতা)	৪৯৮
গোলাম মোর্ত্তজা	
"ঢাকায় ও নিকটস্থ গ্রামে উপদ্রব" (আলোচনা)	৭০০
শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়	
শব্দতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ	৮৯১
শ্রীজগৎ মিত্র	
কণ্টক (কবিতা)	৬৪৪
জসীম উদ্দীন	
মুসাফীর (কবিতা)	৫০৪

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩০শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৩৭

৪র্থ সংখ্যা

নাদির শাহের অভ্যুদয়

স্যর যদুনাথ সরকার

দেশের দুর্দ্দশার দিন

পারস্য দেশ প্রাচীনকালে পশ্চিম এসিয়াখণ্ডে সভ্যতার কেন্দ্র ছিল,—যেমন দক্ষিণ-এসিয়ায় আমাদের ভারতবর্ষ, তেমনি। এই দুই দেশেই আর্য্যজাতির বাস; দুই দেশের মধ্যেই তখন ভাষা ও ধর্ম্মের অনেক সাদৃশ্য ছিল। পরে মুসলমান বিজয়ের ফলে পারস্য দেশ ভারত হইতে বড় বিভিন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে যখন ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর আসিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া দেশে শান্তি সুখ ধন আনয়ন করিলেন, ভারত আবার সভ্যতার কেন্দ্র হইল,—ঠিক তখনই পারস্য দেশ সফবী রাজবংশ স্থাপনের ফলে জাগিয়া উঠিল, ধনে বলে সভ্যতায় আবার এসিয়ার প্রদীপ হইয়া দাঁড়াইল।

আবার এদিকে যেমন আওরংজীবের সঙ্গে সঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরব-রবি দ্রুত অস্তগামী হইল, তেমনি ঐ সম্রাটের জীবনকালে পারস্য দেশেও রাজশক্তির অবনতি এবং দেশের অধঃপতন স্পষ্ট দেখা দিল। পারস্যের নবীন শাহরা আর যুদ্ধ শিখেন না, বাল্যকাল অবধি অন্তঃপুরে স্ত্রীলোক ও খোজার মধ্যে প্রতিপালিত হন এবং সিংহাসন লাভ করিবার পর রাজ্যভার উজীরের হাতে সঁপিয়া দিয়া নিজে ইন্দ্রিয়-সুখ ও সুরাপানে অকালমৃত্যু ডাকিয়া আনেন। এই সফবী বংশের শেষ রাজা, শাহ সুলতান হুসেন (রাজ্যকাল ১৬৯৪-১৭২২ খৃষ্টাব্দ) নেশা করিতেন না বটে, কিন্তু মুল্লা ও খোজাদের হাতে সমস্ত শাসনকার্য্য ছাড়িয়া দিয়া নিজে মালাজপ করিতেন এবং হারেমে অসংখ্য রমণী লইয়া সময় কাটাইতেন। মুল্লাদের পরামর্শে তিনি দেশ হইতে সমস্ত দার্শনিক, সুফী এবং শিয়া ভিন্ন অপর সব সম্প্রদায়ের মুসলমানকে নির্যাতন করিয়া তাড়াইতে লাগিলেন। ইহাতে দেশে জ্ঞান-চর্চ্চা বিদ্যাবুদ্ধি লোপ পাইল। সৈন্যগণ এবং প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশগুলি রাগে অপমানে এহেন রাজাকে পরিত্যাগ করিল। অবশেষে শাসন-কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ও অবহেলার অনিবার্য্য ফল ফলিল। সীমান্ত প্রদেশগুলি স্বাধীন হইতে আরম্ভ করিল। উত্তর-পূর্ব্ব কোণে হিরাট জেলায় আবদালি জাতি এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে কান্দাহার প্রদেশে ঘিলজাই জাতি পারসিক সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া পারসিক শাসনকর্ত্তাকে তাড়াইয়া দিয়া বা মারিয়া ফেলিয়া দেশ দখল করিল,

স্বজাতির প্রভুত্ব স্থাপন করিল। ইহারা আফঘান এবং স্থন্নী, স্থতরাং শিয়া পারসিকদের মহাশত্রু।

তাহার পর ঘিলজাই রাজা মাহমুদ গিয়া পারস্য দেশ আক্রমণ করিলেন। রাজধানী ইস্‌ফাহানের নিকট দুই পক্ষে যুদ্ধ হইল। পারসিক সৈন্য পঞ্চাশ হাজার, সঙ্গে চব্বিশটি বড় কামান। আফঘানেরা সংখ্যায় মাত্র বিশ হাজার আর সঙ্গে উটের পিঠে চাপান এক শত জম্বুরক বা লম্বা বড় বন্দুকবিশেষ; অথচ পারসিকেরা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। শাহ ইস্‌ফাহানে অবরুদ্ধ হইয়া অন্নাভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন (২১ অক্টোবর, ১৭২২), পারস্য দেশে আফঘানরা রাজত্ব আরম্ভ করিল এবং সাত বৎসর ধরিয়া দেশ উৎসন্ন করিল। এই সাত বৎসরে দশলক্ষ প্রজার প্রাণ গেল, সুন্দর সুন্দর প্রদেশগুলি মরুভূমিতে পরিণত হইল, আর কত মহামূল্য অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইল।

কিন্তু ইতিমধ্যে ভীরু অকর্ম্মণ্য হৃতরাজ্য শাহ হুসেনের পুত্র মির্জা তহমাস্প সুদূর উত্তরে মাজেন্দ্রান্‌ প্রদেশে পলাইয়া গিয়া সেখানে নিজকে রাজা ঘোষণা করিয়া দেশ দখলের চেষ্টায় ছিলেন। পারস্যের বিপদ দেখিয়া পুরাতন শত্রু রুষ এবং তুর্কী উত্তরে ও পশ্চিমে নানা স্থান জয় করিয়া ফেলিল। তহমাস্প যুবক, বুদ্ধি বা চরিত্রের বল নাই, তাহার উপর ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন। দেশের চারিদিকে এই বিপদের দিনে জাতীয় উদ্ধার-কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইবার নহে। এবার পারস্য চিরদিনের জন্য ধ্বংস্‌ হয় হয়।

জাতীয় ত্রাণকর্ত্তা নাদির

এমন সময় পারস্যের সৌভাগ্যে উদ্ধারের এক অভাবনীয় পথ খুলিয়া গেল, জাতীয় দলে এক অপূর্ব্ব শক্তিমান পুরুষসিংহ দেখা দিলেন। তিনিই পরে নাদির শাহ নামে বিখ্যাত হন।

খুরাসান প্রদেশে একটি সামান্য গ্রামে আফশার নামক তুর্কমান জাতির দলভুক্ত কির্কলু বংশে এক গরিব মেষ-পালক ও চামড়ার জামাটুপী প্রস্তুতকারী দর্জির ঘরে নাদিরের জন্ম (১৬৮৮)। তাঁহার বয়স যখন আঠার সেই সময় একদল উজবেগ দস্যু আসিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার মাতাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাতার দেশে দাস করিয়া রাখে। সেখানে মাতার মৃত্যু হইল, কিন্তু নাদির চারি বৎসর পরে পলাইয়া আসিয়া, খুরাসান প্রদেশের একটি ছোট জেলার প্রধান শহর অবিভার্দ নগরে শাসনকর্ত্তার অধীনে চাকরি লইলেন এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পদ পাইলেন।

নাদিরের ঈশ্বর-দত্ত প্রতিভা যুদ্ধে ও লোকশাসনে প্রকাশ পাইল। খুরাসানের পাঠান-রাজার সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় তিনি দস্যুদল জুটাইয়া দেশ লুঠ ও জয় করিয়া নিজ বল বাড়াইলেন, এবং ক্রমে কিলাৎ-ই-নাদিরি দুর্গ এবং খুরাসানের রাজধানী নীশাপুর নগর দখল করিলেন, এবং তাহার পরেই স্বদেশের রাজা মির্জা তহমাস্পের সঙ্গে যোগ দিয়া (১৭২৭) দেশ উদ্ধারের কেন্দ্র ও নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন। দুই বৎসরের মধ্যে নাদির যুদ্ধের পর যুদ্ধে আফঘানদের হারাইয়া পারস্য দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন এবং এরূপ কঠোরভাবে পশ্চাদ্ধাবন করিলেন যে, কান্দাহারে যাইবার সমস্ত পথ হত আফঘান স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধের মৃতদেহে ভরিয়া গেল। একজন ঘিলজাইও প্রাণ লইয়া দেশে ফিরিতে পারিল না। পারস্যে তাহারা যে সাত বৎসর ধরিয়া অত্যাচার করিয়াছিল তাহার পূর্ণ প্রতিশোধ হইল, আবার পারসিকেরা মাথা তুলিতে পারিল, নাদির স্বদেশবাসীর আহ্লাদের ও গর্ব্বের বস্তু হইলেন।

কৃতজ্ঞ রাজা শাহ তহমাস্প অর্দ্ধেক পারস্য দেশ নাদিরের হাতে দিয়া তাঁহাকে সুলতান উপাধি এবং নিজ নামে টাকা বাহির করিবার অধিকার দান করিলেন। আফঘানরা বিতাড়িত হইল বটে, কিন্তু এখনও তুর্ক হইতে পারস্যের পশ্চিম প্রদেশগুলি উদ্ধার করিতে বাকী। নাদির সেই কার্য্য আরম্ভ করিলেন এবং তুর্কী সৈন্যদলকে কয়েকবার যুদ্ধে হারাইয়া দিলেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ পূর্ব্বপ্রান্তে হিরাট অধিকার করিতে যাওয়ায় তাঁহার অনুপস্থিতিতে শাহ তহমাস্প তুর্কী-সৈন্য আক্রমণ করিতে গিয়া বুদ্ধি ও বীরত্বের অভাবে পরাস্ত হইয়া নাদিরের উদ্ধার-করা সমস্ত পশ্চিম প্রদেশগুলি হারাইলেন। দেশের লোক তাঁহাকে ধিক্কার দিতে লাগিল, পারসিক সেনানায়কেরা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন যে, তহমাস্পকে দেশের নেতা করিয়া

রাখিলে আবার জাতীয় পরাধীনতা ও দুর্দ্দশা ফিরিয়া আসিবে। তাঁহারা নাদিরকে রাজা করিতে চাহিলেন। কিন্তু নাদির সম্মত হইলেন না। ২৬ আগষ্ট, ১৭৩২ তহমাস্পকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার আট মাসের শিশু-পুত্র আব্বাসকে শাহ বলিয়া ঘোষণা করা হইল, নাদির হইলেন তাহার অভিভাবক ও প্রতিনিধি, অর্থাৎ দেশের প্রকৃত শাসক। চারি বৎসর পরে বালক-রাজা মারা যাওয়ায় নাদির প্রকাশ্যভাবে সিংহাসনে বসিলেন (২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৭৩৬); তাঁহার উপাধি হইল শাহান্-শাহ নাদির শাহ; পূর্ব্ব উপাধি ছিল তহমাস্প কুলী খাঁ।

নাদিরের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী, একদিকে রাজনীতির চাল চালিতে সন্ধি ও ভেদের বন্দোবস্ত করিতে তিনি যেমন দক্ষ, তেমনি অপরদিকে যুদ্ধবিদ্যায় সে যুগে কেন, সমগ্র ইতিহাসে এসিয়াখণ্ডে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। ঠিক কোন্‌দিকে সৈন্য চালনা করা দরকার, কখন যুদ্ধ করিতে হইবে এবং কখন হটিয়া আসা বা অপেক্ষা করা উচিত, কামানের ব্যবহার ও উন্নতি এবং ঠিক পরিমানে বন্দুকচী ও অশ্বারোহী সৈন্য সমাবেশ করা, ইউরোপীয় (ফরাসী) গোলন্দাজদিগকে নিযুক্ত করা অথচ তাহাদের নিজ আজ্ঞায় চালনা করা, স্বয়ং সেনাদলের সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধে নেতৃত্ব করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রতিপত্তি ও খ্যাতির বলে তাহাদের পূজ্য দেবতা হওয়া—এ সব গুণই তাঁহার ছিল। এজন্য পারস্য দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজ ইতিহাস-লেখক (তিনি নিজে ব্রিগেডিয়ার জেনারল) নাদিরকে "এসিয়ার নেপোলিয়ন" বলিয়াছেন।

রাজা হইয়াই নাদিরের প্রথম কাজ হইল পারস্যের হৃত প্রদেশগুলি উদ্ধার করা। তুর্কদের হারাইয়া দিয়া তাহাদের হাত হইতে আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া কাড়িয়া লইলেন; রুষের সঙ্গে সন্ধিবিগ্রহের ফলে কাস্পিয়ান হ্রদের তীরের প্রদেশগুলি ফিরাইয়া পাইলেন; আরবদের হাত হইতে পারস্য-উপসাগরের দ্বীপগুলি পুনরুদ্ধার করিলেন। দেশস্থ দস্যুজাতিগুলিকে খুব হারাইবার পর নিজ সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিয়া নেতার শাসনে রাখিয়া তাহাদের অত্যাচারের পথ বন্ধ করিলেন। অবশেষে ১৭৩৭ সালে একমাত্র অবশিষ্ট প্রদেশ, কান্দাহার জয় করিতে নাদির রওনা হইলেন। সেখানে আফঘান শাসন বজায় থাকিলে পারস্যের ভবিষ্যৎ বিপদের কারণ রহিবে। আর, ভারতের অগণিত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে হইলে কান্দাহারের পথ দিয়াই যাইতে হইবে। এক বৎসর অবরোধের পর, ১২ মার্চ্চ ১৭৩৮ কান্দাহার দুর্গ তাঁহার হাতে আসিল। তিনি উহা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া উহার দুই মাইল পূর্ব্বদিকে ময়দানের মধ্যে এক নূতন কান্দাহার স্থাপন করিলেন এবং তাহা প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া দিলেন। ইহার নাম হইল "নাদির-আবাদ"।

অতুলনীয় যোদ্ধা নাদির শাহ রাজনীতিতেও অতি গভীর বুদ্ধিশালী ও দক্ষ ছিলেন। কান্দাহার আফঘানদের দেশ, সুতরাং উহা জয় করিবার পর পরাজিত আফঘান শাখাদিগকে কোনরূপ শাস্তি দিলেন না, লুণ্ঠন করিলেন না, সমস্ত বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিয়া, তাহাদের প্রধানদিগের বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া, নানাপ্রকারে দয়া ও সৌজন্য দেখাইয়া, তাহাদের যোদ্ধাদিগকে নিজ-সৈন্যদলে চাকরি দিয়া, এই সমস্ত আজন্মযোদ্ধার জাতিকে বশ করিয়া ফেলিলেন, নিজের ভবিষ্যৎ দেশবিজয়ের ভৃত্য করিলেন। অথচ পাঠানদের সংযত রাখিবার জন্য আবদালী বংশকে তাহাদের আদিবাসস্থান খুরাসান হইতে আনিয়া কান্দাহার প্রদেশের রক্ষার ভার দিলেন এবং কান্দাহারের আদিম ঘিলজাইদের উঠাইয়া লইয়া খুরাসানে বসতি করাইলেন। এই দুই শাখা আফঘান হইলেও পরস্পর চির-বিরোধী।

নাদির নিজে পারস্যদেশীয় হইলেও জাতিতে পারসিক অর্থাৎ আর্য্য নহেন, তিনি তুর্কমান্। আসল পারসিকেরা খুব বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পকলায় লেখনী চালনে জগদ্বিখ্যাত, কিন্তু যুদ্ধে প্রায়ই দুর্ব্বল এবং ভীরু। পারস্যরাজের প্রধান সম্বল কিজিল্‌বাশ্ ('লালমাথা' অর্থাৎ লালটুপী পরা) সৈন্য; ইহারা তুর্কস্থান হইতে পারস্যে আনিয়া স্থাপিত করা সাতটি তুর্কী শাখার বংশধর, অদম্য বীর। কিন্তু ধর্ম্মে শিয়া হওয়ায় সফবী রাজগণের এবং পরে নাদিরের, অতি ভক্ত অনুচর হয়।

ইহার পর নাদিরের ভারতবিজয়। সে এক অতি রোমাঞ্চকর, কিন্তু শিক্ষাপ্রদ কাহিনী।

বঙ্গসাগরের ঝড় ও তাহার প্রকৃতি

শ্রীসুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি-এস্‌সি

বাংলা দেশে প্রতি বৎসর ঝড়ে এবং জলপ্লাবনে কিরূপ অনিষ্ট হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। কি প্রকারে এই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা প্রতিবৎসর ঘটে সে সম্বন্ধে এদেশের অনেকেরই প্রকৃত ধারণা নাই। সচরাচর জনসাধারণ এইগুলিকে ভগবানের অভিসম্পাত বলিয়া মনে করে।

বাংলা দেশে দুই প্রকারের ঝড় সমূহ ক্ষতি করে। চৈত্র বৈশাখ মাসে কোনো কোনো দিন হঠাৎ অপরাহ্নকালে উত্তর-পশ্চিম কোণে ক্ষুদ্র একখানি কাল মেঘ উদিত হইয়া অচিরে কিরূপ ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতের সহিত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং মুষলধারে বৃষ্টি ও মুহুর্মুহু অশনিসম্পাতে মনে ভীতি জাগাইয়া তোলে, তাহা বাংলা দেশের কাহারও অবিদিত নাই। এই ঝড়গুলিকেই আমরা কালবৈশাখী বলি। এগুলি বাংলা দেশেই উৎপন্ন হয়। যতই ভীতিপ্রদ হউক ইহাদের অনিষ্টকারী ক্ষমতা অনেকটা সীমাবদ্ধ এবং ইহারা কখনও জলপ্লাবন ঘটায় না। দ্বিতীয় প্রকার ঝড়ের উৎপত্তিস্থান বঙ্গসাগর। প্রতিবৎসর বর্ষাকালে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাসে বঙ্গসাগরের উত্তর-সীমায় বাংলা দেশের ঠিক দক্ষিণে এমন অনেক দিন আসে যখন বায়ু চক্রাকারে বহিতে থাকে এবং ভীষণ ঝড়ের সৃষ্টি করে। বাংলা দেশে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত প্রায় নিত্যকার ঘটনা; কিন্তু যখন এই ঝড়গুলির সৃষ্টি হইতে থাকে তখন এই বৃষ্টিপাত কমিয়া যায়। এই ঝড় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হইয়া পূর্ণাকৃতি প্রাপ্ত হওয়া মাত্র সচরাচর পশ্চিম অভিমুখে ধাবিত হয় এবং সর্ব্বপ্রথমে উড়িষ্যা দেশে প্রবেশ করিয়া প্রচুর বারি বর্ষণ করে। এই প্রকার ঝড়ের আবর্ত্ত প্রায় তিনচার শত বর্গমাইল কিংবা তাহারও অধিক। সুতরাং পশ্চিম অভিমুখে গতি হইলেও ইহাদের প্রকোপ বাংলা দেশেও কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হয়। মধ্যভারতের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে ইহাদের গতি কখনও কখনও বাঁকিয়া যায়। এইরূপে যুক্ত-প্রদেশের কিংবা পঞ্চনদের উত্তর-সীমায় উপস্থিত হয় এবং হিমালয়ে বাধা পাইয়া ধ্বংস হইয়া যায়। আবার কখনও সোজা পশ্চিমদিকে যাইয়া সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টিপাত করে। বঙ্গসাগরের উত্তর-সীমার এই ঝড়গুলি কখনও কখনও পশ্চিম অভিমুখে না যাইয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করে এবং বঙ্গের উত্তর-সীমার পর্ব্বতমালায় বাধা পাইয়া বিলীন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবল বায়ু ও জলধারায় বাংলা দেশ ভাসাইয়া দেয়। বর্ষাকালের এই ঝড়গুলি অপেক্ষাও ভীষণতর ঝড় বর্ষার পূর্ব্বে ও পরে বঙ্গসাগরে উৎপন্ন হইয়া কখনও কখনও বঙ্গদেশকে আক্রমণ করে। ১৯১৯ সালের আশ্বিন মাসে এইরূপ একটি ঝড় পূর্ব্ববঙ্গে প্রবেশ করিয়া বহু লোকের প্রাণনাশ এবং বহু লোককে আশ্রয়হীন করিয়াছিল। বর্ষাকালের ঝড়ের আবর্ত্তে হাওয়ার গতি সাধারণতঃ ঘণ্টায় ৪০।৫০ মাইলের অধিক হয় না। কিন্তু বর্ষার পূর্ব্বে ও পরে যে ভীষণ ঝড়গুলি বঙ্গসাগরে উৎপন্ন হয় তাহাদের ঘূর্ণাবর্ত্তে হাওয়ার গতি ঘণ্টায় ১০০ মাইলেরও অধিক হয়। এই ভীষণ গতি কেন্দ্রস্থলের নিকটে দ্রুত কমিয়া গিয়া প্রায় কিছুই থাকে না। এই ঝড়ের আবর্ত্তের ক্ষেত্র বর্ষার ঝড়ের অপেক্ষা আয়তনে ছোট। পূর্ব্ববঙ্গের অনেকেই ১৯১৯ সালের ঝড়ের সময় লক্ষ্য করিয়াছেন যে ঝড়ের বহির্ভাগের মৃদুমন্দ বাতাস ঝড়ের উত্তরাভিমুখে অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে অতি দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ভীষণ বেগে পূর্ব্ব দিক হইতে বহিতে থাকে, এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই গতির বেগ কমিয়া গিয়া কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হইলে প্রায় কিছুই থাকে না। তখন আকাশ রক্তবর্ণ হয় এবং একটা শান্তগম্ভীর ভাব ধারণ করে। কেন্দ্রস্থল পার হইয়া গেলে হাওয়া বিপরীত দিক হইতে

বহিতে থাকে এবং ইহার গতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ব্বের মত ভীষণ হইয়া উঠে এবং ঝড় পার হইয়া গেলে অল্পে অল্পে কমিয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের কেহ কেহ ঝড়ের এইরূপ দুইবার হাওয়ার বৃদ্ধি এবং বিপরীতাভিমুখে বহিবার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রকারের ঝড়ের আবর্ত্তে ঘটিকা-যন্ত্রের কাঁটার বিপরীত দিকে হাওয়া বহিতে থাকে এবং কেন্দ্রস্থলে হাওয়ার বেগ কিছুই থাকে না, ইহা স্মরণ রাখিলে উপরিউক্ত পর্য্যবেক্ষণের কারণ সহজেই অনুভূত হইবে।

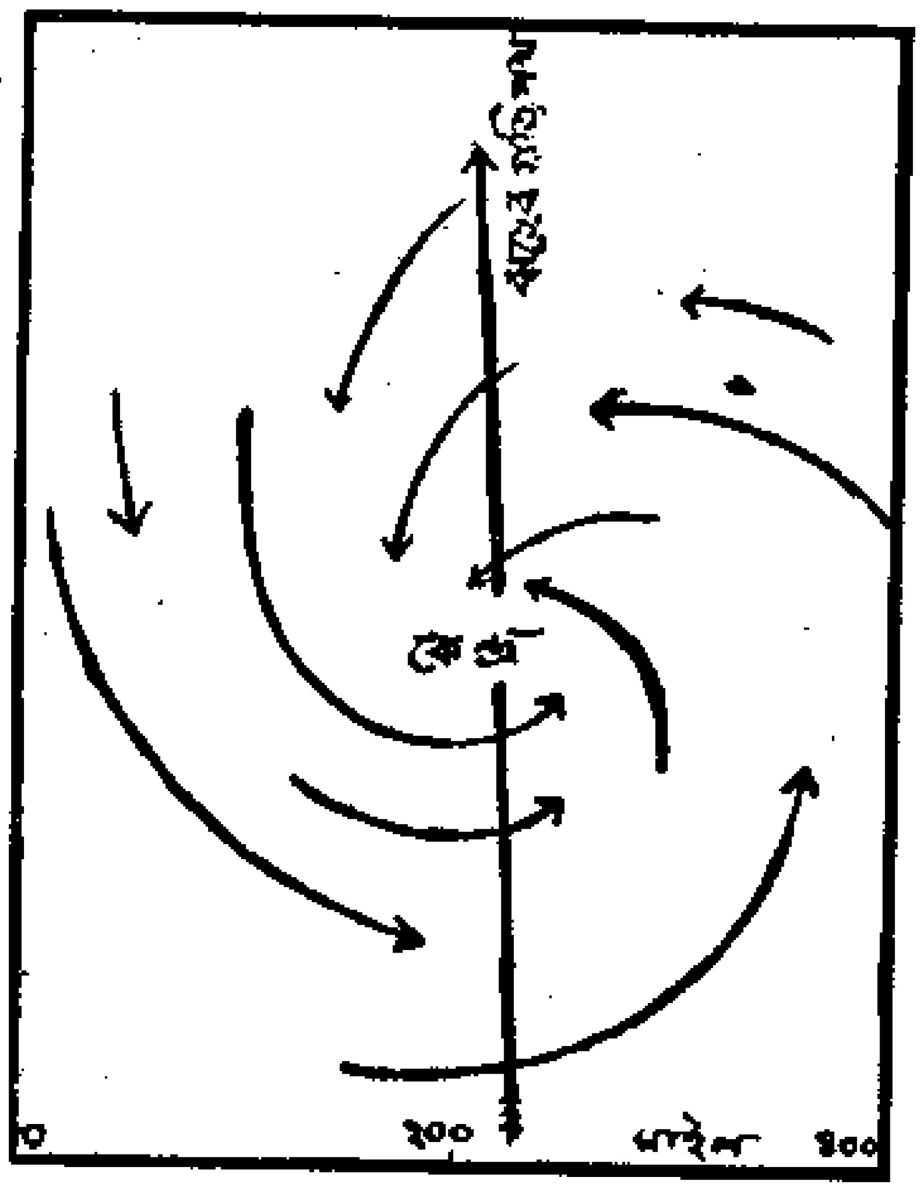

ঝড়ের বায়ুচক্র
(ক্ষিতিজ তলের সহিত সমান্তরালভাবে)

ঝড়গুলির উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে সত্য, কিন্তু ঝড় উপস্থিত হইলে হাওয়া কেন ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে চক্রাকারে বহিতে থাকে তাহার কারণ বৈজ্ঞানিকগণ অনেকদিন পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বর্ষার পূর্ব্বের এবং পরের ঝড়গুলি উৎপন্ন হইবার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত বঙ্গসাগরে প্রকৃতি কেমন একটা শান্তগম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। আকাশ নির্ম্মল, কোথাও যেন মেঘের চিহ্নমাত্র নাই। এইরূপ অবস্থায় প্রখর সূর্য্যের উত্তাপে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইয়া উষ্ণ হাওয়ার সঙ্গে মিশিতে থাকে। হাওয়া উষ্ণ হইলে হাল্কা হইয়া যায়। এইজন্য সমুদ্রের উপরের জলীয় বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ হাওয়া ঊর্দ্ধমুখী গতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং উপরে উত্থিত উষ্ণ হাওয়ার পরিত্যক্ত স্থান পূর্ণ করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটিয়া আসে। এই প্রক্রিয়ার ফলে সমুদ্রের উপরে কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাওয়ার ঊর্দ্ধমুখী গতি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং সেই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে উত্তরোত্তর বেগবৃদ্ধির সহিত ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবহমান হয়। পৃথিবীর আহ্নিকগতির ফলে উহার উপরিতলস্থ হাওয়ায় প্রতিমুহূর্ত্তে ঘর্ষণ লাগিতেছে। এইরূপ ঘর্ষণের ফলে উপরিউক্ত কেন্দ্রমুখী প্রবাহী হাওয়ামণ্ডলী চক্রাকারে গতিপ্রাপ্ত হয়। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতেছে বলিয়া জ্যামিতির সূত্র অনুসারে বিষুবরেখার উত্তর দিকে এইরূপ চক্রাকারের হাওয়ার গতি ঘটিকা-যন্ত্রের কাঁটার বিপরীতমুখী হইবে, এবং বিষুবরেখার দক্ষিণ দিকে উহা ঘটিকা-যন্ত্রের কাঁটার অভিমুখী হইবে। এইজন্যই বঙ্গসাগরের ঝড়গুলির হাওয়া ঘটিকা-যন্ত্রের বিপরীত দিকে বহিতে থাকে।

উষ্ণ হাওয়ার ঊর্দ্ধে উঠিবার শক্তি পারিপার্শ্বিক হাওয়ার সহিত উহার তাপের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। এই তারতম্য যত অধিক হয় হাওয়াও তত অধিক ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে। পরীক্ষার দ্বারা জানিতে পারা যায়, উষ্ণ হাওয়া যত উপরে উঠে তত ঠাণ্ডা হইতে থাকে। তিন শত ফিট উপরে উঠিলে তাপের মাত্রা প্রায় এক ডিগ্রি কমিয়া যায়। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ঝড়ের কেন্দ্রস্থলের উষ্ণ হাওয়া কিছুদূর উঠিয়া যখন সেই স্তরের হাওয়ার তাপের সহিত সমতা প্রাপ্ত হয় তখন আর উহার ঊর্দ্ধে উঠিবার ক্ষমতা থাকে না। জলীয় বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ বায়ু যখন ঊর্দ্ধে উঠিয়া উহার তাপ হারাইয়া ফেলে তখন বাষ্পগুলি জমিয়া মেঘের আকারে দেখা দেয়। তাপ-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে জলীয় বাষ্প জলকণাপূর্ণ মেঘে পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরিক তাপ (latent heat) নির্গম করিতে থাকে। এই আভ্যন্তরিক তাপের ব্যাপারটি বুঝিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাষ্পে পরিণত করিতে হইলে জলে যেমন অনেক তাপ প্রয়োগ করিতে হয়

সেইরূপ বাষ্প যখন পুনরায় জলে পরিণত হয় তখন এই তাপ বাহির করিয়া দেয়। এইরূপ তাপ নির্গমের ফলে যে বায়ু ঊর্দ্ধে উঠিয়া ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল তাহা পুনরায় উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং আরও অধিক ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে বায়ু ঠাণ্ডা হইয়া আরও অধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প মেঘে পরিণত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাপনির্গমের ফলে অধিকতর ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। যখন এইরূপে প্রায় অধিকাংশ জলীয় বাষ্প মেঘে পরিণত হইয়া যায় এবং ঊর্দ্ধে উত্থিত বায়ু তাপ হারাইয়া পারিপার্শ্বিক বায়ুর তাপের সহিত সমতা প্রাপ্ত হয়, তখন আর উহার ঊর্দ্ধে উঠিবার ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু সেই অবস্থায় উহার স্থির থাকিবারও উপায় নাই, কারণ নীচ হইতে উষ্ণ হাওয়া স্থান-ত্যাগের জন্য ক্রমাগত ধাক্কা দিতেছে। এইরূপ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত মেঘপূর্ণ হাওয়া ক্ষিতিজ রেখার সহিত সমান্তরালভাবে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং দিঙ্মণ্ডল ঘন মেঘে আবৃত করিয়া মুষলধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ করে। বৃষ্টিপাতের দরুণ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত এই উপরের ঠাণ্ডা হাওয়াতে আর জলকণা থাকে না এবং উহা বহুদূরে যাইয়া ধীরে ধীরে নিম্নে অবতরণ করিতে থাকে; কারণ হাওয়া ঠাণ্ডা হইলে একটু ভারী হয়। পরে ধীরে ধীরে পূর্ব্বোক্ত ঝড়ের কেন্দ্রমুখী প্রবাহিত হাওয়ার সঙ্গে পুনরায় একীভূত হইয়া যায়।

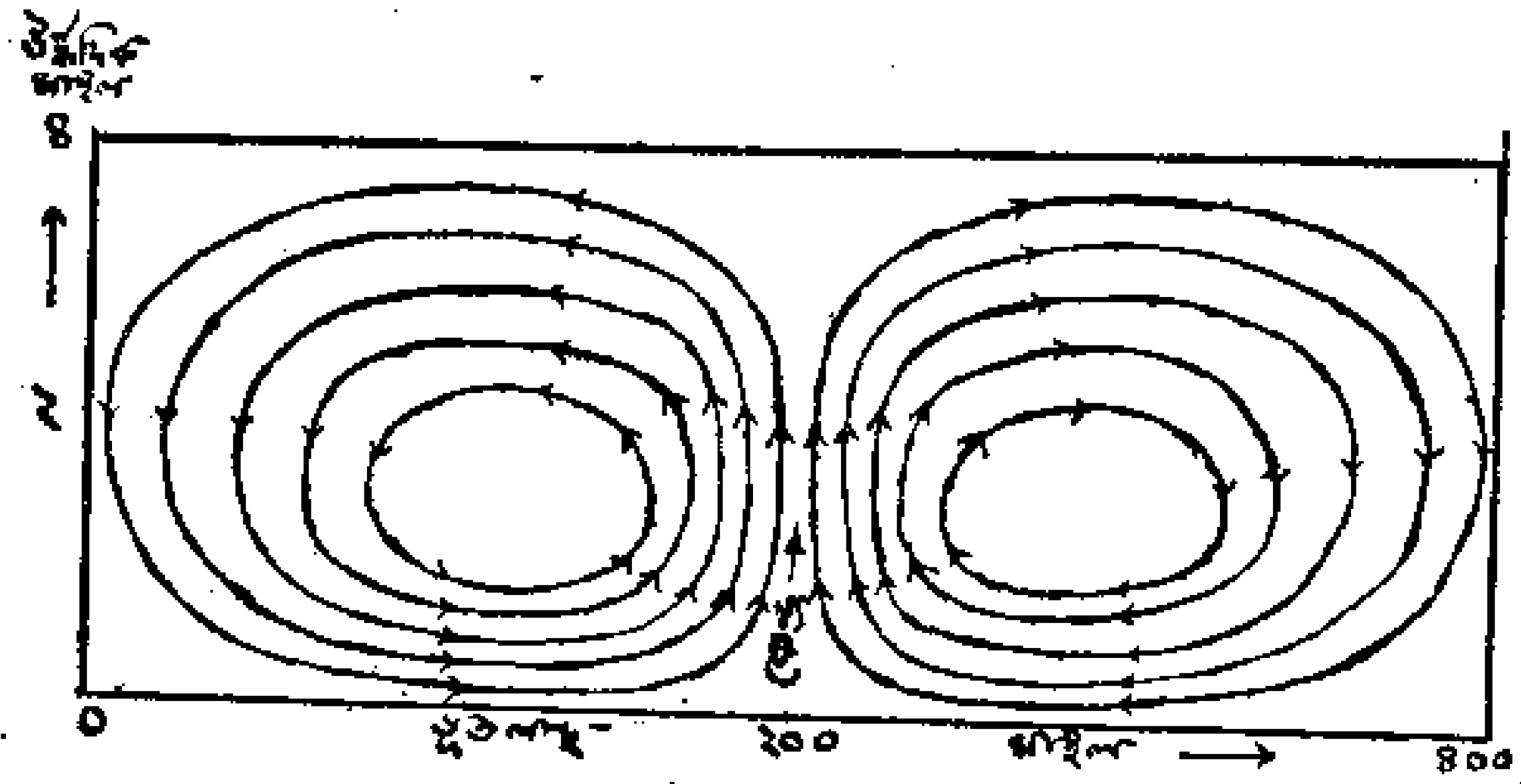

ঝড়ের বায়ুচক্র (ঊর্দ্ধ অধঃ ভাবে)

সমুদ্রের উপর দিয়া গমনের সময় এই হাওয়া সমুদ্রের জল হইতে পুনরায় বাষ্প গ্রহণ করিতে থাকে। সুতরাং যখন ঝড়ের কেন্দ্রস্থানে উপস্থিত হয় তখন উহা প্রায় পূর্ব্বের ন্যায়ই বাষ্পপূর্ণ থাকে এবং পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে মেঘের সঞ্চার করিতে থাকে। এইরূপ বাষ্প হইতে মেঘ, এবং হাওয়ার গতির ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে চক্রাকারে পরিবর্ত্তন অহর্নিশ ঘটিতে থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পৃথিবীর দৈনন্দিন ঘূর্ণনের জন্য ঝড়ের কেন্দ্রমুখী প্রবাহিত বায়ুর ঘটিকা-যন্ত্রের কাঁটার বিপরীতাভিমুখে চক্রাকারে গতি উৎপন্ন হয়। এখন আবার আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ঊর্দ্ধে উত্থিত বায়ুরও এইরূপ একটা চক্রাকার গতি আছে। এই উভয় প্রকারের গতি মিলিয়া ঝড়কে একটা নিজস্ব সত্তা দান করে, এবং উহা দুই তিন শত বর্গমাইলব্যাপী বায়ু নিজ দেহের ভিতরে গ্রহণ করে। একটু কল্পনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, ঝড়ের এই বিশাল নিজস্ব দেহ আরও একটা বিশালতর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে নিহিত আছে। এই বিশালতর বায়ুমণ্ডলেরও একটা নির্দ্দিষ্ট গতি আছে; এই গতির দিক যেদিকে উহার অভ্যন্তরস্থ ঝড়ও সেইদিকে চলিতে থাকে। সাধারণতঃ এই গতির মাত্রা ঘণ্টায় দশ হইতে বিশ মাইল হইয়া থাকে। বিশালতর বায়ুর গতির দিক যদি উত্তরাভিমুখী হয় তাহা হইলে ঝড়ও ঐরূপ গতিতে উত্তরাভিমুখে চলিতে থাকে।

দক্ষিণ-পশ্চিম মনসুন যখন ভারত-সাগরের উপর দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে তখন বঙ্গসাগরের উপরস্থ হাওয়ার গতি সাধারণতঃ উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত এই সময়ের বঙ্গসাগরে উৎপন্ন ঝড়গুলি আরাকান-তীরের উপর দিয়া ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে। চলিতে চলিতে কখনও দিক পরিবর্ত্তিত হইয়া বঙ্গদেশেও প্রবেশ করে।

বর্ষার পরে উত্তর-পূর্ব্ব মনসুন ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকে। এইজন্য এই সময়ের ঝড়ের দিক সাধারণতঃ পশ্চিমাভিমুখী হয়, এবং ইহারা করোমণ্ডল তীরের উপর দিয়া মান্দ্রাজে প্রবেশ করে। কখনও কখনও দাক্ষিণাত্য পার হইয়া এই ঝড়গুলি আরব-সাগরে আসিয়া পৌছায়, এবং পুনরায় সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্প গ্রহণের সুযোগ পাইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। ইহারা চলিতে চলিতে কখনও আফ্রিকায়, কখনও আরবে আসিয়া পৌছায় এবং মরুভূমির উপরে জলীয় বাষ্প না

পাইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। বঙ্গসাগরের উপরে বর্ষার পরের হাওয়ার গতি সাধারণতঃ পশ্চিম অভিমুখী হইলেও এবং উহার অভ্যন্তরস্থ ঝড় প্রথমে পশ্চিম অভিমুখে চলিতে থাকিলেও, কখনও কখনও দিক পরিবর্ত্তিত হইয়া ঐ ঝড় উত্তরাভিমুখে চলিতে থাকে এবং বঙ্গদেশে আসিয়া প্রবেশ করে।

ঝড়ের উৎপত্তির পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কল্পনার মধ্যে অনেক সত্য রহিয়াছে, ইহা বৈজ্ঞানিকগণ বহুদিন যাবৎ মনে করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সম্প্রতি নরওয়ে প্রদেশের বিয়ার্কনিস প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ আটলান্টিক সাগরে যে ঝড় হয় তাহার উৎপত্তির আর এক প্রকারের কারণ অনেক পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন। ইহারা দেখাইয়াছেন যে, উত্তর-মেরুপ্রদেশ হইতে দক্ষিণাভিমুখী হাওয়া যখন গ্রীষ্মমণ্ডল হইতে উত্তরাভিমুখী প্রবাহিত উষ্ণ বায়ুর সঙ্গে ধাক্কা খায় তখন এই দুই প্রকারের হাওয়ার সঙ্গমস্থলে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হয়। উষ্ণ হাওয়া বৃত্তাকারে উত্তর-পশ্চিম কোণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া সর্ব্বপ্রথম ঠাণ্ডা হাওয়াকে আক্রমণ করে এবং উহার ঘাড়ে চড়িয়া বসে। ঠাণ্ডা হাওয়া এই আক্রমণ নিশ্চেষ্টভাবে গ্রহণ না করিয়া একটু ঘুরিয়া বিপরীত দিক হইতে, অর্থাৎ পূর্ব্ব কোণ হইতে, উষ্ণ হাওয়াকে আক্রমণ করে এবং উহাকে আরও অধিক ঊর্দ্ধে তুলিয়া দেয়। এই আক্রমণের ফলে ঐস্থলে সমুদ্রের উপরিতলের হাওয়ার ঘটিকা-যন্ত্রের কাঁটার বিপরীত দিকে চক্রাকারে গতি উদ্ভূত হয়, এবং উষ্ণ হাওয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়ার দরুণ উহার জলীয় বাষ্প ঘন মেঘে পরিণত হইয়া মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দেয়।

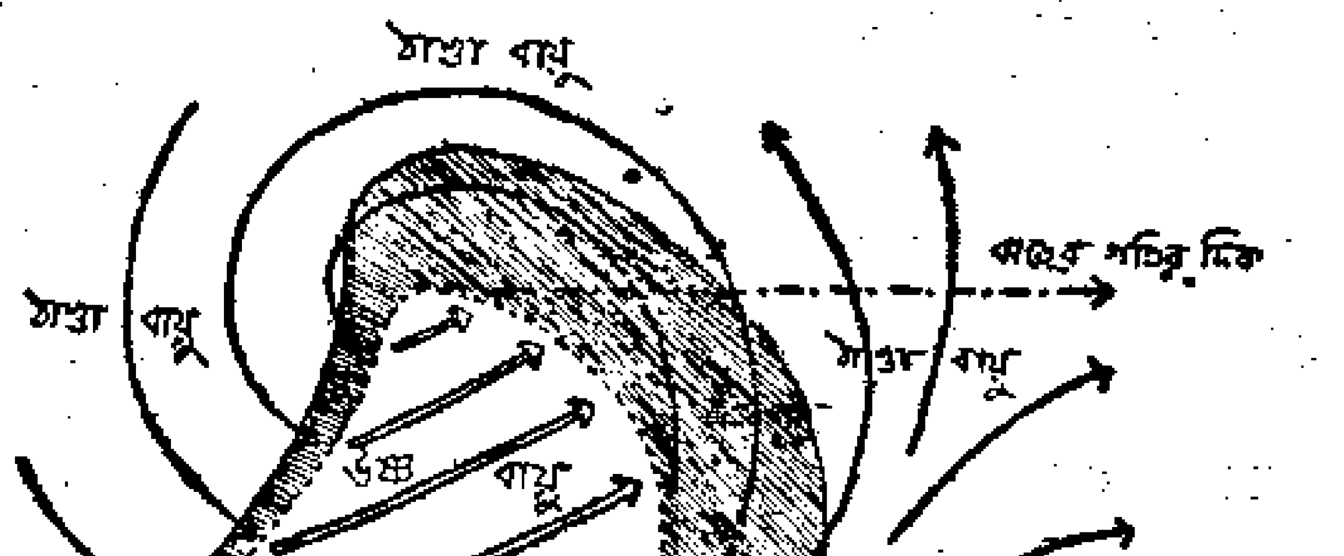

ঠাণ্ডা বায়ু এবং উষ্ণ বায়ুর সংস্পর্শে ঝড়ের উৎপত্তি
(ছায়া চিহ্নিত স্থানে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে)

বঙ্গসাগরের ঝড়ের উৎপত্তির এই প্রকার কারণ নির্দ্দেশের প্রধান বাধা এই যে, উহার চতুর্দ্দিকের হাওয়ার তাপের বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না। কিন্তু তথাপি কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সমুদ্র হইতে উত্তর কিংবা উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখী প্রবাহিত বায়ু, এবং স্থল হইতে দক্ষিণ কিংবা দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখী বায়ুর সংঘর্ষ এইরূপ ঝড়ের উৎপত্তির আদি কারণ। এইরূপ অনুমান করিবার প্রধান হেতু এই যে, ইহা হইতে বর্ষার পূর্ব্বের এবং পরের ঝড় কি জন্য দক্ষিণ-বঙ্গসাগরে এবং বর্ষাকালের ঝড় উত্তর-বঙ্গসাগরে উৎপন্ন হয় তাহা অনুধাবন করা যায়। কারণ সর্ব্বদাই দেখা যায়, ঝড় এই দুই প্রকারের হাওয়ার মিলন-স্থলে উৎপন্ন হয়। বর্ষার পূর্ব্বে ও পরে এই মিলন

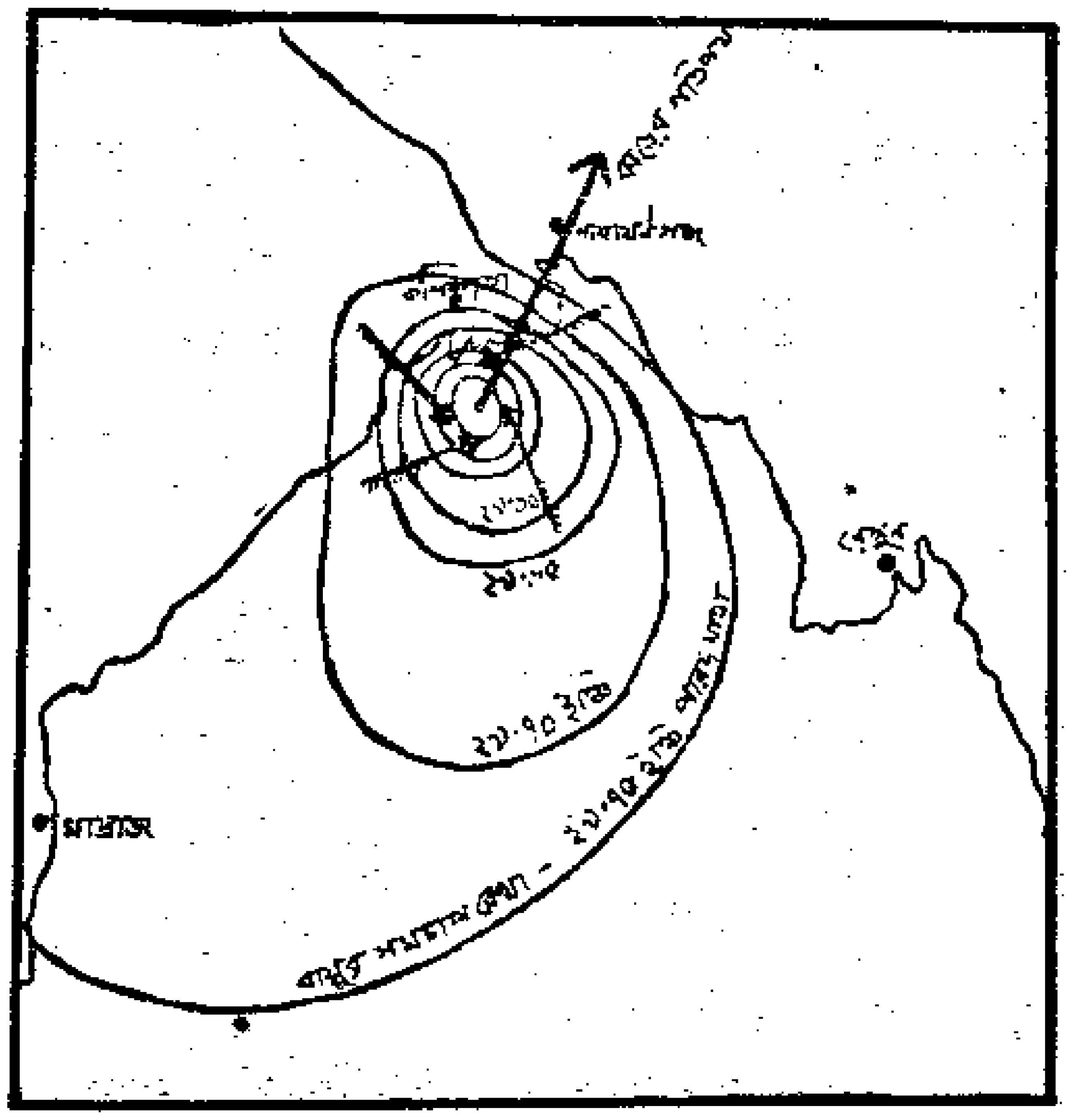

১৯১৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর ৮ ঘটিকার সময়
বঙ্গসাগরের ঝড়ের বায়ুচক্র
(এই ঝড় ২৪শে মধ্যরাত্রিতে এবং ২৫শে প্রাতঃকালে
পূর্ব্ববঙ্গের উপর দিয়া বহিয়া যায়)

বঙ্গসাগরের দক্ষিণে এবং বর্ষার সময়ে বঙ্গসাগরের উত্তরে ঘটিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারের হাওয়ার তাপের বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও ইহাদের অন্যান্য গুণ—যেমন, অভ্যন্তরস্থ জলীয় বাষ্প কিংবা ঊর্দ্ধ দিকে তাপ-মাত্রার হ্রাস,—সমান নহে।

যদিও ঝড় উৎপত্তির প্রথম অবস্থায় ঐ দুই প্রকার

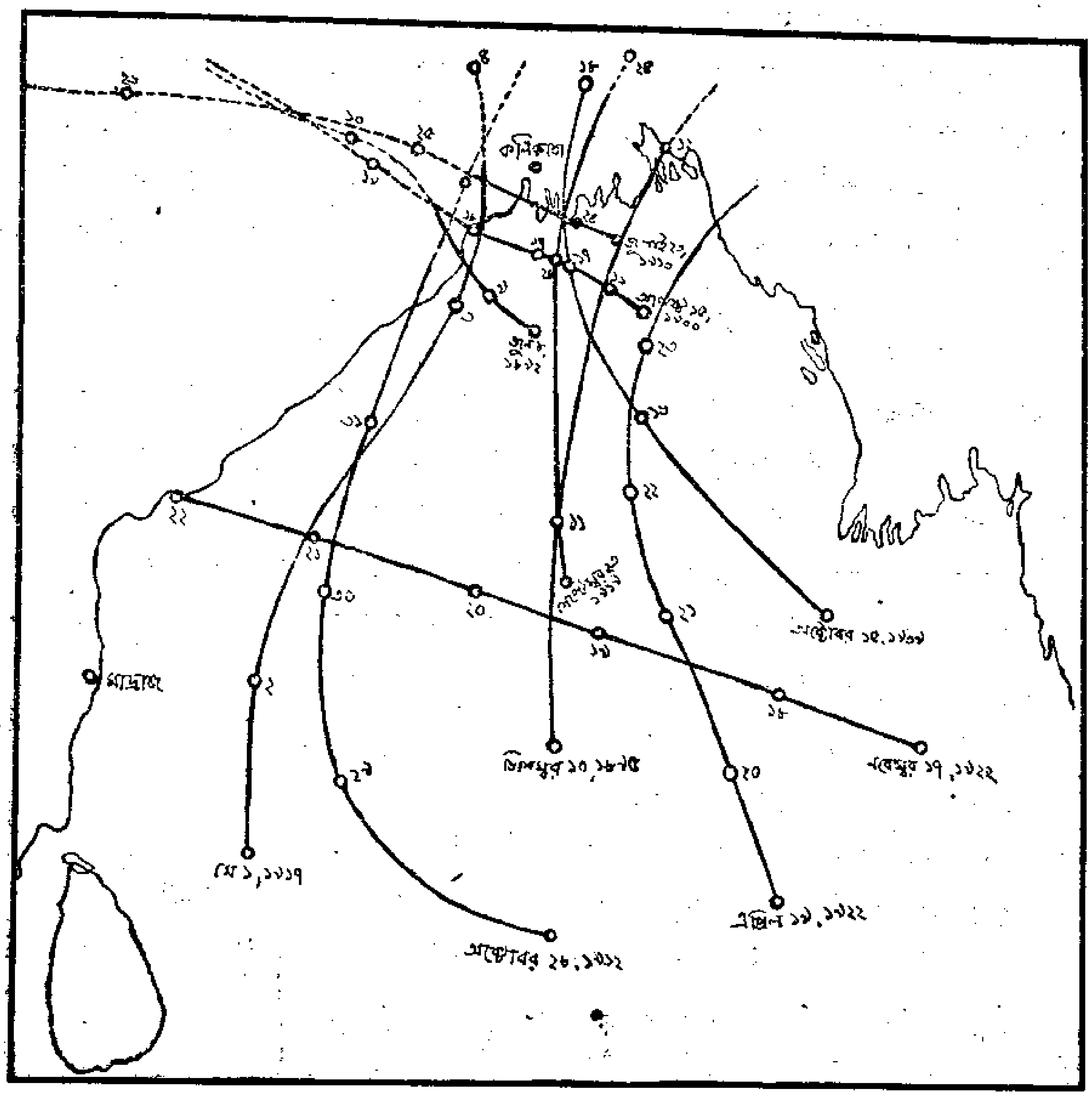

বঙ্গসাগরের বিভিন্ন সময়ের ঝড়ের গতিপথ
(ক্ষুদ্র বৃত্তগুলি প্রতিদিন ৮ ঘটিকার সময় ঝড়ের অবস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে)

হাওয়ার সংমিশ্রণে অনেক শক্তি গ্রহণ করিতে পারে, তথাপি পূর্ব্বে উহার উৎপত্তির এবং গতির কারণ যেরূপ লিখিত হইয়াছে তাহাই যে বহুল পরিমাণে প্রকৃত কারণ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি কালবৈশাখীর সময় বেলুনের সাহায্যে বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন বায়ু-স্তর পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে, এই ঝড়গুলি দুইটি বিভিন্ন প্রকার বায়ুর সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। কাজেই সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সময় হিমালয় হইতে দক্ষিণদিকবাহী ঠাণ্ডা হাওয়া এবং বঙ্গসাগর হইতে উত্তরদিকবাহী জলীয় বাষ্প পূর্ণ উষ্ণ হাওয়ার সংঘর্ষে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়।

এ পর্য্যন্ত ঝড় কি প্রকারে উৎপন্ন হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কি প্রকারে ধ্বংস হয় তাহার কথা বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। একবার ঝড়ের বায়ু-প্রবাহ চক্রাকারে গতি প্রাপ্ত হইলে উহার ধ্বংস ঘটা সহজ ব্যাপার নহে। উহার প্রবল বায়ু-প্রবাহ মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিতে করিতে দিনের পর দিন অগ্রসর হইতে থাকে। ঝড়ের ধ্বংস দুই প্রকারে সংঘটিত হইতে পারে। প্রথম উহার প্রধান আহার্য্য পদার্থ,—অর্থাৎ জলীয় বাষ্প যাহা মেঘে পরিবর্ত্তিত হইয়া উহাকে শক্তি প্রদান করে, তাহা নিরোধ করা। দ্বিতীয়তঃ, কোনো পর্ব্বতমালায় ধাক্কা খাইয়া উহার বায়ুপ্রবাহের চক্রাকারের গতি ভঙ্গ হইয়া গেলে সহজেই ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটে। ভারতবর্ষে যে-সমস্ত ঝড় প্রবেশ

করে তাহাদের ধ্বংস এই দ্বিতীয় কারণে অর্থাৎ হিমালয় পর্ব্বতে কিংবা ব্রহ্মদেশের পর্ব্বতে ধাক্কা লাগিয়া ঘটিয়া থাকে। বঙ্গসাগর হইতে ঝড় দাক্ষিণাত্য প্রদেশের উপর দিয়া আরব-সাগরে গমনের সময় কখনও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালায় বাধা পাইয়া ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু আবার কখনও কোনো প্রকারে এই ধাক্কা সামলাইয়া আরব-সাগরে উপস্থিত হইয়া পুনরায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। কখনও বঙ্গসাগরের ঝড় মধ্যভারতের উপর দিয়া পশ্চিম অভিমুখে যাইতে যাইতে সিন্ধু প্রদেশের মরুভূমির উপরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং দুই তিন দিন ধরিয়া স্থলের উপর দিয়া গমনের ফলে এবং মরুভূমির উপর অবস্থানের জন্য জলীয় বাষ্পের অভাবে উহাদের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

শীতকালে বঙ্গসাগরে কখনও ঝড় উৎপন্ন হয় না। কিন্তু ঐ সময় আটলাণ্টিক কিংবা ভূমধ্যসাগরে উৎপন্ন ঝড় পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে চলিতে পশ্চিম সীমান্ত (বেলুচিস্থান) দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং সমস্ত উত্তর-ভারতে বারি বর্ষণ করিতে করিতে ব্রহ্মদেশে আসিয়া পৌছায়। কখনও ব্রহ্মদেশের পর্ব্বতে ধাক্কা খাইয়া ইহারা ধ্বংস হইয়া যায়, কখনও বা পর্ব্বত পার হইয়া প্রশান্ত-মহাসাগরে উপস্থিত হয়। হাজার হাজার মাইল চলিয়াও যে ঝড়ের ধ্বংস হয় না তাহাদের অস্তিত্ব কত দৃঢ় এবং সেগুলি ধ্বংস করা কত কঠিন তাহা সহজেই ধারণা করা যায়। যাঁহারা শীতকালের এই ঝড়গুলির প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন এই ঝড় আসিবার পূর্ব্বে হাওয়া কেমন উষ্ণ হইয়া উঠে এবং চলিয়া গেলে বায়ুর তাপ ১৫।২০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত কমিয়া যায়। ইহা হইতে এই ঝড়গুলি যে উষ্ণ ও ঠাণ্ডা বায়ুর মিলন-স্থলে উৎপন্ন তাহা অনায়াসে বুঝা যায়।

এই আটলাণ্টিক ও ভূমধ্যসাগর হইতে আগত ঝড়গুলির উপরে উত্তর-ভারতের রবি-শস্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। কারণ এইগুলি না আসিলে ঐ সময়ে বৃষ্টি-পাতের কোন সম্ভাবনা থাকিত না। কাজেই এই ঝড়গুলি আমাদের পরম বন্ধু।

প্রাণের দাবী

শ্রীসান্ত্বনা দেবী

১

নিজের সর্ব্বশেষ অলঙ্কারখানি, স্বামী অনাথের হাতে তুলে দিয়ে পত্নী মমতার মনে হয়েছিল সে বুঝি আজ সত্যই নিশ্চিন্ত হয়েছে।

অসীম শূন্য বিরাট আকাশের মতই তার হৃদয়ও আজ কানায় কানায় শূন্যতার শান্তি দিয়ে ভরে উঠেছে। চাওয়ারও আর কিছু নেই, দেবারও আজ কিছু নেই। সবেরই সমাপ্তি হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু পরক্ষণেই যখন বাড়িওয়ালী এসে তাকে বাকি ভাড়ার জন্য অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত করে গেল, তখন মনে হ'ল, দেবার আর কিছুই নেই—এ একটা মস্ত সান্ত্বনা বটে, তবুও চাই—আর দিতে হবেই—এর হাত হতে পরিত্রাণের উপায় কি?

ভিড়ের দিনে মন্দির-যাত্রীরা যেমন মার মার করে পিষে ফেলে মন্দিরে ঢোকে তেমনি করেই তার মগজের ভিতর নানান্ দুঃখ, নানান্ দেনা এসে ঢুকতে লাগল।

বাড়িভাড়া সত্তর টাকা বাকি পড়েছে, তা দিতে হবে। ধোপারও খুব কম করে কুড়িটাকা বাকি, তাও চাই। গয়লা দুধের জোগান বন্ধ করে দিয়েছে, তারও পঞ্চাশ ষাট টাকা না মিটিয়ে দিলেই নয়। ঘরে চাল নেই, ডাল নেই, একটু নুন পর্য্যন্ত নেই।

দোকানে প্রায় একশ' টাকা ধার হয়েছে। না মিটিয়ে

দিলে তার রক্ষা নেই। পরিধেয় বস্ত্র নেই, শত তালি, শত গ্রন্থিবিশিষ্ট বস্ত্রে আর লজ্জানিবারণ হয় না। এমনি কত কি।

দেবার আর কিছুই নেই, অথচ দিতে যে হবেই। এই এক ভাবনায় মমতার মাথাটা এমন ঘুরে উঠল যে, সে ঝুপ করে দালানে বসে পড়ে, থামের খুঁটিতে মাথা রেখে চোখ বুজল।

শ্বশুরের রেখে যাওয়া এই দু'হাজার টাকার ঋণ ছাড়া আর কিছু ছিল না। ভরসা স্বামীর ত্রিশ টাকা বেতনের একটি চাকরী। তাও আজ ছয়মাস তিনি চাকরীশূন্য—বেকার।

নিজের গায়ে একখানি গয়না নেই—দেনার সুদে সুদে সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। তবুও বাঁচতে হবেই—আর রাঁধতে খেতেও ঠিক তারি জন্যেই হবে।

দোকানে ধার মেলে না। তবুও চাই - যেমন করে হোক। নিজের না হোক, স্বামীর জন্য—শিশু পুত্র কন্যাদের জন্যও অন্ততঃ চাই। নুনভাত—ফ্যান্-ভাত যা হোক এক্ষণি চাই।

ছেলে মেয়ে দুটি সেই সকালে দুটি বাসি ভাত খেয়ে খেলা করতে গিয়েছে। এবার এসে ক্ষুধায় আর দাঁড়াতে পারবে না। যে করে হোক, ধার করে ভিক্ষা করে তাদের দুটি না খেতে দিলে ত চলবে না। মমতাকে উঠতেই হ'ল।

প্রথমটা মাথা তুলে সোজা হয়ে বসে সে একবার চারিদিকে চাইল। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

ঘরের ঘটিবাটি তৈজসপত্র সব বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। এমন কিছুই ছিল না, যা দিয়ে তাদের জননী আজ দুটি বুভুক্ষিত শিশুর মুখে আহার্য্য জোগান।

রৌদ্রে উঠানটা ভরে উঠেছে। চৌবাচ্ছায় জলের কল দিয়ে জল পড়ার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। মমতা কলতলায় গিয়ে, প্রথমে খুব খানিকটা আঁজলা পূরে জল খেয়ে নিল। তারপর ছেঁড়া কাপড়খানাই ভাল রকম গুছিয়ে নিয়ে সদর দ্বারটা খট্ করে খুলে বের হয়ে গেল।

২

মমতাদের বাড়ীর পাশেই জমিদারের মস্ত বাড়ী। সেখানে তখন তক্তপোষের উপর ফরাসপাতা বিছানায় ডজনখানেক তাকিয়া ঠেস দিয়ে ডজনখানেক লোক তবলা, বাঁয়া, ডুগি, এসরাজ, হারমোনিয়ম, এই-সব নিয়ে গান-বাজনায় রত ছিল।

শীঘ্রই জমিদার-পুত্রের উৎসাহে তাদের থিয়েটার পার্টি খোলা হবে, তারই রিহার্সাল চলছিল!

মমতা সেইখানে গিয়েই সোজা হয়ে দাঁড়াল। জমিদার-পুত্র হতে সকলেই চমকে উঠল।

প্রথম মমতাই কথা বলল। তার চোখে পলক ছিল না। গলার স্বরও বেশ স্পষ্ট স্থির।

"বাবু আমরা বড় গরীব। দয়া করে চারটি টাকা দিন না।"

ঘরের সবাই নিস্তব্ধ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। সকলেই মমতাকে চিনত, ভদ্র গৃহস্থ বধূ সে। সে যে কতখানি অভাব-অসুবিধায় পড়ে আজ ভিক্ষার্থ নিজে এসে দাঁড়াতে পেরেছে, তা সবাই বুঝল।

জমিদার-পুত্র একটু তোতলার মত বলে উঠলেন, "তুমি—আপনি—নিজে এসেছেন কেন? যান্ যান্ আমি চাকরের হাতে আপনার যা' যা' দরকার পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

মমতা বেশ অবিচলিতভাবেই বলল, "না আমায় চারটি টাকা দিন তাহলেই হবে।"

জমিদার-পুত্র পকেট হতে তাকে চারটি টাকা বের করে দিলেন। প্রসারিত দক্ষিণ হস্তখানায় অকুণ্ঠিতভাবে নিয়ে মমতা চলে এল।

জমিদার-পুত্রের চোখের চাহনির তলায় যে একটা গুপ্ত দৃষ্টি উঁকি মারছিল, টাকা দেবার সময় অলক্ষ্যে তার হাত যে তার হাতখানা স্পর্শ করেছিল, তা দেখেও সে গ্রাহ্য করল না।

তারপর চাল এলো—ডাল এলো—সামান্য তরি-তরকারি ও মাছ এলো। রান্না হ'ল। কিন্তু মমতার সেই স্তব্ধ শুষ্ক মুখ আর মৌন প্রখর দৃষ্টি কিছুতেই বদলাল না।

সন্তানদের খাইয়ে শুইয়ে রেখে স্বামীর অন্নব্যঞ্জন

গুছিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে উনানে জল ঢেলে রেখে যখন সে শোবার উদ্যোগ করছে তখন বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। আর সেদিন নিয়ে উপরি উপরি তিন দিন প্রায় আর কিছু খাওয়া হয়নি।

স্বামী কোথায় গিয়েছেন জানা নেই। কখন ফিরবেন তাও স্থির নেই। পৈতৃক ঋণের সুদে সুদে সব সম্বল শেষ। তবুও দেনায় মাথার চুল অবধি বিক্রী। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে ইচ্ছা করে না। বর্ত্তমানও ভয়াবহ দিন নিয়ে উপস্থিত। চরম সময় ভগবানকেই নারী ডাকে। তাও প্রবৃত্তি হয় না। শিশুকাল হতে হিঁদুর মেয়ে ঈশ্বরকে বুক দিয়ে অনুভব করতে শেখে, তাঁকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান করে। কিন্তু আজ তার সে অটল বিশ্বাস নেই। চোখে এক ফোঁটা জল নেই, কণ্ঠে ভাষা নেই, হৃদয়ে কিছু অভিযোগও বুঝিবা নেই।

বাপ নেই—মা নেই। আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। এক ধনী মামাশ্বশুর আছেন, তিনি খোঁজখবর নেন না। বিতৃষ্ণায় মমতারও তাঁর শান্তি ভঙ্গ করতে ইচ্ছা হয় না। প্রত্যক্ষ নারায়ণ আছেন, তুলসী বৃক্ষ। নিত্য তার তলায় দীপ জেলে দেয়। কিন্তু প্রার্থনা করে না, কেবল প্রণাম করে। কেন বৃথা তাঁর শান্তি ভঙ্গ করা। স্বামীকে কিছু বলে না—বলা বৃথা। বিষম বিতৃষ্ণায় সে তাঁরও শান্তি-ভঙ্গ করতে ইচ্ছা করে না। নিজের মন? হাঁ, সেইটা শান্তিতে রাখা সব চাইতে শক্ত। তবু সে যথাসম্ভব চিন্তা করে না। যা' হবার হোক। ছেলেমেয়ে না-খেয়ে মারা যাক্ দেনার দায়ে স্বামী জেলে যান্—বাড়িভাড়ার জন্য অপমানিত হতে হোক—যা-কিছু সব হোক—সে কিছু ভাবতে চায় না। বৃথা কান্নাকাটি করে নিজের মনের শান্তির ব্যাঘাত করতেও সে ভালবাসে না।

বিশ্রাম-সময়ে নির্ভীক বীরের মত নিজের ভবিষ্যৎ-টাকে নানারূপে সম্ভব অসম্ভব দুঃখের ছবিতে গড়ে তোলে, নিস্পন্দ হয়ে তাই দেখে।

চোখের পাতায় পলক পড়ে না। একফোঁটা জলও আর বুঝি তাতে নেই যে ঝরবে।

৩

স্বামীর সাম্‌নে সকালের বাড়া ভাত-ব্যঞ্জন ধরে দিয়ে প্রদীপ জেলে মমতা বসেছিল।

নির্নিমেষদৃষ্টি স্বামীর অন্নের দিকেই নিবদ্ধ করে সে ভাবছিল। এই যে মহাপুরুষটি খোঁজ রাখেন না, খবর করেন না, শান্ত নিরীহের মত যা পান খান, কোথা হতে এসব এল জানবারও যার প্রয়োজন নেই, একেই স্বস্তিতে রাখবার জন্য সে ভিক্ষা করছে। নিজের সমস্ত সম্বল বিক্রী করেছে।

রেঁধে ভাত দেওয়া। পরকে তৃপ্তিসহকারে খাওয়ানোতে যে আনন্দ আছে সে-রকম্ আনন্দ নারীজীবনে আর কিছুতেই নেই। তবু এসব সে পায় কোথা হতে?

নিত্য পলে পলে অভাব, পলে পলে দুঃখ—এ পাষাণ-প্রাণেও যে, আর সহ্য হয় না।

জননীর কর্ত্তব্য, স্ত্রীর কর্ত্তব্য সব কি তারই জন্য সৃষ্টি হয়েছিল? আর কি কারোর কর্ত্তব্য বলে কোন দায়িত্ব থাকতে নেই? সহসা মর্ম্মভেদী একটা দীর্ঘশ্বাস মমতার বক্ষ মথিত করে বের হয়ে এল।

চমকে মুখ তুলে অনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হ'ল গা?"

"নাঃ, কিছু না।" মমতা উঠে দাঁড়াল। আঁচাতে আঁচাতে অনাথবন্ধু বললেন, "আজ সারা দিন ভারি খাটুনী গিয়েছে। বিছানাটা পেতে দাও ত।"

মমতা বলল, 'বিছানা পেতেই রেখেছি।"

"রেখেচ? আঃ, বাঁচলাম। যতীন্ দাস মারা গিয়েছেন জান ত,আজ রাত্রেই তাঁর মৃতদেহ হাওড়ায় আস্‌বে। তারই যথাবিহিত ব্যবস্থা হচ্ছে। সেই দলেই ছিলাম সারাদিন। আবার খানিক বাদেই চলে যাব। রাত্রে ফিরব কি না বলতে পারি না। তুমি দোরটা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ো।"

স্বামী অনর্গল বকে গেলেন। মমতা একটিও হাঁ হুঁ না দিয়ে চুপ করেই বসে রইল।

বলবারই বা তার আছে কি? এই সহরের একটা চাকরদাসীশূন্য আত্মীয়স্বজনশূন্য বাড়ীতে একা অসহায় দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে যে স্ত্রীকে ফেলে যেতে পারে তাকে বলবারই বা মমতার কি থাকতে পারে?

খানিক বাদে স্বামী আবার নিজেই বললেন, "উঃ!

অমর কীর্ত্তি জগতে রাখলেন কিন্তু। ভাবতে গেলেও গা শিউরে ওঠে। এক আধ দিন নয় ত দুমাস ধরে তিলে তিলে দেহ বিসর্জ্জন! ভাব দেখি, দেখ দেখি একবার—"

মমতার ভারি হাসি পেল। মহাপুরুষ তিনি, দধীচির মত আত্মত্যাগী সে বিষয়ে তার সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজ-কারাগারে নাই হোক, অবরোধ কারাগারে নিরুপায় বিদ্রোহীর মত অনশনে সেও ত প্রতিদিনে তিলে তিলে নিজেকে হত্যা করছে, কে তার খবর রাখে? সে ত একা নয়। এ-রকম কত আছে। কত মেয়ে ঠিক এমনি সঙ্কটে, এমনি অবস্থায়, দিনে দিনে নিজের কামনা বাসনা সুখশান্তিকে হত্যা করছে। অনশনে প্রাণ দিচ্ছে। কিন্তু ক'জন তা নিয়ে মাথা ঘামায়? কে-ই বা সে হতভাগিনীদের মৃতদেহ ঘাড়ে নিয়ে এমন সমারোহ করে বেড়ায়?

জগৎ হয়ত জানতেও পারে না যে সে কেন মরল, কি জন্য মরল! এই ত তার নিজের স্বামীই সে খোঁজ রাখেন না, তখন অপরে রাখবে কি করে?

এই হুজুগে যিনি মেতে বেড়াচ্ছেন তাঁর স্ত্রী যে ক'বেলা উপোস করে তা জানবারও বোধ হয় তাঁর আবশ্যক নেই।

উপার্জ্জন না করলে সংসার চলে না। মাঝে মাঝে চাকরীর দরখাস্ত করা ছাড়া আর কোনো চেষ্টাও ত তাঁর নেই। ভাবেন হয়ত, সংসার চলছে ত, যে করে হোক! কিন্তু সে যে কি করে চলচে, তা তার অন্তর্যামী ছাড়া আর কে খবর রাখে?

শক্ত খুঁটীর মত বসে মমতা জ্বলন্ত প্রদীপটার দিকেই চেয়ে ছিল। কখন যে স্বামী চলে গিয়েছেন, কখন যে দালানের প্রদীপটা নিবু নিবু হয়ে এসেছে, তা তার খেয়ালও ছিল না। হঠাৎ পাশের বাড়ীর একটা বিশ্রী বেয়াড়া হাসি ও বাহবার শব্দে তার চমক ভাঙল।

অন্ধকার দালানের দিকে চোখ পড়তেই তার সর্ব্বাঙ্গ অজানা শঙ্কায় কাঁটা দিয়ে উঠল। কোনো মতে উঠে গিয়ে সদর দ্বারটা বন্ধ করে এসে সে শিশুদুটির পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে বিষম ঘামতে লাগল।

বুকের ভিতরও তার ঢিপ ঢিপ করে আওয়াজ হচ্ছিল। পিপাসায় তার আকণ্ঠ শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উপবাস-ক্লিষ্ট শ্রান্ত দেহে আতঙ্কে সে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে উঠে এক গ্লাস জল খেতেও তার সাহস হ'ল না।

জনশূন্য বাড়ীটায় মনে হ'ল যেন অন্ধকারটাই আরও ঘনিয়ে এসে তাকে ঘিরে ফেলবার জন্য হাত বাড়াচ্ছে।

সেই অতল তমসাচ্ছন্ন আঁধারে এমন একটা কিছু আছে যা সে চেনে না—জানে না—তবুও আতঙ্কে ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ তার আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে। কণ্ঠে একটা অস্ফুট শব্দ পর্য্যন্ত আর বাহির হচ্ছে না।

৪

পরদিন সকালে মমতা কলতলা হতে সবেমাত্র স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে বের হয়ে আসছে, এমন সময় 'এই যে বৌদি' বলে জমিদার-পুত্র নরেন্দ্রনাথ এগিয়ে এসে তার পায়ের গোড়ায় ঢিপ করে প্রণাম করল।

সঙ্কোচে লজ্জায় বিস্ময়ে হতবুদ্ধিপ্রায় হয়ে মমতা ভিজে কাপড়টাই যথাসম্ভব সংবরণ করতে লাগল। মুখে তার তখনও জলকণাগুলি মুক্তাবিন্দুর মতই লেগে ছিল, ভিজে চুলের বোঝা তখনও সোজা হয়নি, তা দিয়েও জল ঝরছিল। নরেন্দ্র প্রভাতী রৌদ্র-ফলিত ধৌত সুন্দর মুখখানা একটু ভাল করেই দেখতে দেখতে বলে উঠল, "হঠাৎ এসে বৌদি বলে ডাকলাম বলে রাগ করলেন নাকি?"

"না বসুন।" সে একখানা মাদুর দালানে পেতে দিল। মাদুরটার উপরে জাঁকিয়ে বসে নরেন্দ্র বলল, "সেদিন যেমন একটু দরকারে পড়েই আপনি আমার কাছে গিয়েছিলেন, আমিও তেমনি দরকারে পড়েই আজ আপনার কাছে এসেছি।"

মমতার কণ্ঠে একটাও ভাষা ফুটল না যে জিজ্ঞাসা করে অতবড় জমিদার-পুত্রের তার মত দুঃখীর কাছে কি দরকার থাকতে পারে। কেবল নতনেত্রে দাঁড়িয়ে রইল। নরেন্দ্র তার দিকেই চেয়ে আবার বলল, "ভাবছেন বুঝি আমার আবার আপনার কাছে কি দরকার থাকতে পারে? কিন্তু বৌদি এ আপনি ছাড়া আর কারও দ্বারা সম্ভব নয়। তাই আপনার কাছেই এলাম। আমরা একটা সখের থিয়েটার খুলছি জানেন ত? তাই একজন অভিনেত্রীর দরকার। আপনি যদি সে অভাব দূর করেন,

এই দেখুন দু হাজার আগাম দিচ্ছি। এর পর মাসে মাসে দেব। কেমন ? রাজি ?"

হাতের নোটগুলো সে সবে মাত্র মাটিতে মমতার পায়ের কাছে নামিয়ে রাখছিল। কিন্তু মমতার আগুন-রাঙা মুখের দিকে তাকিয়ে তার কেমন সাহস হ'ল না।—"বেরিয়ে যান—আমরা গরীব মানুষ, তা ব'লে অত হীন নই—আমার স্বামীর অসাক্ষাতে আর এ বাড়ীতে ঢুকবেন না।"

চমকে উঠে তোতলার মত নরেন্দ্র বলল,—"আপ—আপ–তো–তোমার ভালর জন্যই বলছিলাম, খেতে পাও না, ভিক্ষা করতে হয়। সুখে থাকতে। তোমার জানোয়ার স্বামীর মুখে ঝাড়ু মেরে চলে যেতে।"

জলন্ত কয়লার মত দু'চোখ তার মুখের উপর তুলে মমতা বলল, "যান—"

নরেন্দ্র ঘাড় নীচু করে নোটের তাড়াটা পকেটে পুরে মমতার তর্জ্জনী-নির্দ্দিষ্ট পথে নিরীহের মত বের হয়ে গেল। একটিও কথা আর বল্‌তে পারল না।

আর মমতা—সেইখানে ধপ করে বসে পড়ে বহুদিন পরে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

এত দুঃখ সে আর সত্যিই বহন করতে পারছে না। বাঁচবার স্পৃহা নেই, তবু বাঁচতে হবে। অন্ন নেই, ক্ষুধা আছে, খেতে হবে। অর্থ নেই, ধার করতে হবে, না পেলে ভিক্ষা করতে হবে। সম্ভ্রম আছে, বজায় রাখবার পথ নেই। লজ্জা আছে, নিবারণ করবার উপায় নেই। স্নেহ আছে, সামর্থ্য নেই। সে আর পারে না। ঈশ্বরের করুণা অসীম শোনা যায়, এতদিন তারও সেই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু অসীম দুঃখ যন্ত্রণার পেষণে তার আর সে বিশ্বাসও নেই।

শিশুপুত্র এসে মমতার ভিজে কাপড়ের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ল। "মা একটা পয়ছা দাও—বাঁছী কিনব।" কন্যা এক টুকরো ভাঙা শ্লেটে কাটাকুটি খেলবার ঘর এঁকে ডাকল,—"ভাইটি খেলবি আয়, মার পয়সা নেই চেও না।" ছেলে শুনল না, কচি কচি ছোট ছোট দুটি হাতে মমতার মুখ তুলে ধরে বলল, "দাও না মা, দুতি পায়ে পলি।" মমতা চোখ মুছে বলল, "পয়সা নেই বাবা, আজ থাক আর একদিন কিনো।" "না মা, আজকেই দাও।" সংসার-অনভিজ্ঞ মহা-আবদারে শিশু আঁচল ধরে টানাটানি করতে লাগল।

মমতা ডাকল, "শিউলি!"—"কি মা ?" "বাক্সটা একবার ভাল করে খুঁজে দেখত মা, যদি পয়সা থাকে"—মেয়ে মুখের উপর হতে এক ঝাঁকড়া চুল সরিয়ে দিয়ে বল্‌ল, "কোথায় খুঁজব ? সকালেই ত দুবার খুঁজলাম মুড়ি আনব বলে ; তা একটিও পয়সা পেলাম না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে খোকাকে শান্ত করবার জন্য মমতা উঠে পড়ল। বেলা বাড়তে লাগল, স্বামীর দর্শন নেই। সেই যে কাল বেরিয়ে গিয়েছেন এখনও আসেন নি। শুকনো মুখে কাছে দাঁড়িয়ে মেয়ে কুন্ঠিত-ভাবে বলল, "ভারি ক্ষিদে পেয়েছে মা।" যেন ক্ষিধে পাওয়াটা তার একটা বিষম অপরাধ ! ছয় বৎসরের মেয়ে তবু মার অবস্থাটা বেশ ভাল রকমই বোঝে। কোলের ছেলে কেঁদে কেঁদে কাঁধের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। কন্যা তৃতীয়বার চুলঢাকা চাঁদের মত মুখখানি মলিন করে পাশে দাঁড়িয়ে।

হাতে একটি পয়সা নেই যে ক্ষুধার্ত্ত কন্যার হাতে তুলে দেওয়া যায়। ঘরে একটি কণাও চাল নেই।

এসব চিরাভ্যস্ত অভাব তার গা-সহাপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। তবুও আজ যেন একেবারেই নিরুপায় সে।

নিজের সর্ব্বস্ব বিক্রী করেছে সে এদেরই খাওয়া-পরার জন্য। কোনো সম্বল নেই। সাহায্য করবারও আজ কেউ নেই।

অথচ—যাক্—। কন্যা আবার বলল, "মা বড্ড ক্ষিদে পাচ্ছে যে।" খোকাকে মাদুরে শুইয়ে দিয়ে মমতা বলল, "একটা কাঁচা পেয়ারা আছে, এখন খা। পরে ভাত রেঁধে দেব।" কবে কার বাড়ির প্রসাদী চরণামৃতের সঙ্গে দেওয়া একটা শুকনো কালো কাঁচা পেয়ারা বের করে এনে পরম উল্লাসে কন্যা তাই খেতে লাগল।

আর শুদ্ধ কালবৈশাখীর আকাশের মত নিস্পন্দ নির্ব্বাক হয়ে বসে বসে মমতা তাই দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

ভিজে কাপড় গায়ে শুকিয়ে উঠল। মাথার চুল

মোছা হ'ল না। দালানে খোকাকে শুইয়ে রেখে তাদের নিরুপায় জননী ছুটি ক্ষুধার্ত্ত শিশুকে আগলে বসে রইল। যিনি বিশ্বজননী, যাঁর অসীম স্নেহ,—তাঁর মনে এতে এতটুকুও দুঃখ হয়েছিল কিনা জানা যায় না। কিন্তু তাঁরই একবিন্দু করুণা দিয়ে গড়া এই মর্ত্ত্যজননীর বুকে আর দুঃখ রাখবার তিলমাত্রও ঠাঁই ছিল না। সেদিন সে এই ছেলে মেয়ে দুটির কথা ভেবেই সম্ভ্রম ত্যাগ করে অসঙ্কোচে ভিক্ষা করে এনেছিল।

সেদিনের মত আজ ভিক্ষায় বেরতে তার কিন্তু প্রবৃত্তি হ'ল না। তার অন্তরের নারী-মহিমা আজ সন্তানের অনাহারের চাইতেও বড়-কিছুর জন্য তাকে কিছুতেই রাস্তায় ভিক্ষার্থ বাহির হতে অনুমতি দিল না।

৫

মমতা ভাবছিল।

জট্‌পাকানো খেইহারানো শত শত বারের পুরানো ভাবনাই তার সম্বল। এই ত তার সবে মাত্র বাইশ বৎসর বয়স, এ বয়সের মধ্যে এত দুঃখ সে পেয়েছে যে, তার পরিমাণ করা যায় না।

আত্মহত্যায় সব দুঃখের অবসান হয় বটে, কিন্তু তার পর? এই ছেলে মেয়ে খাবে কি? জননীবিহনে তারা দাঁড়াবে কোথায়? স্বামী নিতান্ত নিরুপায়। বুঝি মমতার চাইতেও নিরুপায়। তবু লোকের এক-আধটা ছোটখাট কাজ করে দিয়ে সামান্য দুএক টাকাও সে মাঝে মাঝে পায়। কিন্তু সবল কর্ম্মঠ পুরুষ, তাকে কে দয়া করবে? সে নারী, সকলের কৃপার দানে সে বঞ্চিত নয়।

নিজ ঋণ পিতৃঋণ বড় জিনিষ! তা শোধ করাও কর্ত্তব্য। কিন্তু এই আজন্মের সাথী ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে তাঁর ঘাড়ও যে নুয়ে পড়ছে।

তবু শ্বশুর থাকতে এত কষ্ট জানতে হয় নি। তাঁর পেন্সন-লব্ধ টাকাতেই সচ্ছলে সংসার চলেছিল। তিনি যে ভিতরে ভিতরে এত দেনা করে, তাদের সর্ব্বনাশ করে গিয়েছেন, তা তারা ঘৃণাক্ষরেও আগে টের পায় নি ত।

চাকরীর বাজার কি রকম দুর্ম্মূল্য তা সে বেশ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। ব্যবসা—তাও মূলধন চাই। ভদ্র-সন্তান। কিছু লেখাপড়াও জানা। তিনি যে ঘাড়ে মোট বয়ে ছেলেপুলেদের জন্য রোজগার করবেন এমন ভরসাও তাঁর নেই।

এত অভাব, এত দুঃখ, তবুও তাঁর পরিধেয় বস্ত্র সাবান দিয়ে নিত্য ফরসা রাখতে হয়, তিনি ময়লা কাপড় পরে বেরতে লজ্জা বোধ করেন। তাঁর ছেলেপুলে একটি পয়সার জন্য ক্ষুধায় কাঁদে, কিন্তু তাঁর পায়েও নিতান্ত কম পক্ষে পাঁচ টাকা জোড়ারও এক জোড়া জুতা চাই।

ছেলেমেয়ের জামা ছেঁড়া সেলাই করে গ্রন্থি দিয়ে চালান যায়। কিন্তু তাঁকে ভদ্রসমাজে ঘুরতে হয়, তাঁর জামা ফরসা এবং নূতন চাই।

তিনি যে নিজের ভদ্রয়ানা ভুলে গিয়ে তাদের জন্য মাথায় মোট বইবেন, এমন কল্পনা তার স্বপ্নেরও অগোচর।

আর বাস্তবিক তার স্বামীরই বা কি দোষ? সত্যিই যে তিনি ইচ্ছা করে তাদের কষ্ট দিচ্ছেন তা ত নয়। এই রকমই যে আজকাল ভদ্র গৃহস্থ লোকের সমস্যাময় জীবন হয়েছে।

দোষ কারও নয়, দোষ তার অদৃষ্টের। তার স্বকৃত কর্ম্ম-ফলের। ইহজন্মে সে এমন-কিছু করেনি যে, তার এ শাস্তি বহন করতে হয়। তবে পূর্ব্বজন্মে না জানি কত পাপই লুকিয়ে করে এসেছিল, তাই তার অন্তর্যামী এ শাস্তি তাকে দিচ্ছেন।

সব সে সইতে পারত, যদি তার না ছেলেমেয়ে থাকত। তারাই তার জীবনের সব চাইতে বড় সমস্যা—তারাই তার সব চাইতে বড় আনন্দ।

শিউলি শ্লেটটুকু নিয়ে কি সব হিজিবিজি লিখছিল, অনেক পরে বলল, "মা, কই ভাত রাঁধলে না?" মমতা কোনো সাড়া দিল না, মেয়ে মার কাছে ঘেঁষে জিজ্ঞাসা করল, "মা—ওমা—ভাত রাঁধলে না।"

"একটু পরে মা।"

ক্ষুণ্ণ হয়ে শিউলি বলল, "আরও পরে রাঁধবে মা? বিকেল হয়ে গিয়েছে যে।"

বেলার দিকে চেয়ে শুষ্ককণ্ঠে অন্যমনস্কে মমতা বলল, "আগে উনি আসুন।"

শিউলি কাঁদতে লাগল। "আমার খিদে পেয়েছে যে, বাবা নাই বা এল—বাবা ত আর আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসছে না, তুমি ভাত রাঁধ না।—যতীন দাস যেমন না খেয়ে মারা গেল আমিও কি তেমনি না খেয়ে মরে যাব?"

মমতা চমকে উঠল। "ষাট্—কে তোকে একথা বলল শিউলি?"

দুহাতে চোখের জল মুছতে মুছতে শিউলি বলল, "আমি জানি। সরলা আমায় বলেছে। তাই জন্যেই ত আজ তাদের ইস্কুলের ছুটি হয়ে গেল।"

মেয়ের মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে তার অম্লান কপালের উপরকার চুলের গোছাটা সরিয়ে দিয়ে চুমু খেয়ে, মমতা বলল, "রাঁধছি মা—একটু দেরী কর।"

"আর দেরী করতে পারছি না মা। এখনি আমার বড় ক্ষিদে পাচ্ছে।"

উপায়হীনা জননীর বুকের ভিতরটা কি রকম ধড়ফড় করে উঠল। তাই ত! এই যে দুটি শিশুসন্তান আজ ক্ষুধায় শীর্ণ হয়ে তার কাছে আহার চাইছে, এদের এই ক্ষুধার দাবী, প্রাণের দাবী, সে জননী হয়ে কি করে অগ্রাহ্য করে? সে ত জননী, অপর ত কেউ নয়। তিলে তিলে সন্তান-হত্যা তার দ্বারা সম্ভব কি করে হয়?

বাঁচবার দাবী সবারই আছে। তারও কি নেই? সমাজের গণ্ডী পার হয়ে, তার বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে, প্রাণ বাঁচাতে সে কি নারী বলেই পারে না?

যিনি জন্ম দিয়েছেন, তাঁর আইন অমান্য করে আত্মহত্যায় যদি পাপ থাকে, তা হলে সমাজের সবল মুঠোর মধ্যে তিলে তিলে নিজেকে হত্যা করে জননী হয়ে সন্তান-হত্যার পাপ হতে পরিত্রাণের উপায় কি? যে-সমাজ হাত-পা বেঁধে চিরদিনের মত এই নারীজগতকে পঙ্গু করে রেখেছে, যার স্বাধীনভাবে রোজগারের কোনো ক্ষমতাই সে রাখেনি, সেই সমাজের ভিতর এই দুইটি শিশুকে সে বাঁচাবে কি করে? এই নিরুপায় বঙ্গনারীর উপর জননীর দায়িত্ব চাপান কি বিধাতারই সুবিচার হয়েছে বল্‌তে হবে! কিন্তু—না। তাকে বাঁচতেই হবে। ছেলেমেয়েকেও বাঁচাতে হবে। তার শরীরের একখানি অস্থি থাকতে সন্তানদের এভাবে না খেয়ে শুকিয়ে মারা যেতে সে দেখতে পারবে না। তাতে যাই হোক।"

"শিউলি—।" "কি মা।" "এই চিঠিখানা নরেন্দ্রবাবুকে দাও গে ত মা।"

মা দিল, মেয়ে কাগজখানা মুড়ে হাতে নিয়ে বলল, "যাচ্ছি—কিন্তু তুমি আগে রান্না চড়াও।"

"চড়াব। আগে তুই আয়।"

মেয়ে চলে গেল। একটা বহুবিলম্বী শ্বাস মোচন করে মমতা সেইখানে আছড়ে পড়ল।

চোখ বুজে মড়ার মত মাটি আঁকড়ে পড়ে রইল। আর কালির ধারার মত বহুকষ্টের অশ্রুজল চোখের কোণ বেয়ে ঝরতে লাগল।

শিউলি এসে একখানা চিঠি আর একগোছা দশ টাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিল। বল্‌ল, "মা, নরেন্দ্রবাবু দিলেন। বললেন, আমি কাল যাব বলে দিস্‌।"

মমতা উঠে বসল। "যা মা আর দেরী করিস নে—এই নোটখানা নিয়ে পাঁচ টাকার সন্দেশ রসগোল্লা কিনে আন। এত বেলায় আর কখন ভাত চড়াব বল্‌?"

একমুখ হেসে মেয়ে বলল, "পাঁচ টাকার সন্দেশ রসগোল্লা কি হবে মা? সে যে অনেক—।"

"হোক গে—তুই যা।"

তারপর সেই এক চ্যাঙারী ভাল ভাল সন্দেশ নিজের হাতে নিয়ে একটি একটি করে দুটি বুভুক্ষিত শিশুর মুখে তাদের জননী তুলে দিতে লাগ্‌ল। আর একটি একটি করে অশ্রুকণা টপ্‌ টপ্‌ করে ঝরে, তার বক্ষবসন সিক্ত করে দিতে লাগল।

সংসারে ভাল যা-কিছু দারিদ্র্যদুঃখের পেষণে এমনি করেই তারা দিনে দিনে ধ্বংস হয়ে যায়। কে তার খবর রাখে, কেবা তার প্রতিকার-চেষ্টায় মাথা ঘামায়। জগৎ জানেও না হয়ত। আর যদিই বা কেউ জানে তাহ'লে সেই দুর্ভাগিনীর নিন্দায় তারা বিশ্ব মুখর করে

তুলতে একটুও দ্বিধা করে না। একবার ভাবেও না যে, বুকভরা স্নেহ নিয়ে, সামর্থ্যহীন নিরুপায় নারী কত যন্ত্রণা নীরবে সয়েছিল, কত দুঃখেই তার এ কাজ।

বিশ্বসুদ্ধ সবাই তর্জ্জনী তুলে তাকে শাসন করে, কিন্তু যদিই অন্তর্যামী কেউ থাকেন, তাহ'লে হয়ত বা তিনি তার জন্যে ব্যথিতই হন, তাঁরও হয়ত বা করুণার অশ্রুজলই ঝরে।

৬

নূতন কাপড়-জামা পরিয়ে, ছেলেমেয়ের মুখে নূতন একটা আলোক, নূতন একটা হাসির দীপ্তি দেখে মমতার অনেক দিনের একটা ব্যর্থ আশা পূর্ণ হয়েছিল। তার আনন্দই হচ্ছিল। তবুও কি-একটা কাল মেঘ তার বুকের ভিতর এমন ঘনিয়ে এসেছিল যে, সে ভাল করে কথা কইতেও পারছিল না।

আজ নিয়ে দুদিন অনাথ বাড়ীতে অনুপস্থিত। অন্য সময় হ'লে তার উদ্বেগের আর সীমা থাক্‌ত না, আজ কিন্তু তার মনে হচ্ছিল, এ ভাল। সে এখন আরও খানিকটা না আসে যেন।

অথচ মনে মনে স্বামীকে সে যে কি পর্য্যন্ত চাইছিল, তা নিজের অগোচর অন্ততঃ ছিল না।

সারাদিন সে মুখ বুজে জীর্ণ বাড়ীখানির আগাগোড়া ধোয়া-মোছা করল। যা যা জিনিষ অনাথ খেতে ভালবাসে পরিপাটি করে রাঁধলে। অর্থাভাবে এ-সাধ তার অনেক দিন পূর্ণ হয়নি।

বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় সাবান দিয়ে কেচে ধপ্‌ধপে করে শয্যা পেতে রাখল।

ছোট একখানি খাতায় খুচরা দেনা শোধ, বাজার দেনা শোধ, বাকী বাড়িভাড়া শোধ ইত্যাদি নানা ব্যয়ের হিসাব লিখে রাখল। একটা মোটা কাপড় জড়ান এক তাড়া নোট প্রায় দেড় হাজার টাকার, তারই উপর বড় বড় করে লিখল, 'তোমার পিতৃঋণ শোধের জন্য!' এ ভালই হ'ল। সে তার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়জনদের জন্য প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় সম্ভ্রম বলি দিয়েছে। নইলে যে তারা সে তার নারী-মহিমার ঘাড় মুচড়ে চিরদিনের মত তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। আর এর পর হয়ত কোনোদিন নিজের কোনো অন্যায় কাজেই সে বাধা দিতে পারবে না। সমস্ত গৃহ-কোণ জানালা দেয়াল কড়িকাঠ যেন আজ স্তব্ধ চোখে তার মুখের দিকে চেয়েছিল।

অসীম মমতায় সে এই আত্মীয় স্বজনশূন্য, শত দুঃখের নিলয়, শত ব্যথার স্মৃতি মাখানো বাড়িখানির প্রতি আগাগোড়া বার বার চেয়ে দেখতে লাগল।

তুলসীতলায় দীপ জেলে দিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করবার সময় বলল, "প্রভু এ অপরাধিনীকে তার যাবার দিনে তুমি মার্জ্জনা কোরো।"

ছেলেমেয়ে বার বার প্রশ্ন করতে লাগল, "কোথায় যাবে মা আজ? কই তুমি কাপড় পরলে না?"

সে তাদের কি করে বোঝাবে যে এ যাওয়ার তার কত প্রয়োজন অথচ কত শক্ত! কত দুঃখ, কত ব্যথা, কত স্মৃতির ডোর ছিন্ন করা তা তারা কি বুঝবে?

এই শত পাকে জড়ান শত দুঃখের জীর্ণ বাড়িখানা, নিত্য অভাবরাক্ষসীর তাড়নাকে ছাড়তেও আজ তার দুঃখের অবধি ছিল না।

রাত্রি হ'ল। সকল ঘরে আলো জেলে দিয়ে উঠানের মাঝে একটা আলো রেখে সে অসীম স্নেহের চোখে এই বাড়িখানার ছাদ হতে নীচে পর্য্যন্ত দেখতে দেখতে কেঁদে ফেলল। এবাড়ি তার নিজের নয়। তার শ্বশুরেরও নয়। ভাড়া বাড়ি মাত্র। তবু এই বাড়িতেই সে প্রথম নববধূ রূপে পদার্পণ করেছিল। এটি তার ঘর। এই ঘরেরই পাশের ঘরে তার শাশুড়ী মারা যান।

শাশুড়ী মারা যাবার সময় তার হাত দুটি ধরে তিনি বলে গিয়েছিলেন, "বৌমা! অনাথ আমার আজ সত্যিই অনাথ হ'ল। তুমি তাকে দেখো-শুনো। সে অন্যমনস্ক ভারি সরল, রোজগার করতে পারুক-না-পারুক তুমি তাকে গঞ্জনা দিও না। সংসার ঘাড়ে পড়লে আপনিই সব শিখবে। সে অনুরোধ সে একদিনও অবহেলা করেনি। একে একে সর্ব্বস্ব সে তাঁদের অনাথের হাতে তুলে দিয়েছে, তবু কোনো দিন মুখ ফুটে বলেও নি যে,

এরকম করে রোজ রোজ গয়না বিক্রী ত আর আমি করতে পারি না।”

শ্বশুরও মারা গিয়েছিলেন এই তুলসীতলায়। তিনিও মারা যাবার সময় তাকে বলে গিয়েছিলেন, “মা, আমি তোমাদের অকূলে ফেলেই চললাম। তবু ভগবান আছেন, তাঁর মঙ্গলবিধানে অমঙ্গল হতেই পারে না। অনাথ এখন যাই করুক, সংসার ঘাড়ে পড়লে সবই শিখবে। তাকে কিছু বল্‌তে হবে না।”

তা সে তাঁদের দুজনের অনুরোধই জীবনভোর প্রতিপালন করেছে। তাঁরা দুজনে তাঁদের অনাথের দিক্‌টাই দেখেছিলেন, কিন্তু রক্তমাংসে গড়া ক্ষুধাতৃষ্ণার অধীন এই বধূর দিকে তাঁদের একটুও দৃষ্টি ছিল না, বল্‌লে কি খুবই অত্যুক্তি করা হয়? অথচ তখন তার কতই বা বয়স!

সবে ষোল বৎসর মাত্র। অনেক বাসনা-কামনা তখন তার হৃদয়ের প্রতি রন্ধ্রে পোরা।

তবুও সে নিজের জীবনের ব্যর্থতায় বেশী কষ্ট পায় নি। কিন্তু সন্তানের জননী হয়ে তার একি কষ্ট! একি দুঃখ! একি সমস্যা! অথচ ঐ ছেলে দুটি না হ'লে সে বাঁচত বা কি করে? এত দুঃখঝঞ্ঝা সইত কি করে, যদি না ঐ শিশু তার বর্ম্মের কাজ করত? পৃথিবীর কঠিনতম বন্ধনে তারা তাকে বেঁধে রেখেছে যে!

ঐ যে তার ঘর, ঐ কড়িকাঠগুলি কত মুখর কলরব, কত উচ্ছল আনন্দ, কত নীরব ব্যথা, কত অশ্রুজলের মৌন সাক্ষী।

যদি আজ তাদের ভাষা ফুটত, তা হ'লে হয়ত তারা সমস্বরে চেঁচিয়ে বলত,—“মমতা—মমতা—তুই যাস্‌নে—যাস্‌নে।”

৭

ঘরের মাটি বুক দিয়ে আঁকড়ে মমতা খানিক পড়ে রইল। শত শত বন্ধনে এ বাড়ীর ঘরদ্বার আজ তাকে টান্‌ছে—তবু তাকে যেতে হবেই।

যে স্বামীর উপর এতদিন বিতৃষ্ণার অবধিও ছিল না—আজ তাঁরই উপর করুণা তাকে সব চাইতে বাধা দিতে লাগল। আজ তাঁরই উপর দুকূল ছাপিয়ে যে সব ভালবাসা-প্রীতির বান এসে পড়ল, এতদিন তারা ছিল কোথায়?

নিত্য অভাব, নিত্য দুঃখ, নিত্য যাতনার মধ্যে কি তার অন্তরের এই এত বড় ভালবাসার বহ্নিও চাপা পড়ে গিয়েছিল? অথচ আজ যখন সে সবই পরিত্যাগ করে স্বামীর ঋণসুদ্ধ পরিশোধের ব্যবস্থা করে ফেলেছে, তখন এই চিরদিনকার ভুলে থাকা—ভুলে যাওয়া ভালবাসার বহ্নি দাউদাউ করে জলে উঠ্‌ল কেন? কি তার প্রয়োজন ছিল?

আজ সেই বহ্নির দাহে তার যে মনে হচ্ছে, শত দুঃখ, শত লাঞ্ছনা, শত শত কষ্ট অনাদর সহ্য করে থাকাও এর চাইতে ভাল। এমন করে পরিত্যাগ করে যেতে সে এই বদ্ধ অন্ধ বধির সমাজকেও পারছিল না।

শত কষ্টের ভিতরও তার চিরচেনা গৃহস্থালী তার চিরদিনকার পিতামহী মাতামহীর সংস্কার—নারী-জীবনের প্রধান স্বর্গ—তাকে দুর্ব্বার আকর্ষণে টানছিল।

কিন্তু যতই হোক, সন্তান-হত্যা সে জননী হয়ে করে কি করে? তাদের মৌনভাষার আবেদন তিলে তিলে দিনে দিনে অগ্রাহ্য সে করবে কি করে?

তাকে যেতে হবেই জমিদার-পুত্রের জমিদারীতে থিয়েটারের অভিনেত্রী হয়ে। সম্পূর্ণ অজানা এক গন্তব্য পথ মাত্র তার সাম্‌নে, আর কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না।

রাত্রি প্রায় বারোটা বাজল। দ্বারে একটা গাড়ী দাঁড়াবার শব্দ হ'ল। মমতা চমকে উঠল। একবার এই ইট কাঠ দিয়ে তৈরী বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখল। তারপর ঘুমন্ত ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সব দ্বিধা জোর করেই ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল।

স্বামীর আহার্য্য গুছিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে সাংসারিক আয়ব্যয়ের খাতাখানি বিছানার উপর রাখল। তারই উপর আঁচলের রিংসুদ্ধ চাবির থলোও রেখে দিল, এ যেন সমস্ত গৃহিণীপনার হিসাব-নিকাশ শোধ করে তারই পদত্যাগের নোটীশ-পত্র!

শত তালিবিশিষ্ট শতছিদ্র স্বামীর বহু ব্যবহৃত পুরানো মলিন জুতো জোড়াটার ধূলি ঝেড়ে মাথায় দিয়ে

সে ছেলে কোলে নিয়ে মেয়ের হাত ধরে ঘর হ'তে বাহির হয়ে এল।

তখন তারার স্বরভরা অনন্ত আকাশ তার মুখের দিকে অনন্ত ভাষা-ভরা চাউনি মেলেই চেয়েছিল।

*   *   *

শিয়ালদহ ষ্টেশনে ছোট একখানা ইণ্টার ক্লাস কামরার মধ্যে মমতা খোকাকে কোলে নিয়ে বসেছিল। শিউলি মার ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিল। কোলের ছেলেও নিদ্রিত। রুক্ষ ঘনকৃষ্ণ অযত্ন-রক্ষিত কুণ্ডলীকৃত কবরীটায় মাথার কাপড়টা অর্দ্ধস্খলিত হয়েও আট্‌কে গিয়েছিল। জনতার আসা যাওয়া, ফিরিওয়ালার কলরব, লোকদের উঠানামা, এই সবের মধ্যে নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে মমতা নিজের বাড়ীখানার কথাই মনে মনে ভাবছিল।

এতক্ষণ নিশ্চয় তার স্বামী সেখানে ফিরেছেন, সদর-দ্বার খোলা দেখে হয়ত অবাক হয়ে গিয়েছেন, কি-কি। নিজের ঘরে তালাবন্ধ তাও তাঁকে হয়ত কম বিস্মিত করেনি। দুই একবার বোধ হয় তিনি তাকে রান্নাঘরে খুঁজে এসেছেন। খোকাকে শিউলিকে হয়ত বারে বারে ডেকেছেন। শেষে তালা ভেঙে ঘরে ঢোকা স্থির ক'রে হয়ত ঢুকে পড়েছেন। সেখানে সে বিছানা পেতে আলো জেলে, খাবার রেখে এসেছে; তাঁর অসুবিধা আজ অন্ততঃ কিছু হবে না।

কিন্তু—যদি তাকে গৃহত্যাগিনী জানতে পেরে, তিনি তার স্বহস্ত-প্রস্তুত খাদ্য, স্বহস্ত-রচিত শয্যা—স্পর্শও না করেন?

সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে মমতার একটা লজ্জার ঝড় বয়ে গেল। দাঁত দিয়ে অধর দংশন ক'রে সে একটা বিপুল ক্রন্দনোচ্ছ্বাসকে চাপতে লাগ্‌ল।

ট্রেন বংশীধ্বনি করে ছাড়ল। চলতি গাড়ীর সামনে ছুটতে ছুটতে নরেন্দ্র বলে গেল, "আমি পাশের গাড়ীতেই আছি। তোমার কিছু ভয় নেই।"

*   *   *

অসীম মমতা ব্যথা মাখা চাউনি মেলে গাড়ীর জানালার পথে অসীম আকাশ তার মুখের দিকেই চেয়ে ছিল।

স্বপ্ন দেখে খোকা কেঁদে উঠ্‌ল। তাকে জড়িয়ে ধরে এতক্ষণ বাদে একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করে মমতা বলল, 'ষাট'!

বঙ্গলক্ষ্মী

শ্রীগোপাললাল দে

তোমারে হেরেছি রোগে, শয্যাপার্শ্বে জাগর যামিনী,
জাগিছ নিস্পন্দ বক্ষে; হেরিয়াছি পুনঃ স্বামিহীনা,
পালিছ অনাথ পুত্রে; অসহায়া, নিঃস্বা, একাকিনী,
কঠোর সংযম পুণ্যে দীপ্তরুচি, শুচিকায়া, ক্ষীণা।
সতত ত্বরিত-পদ, উদাসীন নিজ সুখ পানে,
দেখেছি ভগিনীরূপে, সখিরূপে প্রেয়সী কল্যাণী,
ব্যস্ত আছ অবিরত গৃহস্থের মঙ্গল-বিধানে;

সেদিনও চিতায় বসি হাসিমুখে তব পিতামহী,
স্বর্ণ-দেহ দেছে ডালি অযোগ্যের প্রেমের স্মরণে;
নন্দিনী দুহিতা রূপে আমাদের গৃহে গৃহে রহি',
বাজাও মঙ্গল-শঙ্খ জ্বালো দীপ তুলসী-চরণে।

অত্যাচারী, তারও পরে রাখিয়াছ প্রেম অধিকার,

পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু শ্রীযুত হরিহর শেঠ মহাশয়ের পত্রে রাখালদাসের অকালমৃত্যুর জন্য চন্দননগরে শোক-সভার উদ্যোগের সমাচার পাইয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। রাখালদাস ভারতের পুরাতত্ত্ব-সেবকগণের অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পেশাদার পুরাতত্ত্ব-সেবক ছাড়া, অপর সাধারণের পুরাতত্ত্বকথা বা পুরাতত্ত্ব-সেবকের কথা লইয়া মাথা ঘামাইবার অবকাশ কোথায়!

এ দেশের শিক্ষিত যুবক-বৃদ্ধ-বনিতা এখন ভবিষ্যতের ইতিহাস স্বহস্তে গড়িয়া তুলিতে একান্ত বিব্রত। এই গঠনকার্য্য আবার যেভাবে চলিতেছে, তাহাতে অতীতের সহিত সম্বন্ধরক্ষার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। এই অভিনব সৃষ্টিলীলার এক বিভাগের কাজ হইতেছে—অতীতের প্রধান কীর্ত্তি, বর্ত্তমান সভ্যতার বেড়াজাল হইতে সমাজকে মুক্ত করিয়া আদিম অকৃত্রিম অবস্থায়, যে অবস্থায় রাণী সুতা কাটিতেন এবং রাজা গরু চরাইতেন—when Adam delved and Eve span—সেই অবস্থায় টানিয়া লইয়া যাওয়া; অপর বিভাগের কাজ টাট্‌কা পাশ্চাত্য আদর্শে স্বহস্তে ভবিষ্যতের স্বরাষ্ট্র নির্ম্মাণ। এইরূপ গড়ন কখনও বিনাযুদ্ধে হয় নাই, সুতরাং বর্ত্তমান সময়কে যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় বলিয়া কথিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ স্কচ্ সাহিত্যিক টমাস্ কার্লাইলের জন ষ্টার্‌লিং নামক একজন প্রিয় বন্ধু ছিলেন। ষ্টারলিং কবিতা রচনা করিতে ভালবাসিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়, চতুর্থ দশাব্দে ইংলণ্ডে গমের আমদানীর উপর যে কর ছিল (Corn Law), তাহা রহিত করিয়া দিবার জন্য যখন ঘোরতর আন্দোলন এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা চলিতেছিল, তখন কার্লাইল ষ্টারলিংকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "যখন গ্রীক-সেনা ট্রয় নগর অবরোধ করিয়া বসিয়াছিল, তখন যেমন ইউলিসিসের মত ট্রয় নগর অধিকার করিতে সমর্থ সুচতুর সেনাপতির প্রয়োজন ছিল, হোমারের মত কবির বা ভাটের কোনো প্রয়োজন ছিল না, তেমনই বর্ত্তমান গোলযোগের সময় কবির প্রয়োজন নাই, যোদ্ধা চাই। সুতরাং তুমি কবিতা রচনা ছাড়িয়া আন্দোলনে যোগদান কর।" বর্ত্তমান উত্তেজনার সময়েও আপনারা যে একজন মৃত ঐতিহাসিকের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার জন্য সমবেত হইতে পারিয়াছেন, তাহার একটি কারণ বোধ হয়, চন্দননগর বৃটিশ-সীমান্তের বাহিরে।

শিক্ষিত ভারতবাসী এখন স্বহস্তে স্বরাষ্ট্র গড়িতে একান্ত বিব্রত। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উপাদান মানুষ। মানুষরূপ ইষ্টকরাশিকে পরস্পরের সহিত সুদৃঢ়রূপে বদ্ধ রাখিবার মশলা—দেশানুরাগ প্রভৃতি উচ্চ আদর্শ। কিন্তু স্থায়ী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে হইলে স্থপতিকে ইট এবং মালমশলা ছাড়া অন্য বিষয়েও দৃষ্টি রাখিতে হয়। প্রথমেই তাঁহাকে ভিতের মাটি পরীক্ষা করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে হয় সেই মাটি প্রাসাদের ভার সহিতে পারিবে কি না; স্থানীয় জল, বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, জলবায়ুর সংস্পর্শে ইটে লোনা ধরিবে কি না। সেইরূপ যে জননায়ক দৃঢ়ভিত্তির উপর সুদৃঢ়ভাবে স্বরাষ্ট্র গড়িতে চাহেন, তাঁহাকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, দেশের মাটি, দেশের জলবায়ু দেশের ফল ফসল (physical environment) দেশের লোক-চরিত্রের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। মানব-প্রকৃতির উপর বাহ্যবস্তুর প্রভাব একদিনে কার্য্যকরী হয় না, দীর্ঘকালের সংযোগের ফলে ধীরে ধীরে ফলোৎপাদন করে। এ দেশের জলবায়ু, ফলফুল এই দেশবাসীর স্বভাবকে অন্য দেশের লোকের তুলনায় কতটা বিভিন্ন করিয়া তুলিয়াছে, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে ইতিহাসের অনুশীলন করা আবশ্যক। মানবের অদৃষ্ট-চক্রের উপর আরও একটি শক্তির বিশেষ প্রভাব আছে।

এই শক্তি বংশধারা (heredity)। আমাদের ধমনীতে যে বংশের এবং যে জাতির রক্ত প্রবাহিত হইতেছে তাহা আমাদিগকে কিরূপ সামর্থ্য দান করিয়াছে, ইহাও হিসাব করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া উচিত। এই হিসাব করিতে হইলেও ইতিহাসের শরণাগত হইতে হইবে। যে জননায়ক জনসাধারণের ধাত এবং ইতিহাস উপেক্ষা করিয়া নবরাষ্ট্র গড়িতে যাইবেন, তিনি কাগজে কলমে অভিনব ইউটোপিয়ার চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে স্থায়ী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এ দেশের লোক যখন একথা বুঝিতে পারিবেন, তখন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, আজ আমরা যাঁহার অকালমৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিবার জন্য মিলিত হইয়াছি, সেই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কত বড়লোক ছিলেন এবং দেশের জন্য তিনি কত কাজ করিয়া গিয়াছেন।

একটি লাটিন প্রবাদ আছে যাহার অর্থ—'Poet is born, not made', কবি তৈয়ার করা যায় না, কবিত্ব জন্মগত। প্রকৃত পুরাতত্ত্ববিদ্ও কোনো শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা তৈয়ারী করা যায় না, শিক্ষাদীক্ষার মূলে জন্মগত প্রবৃত্তি, জন্মগত প্রতিভা থাকা চাই। রাখালদাস এইরূপ প্রবৃত্তি, এইরূপ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাখালদাস আমাকে বলিয়াছিলেন, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন তিনি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন, তখন শাস্ত্রী-মহাশয়ের উপদেশের ফলে তাঁহার মনে পুরাতত্ত্ব অনুশীলনের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল। শাস্ত্রী-মহাশয়ের ক্লাশে অনেক ছাত্র পড়িয়া গিয়াছেন, অনেকে তাঁহার উপদেশ শুনিয়া বিশেষ সুখ্যাতির সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু সেখান হইতে একটি বই দু'টি রাখালদাস বাহির হয় নাই। অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকারের নিকট শুনিয়াছি, বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজ পরিত্যাগের পূর্ব্বেই পুরাবিদ্যা শিক্ষার জন্য রাখালদাস ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের পুরাবস্তু-বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার থিওডোর ব্লকের শরণাগত হইয়াছিলেন। থিওডর ব্লক যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন রাখালদাস ছায়ার মত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। রাখালদাস বরাবরই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন, পুরাতত্ত্ব বিষয়ে যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং থিওডর ব্লকের নিকট ঋণী। ১৯০৫ সালে অধ্যাপক ভাণ্ডারকার যখন ব্লকের স্থানে কিছুদিনের জন্য মিউজিয়মে কাজ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি রাখালদাসের সংগৃহীত ফটোগ্রাফাদি উপকরণ পরীক্ষা করিয়া এবং পুরাবিদ্যা অর্জ্জনের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তখন হইতেই রাখালদাস শক-কুষাণ যুগের ইতিবৃত্ত অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ডাক্তার থিওডর ব্লকের পরলোকগমনের অল্পকাল পরে, ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে, দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয় আমাকে রাখালদাসের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সময় ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে রাখালদাস, শরৎকুমার প্রভৃতি কর্ম্মিগণ সাহিত্য-পরিষদের রমেশভবনের জন্য পুরাবস্তু সংগ্রহ করিতেছিলেন। সেই সংগ্রহকার্য্যের প্রাণস্বরূপ ছিলেন রাখালদাস। পর বৎসর, কতক পরিমাণে রাখালদাসের পরামর্শানুসারেই কুমার শরৎকুমার আমাদিগকে লইয়া বরেন্দ্রের ভগ্নাবশেষ পর্য্যবেক্ষণ এবং পুরাবস্তু সংগ্রহ আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথম যাত্রায় রাখালদাসও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সংগৃহীত বস্তু ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে এবং সাহিত্য-পরিষদে প্রেরিত হইবে, কিংবা রাজসাহীতে রক্ষিত হইবে, ইহা লইয়া আমাদের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় আমরা স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম। স্বর্গীয় নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সহিত মানসী পত্রিকার যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহারও মূলে রাখালদাস ছিলেন।

রাখালদাস ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় অনেক প্রবন্ধ, অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুইখানি বৃহৎ ইংরেজি গ্রন্থ—উড়িষ্যার ইতিহাস এবং প্রাচ্য ভারতের মধ্যযুগের ভাস্কর্য্যের বিবরণ, এখন যন্ত্রস্থ। এই সকল রচনার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দিবার অবকাশ আমার নাই। কিন্তু পুরাবৃত্তকার রূপে রাখালদাসের যে একটি অতি মহৎ গুণ ছিল, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। এ দেশে এখন অনেকেই প্রাচীন ইতিহাসের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। অধিকাংশ স্থলেই দেশের অতীত কালের গৌরব-কাহিনীর কীর্ত্তন ইতিহাস-চর্চ্চার লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হয় এবং সেই সুরেই ইতিহাস সঙ্কলিত হয়। কিন্তু এই হিসাবে ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে,সত্যের মর্য্যাদার হানি হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। জাতীয় জীবনে গৌরবকর, অগৌরবকর এবং মামুলী সকল প্রকার ঘটনাই অবশ্য ঘটিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ইতিহাসে কেবল গৌরবকর ঘটনার বিবরণের স্থান দিতে গেলে তাহা একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট হইয়া যায় এবং স্থলবিশেষে সত্যের অপলাপও ঘটিতে পারে। রাখালদাস সত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ইতিহাস সঙ্কলন করিতে গিয়া কোনো পক্ষের ওকালতী করা বা কোনো মত প্রচার (propaganda) করা তিনি কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেন না। পাল-যুগের শেষভাগে রচিত সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' নামক ঐতিহাসিক কাব্যে এবং কামরূপ-রাজ বৈদ্যদেবের কমৌলীতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে বরেন্দ্র দেশকে পাল-রাজবংশের আদিনিবাস স্থান, অর্থাৎ পাল-রাজগণ বাঙ্গালী ছিলেন এইরূপ কথিত হইয়াছে। পালবংশের রাজ্যলাভের প্রায় তিনশত বৎসর পরে সঙ্কলিত এই বিবরণ যে নির্ভরযোগ্য একথা রাখালদাস অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মৌর্য্য ও শুঙ্গ যুগের ভারতীয় শিল্পে পাশ্চাত্য প্রভাব আছে কি না, এই কথা লইয়া একদিকে এদেশী এবং অপর দিকে বিদেশী পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেক দিন ধরিয়া বাদ-বিবাদ চলিতেছে, অনেক এদেশী পুরাবিদেরই মত পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষে কোনো ভাল জিনিষের উৎপত্তি স্বীকার করা কষ্টকর মনে করেন বলিয়াই প্রাচীন-ভারত শিল্পে পাশ্চাত্য প্রভাব দেখিতে পান। রাখালদাস এই প্রকার বাদ-বিবাদে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না।

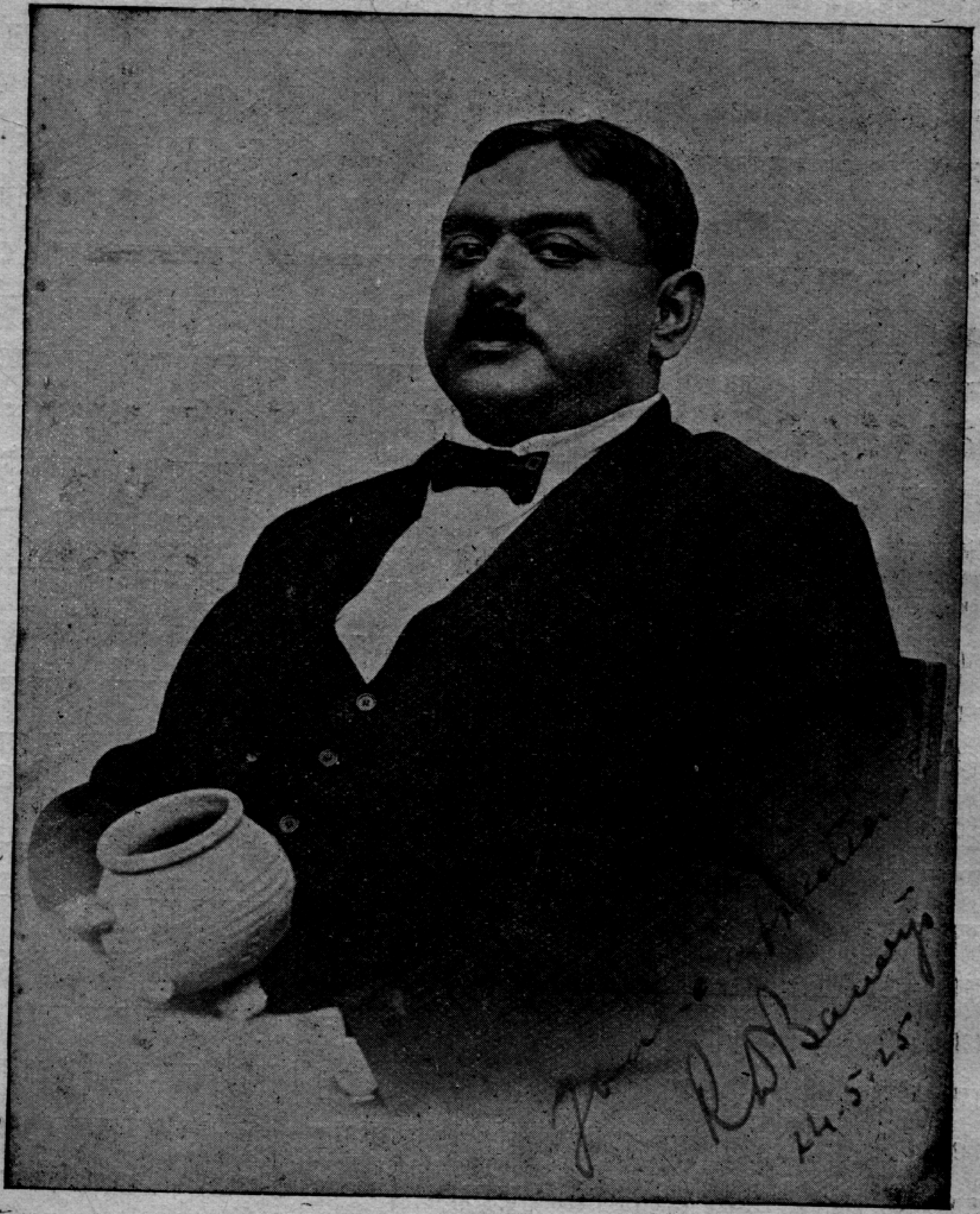

পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনি যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেন। স্বয়ং বন্দ্যঘটীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ হইয়াও আদিশূর যে বন্দ্যঘটীয়গণের বীজপুরুষকে কান্যকুব্জ হইতে আনিয়া বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কেবল কুলপঞ্জিকার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া রাখালদাস একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এইরূপ সকল প্রকার সংস্কারবর্জ্জিত বিশুদ্ধচিত্তে সত্যের সাধন আমাদের দেশের ঐতিহাসিকসমাজে সুলভ নহে।

রাখালদাসের প্রধান কীর্ত্তি, রাখালদাসের অক্ষয় কীর্ত্তি—মহেন-জো-দড়োতে অতি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতার নিদর্শনের আবিষ্কার। রাখালদাসের মহেন-জো-দড়োতে ভগ্নস্তূপ খননের পূর্ব্বেই হরপ্পায় এই শ্রেণীর পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল বস্তু যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন তাহা রাখালদাসই প্রথম অনুমান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তিনিই তৎপ্রতি পুরাতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। রাখালদাসের আবিষ্কারের গুরুত্ব বুঝিতে হইলে তাহার প্রাচীনতা বিবেচ্য। এই আবিষ্কারের পূর্ব্বে বৈদিক সাহিত্য ছাড়া অবিসম্বাদিত রূপে মৌর্য্য যুগের পূর্ব্বকালের উন্নত সভ্যতার কোন নিদর্শন আমাদের হস্তগত ছিল না। এই আবিষ্কার হিন্দুসভ্যতার ইতিহাসকে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০০ অব্দ হইতে এক ধাক্কায় খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০০০ অব্দে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। হরপ্পায় এবং মহেন-জো-দড়োর ভগ্নাবশেষ যে অতি প্রাচীন তাহার এক প্রমাণ এই ভগ্নাবশেষের মধ্যে লোহার চিহ্নও পাওয়া যায় নাই, কেবল ফ্লিণ্ট পাথরের ছুরি এবং তামার তৈয়ারী অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে যুগে মানুষ লোহার অস্তিত্ব অবগত ছিল না, লোহার অভাবে তামার অস্ত্র ব্যবহার করিত, এবং যে যুগ, তামা আবিষ্কারের পূর্ব্বে ব্যবহৃত পাথরের অস্ত্রও একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই, হরপ্পার এবং মহেন-জো-দড়োর ভগ্নস্তূপ সেই অতি প্রাচীন পাষাণ-যুগের এবং তাম্রযুগের সন্ধিক্ষণের সভ্যতার পরিচায়ক। খৃষ্টাব্দের হিসাবে এই সভ্যতার বয়ঃক্রম কত তাহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। হরপ্পায় এবং মহেন-জো-দড়োতে অপরিচিত অক্ষরের লেখাযুক্ত বহুসংখ্যক সচিত্র মোহর (seal পাওয়া গিয়াছে। অনেক দিন পূর্ব্বে ঠিক এই প্রকার একটি মোহর পারস্যের অন্তর্গত সুসার ভগ্নাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল এবং আর একটি মোহর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত কিশের ভগ্নাবশেষ খনন-কালে পাওয়া গিয়াছে। এই দুইটি মোহর যে সুসায় এবং কিশে তৈয়ারী হয় নাই, কিন্তু হরপ্পা—মহেন-জো-দড়ো অঞ্চল হইতে তথায় নীত হইয়াছিল, এই প্রকার সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য। সুসার এবং কিশের ভগ্নস্তূপের যে স্তরে এই সিন্ধুদেশীয় মোহর আবিষ্কৃত হইয়াছিল, নানা প্রমাণের বলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ সেই স্তরের সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০০০ অব্দ। সিলমোহর ছাড়া অন্যান্য বস্তুও মেসোপটেমিয়ার ভগ্নস্তূপনিচয়ের ঐ একই স্তরে পাওয়া গিয়াছে যাহা খুব সম্ভব সিন্ধুদেশ হইতে সেখানে আমদানী করা হইয়াছিল। ঋক্ বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির রচনা-কাল লইয়া পণ্ডিত-সমাজে বিস্তর মতভেদ থাকিলেও, মহেন-জো-দড়ো এবং হরপ্পা নগরী যে খৃষ্টাব্দের আরম্ভের ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, এই বিষয়ে মতভেদের অবকাশ নাই। সেই সময় এই নগরীদ্বয়ের সভ্যতা নিকটবর্ত্তী দেশের সভ্যতার তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছিল। সুতরাং এ সভ্যতাকে ধার করা সভ্যতা অথবা আগন্তুক-গণের আনীত সভ্যতা বলা যায় না; এই সভ্যতা সিন্ধু-নদের তীরেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল। মহেন-জো-দড়ো এবং হরপ্পার সভ্যতা যেমন প্রাচীন, তেমনই উন্নত ছিল, একথাও সর্ব্ববাদিসম্মত। এই সমুন্নত সভ্যতা যখন আমদানী করা নয়,—দেশজ, তখন স্বীকার করিতে হইবে, আনুমানিক ছয় সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধু-তীরে সভ্যতার সূত্রপাত হইয়া থাকিবে। পক্ষান্তরে টাইগ্রিস্ এবং ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরে যে সুমেরীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা দেশজ নহে, আগন্তুকগণের আনীত। এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, সুমেরীয় সভ্যতা কি সিন্ধুদেশ হইতে গত ঔপনিবেশিকগণের সৃষ্টি? প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুদেশের সভ্যতা এবং

সুমেরীয় সভ্যতায় কোনো কোনো বিষয়ে এত প্রভেদ আছে যে, পণ্ডিতেরা এই দুই সভ্যতার মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা আপাতত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারতবর্ষের পশ্চিম-সীমান্তের বাহিরে, অথচ ভারতবর্ষেরই নিকটে, হয়ত বেলুচিস্থান অথবা সিস্তানে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার যাহা মূল, তাহা রোপিত হইয়াছিল। সেই মূল হইতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহার এক কাণ্ড সিন্ধুনদের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং আর এক কাণ্ড টাইগ্রিস্ এবং ইউফ্রেটিস নদের তীরদেশে পৌছিয়াছিল।

সিন্ধু-তীরের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার উৎপত্তি অপেক্ষা পরিণতির প্রসঙ্গ আমাদের কাছে অধিকতর শিক্ষাপ্রদ। সুমেরীয় সভ্যতার মূল ধারা এবং মিশরীয় সভ্যতার মূলধারা বহুকাল শুকাইয়া গিয়াছে। সিন্ধু-তীরের সভ্যতার মূলধারাও কি সেই দশাই প্রাপ্ত হইয়াছে? না, হিন্দু-সভ্যতার আকার ধারণ করিয়া আজও প্রবহমান আছে? গত বৎসরে প্রকাশিত একখানি পুস্তকে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, সিন্ধু-তীরের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা, বর্ত্তমান হিন্দু-সভ্যতার অন্তরালে এখনও জীবিত রহিয়াছে, অর্থাৎ হিন্দু-সভ্যতা মূলতঃ সিন্ধু-তীরের প্রাচীন সভ্যতা। রাখালদাসের আবিষ্কারের ফলে ঐতিহাসিক চিন্তা-স্রোত এখন কোন্ খাতে চলিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য একথাটা একটু খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক মনে করি। রাখালদাসের পরে যাঁহারা মহেন-জো-দড়ো খনন করিয়াছেন তাঁহারা কতকগুলি পাথরের মূর্ত্তি পাইয়াছেন, যে-সকল মূর্ত্তির অঙ্গ-ভঙ্গী এবং মুখভঙ্গী হুবহু হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত ধ্যানযোগীর মুখভঙ্গীর মত। ভগবৎ গীতায় (৬।১১-১৪) উক্ত হইয়াছে—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থির।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥

মহেন-জো-দড়োর এই সকল মূর্ত্তির হাত-পা ভাঙিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে অংশ অবশিষ্ট আছে তাহাতে 'সমং কায়শিরোগ্রীবং' এবং নাসিকাগ্রবদ্ধদৃষ্টি পরিষ্কার বিদ্যমান রহিয়াছে। মহেন জো-দড়োতে প্রাপ্ত কোনো কোনো মোহরে যোগীর মত পদ্মাসনবদ্ধপদে উপবিষ্ট মনুষ্যের চিত্রও অঙ্কিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও এইরূপ মূর্ত্তি বা চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষে যত দেব-দেবীর এবং বুদ্ধ বা জিনের মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে তাহার সকল-গুলিই নাসিকাগ্রবদ্ধদৃষ্টি। ইহার কারণ হিন্দুর উপাসনাকাণ্ড এক হিসাবে যোগীর পূজা। বুদ্ধ এবং জিনগণ ধ্যানস্থ বা যোগযুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বৈষ্ণবের বিষ্ণু এবং শৈবের শিবও যোগীর আকারে কল্পিত। তাই বুদ্ধ ও জিন মূর্ত্তির ন্যায় হিন্দুর ইষ্টদেবতার মূর্ত্তিও নাসিকাগ্রবদ্ধদৃষ্টি। যে ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষণে শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ এবং জৈন মূর্ত্তির সহিত মহেন-জো-দড়োর মূর্ত্তির এমন ঐক্য দেখা যায়, সেই ক্ষেত্রে এই দুই শ্রেণীর মূর্ত্তির মধ্যে যে একটা নিকট সম্পর্ক আছে, এ কথা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মহেন-জো-দড়োর অধিবাসিগণের মধ্যে কোনো এক প্রকার যোগসাধন এবং যোগস্থ দেবতার বা সাধুর উপাসনা প্রচলিত ছিল, যাহা কালক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্মের প্রাণবস্তুতে পরিণত হইয়াছে।

রাখালদাসের মহান্ আবিষ্কার যে মানবের ইতিহাস এবং সমাজ-বিজ্ঞানকে উন্নতির পথে কতদূর লইয়া যাইবে তাহা এখন অনুমান করা দুঃসাধ্য। ভবিষ্যতে এই সকল বিদ্যার যতই অনুশীলন হইবে, রাখালদাসের স্মৃতির প্রতি পণ্ডিত-সমাজের শ্রদ্ধা ততই বাড়িতে থাকিবে। রাখালদাসকে আর আমরা সশরীরে দেখিতে পাইব না বটে, কিন্তু রাখালদাসের মৃত্যু নাই, রাখালদাস অমর। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

---

* ১৯৩০, ৭ই জুন তারিখে চন্দননগর পুস্তকাগারের উদ্যোগে নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে শোকসভায় সভাপতির নিবেদন।

মুসাফীর

জসীম উদ্‌দীন

চলে মুসাফীর গাহি,
এ জীবনে তার ব্যথা আছে শুধু ব্যথার দোসর নাহি।
নয়ন ভরিয়া আছে আঁখিজল, কেহ নাই মুছাবার,
হৃদয় ভরিয়া কথার কাকলী, কেহ নাই শুনিবার।
চলে মুসাফীর নির্জ্জন পথে, দুপুরের উঁচু বেলা,
মাথার উপরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া করিছে আগুন-খেলা।
দুধারে উধাও বৈশাখ মাঠ, রৌদ্রেরে বুকে চাপি,
ফাটলে ফাটলে চৌচির হয়ে করিতেছে দাপাদাপি।
নাচে উলঙ্গ দমকা বাতাস, ধূলার বসন ছিঁড়ে,
ফুঁ দিয়ে ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালায় মাঠের ঢেলারে ঘিরে।
দূর পানে চাহি হাঁকে মুসাফীর, আয় আয় আয় আয়,
কম্পন জাগে খর দুপুরের আগুনের হল্‌কায়।
তারি তালে তালে দুলে দুলে উঠে দুধারের স্তব্ধতা,
হেলে নীলাকাশ দিগন্তে বেড়ি বাঁকা বনরেখা-লতা।

চলে মুসাফীর দূর দুরাশার জনহীন পথপাড়ি,
বুকে করাঘাত হানিয়া সে যেন কি ব্যথা দেখাবে ফাড়ি।
নামে দিগন্তে দুপুরের বেলা, আসে এলোকেশী রাতি,
গলায় তাহার শত তারকার মুণ্ডমালার বাতি।
মেঘের খাড়ায় রবিরে বধিয়া নাচে সে ভয়ঙ্করী,
দূর পশ্চিমে নিহত দিনের ছিন্ন মুণ্ড ধরি।
রুধির লেখায় দিগন্ত ছায়, লোল সে রসনা মেলি,
হাসে দিগন্তে মত্ত ডাকিনী করিয়া রক্ত-কেলি।
চলেছে পথিক—চলেছে সে তার ভয়ঙ্করের পথে,
বেদনা তাহার সাথে সাথে চলে স্বরের ইন্দ্ররথে।
ঘরে ঘরে জ্বলে সন্ধ্যার দীপ, মন্দিরে বাজে শাঁখ,
গাঁয়ের ভগ্ন মসজিদে বসি ডাকে দুটো দাঁড়কাক।
কবরে বসিয়া মাথা কুটে কাঁদে কার বিরহিণী মাতা,
চলেছে পথিক আপনার মনে বকিয়া বকিয়া যা-তা।

চলেছে পথিক—চলেছে পথিক—কতদূর—কতদূর,
আর কতদূরে গেলে পরে সে যে পাবে দেখা বন্ধুর।
কেউ কি তাহার আশাপথ চাহি গণেছে বরষ মাস,
ধুঁয়ার ছলায় কাঁদিয়া কি কেউ ভিজায়েছে বেশবাস
কেউ কি তাহারে দেখায়েছে দীপ কোন গেঁয়ো ঘর হতে
মাথার কেশেতে পাঠায়েছে লেখা গংকিনী নদীসোঁতে?

চলেছে পথিক চলেছে সে তার ললাটের লেখা পড়ি,
সীমালেখাহীন পথ-মায়াবীর অঞ্চলখানি ধরি;
ঘরে ঘরে ওঠে মৃদু কোলাহল, বধূরা বঁধুর গলে,
বাহুর লতায় বাহুরে বাঁধিয়া প্রণয়-দোলায় দোলে।
বাঁশী বাজে দূরে সুখরজনীর মদিরা সুবাস ঢালি,
দীঘির মুকুরে হেরে মুখ রাত চাঁদের প্রদীপ জ্বালি।
নতুন বধূর বক্ষ জড়ায়ে কচি শিশু বাহু তুলি,
হাসিয়া হাসিয়া ছড়াইছে যেন মণি-মাণিকের ধূলি।
চলিছে পথিক—রহিয়া রহিয়া করিছে আর্ত্তনাদ,
ও যেন ধরার সকল সুখের জীবন্ত প্রতিবাদ।

রে পথিক, বল্, কারে তুই চাস, যে তোরে এমন করে,
কাঁদাইল হায়, কেমন করিয়া রহিল সে আজ ঘরে?
কোন্ ছায়াপথ নীহারিকাপারে, দেখেছিলি তুই কারে,
কোন্ সে কথার মাণিক পাইয়া বিকাইলি আপনারে!
কার গেহ ছায়ে শুনেছিলি তুই চুড়ির রিনিকি ঝিনি,
কে তোর ঘাটেতে এসেছিল ঘট বুড়াইতে একাকিনী!

চলে মুসাফীর আপনার রাহে কোন দিকে নাহি চায়,
দূর বনপথে থাকিয়া থাকিয়া রাত-জাগা পাখী গায়।
গগনের পথে চাঁদেরে বেড়িয়া ডাকে পিউ, পিউ কাঁহা,
সে মৌন চাঁদ আজো হাসিতেছে, বলিল না, উহু আহা।
বউ কথা কও—বউ কথা কও – কতকাল—কতকাল,
রে উদাস, বল্, আর কতকাল পাতিবি সুরের জাল!

সে নিঠুর আজো কহিল না কথা, রহস্য-যবনিকা,
খুলিয়া আজিও পরাল না কারো ললাটে প্রণয়-টীকা।
চলেছে পথিক চলেছে সে তার দূর দুরাশার পারে,
কোনো পথ বাঁকে পিছু ডাকে আজ ফিরাল না কেউ তারে
চলেছে পথিক চলেছে সে যেন মৃত্যুর মত ধীরে,
যেন জীবন্ত হাহাকার আজি কাঁদিছে তাহারে ঘিরে!

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫

ছাত্রীকে পড়াইতে যাইবার সময় অপুর গায়ে যেন জ্বর আসে, ছুটী-ছাটার দিনটা না যাইতে হইলে সে যেন বাঁচিয়া যায়। অদ্ভুত মেয়ে! এমন কারণে-অকারণে প্রভুত্ব জাহির করার চেষ্টা, এমন তাচ্ছিল্যের ভাব—এই রকম সে একমাত্র অতসী-দি'তে দেখিয়াছে।

একদিন সে ছাত্রীর একটা রূপা-বাঁধানো পেন্সিল হারাইয়া ফেলিল, পকেটে ভুলিয়া লইয়া গিয়াছিল, কোথায় ফেলিয়াছে, তারপর আর কিছু খেয়াল ছিল না, পরদিন প্রীতি সেটা চাহিতেই তাহার তো চক্ষুস্থির। সঙ্কুচিত-ভাবে বলিল—কোথায় যে হারিয়ে ফেল্‌লাম - কাল বরং একটা কিনে—

প্রীতি অপ্রসন্ন মুখে বলিল, ওটা আমার দাদুমণির দেওয়া বার্থ-ডে গিফ্‌ট্‌ ছিল—

ইহার পর আর কিনিয়া আনিবার প্রস্তাবটা উত্থাপিত করা যায় না, মনে মনে ভাবিল, কাল থেকে ছেড়ে দেবো—এখানে আর চল্‌বে না।

কি একটা ছুটীর পরদিন সে পড়াইতে গিয়াছে, প্রীতি জিজ্ঞাসা করিল কাল যে আসেন নি? অপু বলিল, কাল ছিল ছুটির দিনটা—তাই আর আসিনি। প্রীতি ফট্‌ করিয়া বলিয়া বসিল—কেন, কাল তো আমাদের সরকার, বাইরের দুজন চাকর, ড্রাইভার সব এসেছিল? আমার পড়াশুনো কিছু হ'ল না, আজ ডিটেন্‌ করে রাখ্‌লে পাঁচটা অবধি। অপুর হঠাৎ বড় রাগ হইল, দুঃখও হইল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি তোমাদের সরকার কি রাঁধুনী ঠাকুর তো নই প্রীতি? কাল স্কুল-কলেজ সব বন্ধ ছিল, এজন্যে ভাবলাম আর যাব না। আমার যদি ভুলই হয়ে থাকে—তোমরা সেই রকম মাষ্টার রেখো যিনি এখানে বাজার-সরকারের মত থাক্‌বেন -আমি কাল থেকে আর আস্‌বো না বলে যাচ্ছি।

বাটীর বাহিরে আসিয়া মনে হইল দেওয়ানপুরের নির্ম্মলাদের কথা। তাহারাও তো অবস্থাপন্ন, তাহাদের বাড়ীতেও তো সে প্রাইভেট মাষ্টার ছিল, কিন্তু সেখানে সে ছিল বাড়ীর ছেলের মত—নির্ম্মলার মা দেখিতেন ছেলের চোখে, নির্ম্মলা দেখিত ভাইয়ের চোখে—সে স্নেহ কি পথেঘাটে সুলভ? নির্ম্মলার মত মমতাময়ীকে তখন সে চিনিয়াও চেনে নাই, আজ নতুন করিয়া তাহাকে আর চিনিয়া লাভ কি? আর লীলা? সে কথা ভাবিতেই বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল—যাক্‌ সে-সব কথা।

হাতের টাকায় কিছুদিন চলিল। ইতিমধ্যে কলেজে একটা বড় ঘটনা হইয়া গেল, প্রণব লেখাপড়া ছাড়িয়া দেশের নাকি কি কাজ করিতে চলিয়া গেল। সকলে বলিল, সে এনার্কিষ্ট দলে যোগ দিয়াছে।

প্রণব চলিয়া যাওয়ার মাসখানেক পরে একদিন অপু হোটেলে খাইতে গিয়া দেখিল সুন্দর-ঠাকুর হোটেল-ওয়ালার মুখ ভার ভার। দু-তিন মাসের টাকা বাকী, হাতে যতদিন ছিল দিয়াছে, তারপর বার বার তাগাদা সত্ত্বেও শোধ দিতে পারে নাই। পাওনাদার আর কতদিন শোনে? আজ সে স্পষ্ট জানাইল দেনা শোধ না করিলে আর সে খাইতে দিতে পারিবে না। বলিল, বাবু অন্য খদ্দের হ'লে মাসের পয়লাটি যেতে দিই নে—ওই কুষ্টোবাবু খায়, ওদের পাটের কলের হপ্তাটি পেলে দিয়ে দেয়—তুমি ব'লে আমি কিছু বলেচি না—দু-মাসের ওপর আজ নিয়ে সাত দিন। যাক্‌ আমি আর পারবো না, আপুনি আর আসবেন না—আমার ভাত একজন ভদ্দর নোকের ছেলে খেয়েচে ভাব্‌বো, আর কি করবো?

কথাগুলি খুব ন্যায্য এবং আদৌ অসঙ্গত নয়, কিন্তু খাইতে গিয়া এরূপ রূঢ় প্রত্যাখ্যানে অপুর চোখে জল আসিল। তাহার তো একদিনও ইচ্ছা ছিল না যে,

ঠাকুরকে সে ফাঁকি দিবে, কিন্তু সেই প্রীতির টুইশানি ছাড়িয়া দেওয়ার পরে আজ দুই তিন মাস একেবারে নিরুপায় অবস্থায় ঘুরিতেছে যে!

বিপদের উপর বিপদ। দিন-দুই পরে সে কলেজে গিয়া দেখিল নোটিশবোর্ডে লিখিয়া দিয়াছে যাহাদের মাহিনা বাকী আছে এক সপ্তাহের মধ্যে শোধ না করিলে কাহাকেও বার্ষিক পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। অপু চক্ষে অন্ধকার দেখিল। প্রায় গোটা এক বৎসরের মাহিনাই যে তাহার বাকী!...মাত্র মাস-দুইয়ের মাহিনা দেওয়া আছে—সেই প্রথম দিকে একবার, প্রীতির টুইশানির টাকা হইতে একবার—তাহার পর হইতে খাওয়াই জোটে না তো কলেজের মাহিনা!...দশ মাসের বেতন ছ'টাকা হিসাবে ষাট টাকা বাকী—কোনোদিক হইতে একটা কলঙ্কধরা নিকেলের সিকিও আসিবার সুবিধা নাই যাহার—ষাট টাকা সে এক সপ্তাহের মধ্যে কোথা হইতে যোগাড় করিবে?...হয়ত তাহাকে পরীক্ষা দিতে দিবে না, গ্রীষ্মের ছুটীর পর সেকেণ্ড ইয়ারে উঠিতেও দিবে না—সারা বছরের কষ্ট ও পরিশ্রম সব ব্যর্থ নিরর্থক হইয়া যাইবে। উপায়?

কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সন্ধ্যার সময় সে হাত-খরচের পয়সা হইতে চাউল ও আলু কিনিয়া আনিয়া থাকিবার ঘরের সাম্‌নের বারান্দাতে রান্নার যোগাড় করিল। হোটেলে খাওয়া বন্ধ হইবার পর হইতে আজ কয়দিন নিজে রাঁধিয়া খাইতেছে। হিসাব করিয়া দেখিয়াছে ইহাতে খুব সস্তায় হয়। কাঠ কিনিতে হয় না। নীচের কারখানার ছুতার-মিস্ত্রীদের ঘর হইতে কাঠের চোঁচ ও টুক্‌রা কুড়াইয়া আনে, পাঁচ ছ' পয়সায় খাওয়া-দাওয়া হয়। আলুভাতে ডিমভাতে আর ভাত। ভাত চড়াইয়া ডাক দিল—ও বহু—বহু—নিয়ে এস আমার হয়ে গেল বলে—ছোট কাঁসিটাও এনো—

কারখানার দারোয়ান শম্ভুদত্ত তেওয়ারীর বৌ একখানা বড় পিতলের থালা ও কাঁসি লইয়া উপরে আসিল—এক লোটা জল ও গোটাকতক কাঁচা লঙ্কাও আনিল। থালা বাসন নাই বলিয়া সে-ই দুই বেলা থালা আনিয়া দেয়। হাসিমুখে বলিল, মছলিকী তরকারি হম্ নেহী ছুয়েঁগা বাবুজী—

—কোথায় তোমার মছ্‌লি?...ও শুধু আলু—একটু হলুদ বাটা এনে দ্যাও না বহু?...রোজ রোজ আলুভাতে ভাল লাগে না—

বহুকে ভাল বলিতে হইবে, রোজ উচ্ছিষ্ট থালা নামাইয়া লইয়া যায়, নিজে মাজিয়া লয়—হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণে যাহা কখনও করে না—অপু বাধা দিয়াছিল, বহু বলে, তুম্ তো হমারে লেড়্‌কেকে বরাবর হোকে বাবুজী—ইস্‌মেঁ ক্যা হ্যায়?...

দিনকতক পরে মায়ের একটা চিঠি আসিল, হঠাৎ পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া সর্ব্বজয়ার পায়ে বড় লাগিয়াছে, পয়সার কষ্ট যাইতেছে। মায়ের অভাবের খবর পাইলে অপু বড় ব্যস্ত হইয়া উঠে, মায়ের নানা কাল্পনিক দুঃখের চিন্তায় তাহার মনকে অস্থির করিয়া তোলে, হয়ত আজ পয়সার অভাবে মায়ের খাওয়া হইল না, হয়ত কেহ দেখিতেছে না মা আজ দু-দিন উপবাস করিয়া আছে, এই-সব নানা ভাবনা আসিয়া জোটে, নিজের আলুভাতে ভাতও যেন গলা দিয়া নামিতে চায় না।

এদিকে আর এক গোলমাল—কারখানার ম্যানেজার ইতিপূর্ব্বে তাহাকে বার-দুই ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন উপরে সে যে ঘরে আছে তার সমস্তটাই ঔষধের গুদাম করা হইবে—সে যেন অন্যত্র বাসা দেখিয়া লয়—বলিয়াছিলেন আজ মাসতিনেক আগেকার কথা, তাহার পর আর কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই—অপুও থাকিবার স্থানের জন্য কোথায় কিভাবে কাহার কাছে গিয়া চেষ্টা করিবে বুঝিতে না পারিয়া একরূপ নিশ্চেষ্টই ছিল এবং দিন যাইতে দেখিয়া ভাবিয়াছিল ও-কথা হয়ত আর উঠিবে না—কিন্তু এইবার যেন সময় পাইয়াই ম্যানেজার বেশী পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন।

হাতের পয়সা ফুরাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে অপু এত সাধ করিয়া কেনা সখের আসবাবগুলি বেচিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে গেল প্লেট্‌গুলি—তাও কেহই কিনিতে চায় না—অবশেষে চৌদ্দ আনায় এক পুরানো দোকানদারের কাছে বেচিয়া দিল। সেই দোকানদারই ফুলদানিটা

আট আনায় কিনিল, দুখানা ছবি দশ আনা। তবু শেষ পর্য্যন্ত সে স্যাণ্ডোর ডাম্বেল্‌টা ও জাপানী পর্দ্দাটা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া রহিল।

সে শীঘ্রই আবিষ্কার করিল ছাতু জিনিষটার অসীম গুণ—সস্তার দিক্ হইতেও বটে, অল্প খরচে পেট ভরাইবার দিক হইতেও বটে। আগে আগে চৈত্র বৈশাখ মাসে তাহার মা নতুন যবের ছাতু কুটিয়া তাহাদের খাইতে দিত —তখন ছাতু ছিল বৎসরের মধ্যে একবার পাল-পার্ব্বণে সখ করিয়া খাইবার জিনিষ, তাই এখন হইয়া পড়িল প্রাণধারণের প্রধান অবলম্বন। আগে একটু-আধটু গুড়ে তাহার ছাতু খাওয়া হইত না। গুড় আরও বেশী করিয়া দিবার জন্য নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে মাকে কত বিরক্ত করিয়াছে এখন খরচ বাঁচাইবার জন্য শুধু নুন ও তেওয়ারী-বহুর নিকট হইতে কাঁচা লঙ্কা আনাইয়া তাই দিয়া খায়। অভ্যাস নাই, খাইতে ভাল লাগে না।

কিন্তু ছাতু খুব সুস্বাদু না হউক, তাহাও বিনা পয়সায় পাওয়া যায় না। অপু বুঝিতেছিল টানাটানি করিয়া আর বড়-জোর দিনদশেক—তার পর কূল-কিনারাহীন অজানা মহাসমুদ্র!…তখন কি উপায়?…

সে রোজ সকালে উঠিয়া নিকটবর্ত্তী এক লাইব্রেরীতে গিয়া দৈনিক ইংরেজি বাংলা কাগজে ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া ও চেষ্টা করিয়া দেখিল। গ্যাস্-পোষ্টের গায়ে অনেক সময় এই ধরণের বিজ্ঞাপন মারা থাকে—চলিতে চলিতে গ্যাস্ পোষ্টের বিজ্ঞাপন দেখিয়া-বেড়ানো তাহার একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইল। প্রায়ই বাড়ী-ভাড়ার বিজ্ঞাপন। আলো ও হাওয়াযুক্ত, ভদ্রপরিবারের থাকিবার উপযোগী দুইখানি কামরা ও রান্নাঘর, ভাড়া নামমাত্র। যদি বা কালেভদ্রে এক আধটা ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়,তার ঠিকানাটি আগে কেউ ছিঁড়িয়া দিয়াছে, পাছে উমেদার বেশী হইয়া পড়ে। কাপড় ময়লা হইয়া আসিল বেজায়, সাবানের পয়সার অভাবে কাচিতে পারিল না। তেওয়ারীর স্ত্রী একদিন সোডা ও সাবান দিয়া নিজেদের কাপড় সিদ্ধ করিতে বসিয়াছে, অপু নিজের ময়লা সার্ট ও ধুতিখানা লইয়া গিয়া বলিল —বহু, তোমার সাবানের বোল্ একটু দেবে, আমি এ দুটোয় মাখিয়ে রেখে দি—তার পর ওবেলা কলেজ থেকে এসে কলে জল এলে কেচে দেবো—দেবে?… তেওয়ারী বধূ বলিল—দে দিজিয়ে না বাবুজী, হাম্ হাঁড়ি মে ডাল দেগা।

অপু ভাবে—আহা, বহু কি ভাল লোক!…যদি কখনও পয়সা হয় ওর উপকার করবো—

এক একবার তাহার মনে হয় যদি কিছু না জোটে, তবে এবার হয়ত কলেজ ছাড়িয়া দিয়া মনসাপোতা ফিরিতে হইবে—কিন্তু সেখানেও আর চলিবার কোনো উপায় নাই, তেলি ও কুণ্ডুরা পূজার জন্য অন্যস্থান হইতে পূজারী বামুন আনাইয়া জায়গাজমি দিয়া বাস করাইয়াছে। আজ কয়েকদিন হইল মায়ের পত্রে সে-খবর জানিয়াছে, এখন তাহার মাকেও আর তেলিরা তেমন সাহায্য করে না, দেখে শোনে না। মায়ের একাই চলে না—তার মধ্যে সে আবার কোথায় গিয়া জুটিবে?…তাহা ছাড়া পড়াশুনা ছাড়া? অসম্ভব!…

সে নিজে বেশ বুঝিতে পারে এই এক বৎসরে তাহার মনের প্রসারতা এত বাড়িয়া গিয়াছে, এমন একটা নতুন-ভাবে সে জগতটাকে, জীবনটাকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে—যা কি না দশ বৎসর মনসাপোতা কি দেওয়ান-পুরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইলেও সম্ভব হইয়া উঠিত না। সে এটুকু বেশ বোঝে কলেজে পড়িয়া ইহা হয় নাই, কোনো প্রোফেসারের বক্তৃতাতেও না—যাহা কিছু হইয়াছে, এই বড় আল্‌মারী ভরা লাইব্রেরীটার কাছে সে তাহার জন্য কৃতজ্ঞ। প্রণবের ও অনিলের মত সহপাঠী বন্ধুর সাহচর্য্য—সকলের উপরে এই দু-চারজন অতি অল্প সংখ্যক বন্ধুবান্ধবের কথাবার্ত্তা ও আশা-নিরাশা লইয়া যে একটা অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই অনুপ্রেরণা। বাকীটা হইয়াছে সবই কলেজ লাইব্রেরীটা হইতে।

যতক্ষণ সে লাইব্রেরীতে থাকে, ততক্ষণ তাহার খাওয়া-দাওয়ার কথা তত মনে থাকে না। এই সময়টা এক একটা খেয়ালের ঘোরে কাটে। খেয়ালমত এক একটা বিষয়ে প্রশ্ন জাগে মনে তাহার উত্তর খুজিতে গিয়া বিকারের রোগীর মত অদম্য পিপাসায় সে সম্বন্ধে

যত বই পাওয়া যায় হাতের কাছে—পড়িতে চেষ্টা করে। কখনও খেয়াল নক্ষত্র জগৎ···কখনও প্রাচীন গ্রীস ও রোমের জীবনযাত্রা-প্রণালীর সহিত একটা নিবিড় ধরণের পরিচয়ের ইচ্ছা—কখনও কীট্‌স্‌, কখনও হল্যাণ্ড রোজের নেপোলিয়ন। কোনো খেয়াল থাকে দুদিন, কোনোটা আবার একমাস। তার কল্পনা সব সময়ই বড় একটা কিছুকে আশ্রয় করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে চায়—বড় ছবি, জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী, চাঁদের দেশের পাহাড়শ্রেণী, বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ, কোনো বড় লোকের জীবনী।

কারখানার ম্যানেজার আর একদিন তাগিদ দিলেন। খুব সুখের বাস ছিল না বটে,কিন্তু এখন সে যায় কোথায়? হাতে কিছু না থাকায় সে এবার পর্দ্দাটা একদিন বেচিতে লইয়া গেল। এটা তাহার বড় সখের জিনিষ ছিল। পর্দ্দাটাতে একটা জাপানী ছবি আঁকা—ফুলে-ভরা চেরীগাছ, একটু জলরেখা, মাঝ-জলে বড় বড় ভিক্টোরিয়া রিজিয়া ফুটিয়া আছে, ওপারে ঢেউখেলানো কাঠের ছাদওয়ালা একটা দেবমন্দির, দূরে ফুজিসানের তুষারাবৃত শিখর একটু একটু নজরে পড়ে। এই ছবি-খানার জন্যই সে পর্দ্দাটা কিনিয়াছিল, এইজন্যই এতদিন হাতছাড়া করিতে পারে নাই—কিন্তু উপায় কি? সাড়ে তিন টাকা দিয়া কেনা ছিল, বহু দোকান ঘুরিয়া তাহার দাম হইল এক টাকা তিন আনা।

পর্দ্দা বেচিয়া অনেকদিন পরে সে ভাত রাঁধিবার ব্যবস্থা করিল। ছাতু খাইয়া খাইয়া অরুচি ধরিয়া গিয়াছে, বাজার হইতে এক পয়সার কলমী শাকও কিনিয়া আনিল। মনে পড়িল সে কলমী শাক ভাজা খাইতে ভালবাসিত বলিয়া ছেলেবেলায় দিদি যখন-তখন গড়ের পুকুর হইতে কত কলমী তুলিয়া আনিত! দিন-সাতেক পর্দ্দা-বেচা অর্থে চলিল মন্দ নয়, তার পরেই যে কে সেই! আর পর্দ্দা নাই, কিছু নাই, একেবারে কানাকড়িটা হাতে নাই।

কলেজ যাইতে হইল না-খাইয়া—কিছু না খাইয়া। বৈকালে কলেজ হইতে বাহির হইয়া সত্যই মাথা ঘুরিতে লাগিল, আর সেই মাথা ঝিম ঝিম করা, পা নড়িতে না চাওয়া। মুস্কিল এই যে, এই অবস্থা সে কাহারও কাছে বলিতেও পারে না—ক্লাসে মিথ্যা গর্ব্ব ও বাহাদুরীর ফলে সকলেই জানে যে, সে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, কাহারও কাছে বলিবার মুখও তো নাই। দু-একজন যাহারা জানে, যেমন জানকী—তাহাদের নিজেদের অবস্থাও তথৈবচ।

সারাদিন না খাইয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিয়াই শুইয়া পড়িল। রাত আটটার পরে আর না থাকিতে পারিয়া তেওয়ারী-বধূকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ছোলা কি অড়রের ডাল আছে, বহু? আজ আর খিদে নেই তেমন, রাঁধবো না আর, ভিজিয়ে খেতাম।

সকালে উঠিয়াই প্রথমে তাহার মনে আসিল যে, আজ সে একেবারে কপর্দ্দক শূন্য। আজও কালকার মত না খাইয়া কলেজে যাইতে হইবে। কতদিন এভাবে চালাইবে সে? না খাইয়া থাকার কষ্ট ভয়ানক—কাল লজিকের ঘণ্টার শেষে সেটা সে ভাল করিয়া বুঝিয়াছিল··· বিকালের দিকে ক্ষুধাটা পড়িয়া যাওয়াতে তত কষ্ট বোঝা যায় নাই—কিন্তু সেই বেলা দুটোর সময়টা!··· পেটে ঠিক যেন বোল্‌তার ঝাঁক হুল ফুটাইতেছে—বার দুই জল খাইবার ঘরে গিয়া গ্লাস-কতক জল খাইয়া কাল যন্ত্রণাটা অনেকখানি নিবারণ হইয়াছিল। আজ আবার সেই কষ্ট সম্মুখে!

হাত মুখ ধুইয়া বাহির হইয়া বেলা দশটা পর্য্যন্ত সে আবার নানা গ্যাস-পোষ্টের বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেড়াইল, তাহার পর বাসায় না ফিরিয়া সোজা কলেজে গেল। অন্য কেহ কিছু লক্ষ্য না করিলেও অনিল দু-তিনবার জিজ্ঞাসা করিল তাহার কোনো অসুখ-বিসুখ হইয়াছে কিনা, মুখ শুক্‌নো কেন। অপু অন্য কথা পাড়িয়া প্রশ্নটা এড়াইয়া গেল। বই লইয়া আজ সে কলেজে আসে নাই, খালি হাতে কলেজ হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় রাস্তায় খানিকটা ঘুরিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, মা আজ দিন-বারো আগে যে টাকা চাহিয়া পত্র পাঠাইয়াছিল—টাকাও দেওয়া হয় নাই, পত্রের জবাবও না।

কথাটা ভাবিতেই সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল—না-খাওয়ার কষ্ট সে খুব ভাল বুঝিয়াছে—মায়েরও হয় ত

বা এতদিন না-খাওয়া সুরু হইয়াছে, কে জানে? তাহা ছাড়া মায়ের স্বভাব সে ভাল বোঝে, নিজের কষ্টের বেলা মা কাহাকেও বলিবে না বা জানাইবে না, মুখ বুজিয়া সমুদ্র গিলিবে।

অপু অস্থির হইয়া পড়িল। এখন কি করে সে!··· জেঠাইমাদের বাড়ী গিয়া সব খুলিয়া বলিবে?···গোটা-কতক টাকা যদি এখন ধার পাওয়া যায় সেখানে, মাকে তো আপাততঃ পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে এখন! কিন্তু খানিকটা ভাবিয়া দেখিল, সেখানে গিয়া সে টাকার কথা তুলিতেই পারিবে না, জেঠাইমাকে সে মনে মনে ভয় করে। অখিলবাবু? সামান্য মাহিনা পায়, সেখানে গিয়া টাকা চাহিতে বাধে। তাহার এক সহপাঠীর কথা হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, খুব বেশী আলাপ নাই, কিন্তু শুনিয়াছে বড়লোকের ছেলে—একবার যাইয়া দেখিবে কি? ছেলেটির বাড়ী বৌবাজারের একটা গলিতে, কল্‌কাতার বনেদী ঘর, বড় তেতলা বাড়ী, পূজার দালান, নাটমন্দির, সাম্‌নে বড় বড় সেকেলে ধরণের থাম, কার্ণিসে একঝাঁক পায়রার বাসা। বাহিরের ফ্লোরের খোপটা একজন হিন্দুস্থানী ভুজাওয়ালা ভাড়া লইয়া ছাতুর দোকান খুলিয়াছে। একটু পরেই অপুর সহপাঠী ছেলেটি বাহিরে আসিয়া বলিল—কৈ, কে ডাক্‌চে—ও—তুমি?—রোল টুএল্‌ভ্‌, এক্স্‌কিউজ্‌ মি—তোমার নামটা জানিনে ভাই—সরি—এস এস ভেতরে এস।

খানিকক্ষণ বসিয়া গল্পগুজব হইল। খানিকক্ষণ গল্প করিতে করিতে অপু বুঝিল এখানে টাকার কথা তোলাটা তাহার পক্ষে কতদূর দুঃসাধ্য ব্যাপার। ···অসম্ভব—তাহা কি কখনও হয়? কি বলিয়া টাকা ধার চাহিবে সে এখানে?. এই আমাকে এই—গোটা-কতক টাকা ধার দিতে পারো ক'দিনের জন্যে? কথাটা কি বিশ্রী শোনাইবে! ভাবিতেও যেন লজ্জায় ও সঙ্কোচে তাহার মুখ ঘামিয়া রাঙা হইয়া উঠিল। ছেলেটি বলিল—বা রে এখুনি উঠবে কি—না না বোসো,চা খাও—দাঁড়াও আমি আস্‌চি—

ঘি দিয়া চিঁড়া-ভাজা, নিম্‌কী, পেঁপে-কাটা, সন্দেশ ও চা। অপু ক্ষুধার মুখে লোভীর মত সেগুলি ব্যগ্র-ভাবে গোগ্রাসে গিলিল। গরম চা কয়েক চুমুক খাইতে শরীরের ঝিম্ ঝিম্ ভাবটা কাটিয়া মনের স্বাভাবিক অবস্থা যেন ফিরিয়া আসিল এবং আসিবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে টাকা ধার চাওয়াটা যে কতদূর অসম্ভব সেটাও বুঝিল। বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়া ভাবিল—ভাগ্যিস্—হাউ এ্যাব্‌সার্ড! তা কি কখনও আমি—দূর্!

রাত্রিতে শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িল, আগামী কাল নববর্ষের প্রথম দিন! কাল কলেজের ছুটী আছে। কাল একবার শ্যামবাজারে জেঠাইমাদের বাড়ীতে যাইবে, নববর্ষের দিনটা জেঠাই-মাকে প্রণাম করিয়া আসাও হইবে—সেটাও একটা কর্ত্তব্য, তাহা ছাড়া—

মনে মনে ভাবিল—কাল গেলে জেঠীমা কি আর না খাইয়ে ছেড়ে দেবে? বছরকারের দিনটা—সেদিন সুরেশ-দা তো আর বাড়ীর মধ্যে বলেনি—বললে কি আর খেতে বল্‌তো না?···সুরেশ-দা ওই রকম ভুলো মানুষ!···

ভুল কাহার, পরদিন অপুর বুঝিতে দেরী হইল না। সকালে ন'টার সময় সুরেশদের বাড়ী গিয়া প্রথমে বাহিরে কাহাকেও পাইল না। বলা না, কওয়া না, হুপ্ করিয়া কি বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া যাইবে? কি সমাচার, না নববর্ষের দিন প্রণাম করিতে আসিয়াছি—ছুতাটা যে বড় দুর্ব্বল! সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে সে খানিকক্ষণ পরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া একেবারে জেঠাইমাকেই পাইল দরজার সাম্‌নের রোয়াকে। প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল, জেঠাইমার মুখে যে বিশেষ প্রীতি বিকশিত হইল না, তাহা অপু ছাড়া যে-কেহ বুঝিতে পারিত। তাহার সংবাদ লইবার জন্য তিনি বিশেষ কোনো আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, সে-ই নিজের সঙ্কোচ ও আনাড়িপনা ঢাকিবার জন্য অতসী-দি কবে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে, সুনীল বুঝি কোথায় বাহির হইয়াছে প্রভৃতি ধরণের মামুলি প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিল।

তাহার পর জেঠাইমা কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহ

বাড়ী নাই, সে দালানের বেঞ্চিতে একাটি বসিয়া একখানা এস্ রায়ের ক্যাটালগ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার ভাণ করিল। এই বইখানার মধ্যেই একখানা বিবাহের প্রীতিউপহার পাইল, হাতে লইয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিল সেখানা সুরেশের বিবাহের দরুণ অতসী-দি দিতেছে সুরেশ-দাকে। সে দুঃখিতও হইল, আশ্চর্য্যও হইল, মাত্র মাসখানেক আগে বিবাহ হইয়াছে, সুরেশ-দা তাহার ঠিকানা জানে, সবই জানে, অথচ কি জেঠাইমা, কি সুরেশ-দা কেহই তাহাকে জানায় নাই!

'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় বেলা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিয়া সে জেঠাইমার কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল, জেঠাইমা নির্লিপ্ত, অন্যমনস্ক স্বরে বলিল—আচ্ছা তা এসো—থাক্, থাক্—আচ্ছা

ফুট্‌পাথে নামিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মনে মনে ভাবিল সুরেশ-দার বিয়ে হয়ে গিয়েচে ফাল্গুন মাসে, একবার বললেও না!...অথচ আমাদের আপনার লোক... আজ দ্যাখো না নববর্ষের দিনটা খেতেও বললে না—

খানিক দূরে আসিতে আসিতে তাহার কেমন হাসিও পাইল। আচ্ছা যদি বল্‌তাম, জেঠিমা আমি এখানে এবেলা খাবো তা হ'লে—হি হি—তা'হলে কি হোত!

বাসার কাছে পথে সুন্দর-ঠাকুর হোটেলওয়ালার সঙ্গে দেখা। দু-দুবার নাকি সে অপুর বাসায় গিয়াছে, দেখা পায় নাই, আজ পয়লা বৈশাখ, হোটেলের নতুন খাতা—টাকা দেওয়া চাই-ই। সুন্দর-ঠাকুরের চড়া চড়া কথায় পথে লোক জুটিয়া গেল—পথে দাঁড়াইয়া অপদস্থ হওয়ার ভয়ে সে কোথা হইতে দিবে বিন্দুবিসর্গ না ভাবিয়াই বলিল, বৈকালে নিশ্চয়ই সব শোধ করিয়া দিবে।

বৈকালে একটা বিজ্ঞাপনে দেখিল কোন্ স্কুলে একজন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ-করা শিক্ষক দরকার, টাট্‌কা মারিয়া দিয়া গিয়াছে, এখনও কেহ ঠিকানাটা ছেঁড়ে নাই। খুঁজিয়া তখনি বাহির করিল, মেছুয়াবাজারে একটা গলির মধ্যে কাহাদের ভাঙা বাড়ীর বাহিরের ঘরে স্কুল—অপার প্রাইমারী পাঠশালা। জনকতক বৃদ্ধ বসিয়া দাবা খেলিতেছেন, একজন তাহার মধ্যে স্কুলের না কি হেড্ মাষ্টার। অঙ্কের শিক্ষক...দশটাকা মাহিনা...বাজার যা তাতে ইহাই যথেষ্ট—ইত্যাদি।

অপুর মন বেজায় দমিয়া গেল। এই অন্ধকার স্কুল-ঘরটার দারিদ্র্য, এই ত্রিকালোত্তীর্ণ বৃদ্ধগণের মুখের একটা বুদ্ধিহীন সন্তোষের ভাব ও মনের স্থবিরত্ব, ইহাদের সাহচর্য্য হইতে তাহাকে দূরে হঠাইয়া লইতে চাহিল। যাহা জীবনের বিরোধী, আনন্দের বিরোধী, সর্ব্বোপরি তাহার অস্থিমজ্জাগত যে রোমান্সের তৃষ্ণা তাহার বিরোধী, অপু সেখানে একদণ্ড তিষ্টিতে পারে না। ইহারা বৃদ্ধ বলিয়া যে এমন ভাব হইল অপুর তাহা নয়, ইহাদের অপেক্ষাও বৃদ্ধ ছিলেন শৈশবের সঙ্গী নরোত্তম দাস বাবাজি। কিন্তু সেখানে সদাসর্ব্বদা একটা মুক্তির হাওয়া বহিত, কাশীর কথক-ঠাকুরকেও এইজন্যই ভাল লাগিয়াছিল। অসহায়, দরিদ্র বৃদ্ধ একটা আশা-ভরা আনন্দের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহার মনে—যেদিন জিনিষপত্র বাঁধিয়া সে হাসিমুখে নতুন সংসার বাঁধিবার উৎসাহে রাজঘাটের ষ্টেশনে ট্রেনে চড়িয়া দেশে রওনা হইয়াছিলেন।

স্কুল হইতে যখন সে বাহির হইল, বেলা প্রায় গিয়াছে। তাহার কেমন একটা ভয় হইল—এ ভয়টা এতদিন হয় নাই। না খাইয়া থাকিবার বাস্তবতা ইতিপূর্ব্বে এ ভাবে কখন নিজের জীবনে সে অনুভব করে নাই—বিশেষ করিয়া যখন এখানে খাইতে-পাওয়া নির্ভর করিতেছে নিজের কিছু একটা খুঁজিয়া বাহির করিবার সাফল্যের উপর। কিন্তু তাহার সকলের চেয়ে দুর্ভাবনা মায়ের জন্য—একটা পয়সা সে মাকে পাঠাইতে পারিল না, আজ এতদিন মা পত্র দিয়াছে—কি করিয়া চলিতেছে মায়ের!...

কিন্তু এখানে তো কোনো কিছুই আশা দেখা যায় না—এত বড় কলিকাতা সহরে, পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সহায় নাই, চেনাশোনা নাই, সে কোথায় যাইবে—কি করিবে?...

পথে একটা মাড়োয়ারীর বাড়ীতে বোধ হয় বিবাহ। সন্ধ্যার তখনও সামান্য বিলম্ব আছে, কিন্তু এরই মধ্যে

সামনের লাল-নীল ইলেকট্রিক আলোর মালা জ্বালাইয়া দিয়াছে, দু'চারখানা মোটর ও জুড়ি গাড়ী আসিতে স্বরু করিয়াছে। লুচি ভাজার মন-মাতানো সুগন্ধে বাড়ীর সাম্‌নেটা ভরপুর। হঠাৎ অপু দাঁড়াইয়া গেল। ভাবিল—যদি গিয়ে বলি আমি একজন পুওর ষ্টুডেণ্ট—সারাদিন খাইনি—তবে খেতে দেবে না?···ঠিক দেবে—এত বড় লোকের বাড়ী, কত লোক তো খাবে—বল্‌তে দোষ কি-কে-ই বা চিন্‌বে আমায় এখানে?···যাবো?···

অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। কে যেন তার ঘাড় ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে চাহিতেছে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারিল না। সে বেশ বুঝিল, মনে ষোল আনা ইচ্ছা থাকিলেও মুখ দিয়া এ কথা সে বলিতে পারিবে না কাহারও কাছে—লজ্জা করিবে। লজ্জা না করিলে সে যাইত। মুখচোরা হওয়ার অসুবিধা সে জীবনে পদে পদে দেখিয়া আসিতেছে।···

কলিকাতা ছাড়িয়া মনসাপোতা ফিরিবে?···কথাটা সে ভাবিতে পারে না—প্রত্যেক রক্তবিন্দু বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। যাইবে না সে কখনও। তাহার জীবন-সন্ধানী মন তাহাকে বলিয়া দেয় এখানে জীবন, আলো, পুষ্টি, প্রসারতা—সেখানে অন্ধকার, দৈন্য, নিবিয়া যাওয়া। এখানেই সে টিকিয়া থাকিবে—থাকিতেই হইবে তাহাকে। কিন্তু উপায় কই তাহার হাতে? সে তো চেষ্টার ত্রুটি করে নাই! সবদিকেই গোলমাল। কলেজের মাহিনা না দিলে আপাততঃ পরীক্ষা দিতে দিলেও বেতন শোধ না করিলে প্রমোশন বন্ধ। থাকিবার স্থানের এই দশা, দু বেলা ওষুধের কারখানার ম্যানেজার উঠিয়া যাইবার তাগিদ দেয়, আহার তথৈবচ, সুন্দর-ঠাকুরের দেনা, মায়ের কষ্ট—একেই তো সে সংসারানভিজ্ঞ, স্বপ্নদর্শী প্রকৃতির—কিসে কি সুবিধা হয় এম্‌নিই বোঝে না—তাহাতে এই কয়দিনের ব্যাপার তাহাকে একেবারে দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে।

বাসায় ফিরিয়া ছাদের উপর একখানা খাপরা ছুঁড়িয়া সে একবার দেখিল, দুইবার দেখিল—কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার সে দিকটা, সেই দিকটাই পড়ে। তৃতীয় বার ফেলিয়া দেখিতে আর তাহার সাহস হইল না।

বাল্যকাল হইতে নিশ্চিন্দিপুরের বিশালাক্ষী দেবীর উপর তাহার অসীম শ্রদ্ধা। করুণাময়ী দেবীর কত কথা সে শুনিয়াছে, সে তো তাঁর গ্রামেরই ছেলে—কলিকাতায় কি তাঁর শক্তি খাটে না?···

পরীক্ষা হইবার দিনকয়েক পরে একদিন অনিল তাহাকে জানাইল সায়েন্স সেক্‌সনের মধ্যে সে গণিত ও বস্তু-বিজ্ঞানে প্রথম হইয়াছে, প্রোফেসরের বাড়ী গিয়া নম্বর জানিয়া আসিয়াছে। অপু শুনিয়া আন্তরিক সুখী হইল, অনিলকে সে ভারি ভালবাসে, সত্যিকার চরিত্রবান, বুদ্ধিমান্ ও উদারমতি ছাত্র। অনিলের যে জিনিষটা তাহার ভাল লাগে না, সেটা তাহার অপরকে তীব্রভাবে আক্রমণ ও সমালোচনা করিবার একটা দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনো তুচ্ছ কাজে বা জিনিষে অপু তাহার আসক্তি দেখে নাই—কোনো ছোট কথা, কি সুবিধার কথা, কি বাজে খোসগল্প তাহার মুখে শোনে নাই।

অপু দেখিয়াছে সব সময় অনিলের মনে একটা চাঞ্চল্য, একটা অতৃপ্তি—তাহার অধীর মন মহাভারতের বকরূপী ধর্ম্মরাজের মত সব সময়ই যেন প্রশ্ন ফাঁদিয়া বসিয়া আছে—কা চ বার্ত্তা?

অপুর সহিত এইজন্যই অনিলের মিলিয়াছিল ভাল। দুজনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি এক ধরণের, অপুর বাংলা ও ইংরেজি লেখা খুব ভাল, কবিতা, প্রবন্ধ, মায় একখানা উপন্যাস পর্য্যন্ত লিখিয়াছে। দু'তিনখানা বাঁধানো খাতা ভর্ত্তি—লেখা এমন কিছু নয়, গল্পগুলি ছেলেমানুষী ধরণের উচ্ছ্বাসে ভরা, কবিতা রবি ঠাকুরের নকল, উপন্যাসখানাতে—জলদস্যুর দল, প্রেম, আত্মদান কিছুই বাদ যায় নাই—কিন্তু এইগুলি পড়িয়াই অনিল সম্প্রতি অপুর আরও ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তাহের শেষে দুজনে বোটানিকেল গার্ডেনে বেড়াইতে গেল। একটা ঝিলের ধারে [illegible]

লম্বা ঘাসের মধ্যে বসিয়া অনিল বন্ধুকে একটা সুসংবাদ দিল। বাগানে আসিয়া গাছের ছায়ায় এইভাবে বসিয়া বলিবে বলিয়াই এতক্ষণ অপেক্ষায় ছিল। তাহার বাবার এক বন্ধু তাহাকে খুব ভালবাসেন, বড়বনীর অভ্রের খনির তিনি ছিলেন একজন অংশীদার, তিনি গত পরীক্ষার ফলে অনিলের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিজের খরচে বিদেশে পাঠাইতে চাহিতেছেন। আই-এস্‌সি-টা পাশ দিলেই সোজা বিলাত বা ফ্রান্স্।

—কেম্ব্রিজে কি ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ্ সায়েন্স এণ্ড টেক্‌নোলজি, ওতে পড়বো, রাদারফোর্ড আছেন, টম্‌সন্ আছেন, এঁদের সব দুবেলা দেখতে পাওয়াও একটা পুণ্য—যুদ্ধ থাম্‌লে জার্ম্মানিতে যাব, মস্ত জাত—বিরাট ভাইটালিটি—গেটে, অষ্টওয়াল্‌ডের দেশ—ওখানে কি আর না যাব ?…

সাম্‌নের ঝিলে অজস্র রক্তকুমুদ ফুটিয়াছে, পেন্‌সিয়ানা ও মেহগেনি গাছের ডালপালার মধ্যে কোকিল ডাকিতেছে, ভারি স্নিগ্ধ ছায়া, অনিলের কথা শুনিতে শুনিতে অপুর সারা শরীর উৎসাহে, উত্তেজনায় কেমন করিয়া উঠিল। জগতের বড় বড় লোক, বড় বড় ব্যাপারের কথা মনে করিয়া দিবার জন্য পাশে পাশে অনিলের মত বন্ধুকে ভাগ্যে সে পাইয়াছে!

অনিল অপুর বিদেশে যাইবার টান জানে—বলিল, আমি আপনাকে নিয়ে যাবার ঠিক করবো, না হয় দুজনে আমেরিকায় চলে যাব—আমি সব ঠিক করবো দেখবেন।

অনিলের প্রভাব যেমন অপুর জীবনে বিস্তার লাভ করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে অপুর চরিত্রের পবিত্রতা, মনের ছেলেমানুষী ও ভাবগ্রাহিতা অনিলের কঠোর সমালোচনা ও অযথা আক্রমণ-প্রবৃত্তিকে অনেকটা সংযত করিয়া তুলিতেছিল। দূরের পিপাসা অপুর আরও অনেক বেশী, অনেক উদ্দাম—কলিকাতার ধোঁয়া-ভরা, সঙ্কীর্ণ, ভ্যাপ্‌সা-গন্ধ সিওয়ার্ড ডিচের ভিতর হইতে বাহির হইয়া হঠাৎ যেন একটা উদার প্রান্তর, জ্যোৎস্না-মাখা মুক্ত আকাশ, পাখীদের আনন্দ-ভরা পক্ষ-সঙ্গীতের, একটা বন-প্রান্তের রহস্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় অপুর কথার সুরে, জীবন-পিপাসু নবীন চোখের দৃষ্টিতে, অন্ততঃ অনিলের তো মনে হয়।

কোন্ পথে যাওয়া হইবে সে কথা উঠিল। অপু উৎসাহে অনিলের কাছে ঘেঁষিয়া বলিল—এস একটা প্যাক্ট করি—দেখি হাত ? এস আমরা কখ্‌খনো কেরাণীগিরি করবো না—পয়সা পয়সা করবো না কখ্‌খনো—সামান্য জিনিষে ভুলবো না কখনও—বাস্! পরে মাটিতে একটা ঘুসি মারিয়া বলিল—খুব বড় কাজ কিছু একটা করবো জীবনে।

অনিল সাধারণতঃ অপুর মত নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া ওঠে না, তবুও আজ উৎসাহের মুখে অনেক কথা বলিয়া ফেলিল, বিলাতে পড়া শেষ করিয়া সে আমেরিকায় যাইবে, জাপান হইয়া দেশে ঘুরিয়া আসিবে। বড় একজন বৈজ্ঞানিক হইতে চায় সে, ছোটখাটো বা মাঝারিতে তাহার মনের তৃপ্তি হইবে না, তাহা তার লক্ষ্যও নয়। বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সারাজীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণা লইয়াই থাকিবে।

অপু বলিল—যখন দেশে ছিলাম, তখন আমার একখানা 'প্রাকৃতিক ভূগোল' বলে ছেঁড়া, পুরনো বই ছিল—তার্তে লেখা ছিল এমন সব নক্ষত্র আছে, যাদের আলো আজও এসে পৃথিবীতে পৌঁছয়নি সে সব এত দূরে—মনে আছে সন্ধ্যের সময় একটা নদীতে নৌকো ছেড়ে দিয়ে নৌকোর ওপর বসে সে কথা ভাবতাম, ওপারে একটা কদম গাছ ছিল, তার মাথাতে একটা তারা উঠত সকলের আগে, তারাটার দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতাম—কি যে একটা ভাব হতো মনে! একটা mystery, একটা uplift-এর ভাব—ছেলেমানুষ তখন সে সব বুঝতাম না, কিন্তু সেই থেকে যখনই মনে দুঃখ হয়েচে কি কোনো ছোট কাজে মন গিয়েচে, তখনই আকাশের নক্ষত্রদের দিকে চাইলেই আর ছেলেবেলার সেই uplift-এর ভাবটা একটা joy—বুঝলে?—একটা অদ্ভুত transcendental joy—সে মুখে তোমাকে ভাই—

বেলা পড়িলে দুজনে ষ্টীমারে কলিকাতায় ফিরিল।

পরদিনও কলেজের কমন-রুমে অনেকক্ষণ আবার সেই কথা।

কলেজ হইতে উৎফুল্ল মনে বাহির হইয়া অনিল

প্রথমে দোকানে এক কাপ চা খাইল, পরে ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইয়া একটুখানি ভাবিল, কালীঘাটে মামীর বাড়ী যাওয়ার কথা আছে, এখন যাইবে কি না। একখানা বই কিনিবার জন্ম একবার কলেজ ষ্ট্রীটেও যাওয়া দরকার। কোথায় আগে যায়? অপূর্ব্ব একমাত্র ছেলে, যার কথা তার সব সময় মনে হয়। যে কোনোরূপে হউক অপূর্ব্বকে সে নিশ্চয়ই বিদেশ দেখাইবে।

তলপেটে অনেকক্ষণ হইতে একটা কি বেদনা বোধ হইতেছিল, এইবার যেন একটু বাড়িয়াছে,হাঁটিয়া চৌরঙ্গীর মোড় পর্য্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, সেটা আর না যাওয়াই ভাল। সম্মুখেই ড্যালহাউসি স্কোয়ারের ট্রাম, সে ভাবিল পরেরটাতে যাব, বেজায় ভিড়, ততক্ষণ বরং পত্রখানা ডাকে ফেলে আসি।

নিকটেই লালরংয়ের গোল ডাকবাক্স ফুটপাথের ধারে, ডাকবাক্সটায় গা ঘেঁষিয়া একজন মুসলমান ফিরিওয়ালা পাকা কাঁচকলা বিক্রী করিতেছে, তাহার বাজরায় পা না লাগে এইজন্ম একপায়ে ভর করিয়া অন্ত পা খানা একটু অস্বাভাবিকভাবে পিছনে বাঁকাভাবে পাতিয়া সে সবে চিঠিখানা ডাকবাক্সের মুখে ছাড়িয়া দিয়াছে—এমন সময় হঠাৎ পিছন হইতে যেন কে তীক্ষ্ণ বর্শা দিয়া তাহার দেহটা এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া দিল, এক নিমেষে অনিল সেটাতে হাত দিয়া সাম্‌লাইতেও যেন অবকাশ পাইল না···হঠাৎ যেন পায়ের তলা হইতে মাটিটা সরিয়া গেল···চোখে অন্ধকার—কাঁচকলার বাজরার কাণাটা মাথায় লাগিতেই মাথাটার একটা বেদনা—মুসলমানটি কি বলিয়া উঠিল···হৈ হৈ, বহু লোক···কি হয়েচে মশায়?···কি হ'ল মশায়? সরো সরো—বাতাস করো বরফ নিয়ে এস···এই যে আমার রুমাল নিননা···

অনিলের তুটা মাত্র কথা শুধু মনে ছিল - একবার সে অতিকষ্টে গোঁয়াইয়া গোঁয়াইয়া বলিল—রি—রিপণ কলেজ—রিপণ কলেজ—অপূর্ব্ব রায়—রিপণ—

আর মনে ছিল সাম্‌নের একটা সাইনবোর্ড—গণেশচন্দ্র দাঁ এণ্ড কোং—কারবাইডের মশলা, তারপরেই পেটে পুনরায় তীক্ষ্ণ বর্শাটা কে যেন সজোরে তলপেটে ঢুকাইয়া দিল···সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার—কতক্ষণ পরে সে জানে না, তাহার জ্ঞান হইল একটা বাক্স বা ঘরের মধ্যে সে শুইয়া আছে, ঘরটা বেজায় তুলিতেছে··পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা··· কাহারা কি বলিতেছে, অনেক মোটর গাড়ীর ভেঁপুর শব্দ আবার ধোঁয়া ধোঁয়া···

* * * *

পুনরায় যখন অনিলের জ্ঞান হইল, সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল একটা বড় সাদা দেওয়ালের পাশে একখানা খাটে সে শুইয়া আছে। পাশে তাহার বাবা ও ছোট-কাকা বসিয়া, আরও তিন-চারজন অপরিচিত লোক, নার্সের পোষাক-পরা তুজন মেম। এটা হাঁসপাতাল? কোন্ হাঁসপাতাল? কি হইয়াছে তাহার?···তলপেটের যন্ত্রণা তখনও সমান, শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, সারা দেহ যেন অবশ।

পরদিন বেলা দশটার সময় অপু গেল। সে-ই কাল খবর পাইয়া তখনি ছুটিয়া শিয়ালদহের মোড়ে গিয়াছিল। সঙ্গে ছিল সত্যেন ও চার-পাঁচজন অন্য অন্য শ্রেণীর ছেলে। টেলিফোনে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী আনাইয়া তখনি সকলে মিলিয়া তাহাকে মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে আনা হয় ও বাড়ীতে খবর দেওয়া হয়। ডাক্তার বলেন হার্নিয়া···ষ্ট্রাঙ্গুলেটেড্ হার্নিয়া···তখনি অস্ত্র করা হইয়াছে।

বৈকালেও সে গেল। কেবিন ভাড়া করা হইয়াছে, অনিলের মা বসিয়াছিলেন, অপু গিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। অনিল এখন অনেকটা ভাল আছে, অস্ত্র করার পরে বেজায় যন্ত্রণা পাইয়াছিল, সারারাত ও সারাদিন—তুপুরের পর সেটা একটু কম। তাহার মুখ রক্তশূন্য পাণ্ডুর। সে হাসিয়া অপুর হাত ধরিয়া কাছে বসাইল, বলিল—স্বাস্থ্যের মতন জিনিষ আর নেই, যতই বলুন—এই তিনটে দিন যেন একেবারে মুছে গিয়েচে জীবন থেকে।

অপু বলিল—বেশী কথা বোলো না, যন্ত্রণা কেমন এখন?

অনিলের মা বলিলেন—তোমার কথা সব শুনেচি, ভাগ্যিস তুমি ছিলে বাবা সেদিন!

অনিল বলিল, দেখবেন মজা, ঘণ্টা নাড়লেই নার্স

এখুনি ছুটে আসবে—বাজাব দেখবেন ? সে হাসিয়া একটা হাতঘণ্টা বাজাইতেই লম্বা একজন নার্স আসিয়া হাজির। সে চলিয়া গেলে অনিলের মা বলিলেন —কি যে করিস্ মিছেমিছে ? ছিঃ—

দুজনেই খুব হাসিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ গড়ের মাঠের দিকে বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া অপু সবে আলোটি জ্বালিয়াছে, এমন সময় সত্যেন ও অনিলের পিস্তুতো ভাই ফণি—অপু তাহাকে হাঁসপাতালেই প্রথম দেখিয়াছে, সেইখানেই প্রথম আলাপ – ব্যস্তসমস্ত অবস্থায় ঘরে ঢুকিল। সত্যেন বলিল— ওঃ তোমাকে দুবার এর আগে খুঁজে গেছি—এখুনি হাঁসপাতালে এস—জান না ?···

অপু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উহাদের মুখের দিকে চাহিতেই ফণি বলিল—অনিল মারা গিয়েচে এই সাড়ে ছ'টার সময়—হঠাৎ আপনার কাছে দুবার ··

সকলে ছুটিতে ছুটিতে হাঁসপাতালে গেল। অনিলের মৃতদেহ খাট হইতে নামাইয়া শাদা চাদর দিয়া ঢাকিয়া মেজেতে রাখিয়াছে। বহু আত্মীয়স্বজনে কেবিন ভরিয়া গিয়াছে, ক্লাসের অনেক ছেলে উপস্থিত, একদল ছেলে এইমাত্র এসেন্স ও ফুলের তোড়া লইয়া কেবিনে ঢুকিল। অল্পপরেই মৃতদেহ নিমতলায় লইয়া যাওয়া হইল।

সব কাজ শেষ হইতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল।

অন্য সকলে গঙ্গাস্নান করিতে লাগিল। অপু বলিল, তোমরা নাও, আমি গঙ্গা নাইবো না, কলের জলে সকাল বেলা নাইবো। কল্‌কাতার গঙ্গায় নাইতে আমার মন যায় না।

অনিলের বাবার উপর অপুর অত্যন্ত ভক্তি হইল—এমন দৃঢ়চেতা লোক সে কখনও দেখে নাই, এত বিপদেও তিনি সারারাত বাঁধানো চাতালে বসিয়া ধীরভাবে কাঠের নল বসানো সট্‌কাতে তামাক টানিয়াছেন, অপুকে বার-দুই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—বাবা তোমার ঘুম লাগেনি তো ?··· কোনো কষ্ট হয় তো ব'লো বাবা। অপু কথা শুনিয়া চোখের জল রাখিতে পারে নাই।

সুনীল সিগারেট কেস্‌টা তাহার জিম্মায় রাখিয়া জলে নামিল, সে ঘাটের ধাপের উপর বসিয়া রহিল। অন্ধকার আকাশে অসংখ্য জল্‌জলে নক্ষত্র, রাত্রিশেষের আকাশে উজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল ওপারে জেসপ কোম্পানীর কারখানার মাথায় ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, পূর্ব্ব-আকাশে চিত্রা প্রত্যাসন্ন দিবালোকের মুখে মিলাইয়া যাইতেছে। অপু মনের মধ্যে কোনো শোক কি দুঃখের ভাব খুঁজিয়া পাইল না—কিন্তু মাত্র তিনদিন আগে কোম্পানীর বাগানে বসিয়া যেমন অনিলের সঙ্গে গল্প করিয়াছিল, সারা আকাশের অসংখ্য নক্ষত্ররাজির দিকে চাহিয়া বাল্যে নদীর ধারে বসিয়া সন্ধ্যার প্রথম নক্ষত্রটি দেখিবার মত এক অপূর্ব্ব, অবর্ণনীয় রহস্যের ভাবে তাহার মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল, কেমন যেন মনে হইতে লাগিল অসীম রহস্য ও বিপুলতার আবেগে নির্ব্বাক নক্ষত্রজগৎ যেন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে স্পন্দিত হইতেছে।

অনিলের মৃত্যুর পর অপু বড় মুষড়াইয়া পড়িল। শোকে বা দুঃখে নয়, কিন্তু নানারকম গোলমালে, অভাব অনটনে, অনাহার, কলেজে একরাশ দেনা— ওদিকে মায়ের কষ্ট। তাহা ছাড়া অনিলের মৃত্যুর পর কেমন এক ধরণের অবসাদ শরীরে ও মনে আশ্রয় করিয়াছে, কোনো কিছু কাজে উৎসাহ আসে না, হাত-পা ওঠে না।

বৈকালে ঘুরিতে ঘুরিতে সে কলেজ স্কোয়ারের একখানা বেঞ্চির উপর বসিল। এতদিন তো রহিল, কিছুই স্থির হইল না, এভাবে আর কতদিন চলে ? ভাবিল না হয় এ্যাম্বুলেন্সে যেতাম, কলেজের অনেকে তো যাচ্ছে, কিন্তু মা কি তা যেতে দেবে ?

পরে ভাবিল—বাড়ী চলে যাই, মাসখানেক অর্ডারলি রিট্রিট করা যাক্—তারপর জি, এইচ, কিউ কি ব্যবস্থা করেন দেখা যাবে।

পাশে একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হইতে বসিয়াছিলেন। মধ্যবয়সী লোক, চোখে চশমা, হাতের শিরগুলা দড়ির মত মোটা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সাঁতারের ম্যাচ কবে হবে জানেন ? অপু জানে না, বলিতে পারিল না। ক্রমে দু-চার কথায়

আলাপ জমিল। সাঁতারেরই গল্প। কথায় কথায় প্রকাশ পাইল তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বহুস্থান ঘুরিয়াছেন। অপু কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিল।

ভদ্রলোক বলিলেন—আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক—

অনেক দিনের একটা কথা অপুর মনে পড়িয়া গেল, সে সোজা হইয়া বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমি আপনাকে চিনি, আপনি অনেক দিন আগে বঙ্গবাসীতে 'বিলাত-যাত্রীর চিঠি' লিখতেন।

—হাঁ-হাঁ—ঠিক, সে দশ এগারো বছর আগেকার কথা—তুমি কি করে জানলে? পড়তে না কি?

—ওঃ, শুধু পড়তাম না, হাঁ করে বসে থাকতাম কাগজখানার জন্যে—তখন আমার বয়েস বছর দশ—পাড়াগাঁয়ে থাকতাম—কি inspiration যে পেতাম আপনার লেখা থেকে!...

ভদ্রলোকটি ভারি খুশী হইলেন। কি করে, কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা-বাদ করিলেন। বলিলেন, দ্যাখো কোথায় বসে কে লেখে আর কোথায় গিয়ে তার বীজ উড়ে পড়ে—বিলেতে হাম্পষ্টেডের একটা বোর্ডিংয়ে বসে লিখতাম, আর বাংলায় এক obscure পাড়াগাঁয়ের এক ছোট ছেলে আমার লেখা পড়ে—বাঃ বাঃ—

ভদ্রলোকটির ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব উৎসাহ দেখা গেল। মাদ্রাজে সমুদ্রের ধারে জমি লইয়াছেন, নারিকেল ও ভ্যানিলার চাষ করিবেন। তেরো বৎসরের নিগ্রো বালককে নিঃসম্বলে ইউরোপে আসিয়া নিজের উপার্জ্জন নিজে করিতে দেখিয়াছেন—দেশের যুবকদের চাষবাস করিতে উপদেশ দেন।

ভদ্রলোকটিকে আর অপুর অপরিচিত মনে হইল না। তাহার বাল্যজীবনের কতকগুলি অবর্ণনীয় আনন্দ-মুহূর্ত্তের জন্য এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটি দায়ী, ইঁহারই লেখার ভিতর দিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে সে আনন্দ-ভরা প্রথম পরিচয়—সেই ধূমায়মান ভিসুভিয়াস, বীর-প্রসবিণী কর্সিকা, পল্লীবালা জোয়ান, সঙ্গে সঙ্গে ওদের সঙ্গে জড়িত সেই ইছামতী, ওপারে মাধবপুরের ঘন সবুজ উলুখড়ের মাঠ...দিগম্বর পাটনির ভাঙা খেয়ার ডিঙিখানা।

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের উৎসাহ লইয়া সে ফিরিল। কে জানিত বঙ্গবাসীর সে লেখকের সঙ্গে এভাবে দেখা হইয়া যাইবে!...শুধু বাঁচিয়া থাকাই এক সম্পদ, তোমার বিনা চেষ্টাতেই এই অমৃতময়ী জীবনধারা প্রতি পলের রসপাত্র পূর্ণ করিয়া তোমায় অন্যমনস্ক, অসতর্ক মনে অমৃত পরিবেশন করিবে...সে যে করিয়া হউক বাঁচিবে।

(১৬)

অনেকদিন পরে মনসাপোতা খুব ভাল লাগিল, পথের প্রত্যেক গাছপালা যেন কত কালের পুরাতন পরিচিত সাথী, উলা ষ্টেশন হইতে হাঁটাপথে ক্রোশ-চারেক, গহনার নৌকাতেও রাণাঘাট হইতে আসা যায় বটে, কিন্তু এই পথটাই সুবিধা। অপু ভাবে, 'এইবার সেই তেঁতুল গাছটা', এইবার কাঁটাদ'র মিত্তির বাড়ীর অশথ গাছটা দেখা যাবে।

সন্ধ্যা ঠিক হয় নাই, উঠানে তেলী-বাড়ীর বড়-বৌ দাঁড়াইয়া কি গল্প করিতেছিল, দূর হইতে অপুকে আসিতে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল—কে আসচে বলুন তো মা-ঠাকরুণ? সর্ব্বজয়ার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল, অপু নয় তো! অসম্ভব—সে এখন কেন—

পরক্ষণেই সে ছুটিয়া আসিয়া অপুকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরে। সর্ব্বজয়ার চোখের জলে তাহার জামার হাতটা ভিজিয়া উঠিল। মাকে যেন এবার নিজের অপেক্ষা মাথায় ছোট দুর্ব্বল ও অসহায় বলিয়া অপুর মনে হইতে লাগিল। তপঃকৃশা শবরীর মত ক্ষীণাঙ্গী, আলুথালু অর্দ্ধরুক্ষ চুলের গোছা একদিকে পড়িয়াছে, মুখের চেহারা এখনও সুন্দর, গ্রীবা ও কপালের রেখাবলী এখন অনেকাংশে ঋজু ও সুকুমার। তবে এবার মায়ের চুল পাকিয়াছে, কানের পাশের চুলে পাক ধরিয়াছে। নিজের সবল দৃঢ় বাহুবেষ্টনে সরলা, চিরদুঃখিনী মাকে সংসারের সহস্র দুঃখাবপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে অপুর ইচ্ছা যায়। এভাবটা এইবার প্রথম সে মনের মধ্যে অনুভব করিল, ইতিপূর্ব্বে কখনও হয় নাই।

বড়-বৌ একপাশে হাসিমুখে দাঁড়াইয়াছিল, সে অপুকে ছোট দেখিয়াছে, এখন আর তাহাকে দেখিয়া ঘোমটা দেয় না। সর্ব্বজয়া বলিল, এবার ও এসেছে বৌমা, এবার কালই কিন্তু। অপু নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি খুড়ীমা, কাল কি? বড়-বৌ হাসিয়া বলিল, দেখো কাল আজ বোল্‌বো না তো?

খিচুড়ী খাইতে ভালবাসে বলিয়া সর্ব্বজয়া অপুকে রাত্রে খিচুড়ী রাঁধিয়া দিল, পেট ভরিয়া খাওয়া ঘটিল এই সাত আট দিন পরে আজ মায়ের কাছে। সর্ব্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ রে সেখানে খিচুড়ী খেতে পাস্?

অপুর শৈশবে তাহার মা শত প্রতারণার আবরণে নগ্ন দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর রূপকে তাহাদের শিশুচক্ষুর আড়াল করিয়া রাখিত, এখন আবার অপুর পালা। সে বলিল—হুঁ, বাদ্‌লা হ'লেই খিচুড়ী হয়।

—কি ডালের করে?

— মুগেরই বেশী, মুস্থরীরও করে, খাঁড়ি মুস্থরী।

—সকালে জলখাবার খেতে ছায় কি কি?

অপু প্রাতঃকালীন জলযোগের এক কাল্পনিক বিবরণ খুব উৎসাহের সহিত বিবৃত করিয়া গেল। মোহনভোগ, চা, এক একদিন লুচিও দেয়। খাওয়ার বেশ সুবিধা।

প্রীতির টুইশানি কোন্ কালে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু অপু সেকথা মাকে জানায় নাই, সর্ব্বজয়া বলিল—হাঁরে তুই যে সে মেয়েটি পড়াস্—তাকে কি বলে ডাকিস্? খুব বড়লোকের মেয়ে না?

— তার নাম ধরেই ডাকি—

—দেখতে শুনতে বেশ ভাল?

—বেশ দেখ্‌তে—

—হাঁ রে তা তোর সঙ্গে বিয়ে দেয় না? বেশ হয় তা হ'লে—

অপু লজ্জারক্ত মুখে বলিল, হাঁ—তা তারা বড়লোক আমার সঙ্গে—তা কি কখনও—তোমার যেমন কথা!

সর্ব্বজয়ার কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস

তো মা আসল কথা কিছুই জানে না! প্রীতির টুইশানি থাকিলে কি আর না খাইয়া দিন যায় কলিকাতায়?

অপু দেখিল সে যে টাকা পাঠায় নাই, মা একটি-বারও সে কথা উত্থাপন করিল না, শুধুই তাহার কলিকাতার অবস্থানের সুবিধা অসুবিধা সংক্রান্ত নানা আগ্রহ-ভরা প্রশ্ন। নিজেকে এমনভাবে সর্ব্বপ্রকারে মুছিয়া বিলোপ করিতে তাহার মায়ের মত সে আর কাহাকেও এপর্য্যন্ত দেখে নাই। সে জানিত এ লইয়া বাড়ী গেলে মা কোনো কথা তুলিবে না।

সর্ব্বজয়া একটা এনামেলের বাটী ও গ্লাস ঘরের ভিতর হইতে আনিয়া হাসিমুখে বলিল—এই ছাখ্ এই দুখানা ছেঁড়া কাপড় বদলে তোর জন্যে নিইচি—বেশ ভাল, না?…কত বড় বাটীটা ছাখ। অপু ভাবিল—মা যা দ্যাখে তাই বলে ভালো, এ আর কি ভালো, যদি আমার সেই পুরনো দোকানে কেনা প্লেট্‌গুলো মা দেখ তো!

কলিকাতার সে দুরূহ জীবন-সংগ্রামের পরে এখানে বেশ আনন্দে ও নির্ভাবনায় দিন কাটে রাত্রে। মায়ের কাছে শুইয়া সে আবার নিজেকে ছেলেমানুষের মত মনে করে, ব'লে সেই গানটা কি মা, ছেলেবেলায় তুমি আর আমি শুয়ে শুয়ে রাত্রে গাইতাম—এক একদিন দিদিও—সেই চিরদিন কখনও সমান না যায়—কভু বনে বনে রাখালেরি সনে কভু বা রাজত্ব পায়—

পরে আবদারের সুরে ব'লে—গাও না মা গানটা?

সর্ব্বজয়া হাসিয়া বলে—হ্যাঁ, এখন কি আর গলা আছে—দূর—

—এস দুজনে গাই—এস না মা—খুব হবে, এস—

খুব নীচু সুরে দুজনে গানটা গায়। সর্ব্বজয়ার মনে আছে অপু যখন ছোট ছিল, তখন কোনো মেয়েমজলিসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গান সেখানে হয়ত হইত, অপুর গলা ছিল খুব মিষ্ট, কিন্তু তাহাকে প্রথমে কিছুতেই গান-গাওয়ানো যাইত না—অথচ যেদিন তাহার গান গাহিবার ইচ্ছা হইত, সেদিন মায়ের কাছে চুপি চুপি বার

গাহিবে। সর্ব্বজয়া ছেলের মন বুঝিয়া অমনি বলিত—তা অপু এবার কেন একটা গান কর্ না?…দু' একবার লাজুক মুখে অস্বীকার করার পর অমনি অপু গান সুরু করিয়া দিত।

সেই অপু এখন একজন মানুষের মত মানুষ। এত রূপ এ অঞ্চলের মধ্যে কে কবে দেখিয়াছে? একহারা চেহারা বটে, কিন্তু সবল, দীর্ঘ, শক্ত হাত-পা। কি মাথার চুল, কি ডাগর চোখের নিষ্পাপ, পবিত্র দৃষ্টি, রাঙা ঠোঁটের দুপাশে বাল্যের সে সুকুমার ভঙ্গী এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, শুধু সর্ব্বজয়া তাহা ধরিতে পারে।

অপু কিন্তু সে ছেলেবেলার অপু আর নাই। প্রায়ই সব বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, সে অপূর্ব্ব হাসি, সে ছেলেমানুষি, সে কথায় কথায় মান-অভিমান, আবদার, গলায় সে রিণ্‌রিণে মিষ্টি সুর—এখনও অপুর সুর খুবই মিষ্ট—তবুও সে অপরূপ বাল্যস্বর, সে চাঞ্চল্য—পাগলামি—সে সবের কিছুই নাই। সব ছেলেই বাল্যে সমান ছেলেমানুষ থাকে না, কিন্তু অপু ছিল মূর্ত্তিমান শৈশব। সরলতায়, দুষ্টুমিতে, রূপে, ভাবুকতায়—দেবশিশুর মত। এক ছেলে ছিল তাই কি, শত ছেলেতে কি হয়? সর্ব্বজয়া মনে মনে বলে—বেশী চাইনে, দশটা পাঁচটা চাইনে ঠাকুর, ওকেই আর জন্মে আবার কোলজোড়া করে দিও।

সর্ব্বজয়ার জীবনের পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া অপু যে অমৃত শৈশবে পরিবেশন করিয়াছে, তারই স্মৃতি তার দুঃখ-ভরা জীবন-পথের পাথেয়। আর কিছুই সে চায় না।

কোনো কোনো দিন রাত্রে অপু মায়ের কাছে গল্প শুনিতে চায়। সর্ব্বজয়া বলে—তুই তো কত ইংরিজি বই পড়িস্, কত কি—তুই একটা গল্প বল না বরং শুনি। অপু গল্প করে। দুজনে নানা পরামর্শ করে, সর্ব্বজয়া পুত্রের বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কাঁটাদহের সাণ্ন্যাল বাড়ী নাকি ভাল মেয়ে আছে সে শুনিয়াছে, অপু পাশটা দিলেই এইবার…।

কলিকাতায় যে জেঠাইমাদের বাড়ীতে সে গিয়াছিল সে কথা বলে। সর্ব্বজয়া বলে—তাই নাকি?…তোকে খুব যত্নটত্ন করলে?…কি খেতে দিলে?…অপু নানা কথা সাজাইয়া বানাইয়া বলে। সর্ব্বজয়া বলে—আমায় একবার নিয়ে যাবি?…কল্‌কাতা কখনও দেখিনি, বট্‌ঠাকুরদের বাড়ী দুদিন থেকে মা কালীর চরণ দর্শন করে আসি তা হ'লে?…অপু বলে, বেশ তো মা, নিয়ে যাব, যেও সেই পূজোর সময়।

সর্ব্বজয়া বলে একটা সাধ আছে অপু, বট্‌ঠাকুরদের দরুণ নিশ্চিন্দিপুরের বাগানখানা তুই মানুষ হয়ে যদি নিতে পারতিস্ ভুবন মুখুয্যেদের কাছ থেকে, তবে—

সামান্য সাধ, সামান্য আশা। কিন্তু যার সাধ, যার আশা, তার কাছে তা ছোটও নয়, সামান্যও নয়। মায়ের ব্যথা কোন্‌খানে অপুর তাহা বুঝিতে দেরি হয় না। মায়ের অত্যন্ত ইচ্ছা নিশ্চিন্দিপুরে গিয়া বাস করা, সে অপু জানে। সর্ব্বজয়া বলে—তুই মানুষ হ'লে, তোর একটা ভাল চাক্‌রী হ'লে, তোর বৌ নিয়ে তখন আবার নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে ভিটেতে কোঠা উঠিয়ে বাস করবো। বাগানখানা কিন্তু যদি নিতে পারিস্—বড় ইচ্ছে হয়।

অপুর কিন্তু একটা কথা মনে হয়, মা আর বেশী দিন বাঁচিবে না। মায়ের চেহারা অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছে এবার, কেবলই অসুখে ভুগিতেছে। মুখে যত রকম সান্ত্বনা দেওয়া, যত আশার কথা বলা সব ব'লে। জানালার ধারে তক্তপোষে দুপুরের পর মা একটু ঘুমাইয়া পড়ে, অনেক বেলা পড়িয়া যায়। অপু কাছে আসিয়া বসে, গায়ে হাত দিয়া বলে—গা যে তোমার বেশ গরম, দেখি?

সর্ব্বজয়া সে সব কথা উড়াইয়া দেয়। এ-গল্প ও-গল্প করে। ব'লে…হ্যাঁরে, অতসীর মা আমার কথাটথা কিছু ব'লে?

অপু মনে মনে ভাবে—মা আর বাঁচবে না বেশী দিন। কেমন যেন—কেমন—কি কোরে থাক্‌বো মা মারা গেলে?

(ক্রমশঃ)

বঙ্গসাহিত্যে প্যারীচাঁদ

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী

বাঙ্গলার বর্ত্তমান গদ্য-সাহিত্যের স্রষ্টা বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা পূজা করি। বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয় বঙ্কিমচন্দ্র হইতেই হইয়াছে বলিয়া থাকি। কিন্তু এই সৃষ্টির মূলে যাঁহারা আছেন, এই অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী হেতুরূপে যাঁহাদের নির্দ্দেশ করা যায়, তাঁহাদিগকে ভুলিলে আমাদের চলিবে না। সে কাঁহারা? রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়চন্দ্র দত্ত, ও প্যারীচাঁদ মিত্র, অর্থাৎ টেকচাঁদ ঠাকুর। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত-বহুল ভাষাই বাঙ্গলার আদর্শ এবং শ্রেষ্ঠ ভাষা হইবে, ইহাই তখন লোকে ভাবিয়াছিল। সেই সংস্কৃত-বহুল ভাষাই ভদ্র ভাষা, সাহিত্যের ভাষা। ইহারই অনুসরণ করিয়া সে সময়কার বাঙ্গলার গদ্য ভাষা গড়িয়া উঠিতেছিল। সকল লেখকই এই ভাষা আশ্রয় করিয়া পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা আরম্ভ করিতেছিলেন, এই সংস্কৃত-বহুল ভাষার পরিবর্ত্তে যিনি সাধারণবোধ্য গ্রাম্যভাষা চালাইতে চাহিয়াছিলেন, বাঙ্গলার গদ্য ভাষাকে সম্পূর্ণ সংস্কৃতানুবর্ত্তিতার আকর্ষণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য যিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, তিনি প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর। বাঙ্গলা ভাষা বাঙ্গলা ভাষা হইবে, অনুস্বার বিসর্গ হীন সংস্কৃত হইবে না, এই বলিয়া তিনি বিদ্রোহীর বেশে সাহিত্যের আসরে নামিয়াছিলেন। পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া, ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়া দল বাঁধিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। টেকচাঁদী ভাষা বা আলালী ভাষা সাহিত্যের ভাষা নহে, ভদ্রলোকের ভাষা নহে, শিক্ষিতের ভাষা নহে, উহা ছোটলোকের ভাষা এবং অপভাষা, এইরূপ বহু অপবাদ বহু গালাগালিই তাঁহাকে খাইতে হইয়াছিল। তথাপি তিনি উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হন নাই। অসম সাহসে ফিরেন নাই, সম্মুখের দিকে গতি আদৌ নিয়ন্ত্রিত করেন নাই।

টেকচাঁদ ঠাকুর—এই ছদ্মনাম তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাহা না করিয়া তাঁহার উপায়ও ছিল না। প্রথম সাহিত্যের ভিতর গ্রাম্যভাষা চালাইতে হইলে নিজের প্রকৃত নামের পরিবর্ত্তে ছদ্মনামেই অধিক কার্য্য হইবে ভাবিয়াই তিনি ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সাহস তখনকার কালে অসম সাহস বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত ও ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবে প্রভাবিত দেশের অবস্থা, আর এখনকার বর্ত্তমান অবস্থা এক নহে। বাঙ্গলা ভাষা—সাধারণের বোধ্য হউক, প্রাণের ভাষা হউক, সংস্কৃতের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হইবে কেন, ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। সেই সময়ে তিনি বাঙ্গলা ভাষাকে চলিত ভাষা করার চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই মধ্যযুগের সাহিত্যিকগণের পক্ষে মধ্যপথ ধরার বিশেষরূপ সুবিধাই হইয়াছিল। সংস্কৃতানুবর্ত্তিতার প্রবল স্রোতকে তিনি বাধা না দিলে বর্ত্তমান গদ্য-সাহিত্যের উন্নতি আরও পিছাইয়া যাইত কি না কে জানে? বিদ্যাসাগর, অক্ষয়চন্দ্র, ও এই প্যারীচাঁদের সংঘর্ষের ফলেই আমরা এত শীঘ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে পাইয়াছিলাম।

প্যারীচাঁদ আলালী ভাষার স্রষ্টা বলিয়া তিনি যে সংস্কৃতবহুল ভাষা লিখিতেন না, বা লিখিতে জানিতেন না, এমন নহে। তখন যে-ভাষা সাহিত্যের ভাষা ও ভদ্রলোকের ভাষা ছিল, তাহাও তাঁহাকে প্রথম লিখিতে হইয়াছিল। প্যারীচাঁদের ভাষা হইতে আমরা এই নমুনা তুলিয়া দেখাইতেছি। বলিয়া রাখি যে, এই নমুনা আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় নাই। যে

"দময়ন্তীও পতিপরায়ণা ছিলেন। সকল কামনা পতিতে পর্য্যবসান করত পতিতে মগ্ন হইয়া আত্ম-লাভ সাধন করিতেন। পতি সত্ত্বেই হউক আর পতি-বিয়োগেই হউক, সাকার কিংবা নিরাকার পতি অবলম্বনে পূর্ব্বকালীন অঙ্গনারা আত্মার উদ্দীপন করিতেন। দময়ন্তী ঘোর ক্লেশে পতিত হইয়াছিলেন। অরণ্যে পতি-কর্ত্তৃক পরিত্যাজা অর্দ্ধবস্ত্রপরিধানা, তথায় নিমেষমাত্র পতিকে বিস্মরণ না করিয়া অনেক দুর্গম স্থানে পর্য্যটন-পূর্ব্বক পুনরায় পতিকে পাইয়াছিলেন।" (বসুমতী সংস্করণ ১৪১ পৃষ্ঠা—সদ্যবধূ প্রবন্ধের মধ্যে)

আজকাল এই ভাষা আর চলে না, অথচ তখন ইহাই আদর্শ এবং শ্রেষ্ঠ ভাষা ছিল।

তুলনার মধ্যবর্ত্তী ভাষার নমুনাও তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ তাঁহার প্রবন্ধ রচনা সকল প্রকারের ভাষাতেই লিখিত আছে। ঐ পৃষ্ঠাতেই শকুন্তলা সম্বন্ধে লেখক লিখিতেছেন—

"শকুন্তলার　শিক্ষা হইয়াছিল। পালক পিতা কহেন—কন্যা ঋণ-স্বরূপ—উৎকৃষ্ট অমূল্য রত্ন—পিতারই গচ্ছিত ধন, রাজা দুষ্মন্ত কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া রাজ্যে গমন করেন। অনন্তর শকুন্তলার এক পুত্র জন্মে। তিনি ঐ পুত্রকে সঙ্গে করিয়া রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া বলেন—'রাজন্! আমি তোমার ভার্য্যা, এই বালকটি তোমার পুত্র!' রাজা তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিলেন। শকুন্তলা বলিলেন, 'রাজন্! ভার্য্যাকে অবহেলা করিও না—ভার্য্যা ধর্ম্মকার্য্যে পিতার স্বরূপ—আর্ত্ত ব্যক্তির জননী-স্বরূপ এবং পথিকের বিশ্রাম-স্থান স্বরূপা—আর সত্যই পরম ব্রহ্ম। সত্য প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিও না।'

আর একটি স্থল দেখাইতেছি, মনে হয় এইবার ক্রমশ প্যারীচাঁদের নিজের রাজ্যে আসিয়া পড়িতেছি। প্যারীচাদের প্রাণ যে-ভাষা চাহে, সেই ভাষাই এইবার আরম্ভ হইতেছে। তত্ত্বের দিক দিয়াও ইহার বিশেষ মূল্য আছে, উদ্ধৃত করিতেছি।—

"একজন নাস্তিক ও একজন আস্তিক দুইজনে এক জাহাজে গমন করিতেছিল। দুইজনে ঘোর বিচার হইতেছে, গজকচ্ছপের মত কেহই কাহাকে পরাজয় করিতে পারে না। দৈবাৎ আকাশ ঘন মেঘে পূর্ণ হইল—বায়ু ঘোরতর প্রচণ্ড হইতে লাগিল। তরঙ্গ যেন মাতঙ্গের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইল—জাহাজ ডুবুডুবু হয়, এমত সময়ে নাস্তিক প্রাণভয়ে অতি-শয় ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'পরমেশ্বর রক্ষা কর।' কিয়ৎক্ষণ পরে বায়ু শান্ত হইলে আস্তিক নাস্তিককে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বারংবার অস্বীকার করেছেন, তবে কেন তাঁহাকে ডাকেন?' নাস্তিক কহিল, 'আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ডাকি না, কে যেন আমাকে ডাকালে। বোধ হয় বিপদে পড়িলে সকলেই এইরূপ করে।' (যৎ-কিঞ্চিৎ, ৪৬ পৃষ্ঠা)

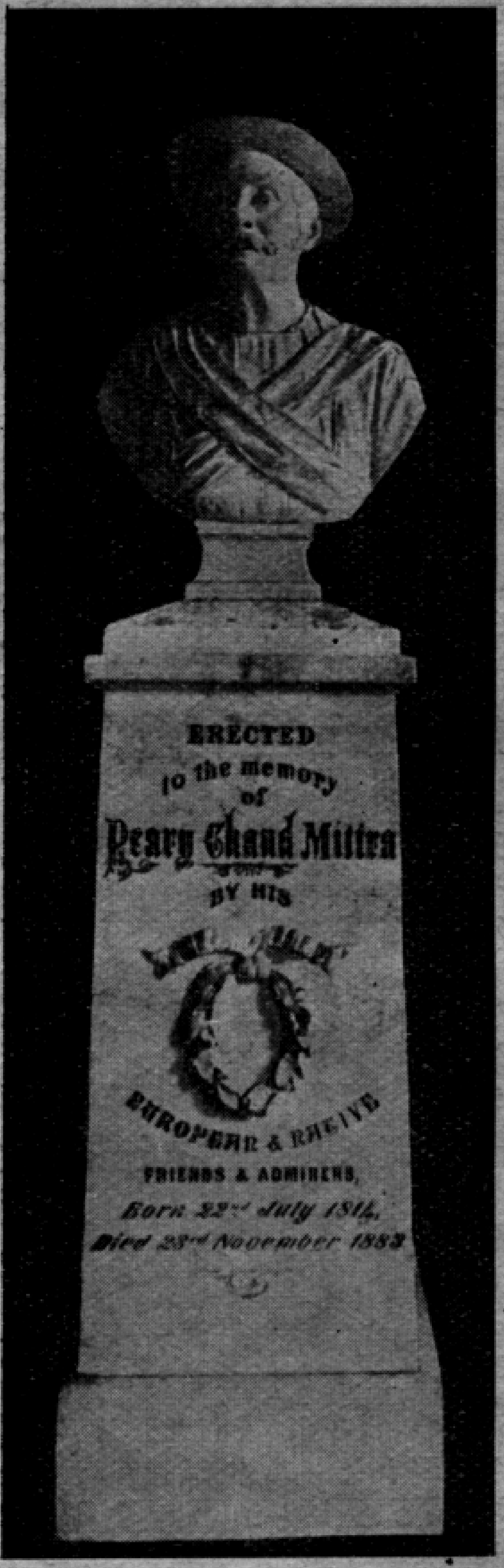

প্যারীচাঁদ মিত্রের মর্ম্মর-মূর্ত্তি

বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য যে ক্রমশই সংস্কৃত ভাষা হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে, উপ-ন্যাস নাটকের কথোপ-কথনে খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের প্রচলন যে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে, এমন কি প্রবন্ধের ভাষাও যে অনেক স্থলে কথ্যভাষার অনুরূপ হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার মূলে এই প্যারীচাঁদের প্রভাবই বিদ্যমান। তবে প্যারীচাঁদ ভাষাটিকেই মাত্র কথ্যভাষা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রুচি দেশীয় ভাবেই অনুপ্রাণিত থাকুক, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। বঙ্গভাষা সংস্কৃতের প্রভাব হইতে মুক্ত হউক,

কিন্তু ভাবের আদর্শও সংস্কৃতের প্রভাব হইতে মুক্ত হউক ইহা তিনি চাহেন নাই। সকল রচনার ভিতরই তাঁহার আদর্শের উপর গৌরব বৃদ্ধির ভাবটি বর্ত্তমান ছিল, দেশ-হিতৈষণার অভাব কোথাও পরিলক্ষিত হয় নাই। সরস ব্যঙ্গের মধ্যেও ঐ সুর, ঐ ধ্বনি। একস্থানে তিনি বলিতে-ছেন,"পুরুষজাত শিকৃলিকাটা টিয়া—কারে না পড়লে স্ত্রীকে স্মরণ হয় না। সুতরাং স্ত্রীর মান বেড়ে উঠে—সে সময় কেবল স্ত্রীই হর্ত্তা, স্ত্রীই কর্ত্তা, নতুবা স্ত্রী পায়ের তলায় পড়ে থাকে।"

তাঁহার গ্রাম্যভাষার মধ্যে মাধুর্য্য ছিল, বর্ণনার মধ্যেও সৌন্দর্য্য ছিল। একটি স্থান আমরা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"দেখিতে দেখিতে পশ্চিমে একটা কাল মেঘ উঠিল—দুই এক লহমার মধ্যে চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার হইয়া আসিল—হু হু করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল—কোলের মানুষ দেখা যায় না—সামাল সামাল ডাক পড়ে গেল। ঢেউগুলো এক একবার রেগে উচ্চ হইয়া উঠে, নৌকার উপর ধপাস ধপাস করিয়া পড়ে।"

'আলালের ঘরের দুলাল'-এর মধ্যে ঠক্ চাচা নামক একটি মুসলমান-চরিত্রের অবতারণা আছে। ঐ জাতীয় চরিত্র যে কথাসাহিত্যে স্থান পাইতে পারে, বিদ্যা-সাগরের যুগে কেহ কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার ঐ অসম সাহস দেখিয়াই মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় স্ব স্ব গ্রন্থে ঐ জাতীয় চরিত্র অঙ্কন করিতে আর ভীত হন নাই।

ঠক চাচার বর্ণনায় লেখক বলিতেছেন—

"ঠক্ চাচা বগলে একটা কাগজের পোট্‌লা, মুখে কাপড়, চোক দুটী মিটমিট করিতেছে। দাড়িটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ঘাড় হেঁট করিয়া চলিয়া যাইতেছে। কাপড়ে বাঁধা মিঠাই খুলিয়া মুখে ফেলিতে যান অমনি পিছন হইতে দুই বেটা মিশ কালো কয়েদি গোপ চুল ও ভুরু সাদা, চোক লাল, হা হা শব্দে বিকট হাস্য করত মিঠায়ের ঠোঙ্গাটি সট করিয়া কাড়িয়া লইল এবং দেখাইয়া দেখাইয়া টপ-টপ খাইয়া ফেলিল।"

এমন স্বাভাবিক করিয়া সাধারণ ঘটনা বর্ণনা করার প্রথা প্যারীচাঁদই প্রথম প্রবর্ত্তন করিলেন।

'পোটলা', 'চোক', 'মট', 'টপাটপ' 'মিশকাল' প্রভৃতি বাঙ্গলার গ্রাম্য শব্দগুলি সাহিত্যের ভিতর চালান বড় অল্প সাহসের কার্য্য নহে। উপন্যাসোক্ত যাহার তাহার মুখে বসান আর সাহিত্যের মধ্যে চালান, এক কথা নহে।

প্যারীচাঁদের ভাষা, লিখনপদ্ধতি ও মতামত পর্য্যন্ত উত্তরকালে বাঙ্গলা সাহিত্যের ভিতর এরূপভাবে চলিয়া যাইবে, তাহা তিনি নিজে ভাবিয়াছিলেন কি না জানি না। তাঁহার "মদ খাওয়া বড় দোষের" জীবন্ত চিত্র যে সধবার একাদশীর নিমচাঁদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে, কে ভাবিয়াছিল? কে মনে করিয়াছিল, মাইকেলের "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ"এর মধ্যে তাঁহার প্রভাব এরূপ সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যাইবে?

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্ত মহাশয় সম্যক সংস্কৃতানু-সারিণী ভাষা সৃষ্টি করিয়া উহাই সাহিত্যের ভাষা, উহাই আদর্শ বঙ্গভাষা, উহাই ভদ্রলোকের ভাষা, এই ধারণা দেশবাসীর মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়া দেন। তাঁহাদের মধ্যে আদর্শও ছিল, মনুষ্যত্ববর্দ্ধক উপাদানও ছিল, সমাজ-হিতৈষণাও ছিল। কিন্তু সে আদর্শ ঠিক বাঙ্গালী সাধারণের মধ্য দিয়া ফোটে নাই। সে উপাদানটি পল্লীর বাঙ্গালী সমাজের বলিয়া আমাদের গ্রহণ করিবার উপায় ছিল না। সে সমাজ-হিতৈষণা উচ্চাঙ্গের; সাধারণের দোষ দুর্ব্বলতার মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে আসে নাই, এক কথায় তাঁহাদের আদর্শ সৃষ্টি ও আদর্শ বর্ণনার মধ্যে বাঙ্গলার, তথা দীনদুঃখীর, সুখদুঃখ স্থান পায় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাধারণতঃ অনুবাদ সাহায্যেই সাহিত্যের প্রচার এবং প্রসার করিয়া গিয়াছেন। অনুবাদ-সাহিত্যই তাঁহার দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছিল। বর্ণপরিচয়, ব্যাকরণকৌমুদী, সে স্বতন্ত্র সামগ্রী। অক্ষয়চন্দ্র দত্ত মহাশয় একজন নীতিবাদী ও আদর্শকাম ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার গম্ভীর প্রকৃতির অনুরূপ সাহিত্যই তিনি গড়িয়া তোলেন; মানবের সদগুণ-সকল কি প্রকারে সমাজের মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে পারে তাহার উপায় তিনি নানারূপে দেখাইয়াছেন। তিনিও

পল্লীগ্রামের মধ্যে আসিয়া, পল্লীর সুখদুঃখ আলোচনা করেন নাই। তাঁহারা করেন নাই বলিয়া মন্দ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি না। তাঁহাদের আদর্শে তাঁহারা ঠিকই ছিলেন।

প্যারীচাঁদের আদর্শ অন্যপ্রকারের। তিনি ইঁহাদের অনুসৃত পথে আদর্শের সন্ধান না করিয়া অন্যত্র আদর্শের সন্ধান করিয়াছেন। তিনি ইঁহাদের বিরুদ্ধ একটি নূতন পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন। তিনি আপনার কথাসাহিত্যে বাঙ্গলার খাঁটী সমাজচিত্র, পল্লীর প্রকৃত নরনারীর চিত্র এবং তাহাদেরই সত্যকারের সুখদুঃখের চিত্রই আঁকিয়াছেন। সীতা, শকুন্তলা, বা দময়ন্তী প্রভৃতির কথা প্রবন্ধের ভিতর রাখিয়া দিয়া কথাসাহিত্যে বাবুরাম-গৃহিণী ও মতিলালের বধূটিকে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা কাহারও অপেক্ষা তাঁহার অল্প ছিল না। তবে সেই আদর্শটি সাধারণ লোকের সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া, পল্লীর ছায়াস্নিগ্ধ ছবিখানির বর্ণনা করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গালী সমাজের পাপ, দোষ ও দুর্ব্বলতাও তাঁহার বর্ণনার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। পল্লীর সুখদুঃখ অভাব-অভিযোগের আলোচনা করিয়া সমাজকে দোষশূন্য করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ছিল। প্রবন্ধ লিখিয়া সমাজ-চিত্র আঁকিয়া, এমন কি ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়াও সেই উদ্দেশ্য, সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

তিনি জানিতেন পল্লী-জননীর ছায়াশীতল পর্ণকুটীর-খানির মধ্যেই জাতির মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে। জাতির জীবনীশক্তি নগরে নাই, আছে পল্লীতে। তাই তিনি পল্লীর ঘটনা লইয়া আপনার কথা-কাহিনী আরম্ভ করিয়াছেন। শ্যামশষ্পময় মাঠ এবং গ্রামের গোময়-লিপ্ত অঙ্গনের মধ্যেই তিনি আপনার স্থান বাছিয়া লইলেন। পুষ্করিণীর ঘাটে পল্লীরমণীদের আলাপের মধ্যে তিনি কেবল মাধুর্য্যই দেখেন নাই। পরকুৎসা এবং হিংসাদ্বেষের কালিমাটুকুও দেখিয়াছেন। ধনী পরিবারের যে চিত্রখানি তিনি কথাসাহিত্যে স্থান দিয়াছেন, তাহা পল্লীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিত্র, নগরবাসী বিলাসী ধনীর নহে। সে ধনী পরিবারের গৃহিণীকে হিন্দুরমণী করিয়াই আঁকিয়াছেন। স্বয়ং ইংরেজী শিক্ষিত হইয়াও পাশ্চাত্য রমণীর প্রাণ তাহার মধ্যে পুরিয়া দেন নাই। দেশীয় মূর্ত্তির ভিতর ইঙ্গবঙ্গ সমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার পক্ষপাতী তিনি একেবারেই ছিলেন না। দেশীয় চিত্রের দেশীয় সজ্জাই হউক, প্রাণপ্রতিষ্ঠাও দেশেরই মন্ত্রে হউক, ইহাই তাঁহার মত ছিল। তাঁহার সৃষ্ট নারী দোষে গুণে বাঙ্গালী নারী; তথাকথিত অর্দ্ধসভ্য হউক, তথাপি পল্লীর নারী। প্রৌঢ় বাবুরামের দ্বিতীয় পক্ষের অল্পবয়স্কা স্ত্রীকে পর্য্যন্ত মৌন বেদনাময়ী পল্লীবধূরূপেই তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন। বাবুরামের পুত্র মতিলাল ফোতোবাবু! পল্লীর কুসঙ্গে মিশিয়া কলিকাতার আবহাওয়ার মধ্যে গিয়া সে একটি অদ্ভুত জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার নিকট গর্ভধারিণী (অবশ্য পতিহীনা হইলে পর) কেবল অনাদর ও তিরস্কারেরই ভাগিনী হইয়াছেন তাহা নহে, দুঃখ বেদনা জানাইতে আসিয়া গালে চড় পর্য্যন্ত খাইয়া ফিরিতে হইয়াছে। চড় খাইয়া মতিলালের মায়ের মুখে তিরস্কার ফুটিল না। উপদেশ বর্ষিত হইল না। সৌন্দর্য্য বিকাশ তেমন হইল না বটে, কিন্তু কঠোর সত্য ফুটিয়া উঠিল। মাধুর্য্য রহিল না বটে, কিন্তু স্বাভাবিক হইল। সেই মাতাই একদিন (অবশ্য স্বামীর বর্ত্তমানে) মতিলাল এবং তাহার সঙ্গীদের দ্বারা অবমানিতা এক রমণীকে তাহাদের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই মা চড় খাইয়া ফিরিয়াই গেল, মুখে কিছু প্রকাশ করিল না।

রক্ষা করিয়া গৃহিণী যে কথাকয়টি রমণীটিকে বলেন, তাহা বড়ই মিষ্ট; পাঠককে উহা শুনাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

'মা! কেঁদ না, ভয় নাই—তোমাকে আমি বুকের উপর রাখ্‌ব। তুমি আমার পেটের সন্তান—যে স্ত্রী পতিব্রতা তাহার ধর্ম্ম পরমেশ্বর রক্ষা করেন। এইরূপে সান্ত্বনা দিয়া গৃহিণী সঙ্গে লইয়া তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিলেন।"

বাঙ্গালী গৃহের এরূপ চিত্র বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির যুগেও অধিক আছে মনে হয় না।

প্যারীচাঁদের অঙ্কিত চরিত্রগুলি সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া

অবশ্য ভ্রমর, সূর্য্যমুখী, কুন্দ, আয়েষা, রজনী, দলনী, কমল বা ইন্দিরার মত ফুটে নাই। একেবারে ফুটে নাই, তাহা বলিতে পারি না। এ চরিত্র ছায়ার মত চক্ষুর উপর ভাসে, প্রাণপ্রতিষ্ঠার দ্বারা সজীব হইয়া হৃদয়ে গাঢ়রূপে অঙ্কিত থাকে না। কায়া আছে কিন্তু তাহার সাজসজ্জা নাই, প্রাণ আছে কিন্তু তাহার স্পন্দন নাই। কতকগুলি বৃক্ষের চারা তৃণরাশির মধ্যে মাথা তুলিয়াছে, ফলফুলে ভরিয়া উঠে নাই। আজ সেই চারাগুলিই বঙ্গ-সাহিত্যের উদ্যানে পৃথক্ নাম ধরিয়া, সুন্দর বেশভূষা পরিয়া ফুলফলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

সংস্কৃত দুরূহ শব্দগুলির স্থানে যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়, সেদিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। খয়ের ছাড়িয়া খদির, চিনি ছাড়িয়া শর্করা, কলা ছাড়িয়া রম্ভা, ঘি ছাড়িয়া ঘৃত প্রভৃতির ব্যবহার তিনি পছন্দ করিতেন না। বাপ, মা, দাদা, ভাই, বহিন, ঠাক্‌রুণ ও ভায়া প্রভৃতি ডাকই তাঁহার প্রিয় ছিল।

তাঁহার উপন্যাসের নাম-করণেই তাহার অভিপ্রায় বুঝা যায়। কর্ত্তা জমিদারের নাম বাবুরাম। তাহার বন্ধুদের নাম বেচারাম ও বাঞ্ছারাম; এমন কি ঠক্ চাচা (মুসলমান বন্ধুটির নাম) পর্য্যন্ত। নায়কের নামটি মতিলাল, তাহার ভ্রাতার নাম রামলাল। লাল কথাটি জুড়িয়া দেওয়ার মধ্যে ঐ একই উদ্দেশ্যসিদ্ধি। প্যারীচাঁদের সৃষ্ট পুরুষ-চরিত্রগুলির কোনোটি অবশ্য গোবিন্দলাল, নগেন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, নবকুমার, ব্রজেশ্বর, সত্যানন্দ বা জগৎসিংহের মত হয় নাই। সাধারণতঃ ইহার চরিত্রগুলি যেন অর্দ্ধশিক্ষিত, অর্দ্ধমার্জ্জিত, অর্দ্ধ-সভ্য, ও কথঞ্চিৎ গ্রাম্যভাবাপন্ন। যাঁহাকে ভাল করিয়াও আঁকিয়াছেন, তিনিও বর্ত্তমান যুগের বর্ত্তমান ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গড়িয়া উঠেন নাই। প্যারীচাঁদ বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী সমাজের খাঁটী বাঙ্গালীই করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অবশ্য তেমন সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। আবার তাহাদের বিদেশীয় করিয়াও গড়িয়া তোলেন নাই। বাঙ্গালায় মাতঃ, পিতঃ, ভ্রাতঃ প্রভৃতি

নরনারী সাধুভাষায়, কাব্যের ভঙ্গীতে এবং ইংরেজী আদবকায়দায় কথা কহিবে, ইহা তিনি ভালবাসিতেন না। স্ত্রীকে গিন্নী, শাশুড়ীকে ঠাকরুণ, বন্ধুদের কাহাকেও বেণী ভায়া, কাহাকেও বেচারাম-দাদা এইরূপ সম্বোধন পদই ব্যবহার করিয়াছেন।

প্যারীচাঁদ প্যারীচাঁদই ছিলেন। টেকচাঁদ ঠাকুরই তাঁহার যথার্থ পরিচয়। বিদ্যাসাগর বা অক্ষয় দত্ত মহাশয়ের কার্য্য এক, তাঁহার কার্য্য পৃথক। তাঁহার "আলালের ঘরের দুলাল"-এর যথার্থ পরিচয় দিতে হইলে বা তাহার প্রকৃত বিচার করিতে হইলে, সেই সময়কার দেশ কাল অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে। জঙ্গলের মধ্যে উদ্যানের সৌন্দর্য্য অন্বেষণ করিলে চলিবে না।

"আলালের ঘরের দুলাল" সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই পাঠকগণকে শুনাইয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকেন অথবা কেহ ভবিষ্যতে করিতে পারেন, কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গলা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই। ভবিষ্যতে হইবে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গলা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ, ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।" (প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা)

বঙ্গসাহিত্য এখন উন্নতির পথে গিয়া চরম পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তাঁহার যোগ্য সম্মান দিবার উপযুক্ত সময় আমাদের মনে এখনই আসিয়াছে। তাঁহার বিদ্রোহ এক নূতন রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। তাঁহার উদ্যম জয়যুক্তই হইয়াছে। প্যারীচাঁদ মিত্র সত্যসত্যই যে একজন অন্যতম যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।*

জাতক

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

তুমি আসো,—আসিতেছ তুমি চিরদিন,—
চিরন্তন,—সুচির নবীন,—
প্রকাশের হে উৎস চপল!
বসুধার সুখদুঃখজন্মমৃত্যু-বন্ধুর উপল
প্রগতি-তরঙ্গে ভরি',
নির্ম্মল নির্ঝরি',
উষরে পুষ্পিত করি' আনন্দ-উৎপল,
আসিতেছ প্রাণস্পন্দ নৃত্যছন্দে দুলে'
স্বচ্ছন্দ প্রবল,—
আলোকে আঁধারে নিত্য পা-ফেলে' পা-তুলে'।
তোমার চলন-তালে চরণের তলে
শঙ্কিত, স্তম্ভিত কাল···কালজয়ী তুমি ক্রীড়াচ্ছলে!

•

যতিহীন গতিসূত্রে অপরূপ গীতিমাল্য গাঁথো সৃজনের,—
প্রথম সম্ভব তুমি অ-কল্পিত অ-সম্ভব রহস্যঘনের।
ফুটে ফুল,—বোঁটা টুটে প্রত্যহ সে ঝরে
এই মর্ত্ত্য-মৃত্তিকার 'পরে;
তবু ফুটে' উঠে ফুল—
আকুল মুকুল
স্ফুটন-উন্মুখ সারি-সারি
পাপ্‌ড়ির পাখা মেলে' দিয়ে চলে পাড়ি।
এই যে ফুলের ধারা
মৃত্যুহীন—শেষ-হারা,
অ-শেষের অ-মৃতের এই ধারা তুমি।

ঐ তারা তুমি—
অসীমের অন্ধকারে জেগে'
মহাশূন্য থেকে,
অসম্বৃত জ্যোতির্বেগে
বাসনার বাষ্প উৎক্ষেপিয়া,
অন্তরের অসহ উল্লাসে যে তারাটি উচ্ছ্বসি' কাঁপিয়া
অবিশ্রান্ত আবর্ত্তিয়া
ফিরিছে নর্ত্তিয়া
দিক হ'তে দিগন্তরে তাপ বৃষ্টি করে,'—
নব নব আলোক ও লোক সৃষ্টি করে'···
তুমি নিখিলের সেই তাপের তাপস
জ্যোতির্ম্ময়;—সৃষ্টি-তামরস
সে তাপের তপেতে তোমার
রূপে রসে অভিনব
নব নব
এক হ'তে আর
অগণিত দলে
বিকশিয়া চলে:—
জড় চলে আবর্ত্তিয়া প্রাণে,
প্রাণ ধায় আত্মার সন্ধানে,
আত্মা ছুটে পরমাত্মা পানে;
তারপর জড় ও চেতন
হারাইয়া সীমা-আয়তন
অসীমায় করে আবর্ত্তন।
তুমি এই রূপ ও অরূপ—
বিবর্ত্তিত অপূর্ব্বের রূপ!

তুমি আবরণাতীত,—মুক্ত,—দিগম্বর,—
উজ্জ্বল-সুন্দর,
সুখদুঃখশোকোত্তর ক্ষয়হীন আনন্দ-ভাস্বর
স্বপ্রকাশ প্রত্যূষ-ভাস্কর;
নিশান্ত জগৎ জাগে নিদ্রা পরিহরি'
শুনি' তব আলোক-বাঁশরী
শাশ্বত অমর।

মাঝখানে

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

রাত্রি এগারটা। প্রায় নিশুতি। রাস্তায় মুসলমান পথিক গাইতে গাইতে চলে গেল,

মেরে দরদী জীগর কি খবর হি নেহি।
এ মেরে দরদী জীগর কী—

স্বামী 'ল্যান্সেট'খানা মুড়ে একটা হাই তুলে বললেন—কি আশ্চর্য্য! এত পড়তেও পার! দেখ দিকিনি, ঠিক যেন আমারি মনের কথা গেয়ে গেল লোকটা।

স্ত্রী হাতের মাসিকপত্রখানা রেখে হাসলে,—আমি ত পড়ছিলাম, নিজে কি করছিলে—ধ্যান করছিলে বুঝি?

—তাই ত করছিলাম। দেখ না ও গান গেয়ে গেল, সুরটি কথাটি আমার 'কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিল গো'। তোমার কি হয়েছে—বেশ তন্ময় হয়ে পড়ছিলে ত। বেশ গানটি, মানেটা বুঝেছ?

—কি? না, তেমন শুনিনি। আমি ত তোমার মতন অমনোযোগ দিয়ে পড়ি না—

—কি মনোযোগিনী!

—আর কাজ নেই, থাক। কি বলতে কি ব'লে বসবে। বরং গানটার ব্যাখ্যা করা হোক শুনি।

—'মেরে দরদী জীগর কি খবর হি নেহি,' মানে আমার যে দরদী স্বজন তার কোনো বার্ত্তা খোঁজই পাওয়া গেল না আজও—এইটুকুই শোনা গেল। আমার মনে হ'ল, আমার যিনি দরদী স্বজন তাঁর পাত্তা আমি পেয়েছি বটে, কিন্তু আপাততঃ—

বাধা দিয়ে স্ত্রী বললে,—হয়েছে থামো দিকি এখন, কিন্তু বেশ গানটা, না?

—তাই ত বলছিলাম, শুনলেই না।

গোলাপ ফুলের কুঁড়ির গায়ের সবুজ আবরণের মাঝ থেকে কুঁড়িটি আস্তে আস্তে বড় হয়ে ফুটে ওঠার মতন—রাত্রির বুক থেকে দিনের পাপড়ি বিকশিত হয়ে ওঠে; তেমনি সুন্দর, বিকশিত, অপরূপ। বাধাহীন আলো আনন্দের বার্ত্তা বয়ে আনে, ধারা বর্ষণ সেই আনন্দেরই চঞ্চল উচ্ছল নূপুরের নৃত্য-ঝঙ্কার নিয়ে আসে; হেমন্তের কুহেলিকা তারই চারিপাশে ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা করে। মাস ঋতু দিনের আনন্দ-চঞ্চলতা যেন সমস্ত দেহে মনে জীবনে ভরপুর হয়ে থাকে। প্রভাতের আলোয় রক্ত শুভ্র শেফালির সৌন্দর্য্য; দুপুরের রৌদ্র কল্কে ফুলের রঙে ত্রিভুবন আলোয় ভরিয়ে দেয়; অসামান্য অপূর্ব্ব শান্ত শ্রীমতী সন্ধ্যা নেমে আসে। দিন আসে লঘু নৃত্যপর; রাত্রি আসে যেন চিত্ত-শিশুকে জননীর মত তার ঘুম পাড়ানী কোলে নিতে ...

জীবন যেন স্বচ্ছ প্রবাহিনী!

পাঁচ বছরে খোকার নাম বদলে রণজিৎ বলে ডাকা হয়, মেয়ের নাম শীলা হয়। ছেলে বাড়ীতে পড়ে, মেয়ে স্কুলে যায়।

মা ভাবে নিজেরা কত বড় হয়েছে। ছেলে-মেয়ের মা। তাদের খাওয়া দাওয়া দেখে—কাপড় গোছায়, ঘরকরণার কাজ দেখে শোনে। কাজেরই পারিপাট্য সাধনে সারা বেলা কেটে যায়। নিজে কিন্তু সিঁদুর-টিপটি পরে পরিষ্কার ফরসা শাড়ীখানি পরতেও লজ্জা করে। চুল বাঁধতে পারে না, কোনোক্রমে এলো-খোঁপা জড়িয়ে নেয়।

বাপ বলে, তুমি যে কি হয়ে থাক, যেন ভূতের মতন। আর কেউ-ই ত তোমার মতন করে থাকে না। কোত্থেকে একটা আধময়লা মোটা শাড়ী খুঁজে আনো, আশ্চর্য্য! সে-সব সখটখগুলো গেল কোথা? আমি কি শাড়ীও তোমার ঐরকম বিদঘুটে মোটা আনি? নিজে আনানো হয়েছে বুঝি?

—তুমি যেন কি—মোটা আবার কোথায়? বুড়ো বয়সে আবার সাজলে যে সং মনে করবে ছেলেরা।

—আচ্ছা পাগল তো! আট বছরের ছেলেমেয়ের কাছে লজ্জা! নাঃ, তোমার মাথার কিছু গোল আছে। আরে, আমি কি সাজতে বলছি? বলছি—পরিষ্কার কাপড় পরার কথা—

অপ্রস্তুত মা হাসে।

কিন্তু পরিষ্কার শাড়ী আর পরা হয় না, সিঁদুর-টিপটি পরা হয় ত চুল বাঁধা হয় না। মনে হয়, বুঝি সকলেই তার দিকে চেয়ে আছে।

মৃদু হেসে স্বামী বললেন, কত বয়স হ'ল গো আমাদের. মনে আছে?

সরলভাবে স্ত্রী উত্তর দিলে,—আমার হ'ল ছাব্বিশ, তাহলে তোমার তেত্রিশ—না?

—উহুঁ, ভুলে গেছ বোধ হচ্ছে। আমার আমি ঠিক বলতে পারলাম না, মাকে জিগগেস করব'খন। তোমার বোধ হচ্ছে একচল্লিশ হ'ল, তাহ'লে আমার কত হবে অবশ্য হিসেব করতে পার।

—যাও, ঠাট্টা করছ,—রাগ করে স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পকেট থেকে ষ্টেথস্কোপ ইত্যাদি বের করে টেবিলে রাখতে রাখতে স্বামী মৃদু স্বরে গাইলে—

ঈষৎ রাগের নিছনি বহিয়া···

ওগো শুনছ? উত্তর দেয় না। এ সাজের কথা নয়—কাজের কথা। মা ডাকছিলেন খেতে,—দেখ ত খাবার দিলে কি না।

শাশুড়ী সন্ধ্যেবেলা মালা করেন, মানস জপ করেন। শ্বশুর নাতি নাতনীকে গল্প বলেন।

মা থাকেন কাজের মাঝে, আদেশ-নির্দ্দেশের সরবরাহ তদারক করতে। আনন্দচঞ্চল মন শরতের শুভ্র লঘু মেঘের মতন ছোট ছোট হাসি কথা, তুচ্ছ মানঅভিমানের স্বপ্নলোক থেকে স্বামীর পায়ের শব্দে চকিত হয়ে ওঠে, উন্মুখ স্মিত হাসিভরা দৃষ্টিতে তরুণ মন ফুটে ওঠে—কিন্তু ভাবে, কত বড় হয়েছে, কত বয়স হয়েছে ··সন্তানের মা···

তারা ডাকলে উত্তর দেন, "কি বাবা"! যেন বর্ষীয়সী শাশুড়ী হাসেন মনে মনে, ওঁদের কালে ছেলেদের ডাকে ও রকম করে উত্তর দিতে ওঁদের ভারি লজ্জা হ'ত! এখনকার এরা···

বিকেল হ'লে প্রায়ই বলেন, বৌমা চুলগুলো জড়াও না গা। ব'লে, এলো চুলে শুতে নেই। তোমাদের বাছা এখনকার কিছু 'মানা' জানা নেই।

স্বামী থাকেন কাজের উন্নতির কল্পলোকে। বাড়ীতে যখন থাকেন তখনও নিজের কথা ভাবলে একবারও নিজকে বয়স্ক বলে মনে করেন না।

বেদনাহীন বিরামহারা চঞ্চলগতিতে দিন বয়ে যায়। স্ত্রীর মনের ছেলেমানুষটি কখনও ধরা দেয়, কখনও লুকিয়েই থাকে; স্বামীর ব্যস্ততার পাশ থেকে, কাজের মাঝ থেকে সেটা কিন্তু সময়ে অসময়ে বেরিয়ে এসে তাকে পরিহাস করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

হঠাৎ একদিন সমস্ত ত্রিভুবনের গতিচক্র ওদের বাড়ীতে থেমে গেল।

আমি যে ডাক্তার, আমার কথাই ঠিক। অসুস্থ স্বামী চোখ বুজে স্ত্রীর হাতখানা নিজের কপালের উপর হাত দিয়ে চেপে ধরলেন।

—হোক্ গে, তাই বলে আমি আর ঘরে থাকতে পারব না।

—আর খোকাকে কি করে দেখবে?—ক্লান্তভাবে পাশ ফিরে শুয়ে স্বামী বল্লেন, আঃ—গায়েও এত ব্যথা হয়েছে। শঙ্কিত ব্যাকুল চোখে স্ত্রী শুধু চেয়ে রইল।

রাত্রে ছেলে মেয়ে শুইয়ে স্ত্রী ফেরে,শাশুড়ী যান শুতে।

—কোথায় যে তোমার ছোঁচ জানি না।

—তুমি শুধু বোসো না তাহ'লেই হবে। আঃ, তাই ব'লে অত কাছে এস না—ওকি পাগল!

তোমার লাগবে না, মিনতি করে স্ত্রী বল্লে। দু ফোঁটা জল ঝরে পড়ল।

—আহা তোমার হবে যে, কি ছেলেমানুষ!

সকালে পূজো সেরে শাশুড়ী আসেন ঘরে, "খোকা চন্নামেত্তরটুকু মুখে দিই, হাঁ কর্।"

ফাঁকে ফাঁকে এসে দেখে যায়, ছুঁতে পারে না; একবার ধূপকাঠি জেলে দেয়, একবার নিমঝাড় দিয়ে যায়। কখনো ব'লে 'হাত বুলোনো বাতাস কিছু করলে কষ্ট কম্‌তে পারে কি?' শাশুড়ী না থাকলে কথা কইতে চোখ কেবলি সজল হয়ে ওঠে।

স্বামী ওর দিকে চেয়ে থাকে। খানিকটা বুঝতে পারে, আবার আশাও হয়। ভাবে এমনি কি হবে। মুখে ব'লে, 'তুমি ওদিকের সব দেখে সেরে তখন এসো, মা যখন খোকাকে দেখবেন দুপুর বেলা'।

মনে হয়, কি দুর্ভাগ্য, কি করে থাকবে···স্ত্রী ভাবতে পারে না, সমস্ত শরীরমন অবসাদে শিথিল···

স্বামী বলে, আমাকে কি রকম দেখতে হয়েছে? তোমার ঘেন্না করছে?

সন্তর্পণে স্বামীর পাশে নীচু হয়ে মাথাটা রেখে বলে, আমার হ'লে করত তোমার?

দিনরাত্রি কাজকর্ম্ম সংসার ঘরকন্না হঠাৎ কেমন করে গতিহীন অলস মন্থর হয়ে গেল। সমস্ত যেন মিছে নিরর্থক বিস্বাদ হয়ে গেল।

কেমন করে দিন কাটল, আর কাটে কে জানে। ঐ চার প্রহরবেলা ঘিরে রাত্রিদিন বর্ষা-বসন্ত তেমনি আসে যায়। কোনোদিন মন যেন থমকে দাঁড়ায়, এ কি আলো···?

চকিত হয়ে ওঠে কখনও, একি ছায়া···শ্রান্ত রাত্রি, অলস দিন···

যেন দৃষ্টিহীনের জগৎ···

গুরুজনেরা ডাকেন 'মা', ছেলে-মেয়েরা ডাকে 'মা', ধ্যানমগ্না তপস্বিনী জেগে ওঠে, কর্ম্মলোকে বেরিয়ে আসে। আর 'বড়' হবার বাধা নেই, বুড়ো হওয়ায় কোনো আপত্তি নেই—সবারি মা। কেমন করে শোকার্ত্ত স্বজনআত্মীয় তাকে বড়র সিংহাসনে মার আসনে কখন বসিয়ে দিয়েছেন। অনেক বড়—সংসারে থেকে অনেক দূরে,—যেন কোন্ তপোবনে নৈমিষারণ্যে সে আছে।

মনের ভেতর জেগে ওঠে, কত বয়স হ'ল গো আমাদের? তোমার বুঝি একচল্লিশ!

গোপন অন্তরের কোন্‌খান থেকে সেই ছেলে মানুষ নারীটি বেরিয়ে এসে সন্ন্যাসিনীর সিংহাসন থেকে নেবে তার পায়ে লুটিয়ে পড়তে চায়।

রাত্রির স্বপ্নে দিনের অবসর লোকের স্বপ্নে সে থাকে মহতের সঙ্গে, আপনার মৃত অস্তিত্ব নিয়ে ধ্যানের মাঝে! কর্ম্মলোকে, সংসারে সে 'মা'। অতিথি-সজ্জন অপরিচিত পরিচিত, বৃদ্ধ তরুণ সকলের 'মা'।

রাত্রিদিবার মাঝখানে সন্ধ্যার মতন জীবনমরণের মাঝখানেও একটা জায়গা আছে যেখানে মৃত্যুসাগরের নোনাজল চোখে লেগে চোখ আকুল করে জল আসে। তটের ধারে বসে এ-পারের গর্জ্জন, ও-পারের তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না, কানে আসে না। পিছনে ফিরে যেতে পথহীন মরু, মৃত্যু যেখানে অমৃতপাত্র ভরে নিয়ে প্রতীক্ষা করে মনে হয়। জীবনের সমস্ত গতি অচল হয়ে স্তব্ধ-বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। ওর আর বড় হওয়া হয়নি—সেইখানে থেকে একই লাইন ফিরে ফিরে মনে আসে—

কথা ছিল—এক তরীতে কেবল তুমি আমি,
যাব অকারণে ভেসে—কেবল ভেসে।

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

২৯

সন্ধ্যার সময় বিজয় বাড়ী ফিরিয়া ঘরে ঢুকিয়াই চীৎকার করিয়া বলিল, "এ কি মায়া-দি, কোন্ আলাদিনের দৈত্য এসে দিন-দুপুরে আমার ঘরটা এরকম বদলে দিয়ে গেল?"

মায়া গম্ভীর মুখে বসিয়াছিল। বিজয়ের কথায় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "দৈত্যের মধ্যে ত আমি আর মহেশ। যা ছিরি করে রেখেছিলে ঘরের, ঢুক্‌লেই মাথা ঘুরে ওঠে।"

বিজয় বলিল, "তা না ঢুক্‌লেই ত হয়। কি কারণে হঠাৎ আমার ঘরে তোমার শুভাগমন হ'ল? আমার কাপড়-চোপড় বই-খাতা সব ফেলে দিয়ে ঘর পরিষ্কার করেছ না কি?"

মায়া বলিল, "সব আছে তোমার মায়ের ঘরে, ভাবনা নেই। এখন হাত মুখ ধুয়ে চা-টা খাও, ক্রমে সব আবর্জ্জনাগুলিই ফিরে পাবে, কিছুর জন্যে আফসোস করতে হবে না।"

বিজয় বলিল, "চা? চা পাব কোথায় শুনি? বাবা গিয়ে অবধি ত ও-জিনিষটার মুখও দেখিনি। গেলাস গেলাস জলই গিলি দুবেলা, কেবল কলেজের টিফিনের সময় ট্যাঁকে পয়সা থাক্‌লে, বেরিয়ে গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসি।"

মায়া বলিল, "আজ বাইরের দুজন ভদ্রলোক এসেছিলেন কি না, তাঁদের জন্যে চা, জলখাবার সব ঘরে করা হয়েছে, তোমার জন্যেও তুলে রেখেছি।"

বিজয় বেতের চেয়ারটায় বসিয়া বলিল, "কে আবার ভদ্রলোক এল এখানে? তাই বুঝি আমার ঘর চড়াও করেছিলে?"

মায়া বলিল, "এ যে বাবার ম্যানেজার শিবচরণবাবু আর তাঁর ছেলে। ওদেরই সঙ্গে পরশু আমি যাচ্ছি কি না, তাই আজ দেখা করতে এসেছিলেন।"

বিজয় বলিল, "ও, এমন জিনিষটা মিস্ করলাম। নানা কারণেই দেবকুমার-চিজটিকে দেখবার আমার বড্ড ইচ্ছে ছিল।"

মায়ার গালের কাছটা একটু লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কি কারণগুলি শুনি?"

বিজয় বলিল, "তা নাইবা শুন্‌লে? সব কথাই কি আর মেয়েদের সাম্‌নে বলা যায়?"

বিজয় একপালা বাঁদরামীর জোগাড় করিতেছে দেখিয়া মায়া তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। জ্যাঠাইমার ঘরে আর তখনই যাইতে ইচ্ছা করিল না, সোজাসুজি ছাদের উপরে উঠিয়া গেল।

দেবকুমার এবং মায়াকে লইয়া একটা গুজব কেবল মাত্র যে রেঙ্গুনেই ছড়াইয়া ছিল, তাহা নহে। কলিকাতায়ও যে এক রকম একটা-কিছু কানাঘুষা পরিচিত মহলে কিছু দিন হইতে চলিতেছে, তাহা মায়া ক্রমেই টের পাইতেছিল। অথচ এত দিন পর্য্যন্ত তাহারা দুজন দুজনকে চাক্ষুষ দেখে নাই পর্য্যন্ত। কিন্তু বাঙালী সমাজে তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। গুজব রটান স্বচ্ছন্দেই চলে।

আজ তাহার সহিত দেবকুমারের দেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু এমন ভাবে দেখা না হইলেই যেন ছিল ভাল। দেবকুমারের কথা সে আগে অনেক শুনিয়াছে, নিজের পিতার কাছে, শিবচরণবাবুর কাছে, বাণী ও তাহার মায়ের কাছে। সে যে কত সুশ্রী, কত বুদ্ধিমান্ এবং কত খানি উগ্র রকম নবীনপন্থী তাহা শুনিতে শুনিতে মায়ার দুই কান বোঝাই হইয়া গিয়াছে। দেবকুমারকে দেখিবার এবং তাহার সঙ্গে আলাপ করিবার কৌতূহল চিরদিনই তাহার ছিল; দেবকুমারের চিত্তের উপর নিজের কিছু একটু প্রভাব বিস্তার করিবার ইচ্ছাও যে আপনার অজ্ঞাতসারে তাহার মনে ছিল না, তাহাই বা কে বলিতে

পারে? মনে মনে এই প্রথম সাক্ষাৎ ব্যাপারটিকে কত বার কত রকম করিয়া সে ভাবিয়া দেখিয়াছে, কল্পনায় কত রকম রং তাহার উপর মাখাইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক যাহা ঘটিল, তাহা মায়ার মনকে একেবারে বিরক্ত করিয়া তুলিল, দেবকুমারের উপরে নয়, নিজের উপরেই। দেবকুমার বিলাত যাইবার আগে না কি তাহার আত্মীয়স্বজন রক্ষাকবচ-স্বরূপ তাহার গলায় একটি পত্নী ঝুলাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে সে বলিয়াছিল, "আমার আয়ার কাজ করা অভ্যাস নেই, খুকীটুকি মানুষ করতে পারব না।" জনৈক আত্মীয় বলিয়াছিলেন, "তবে তোমার মতলবখানা কি বল দেখি? বিলাত থেকে মেম বউ নিয়ে আস্‌বে বুঝি?"

দেবকুমার বলিয়াছিল, "মেমের শাদা চামড়ার লোভে ত করব না, শিক্ষাদীক্ষার লোভে করতে পারি।"

মায়া এই গল্পটি বাণীর কাছে অনেকবার শুনিয়াছে। শুনিলেই তাহার মনে কেমন একটা উত্তেজনা আসিত। দেবকুমার নিজে এমন একটা কি যে, দেশের মেয়েদের প্রতি তাহার এমন অবজ্ঞা? এমন মেয়ে কি দেশে কেহ নাই, যে, রূপে গুণে শিক্ষায় এই অবিনীতকে পায়ের তলায় টানিয়া আনিতে পারে? সে নিজেই কি পারে না? বাণী একদিন ঠাট্টা করিয়াছিল, "বাছাধন ফিরে এলে আশা করি তোর কাছে একটু জব্দ হবেন। সহজে ছাড়িস্ না।"

মনে মনে মায়া তখন ইহাতে আপত্তি অনুভব করে নাই, যদিও প্রকাশ্যে বাণীর পিঠে চড় মারিয়া বলিয়াছিল, "আমি ত আর সার্কাসের ট্রেনার নয় যে যত দুরন্ত জানোয়ার বশ করে বেড়াব? তোমাদের দেবকুমার যা খুসি ভাবুক আর বলুক না, আমার তাতে কি এল গেল?" কিন্তু ঝাপসা রকম একটা সঙ্কল্প তখন হইতে তাহার মনে ছিল, দেবকুমারের সহিত কখনও যদি তাহার পরিচয় ঘটে, তাহা হইলে মায়া তাহাকে বুঝাইয়া ছাড়িবে যে, বাঙালীর মেয়েও এমন আছে, যে, মেমের চেয়ে কোনো অংশে হীন নয়।

কিন্তু আজ দেবকুমার তাহাকে দেখিয়া কি ভাবিল কে জানে? নিতান্ত মায়ার চেহারা দেখিয়া যদি কিছু মুগ্ধ হইয়া থাকে, তাহাও বিশেষ হইবার কথা নয়। কারণ মায়া সুন্দরী হইলেও, সদ্য বিলাত-ফেরতের চোখে তাহাকে এমন কিছু অপরূপ রূপসী মনে নাও হইতে পারে। অন্য কোনোদিকে সে মূর্খ পাড়াগেঁয়ে মেয়ে অপেক্ষা বিন্দুমাত্রও ভাল ব্যবহার করিতে পারে নাই। শিবচরণবাবু যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহাকে হাঁ কিংবা না উত্তর দিয়াছে মাত্র। দেবকুমারের সহিত একটাও কথা বলে নাই। দেবকুমার তাহাকে বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইতেছে, তাহা সে লক্ষ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু সপ্রতিভ ভাবে একবারও তাকাইয়া তাহাকে দেখিতে পারে নাই। ছি, ছি, এ কি কাণ্ড! বিলাত-ফেরৎ ছেলেটি বাড়ী ফিরিয়া মনে মনে হয়ত প্রচুর হাসিয়া লইয়াছে। মায়ার কথা সেও আগে কিছু শুনিয়া থাকিবে। তাহাকে কিরূপ কল্পনা করিয়াছিল, কে জানে? বাস্তবে এবং সেই কাল্পনিক মূর্ত্তিতে কতখানি প্রভেদ দেখিল, তাহা বলা যায় না।

যাইবার সময় দেবকুমার নমস্কার করিয়া বলিয়াছিল, "আচ্ছা, আসি তবে, ষ্টীমারে আবার দেখা হবে।"

মায়া তাহার উত্তরেও সামান্য একটা 'হাঁ' ছাড়া আর কিছু বলিয়া উঠিতে পারে নাই।

মোটের উপর সমস্ত ব্যাপারটাই হাস্যকর হইয়াছিল। উহারা না আসিলেই ছিল ভাল। নিঃসম্পর্কীয় যুবকের সহিত আলাপ-পরিচয় করা মায়ার কাছে কিছু নূতন নয়, সর্ব্বদাই সে সপ্রতিভ ভাবে আলাপ করিতে পারিয়াছে, আজই তাহাকে কি ভূতে পাইল কে জানে?

নীচ হইতে তাহার জ্যাঠাইমা ডাকিয়া বলিলেন, "মায়া, নীচে আয়, খাবার দেওয়া হয়েছে যে। আজ কি আর ছাদ থেকে নামবিই না?"

হাজার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে কখন যে সন্ধ্যার ধূসর ম্লান আলো রজনীর গাঢ় কালিমায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, মায়া তাহা লক্ষ্যও করে নাই। যাক্, আর ভাবিয়া কি হইবে? যদিও আজ বিকালের ব্যাপারটা না ঘটিলেই সে খুসি হইত, তাহা হইলেও ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে মনে করিবার কোনো কারণ নাই। না হয় দেবকুমার তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ না-ই হইয়াছে। কেবল

তাহাকে মুগ্ধ করিবার জন্যই ত মায়ার জন্ম হয় নাই? জগতে কত কাজ হয়ত তাহার জন্য পড়িয়া আছে।

এই কথা মনে হইতেই তাহার প্রভাসের কথা মনে পড়িল। স্কুল-করা বিষয়ে মায়া এখন পর্য্যন্ত ত কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সাবিত্রীর এ সকল বিষয়ে খুব যে সহানুভূতি ছিল, তাহা মনে হয় না। অথচ জনহিতের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, স্কুলটাই গ্রামের পক্ষে সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। প্রভাসকে বিস্তৃত ভাবে চিঠি লিখিয়া সব বিষয় আলোচনা করা মায়ার উচিত ছিল রেঙ্গুন যাইবার আগেই, কিন্তু কিছুই সে করে নাই। স্কুলের জন্য কত টাকা লাগিবে, সেটা এক সঙ্গে লাগিবে, ন বারে বারে দিলেও চলিবে, এ সব কথাও ভাল করিয়া জানিয়া গেলে হইত। নিরঞ্জনকে না জানাইয়া শেষ অবধি চলিবে কি না, তাই-বা কে জানে? নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে মায়া নীচে নামিয়া গেল।

মাঝের দিনটা যাত্রার আয়োজনেই কাটিয়া গেল। মায়া একটি মাত্র মানুষ, কিন্তু নিজের এবং বাণীর জন্য জিনিষ যাহা জুটাইয়াছিল, তাহা গুছাইতেই তাহার প্রাণ বাহির হইবার জোগাড় হইল। বিজয় বলিল, "একটা কেবিনে ধরবে বলে ত মনে হচ্ছে না, আর একটার জন্যে লেখ।"

বাড়ীতে বড় ছেলে একমাত্র বিজয়, সে-ই মায়াকে জাহাজে তুলিয়া দিতে চলিল। জয়ন্তী আসিবে বলিয়াছিল, সেও আসিতে পারিল না, তাহার কোলের মেয়েটির সর্দ্দি-জ্বর হইয়াছে। বিজয় হাজার হইলেও ছেলেমানুষ, এ সব কর্ম্মে বিশেষ অভ্যস্ত নয়; মায়ার ভাবনা হইতেছিল, জাহাজঘাটের হাজার হাঙ্গামা বাঁচাইয়া সে মায়াকে ঠিক উঠাইয়া দিতে পারিবে কি না। অন্যান্য বারে নিরঞ্জন সঙ্গে থাকেন, তাহাকে কিছুই ভাবিতে হয় না।

ঘাটে পৌঁছিতেই দেখা গেল, শিবচরণবাবু এবং দেবকুমারও সেই মাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, জিনিষপত্র নামানো হইতেছে। দেবকুমারের জিনিষই বেশীর ভাগ, ইউরোপের বিভিন্ন দেশভ্রমণের ছাপ মারিয়া তাহারা বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে। শিবচরণবাবুর জিনিষের মধ্যে ছোট একটি ট্রাঙ্ক, এবং সতরঞ্চিতে জড়ানো বিছানা। জলের কুজা এবং বেতের প্যাটরাও আছে বোধ হইল। অর্থব্যয় সম্বন্ধে বৃদ্ধ সর্ব্বদাই অত্যন্ত সতর্ক, কখনও ডেক্ ভিন্ন কেবিনে যাতায়াত করেন না। এবারে ছেলে সঙ্গে থাকায় কিছু বিপদে পড়িয়াছেন। দেবকুমার যেরকম সাহেব হইয়া আসিয়াছে তাহাকে ডেকে যাইবার কথা বলাও যায় না, অথচ পুত্র কেবিনে গেলে, পিতা ডেকে যাইবেন, ইহাও হয় না। সুতরাং দুজনের জন্যই সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট করিতে হইয়াছে।

জাহাজঘাট তখন লোকে লোকারণ্য। যাত্রী, যাত্রীর বন্ধু, কুলি এবং জাহাজঘাটের অন্যান্য লোক মিলিয়া এমন একটা বিরাট জনতার সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহার ভিতর দিয়া যাওয়ার কথা ভাবিতেও ভয় হয়। থার্ড ক্লাসের যাত্রীগুলি নিজেদের পোঁটলাপুঁটলি সব নিজেরাই বহন করিয়া আনিয়াছে, এবং আগেভাগে কাঠগড়া পার হইয়া ষ্টীমারে উঠিবার জন্য এমন ভীষণ ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিয়াছে যে, সেদিকে, স্ত্রীলোক কেন, কোনো ভদ্র পুরুষ মানুষেরও যাওয়া প্রায় অসম্ভব। মায়া ট্যাক্সি হইতে নামিয়া বলিল, "কি রে বিজয়, আজ শেষ অবধি উঠতে পারব বলে মনে হচ্ছে?"

বিজয়ের নিজেরও সে বিষয়ে একটু যে সন্দেহ না হইতেছিল এমন নয়, তবু মুখে খুব সাহস দেখাইয়া বলিল, "না, পারবে কি আর, এইখানেই থেকে যাবে। আপাততঃ কুলি ডাকিয়ে, জিনিষপত্রগুলো ত নামান যাক্।"

কুলি ডাকিবার কোনোই প্রয়োজন ছিল না, গাড়ী থামিবামাত্র যে পরিমাণ কুলি আসিয়া তাহার উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল, তাহারা এক হাজার যাত্রীর মাল স্বচ্ছন্দে বহন করিতে পারিত। মায়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "বিদায় কর, বিদায় কর, একটা কি দুটোকে রাখ, এখনি টানাটানি করে অর্দ্ধেক জিনিষ নষ্ট করে ফেলবে।"

এমন সময় পিছন হইতে কে যেন বলিল, "আপনি ভীড় থেকে বেরিয়ে আসুন, জিনিষপত্রের ব্যবস্থা আমি করছি। বাবা ঐদিকে বসে আছেন, তাঁর কাছে বসবেন চলুন।"

মায়া ফিরিয়া দেখিল দেবকুমার। দ্বিতীয় সাক্ষাতে আর বোকা বনিবে না বলিয়া সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিয়াছিল। তাড়াতাড়ি বিজয়কে দেখাইয়া বলিল, "এই আমার জ্যাঠামশায়ের মেজ ছেলে বিজয়। আপনি ওকে নিয়ে জিনিষগুলোর গতি করুন, আমি যাই।"

ভীড়ের একপাশে একগাদা জিনিষের মধ্যে বৃদ্ধ শিবচরণবাবু বসিয়াছিলেন। দেবকুমার মায়াকে সেইখানে লইয়া আসিয়া বলিল, "এইখানে বসুন, ওঠবার পথ একটু মুক্ত দেখলে আমি এসে ডেকে নিয়ে যাব।" জিনিষপত্রের গাদা হইতে সে একটা ডেক চেয়ার টানিয়া বাহির করিয়া মায়ার জন্য পাতিয়া দিল। কয়েকটা ইংরেজী ম্যাগাজিন এবং খবরের কাগজ বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, "ততক্ষণ এইগুলো উল্টে সময় কাটান, আশা করি খুব বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।"

দেবকুমার চলিয়া গেল। মায়া বসিয়া বসিয়া ছবি দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল, ছেলেটির ভদ্রতার কোনো ত্রুটি অন্ততঃ নাই। দেশী ভদ্রতা হইতে একটু পার্থক্যও আছে। বিজয়, অজয় অথবা তাহার বাবা সঙ্গে থাকিলে তাহাকে ভীড় হইতে সরাইয়া আনা পর্য্যন্ত করিতেন বটে, তবে চেয়ার পাতিয়া বসান বা ম্যাগাজিন পড়িতে দেওয়া পর্য্যন্ত হইত কি না সন্দেহ। বিলাত হইতে ছেলেটি সবে ফিরিয়াছে, তাই এ সব অতি-সৌজন্য এখনও ছাড়িতে পারে নাই। কিন্তু ইহাতে মায়াকে বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট বোধ হইল না, যদিও অতি-সাহেবীআনাকে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করা অভ্যাসটা তাহার এখন পর্য্যন্ত একেবারে যায় নাই।

মিনিট কয়েক পরেই দেবকুমার আসিয়া বলিল, "চলুন এইবার, একটুখানি লাইন্ ক্লিয়ার্ পাওয়া গিয়েছে।"

মায়া এবং শিবচরণবাবু উঠিয়া পড়িলেন। সঙ্গের জিনিষপত্র দুইজন কুলি ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইল। ডাক্তারের পরীক্ষা প্রভৃতি অতি সংক্ষেপে সারিয়া, তাহারা সিঁড়ির কাছে আসিয়া পৌছিল। দেবকুমার বলিল, "এই বড় ট্রাঙ্কটা নিয়ে কুলিটা উঠুক, আপনি ঠিক তার পিছনে যান, আমি থাক্‌ব তার পরেই। এরকম করে উঠলে আপনাকে আর গুঁতো খেতে হবে না।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "জিনিষপত্রগুলো সব ঠিক এসেছে ত? ক'টা ছিল তাও আপনাকে বল্‌তে ভুলে গেছি।"

দেবকুমার বলিল, "সে আমি গাড়ী থেকে নামাবার সময়েই গুণে নিয়েছি। সব লাইন করে পিছনে আস্‌ছে, বিজয়বাবু তাদের রিয়্যার্ গার্ড হয়ে আসছেন, আপনার কোনো ভাবনা নেই, উঠে পড়ুন।"

মায়া উপরে উঠিয়া গেল। 'বয়' সাম্‌নেই দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সাহায্যে সহজেই নিজের কেবিন খুঁজিয়া পাইল। জিনিষপত্রও শীঘ্রই আসিয়া পড়িল। দেবকুমার এবং বিজয় মিলিয়া সেগুলির সুব্যবস্থা করিতে লাগিল। বিজয় বলিল, "মায়া-দি, অকারণ কতকগুলো টাকা বাজে খরচ করলে, অনেক ত জায়গা পড়ে রইল, আর একজন লোক অন্ততঃ বেশ যেতে পারত।"

দেবকুমার বলিল, "একটুখানি খালি জায়গা যে কি রকম মূল্যবান জিনিষ, তা জাহাজে চড়ে কিছু দূর যদি যান, তাহ'লেই বুঝতে পারবেন। স্বজাতি-প্রীতি কমাবার এতবড় ওষুধ আর নেই। বিশেষ করে আমাদের স্বজাতি যাঁরা, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, ঘরের বাইরের লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে তাঁরা মোটেই জানেন না।"

জিনিষ গোছান হইয়া যাইতেই দেবকুমার বলিল, "আচ্ছা, একটু আমাদের কেবিনটার গতি করে আসি, বাবা বোধ হয় জিনিষপত্র নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

সে বাহির হইয়া যাইতেই বিজয় বলিল, "আমার আসবার কিছু দরকারই ছিল না, মায়া-দি, যা গ্যাল্যান্ট সঙ্গী তুমি জুটিয়েছ।"

মায়া বলিল, "আমি আর কোথায় জুটালাম, বাবাই জুটিয়ে রেখেছেন। তা ভালই ত হ'ল, তোমাকে বেশী খাটতে হ'ল না। পূজোর ছুটিতে আস্‌ছ ত ঠিক?"

বিজয় বলিল, "সে অনেক পরের কথা। ততদিনে কত কি ঘটে যেতে পারে।"

মায়া হাসিয়া বলিল, "অনেক কিছু ঘটলে ত আরও আসা উচিত।"

৩০

রেঙ্গুনযাত্রী জাহাজটি সমুদ্রের নীল জলরাশি ভেদ করিয়া অবলীলাক্রমে চলিয়াছিল। বাহির হইতে শোনা যায় কেবল এঞ্জিনের শব্দ, কেবল সফেন তরঙ্গরাজির জাহাজের অঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়ার শব্দ। দুপুরে জাহাজের ভিতরটা একটু যেন নিস্তব্ধ থাকে। খাওয়া-নাওয়ার হ্যাঙ্গাম নাই, ডেকের যাত্রীর দল অধিকাংশই চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে। দুই চারি জন উঠিয়া বসিয়া সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেছে, এবং আশেপাশে সহযাত্রিনী কেহ দর্শনযোগ্যা আছে কি না, তাহারই সন্ধান লইতেছে। বাঙালীবাবু ডেকযাত্রীও কিছু কিছু আছেন, তাঁহারা হয় মাসিকপত্র বা খবরের কাগজ পড়িতেছেন, নয় তাস খেলিতেছেন। বর্ম্মা চুরুটের উৎকট গন্ধে স্থানটি ভরপুর। ছেলে-পিলেরা এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে, মেয়েরা স্থানে স্থানে জটলা পাকাইয়া গল্প করিতেছে। জাহাজে কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, সময় যেন আর কাটিতেই চায় না।

মায়া কেবিনের মধ্যে শুইয়া বসিয়া বৃথা কাগজ পড়িবার চেষ্টা করিয়া, একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। আজ ত সবেমাত্র প্রথম দিন, এখনও পূরা দুইটা দিন বাকি। আরামের জন্ত একলা একটা কেবিনে আসিয়া তাহার যেন আরও বিপদ হইয়াছিল। সঙ্গিনী থাকিলে যেমন নানাদিক দিয়া জ্বালাতন হইতে হয়, তেমনি দুটা কথাও তাহার সঙ্গে বলা চলে। এই ত মাত্র কয়েক ঘণ্টা জাহাজ ছাড়িয়াছে, ইহারই ভিতর তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল, বাকি সময়টা কাটিবে কি করিয়া? খোঁজ লইলে হয়, জাহাজে বাঙ্গালী সহযাত্রিনী কেহ আর আছে কি না, তাহা হইলে যাইয়া খানিক গল্প করিয়া আসিতে পারে। তাহার প্রথমবারের সমুদ্রযাত্রার কথা মনে পড়িল। সেবার বাণী এবং বাণীর মা সঙ্গে থাকায়, তাহাদের কোনো ভাবনা ছিল না, সময় দিব্যই কাটিয়া গিয়াছিল।

কেবিনের দরজার গায়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইল। হয়ত জাহাজের ভাণ্ডারী রান্নার জোগাড় লইতে আসিয়াছে মনে করিয়া মায়া বলিল, "ভিতরে এস।"

দরজাটা অল্প খুলিয়া গেল, কিন্তু ভিতরে কেহ প্রবেশ করিল না দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল, "আমি দেবকুমার। একলা কেবিনে বসে আছেন, তাই জান্‌তে এলাম যে, ডেকে একটু বেড়াতে যাবেন কি না।"

মায়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া, চটি পায়ে দিয়া দরজার কাছে অগ্রসর হইয়া গেল। দেবকুমার সাহেবী পোষাক ছাড়িয়া, বাঙালী সাজিয়া আসিয়াছে। মায়াকে দেখিয়া বলিল, "চলুন না ডেকে? বেশ হাওয়া আছে, এই ষ্টাফী খোঁপটার মধ্যে একলা বসে বসে করবেন কি? জাহাজ না জাহাজ! ঠিক যেন মোচার খোলা, একটু নড়ে বসতে গেলেই অন্ত কারো ঘাড়ে গিয়ে পড়তে হয়।"

মায়া ত তখন যাইতে পারিলেই বাঁচিয়া যায়। কিন্তু ডেকে যাইতে হইলে ঠিক এই ভাবেই যাওয়া যায় না। কাজেই বলিল, "আচ্ছা আপনি এগোন, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।"

দেবকুমার তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। পাঁচ মিনিটের বেশী সময় অবশ্য মায়ার লাগিল। চুল বাঁধিতে হইল, স্যুটকেস্ খুলিয়া, শাড়ী ব্লাউস সব বদ্‌লাইতে হইল। শাদা কাপড় পরিয়া যাইতে কিছুতেই তাহার মন উঠিল না। হাল্কা গোলাপী রংএর ক্রেপের পোষাক পরিয়া, গলায় একছড়া প্রবালের মালা দুলাইয়া সে উপরে চলিল। চটি ছাড়িয়া, এক জোড়া নাগ্‌রা জুতা পরিয়া গেল।

দেবকুমার তাহার জন্ত সিঁড়ির মুখেই অপেক্ষা করিতেছিল। মায়াকে দেখিয়া বলিল, "চলুন, এখন লোক বেশী নেই, আরাম করে বস্‌তে পারবেন।"

দুইজনে উপরের ডেকে উঠিয়া গেল। নিজের ডেক চেয়ারখানির পাশে. দেবকুমার আরও একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া রাখিয়াছে, বই, ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ প্রভৃতিতে তাহার একখানা সম্পূর্ণ বোঝাই।

মায়া একটা চেয়ারে আসিয়া বসিতেই দেবকুমার তাহার পাশেরটিতে আসিয়া বসিয়া দিব্য অসঙ্কোচে গল্প

আরম্ভ করিয়া দিল। মায়ার সামান্য একটু সঙ্কোচ যাহা ছিল, দেবকুমারের ব্যবহারে সেটাও কাটিয়া গেল।

দেবকুমার বলিল, "আচ্ছা, জাহাজের জার্নী আপনার কেমন লাগে? বেশ কয়েকবারই এই লাইনে গিয়েছেন এসেছেন, না?"

মায়া বলিল, "না, খুব বেশী বার কি আর? এই নিয়ে বার চারেক হ'ল। আমার মোটেই ভাল লাগে না, সময় কিছুতেই কাট্‌তে চায় না। ঘড়ি দেখে দেখে আমার ত চোখ ব্যথা করতে থাকে।"

দেবকুমার বলিল, "প্রতিবারেই কি একলা এক কেবিনে থাকেন?"

মায়া বলিল, "না, প্রথমে ত আমার এক পিসীমা সঙ্গে ছিলেন। তার পর অন্য লোকের সঙ্গেও এসেছি, কিন্তু এত বেশী অসুবিধা হয় যে, বাবা লিখেছিলেন এবারে একটা কেবিন রিজার্ভ করে যেতে। এতেও এক বিপদ, সারাক্ষণ হাঁ করে একলা বসে থাকতে থাকতে প্রাণ যেন বেরিয়ে আসে।"

দেবকুমার বলিল, "কিই বা দরকার ও খুপরীটার মধ্যে সারাক্ষণ বসে থাক্‌বার। খাওয়া, নাওয়া, ঘুমনো ছাড়া সব সময়টাই ডেকে থাকতে পারেন। ওদিককার বড় বড় জাহাজগুলোতে ডেক ত কোনো সময় খালি দেখবার জো নেই। হয় খেলা চল্‌ছে, নয় গান বাজনা, নয় গল্প। নিদেন পক্ষে চুপচাপ বসে সমুদ্রও ত দেখা যায়। কেবিনের মধ্যে সে সুবিধেও ত নেই।"

মায়া বলিল, "তা এলে হয়, তবে সব সময় একলা হট্ হট্ করে আসতে যেতে ভাল লাগে না। ডেকের এই পাশের লোকগুলো এমন অসভ্যের মত তাকিয়ে থাকে, যে, তাদের সাম্‌নে দিয়ে যাওয়া-আসা করাই এক ট্রায়াল্।"

দেবকুমার বলিল, "যতবার বল্‌বেন ততবার গিয়ে আমি নিয়ে আসব। বয়টাকে বল্‌লেই সে আমায় ডেকে দেবে।"

মায়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "আপনি আবার এত কষ্ট করে, বার বার আসবেন—"

দেবকুমার আবার বলিল, "কষ্ট আবার কি? আমি ত বেঁচে যাই, সারাদিন একলা হাঁ করে বসে থাকতে আমার বুঝি বড় ভাল লাগে? এক এক সময়ে ইচ্ছে করে ঐ মেড়োগুলোর সঙ্গেই গিয়ে ভাব করি।"

মায়া অন্য কথা পাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, এতকাল বিলেতে থেকে এসে দেশটা আপনার কেমন লাগছে?"

দেবকুমার বলিল, "তা ত বলা শক্ত। এক এক দিক দিয়ে বেশ খারাপই লাগে, যেমন রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর সবই বেশী নোংরা লাগে, মানুষগুলিকেও এক একদিকে অসভ্য এবং অভব্য মনে হয়। অধিকাংশ মানুষের সঙ্গে কি নিয়ে যে আলোচনা করব ভেবে পাই না, নিতান্ত নিজের বয়সী ছেলেছোক্‌রার দলের সঙ্গে ছাড়া। আবার এতকাল পরে আত্মীয়স্বজন সবাইকে দেখছি, সেটা ভাল লাগ্‌ছে। লণ্ডনের ধোঁয়া আর কুয়াসার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নীল আকাশ, চাঁদ তারাগুলো দেখতে পাচ্ছি, এটাও ভাল লাগ্‌ছে। হাজার কাটখোট্টা হ'লেও দেশের মাঠ, ঘাট, বন নদী দেখে খুসি না হয় এমন লোক আর কটা আছে?"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি রেঙ্গুনেই প্র্যাক্‌টিস্ করবেন, না কলকাতায় ফিরে আসবেন?"

দেবকুমার তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "রেঙ্গুনে করাই এক রকম স্থির করে ফেলেছি।"

হয়ত তাহার তাকান এবং কথার মধ্যে বিশেষ কোনোই অর্থ ছিল না, তবু মায়ার কানের কাছটা লাল হইয়া উঠিল এবং কিছুক্ষণের জন্য সে থামিয়া গেল।

দেবকুমার বলিল, "গিয়ে দিন-কতক সারাবর্ম্মা ঘুরব ঠিক করেছি। তারপর বাবাকে নিয়ে পড়তে হবে তাঁর মেসে বাস ঘোচাবার জন্যে। এক ঘরে দশজন মানুষ বাস করে করে এমনি অভ্যাস করেছেন, যে, একটা ঘরে একলা থাকতেই তাঁর অসুবিধা বোধ হয়। বাড়ীতে একটার বেশী দুটো চাকর বা দুটোর বেশী তিনটে তরকারি দেখলেই তিনি অস্বস্তিতে অস্থির হয়ে ওঠেন।"

মায়া বলিল, "তবে ত আপনার বড় অসুবিধা হবে।"

দেবকুমার বলিল, "তিনি ষাট বছরের বুড়ো হয়ে যা

পুণ্যিপুকুর
শ্রীপ্রভাত নিয়োগী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সহ্য করতে পারেন, আমি ইয়্যাংম্যান্ হয়ে যদি তা না পারি,তাহ'লে ত আমার ডুবে মরা উচিত। নিজের জন্যে ততটা নয়, তাঁরই জন্যে আমি একটু ব্যবস্থা বদল করতে চাইছি। আচ্ছা, বর্ম্মাটা আপনার কেমন লাগে ?"

মায়া বলিল, "মন্দ নয়। ওখানে যাবার আগে ত একেবারেই পাড়াগাঁয়ে থাক্‌তাম। ওখানে সবই নূতন রকম, কাজেই প্রথম প্রথম যদিও কয়েকদিন অসোয়াস্তি লেগেছিল, তারপর থেকেই মন্দ লাগে না। সারাক্ষণই একটা কিছু নিয়ে থাকতে হয়, কাজেই খারাপ লাগবার অবসরও থাকে না।"

দেবকুমার বলিল, "আপনার বাবা ত বহুকাল এখানে, আপনারা এর আগে একবারও আসেন নি যে ?"

অন্য মানুষ হইলে এ প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই ভাল করিয়া পাইত না। মায়া যেমন করিয়া হোক কথাটা ফিরাইয়া দিত। কিন্তু কেন জানি না, দেবকুমারের কথার উত্তর না দিয়া সে থাকিতে পারিল না। বলিল, "মা সাহেবীআনা বড় বেশী অপছন্দ করতেন, তাই তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন আমাদের আর আসা হয়নি। মা মারা যাবার পর বাবা আমাকে আর পিসীমাকে নিয়ে যান্।"

দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার পিসীমা এখনও ওখানে আছেন না কি ?"

মায়া বলিল, "না, তিনি বছরখানেক থেকেই দেশে ফিরে যান। এবারে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে বাবা খুবই জেদ করেছিলেন, তিনি কিছুতেই এলেন না।"

দেবকুমার বলিল, "তাহ'লে রেঙ্গুনের ঘরসংসার সব আপনাকেই তদারক করতে হয় ?"

মায়া হাসিয়া বলিল, "তদারক ত ভারি, এক পাল চাকর ঝি আছে, তারাই সব করে।"

দেবকুমার বলিল,"সেই ত আরও মুস্কিল। নিজে কাজ করা বরং সহজ, কিন্তু এক পাল ইন্‌এফিশিয়েন্ট লোককে দিয়ে মনের মত করে কাজ করান খুবই শক্ত ব্যাপার। বিলেতে একটা ঝি যা কাজ করে এখানে তিন চারটে চাকর দিয়ে সে কাজ পাওয়া যায় না।"

মায়া বলিল, "এপর্য্যন্ত যত বিলেত-ফেরৎ দেখলাম, ওদেশের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। ওখানের সব কিছু কি সত্যিই এত ভাল ?"

দেবকুমার হাসিয়া বলিল, "সবই ভাল মোটেই নয়। তবে কোনো কোনো বিষয়ে ভাল বই কি ? আবার আমাদের দেশেও এমন জিনিষ আছে, যা ওখানে একেবারে দুর্লভ।"

এমন সময় খাওয়ার ঘণ্টা বাজিয়া ওঠাতে দেবকুমার উঠিয়া পড়িল। বলিল, "যাই, এ ব্যাপারটা সেরে আসি। এ লাইনে সেকেণ্ড ক্লাসে এমন বাজে খাওয়া দেওয়া হয় জান্‌লে আমি উইথ্ ডায়েট্ টিকিট করতাম না। বাবার মত চাল ডাল পুঁটলি বেঁধে আনতাম। বাবা আবার এমন হিসেবী মানুষ যে, একমুঠো কিছু বেশী আনেন নি। কাজেই এখন ব্যবস্থা বদলানো চলে না।"

খাওয়া-দাওয়ায় কাহারও অসুবিধা হইতেছে শুনিলে স্ত্রীজাতির মন কখনও অবিচলিত থাকিতে পারে না। মায়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "ওমা, আপনি এত কষ্ট কর্‌ছেন কেন ? আমার সঙ্গে যা দিয়ে দিয়েছেন জেঠাইমা, তাতে চারজন লোক দশদিন বসে খেতে পারে। আমি কাল থেকে আপনাকে খাবার পাঠিয়ে দেব, আপনি জাহাজের খাবার খাবেন না। আজ রাত্রেও বলেন ত পাঠিয়ে দিই।"

দেবকুমার বিন্দুমাত্র আপত্তি করিল না। হয়ত মায়াকে এই কথা বলাইবার জন্যই সে খাওয়ার দুঃখ বর্ণনা করিতে বসিয়াছিল। মায়া ঠিক ততটা বুঝিল কি না সন্দেহ; তবে একটা কিছু বুঝিল বটে। দেবকুমার শুধু বলিল, "আপনার যদি অসুবিধা না হয়, তাহ'লে আমি ত বেঁচে যাই। চলুন আপনাকে কেবিনে রেখে আসি, আবার বিকেল বেলা আস্‌ছেন ত ?"

মায়া বলিল, "আচ্ছা, একেবারে ভাঁড়ারটাড়ার লোকটাকে বের করে দিয়ে, চা খেয়ে আসব।"

দেবকুমার মায়াকে কেবিন পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। মায়া ঘণ্টা বাজাইয়া ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া পাঠাইয়া, রাত্রের আহারের ব্যবস্থা করিতে বসিল। ওবেলা ডালভাত নিরামিষ তরকারিতেই কাজ চালাইয়াছিল। এ বেলা তাহাতে মন উঠিল না।

দেবকুমারকে সে এক রকম নিমন্ত্রণ করিয়াই আসিয়াছে, জাহাজের খাওয়ার চেয়ে ভাল না খাওয়াইতে পারিলে সে কি মনে করিবে? ভাণ্ডারীর কাছে খোঁজ লইয়া জানিল, ডিম, মাংস, এমন কি কই মাগুর মাছ পর্য্যন্ত পয়সা দিলে জাহাজেই পাওয়া যায়।

মাছ কি রকম দর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, কই মাছ এক আনা করিয়া একটা, শিঙ্গি মাগুর দুই আনা করিয়া, কারণ সেগুলিকে আরও বেশীদিন বাঁচাইয়া রাখা যায়। মায়া ছয় আনা পয়সা দিয়া ছয়টা কই মাছ কিনিয়া রাঁধিতে বলিয়া দিল। তরকারিও প্রচুর পরিমাণে ঢালিয়া দিল।

নিজের চা খাওয়া হইয়া যাইবার পর হাতমুখ ধুইয়া, চুল বাঁধিয়া, আবার বেশ পরিবর্ত্তন করিল। তাহার কাপড় ছাড়া শেষ হইতে-না-হইতে কেবিনের দরজায় আবার টোকা পড়িল।

মায়ার মুখে একটু হাসি দেখা দিল। প্রথম সাক্ষাতের দিন তাহার যে ভয় হইয়াছিল, তাহা ত একান্তই অমূলক দেখা যাইতেছে। দেবকুমার যে নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরেই এতটা করিতেছে, তাহা কিন্তু মায়ার মনে হইল না। ইহা অপেক্ষা যথেষ্ট কম করিলেও ভদ্রতা রক্ষা হইত। বৃদ্ধ শিবচরণবাবু জাহাজ ছাড়ার পর একবারের বেশী মায়ার কেবিনের দিকে আসেন নাই। জাহাজে উঠিলেই তিনি কিছু অসুস্থ বোধ করেন, ইহা একটা কারণ, আর পুত্র নিশ্চয়ই মায়ার যথেষ্ট তত্ত্বাবধান করিবে, এ বিশ্বাসও একটা হইতে পারে।

দেবকুমারের আগ্রহাতিশয্যে মায়ার মনেও যে কোনো রেখাপাত হয় নাই, তাহা বলা যায় না। ঠিক এইভাবে কেহ এপর্য্যন্ত তাহার নিকট আসিবার চেষ্টা করে নাই। রেঙ্গুনে সে বাড়ীতে একলা, তাহার পিতাও সারাদিনই প্রায় বাহিরে ঘুরিতেন, সুতরাং মায়ার সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার যথেষ্ট ইচ্ছা থাকিলেও কোনো যুবক বেশী আমল পাইত না। মায়ার মনোরাজ্য এতদিন অতিথিহীনই থাকিয়া গিয়াছিল।

এই একদিনের মধ্যেই সেখানে যেন একটা পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। দেবকুমার যতখানি আগ্রহ করিয়া তাহার কাছে আসিতে চাহিতেছিল, মায়ার মনের কোণেও যেন তাহার সাড়া জাগিয়া উঠিতেছিল। সে কি শুধু ভদ্রতার খাতিরেই এতটা করিতেছিল? মৃদু পুলকের শিহরণ কি থাকিয়া থাকিয়া তাহার হৃদয়কে দোলা দিতেছিল না? অথচ কে এই যুবক, কোথা হইতে আসিয়া একদিনেই মায়ার হৃদয়রাজ্যে এতখানি আলোড়নের সৃষ্টি করিল? কয়েকদিন পূর্ব্বে ইহার নাম ভিন্ন সে কিছুই জানিত না। সত্যই কি মানুষকে জয় করিবার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয় না? শুধু শুভক্ষণের প্রয়োজন?

কিন্তু অধিক ভাবিবার সময় ছিল না। দ্বারে অতিথি তখনও দাঁড়াইয়া। মায়া কাপড় পরা শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

পুরাণে রাঢ়ের ইতিহাস

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ

মহাপুরাণ অষ্টাদশ, তন্মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ একখানি। কিন্তু এই পুরাণ বহু বিষয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। মৎস্য পুরাণ ও নারদ পুরাণে এই পুরাণের অনুক্রমণিকা আছে, কিন্তু তাহার কতকগুলি বিষয় বর্তমান সংস্করণে নাই। বস্তুতঃ "বঙ্গবাসী"র প্রকাশিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রাচীন পুরাণের রাঢ়ীয় ও অর্বাচীন সংস্করণ। এই হেতু ইহাতে রাঢ়ের এক কালের ইতিহাস পাওয়া যায়।...

পুরাণখানি চারি খণ্ডে বিভক্ত। যথা,—(১) ব্রহ্ম খণ্ড, (২) প্রকৃতি খণ্ড, (৩) গণেশ খণ্ড, (৪) শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড।...

কবির দেশ:—(১) পুরাণখানি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন বাঙ্গালা পড়িতেছি; যেন বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃত করা হইয়াছে। 'নিবেদনং চকার', 'রাজা চকার স্বীকারং, 'ক্রীড়ান্ চকার', 'প্রশ্নং চকার', 'ভৃত্যদ্বারা চকার ধান্যসঞ্চয়ম্', 'চকার ক্রোড়ে,' ইত্যাদির 'চকার' স্থানে 'করিলেন' বসাইলে অবিকল বাঙ্গালা শোনাইবে। 'হে নাথ', 'হে তাত', 'হে দীনবন্ধো' ইত্যাদির 'হে' প্রয়োগ বাঙ্গালা। 'দর্শনং দেহি,' 'বিদায়ং দেহি'। কেহ কেহ বলেন 'বিদায়' শব্দ সংস্কৃত নয়, আর্বী 'বিদাআ'। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'পরিহার' ছিল। বাঙ্গালায় বলি, শিশু মাতার স্তনপান করে। ইদানী কেহ কেহ 'স্তনপান' অশুদ্ধ মনে করিয়া 'স্তন্যপান' লেখেন। কিন্তু এই পুরাণে 'স্তনং দত্বা প্রবোধয়' (কৃ।১৫), ইত্যাদি আছে। এই পুরাণের স্থানে স্থানে বাঙ্গালা শব্দ কবির অজ্ঞাতসারে সংস্কৃত হইয়া গিয়াছে। দুর্বিনীত অর্থে বাং 'দুরন্ত' (যেমন দুরন্ত ছেলে), পুরাণে সং হইয়াছে।...মনে করিতাম, বাং সাঁকো, সং সংক্রম হইতে আসিয়াছে, কিন্তু এই পুরাণে দেখিতেছি শব্দটি 'শঙ্কুসেতু', শঙ্কুকাঠ দ্বারা যে সেতু। বরুণ বৃক্ষের এক নাম সেতুদ্রুম আছে। শঙ্কু শব্দ হইতে ঘরের শাঙ্গা। শঙ্কু দ্বারা নির্ম্মিত, শঙ্কুআ, শাঁকো, এই ব্যুৎপত্তি ঠিক বোধ হইতেছে।

২। চতুর্বর্ণ হইতে সঙ্কর জাতির উৎপত্তি বর্ণনায় যে যে জাতির নাম আছে (ব্র।১০) দুই একটি ব্যতীত সব জাতির নাম রাঢ়ে অদ্যাপি বর্ত্তমান। রাঢ়ে যে 'নবসায়ক' নামে জাতিভাগ আছে, এই পুরাণে তাহার উৎপত্তি পাইতেছি। কবি লিখিয়াছেন, "ইহারা বিশ্বকর্মার সন্তান, নয়টি 'শিল্পকারী';—যথা, মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক (তাঁতি), কুম্ভকার, কংসকার, সূত্রধার, স্বর্ণকার, চিত্রকার। শেষোক্ত তিন জাতি ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়াছে।" অদ্যাপি সকলে বিশ্বকর্মার পূজা করে কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু জানি কয়েকটি করে। এই নবসায়ক ভাগ বঙ্গ ব্যতীত আর কোথাও নাই। পুরাণের মহাদস্যু 'বাগতীত' রাঢ়ের বাগদী, দস্যু 'চলট' জাতি বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে আছে। পুরাণে 'আগরী' বর্দ্ধমান জেলায়, 'জুঙ্গি' (জুগী বা যোগী), ও 'জোলা' রাঢ়ে প্রসিদ্ধ। 'সরাক' জাতি বাঁকুড়ায় আছে।

৩। কবি নানা স্থানে নানা বৃক্ষের নাম করিয়াছেন। এই সকল বৃক্ষ তাঁহার দেশের জীবন্ত সাক্ষী।...

(ক) বায়ু পিত্ত কফের বৃদ্ধি ও উপশম বর্ণনায় (ব্র।১৬) পাইতেছি,—বিল্ব, তালফল, রম্ভাফল, নারিকেল জল, 'তরুমুঞ্জা' কর্কটী ফল (কাঁকুড়), 'পিণ্ডারক', নারিকেল, তাল, খর্জুর বৃক্ষের 'মস্ত' (মেথি)।...লিখিত আছে, পক্ক তরমুজা ফল ও পক্ক কর্কটী ফল শ্লেষ্মকারক। পক্ক কর্কটী, ফুটী, তরুমুঞ্জা, তরমুজ। শব্দটী ফার্সী 'তরবুজ', অর্বাচীন সংস্কৃত 'তরম্বুজ'। প্রকৃত সংস্কৃত নাম কালিন্দ বা কালিঙ্গ।...তিনি লিখিয়াছেন, অপক্ক কদলী অর্থাৎ কাঁচকলা, এবং অপক্ক পিণ্ডারক শ্লেষ্মনাশক। পিণ্ডারক ফল যে কি, তাহা বাঁকুড়ায় না আসিলে বুঝিতাম না। এই ফল আরণ্য কণ্টকবৃক্ষজাত; দুঃখীরা বাজারে বিক্রয়ার্থ আনে, নাম পিঁড়রা। ফলটী দেখিতে পেয়ারার আকার, গ্রীষ্মশেষে ধরে। ফুল বড় বড়, শাদা সুগন্ধ।...কবি বায়ু-নাশের নিমিত্ত নারিকেলোদক অর্থাৎ ডাবের জল, সদ্য পর্যুষিতান্ন অর্থাৎ ভিজাভাত, এবং সৌবীর অর্থাৎ আমানি ব্যবস্থা করিয়া রাঢ় হইতে ওড়িষ্যা প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন।

(খ) কবি দন্তকাষ্ঠ নির্দেশ করিয়াছেন (ব্র।২৬)। যথা, অপামার্গ (আপাং), সিন্ধুবার (নিসিন্দা), আম্র, করবীর, খদির, শিরীষ, জাতি (চামেলী), পুন্নাগ, শাল, অশোক, অর্জুন, ক্ষীরিবৃক্ষ (যেমন আকন্দ), কদম্ব, জম্বু (জাম), বকুল, ওড্র (জবা), পলাশ,—দন্তকাষ্ঠে প্রশস্ত।... এক কালে পশ্চিম রাঢ়ে খদির বন ছিল; ইহা হইতে খদির, খয়র বাহির করিবার খয়রা-জাতি নামে এক জাতি ছিল, এখনও আছে। খদিরের দন্তকাষ্ঠ, বাবলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। খদিরের এক নাম 'দন্তধাবন।'...

কবির কাল:—কবির কালনির্ণয়ে কষ্ট পাইতে হইবে না।

(১) কবির দেশের জাতিদিগের নাম আছে (ব্র।১০১)। তিনি মুসলমানকে "ম্লেচ্ছ" বলিয়াছেন। লিখিয়াছেন, ইহাদিগের দ্বারা কুবিন্দ কন্যার গর্ভে জোলা জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এই উৎপত্তি রাঢ়ে মুসলমান অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে হইতে পারে নাই। ত্রিবেণীর নিকট সপ্তগ্রাম, ত্রয়োদশ খ্রীষ্ট শতাব্দ পর্য্যন্ত হিন্দুশাসনে ছিল। আরও এক শতাব্দ না গেলে একটা জাতি উৎপন্ন হইতে পারে না। কবি লিখিয়াছেন, কলিকালে ম্লেচ্ছ যবনেরা রাজা হইবেন (কৃ।৯০)। অর্থাৎ তিনি দেখিয়াছিলেন।

(২) কবির কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ও কতকগুলি সঙ্কর জাতি ছিল (ব্র।১১)। আর এক জাতি ছিল, 'বৈষ্ণব'। "স্বতন্ত্র-জাতিরেকাচ বিশ্বেষু বৈষ্ণবাভিধা।" কবির পূর্ব্বে বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণব নামে জাতি ছিল না। শ্রীচৈতন্যের পরে এই জাতির উৎপত্তি। অতএব কবি ষোড়শ খ্রীষ্ট-শতাব্দের কথা লিখিয়াছেন।

(৩) আমাদের দেশে নাসিকার অলঙ্কার ছিল না। কালিকা পুরাণে নারীর চল্লিশটি অলঙ্কারের নাম আছে। সকল নাম বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু একটিও নাসিকার নাই। এই পুরাণ আসামে দশম খ্রীষ্ট-শতাব্দে প্রণীত মনে হয়। "প্রবাসী" পত্রে শ্রীযুত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন, পঞ্চদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দের পর ইরাণ দেশ হইতে এ দেশে নাসিকায় অলঙ্কার-ধারণ আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে চারি খণ্ডের 'প্রকৃতি', 'গণেশ', ও 'শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম,' তিন খণ্ডে নাসিকায়

গজমুক্তা পাইতেছি। যথা, প্রকৃতি খণ্ডে (৬৪), দুর্গার ধ্যানে, 'নাসা দক্ষিণভাগেন বিভ্রতিং গজমৌক্তিকম্।' দেবীর দক্ষিণ নাসায় গজমুক্তা। গণেশ খণ্ডে (৪), নাসিকার রূপহেতু অমূল্য রত্ন। শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে (৬।৯) নাসাগ্রে গজমুক্তা। এই মুক্তা, নাক-মুক্তা নামে অলঙ্কার। ফুলের আকৃতি হইলে নাক-ফুল। নাসিকার মধ্যস্থলে মুক্তার লোলকও আছে। যথা, শ্রীকৃষ্ণ (৪), 'গজেন্দ্রমুক্তালঙ্কারৈর্নাসিকামধ্যরাজিতৈঃ;' শ্রীকৃষ্ণ (১৫), 'তন্মধ্যস্থলশোভা-স্থূল মুক্তাফলোজ্জ্বলা' নাসিকা। কবির কালে 'নথ' আসে নাই, বেশ-র আসিয়া থাকিবে।

পুরাণখানির বর্তমান সংস্করণ ষোড়শ খ্রীষ্ট-শতাব্দের পূর্বে হয় নাই। কিন্তু আরও পরে নয় কেন, তাহা বিবিধ প্রসঙ্গে দৃষ্ট হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ :—কবি রাঢ়ী শ্রেণীর স্মার্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। কারণ তিনি সামবেদের কৌথুমশাখামতে দেবদেবীর পূজা করিতে বলিয়াছেন। কদাচিৎ যজুর্বেদের কাণ্ব শাখারও নাম করিয়াছেন। কবির কালে ব্রত ও পূজা বর্তমানের অপেক্ষা ন্যূন ছিল। শিবরাত্রি, উত্তর ফাল্গুনীযুক্তা পূর্ণিমায় দোলন, চৈত্র মাসে অথবা মাঘ মাসে [?] শিবের তুষ্টির নিমিত্ত বেত্রপাণি হইয়া নর্তন [গাজন], শ্রীরামনবমী, বৈশাখে শক্তু ও জলদান, পূর্ণিমায় রাস, মাঘ শুক্ল পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা। শুক্ল সপ্তমীতে রবিবার ও সংক্রান্তি হইলে সূর্য পূজা। [কবি শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ভুলিয়াছেন।] নারীদিগের নিমিত্ত প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গল চণ্ডিকা, প্রতি শুক্ল ষষ্ঠীতে ষষ্ঠীপূজা, শুক্লাষ্টমীতে দুর্গা পূজা, জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণচতুর্দশীতে সাবিত্রী ব্রত, আষাঢ় সংক্রান্তিতে মনসা পূজা (প্র।৩৪)। একাদশী সম্বন্ধে লিখিত আছে, শুক্ল অথবা কৃষ্ণপক্ষে একাদশী করিবে (প্র। ২৭)।…অন্যত্র (কৃ। ৭৬), রথস্থ জগন্নাথ, ভাদ্র মাসে ঝুলন, উত্তরায়ণে কোণার্কে [কণারকে] সূর্যপূজা, ইত্যাদি। এখানে কবি যেন কোনও পুরাণ হইতে এই কয়েকটি জানিয়াছিলেন।…কবি 'গ্রাম্য দেবতা,' 'গ্রামদেবী' এবং বোধ হয় 'ধর্ম-ঠাকুর' দেখিয়াছেন, কবির 'ধর্ম' দেবতার বাহন শ্বেত অশ্ব (ব্র। ৫), পত্নী 'মূর্তি'। ইনি যমরাজ নহেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সমান। 'শুভা চণ্ডী এখন 'সুবচনী' নামে পূজিত হইতেছেন। মঙ্গলচণ্ডী ষোড়শ বর্ষীয়া, শ্বেতচম্পকবর্ণাভা, ঈষৎহাস্যপ্রসন্নাস্যা, জগদ্ধাত্রী। ইনি বাসলী নহেন, বাসলী ভয়ঙ্করী।

কবির কালে রাঢ়ে মুসলমান অধিকার হইলেও, হিন্দু রাজাও ছিলেন। তিনি রাজার ও রাজ্যের কাল জ্ঞান নিমিত্ত 'তাম্র ঘটিকা' নির্মাণের উপদেশ দুইবার দিয়াছেন।…কবি দ্বারকায় শিবির-নির্মাণচ্ছলে দুর্গ ও গৃহনির্মাণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়াছেন (কৃ। ১০৩)। তিনি বাস্তুর পূর্বে বা দক্ষিণে পুষ্পোদ্যান, এবং ঈশানে, পূর্বে, পশ্চিমে কিম্বা উত্তরে জলাশয় করিতে বলিয়াছেন। প্রাচীন বাস্তু শাস্ত্রমতে ঈশানে কিম্বা পূর্বে জলাশয়। আমরা বলি, "পূবে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ।"…কবি বাস্তু চতুরস্র (দীর্ঘ প্রস্থে সমান) এবং তন্মধ্যে আবাস (রাজার "আওয়াস") উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ করিতে বলিয়াছেন।…

"গৃহ ও প্রাকারের মধ্যভাগে দ্বার না করিয়া কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক করিবে।" [এই প্রাচীন বিধি উত্তম ছিল। অধুনা না বুঝিয়া লোকে মাঝে দ্বার বসাইতেছে।] "গৃহ নির্মাণে শাল্মলী, তিন্তিড়ী, হিন্তাল, নিম্ব, সিন্ধুবার [নিসিন্দা], ডুম্বুর, ধুস্তূর, বট এবং এরণ্ড বৃক্ষের কাষ্ঠ নিষিদ্ধ।"…এই বিধি-নিষেধের দুই মূল। (১) অসার কাঠ, এবং (২) বট, অশ্বত্থ নিম্বাদি মাঙ্গল্য-বৃক্ষ ছেদন বর্জ্জনীয়।…

কবি পুরাণ-পাঠক ছিলেন, পুরাণ-কথকের অত্যুক্তি ও পুনরুক্তি ছাড়িতে পারেন নাই। লক্ষ ও কোটির ন্যূন সংখ্যায় তাঁহার তৃপ্তি হইত না। মুক্তা, মাণিক, হীরা, ইন্দ্রনীল, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি যাবতীয় রত্ন ও রত্নেন্দ্রসার দ্বারা অসংখ্য মন্দির ও লক্ষ গবাক্ষ নির্মিত হইয়াছিল। 'ইষ্টক' মণি-নির্মিত [কবির দেশে প্রস্তর ছিল না], প্রাঙ্গণ ইন্দ্রনীল দ্বারা পরিষ্কৃত পদ্মরাগের। রাজমার্গ ও বীথী রত্নখচিত, কপাটে কঠিন দৃঢ় অর্গল ও কীলক, ইত্যাদি। পৃথিবীর মধ্যে স্যমন্তক মণি একটি ছিল। কবি নগর নির্মাণে স্যমন্তকও লাগাইয়াছেন। তিনি এই সকল মণির নাম কোথায় পাইয়াছিলেন, কে জানে?…

কবি বস্ত্র মধ্যে "সূক্ষ্ম বস্ত্র", "ক্ষৌম বস্ত্র" কদাচিৎ দেখিতেছেন। তিনি যে বস্ত্র বোধ হয় পঁচিশ ত্রিশ স্থানে লিখিয়াছেন, সেটি "বহ্নিশুদ্ধ"। সে বস্ত্র জলে ও ক্ষারে শুদ্ধ ও নির্মল হইবার নয়, জ্বলদগ্নিতে শুদ্ধ হয়। এইরূপ বস্ত্র "মার্কণ্ডেয় পুরাণে" একবার মাত্র পাইয়াছি। সে বস্ত্র প্রাণিজ, উদ্ভিজ্জ কিংবা ধাতুজ নয়। খনিজ অগ্নি-অস্পৃষ্ট (asbestos) দ্বারা নির্মিত। কবি মার্কণ্ডেয় পুরাণ পড়িয়া "বহ্নি শুদ্ধাংশুক" দ্বারা দেবীর বসন করিয়াছেন। কবি উক্ত পুরাণের "একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্।" স্থানে 'নিশায়াং হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্' লিখিয়াছেন (প্র। ৬২)।

কবি নারীকে যুগ্ম বস্ত্র দিয়াছেন, কঞ্চুক দেন নাই।…ব্রহ্মবৈবর্তের কবি স্বদেশের বসনভূষণ পরিবর্তন করেন নাই। তিনি নারীর সীমন্তের অধোদেশে উজ্জ্বল সিন্দূরবিন্দু, ললাটে ও গণ্ডে সিন্দুর চন্দন অগুরু কুঙ্কুমের বিন্দু, তিল, তিলক, পত্রক, পত্রাবলী রচনা করিয়া মুখশ্রী সুন্দর করিয়াছেন। তিলক রচনা, কলা-বিশেষ, যার তার কর্ম নয়। কোন্ মুখে কেমন তিলক সাজে, তাহা গুণীই বলিতে পারেন। ইদানী বঙ্গদেশে তিলক রচনা উঠিয়া যাইতেছে, প্রাচীনকালের লোধ্রকুসুমের পরাগ স্থানে 'পাউডার' আরম্ভ হইয়াছে। তিলের আকারে ছোট হইলে 'তিল', বড় হইলে 'তিলক'। তমাল ও তিলক বৃক্ষপত্রের আকারে 'পত্রক', 'পত্রাবলী', 'চিত্রপত্রক'। কেহ কেহ তিলক বৃক্ষকে তিল গাছ ভাবিয়া বিষম ভ্রম করেন। তিলক গাছ অরণ্যে জন্মে। বাঁকুড়ায় প্রচুর। শীতকালে আমের মঞ্জরীর ন্যায় মঞ্জরী হয়; তদ্দ্বারা সরস্বতী দেবীর পূজা করা হয়।…

কবি কুত্রাপি তাম্বূল বিস্মৃত হন নাই। সেকালে 'কর্পূর-সুবাসিত পরিপক্ব পর্ণ' ভোগসার গণ্য হইত। 'তাম্বূল-করঙ্ক', 'তাম্বূল-সজ্জা' লোকের সঙ্গে থাকিত। তাম্বূল 'জিহ্বাজাড্যচ্ছেদকর'। কবি বলেন, নিত্য তাম্বূল ভোজন করিলে জরা আসে না (ব্র। ১৬)। সেকালে তামুক ছিল না, নস্য ছিল না, চা ছিল না, 'সিগ্রেট' ছিল না। তাম্বূল চর্বণ দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ মাদকরসে শ্রান্তি দূর করিতে হইত। কবিকঙ্কণ হাতে পান-গুআ দিয়া কর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, অদ্যাপি গ্রামে পান-গুয়া দিয়া মানীর মান রাখিতে ও মানীকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। কবিকুল তাম্বূল সেবনে এত তৃপ্ত হইতেন যে ১৩ (অঙ্ক) না বলিয়া "তাম্বূল গুণাঃ' বলিতেন। বলিতেন, তাম্বূলের ত্রয়োদশ গুণ স্বর্গেও দুর্লভ। ইদানী লাট দরবারেও পাণ। কিন্তু সেকালে আতর ছিল না, ছিল চন্দন অগুরু কস্তুরী।

এই পুরাণে পুনরুক্তি এত আছে যে, পড়িতে বিরক্তি বোধ হয়। কথকের মুখে শুনিলে হয় ত ইহা গুণের হইত।…

কবির কালে দেশের দুর্দিন চলিতেছিল। প্রজার ধর্মভাব শিথিল, রাজা থাকিয়াও নাই, দেশ শাসন করিতে পারিতেন না। তখনকার যবন জাতি দুরন্ত প্রকৃতি ছিল। কবি লিখিয়াছেন, "ম্লেচ্ছ জাতি বলবন্ত, দুরন্ত, অবিদ্ধকর্ণ (?), ক্রূর, নির্ভয়, রণদুর্জয়, শৌচাচারবিহীন, দুর্ধর্ষ, ধর্মবর্জিত" (ব্র।১০)। তিনি লিখিয়াছেন, রাজ্য ও দৈব হইতে যে গো-পালন করিতে না পারে, সে গো-হত্যা করে (প্র।৩০)। এই রাজা অবশ্য হিন্দু ছিলেন না। বোধ হয়, কবির কালে "শূন্য পুরাণে"র

'নিরঞ্জনের উষ্মা' হইয়াছিল। কপট ব্রাহ্মণের অত্যাচার হেতু "ধর্ম্ম হৈলা জবন রূপি, মাথাএত কাল টুপি, হাতে সোভে কিরিচ কামান। চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়, খোদায় বলিয়া এক নাম॥ দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড্যা কিড্যা খায় রঙ্গে, পাখড় পাখড় বোলে বোল। জতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে এক মন, প্রবেশ করিল জাজপুর।" প্রথমে মালদহ ধ্বংস হইয়াছিল। তারপর যাজপুর।*

কবি লিখিয়াছেন, "নিষ্কামা দুর্ব্বলা নারী বলবান্ দ্বারা গ্রস্তা হইলে ধমচ্যুতা হয় না; প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধা হয়" (প্র। ৬১, কৃ। ৪৭)। এই ব্যবস্থা দুই স্থানে আছে। অনেক নারী দুর্বৃত্ত দ্বারা ধর্ষিতা না হইলে প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠিত না, ধর্ষিতার আর্তনাদে সমাজও চমকিয়া উঠিত না। এই "বলবান", হিন্দু বোধ হয় না, হিন্দু হইলে নরক-কুণ্ডে স্থান হইত। ধর্ষিতা নারী শূদ্রা কিংবা অন্ত্যজা বোধ হয় না; কারণ তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত কি আছে। দেবীবর ঘটক সাক্ষী আছেন, কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহের মেল বন্ধনে দোষে দোষে জুখিয়াছেন। যবনদোষ অনেক ব্রাহ্মণকুল স্পর্শ করিয়াছিল। তথাপি পুরাণ-কারের চৈতন্য হয় নাই, কোন কোন জাতির নামে ক্ষিপ্ত হইয়া জাতিকে জাতি নরককুণ্ডে ফেলিয়াছেন। তিনি বিপ্র, হরিভক্তি-পরায়ণ, বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধালু। কিন্তু বৈষ্ণবোচিত দৈন্য, দাস্য, কারুণ্য সর্বভুতে দয়া পুরাণের কুত্রাপি লিখিতে পারেন নাই। তিনিই লিখিয়াছেন, 'আচারে ব্যবহারে চ জ্ঞায়তে হৃদয়ং নৃণাম্' (প্র।৬০)। প্রতি মঙ্গলবারে যোষিৎ দ্বারা শুভা মঙ্গলচণ্ডিকার পূজা করাইতেছেন, সামবেদের কৌথুম শাখা ধরিয়া ষষ্ঠী পূজা, মনসাপূজা, শারদীয়া মহাপূজা করাইতেছেন, একবার নয়, দুই তিনবার; অজ, মেষ, মহিষ, গণ্ডার বলিদান দেখিতেছেন, 'নরবলি' না বলিয়া এক নূতন 'মায়াতি' নামে সৎশূদ্র ক্রয় করাইতেছেন (প্র। ৬৪)। নন্দরাজা ইন্দ্রযজ্ঞ করিবেন, অজ মেষ মহিষ গণ্ডক বলির সহিত ষোলটি 'মায়াতি' লইয়া গিয়াছেন (কৃ। ২১)। এ সবে দোষ নাই, নৃত্য-গীত-বাদ্যের সঙ্গে "কৃষ্ণকীর্ত্তন" থাকিলেই স্থান পবিত্র (প্র।৪৪)। বৈষ্ণব পুরাণে এ কি ব্যাপার, বুঝিতে পারি না। বোধ হয় কবি মনে মনে বৈষ্ণব হইয়াও তৎকালের শক্তি-পূজা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজা শাক্ত ছিলেন। ক্ষত্রিয়েরা চিরদিন শাক্ত কিংবা শৈব। পরমাশ্চর্য, এই অরাজককালে দলে দলে কবি জন্মিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার গান বাঁধিতে বসিয়াছিলেন। সেই এক তাল, এক স্বর, এক ভাব। সে সহস্র পিষ্টপেষণ-শব্দ শুনিবার শ্রোতাও ছিল। রসিক জনে রসাস্বাদন করুন, রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এই রস অতি-নিদ্রা, অপার নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়া, "দুদিন বই ত নয়"। কবি তৎকালের চিত্র গোপন করেন নাই। লিখিয়াছেন, (ব্র।১০), "যাহার সহিত বন্ধুতা হয়, তিনি মিত্র। মিত্র সম্বন্ধ ত্রিবিধ—বিদ্যাজ, উৎপত্তিজ, প্রীতিজ। প্রীতিজ-সম্বন্ধ সুদুর্লভ। আর এক সম্বন্ধ আছে, সেটি 'নামসম্বন্ধ'। জারোপপতি 'বন্ধু', স্বামী তুল্য। (বৈষ্ণবপদের "বঁধু") উপপত্নী 'নবজ্ঞা' (নয়ানী) গৃহিণীসমা। এই সম্বন্ধ সর্বদেশে বিগর্হিত বটে, কিন্তু দেশভেদে মহৎ দ্বারাও দুস্ত্যজ হইয়াছে। তবে কি না, যুগে যুগে বিদ্যমান আছে, 'তেজীয়সাং ন দোষায়', তেজস্বীর পক্ষে দোষ নাই।" বোধ হয়, এই দোষের প্রতিকারে "মহানির্বাণ তন্ত্রে"র শৈব বিবাহের উৎপত্তি। সে বিবাহে 'বন্ধু' ও 'নবজ্ঞা' থাকিত না, বিবাহিত পতিপত্নী হইত।

পুরাণে অবশ্য বহু ধর্মোপদেশ আছে। কবি বহুবার নরককুণ্ড বর্ণনা করিয়াছেন, চৌরাশি কুণ্ডের দুই অধিক ছিয়াশি কুণ্ডে কত ছিয়াশি পাপকর্মাকে কতবার ফেলিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। ইহাদের অধিকাংশ চোর; পুংশ্চলীও অল্প নয়। দারুণ দুঃসময়ে অন্নাভাবে ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছসেবী, যবনসেবী, মসীজীবী, যবনভাষাপাঠী, হরিমন্ত্রবিক্রয়ী, বৈদ্যোপজীবী চিকিৎসক, গণক দৈবজ্ঞ, শূদ্রের পাকোপ-জীবী সূপকার, ধাবক, শূদ্রযাজী, শূদ্রের শবদাহী, বৃষবাহ ও নিষিদ্ধ দ্রব্য ব্যাপারী, ইত্যাদি হইয়া বিপ্রের অনুচিত কর্ম করিতেন। কবি অর্থকষ্ট নিবারণের উপায় করিলেন না, নরককুণ্ডে ফেলিতেছেন। শূদ্রের দানগ্রহণ ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণকে দান করিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্য নানাবিধ দানের পুণ্য বার বার অজস্র কীর্তন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদেরও অবস্থা ভাল ছিল না, ধর্মভাবও দুর্বল হইয়াছিল।...

ব্রাহ্মণ-কন্যা কখনও সুলভ ছিল না, কন্যা ক্রয়-বিক্রয় ইদানী নূতন নয়। কন্যাপণের কারণ এখন আছে, তখনও ছিল। তদুপরি, কুলীন ও মৌলিক, ভাগ দ্বারা বরকন্যা ন্যূনাধিক হইয়া পড়িল, কুলীন বর বহু স্ত্রী পাইত, লইত, মৌলিক একটিও পাইত না। পুরাণকার দরিদ্রের অভাব দেখিলেন না লিখিলেন, যে জ্ঞান-দুর্বল ব্রাহ্মণ শূদ্রপত্নী গ্রহণ করে, সে কুম্ভীপাকে পচিতে থাকে (ব্র। ২০)। কবি তেজীয়ানের 'নবজ্ঞা' সহিতে পারিতেন, শূদ্রাকন্যা বিবাহে অধীর হইয়াউঠিয়াছেন। কোন কোন ব্রাহ্মণ কন্যার শূদ্রপতি হইত, যদিও কদাচিৎ।...

আদি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের দেশ ও কাল:—এই পুরাণ এত রূপান্তরিত হইয়াছে যে ইহার নূতন ও পুরাতন অংশ পৃথক করিবার উপায় নাই। রাঢ়ীয় একাধিক কবি পুরাতন পরিবর্তন ও নূতন শ্লোক যোজন করিয়াছেন। এই কারণে বর্তমান সংস্করণে এত পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। কোনও কবি একই বিষয় দুইবার লেখেন না। এই পুরাণে দ্বিরুক্তি দশ বারটা পাওয়া যাইবে, কোন্ পাপে কোন্ নরকভোগ, গণিলে চারি পাঁচটা হইবে। আদি পুরাণে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক ছিল, তাহা এই পুরাণেই লিখিত আছে, অন্য পুরাণেও আছে। কিন্তু বর্তমান সংস্করণের সম্পাদক [তর্করত্ন মহাশয়] ইহাতে একবিংশতি সহস্র শ্লোক গণিয়াছেন। কিন্তু সহস্র শ্লোক প্রক্ষিপ্তের পরিমাণ নয়। পুরাতন অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকের অনেক শ্লোক গিয়াছে; তাহাদের স্থানে নূতন শ্লোক বসিয়াছে। "পুরাণ নিরীক্ষণ" লেখক শ্রীযুত গুরুনাথ কালে মহাশয় নারদ পুরাণ প্রদত্ত অনুক্রমণিকার সহিত বর্তমান মিলাইয়া দেখাইয়াছেন, গণেশ-খণ্ড ও কৃষ্ণজন্ম খণ্ড, মাত্র এই দুই খণ্ড অনুক্রমণিকা অনুযায়ী আছে। আমারও মনে হইয়াছে, গণেশখণ্ডে হস্তক্ষেপ অল্প হইয়াছে; কৃষ্ণজন্মখণ্ডে তদপেক্ষা অধিক, অন্য দুই খণ্ডে মূল রূপ অল্পই আছে। অনুক্রমণিকা দ্বারা প্রক্ষিপ্তের পরিমাণ সম্যক বুঝিতে পারা যায় না।...

(১) গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং' ইত্যাদি শ্লোকের বিষয়টি এই পুরাণেই পাওয়া যায় (কৃ। ১৫) অন্য পুরাণে নাই। গীতগোবিন্দ দ্বাদশ খৃষ্ট শতাব্দে রচিত। অতএব পুরাণের উক্ত অধ্যায় এই শতাব্দের পূর্বে ছিল।

(২) এই পুরাণে বর্তমান প্রচলিত পূজার পঞ্চদেবতার অতিরিক্ত বহ্নি দেবতা আছেন। বহুস্থানে ষট্‌দেবতার পূজা করিতে বলা হইয়াছে (প্র। ৪, প্র। ২৩)। মাত্র একটি স্থানে সৌর গাণপত্য শৈব শাক্ত বৈষ্ণব, এই পঞ্চদেবতার পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের

* কেহ কেহ এই যাজপুর রাঢ়ে খুঁজিয়া পায় নাই। সে যাজপুর এখন দাদপুর নামে খ্যাত। (জ স্থানে দ হয়, যেমন বীরভূমের 'যুবরাজ-পুর' এখন দুবরাজপুর হইয়াছে।) উত্তর রাঢ়ে দাদপুর নামে অনেক গ্রাম আছে দুই একটা "দাউদপুর" হইতে পারে। এই যাজপুর ত্রিবেণীর কিম্বা কালনার নিকটবর্ত্তী দাদপুর। পাণ্ডুয়ার নিকটেও এক দাদপুর আছে।

উল্লেখ আছে (প্র।৩০)। দুই স্থানে পঞ্চদেবতার পূজা আছে (কৃ।৮)। রাঢ়ে বহ্নিপূজা প্রচলিত নাই, কোনও কালে থাকিলে একেবারে লুপ্ত হইত না। পৃথক্ গণেশপূজা ও আদিত্য পূজাও নাই। এ বিষয় "বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ" আলোচনায় দেখা গিয়াছে। অতএব বোধ হয় মূল পুরাণ দশম খ্রীষ্ট শতাব্দের পূর্বে পশ্চিম প্রদেশে রচিত হইয়াছিল। রাজপুতানায় অগ্নিকুল নামে এক রাজকুল আছে, এবং বোধ হয় রাজপুত জাতিই তাহাদের আদি দেশ হইতে সূর্য-পূজা আনিয়াছিল।

(৩) শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে, কৃষ্ণের অবতার নয়টি, তন্মধ্যে সাংখ্যকার কপিল এক। অন্যত্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশ, কার্তিকেয়, ধর্ম, নরক প্রভৃতি এবং প্রধান প্রধান গোপেরা এক এক অবতার। বর্তমান প্রচলিত দশ অবতার গণনা পূর্বকালে ছিল না। "বিষ্ণুপুরাণে" বৃক্ষলতা, পশু-পক্ষী, এই সবই ব্রহ্মের অবতার। "ভাগবত পুরাণ" মতে ভগবানের অবতার অসংখ্য, প্রজাপতি, দেবতা, ঋষি, মনু ও মানব সকলেই হরির অংশ। তথাপি ২০টি অবতার বিশেষ করা হইয়াছে। কালে অবতার সংখ্যা অল্পে অল্পে নির্দিষ্ট হইয়া দশে দাঁড়াইয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, নবম খৃষ্টশতাব্দের পরে দাঁড়াইয়াছে। অতএব ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এই শতাব্দের পূর্বের।

(৪) আদি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কালে গোমাংস ভক্ষণ নামে লোকে কানে আঙ্গুল দিত না। চন্দ্রপুত্র-বুধের চৈত্র নামে সপ্তদ্বীপপতি পুত্র জন্মে। ইনি ঘৃত দধি দুগ্ধের শত 'নদী', মধুর ষোড়শ, তৈলের দশ, শর্করা মিষ্টান্ন স্বস্তিকের লক্ষ 'রাশি', ইত্যাদির সহিত "পঞ্চকোটি গবাং মাংসং" ব্রাহ্মণগণকে নিত্য ভোজন করাইতেন (প্র। ৬১)। এইরূপ স্বায়ম্ভুব মনু ত্রিলক্ষ নরমেধ ; চতুর্লক্ষ গোমেধ করিবার কালে প্রত্যহ তিনকোটি ব্রাহ্মণকে "পঞ্চলক্ষ গবাং মাংসৈঃ সুপক্বৈর্ঘৃতসংস্কৃতৈঃ" ভোজন করাইতেন (প্র।৫৪)। এ সব কাহিনী শুনিলে মহাভারতের রন্তিদেবকে মনে পড়ে। পুনশ্চ, গর্গমুনি নন্দ যশোদাকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিতে আসিলে যশোদা তাঁহাকে পাদ্য গোমধুপর্ক ও স্বর্ণ সিংহাসন দিয়া পূজা করিলেন (কৃ।১৩)। এখানে কথা উঠিবে, কবি পুরাকালের আচার ব্যবহার লিখিয়াছেন, তাঁহার কালের লেখেন নাই। এ তর্ক অবশ্য মান্য। কিন্তু আদি কবি গোমাংস ভক্ষণ মহাপাতক মনে করিলে সে স্থানে অজমাংস লিখিতেন, এবং প্রকৃত বৈষ্ণব হইলে ব্রাহ্মণগণকে মাংসও দিতেন না। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির কালে (৪র্থ খ্রীষ্ট শতাব্দে) গোমাংস-ভোজন বর্জিত হয় নাই, পিত্রাদির শ্রাদ্ধে গোমাংস চলিত। কিন্তু পরবর্তী কালের টীকাকারেরা স্মৃতির বচনের অর্থান্তর করিয়া শান্তি পাইয়াছেন। "উত্তর রামচরিতে"র কবি ভবভূতি গোমাংস ভক্ষণে ভীত হন নাই। ইনি সপ্তম খ্রীষ্ট শতাব্দে ছিলেন। এই শতাব্দের পর হইতে গো-বধ অ-কথ্য, অ-শ্রাব্য হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি প্রাচীন আচার-ব্যবহার কলিকালে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই কলি পাঁজির কলিযুগ নয়। কলিকালের কতকগুলি লক্ষণ আছে। যে কালে সে লক্ষণ দেখা যায়, সেকাল কলি। বোধ হয়, এই কলি অষ্টম শতাব্দে আরম্ভ হইয়াছে। এই শতাব্দে শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তখন বৌদ্ধ পাষণ্ডেরা প্রবল, ব্রাহ্মণ হীনবল। এই সময়ে আরবদেশীয় মুসলমান ভারতে প্রবেশ করিতে থাকে। ইহাদের পূর্বে যবন, শক, হূণ জাতিরা ভারতে আসিয়া স্থানে স্থানে ভূপতি হইয়াছিল। তাহারাও গোমাংস-ভোজী ছিল, কিন্তু তৎকালে গোমাংস অমেধ্য হয় নাই, তাহারাও স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া ক্রমে হিন্দু হইয়াছিল। কিন্তু আরবী মুসলমান হিন্দু হইল না ; যত্র তত্র হিন্দুর দৃষ্টিতে অনাবশ্যক ও অতিশয় গোবধ করিতে লাগিল। গো-ক্ষয় দেখিয়া হিন্দুসমাজ বিশেষতঃ জৈনেরা ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু প্রতিকার করিতে পারিল না। পূর্বকালের হিন্দু গোমাংস খাইত, কিন্তু উৎসবের সময় খাইত, প্রত্যহ খাইত না। ইহাতে গোবংশের হানি হইত না, দধি দুগ্ধ ঘৃতের অভাব হইত না, কৃষি কর্মেও ব্যাঘাত হইত না। বিদেশী বিজয়ী মুসলমান এদিকে দৃষ্টি না করাতে সর্বত্র যেমন ঘটিয়া থাকে হিন্দুও তেমন নিজের নিজের গো-রক্ষায় অধিকতর মনোযোগী হইল, গো বধ মহাপাপ গণ্য হইল। অর্থাৎ আত্মরক্ষার চেষ্টায় কলিকালের নিমিত্ত নূতন স্মৃতির ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে মনে হয়, ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণ অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রণীত হইয়াছিল। এ বিষয়ে এক প্রমাণও আছে। শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে (৯৬) কালমান বর্ণিত হইয়াছে। এটি দ্বিতীয়বার, কিন্তু এইটি আদি পুরাণের। কারণ এখানে পঞ্চবর্ষে যুগ এবং নক্ষত্রের মধ্যে অভিজিৎ গণনা হইয়াছে। দেখিতেছি, এখানে শ্রাবণ হইতে দক্ষিণায়ন ও মাঘ হইতে উত্তরায়ণ এবং সপ্তবিংশতি যোগ ধরা হইয়াছে। ষষ্ঠ খ্রীষ্ট শতাব্দের পর উক্ত অয়ন এবং সপ্তম শতাব্দের পর যোগ গণনার আরম্ভ হইয়াছে। অতএব আদি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অষ্টম শতাব্দের পূর্বে হইতে পারে না।

ইহার উৎপত্তি বঙ্গদেশে হয় নাই বলিবার দৃঢ় প্রমাণ নাই। এক বাধা, গণেশখণ্ডে। আর এক বাধা, রাধাকৃষ্ণের উপাসনা। অষ্টম শতাব্দে রাঢ়দেশ ঘোর শাক্ত ছিল। বোধ হয় দশম শতাব্দে এই পুরাণ বঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিল। তদবধি ষোড়শ পর্য্যন্ত রাঢ়ীয় কবি ইহাকে নিজের করিয়া ফেলিয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশের সংস্করণ মিলাইলে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের পক্ষে রাঢ়ীয় সংস্করণ বহুমূল্য।

(ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৩৭) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

কালিদাসের বৃক্ষলতা

৫৩। বন্ধূক :—ভিন্নাঞ্জন প্রচয়কান্তি নভো মনোজ্ঞম্ বন্ধূক পুষ্পরচিতারুণতা চ ভূমিঃ। ঋ ৩।৫

দেশভেদে নাম :—বাঃ—বাঁধুলি, বাঁদুল বা বানরী।

বাঁধুলী বাংলায় পরিচিত। ইহার ফুল লাল বলিয়া ইহার "রক্তক" এবং মধ্যাহ্নে ফোটে বলিয়া মাধ্যাহ্নিক বা দুপহরিয়া নাম হইয়াছে। ইহা শরৎকালের ফুল। ওষ্ঠের রং-এর সঙ্গে মহাকবি ইহার তুলনা করিয়াছেন।

৫৪। ভূর্জ :—ভূর্জেষু মর্মরীভূতাঃ কীচকধ্বনিহেতবঃ। র ৪।৭৩

দেশভেদে নাম :—বাঃ—ভূর্জ্জপত্র বা ভুজ্জিপত্র।

কালিদাস হিমালয় বর্ণনায় ভূর্জপত্র বৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন।

৫৫। মধুক :—পর্য্যাক্ষিপৎ কাচিদুদারবন্ধং দূর্ব্বাবতা পাণ্ডু-মধুকদাম্না॥ কু ৭।১৪

দুই প্রকার মধুক আছে। এক "মধুক" (Bassia latifolia. Indian Butter tree), দ্বিতীয় "জলমধুকর" (Bassia longifolia).

জলমধুকের নাম :—মধুলক, দীর্ঘপত্রক, হ্রস্বপুষ্প, কীরেষ্ট, ফলস্বাদু।

ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে "জলমধুক" বৃক্ষের চাষ হয়। ইহার কাণ্ড হ্রস্ব হইলেও বহু শাখাযুক্ত হয় বলিয়া ইহা উত্তম ছায়া এবং প্রচুর ফল দান করে।

মধু বা মৌয়া গাছের কাণ্ড হ্রস্ব ও মসৃণ, ভিতরে লাল, বাহিরে পাঁশুটে রঙের স্থূল কষায় স্বাদযুক্ত ছালে ঢাকা। শীতে গাছের পাতা ঝরিয়া যায়। বসন্তে ফুলের সঙ্গে নূতন পাতা জন্মায়।

মৌয়াফুলের মদ সুপরিচিত। মৌয়ার তেলে রাঁধা হয়। ঐ তেলে চুলকানি সারে। শীতকালে এই তেল জমাট বাঁধে। মৌয়ার ফুলেও মাদকতা আছে। মধুপুরে মৌয়াগাছ যথেষ্ট দেখা যায়। কালিদাস এই মৌয়ারই বর্ণনা করিয়াছেন।

৫৬। মন্দার :—করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা বিনিদ্র-মন্দার রজোরুণাঙ্গুলী॥ কু ৫।৮০

মন্দার দেবতরু। ইহার ফুলের বর্ণনায় কালিদাস লিখিয়াছেন "হস্তপ্রাপ্য-স্তবক-নমিতঃ"।

৫৭। মল্লিকা :—বনেষু সায়ন্তন মল্লিকানাং বিজৃম্ভণোদ্ গন্ধিষু কুট্মলেষু। র ১৬।৪৭

মল্লিকা আমাদের অতিপরিচিত বেলফুল।

৫৮। মাধবী :—রক্তাশোকশ্চলকিসলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ প্রত্যাসন্নৌ কুরুবকবৃতে র্মাধবীমণ্ডপস্য। মে ২।১৫

দেশভেদে নাম :—বাঃ—মাধবীলতা।

৫৯। মালতী :—তামুত্থাপ্য স্বজলকণিকাশীতলেনানিলেন প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈ র্মালতীনাম্। মে ২।৩৫

দেশভেদে নাম :—বাঃ—চামেলি, জাতি, মালতী।

মহাকবি বর্ষা ও শরতে ইহার বর্ণনা করিয়াছেন।

৬০। মুস্তা :—উত্তস্থুষঃ সপদি পল্বলপঙ্কমধ্যান্ মুস্তাপ্ররোহকবলাবয়বানুকীর্ণম্। র ৯।৫৯

দেশভেদে নাম :—বাঃ—মুথা।

অমরকোষের অনুবাদক মুথার নামান্তর "ভদ্রমুস্তক" দিয়া উভয়কে এক করিয়াছেন। কিন্তু অমর মুস্তা ও ভদ্রমুস্তক আলাদা করিয়াছেন। এই ভদ্রমুস্তককে ভাদালিয়া মুথা বলে; কেহ বা ইহাকে নাগর মুথাও বলে। কালিদাস ঋতুসংহারে "ভদ্রমুস্তা"র উল্লেখ করিয়াছেন।

আমি মুথা ও ভদ্রমুথাকে ভিন্ন বলিয়া পূর্ব্বে দুই স্থানে উল্লেখ করি নাই। এখন দেখিতেছি বনৌষধিদর্পণ চারি প্রকার মুথা খাড়া করিয়াছে।

৬১। যব :—অরুণরাগনিষেধিভিরংশুকৈঃ শ্রবণলব্ধপদৈশ্চ যবাঙ্কুরৈঃ। — র ৯।৪৩

দেশভেদে নাম :— বাঃ—যব।

যবাঙ্কুর মেয়েরা কাণে পরিত বলিয়া মহাকবি কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন। আর বসন্তকালেই যবাঙ্কুর জন্মায়।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীসুবিমল রায়

প্রবাসীর পাঠকগণের নিকট মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নাম সুপরিচিত। গত ১২ই জুন পূজ্যপাদ মহেশবাবু পরলোকে গমন করিয়াছেন। আমরা হাজারিবাগে অবস্থানকালে নানাবিষয়ে তাঁহার অসাধারণত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলাম; এই প্রবন্ধে তাহার সামান্য বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে, নভেম্বর মাসে, হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজে মহেশবাবুকে প্রথম দর্শন করি। শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্তু তেজঃপুঞ্জ শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি। মস্তকে গেরুয়ারঙের পাগ্ড়ী; কাঁচাপাকা দাড়ি; কথায় ও চেহারায় পাণ্ডিত্য বিনয়, ধর্ম্মভাব ও তেজস্বিতা প্রকাশ পায়। কেহ প্রণাম করিতে গেলে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন এবং বাধা দিবার চেষ্টা করেন। সুতরাং একরকম জোর করিয়াই প্রণাম সারিতে হইল।

ইহার পর হইতে মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে আরম্ভ করি; সেখানে বহু লোকের সহিত তাঁহার কথোপকথন হইত। তাঁহার আত্মীয় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের গৃহেই তিনি অবস্থান করিতেন। একদিন পূজ্যপাদ মহেশবাবু বলিলেন, "প্রবাসীর পাঠকগণের মধ্যে যদি মুষ্টিমেয় লোকও আমার প্রবন্ধ পড়েন, তবে আমি আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। উপনিষদাদি গ্রন্থ এবং দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ কম লোকেই পড়ে। সুতরাং আমি কিছুতেই আশা করিতে পারি না, যে, বেশী লোক আমার প্রবন্ধগুলি পড়িবে।"

তিনি অত্যন্ত অল্পাহারী ছিলেন এবং নিরামিষ খাইতেন। মানসিক শ্রমে তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করিতেন না। অনেকে তাঁহাকে আমিষ খাইতে পরামর্শ দিতেন, এবং বলিতেন, যে, নিরামিষ খাইয়া বেশী

পরিশ্রম করিলে তাঁহার গুরুতর ক্ষতি হইবে। মহেশবাবু কিন্তু সে কথা স্বীকার করিতেন না। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "বহু বৎসর পূর্ব্বে চিকিৎসকগণ আমাকে আমিষ খাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, এবং আমি আমিষ খাইয়া দেখিয়াছি। দেখিলাম আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার আহারের ফল প্রায় একই। আমিষ খাইয়া বিশেষ কিছু উন্নতি বুঝিলাম না। সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় নিরামিষ আহার করিতে লাগিলাম।"

অল্পাহার সম্বন্ধে একটি মজার ঘটনার কথা মহেশবাবু বলিয়াছিলেন। একদিন একজন ভদ্রলোক আসিয়া অত্যন্ত বিনয়ের সহিত মহেশবাবুকে বলিলেন, "আপনি নাকি অনাহারে থাকেন? একি কম শক্তির কথা! আপনি নিশ্চয় যোগ অভ্যাস করেন, কিছু না খেয়ে থাকা কি যার তার কর্ম্ম?"

মহেশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আপনাকে কে বলিল, যে, আমি অনাহারে থাকি? আমি সামান্যই আহার করি, কিন্তু অনাহারে থাকি না এবং না খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবার শক্তিও আমার নাই।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "সাধুরা এইভাবেই আত্মগোপন করেন।"

মহেশবাবুর খুব হাসি পাইল। তিনি নানাভাবে ভদ্রলোকটিকে বুঝাইলেন, যে, তিনি প্রত্যহ আহার গ্রহণ করেন; অনাহারে থাকেন না।

তাঁহার অসাধারণ মনের জোর ছিল। তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ছিলেন। কোন ঘটনায় তিনি বিচলিত হইতেন না। শারীরিক পীড়া তাঁহার শান্তি ও প্রফুল্লতা হরণ করিতে পারিত না। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তাঁহার ঘরে ঢুকিলেই দেখা যাইত, যে, ঘরময় রাশি রাশি পুস্তক সাজান রহিয়াছে। পাশের ঘরগুলিতেও তাই। তিনি একবার যাহা পাঠ করিতেন, তাহা সহজে বিস্মৃত হইতেন না।

তিনি বহু পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, সমালোচকের কাজ করিলে মানুষের মন তিক্ত ও রুক্ষ হইয়া যায়। কিন্তু মহেশবাবু সদানন্দ, সরল ও বিনয়ী ছিলেন। যশোমানের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে নানা গুণের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি নির্জ্জনবাসী হইয়াও জনসমাজের সকল সংবাদ রাখিতেন। অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াও অজ্ঞের ও অল্পজ্ঞের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। দার্শনিক হইয়াও কর্ম্মকুশল ছিলেন।

তাঁহার দেহত্যাগের বহু বৎসর পূর্ব্বেই চিকিৎসকগণ তাঁহার জীবনের আশা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। অনেকেই বলিতেন, "মহেশবাবুর অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি তাঁহাকে এখন বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।" তাঁহার ক্ষীণ দেহের মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ ও মানসিক স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়া সকলকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিত।

তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ভাল জানিতেন। অনেক গরীব লোক তাঁহার নিকট ঔষধ লইতে আসিত। তাঁহার চিকিৎসায় উহারা বেশ ফল পাইত। একদিন আমি তাঁহার নিকট বসিয়া আছি, এমন সময় একজন লোক (বোধ হয় একজন গাড়োয়ান) আসিয়া তাঁহার নিকট ঔষধ চাহিল। তিনি রোগের সমস্ত লক্ষণের কথা শুনিয়া ঔষধ দিলেন। লোকটি চলিয়া গেলে তিনি বলিলেন, 'ইহারা বড় বেশী পেঁয়াজ রসুন খায়, তবু ইহাদের শরীরে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া হইতে দেখা যায়।"

একবার বহুলোক তাঁহাকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করে। এক একজন প্রণাম করে আর মহেশবাবু দুই হাত পিছাইয়া যান। যখন শেষ ব্যক্তির প্রণাম করা হইয়া গেল, তখন দেখা গেল, যে, মহেশবাবু পিছাইতে পিছাইতে প্রায় ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

একবার একজন শিক্ষিত ব্যক্তি কর্ম্মদোষে বিপন্ন হইয়া পড়েন; সেই ব্যক্তি এক সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং সৌভাগ্যলাভের আশায় নানারূপ ক্রিয়া করাইতে থাকেন। মহেশবাবু সে কথা শুনিয়া বলিলেন, "শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও এই দুর্ব্বলতা দেখা যায়। কেহ কেহ ধর্ম্মকর্ম্মকে সাংসারিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়-রূপে ব্যবহার করে। যদি হঠাৎ তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ

হইয়া যায় তবে তাহারা মনে করে, যে, ঐ সকল প্রক্রিয়াই তাহাদের সাংসারিক উন্নতির জন্য দায়ী।"

তিনি চিরকুমার ছিলেন। জ্ঞানচর্চ্চা তাঁহার জীবনে বল, আনন্দ ও শান্তি আনয়ন করিয়াছিল। তিনি শেষ-জীবন হাজারিবাগেই কাটাইয়াছিলেন। ১৯২৬ সনের এপ্রিল মাসে তাঁহার সহিত শেষ দেখা হয়। তখন বলিয়াছিলেন, "আর দেখা হয় কি না সন্দেহ।" কিন্তু তাহার পরেও চারি বৎসর পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

দেহত্যাগের দুইতিন মাস পূর্ব্বে তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ে। তখন হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজে উৎসব হইতেছিল। একা উৎসবের ভার বহন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না; সুতরাং কলিকাতা হইতে লোক পাঠান হয়। ইহার পর তাঁহার শরীর কিছু সুস্থ হয়, কিন্তু আবার অসুখের বৃদ্ধি হয়। অসুস্থ অবস্থায় তিনি কোন দিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোন প্রকার কাতরতা প্রকাশ করেন নাই। তিনি পরম নিশ্চিন্ত-ভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এবং প্রায় তিন মাস রোগে ভুগিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

নাস্তিক

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

১

তারপর বিনোদ বলিল, খবর কি? এতদিন পর মনে পড়ল আমায়? কোথায় ছিলে এতদিন? তুমি কিন্তু একটুও বদলাও নি। তোমার সেই রোগাপট্‌কা চেহারা, ম্লান মুখ, ড্যাব্‌ড্যাবে কালো চোখ দুটি যেন কিসের সন্ধানে ঘুরে মরছে, যেন সবজিনিষেরই ভিতরকার কথা টেনে নিতে চায়! তোমায় পেয়ে ভারি খুশী হয়েছি কিন্তু।…কিন্তু সে যাক, বুড়ো ঠাকুমা'র মত কি সব আবোলতাবোল বক্‌ছি! আমায় এখানে এ অবস্থায় দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেছ নিশ্চয়! ভাবছ আমি অনেকটা বুড়িয়ে গেছি, কেমন নয়?—তা বয়েসও ত নেহাৎ কম হ'ল না। এই যে হাত দুখানা দেখছ, এতে ডাক্তারের ছুরির বদলে চাষীর কাস্তেই মানায় ভাল। তোমার হাত দুখানা কিন্তু বেশ নরমই রয়ে গেছে—তোমার যৌবনশ্রীর এতটুকুও কম্‌তি হয় নি।

আমার কথাবার্ত্তা শুনে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেছ। হাঁ, আমিই তোমার সেই ছেলেবেলাকার সাথী, যৌবনের সহপাঠী; আজ আমি প্রৌঢ়, চোখ দুটো আমার কোটরে ঢুকেছে, কপালে সুস্পষ্ট বলিরেখা পড়ে গেছে! মনে পড়ে ছেলেবেলাকার কথা? বেরালের লেজে বিস্কুটের টিন বেঁধে তাকে একদিন ছাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম, সারাটা রাত্তির বেরালটার সে কি তাণ্ডব নৃত্য! পাশের বাড়ীর সকলেই ভূতের উপদ্রব মনে করে কি সাংঘাতিক ভয়ই না পেয়েছিল!

তোমার প্রাণখোলা সরল হাসিটি আজও মনে পড়ে অথচ কতদিন হয়ে গেছে!

মনে পড়ে স্কুলে সেই পিছনের বেঞ্চিতে বসে লেবেঞ্চুস খাওয়া। অঙ্কের ঘণ্টায় নিশিবাবুর সেই অতি-শাসন?—সামান্য ত্রুটি এড়িয়ে চলবার জো নেই, তাঁর উদ্যত বেত্রখণ্ডের সঙ্গে আমাদের সেই প্রতিদিনকার চির-মিলন। মনে পড়ে, একদিন তোমার 'হোম টাস্ক' আমি হরিপদর খাতা দেখে টুকে দিয়ে কি লাঞ্ছনাটাই না ভোগ করেছিলাম!

তারপর, সেবার বার্ষিক পরীক্ষার পর তোমাতে আমাতে একদিন দুপুরে আমাদের বকুল গাছটার তলায় শানবাঁধানো আসনে বসে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদার' কাব্যরসে মশ্‌গুল ছিলাম। তোমার স্বাভাবিক মৃদুমধুর সুকণ্ঠে সেই আবৃত্তি, তোমার সে আত্মহারা দৃষ্টি আজও আমি ভুলতে পারিনি। তুমি হেসে আমায় বলেছিলে,

জানিস্ এ দৃষ্টি আমি উত্তরাধিকারসূত্রে কৃষ্ণ-সখার কাছ থেকে পেয়েছি। খুব সম্ভব সেদিন পাঠশেষে তুমি উদ্দেশে কবিগুরুর পায়ে শত শত প্রণাম নিবেদন করেছিলে। মনে পড়ে সব ?

তোমায় বিরক্ত করছি না ত ? দীর্ঘকাল পরে তোমায় পেয়ে আমার কত কথা মনে পড়ছে। অনেকদিন প্রাণ খুলে কথা কইতে পারি নি। এখানকার এ একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগে না। সারাটা দিন সেই রোগী দেখা, তাদের ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা—নীতি-কথার মতই তেতো মনে হয়। রাস্তায় লোক-চলাচল বেশী নেই—মাঝে মাঝে দূরাগত দু'চার জন পথিক তাদের পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে কোন্ সুদূরে মিলিয়ে যায়—কে জানে !

ওই দেখ অদূরে পাহাড়টা কেমন ঝুঁকে পড়েছে, যে-কোনো মুহূর্তে ও যেন আমাদের উপর ধসে পড়বে—তাই দিনরাত্তির শাসাচ্ছে, যেন আমাদের গুঁড়িয়ে মারাই তার মতলব। হাসপাতালে রোগীর ভিড় তেমন নেই, যে কয়জন আছে, তাদের সে বিচিত্র অভিযোগের অদ্ভুত বিবরণ শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যায়- তাদের মেজাজই যেন পাওয়া ভার ! তাদের চিকিৎসা করবার সুযোগ দিয়ে যেন তারা আমায় কৃতার্থ করেছে, পান থেকে চূণ খসলেই অনর্থ, শাপমন্যিরও সীমা নেই। যেন তারা সব আমার মেয়ের বিয়েতে বরযাত্রী এসেছে।

রবিবারে হাসপাতালে কাজের ভিড় একটু কম থাকে। তাই সেদিন আমার শান্তির যেখানে শেষ বিছানা বিছিয়ে দিয়েছি, সেই পাহাড়ের গায়ের সেই খানটায় গিয়ে একটু বসি। শান্তি কে ? জিজ্ঞাসা করছ ?—শান্তি আমার একমাত্র কন্যা, চার বছর হ'ল এক মেঘেভরা বৃষ্টিঝরা অপরাহ্নে তাকে চিরদিনের মত হারিয়েছি। সে দিনটির কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে।

কিছুদিন থেকেই তার ক্ষয়রোগ হয়েছিল। নিজে চিকিৎসক, চিকিৎসার যে তেমন কোনো ত্রুটি হয়েছে তা বলতে পারি নে, তবে সেবাশুশ্রূষার যে প্রতিপদে ত্রুটি হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একা মানুষ, সব সময় নিয়মিত ওষুধপথ্য দিতে পারতাম না। ঘরে স্ত্রী আছেন বটে, কিন্তু তিনি সপত্নী-কন্যার সেবা করতে গিয়ে দুরারোগ্য ব্যাধি অর্জ্জন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিশেষত রোগীর সেবা করা তাঁকে মোটেই পোষাত না।

সেদিন সকাল থেকেই থেকে থেকে জল ঝরছিল, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছিল। এক একবার এক একটা বজ্র কড়্ কড়্ শব্দে কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছিল। শান্তি সজল চক্ষে গলা জড়িয়ে আমায় আঁকড়ে ধরল। আমি নীরবে অশ্রুশূন্য চোখে তার সামনে বসে ছিলাম। আমি তখন কোনো একটা বিশেষ কিছু ভাবছিলাম না—মনটা নেহাতই যেন ফাঁকা। ক্রমে চারদিক নীরব নিস্তব্ধ হয়ে এল, কেবল মাঝে মাঝে বৃষ্টির ঝটকা বন্ধ-জানলার শার্সিতে এসে পড়ে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল। সেদিন স্ত্রী তার মাসতুত ভায়ের মেয়ের পুতুলের বিয়েতে যোগদান করবার জন্যে তার দাদার বাড়ীতে গিয়েছিলেন। একটু পরেই জল থেমে গেল, আমার একটু অমনো-যোগিতার ফাঁকে শান্তি যে কখন আমায় অশান্তির পাঁথারে ফেলে রেখে চলে গেল, তা জানতেও পারলাম না। তখনও সে কিন্তু আমায় জড়িয়ে ধরেই ছিল, চোখের শেষ অশ্রুবিন্দু তখনও তার গাল থেকে নিঃশেষে শুকিয়ে যায় নি।

তাকে ওখানে ঐ শিউলি ফুলগাছটার তলায় পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছি, তারপর ঐ যে দেখছ সমাধি-ফলকখানা, ও তারই স্মৃতির জন্য বানিয়েছি। প্রতি রবিবার সকালে ঐ শিলাখণ্ডের সামনে বসে অনেকটা সময় কাটাই, নিজের মনে ফুল দিয়ে প্রস্তর ফলকখানাকে সাজাই। আমার বিশ্বাস—বিশ্বাস কেন, আমি ঠিক অনুভব করি যে, শান্তি অদৃশ্যলোক থেকে সেই সময় আমার পাশে এসে উপস্থিত হয়। সে যেন আস্তে আস্তে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, 'বাবা, কেঁদ না, আমি ভাল আছি, আর কোনো অসুখই আমার নেই।'

অদূরে খ্রীষ্টানদের কবরখানায় একটি আধা-বয়সী স্ত্রীলোক কালো পোষাক পরে প্রতি রবিবারই প্রাতে এসে উপস্থিত হয়। কবরের উপরকার প্রস্তরফলক শাদা

ফুল দিয়ে সাজায়, বাইবেল পড়ে—পরে চোখ মুছতে মুছতে চলে যায়। একদিন মহিলাটির সঙ্গে যেচে আলাপ করে জানলাম, ওখানে তার একমাত্র সন্তানকে গোর দেওয়া হয়েছে।

শান্তির সমাধি-ফলকে বসে এক একসময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি, তখন এত বড় বিশ্বের আর কারুর কথাই মনে আসে না,—একমাত্র তোমার কথা সময় সময় মনে পড়ে। এখনও প্রতিষ্ঠা ও ধনসম্পদ কামনা করি—কেন-না দরিদ্র বলেই না শান্তি আমায় অত সহজে ছেড়ে যেতে পারল,—আমি ত বেশ জানি যে চিকিৎসার কোনো ভাল ব্যবস্থাই করতে পারিনি।

শান্তির সমাধিস্থান ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি-বারেই নিজের মনে একটা পরম সান্ত্বনা পাই—মনে হয়, তাকে আমি আমার-জগতে হারিয়েছি বটে, কিন্তু তাকে বৃহত্তর জগতে বিরাটরূপে লাভ করেছি। শান্তি আমার ছিল, শান্তি আমার আছে।

দেখছ আমার কাণ্ডজ্ঞান! তুমি পথশ্রমে না জানি কত ক্লান্ত হয়েই এসেছ, অথচ সেদিকে আমার খেয়ালই নেই, নিজের দুঃখের কথাই বলে যাচ্ছি। মাফ্ করো ভাই। চল, ঘরে গিয়ে বসি। বস্‌বে না?—বেশ, এখানে তাহ'লে এই ঘাসের উপর বসি।

তারপর কি বলছিলাম, হাঁ। যতক্ষণ হাসপাতালে থাকি—নিজেকে বেশ ভুলে থাকি, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এলেই নিজের ব্যর্থ জীবনের সে মর্ম্মন্তুদ করুণতা আমায় আত্মহারা করে তোলে। এতদিন পর তোমায় পেয়েছি, জীবনের সব কথা ব'লে দুঃখের ভার কিঞ্চিৎ লাঘব করে নিই। তোমায় বলতে কি ভাই, স্ত্রীকে আমি সইতে পারি নে, অথচ ছাড়বারও জো নেই।

না, দোহাই তোমার হেসো না শুনে! আমার ন্যায় দুর্ভাগার এই করুণ কাহিনী শুনে যার প্রাণে হাসি আসে তার মত পাপিষ্ঠ আর নেই। এ যে আমার কি পরম ব্যথা তা বলতে পারি নে, যাকে নিজের গৃহলক্ষ্মীর আসনে প্রতিষ্ঠা করেছি, তাকেও আপনার করে পেলাম না।

ভয়ের আমার সীমা নেই, পাছে আমার কোনো আচরণে সে মর্ম্মাহত হয়, পাছে সে মনে করে, তাকে আমি প্রতারিত করেছি, সেই ভয়েই সর্ব্বদা তটস্থ থাকি। বিলাসের উপকরণেরও কিছুমাত্র অভাব নেই তার, আব্দারও তার অফুরন্ত; এটা চাই, ওটা চাই—প্রতিদিনই দাবীর মাত্রা অব্যাহত বেড়ে চলে। গহনা, গ্রামোফোন, শাড়ী, জামা, সাবান এসেন্স,—নিত্য নতুন সব তার চাই। আব্দার পূরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নেই, এ যেন তার পাওনা। অর্থাভাবে তার দাবী পূরণে এতটুকু ত্রুটি হ'লে অনর্থপাত অপরিহার্য্য। আমি বাঁচি কি মরি, আমার কাজ হোক, কি না হোক, তা আর দেখবার প্রয়োজন নেই, ইচ্ছাও নেই, তার দাবী পূর্ণ হলেই হ'ল।

যাক্-গে এ সব কথা। কই তোমার শরীরটাও ত তেমন ভাল দেখছি নে—তবে কি জগতে আমার মত সকলকারই দুঃখ-কষ্ট আছে!

হাঁ, কি বলছিলে?—শশাঙ্ক কোথায় আছে?—সে যেখানে আছে, সেখানকার খবর কেউ জানে না, আজ পর্য্যন্ত কেউ জানতে পারে নি। তুমি জান তার সেই নির্ব্বোধের মত চেহারাটা দেখলেই ছেলেবেলায় আমার হাসি পেত। তার বুদ্ধি কম ছিল বটে কিন্তু তার প্রাণ ছিল। যৌবনের সুরুতেই সংসারের জন্যে কি অসাধারণ খাটুনিই না সে খাটত। তার সেই রোগা ঢ্যাঙা চেহারা কাঠির মত হাত-পাগুলি, কোটরগত চোখদুটি, মুখখানা সর্ব্বক্ষণ বিষাদাচ্ছন্ন—এখনও যেন চোখের উপর ভাসে।

আমি তখন সবে এখানে ডাক্তার হয়ে এসেছি। একদিন তার বৃদ্ধ বাপ কেঁদে এসে আমায় বললেন, বাবা, আমার শশাঙ্ককে একবার দেখবে এস, তাকে বুঝি আর বাঁচাতে পারলাম না।

শশাঙ্কের বাবার কথা তোমার অবশ্যই মনে আছে, সেই সহৃদয় অতিদরিদ্র বৃদ্ধ এখানকার স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, অথচ তিনি যে কোনদিন লেখাপড়া কিছু শিখেছিলেন তা কিন্তু তাঁকে দেখলে বা তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইলে কখনই মনে হত না।

আমি গিয়ে দেখি শশাঙ্ক একেই ত রোগা মানুষ, তার উপর রোগে ভুগে ভুগে তার দেহে মাংসের কণামাত্রও ছিল না। একখানা ক্যাওড়া কাঠের তক্তপোষে মলিন

শয্যায় শুয়ে ধুঁকছে। বুড়ি পিসিমা তার একপাশে বসে মালা জপ করছেন, যেন ভগবানের নিকট একাগ্রতার সঙ্গে ভ্রাতুস্পুত্রের আয়ুভিক্ষা করছেন। দর্মার বেড়ার ফাঁক দিয়ে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের শেষকিরণ-সম্পাতে রোগীর মুখখানাকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তোমার মনে আছে নিশ্চয় যে, মা তার ছাত্রজীবনেই মারা যান। ছোট ভাইটি দাদার অসুখ কিসে সারবে তারই ভাবনায় ব্যাপৃত, অথচ ছেলেমানুষ সে, জানে না যে, তার দাদার জীবন-প্রদীপের তৈল প্রায় নিঃশেষ হয়েই এসেছে।

শশাঙ্ককে মনোযোগ দিয়েই পরীক্ষা করলাম। কিন্তু বুঝলাম আর বেশী দেরী নেই। দীর্ঘকাল রোগে ভুগে, অনাহারে অর্দ্ধাহারে অমানুষী পরিশ্রমে অচিকিৎসায় তার জীবনের মূলে মরণের টানটা খুব স্পষ্ট হয়েই আমার চোখে ধরা পড়ল। আমায় দেখেই সে তার রোগজীর্ণ বিশীর্ণ হাত দুখানি প্রাণপণ চেষ্টায় বাড়িয়ে দিল, কিন্তু দুর্ব্বল দেহ তার ভারটুকুও বইতে পারল না। জড়িত স্বরে কি বললে, তার সব কথা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না, তবে তার অস্পষ্ট কথার মধ্যে থেকে এইটুকু বুঝতে পারলাম যে, মৃত্যুকালে আমায় দেখতে পেয়ে সে ভারি খুশী হয়েছে, তোমায় শেষ দেখা দেখতে পেলে আরও খুশী হত। কিন্তু তুমি তখন কোথায়!

আগেই বলেছি, শশাঙ্কর বুড়ি পিসিমা একধারে বসে বুঝি একমনে ভগবানকেই ডাকছিলেন। তাঁর সে আকুল প্রার্থনার সব কথা আমাদের কানে পৌঁছয় নি। শশাঙ্কর প্রাণে যেন কোনো দুঃখই নেই, কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষাও নেই—তার মুখ দেখে আমার তাই মনে হ'ল।

আমার মুখে চোখে কি তখন অবিশ্বাসীর হাসি ফুটে উঠেছিল?—কেন-না, সঙ্গে সঙ্গেই সে তার ভীত কম্পিত হাতখানা আস্তে আস্তে আমার হাতে তুলে দিয়ে বিজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ভাই, সত্যি ভগবান আছেন?

আমি কি জবাব দিব? ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমার কোনদিনই আস্থা ছিল না, ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু ভাবাও কোনদিন প্রয়োজন বলে মনে করি নি। কিন্তু তাই বলেই কি এখন আমি বলতে পারি যে, সত্যিই তিনি নেই? কিন্তু তবু আমার বার বার এই কথাই মনে হ'ল যে,হয় ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেহাতই অলীক, নেহাতই মানুষের মন-গড়া; দুর্ব্বল মানব জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হয়ে নিজেকে স্তোক দেবার জন্যে 'ঈশর ঈশ্বর' করে মাথা ঘামায়।...

আমার মতামতের যে তার কাছে তখন কি মূল্য তা আমার বেশ জানা ছিল। হয় ত সে মনে করেছিল যে, আমি অনেক পড়াশুনা করেছি, অনেক ভেবেছি, অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর, আমি সম্ভবত তার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারব, এই ভরসাতেই সে আমায় এ প্রশ্ন করল। কিন্তু আমি কোনরকম জবাবই দিলাম না কেন-না জবাব আমার মুখ দিয়ে বেরল না, কেমন একটা সঙ্কোচ এসে আমায় বাধা দিল।

আমায় নীরব থাকতে দেখে পিসিমার মুখে চোখে একটা তীব্র ঘৃণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, সে দৃষ্টি যেন আমায় বলছিল, দস্যু, আমার এই মরণপথযাত্রী পুত্রের শেষ বিশ্বাসটুকুও নষ্ট করলে!

শশাঙ্ক ব্যাকুলদৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল, তার সেই আয়ত দৃষ্টির মধ্যে একটা আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে এল। আমার জবাবের উপরই তার সব নির্ভর করছিল। যেই আমি জবাব দিতে যাব, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তার হাতে মৃত্যুর কম্পন যেন অনুভব করলাম। আর কিছু বলা হ'ল না, সঙ্গে সঙ্গেই তার হিমশীতল হাতখানা অসাড় হয়ে তক্তপোষের পাশ দিয়ে ঝুলে পড়ল। পিসিমা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। শশাঙ্কের বৃদ্ধ পিতা অপলক দৃষ্টিতে শশাঙ্কের মৃতদেহের দিকে চেয়ে রইল। ছোট ভাইটি তখনও জোড়হাতে শূন্যে তাকিয়ে বসে ছিল।

উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে দরজার সুমুখে গেলাম। তারপর কেমন করে যে সে বাড়ী থেকে চলে এসেছিলাম, আজ আর সে কথা মনে নেই। বাইরে তখন ভারি গরম—রৌদ্র খাঁ খাঁ করছিল, তারিণী মুদীর দোকানে তাদের সে বুড়ো সরকার তখন সবে কাশীদাসের মহাভারতখানা খুলে বসেছিল। কোনো রকমে বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছুলাম। সারাক্ষণ আর ঘরের বার হইনি, দরজা-জানলা বন্ধ করে আচ্ছন্নের মত বসে রইলাম। এক এক সময় মনে হচ্ছিল,

শশাঙ্কের বুড়ি পিসিমা যেন বন্ধ ঘরের ফাঁক দিয়ে বার বার উঁকি মারছেন। তাঁর সে অগ্নিদৃষ্টি আমায় বার বার পুড়িয়ে দিতে লাগল। তারপর থেকে যতদিন তাঁরা এখানে ছিলেন আর কোনো দিন তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারি নি।

কিন্তু এসব করুণ কাহিনী ব'লে তোমায় দুঃখ দিচ্ছি মাত্র। আর এসব নয়। দু'একটা মজার কথা বলি। বলব না?—বেশ, যা বল। সত্যি বলতে কি, দুঃখের কাহিনী ছাড়া বলবার মত আমার জীবনে কিই-বা আছে। জীবনটাই আমার একটা বিরাট দুঃখের মহাভারত।

ওই শোন, গ্রামোফোন চলছে। কোনো দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, ভাবনা-চিন্তা নেই, বেশ আছেন। গ্রামোফোন আমি কিন্তু দু' চক্ষেও দেখতে পারি নে, গ্রামোফোনের স্বর আমায় জাগ্রত রাখে, উত্যক্ত করে, কিন্তু গৃহিণী দিনরাত লোকজন নিয়ে গ্রামোফোন বাজান। আমি কর্ম্মক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে শোবার ঘরে বসে একদৃষ্টিতে শান্তির ছবিখানার দিকে চেয়ে থাকি! পাড়ার যত মেয়ে এসে গৃহিণীর সঙ্গে বসে জটলা করে, আমার অস্তিত্ব তাদের মনে কোনো উদ্বেগই এনে দেয় না।

ওই যে লোকটিকে দেখছ, ও তার কেমন সম্পর্কে দাদা নাকি। এ লোকটির আনাগোনা সম্প্রতি বড়ই হামেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সময় সময় ঘর ছেড়ে এই গাছটার নীচে এসে বসে থাকি। কতদিন যে এমনি নিঃসঙ্গ প্রবাস-জীবন যাপন করতে হবে কে জানে! শান্তি তাকে একদিনও ত মা বলে ডেকেছে, এই জন্যেই তাকে কিছু বলতে পারি নে হয় ত, কিন্তু তোমায় ব'লে রাখছি বিনোদ, যদি কোনদিন এখানে কাউকে খুন করা হয়েছে বলে শোন, আর সে খুনের সঙ্গে তোমার ডাক্তার-বন্ধুর নাম সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহ'লে বিস্মিত হয়ো না, কেন-না বিস্মিত হবার তাতে কিছু নেই।

তুমি ভাবছ হয় ত, যে-লোক একটা পিঁপড়েকে মারতে ইতস্তত করে, সে কেমন করে একটা মানুষ খুন করবে, কেমন, তাই না? কিন্তু ভাই, আমি একেবারে বদলে গেছি—প্রতিদিনই বদলাচ্ছি। এক এক সময় হাসপাতালের রূপোর মত চকচকে অস্ত্রগুলির দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকি। এক একসময় হাসপাতাল থেকে বাড়ী আসবার জন্যে রাস্তায় বেরিয়ে এসেও ফের অজানার আকর্ষণে হাসপাতালে ফিরে যাই এবং যে-ঘরে অস্ত্রগুলি থাকে সে ঘরের আলোটা জ্বেলে অস্ত্রগুলির দিকে তাকিয়ে থাকি। অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত-কি ভাবি। আমার কল্পনায় অস্ত্রগুলি যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। তারা যেন দম্ভভরে আমায় ডাকে। আমি চোরের মত চুপি চুপি আলমারী খুলে অস্ত্রগুলি নাড়াচাড়া করি। অনুভব করি, একদিন আমায় খুনে হতেই হবে হয় ত।...

কে ডাকছে না আমায়?—সম্ভবত গৃহিণী। দেখি, কি হুকুম হয়। তুমি একটু বস ভাই, আমি এখুনি আসছি।...

বেশী দেরী হয় নি। গৃহিণীর সেই ভাই এসেছেন, তাকে খাওয়ান হবে—টাকা চাই। দিয়ে এলাম। কি বিনোদ, চোখ রাঙাচ্ছ যে! জানি তার হুকুম মেনে চলতে গিয়ে ভিক্ষুকেরও অধম হয়ে গেছি। আমার যেন অস্তিত্বই নেই। তাও বলি, রাগ করেই বা কি করব, কাকে তাড়াব? তাতে ত নিজেরই কলঙ্ক—লোকে হাসবে।

তুমি কি এখনই যেতে চাও নাকি? বেশ, যাবে যাও। মধ্যে মধ্যে খোঁজ নিয়ো। এই ত ছোট্ট নদী, ওপারেই ত তোমার কর্ম্মক্ষেত্র। কত দিন এসেছ বদলি হয়ে?—পনর দিন?—তা হবে। এতদিন কাছে ছিলে না, তাই নিজেকে বড় একাকীই মনে হয়েছে। এখন মধ্যে মধ্যে তোমায় কাছে পেলে তবু মনে একটু সময়ের জন্যেও হয় ত শান্তি পাব। আজ যখন চলে যাবে, আমি তখন এখানে একাকী বসে বসে জীবনের পাতা উল্‌টিয়ে যাব—কত লোক এসেছে, কত লোক চলে গেছে—কত স্মৃতি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। ঘরের আলো তখন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকবে—চোখ মুছে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরব।

ওই তারা আবার গ্রামোফোন বাজাচ্ছে। কি গান বাজছে ?—

তুমি যেয়ো না এখনি
এখনো আছে রজনী।

এ-কথা শোনাবার জন্যে গ্রামোফোন বাজাবার কোনোই দরকার ছিল না।

হাঁ, একটা জিনিষ তোমায় দেখাতে চাই। লাল নীল সবুজ কাগজ দিয়ে কতকগুলি ফুল তৈরী করছি—এগুলি আমার শান্তির জন্মদিনে উপহার দোবো—পরশুই তার জন্মদিন। আসবে সেদিন ?……

কিন্তু, ওকি বিনোদ, দুহাতে মুখ ঢাকছ কেন ভাই ? তোমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে কেন ? কেন বন্ধু… কেন ?*

* এই গল্পের মূলগত ভাবটি একটি ফরাসী গল্প থেকে নেওয়া।

তারার মতন

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

মনে সাধ যায় মোর তারার মতন হয়ে থাকি,
সাঁঝে আসি, সারাদিন আপনারে লুকাইয়া রাখি,
তপনের সাদাজরির চাদর তলে শুয়ে,
আকাশের নীল চাঁদোয়ার নীচে হ'তে হুয়ে,
সারা বেলা দেখি চেয়ে ধরণীর খেলা,
ঘরে ঘরে কত কাজ, গোধূলির বেলা
ধূপ দীপ জেলে নিয়ে ঘরে ঘরে চলা,
ছেলেদের কাছে নিয়ে রূপকথা বলা,
সকাল হতে-না-হতে পলায়ন এমনি সুদূরে,
খুঁজিলেও মিলিবে না ধরণীর কোনো অন্তঃপুরে !
কাজ নয় স্বপনের বুনি জালখানি,
বলার নূতন কথা খুঁজে পেতে আনি।

সাধ যায় মনে অমনি তারার মত হয়ে থাকি,
সাঁঝে হাসি, সারাদিন আপনারে লুকাইয়া রাখি,
চেয়ে দেখি ভালো করে দুই লোকে যাহা কিছু ঘটে,
আলোর মুখেতে শুনি, যাহা কিছু চিরদিন রটে,
ভালোমন্দ আলোকে ছায়ায় কাছে বহুদূরে,
সবার খবর রাখি, গানের সকলতর সুরে
প্রাণে পাই সাড়া, আর লয়ে তারি বাণী,
তোমাদের তরে আমি, মালা গেঁথে আনি,
ধরার চম্পক আর স্বর্গ পারিজাত,
মনের বাসরে মোর লভে একজাত,
স্বর্গ সুখ পাই যেন, ধরণীর প্রীতি না হারাই,
দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখি প্রাণ হতে প্রিয় তোমরাই,
সাধ যায় মনে অমনি তারার মত হয়ে থাকি,
স্মৃতিতে বিস্মৃতি নাই, স্বপ্নরাজ্যে খুলে যায় আঁখি।

ঢাকাই মসলিন

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

এদেশের যে সকল শিল্প লোপ পাইয়াছে তাহার মধ্যে ঢাকার মসলিনের স্মৃতি সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। অতি অল্প দিন—পঞ্চাশ বৎসর—পূর্ব্বেও এই বয়নশিল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ এদেশের শিল্পীকে গৌরবান্বিত ও বিদেশীয়কে হতাশ করিত। অতি আধুনিক যুগে কলনির্ম্মিত স্বল্পমূল্য অনুকরণের ফলে ইহার ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

ইহার ইতিহাস অতি প্রাচীন। সুদূর রোমে ইহা Ventus textilis বা Nebula নামে আদৃত ও বহু-মূল্যে বিক্রীত হইত।* তাহারও বহুপূর্ব্বে এদেশের প্রাচীন পুস্তকে উহার উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন কার্পাসবস্ত্রসকল মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত।

ট্যাভরনীয়রের আমলেও (খৃঃ সপ্তদশ শতকের প্রথমার্দ্ধে) ইহা জগদ্‌বিখ্যাত ছিল এবং সর্ব্বত্র আদৃত হইত।† সে সময়ে পনের গজ লম্বা ও একগজ চওড়া সাধারণ মসলিনের ওজন হইত তিন বা চারি তোলা মাত্র।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ঐ মাপের শ্রেষ্ঠ মসলিন পাঁচ হইতে সাত তোলা ওজনের হইত। সে সময়ের দশগজ লম্বা এবং একগজ চওড়া উৎকৃষ্ট মসলিনের (মলমলখাস) টানায় ১০০০ হইতে ১৮০০ সংখ্যক সুতা থাকিত। ইহার ওজন হইত ১৪০০ হইতে ১৫০০ গ্রেণ অর্থাৎ চার হইতে পাঁচ তোলার মধ্যে।

বর্ত্তমান সময়ে সুতাকাটা ও বয়ন সম্বন্ধে দেশে পুনর্ব্বার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, সেইজন্য এই শিল্পের খৃঃ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে যে অবস্থা ছিল তাহার একটি বিবরণ দেওয়া গেল।‡

মসলিন

মসলিন নানা প্রকারের ও তাহা বহু নামে পরিচিত। তন্মধ্যে সূক্ষ্ম, সাদা জমিন ও সাদা রঙের মসলিনের বিষয় এই স্থানে আলোচনা করা যাইতেছে।

এই মসলিনের বেশীর ভাগ ঢাকায় তৈরী হয় এবং ঐস্থানের মসলিনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই কারণেই ভারতের যে সকল সূক্ষ্ম মসলিন আছে তাহা ঢাকাই মসলিন বলিয়াই আমরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। ভারতের অন্যান্য স্থানেও সুশ্রী ও সূক্ষ্ম মসলিন প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ঢাকার তাঁতীরা এই সম্পর্কে অবিসম্বাদিরূপে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। নিপুণতার দিক দিয়া এ পর্য্যন্ত ভারতের বা

টেকোয় সরু সুতাকাটা

বিদেশের কোন তাঁতীই ইহাদিগকে হারাইতে পারে নাই। ঢাকার মসলিন হইলেই কেহ আর তাহা যাচাই করিতে যায় না। 'সান্ধ্যশিশির,' 'স্রোতের জল' ইত্যাদি চমকপ্রদ কবিত্বময় নামগুলিই লোকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে।

টেলর সাহেবের মতে ঢাকাই মসলিনের পরিমাপ সচরাচর এক একখানা দৈর্ঘ্যে ২০ গজ এবং প্রস্থে এক গজ। টানার সুতার সংখ্যা পড়েনের সুতা অপেক্ষা অনেক বেশী। বিশ তোলা (এক পোয়া) ওজনের একখানা মসলিনে টানা এবং পড়েনের সুতার অনুপাত ১১:৯, বস্ত্রের দৈর্ঘ্য এবং ওজনের তুলনায় টানার সুতার সংখ্যা বিবেচনা করিয়াই মসলিনের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যেগুলির দৈর্ঘ্য যত বড়, টানার সুতার সংখ্যা যত বেশী এবং ওজন যত হাল্কা তাহার মূল্যই তত বেশী। চার পাঁচটি সুতা এক সঙ্গে পাকাইয়া তাহাতে গ্রন্থি দিয়া মসলিনের এক প্রান্তে ঝালরের মত কারুকার্য্য করা হয়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে ঢাকাই মসলিন মিশর দেশের মমী বস্ত্রেরই কতকটা অনুরূপ। মমীবস্ত্রের দুই দিকেই কিন্তু শালের ন্যায়

* Periplus, Schoff, 63. See notes.
† Tavernier's *Travels*. Ball's Edition Book II, chap. II.
‡ Watson, *Textile Manufactures*.

ঝালর-যুক্ত আঁচলা দেওয়া থাকে। ঢাকার উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম মসলিন সকল সময়েই ফরমাশ মাফিক তৈরী হইত এবং প্রধানত ভারতীয় ধনী ও অভিজাত কুলের ব্যবহারের জন্যই বোনা হইত। মোগল রাজত্বের তুলনায় পরবর্ত্তী কালে মসলিনের চাহিদা খুব সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু যেটুকু আছে তাহাই এই শিল্পটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে। ঢাকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মসলিন 'মলমলখাস' বা নবাবী মসলিন নামে অভিহিত হয়। ইহা সাধারণত দশ গজ দীর্ঘ ও এক গজ চওড়ায় আধখানা করিয়া তৈরী করে এবং এরূপ এক একখানা মসলিনে সাধারণত টানায় হাজার হইতে আঠার শত সুতা থাকে। 'স্রোতের জল' নামক মসলিন দ্বিতীয় শ্রেণীর।

মসলিনের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে বোল্টস্ সাহেব দুইটি গল্প বলিয়াছেন। তাহার একটি এই:—একদিন বাদশাহ আওরঙ্গজেব তাঁহার কন্যার নগ্নকান্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করেন। তাহাতে তরুণী বাদশাহজাদী প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, তিনি মোটেই নগ্ন নহেন, সাত সাতটি জামা পরিধান করিয়া আছেন।

টানা খাটানো

দ্বিতীয় গল্পটি এই:—নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর সময়ে একজন তাঁতী বিশেষ রূপে শাস্তি পাইয়াছিল এবং ঢাকা শহর হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার অপরাধ—'আব্রুয়ান' নামক একখণ্ড মসলিন সে ঘাসের উপর বিছাইয়া রাখিয়া ছিল, তাহা তাহার অসাবধানতায় সেখানেই পড়িয়া ছিল এবং তাহার গরু ঘাসের সঙ্গে তাহা গিলিয়া ফেলে।

'সান্ধ্যশিশির' নামে পরিচিত মসলিন তৃতীয় শ্রেণীর। তারপর 'সরকারালী,' তারপর 'তৃণজেব'। জঙ্গলখাসা ও নয়নসুখও বেশ সুদৃশ্য মসলিন। ঢাকার অন্যান্য আরও যে সকল মসলিন আছে তাহা 'বুদ্ধনখাস,' 'কুসীম,' 'ঝুনা' (ইহা বিশেষভাবে নর্ত্তকীদের দ্বারা ব্যবহৃত), 'রঙ্গ', 'আলাবল্লী', 'তুরুনদম' (এই মসলিন এক সময়ে 'তারেন্দাম' নামে বিলাতে রপ্তানি করা হইত) প্রভৃতি…

এই সময়ে বিলাত ও ফ্রান্সে কলনির্ম্মিত মসলিন চালাইবার খুবই চেষ্টা হয়। কলওয়ালারা বলেন যে, তাঁহাদের মসলিন ঢাকাই মসলিন অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও ঘন। এ বিষয়ে এদেশে গভর্ণমেণ্টের আদেশে ওয়াটসন্ সাহেব অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল নীচে দেওয়া গেল। ভারতীয় সুতা যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাহা ঐ পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছিল।

চারখানি মসলিন পছন্দ করা হয়, তাহার মধ্যে দুইখানা ইউরোপে আর দুইখানা ঢাকায় তৈরি। ইউরোপে তৈরি দুইখানার মধ্যে যেখানি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট তাহা ১৮৫১ সালে, এবং অপরখানি ১৮৬২ সালে প্রদর্শিত হয়। ঢাকায় তৈয়ারী মসলিনের মধ্যে যেখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেখানি ১৮৬২ সালে প্রদর্শিত হয়, অপরখানি কলিকাতার যাদুঘর হইতে প্রদর্শিত হয়, সেখানি আরও সূক্ষ্ম।

ইউরোপে তৈরি সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম সুতা অপেক্ষা ঢাকার তৈরি সুতার ব্যাস অনেক কম। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইউরোপে তৈরি প্রদর্শিত সূক্ষ্মবস্ত্রের ব্যাস যথাক্রমে '০০২২২ ও '০০২১৬৭ ইঞ্চি পাওয়া গিয়াছে, আর ভারতে প্রস্তুত কাপড়ের নমুনা যথাক্রমে '০০১৫২৬ ও '০০১৮৯৬ ইঞ্চি দেখা গিয়াছে। প্রথমদৃষ্টিতে লোকের মনে এই পার্থক্যটা বড় বেশী বলিয়া মনে না হইতে পারে, কিন্তু আসলে এই পার্থক্য যে উপেক্ষার যোগ্য নহে তাহা বলাই বাহুল্য, আর এই পার্থক্যটা ভারতবর্ষের বয়ন-শিল্পের বিশেষ নৈপুণ্যের ই পরিচায়ক।

সুতার ব্যাসের এই মাপ বাজারে বিক্রয়ার্থ মসলিন হইতেই লওয়া হইয়াছে। কিন্তু মাড় থাকার জন্য মাপের পার্থক্য হওয়া বিচিত্র নহে, এই কারণে সযত্নে প্রত্যেকখানা হইতে মাড় দূর করিয়া পুনর্ব্বার মাপা হইয়াছে।

নীচের তুলনামূলক তালিকা হইতে এই অনুসন্ধানের ফলাফল জানা যাইবে:—

		সুতার ব্যাস (এক ইঞ্চির অংশ) সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ	সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ	গড়পড়তা
ফরাসী মসলিন (১৮৬২ সালের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী)	১ম নমুনা	'০০১	'০০৩২৫	'০০১৮৭৫
	২য় ,,	'০০১২৫	'০০৩২৫	০০১৯২৫
	গড়পড়তা	—	—	'০০১৯
বিলাতী মসলিন (১৮৫১ সালের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী)	১ম নমুনা	'০০১	০০২৭৫	'০০১৮০
	২য় ,,	'০০১২৫	০০২৫	'০০১৮০
	গড়পড়তা	—	—	'০০১৮
ঢাকাই মসলিন (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম)	১ম নমুনা	'০০০৭৫	'০০২	'০০১৩০
	২য় ,,	'০০১	০০২৫	'০০১৩৭৫
	গড়পড়তা	—	—	'০০১৩৩৭৫
ঢাকাই মস্‌লিন (১৮৬২ সালের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী)	১ম নমুনা	'০০১	০০২২৫	'০০১৫৫
	২য় ,,	'০০১	'০০২২৫	'০০১৫৭৫
	গড়পড়তা	—	—	'০০১৫৬২৫

ইহা হইতে পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে যে, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান বিশদরূপে ও সম্পূর্ণরূপেই করা আবশ্যক। বস্ত্র-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ও পরে সুতার ব্যাসের তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু ইহাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতীয় এবং

ইউরোপীয় সুতার প্রতিযোগিতায় ভারতীয় সুতাই উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রমাণিত হয়। আজ পর্য্যন্ত ইউরোপ যেরূপ সূক্ষ্ম সুতা তৈরি করিতে সক্ষম হইয়াছে, ভারতীয় সুতা তাহা অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম। বয়নের উপযোগী করিতে গিয়া সুতা যেরূপ পাকাইতে হয় তাহাতে ঢাকাই মসলিনের বিশেষত্বই প্রমাণিত হয়।

এ সম্পর্কে ইউরোপের তৈরি মসলিন ও ঢাকাই মসলিনে যে কি প্রভেদ তাহা নীচের তালিকা হইতে প্রমাণিত হইতেছে।—

		প্রতি ইঞ্চি সুতায় কতটা পাক দেওয়া হয়		
		সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ	সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ	গড়পড়তা
ফরাসী মসলিন (১৮৬২ সালের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী)	১ম নমুনা	৩২	১৭২	৭৩·২
	২য় ,,	৪৬	১৬৬	৬৪ ৪
	গড়পড়তা	—	—	৬৮·৮
বিলাতী মসলিন (১৮৫১ সালের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী)	১ম নমুনা	২৬	১১৪	৫৫·৬
	২য় ,,	২৮	১৪৬	৫৭·৬
	গড়পড়তা	—	—	৫৬·৬
ঢাকাই মসলিন (ইণ্ডিয়া মিউজিয়ম)	১ম নমুনা	৬৪	২৬০	১২১·৮
	২য় ,,	৪৬	১৯০	৯৮·৪
	গড়পড়তা	—	—	১১০·১
ঢাকাই মসলিন (১৮৬২ সালের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী)	১ম নমুনা	৪৮	১৯৬	৮২·৮
	২য় ,,	৩৮	১৪৪	৭৪·৬
	গড়পড়তা	—	—	৪০·৭

ইউরোপে প্রস্তুত মসলিন দুইখানার সম্পর্কে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক ইঞ্চি সুতায় গড়ে ৬৮·৮ এবং ৫৬·৬-টি পাক দেওয়া হইয়াছে; ইহার সঙ্গে তুলনায় ভারতীয় সুতায় ১১০·১ এবং ৮০·৭-টি পাক পড়িয়াছে। এই পার্থক্যের গুরুত্ব যে অত্যন্ত অধিক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কলে-কাটা অপেক্ষা সুতা হাতে-কাটা সুতা যে বেশী মজবুৎ সে বিষয়ে কোনো মতভেদ নাই। আর ইহাও সকলেরই বিশেষরূপে জানা আছে যে, কলে-কাটা এই সব সূক্ষ্ম সুতার বস্ত্রাদি ব্যবহারের পক্ষে অযোগ্য। অথচ ভারতের হাতে-কাটা সূক্ষ্মতম সুতায় তৈরি বস্ত্র বিশেষ মজবুৎ এবং পুনঃ পুনঃ ধোলাই করিলেও খারাপ হয় না, কিন্তু বিলাতের অথবা ইউরোপের সূক্ষ্মতম মসলিন বেশী ধোলাই করিলে পরে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া যায়।

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আমাদের (অর্থাৎ ইউরোপীয়) কারিগরদের যতই বড় বলিয়া জাহির করিতে চাহি না, তাহাদের এবিষয়ে এখনও অনেক শিখিবার আছে। ঢাকায় যেরূপ সূক্ষ্ম মজবুত মসলিন তৈরি করা সম্ভব হইয়াছে, আমাদের যন্ত্রপাতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতরূপে তৈরি হওয়া সত্ত্বেও ঢাকার ন্যায় মসলিন তৈরি সম্ভব হয় নাই। ঢাকার যন্ত্রপাতি সেকেলে পুরনো হইলেও

নাটাইয়ে সুতা গুটানো

তাহ৷ যে এরূপ সূক্ষ্মবস্ত্রবয়নের একান্ত উপযোগী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

ওয়াটসন্ মসলিন প্রস্তুত করণের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই ঃ—

সুতাকাটা

যে সকল স্ত্রীলোক সুতা কাটে তাহারাই কাপাস (অর্থাৎ তুলা ও বিচি আলাদা করার পূর্ব্বাবস্থা) পরিষ্কার করে। গাছের পাতা, ডাঁটা ও বীজ-কোষ ইত্যাদি সযত্নে হাত দিয়া পরিষ্কার করে, তারপর বিচির গায়ে যে তুলা আঁটিয়া লাগিয়া থাকে তাহা বোয়ালমাছের চোয়াল (ইহা দেখিতে ঘন ও ক্ষুদ্র দাঁতওয়ালা চিরুণীর মত) দিয়া আঁচড়াইয়া লয়, তাহাতে তুলার আল্‌গা ও মোটা আঁশগুলি পিঁজিয়া মাটির টুকরা বা অন্যান্য অপরিষ্কার বস্তু দূর হয়। কাটুনিরা বেশীর ভাগই হিন্দু স্ত্রীলোক, তাহারা অক্লান্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে বোয়াল মাছের চিরুণী দিয়া প্রত্যেকটি বিচি পরিষ্কার করে। পরিষ্কার করার কাজ শেষ হইলেই সে প্রত্যেকটি আঁশ হইতে বিচি বাহির করিয়া ফেলে। একখানা মসৃণ চাল্‌তা কাঠের তক্তার উপর আঁচড়ান-তুলা রাখিয়া লোহার একটা হুক্ দিয়া বিচি হইতে আঁশগুলি আল্‌গা করে। এই কাজ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করিতে হয়, পাছে বিচি নষ্ট হয়। তারপর একটি ছোট ধুনুনি দিয়া তুলাগুলি ধুনিয়া ফেলে। তুলা বেশ তুল্‌তুলে হইলে পরে একটা পুরু কাঠের বেলনে সেই তুলা পাট করা হয়, পরে বেলনটা সরাইয়া লইয়া দুইখানা তক্তা দিয়া তাহা চাপ দিতে হয়, তারপর সেই তুলা একটি ছোট্ট নলখাগড়ায় জড়াইয়া রাখা হয়। পরে সেই তুলা-

জড়ান নল কুঁচে-মাছের মসৃণ নরম চামড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। কাজেই বাহিরের ধূলা বালি লাগিয়া তুলা নষ্ট হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না, এবং সুতা কাটিবার সময়ও ময়লা হইতে পারে না।

ত্রিশ বৎসরের নীচে যে-সকল স্ত্রীলোকের বয়স তাহারাই সাধারণতঃ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম সুতা কাটিয়া থাকে। তাহাদের কাট্‌না যন্ত্রপাতি সবই ছোট চ্যাপ্‌টা বাক্সে রক্ষিত হয়। তাহাতে পুনি, টেকো, কাদামাটিতে প্রোথিত একটি ঝিনুক, চা-খড়ির গুঁড়ো ইত্যাদি থাকে। টেকো চালাইতে গিয়া ঘামে হাত ভিজিয়া উঠিলে চা-খড়ির গুঁড়া দিয়া আঙুলের ঘাম দূর করিয়া দেয়। টেকো গুণছুঁচ অপেক্ষা কিছু মোটা, ইহার দৈর্ঘ্য দশ ইঞ্চি

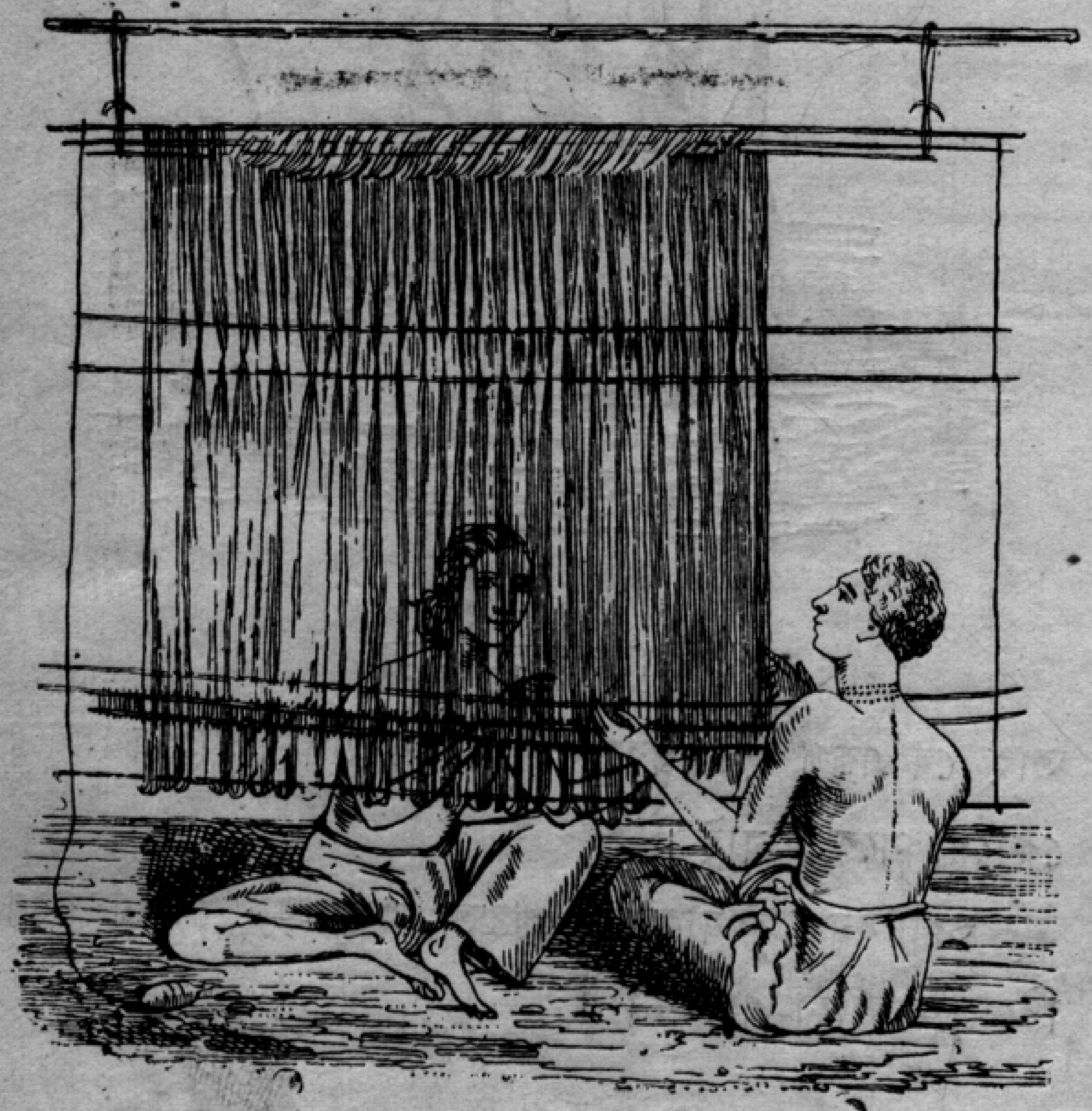

টানা গাঁথা

হইতে চৌদ্দ ইঞ্চি, এবং নীচের দিকে খানিকটা গোলাকার শুখনো মাটি লাগান থাকে, তাহাতে দুই আঙুলে টেকো ঘুরাইতে বেশ একটু ভার বোধ হয়। কাটুনি টেকো একটু আনত হইয়া ধরিয়া থাকে (১ম চিত্রে দ্রষ্টব্য) এবং টেকোর একদিক ঝিনুকের মধ্যে ও উপর দিকটা ডানহাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর চাপে ঘুরাইয়া থাকে, বাম হাতে তুলার পাঁজ হইতে সঙ্গে সঙ্গে সুতা বাহির করিয়া থাকে। খানিকটা সুতা হইলেই তাহা টেকোতে পাকাইয়া রাখে এবং বেশ খানিকটা সুতা টেকোতে জমা হইলে তাহা নলের কাঠিতে স্থানান্তরিত করে। শুষ্ক আবহাওয়ায় তুলার আঁশ হইতে খুব সরু ও লম্বা সুতা বাহির করা সম্ভব হয় না, কাজেই তাহা সূক্ষ্ম সুতা-কাটার পক্ষে বিশেষ প্রতিকূল। জলীয় হাওয়ার তাপ অন্তত ৮২ ডিগ্রী থাকিলেও এই কার্য্যের অনুকূল হয়। ঢাকার কাটুনিরা উষাকাল হইতে বেলা নয়টা দশটা পর্য্যন্ত এবং বৈকালে তিনটা চারটা হইতে সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত এই কাজ করিয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম সুতা কাটা রৌদ্র উঠিবার আগেই ভাল হয়। যদি দিনের অবস্থা এই কার্য্যের ঠিক অনুকূল না হয় তাহা হইলে একটা চ্যাপ্‌টা পাত্রে খানিকটা জল রাখিয়া তাহার মধ্যে ঝিনুকটি বসাইয়া সুতা কাটা চলে, কেন-না জল হইতে যে জলীয় বাষ্প উঠে তাহাতে কাজের সুবিধা হয়।

ঢাকার তাঁতীরা সুতা দেখিবামাত্র তার সূক্ষ্মতা ঠিক করিতে পারে। নলের মধ্যে কতটা সুতা পাকান আছে তাহা ঠিক করিবার তাহাদের কোনো তৌলদণ্ড নাই। সুতার শ্রেষ্ঠতা চোখ-চাহিয়াই ঠিক করে এবং দৈর্ঘ্য ঠিক করিতে হইলে খানিকটা খোলা জমিতে কিছু দূরে দূরে দুইটি কাঠি পুঁতিয়া তাহাতে সুতা মেলিয়া দিয়া স্থির করে। এই কার্য্যে বিশেষ সতর্কতা দরকার, সেইজন্য পাকা কাটানি কিংবা দক্ষ তাঁতী ছাড়া এ কার্য্য অপর কাহাকেও করিতে দেওয়া হয় না। সুতা মাপিতে এক হাত দুই হাত করিয়া গণনা করে এবং রতি দিয়া ওজন ঠিক করে। এক রতির ওজন প্রায় দুই গ্রেণ। পূর্ব্বকালে যখন দিল্লীর বাদশার দরবারে মসলিন পাঠানো হইত তখন সেই মসলিনের দৈর্ঘ্য সাধারণত ছিল ১৫০ হাত লম্বা ও ওজন এক রতি; কিন্তু সময় সময় দৈর্ঘ্য কমবেশী হইয়া ১৪০ হাত হইতে ১৬০ হাত পর্য্যন্ত হইত। টানায় ১৪০ হাত আর পড়েনে ১৬০ হাত সুতা আবশ্যক হইত।

১৮০০ সালে ঢাকার তাঁত হইতে যে-সকল সর্ব্বোত্তম সুতা ব্যবহৃত হইত তাহা এক রতিতে ১৪০ হাতের বেশী হইত না। কেহ কেহ বলে, ঐ সময় সোনারগাঁয়ে এক-রতি ওজনের সুতা হইতে ১৭৫ হাত পর্য্যন্ত সুতা হইতে পারিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ঢাকাতে ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর সুতা কাটা হইত। একজন তাঁতী আমার সম্মুখে ১৮৪৩ সালে একটা সুতার ফেটি মাপিয়াছিল, পরে খুব যত্নের সহিত তাহা ওজন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এক পাউণ্ড সুতায় ২৫ মাইল দীর্ঘ সুতা হয়। ঢাকাই তুলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তন্তু—যাহা হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুতা পাওয়া যায়, তাহা হইতে কলে সুতা কাটা সুবিধা-জনক নহে। পক্ষান্তরে আমেরিকার তুলার আঁশ হইতে যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট সুতা কাটা সম্ভব; হিন্দু তাঁতীদের টেকোতে সেরূপ উৎকৃষ্ট সুতা বাহির করা সম্ভব হইবে না। ১৮১১ সালে ঢাকার তাঁতীদের বিদেশী গুটি বিতরণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কাটুনিরা তাহা হইতে সুতা বাহির করিতে পারে নাই; তাহারা বলিয়াছে যে, দেশী তাঁতে এই সুতা দিয়া কাপড় বোনা অসম্ভব।

ঢাকাই সুতা mule twist অপেক্ষা ঢের নরম এবং আমার বিশ্বাস ইহা দ্বারা যে সুতা তৈরি হয় তাহা কলে-কাটা সুতা অপেক্ষা ঢের বেশী মজবুৎ। যে-সকল আঁশ জলীয় হাওয়াতে স্ফীত হয় তাহাই নাকি তাঁতীদের মতে উৎকৃষ্ট তুলা। ধোলাই করিলে যে তুলা যত কম ফাঁপিয়া উঠে তাহা তাঁতীদের মতে উৎকৃষ্ট

বলিয়া গণ্য, অন্তত তাহা হইতে যে সূক্ষ্ম সুতা কাটা যাইবে ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। তাহারা বলে, বিলাতী সুতা ধোলাই করিলে ফাঁপিয়া উঠে, পক্ষান্তরে ঢাকাই সুতা সঙ্কুচিত হয়, এই কারণে ঢাকাই কাপড় বেশী মজবুৎ হয়।

একজন কাটনি প্রতিদিন সারা সকাল বেলা টেকো কাটিলে একমাসে প্রায় আধা তোলা (৯০ গ্রেণ) সুতা কাটিতে পারে। ইহা অপেক্ষা বেশী কেহ কাটিতে পারে না, কিন্তু বর্ত্তমানে এই কাজটা অবসর সময়ে করার জন্য সারা মাসে ৪৫ গ্রেণের বেশী সূক্ষ্ম সুতা কাটা সম্ভব হয় না। কেন-না ইহা এখন একমাত্র ব্যবসায়রূপে কেহই গ্রহণ করে না। সূক্ষ্ম সুতা স্যাকরার তুলাদণ্ডে কুঁচ দিয়া মাপা হয়। এক একটি কুঁচের ওজন এক রতি। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঢাকাই সুতা প্রত্যেক তোলার (১৮০ গ্রেণ) মূল্য আট টাকা মাত্র।

কাপড় বুনিতে কোন্ কোন্ ধারা পর পর অবলম্বন করা হয় তাহাদের নাম যথাক্রমে এইঃ—তুলা পেঁজা ও সুতা কাটা; সুতা পাকান; টানাতে নলের প্রয়োগ; তাঁতের প্রান্তে টানার প্রয়োগ; বয়নতন্তু বা সুতা, যাহাতে টানা-সুতা ফাঁক করিয়া মাকু যাতায়াতের পথ খোলসা করা হয়, তাহা প্রস্তুত করা; সর্ব্বশেষ বুনন।

সুতা নাটাই করা ও নলি ভরা

তাঁতীর নিকট সুতা দিলে সে ঐ সুতা ছোট ছোট নলিতে জড়ায়, অথবা ছোট ছোট ফেটি করিয়া লয়। তারপর সেই নলিভরা বা ফেটি করা সুতা জলে ভিজাইয়া রাখে। অতঃপর ৩নং চিত্রে যেরূপ আছে সেরূপে সুতা নাটাই করা হয়। নলির ছিদ্র দিয়া একটা কাঠি ঢুকাইয়া দেওয়া হয় এবং সেই কাঠি একখণ্ড বাঁশের এক প্রান্ত চিরিয়া তাহাতে আটকাইয়া দেওয়া হয়। তাঁতী ঐ বাঁশ বাঁ-পায়ের আঙুলে আটকাইয়া ধরে এবং কাঠির উপর ঘূর্ণায়মান নলি হইতে সুতা বাহির করিয়া উহা নাটাইতে গুটাইয়া লয়। একটি নারকেলের মালার বাটীতে নাটাই ঘুরাইয়া সুতা গুটাইয়া লয়। এইরূপে সুতা ফেটি বাঁধা হইয়া গেলে বাঁশ এবং সুতা দিয়া তৈরি চরকীতে পরাইয়া দেওয়া হয়। এই চরকী একটা বাঁশের ফালি বা কঞ্চির এক প্রান্তে বসাইয়া তাহা হইতে সুতা বাহির করিয়া লওয়া হয়।

সুতা দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম সুতা যথেষ্ট পরিমাণে পড়েনের জন্য রাখা হয় এবং অবশিষ্ট অংশ টানার জন্য ব্যবহৃত হয়। টানার সুতা তিনদিন জলে ভিজাইয়া রাখা হয় এবং ঐ জল দিনে দুইবার করিয়া বদলাইয়া দিতে হয়। চতুর্থ দিনে জল হইতে উঠাইয়া ফেটিগুলি হইতে জল ঝরাইয়া চরকীর উপর লওয়া হয় এবং তাহা হইতে পুনরায় উপরের লিখিত প্রণালীতে নাটাই করা হয়। সুবিধামত আকারের ফেটি তৈয়ারী করিয়া তাহা পুনরায় জলে ভিজান হয় এবং দুইটি কাঠির মধ্যে শক্ত করিয়া পাকান হয়। তারপর উহা ঐ কাঠিতেই রৌদ্রের তাপে রাখিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর সেগুলির পাক খুলিয়া লইয়া কাঠকয়লার গুঁড়া, প্রদীপের কালী, অথবা রান্নার হাঁড়ির কালী জলের সঙ্গে মিশাইয়া তাহাতে ঐ সুতা ভিজান হয়। এই কালীমিশ্রিত জলে দুইদিন ভিজাইয়া লইয়া তারপর পরিষ্কার জলে উত্তম করিয়া ধুইয়া লইতে হয় এবং জল নিঙড়াইয়া শুখাইবার জন্য ছায়ায় ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। প্রত্যেকটি ফেটি পুনরায় নাটাই করিয়া লইয়া একরাত্রির জন্য ভিজাইয়া রাখা হয় এবং পরদিন জল হইতে তুলিয়া একখানা তক্তার উপর বিছাইয়া রাখা হয়। পরে হাত দিয়া ডলিয়া, খইয়ের মণ্ড ও অল্প পরিমাণে পরিশোধিত চূণের জল দিয়া আছড়াইয়া লইতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে বয়নকার্য্যে ব্যবহৃত মাড়-হিসাবে ভাতের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। মাড় দেওয়া সুতার ফেটিগুলিকে তারপর নাটাইয়ে গুটাইয়া লইয়া রৌদ্রতাপে দেওয়া হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া

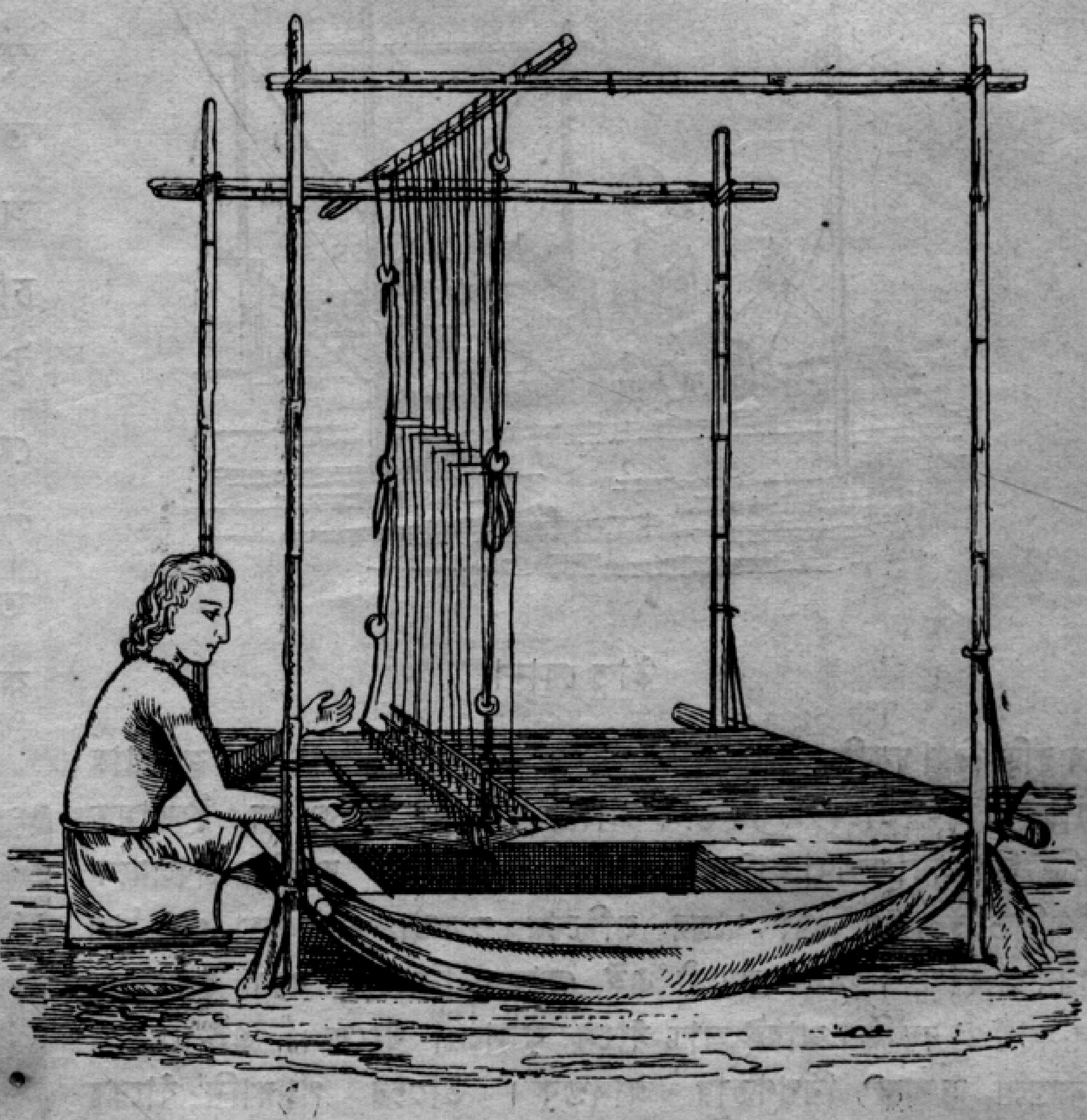

তাঁত বোনা

যাইবার জন্য নাটাইয়ের উপরেই ফেটিগুলিকে চওড়া করিয়া মেলিয়া দেওয়া হয়। পুনরায় ঐগুলিকে নাটাই করিতে হয় এবং টানা দিবার জন্য সুতা বাছিয়া লওয়া হয়। টানার সুতা তিনভাগে বিভক্ত হয়। টানার ডানদিকের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম সুতা বাছিয়া রাখা হয়। তারপর বাছিয়া যে সূক্ষ্ম সুতা পাওয়া যায় তাহা টানার বামদিকের জন্য লওয়া হয়। মোটা সুতা মাঝখানের কাজে লাগে।

পড়েনের সুতা বয়ন আরম্ভ করিবার দুইদিন আগে তৈরি করিয়া রাখা হয়। একদিনের কাজের উপযোগী সুতা চব্বিশ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখা হয়। তার পরদিন উত্তমরূপে ধুইয়া লইয়া বড় নাটাইয়ে গুটানো হয় এবং টানার সুতায় যে মাড় দেওয়া হয় ঐরূপ মাড়ই অল্পমাত্রায় উহাতে দেওয়া হয়। ছোট নাটাই হইতে বড় নাটাইয়ে গুটাইয়া এগুলিকে ছায়ায় শুকাইতে দেওয়া হয়। বস্ত্রবয়ন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পড়েনের সুতা এই প্রণালীতে রোজই তৈরি করিয়া লইতে হয়।

তাঁত ও বয়ন-প্রণালী

ভারতীয় তাঁতগুলি ভূমির সহিত সমতল করিয়া বসানো হইয়া থাকে। এই সকল তাঁত দেখিতে অনেকটা মিশরীয় তাঁতেরই অনুরূপ। তাঁতের চারিকোণে চারিটি বাঁশের খুঁটি শক্ত করিয়া মাটিতে পোঁতা হয় এবং পাশ ঘিরিয়া খুঁটির মাথায় বাঁশ বাঁধিয়া

যোগ করিয়া দেওয়া হয়। লম্বালম্বিভাবে পাশে বাঁধা বাঁশের উপর একটা আড়বাঁশ বাঁধা থাকে; তাহাতে 'দফ্‌তি' বা 'ব্যাটন' এবং 'ব-কাঠি' ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। দফতি দুইখানা চওড়া কাঠ দিয়া তৈরি। কাঠ দুইখানার ভিতর দিকে একটু খাঁজ কাটা থাকে; সেই খাঁজে শানা বসাইয়া কাঠ দুইখানাকে 'খিল' দিয়া আটকাইয়া দেওয়া হয়।

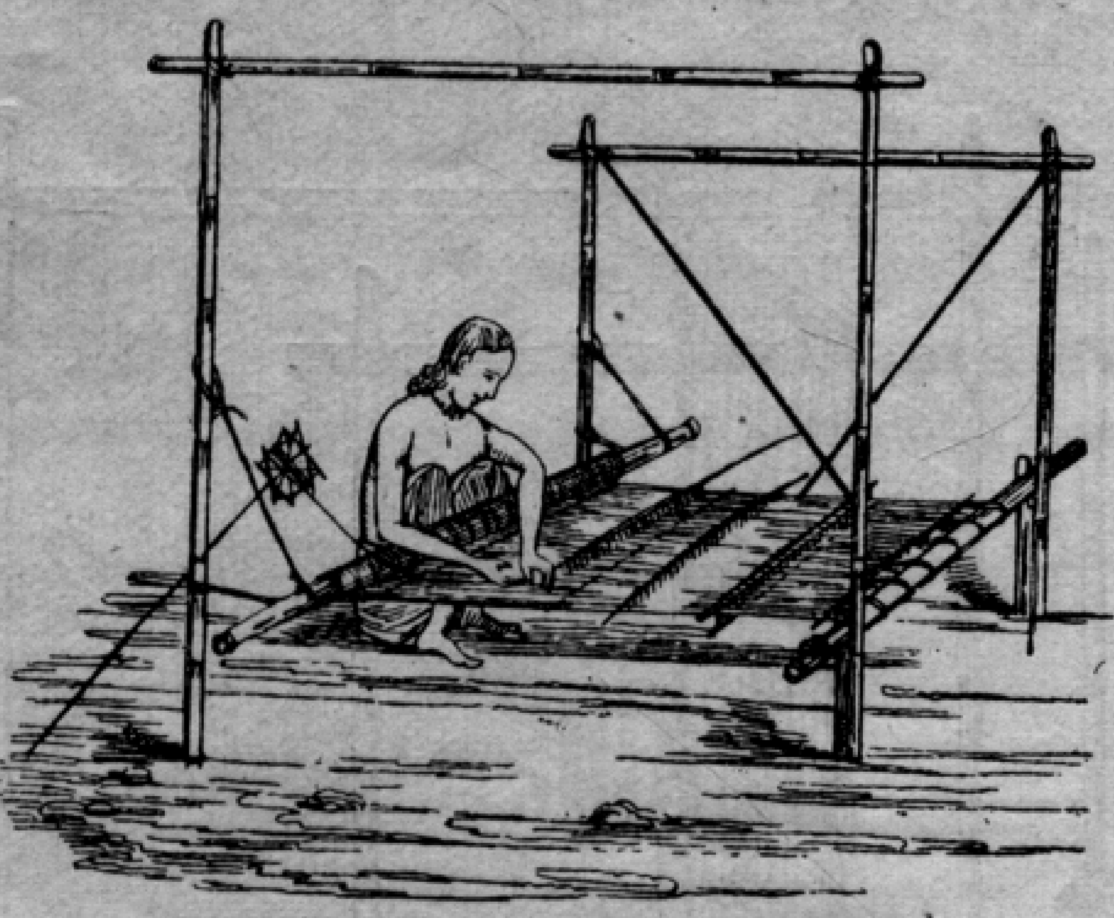

তাঁত বোনা

যে দড়ি দিয়া দফতি আড়-বাঁশে ঝুলানো থাকে তাহাতে জায়গায় জায়গায় এমনভাবে কতকগুলি আংটি বসানো থাকে যে, ইচ্ছামত দড়িটাকে লম্বা অথবা খাট করা যায়, এবং তাহাতে দফতির দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, এবং বস্ত্রের জমিনের সূক্ষ্মতা ও স্থূলতা এবং ঠাশ বুনন ও হালকা বুনন অনুযায়ী এই দোলন নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক, 'ব-কাঠিও' দফতির ন্যায়ই আড়-বাঁশে ঝুলানো থাকে। এই দোলন নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত নিপুণতার আবশ্যক। তাঁতের পা-দানি বাঁশের তৈরি। আনুমানিক দুই হাত লম্বা, পৌনে দুই হাত চওড়া এবং এক হাত গভীর গর্ত্তে এই পা-দানি ঝুলানো থাকে, এবং সেই গর্ত্তের ভিতর পা-দানিতে পা রাখিয়া তাঁতীরা তাঁত চালাইয়া থাকে। মাকুগুলি হালকা সুপারী কাঠের তৈরি (বর্ত্তমানে এগুলি কাঠ দিয়াও তৈরি হয়, কোন কোন স্থানে লোহার মাকুরও চলন আছে)। মাকুর দুই প্রান্ত বর্শার ফলকের ন্যায় চোখা এবং তাহা লোহার পাত দিয়া মোড়া থাকে। মাকুগুলি সাধারণত দশ হইতে চৌদ্দ ইঞ্চি লম্বা, তিন পোয়া ইঞ্চি চওড়া হয় এবং তার ওজন প্রায় এক ছটাক। মাকুর মাঝের খানিকটা স্থান ক্ষোদিয়া লইয়া তাহার ভিতর দিয়া একটি লোহার অত্যন্ত সরু শিক্ (শলা) বসানো থাকে, এই শলাটি আপনা হইতেই ঘুরিয়া থাকে, ইহার উপরই পড়েনের সুতার নলি গাঁথিয়া দেওয়া হয়। ফলে পড়েনের মুখে মাকুর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাওয়া-আসার সময় নলিও ঘুরিতে থাকে এবং মাকুর পেটের দিকে যে সরু ছিদ্র থাকে তাহা দিয়া পড়েনের সুতা অতি সহজেই বাহির হইয়া আসে। বুননের মুখে বস্ত্র তাঁতের উপর মেলিয়া রাখিবার জন্য ধনুকের মত বাঁশের যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

বয়নকারী গর্ত্তের ভিতর পা দুইখানি পা-দানিতে রাখিয়া গর্ত্তের মুখে বসে, যে গোলাকার কাষ্ঠখণ্ডে বোনা বস্ত্র জড়াইয়া রাখে তাহা তাহার কোলের উপর আড়ভাবে থাকে। পা-দানির পরিচালনায় ব-বাঁধা সুতার উঠা-নামায় যে জালি উঠে তাহার মধ্য দিয়া তাঁতী এক হাত হইতে অন্য হাতের ঈষৎ আন্দোলনে মাকু ছুঁড়িয়া দেয় এবং দফতির আঘাতে সুতা ঠাসিয়া দেওয়া হয়।

এই প্রকার বয়ননৈপুণ্যে হিন্দু তাঁতীরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলার অপরাপর যন্ত্রশিল্পীর ন্যায় ঢাকার তাঁতীদের দেহের গড়ন ছিপ্‌ছিপে ও কোমল। তাহাদের দৈহিক শক্তি ও উদ্দমের কিঞ্চিৎ অভাব পরিলক্ষিত হইলেও অপর পক্ষে তাহারা সূক্ষ্ম স্পর্শজ্ঞান ও ওজন সম্পর্কে সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন; শুধু তাহাই নহে, দেহপেশীর পরিচালনে তাহাদের যে অসামান্য ক্ষমতা আছে তাহার ফলে হাতের আঙুলের সঙ্গে পায়ের আঙুল ঠিক সমান তালে পরিচালিত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক অর্ম্মে ইহাদের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ইহারা যে-সকল যন্ত্রপাতির সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন করিতে পারে, ঐ সকল যন্ত্রপাতির দ্বারা ইউরোপীয় তাঁতীরা তাহাদের শক্ত ও স্থূল অঙ্গুলীর সাহায্যে মোটা চটও বয়ন করিতে কদাচিৎ সক্ষম হয়।

ঢাকাই মসলিন

বয়নকালে টানার সুতায় যাহাতে কম ঘর্ষণ লাগে, সেইজন্য মাকু, শানা ও দক্তিতে সময় সময় তেল দেওয়া দরকার। গ্রীষ্মের তাপে টানার সুতা যাহাতে শুকাইয়া ভঙ্গুর অবস্থা প্রাপ্ত না হয় সেইজন্য নলখাগড়ার আঁশে তৈরী বুরুস দিয়া মাঝে মাঝে সুতায় সরিষার তেল মাখাইয়া দিতে হয়। দশ বার ইঞ্চি কাপড় বোনা হইয়া গেলে কাপড়-গুটানি গোলাকার কাঠে তাহা জড়াইয়া রাখিবার পূর্ব্বে তাহাতে চূণের জল ছিটাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে কাপড় পোকায় নষ্ট করিতে পারে না। জলীয় হাওয়ার তাপ যখন ৮২ ডিগ্রী হয় তখন মসলিন-বয়ন সম্ভব হয়, তাহার বেশী তাপে কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। দুপুরে যখন সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ চারিদিক ঝলসাইয়া দেয় তখন বয়নের কাজ সম্ভব হয় না। এই জন্য তাঁতীরা সকালে ও বিকালে বয়নকার্য্য চালাইয়া থাকে। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র বয়নের পক্ষে বিশেষ উপযোগী সময়। অত্যন্ত গরমের দিনে বয়নকালে টানার সুতার নীচে অগভীর পাত্রে জল রাখার প্রয়োজন হয়। সেই জল হইতে জলীয় বাষ্প উঠিয়া সুতাগুলিকে আর্দ্র করিয়া রাখে এবং তাহার ফলে বয়নকালে সুতা ছিঁড়িয়া যায় না। সম্ভবত এই প্রক্রিয়াই ঢাকাই মসলিন যে কখন কখন জলের ভিতর বয়ন করা হয়, এই ভ্রান্ত ধারণা লোকের মনে জাগাইয়া দিয়াছে। বস্ত্রের সূক্ষ্মতা ও দৈর্ঘ্যের তারতম্য অনুসারে এবং শিল্পীর নিপুণতার ইতরবিশেষে বস্ত্র-বয়নে সময়েরও তারতম্য হইয়া থাকে। সাধারণ বস্ত্র বয়নে দশ হইতে পনের, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কুড়ি, তার চাইতেও উৎকৃষ্ট ত্রিশ, এবং তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট চল্লিশ হইতে পঁয়তাল্লিশ এবং উহা যদি খুব সূক্ষ্ম চারখানা বা ডুরীয়া রকমের হয় তাহা হইলে দুইজন লোকের ষাট দিন সময় লাগে। একজন বয়ন করে, অপর জন জোগান দেয়। আধখানা 'মলমলখাস' অথবা 'সরকারালী সূক্ষ্ম বস্ত্র—যাহার মূল্য ষাট হইতে আশী টাকা পর্য্যন্ত—বয়ন করিতে অন্যূন পাঁচ ছয় মাস লাগে। কিন্তু দুই টাকা মূল্যের পুরা একখানা 'নারায়ণপুর জাহাজী মসলিন,' বয়ন করা আট দিনেই সম্ভব।

উপরিউক্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, এদেশের ছোট আঁশের তুলায়, অতি সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে এদেশের শিল্পী তাহার স্বভাবজাত কৌশলে জগতে অতুলনীয় বস্ত্র উৎপাদন করিত এবং ইহাও মনে হয় যে, পূর্ব্বের মত আদর পাইলে হয়ত কিছুকালের মধ্যে এই লুপ্তশিল্পের উদ্ধার সম্ভবপর হইতে পারে।

রঙ্গিণী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

—তাঁর মত শান্ত লোক পৃথিবীতে অন্য আর একজন ছিল কি না সন্দেহ!

—কার কথা বল্‌চেন?

—সে পরে বলব, ব'লে হেমপ্রভা একটু রহস্যের হাসি হাস্‌লেন।

এই কথায় আমাদের মন যেন সেদিকে একদম ঝুঁকে পড়ল।

উনি যখন গল্প বলেন, তখন একটি কথাও বানিয়ে বলেন না। উনি বলেন এ জগতে সত্য এত বিস্তৃত এবং বহুল, এত তার বৈচিত্র্য যে, সত্যের অন্বেষণ করলেই মানুষের যথেষ্ট হয়; কল্পনার কোনো প্রয়োজন ত দেখিনে।

এই কথা শুনে রেবা প্রায় ক্ষেপে উঠ্‌ত, সে বল্‌ত, যান না উনি, গিয়ে বলুন ত একবার কবির সাম্‌নে, ওই কথা, বোলপুরে? মুখের মত জবাব শুনে ফিরে আসতে হবে! নিশ্চয় বলে দিচ্চি!

রেবা কবিতা লিখ্‌ত; আর এমন ছবিখানির মত সেজে থাক্‌তো, দেখলে মনে হয় পটে-আঁকা সরস্বতী ঠাকুরটি! কিন্তু রেবার বয়স ছিল কম; সবে এসে কলেজে ঢুকেচে।

আর হেমপ্রভা! বাবা! দুটো ফার্ষ্ট ক্লাশ এম্‌-এ! আর একটা দিলেই হয়!

কিন্তু সাধ্য কি তাঁকে কেউ দিদি বলে! তিনি বলেন, দাদা, দিদি, মাসী, পিসী,—যে দাদা, যে দিদি তাদেরই বল্‌তে হয়; পাতিয়ে দাদা-দিদি বাড়ালে কেবল

নিজের দুঃখকে বাড়িয়ে তুল্‌তে হয়। কিসের দিদি আমি তোমাদের? আমি সকলের কাছেই হেমপ্রভা, খবরদার বলচি - দিদি বলবে না।

এ ধমকের মধ্যে রহস্যই বেশী, তবুও আমাদের কেমন ভয় ক'রে উঠ্‌ত।

হেমপ্রভার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা ধূপছায়া কাপড়ের মত ছিল। সবটাই বন্ধুত্ব আর প্রীতি, কিন্তু সেই নীলের আভার মধ্যে যেন কোথা দিয়ে লাল চম্‌কে যায়, কোথায় যেন একটু ভয়!

হেমপ্রভা বল্‌লেন, এই শান্ত মানুষটি কিন্তু একতিলের জন্যে শান্তি পেতেন না। তাঁর অপরাধ ছিল যে, তিনি একজন ডাক্তার ছিলেন। অম্বুডাক্তারের নাম করতে লোকের মুখ থেকে যেন নাল গড়িয়ে পড়ত। সাক্ষাৎ শিব। যাকে মনে করবেন যে বাঁচাব, তাকে যমরাজা আর মিছে টানাটানি করত না।

এ কথা সত্যি?

হেমপ্রভা হাসেন, বলেন, তাঁকে সেবা করার সৌভাগ্য আমার কিছুদিন হয়েছিল, তিনি যখন গিয়ে কাশীতে ছিলেন,—তেমন মানুষ আর জীবনে দেখ্‌ব বলে মনে হয় না।

হেমপ্রভার গলা হঠাৎ যেন ভারী হ'য়ে গেল। চোখ দিয়ে জল ফেলার দুর্ব্বলতা তাঁর বোধ হয় ছিল না।

অম্বুডাক্তার তখন কাশীতে। বড়োদার রাজার ছেলের অসুখ। তাঁকে ধরে টানাটানি। এদিকে রাজবাড়ীতে দেশ-বিদেশের ডাক্তারদের গাঁদি লেগে গেছে! কেউ স্যর, কেউ এম-ডি। কিন্তু ছেলের জর এক পয়েণ্টও নামে না! একশো-পাঁচে উঠে জর যেন বসে আছে পাথরের মত!

শেষকালে যেতে হ'ল অম্বুডাক্তারকে। গাইকোয়াড় নিজে এলেন।

ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, সব ওষুধ বন্ধ করে দিতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টা ওষুধ বন্ধের পর আমি একটা শিরুয়া দেব, তাতেই জর ছাড়বে।

সায়েব ডাক্তার তর্জ্জন করে বল্‌লেন, আর যদি না ছাড়ে? এ জীবনের জন্য কে দায়ী হবে?

অম্বুডাক্তার বল্‌লেন, সে দায়িত্ব কি এখন আপনার হাতে আছে? যদি তাই থাকে ত আমি হাত দিতে চাইনে।...ডাক্তার সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করে, তার বেশী সে কি করতে পারে?

কথা শুনে সায়েবের চোখ-মুখ রাঙা হ'য়ে গেল। দেশী লোকের এতবড় স্পর্দ্ধা!

অম্বুডাক্তার উঠে ধীরে ধীরে নিজের গাড়িখানিতে বসলেন।

সমস্ত কাশীময় একটা ঢি-ঢি পড়ে গেল। অম্বু-ডাক্তারকে অপমান! এ অপরাধ বিশ্বেশ্বর সইবেন না।

বেণীমাধব থেকে কেদারনাথ পর্য্যন্ত সমস্বরে সবাই যেন প্রতিবাদ করতে লাগ্‌ল। দশাশ্বমেধের চাতালের উপর সেদিন হাতাহাতি হ'য়ে গেল।

কিন্তু যাদের অম্বুডাক্তারকে প্রতি মুহূর্ত্তে দেখার সুবিধা ছিল, তারা বুঝলে যে, এই ঘটনায় তিনি একটুও বিচলিত হননি। ডাক্তারের চিক্কণ, মসৃণ মনটির উপর একটি আঁচড়ও পড়েনি। লোকে বল্‌লে বলতেন, উঃ ওদের দায়িত্বজ্ঞান? নিশ্চয়, আমাদের চেয়ে সহস্র গুণ বেশী ঠিকই বলেছেন ডাক্তার মর্গান্‌।

দুদিন কেটে গেল। তিন দিনের দিন গাইকোয়াড় নিজে ডাক্তার মর্গানকে সঙ্গে করে এসে উপস্থিত, সেই ছোট্ট বাড়িটিতে! অম্বুডাক্তার তখন গেছেন গঙ্গাস্নান করতে।

নামাবলী গায়ে, খালি পায়ে তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন ডাক্তার মর্গানের আর বিস্ময়ের শেষ রইল না। তিনি হেসে রাজাকে বল্‌লেন, এ কুসংস্কার শুধু ভারতবর্ষেই সম্ভব, অন্য দেশ হ'লে, এই লোকটাকে কখনও কেউ আমল দিত না।

গাইকোয়াড় বললেন, ডাক্তার, তোমার বোধ হয় অনধিকারচর্চ্চা হচ্চে, আমি বাইবেলের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্চি তোমাকে, জজ নট্‌—মানুষকে এমন ক'রে অবিচার করো না। তুমি ভারতবর্ষের কিছুই জান না, তার ধর্ম্ম-কর্ম্মের প্রতি তোমার পরিহাস, তোমার নিষ্ঠুর কটাক্ষ আমাদের বড় আঘাত করে।

ডাক্তার মর্গান উত্তরে বললেন, কিন্তু হীন জাতকে

তাদের ত্রুটি দেখিয়ে দেওয়া আমি অন্যতম কর্ত্তব্য মনে করি।

কোনো কথা না ব'লে, গায়কোয়াড় গাড়ি থেকে নেমে চালককে বললেন, তুমি সায়েবকে পৌঁছে দাও। তারপর আমাকে নিয়ে যেও।

শুনেছি সেইদিনই মর্গান একটা প্রকাণ্ড টাকার থলে ভর্ত্তি করে বিদায় নিয়েছিলেন।

অম্বু ডাক্তার গিয়ে পরীক্ষা ক'রে সেই একই কথা বললেন, চব্বিশ ঘণ্টা ওষুধ বন্ধ রাখতে হবে, তারপর যা-হয় আমি করতে পারি।

—কিন্তু ডাক্তারবাবু, আপনার এই কাজের যুক্তিটা কি, তা কি আমরা জান্‌তে পারিনে।

অম্বু ডাক্তার হেসে বললেন, একশো বার। যুক্তি খুব সোজা, মহারাজ, আপনার ছেলের জ্বর এখন অতিরিক্ত ওষুধ খেয়ে হয়েছে। ওষুধ বন্ধ করলে তবে ওঁর আসল অসুখটা বুঝতে পারা যাবে। সেটা বোঝার অবসর আমাকে দিতে হবে আপনাদের।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জ্বর ছাড়িয়ে দিয়ে অম্বু ডাক্তার বাড়ী ফিরে এলেন।

তখন গাইকোয়াড় তাঁকে কত টাকাকড়ি দিয়ে নিজের দেশে নিয়ে যেতে চাইলেন।

অম্বু ডাক্তারের সেই একই উত্তর, আমি কাশী ছেড়ে কোথাও যাব না, মহারাজ!

২

হেমপ্রভা হেসে বললেন, কিন্তু যারা অম্বু ডাক্তারকে এইটুকু জেনেছে, তারা রত্ন ছেড়ে তীরের উপলখণ্ডকে রত্ন বলে ভুল করেছে। এটি ওঁর চরিত্রের বাইরের খোলার মত। ওঁর অন্তর ছিল কত বড়, কত সুন্দর, কত মহান্—তা ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত।

হেমপ্রভা চুপ করলেন। কিন্তু তাঁর দু'চোখ দিয়ে একটা আনন্দের আলো বার হ'তে লাগলো; মনে হ'ল তিনি চোখে স্বর্গের ছবি দেখছেন যেন।

অধীর হ'য়ে আমরা বলি, না তারপর বলুন, থামবেন না।

হঠাৎ তাঁর যেন একটা চট্‌কা ভাঙল, বল্‌লেন, বলব বই কি, তাঁর কথা বললেও হৃদয় মন শুদ্ধ হয়।

হেমপ্রভা আবার বলতে সুরু করলেন—অম্বু ডাক্তারের মনের যেন দুটো পরিষ্কার ভাগ ছিল; যেমন দিন রাত, যেমন মাসের শুক্ল পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষ।

চিন্তায় তাঁর এতটুকু গতানুগতিকতা ছিল না। প্রত্যেকটি কথা নিজে নূতন করে ভেবে দেখতেন। সকলের চিন্তাকে, সকলের মতামতকে, যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিতেন। তিনি বলতেন, অন্যের মত আমাদের চলার পথ রোধ করে না, চলার পথে তা আলো দেয়, আমাদের চলার সাহায্য করে। নিজের মতকে অন্যের উপর চালাবার অধৈর্য্য যেন তাঁর ছিলই না। আবার পরের মতকে ঘাড়ে করে অন্ধের মত ছুটতে গিয়ে হোঁচট খাওয়াকেও তিনি নির্বুদ্ধিতাই মনে করতেন।

সবচেয়ে বড় জিনিষ তাঁর ছিল, অপক্ষপাত সুবিবেচনা আর মানুষের উপর সুন্দর বিচারটুকু। সে যে কত সুন্দর সংযত শান্ত, তা বর্ণনা করা যায় না।

এমন একজন লোকের জীবনের পথ খুব সহজ ছিল, এ অনুমান করে নেওয়া স্বাভাবিক হতে পারে। কিন্তু তা মোটেই সত্য নয়। জীবনে তাঁকে নিত্য-নিত্য কত যে পরীক্ষা দিতে হয়েছে, তার ঠিক ঠিকানা নেই।

চল্লিশের আগেই তাঁর পত্নীর বিয়োগ ঘটে। দুটি ছেলে নিয়ে অম্বু ডাক্তার সংসারে ভাস্‌লেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই বল্‌লে, আর একটা বিয়ে কর। কিন্তু তিনি স্নিগ্ধমধুর হেসে বলতেন, তা কি হয়?

কেন হয় না? সবাই ত করছে?

অম্বু ডাক্তার কথা কইতেন না, চুপ ক'রে মৃদু-মধুর হাস্‌তেন।

অযৌক্তিক কথার নিরুত্তরে যে কত গভীর, অমোঘ উত্তর দেওয়া চলে, তা তাঁর কাছ থেকেই শিখ্‌তে হয়।

কিন্তু দুই ছেলেকে ত মানুষ করে তুলতে হবে? তিনি ধীরে ধীরে ডাক্তারীর সময়টা এই কাজে দিতে লাগ্‌লেন। কিন্তু তাতেও বিপদ ঘটল, ছোট ছেলেটির মার দুধের অভাবে লিভার খারাপ হ'ল। তাকে নিয়ে তিনি বিষম সঙ্কটে পড়ে গেলেন।

এ সংসারের মজা এই যে, বিপদের পিছনে পিছনে তার সমাধানও আসতে থাকে। সে এক অভাবনীয় ব্যাপার। দুশ্চিন্তায় অম্বু ডাক্তারের মন যখন প্রায় বিবশ তখন একখানি চিঠি পেলেন তিনি। চিঠিখানি তাঁর এক দূরসম্পর্কের শালা লিখেছিলেন। অম্বু ডাক্তারের পঠদ্দশায় এঁর সঙ্গে ভাল পরিচয়ই ছিল। নামটি তার মনোমোহন।

মনোমোহনের হয়েছিল কঠিন অসুখ। তাই চাক্‌রি করা সম্ভব নয়, চিকিৎসা হওয়াও শক্ত। অম্বু ডাক্তার কিছু সাহায্য করেন।

চিঠির উত্তরে অম্বু ডাক্তার তাঁকে অবিলম্বে আস্‌তে লিখে টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

আসার কিছুদিন পরেই মনোমোহন মারা গেলেন। তিনি সপরিবারে এসেছিলেন; স্ত্রী এবং একটি মাস-ছয়েকের ছেলে। স্ত্রী বিমলা এমনি করে এসে অম্বু ডাক্তারের আশ্রয় পেলেন। তিনিই মোহিতকে মানুষ করতে লাগ্‌লেন। মায়ের অভাবে মোহিতের মাতৃদুগ্ধ জুটল। স্ত্রীর অভাবে অম্বু ডাক্তারের সংসারে গৃহিণী এলেন।

হরণ-পূরণের মালিকের এ কি অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!

কিন্তু আত্মীয় প্রতিবেশীর সঙ্গে এই নিয়ে লেগে গেল গোল।

সত্যের সরল সংকীর্ণ পথে চলা শক্ত বটে। কিন্তু তাই তার কেবল মাত্র বাধা নয়। বাধা বৃহত্তর করে রেখেছে, চতুর্দ্দিকের মানুষের অযথা নিষ্ঠুরতা, অকারণ কপটতা, আর হিংস্র পরশ্রীকাতরতা।

তবুও অম্বু ডাক্তারের ছিল টাকা, ছিল ডাক্তারির কাজে গভীর পারদর্শিতা। তাই তিনি সংসারের চাপে মারা না পড়ে, পিছ্‌লে বেরিয়ে গেলেন সেই চক্র থেকে।

বিমলাকে নিয়ে নিজের পৈতৃক সম্পত্তির খুদ-কুঁড়োটি পর্য্যন্ত বিক্রি ক'রে দিয়ে অম্বু ডাক্তার বেরিয়ে দাঁড়ালেন সংসারের অনন্ত পথে।

একদিন এসে বিশ্বেশ্বরের চরণের তলায় আশ্রয় পেয়েছিলেন। এই তাঁর কাশী আসার ইতিহাস।

বিমলা বিধবা হয়ে অন্যের ঘরে বাস করতে বাধ্য হলেন। আর মোহিতকে বাঁচাবার জন্য অম্বু ডাক্তারের বিমলাকে ঘরে স্থান দেওয়া ছাড়া গতি ছিল না। এই সম্বন্ধের মধ্যে যারা কালসর্প দেখে শিউরে উঠ্‌ল, তাদের তুষ্ট করলে দুদিকের ক্ষতি। বহু তর্ক-বিতর্ক করে শেষে একদিন অম্বু ডাক্তার বিমলাকে ডাকলেন।

তিনি বিমলাকে বল্‌লেন, বিমলা, তুমি ঘরে থাক, বাইরের খবর জানার সুবিধা হয় না। কিন্তু তোমার আমার ঘরে বাস করা নিয়ে হয়ত অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সইতে হবে; হয়ত এমন একদিন আস্‌বে তোমার ছেলে আমার ছেলেরাও সেদিন এটিকে ভাল চোখে দেখে উঠ্‌তে পারবে না। ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভেবে চিন্তে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করতে চাই, তাই তোমাকে ডেকেছি—

বিমলা কেঁদে অম্বু ডাক্তারের পায়ে পড়ে বল্‌লে,—পৃথিবীতে আর আমার আপনার বলার কেউ নেই; যদি আপনি আমায় আশ্রয় না দেন ত কেমন ক'রে আমার ছেলেটি বাঁচ্‌বে?

অনেক ভেবে অম্বু ডাক্তার বল্‌লেন,—কিন্তু বিমলা এই জন্যে অনেক নিন্দা গ্লানি আমাদের দুজনকেই হয়ত সইতে হবে, তার জন্য কি তুমি প্রস্তুত?

বিমলা ছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, সে আর কান্নাকাটি না ক'রে বল্‌লে,—ছেলের প্রাণ বড়, না আমার নাম বড়? ঈশ্বর রইলেন সাম্‌নে, আমি কোনো নিন্দা গঞ্জনাকে ভয় করব না।

তার কয়েকদিন পরেই নিজের বিষয়সম্পত্তি বেচে দিয়ে—শ্রীরামপুর থেকে রাজপুতানায় একটা চাকরি নিয়ে তিনি চ'লে যান। অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে শেষজীবনে এলেন কাশীতে।

৩

তখন ললিত, মোহিত আর বঙ্কু বেশ বড় হয়েছে। অম্বু ডাক্তার কাশীতে এসে বাঙ্গালী পল্লীতে রইলেন না। অল্প বাড়ীভাড়া দিয়ে, বিদেশীদের সঙ্গে বনিয়ে চলাই তিনি সহজ এবং বুদ্ধির কাজ মনে করতেন। তাই করে

গেছেনও শেষ পর্য্যন্ত। পরে একদিন অনেকেই ব্যাকুল হয়েছিল ঘনিষ্ঠতা করার জন্যে। কিন্তু তিনি আর ফিরেও চাইলেন না। তাঁর কাছে জানা, অজানা, দূর, নিকট, সবই যেন এক হয়ে গিয়েছিল।

সেই সময় পাশের বাড়ীর একটি মেয়ে আসত পড়তে, শেলাই শিখ্‌তে, বিমলার কাছে। পায়ে মল ঝুম্‌ ঝুম্‌ করছে, কানে মাকড়ি! তার নাম ছিল একটা মস্ত বড় ভজকট, সাধ্যি কি বাঙ্গালীর জিবে তার উচ্চারণ হয়। তাই বিমলা তার নাম দিয়েছিলেন—রঙ্গিণী।

রঙ্গিণী পাঁচ বছর বয়সে বিধবা হয়। কিন্তু ওদের সমাজে বিধবা বিয়ে মানা ছিল না।

রঙ্গিণীরও মা ছিল না, ছিল তারও এক বহু দূর সম্পর্কের মাসী। তার বাপ যে কোথায়, বেঁচে, কি মরে,—তাই কেউ জান্‌ত না। বিমলার স্নেহে রঙ্গিণী ক্রমেই যেন এ বাড়ীর মেয়ে হয়ে গেল, সে খাসা বাংলা বলতে লাগ্‌ল; কানের মাকড়ি খুলে বাঙ্গালীর কাপড় পরে, সে ঠিক বাঙ্গালী ঘরের নন্দিনীটি হয়ে পড়ল।

বিমলা শেষ পর্য্যন্ত রঙ্গিণীকে স্কুলে দিয়ে তাকে মানুষ ক'রে তোলার পথে নিয়ে চলেছিলেন। লোকে যেন ভুলেই গেল যে, রঙ্গিণী অম্বু ডাক্তারের বাড়ীর মেয়ে নয়। ডাক্তারবাবুর ক্রমে এমন প্রতিপত্তি হ'য়ে গেল যে, তাঁকে খুসী করার জন্যে রঙ্গিণীর মাসী রঙ্গিণীকে ফিরে চাইতেও সাহস করলে না।

এমনি ক'রেই দিন কেটে যেতে লাগ্‌ল।

দুই ভাই ললিত আর মোহিতের পার্থক্যটা প্রায় আকাশ-পাতাল দাঁড়াল। ললিত শান্তশিষ্ট একেবারে পুরোপুরি সাধুসজ্জন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে টপাটপ্‌ পাশ করে ব্যারিষ্টার হ'তে বিলেত চলে গেল। সে রঙ্গিণীকে ভালবাসত। যাবার সময় অনেক আদর করে বলে গেল, রঙ্গিণী ভাই, তুই ভাল করে থাকিস্‌, লেখা-পড়া করিস্‌। আমার যখন টাকা হবে তখন তোকে সঙ্গে করে বিলেত দেখিয়ে আন্‌ব।

রঙ্গিণী কেঁদে ফেলে বললে, কিন্তু ললিত দাদা, তুমি যদি আস্‌তে দেরী কর ত ভারি রাগ করব আমি, অন্য কোথাও চলে যাব।

ললিত তার গালে আদর করে চড় মেরে বললে, ছিঃ রঙ্গু, অমন কথা কি বল্‌তে আছে, পাগলী?

পাগলী সেদিন কেঁদেই ফেলেছিল। তার বুকের যে কত বড় ব্যথা, সে ললিত বুঝতে পারেনি। ললিত জান্‌ত যে রঙ্গিণী তাকে ভালবেসেছিল। তাকে সে সম্পূর্ণ নিজের মনে করত।

তার কারণও ছিল। বিমলা মাঝে মাঝে যদি মনে করিয়ে দিতেন যে, রঙ্গিণী পরের ঘরের মেয়ে ত সে পা ছড়িয়ে ব'সে কাঁদত,—বিনিয়ে বিনিয়ে বল্‌ত, আমি অন্য কোনো ঘরে যাব না।

তখন অম্বু ডাক্তার এসে তাকে আদর করে বলতেন, আচ্ছা তুই যাস্‌নি কোথাও, ললিতের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব।

বিমলা বলতেন, তা কি হয়? ও যে……। সে কথা চাপা দিয়ে অম্বু ডাক্তার বলতেন, খুব হয়, সব হয়, মানুষ মনে করলে কি না হয়?

এসব কথার গভীর অর্থ ছিল। তলায় তলায় ললিত আর রঙ্গিণীর প্রাণে প্রেমের ফাঁস জড়িয়ে দিত।

কিন্তু মোহিত হল একটা জানোয়ার। এ রকম বদ্‌রাগী মানুষ পৃথিবীতে কম এসেছে। লেখাপড়ায় ফোর্থ ক্লাসেই গোঁফ উঠলো। আর ইস্কুলে যেতে লজ্জা হ'ত।

তাই সে তারপর জীবনের পাঠ নেবার জন্যে পৃথিবীর এমন কোনো জায়গা বাদ রাখলে না যে, পরে কোনদিন আক্ষেপ করতে হয়।

কিন্তু এসব কাপতেনি করতে হ'লে টাকার দরকার ত? সেই বা আস্‌ছে কোত্থেকে? অবশেষে সে বিমলাকে ধরলে, বাবাকে বলে আমাকে একটা ওষুধের দোকান ক'রে দাও, মাসী!

বিমলা বললে, এ সব কথার মধ্যে, আমি বাইরের মানুষ, আমার থাকা উচিত নয়, মোহিত।

মোহিত রাগে জ্ঞানহারা হ'য়ে বললে, জানি, জানি তোমার সব বাইরের মানুষী, লোকে কি বলে শুনে

এসো গে না। একচোকো, ললিত, ললিত! ললিত বিলেত থেকে এসে ওঁর ছাতা দিয়ে মাথা রাখবে…… আর আমি এলুম ভেসে……

বিমলা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে অন্য ঘরে চলে গেলেন।

একথা অম্বু ডাক্তারের কানে উঠলে কি হ'ত বলা শক্ত, কিন্তু বিমলা প্রাণপণে মোহিতের সকল দোষ তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতেন।

একটি ছোট ওষুধের দোকান খোলা হ'ল বটে; কিন্তু সে মোহিতের নামে নয়, বঙ্কুর।

বিমলার শত আপত্তি অম্বু ডাক্তার শুন্‌লেন না, বললেন, বঙ্কু শান্তশিষ্ট ছেলেটি, ওর ধীর বুদ্ধি, ও পার্‌বে কম্‌পাউণ্ডারি করতে, দোকান চালাতে। মোহিতের ও কর্ম্ম নয়।

মোহিত খুব ভাল ক'রেই জান্‌ত যে বিমলার কোনো পরামর্শই ছিল না এতে। তবুও সে রাগে অধীর হয়ে এসে বললে, কি? নিজের ছেলের জন্যে ডিস্‌পেনসারি খুলিয়েচ ত—মালিনী মাসী।

বিমলার দু'চোখ জলে ভরে গেল।

—ছিঃ বাবা মোহিত, আমার সঙ্গে কি অমন ক'রে কথা কইতে আছে? তোর সঙ্গে বঙ্কুর তুলনা হয়, বঙ্কু তোর পায়ের কড়ে আঙুলেরও সমান নয়। আমার দুধ খেয়ে যে মানুষ তুই বাবা, আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে হয় না।

মোহিত বললে, ও সবে মোহিত ভোলে না, বলে দিচ্ছি। আমার এখ্‌খুনি দশ টাকার দরকার, দিতে যদি পারত—ভাল। নইলে আজ রাতে বঙ্কুকে মেরে তার সিন্দুক ভেঙে—মোহিত লম্বা দেবে।

বাক্স-পেঁটরা খুঁজে পেতে বিমলা দশটি টাকা বার ক'রে দিলেন।

কিন্তু একথা অম্বু ডাক্তারকে বলা তাঁর সাধ্যে হ'ল না।

রঙ্গিণী রাগে ফুঁসতে লাগল।

৪

মোহিতের নজর রঙ্গিণীর উপরেও ছিল। যে অন্যায় করে সে জানে যে, অসত্য আচরণ অন্যায়; সে জানে, গুরুজনকে অপমান ক'রে কটুবাক্য বলাও অন্যায়। হয়ত কোন সময়ে এই সবের জন্য মোহিতের মনে অনুতাপও দেখা দিত। কিন্তু সে একটা সাময়িক ব্যাপারমাত্র। তালপাতায় আগুন যেমন দপ্‌ ক'রে জলে, মোহিতের মনেও রাগ, লোভ, লালসা তেমনি সহসা জলে উঠলে, তাকে সংযত করার শক্তি তার ছিল না।

ভালবাসা দিয়ে রঙ্গিণীর মন জয় করার কাজ বহু ধৈর্য্য, বহু সংযমের কথা। সে পথে মোহিত যায় নি মোহিত সরল মেয়েটিকে ভুলিয়ে পথে বার করবার মতলব মনে মনে আঁটছিল। কিন্তু তাতে টাকার দরকার। সেই টাকা তার হাতে না আসাতেই তার মারমূর্ত্তি প্রকাশ পেত।

কিন্তু সে সুযোগ একদিন মোহিতের কপালগুণে ঘটে গেল। সেদিন বিমলা গিয়েছিলেন এক জমিদারের বাড়ীতে তাঁদের মেয়েদের সেলাই শেখাতে। অম্বু ডাক্তার গিয়েছিলেন একটা দূরের 'কলে'। তাড়াতাড়িতে লোহার সিন্দুকের চাবিটা টেবিলের উপর পড়েছিল।

মোহিত কি করতে বাড়ী এসে এই সুবর্ণ সুযোগটিকে বৃথা বয়ে যেতে দিলে না। সিন্দুকে যা ছিল সব আত্মসাৎ ক'রে এসে রঙ্গিণীকে বললে, দেখ্‌, আজ আমি সার্‌কাস দেখতে যাচ্ছি, চারটে থেকে ছটার মধ্যে, তুই যাবি দেখতে? প্রকাণ্ড দুটা সিঙ্গী এনেছে—তাদের ভীষণ লড়াই হবে। ওদিক দিয়ে মাসীকে ওরা নিয়ে যাবে, তুই যাবি?

রঙ্গিণীর দোষ ছিল যে, সে সব তাতেই নেচে উঠত। আর পৃথিবীতে কোনো মানুষকেই অবিশ্বাস করত না। সে রাজি হ'য়ে বেরিয়ে পড়ল।

পথে যেতে যেতে মোহিত বললে,—বড় খিদে পাচ্ছে, কি বলিস্‌, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্‌, এখনও অনেক দেরি। গাড়ি থেকে নেমে অনেক খাবার কিনে নিয়ে এসে রঙ্গিণীর হাতে দিয়ে বললে, খা, আর এই পান রাখ।

রঙ্গিণী খেতে লাগল।

সে খাবারে ছিল সিদ্ধি মেশান। কিছুক্ষণের মধ্যে রঙ্গিণীর বোধ-বিবেচনা চলে গেল। সে বললে,— মোহিত-দা, কত দূর যাব?

অনেক দূর রঙ্গিণী. সে অ-নে-ক দূর। বল্ ত কোথায় ?

—জানি নি, ব'লে রঙ্গিণী হাসে।

—বল্ না ?

—ক'ল্‌কাতায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে সার্কাস দেখাতে ?

ছুদিন পর্য্যন্ত রঙ্গিণীর ঠিক জ্ঞান হয় নি।

জ্ঞান হ'য়ে সে দেখ্‌লে যে, খাঁচার পাখীর মত বন্দিনী হ'য়ে সে আছে। মোহিত যায় আসে, তাকে প্রবোধ দেয়, কিচ্ছু তোর ভয় নেই, তোকে আমি বিয়ে ক'রে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

রঙ্গিণী কাঁদে, বলে,—তোমাকে কেন বিয়ে করতে যাব আমি ?

মোহিত নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলে, তুই না করিস্, তোর ঘাড় করবে। দেখ্‌বি শেষ পর্য্যন্ত। রাগ করতে করতে মোহিত চলে যায়। কল্পনায় কাজটা যত সহজ মনে হয়েছিল, বাস্তবিক কিন্তু তত সহজ হল না।

একজন বুড়ীও আস্‌ত মধ্যে মধ্যে রঙ্গিণীকে বোঝাতে। সে বল্‌ত কেন রাজি হচ্ছিস্ না মা ? মোহিতবাবুর মত পাত্তর কে কোথায় পায় ? হাতে অগাধ টাকা, তোকে রাজরাণী করে রাখবে।

রঙ্গিণী কথার উত্তর দিত না, কেঁদে কেঁদে তার চোখ ছুটো ভাটার মত হয়ে গিয়েছিল।

একদিন মোহিত এল রাতে। মুখ থেকে বিশ্রী একটা কিসের গন্ধ বেরুচ্ছে। চোখ ছুটো লাল টকটকে। জিব যেন এড়িয়ে গেছে। এসে বললে, আজ একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফিরব, নইলে এই দেখ,বলে সে একটা প্রকাণ্ড ছোরা বার করে বললে, এই দিয়ে তোকে দুখানা করে কেটে তারপর ঝুলব গিয়ে ফাঁসি কাঠে।

রঙ্গিণী ঠক ঠক ক'রে কেঁপে বললে, তোমার পায়ে পড়ি মোহিত দাদা।

—দাদা ! নেকি, খবরদার দাদা-টাদা নই তোর, বল আমার বিয়ে করবি কি না !

রঙ্গিণী বললে—করব যদি তুমি কাশীতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারবাবুর মত করতে পার।

মোহিত বললে, দেখ, এর নড়চড় হবে না ?

—না।

—তিন সত্যি কর্।

—তিন সত্যি করচি !

মোহিত সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সে গভীর রাতেও খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে পাখী উড়ল !

রঙ্গিণীর ভয়-ডর কোথায় উড়ে গেল ! খোলা পথের মুক্ত বাতাসে এসে, তার জীবনের আশা হল। এ পৃথিবীতে সবাই মোহিতের মত দুর্বৃত্ত নয়। সে প্রাণপণে এগিয়ে চল্‌ল, দূরে, দূরে, মোহিতের কাছ থেকে যত দূরে পালিয়ে যাওয়া যায়।

সে রাতে ক'লকাতার পথে আলো ঝলমল করে, লোক ছুটো-একটা, হয় মাতাল, নয়ত তারি মতন আর কেউ। মাতাল দেখে সে চিন্‌তে পারলে, তার চলায়, পথের একদিক থেকে আর একদিকে চলেছে, টল্‌তে টল্‌তে। সে থম্‌কে দাঁড়ায়, কাজ নেই ওর আগে গিয়ে। রঙ্গিণী অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বুদ্ধিতে অনেকখানি অসম্ভব রকম বেড়ে উঠেছিল।

হঠাৎ পিছনে একটা চীৎকার শুনে সে চম্‌কে উঠ্‌ল। একটা গলির আড়ালের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে সে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, কারা হট্টগোল ক'রে চলেছে।

কাছে এসে লোকগুলো আবার চেঁচালে, বল হরি, হরি বোল্ ! সেই নিস্তব্ধ পথের দুদিকের বাড়ীর দরজা-জান্‌লাগুলো যেন ঝন্‌ঝনিয়ে বেজে উঠ্‌ল।

একজন বল্‌লে,—ওরে দাঁড়া, কাঁধ বদল করি। আর একজন বল্‌লে, ভারি কাঁধটা ভেরে গেছে, একটু রাখবে। সেইখানে খাট রেখে লোকগুলো বসে বিড়ি টান্‌তে লাগল।

রঙ্গিণী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথা শোনে। খানিক পরে দুজন স্ত্রীলোক গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদতে কাঁদতে এসে সেখানে পৌছল। একজন কাঁদ্‌চে, আর একজন তার সঙ্গে কেঁদে কেঁদে বোঝাচ্চে, ছি মা, চুপ কর, এ সময় কাঁদতে নেই। মেয়েটি তবুও কাঁদে, বলে, ওগো, এমনি ক'রেই ত এবার থেকে কেঁদে কেঁদেই আমার দিন কাটবে, ওঁর সাম্‌নে কেঁদে নি, প্রাণ ভ'রে···

রঙ্গিণীরও জমা কান্নার অথই জল যেন উপ্‌চে পড়ে দুচোখ দিয়ে।

যে ডুবতে ব'সেছে, সে খড়কুটো ধরেও বাঁচার চেষ্টা করে। রঙ্গিণী বুঝলে, যে এই শোকসন্তপ্ত লোকগুলোর সঙ্গ নিলে রাত একরকমে কেটে যাবে। তারপর দিনের মালিকের কাছে সে আবার নিজেকে সমর্পণ করে দিয়ে ব'লবে, প্রভু যেদিকে নিয়ে যাবে, সেইদিকে যাব, কেবল মোহিতের হাতে সঁপে দিও না। লোকে যে তোমাকে দয়াময় বলে, সে কি একেবারে বানানো ?

তাদের পিছনে পিছনে রঙ্গিণী গিয়ে গঙ্গার তীরে পৌঁছে, একটু দূরে ব'সে প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌ল কখন্ তাদের ছুটি হবে।

দিনের আলো ফুটে উঠ্‌লে রঙ্গিণী যেন লোকের কথাবার্ত্তা, সূর্য্যের আলো উত্তাপ থেকে অনেকখানি সাহস সঞ্চয় ক'রে, সেই সদ্যবিধবার পায়ের কাছে এগিয়ে কথা কইতে গিয়ে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে শুধু একটি চির-করুণ অনাহত আদি শব্দ বার হ'য়ে প'ড়ল —মা !

৫

গঙ্গার ঘাটে রঙ্গিণী ঝাঁপিয়ে কেঁদে প'ড়ল অম্বু ডাক্তারের পায়ের তলায়। তিনি সেই সকালেই গাড়ি থেকে নেমে স্নান সেরে নিয়ে যাচ্ছিলেন রঙ্গিণীর খোঁজে, বাদুড়বাগানে।

রঙ্গিণী এসেছিল, তার নতুন মা'র সঙ্গে গঙ্গা-স্নানে। সে একতিলের জন্যও তাঁকে ছেড়ে থাকৃত না। পাছে, কোথা দিয়ে এসে মোহিত চুরি ক'রে ধরে নিয়ে যায় !

অম্বু ডাক্তার শান্তগম্ভীর গলায় বল্‌লেন, রঙ্গিণী, অধীর হয়ো না। আর ত তোমার কোন ভয় নেই। কা'র সঙ্গে এসেছ এখানে ?

—নতুন মা।

-- বেশ, চল তাঁদের বাড়ী যাই।

নতুন মা পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একখানা গাড়ি ডেকে তাঁরা রওনা হ'লেন।

গাড়ি চ'ড়ে ঠিক সেদিনের মতই রঙ্গিণীর মাথাটা নেশায় যেন টল্‌মল্ করে। যেন মনে হয়, এখুনি কোন্ অতলে তলিয়ে যাবে !

দুপুরে রঙ্গিণীকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। একটি কথাও জিজ্ঞেস্ করার দরকার নেই। রঙ্গিণী যত-টুকু চিঠিতে লিখতে পেরেছিল, তার বেশী বোধ হয় জানার কোনো দরকার ছিল না তাঁর।

একটা বড় বাড়ির সাম্‌নে গাড়িখানা দাঁড়াল। রঙ্গিণীকে সঙ্গে ক'রে সেই বাড়ীর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গিয়ে, দেয়ালের গায়ে একটা চাবি টেনে দিয়ে বললেন, ব'স ঐ চেয়ারে গিয়ে।

তাড়াতাড়ি পর্দ্দা টেনে একজন সায়েবি পোষাক-পরা বাবু বেরিয়ে এসে অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে বললেন, অম্বু, তুমি ? তারপর সব ভাল ত ?

—ভাল আর কই ! বাড়িতে অসুখ রেখে আসতে হ'য়েছে।...এই মেয়েটি তোমার জিম্মায় দিয়ে যাচ্ছি। একে কাল স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিতে হবে। আর তোমার ইচ্ছামত একটি বোর্ডিংয়ে ব্যবস্থা ক'রে রেখে দিও। ব'লে কিছু টাকা তিনি ডাক্তার ঘোষের হাতে তুলে দিয়ে বললেন,—আমাকে এই তিনটের গাড়ি ধরতে হবে। বাড়ীতে ভারি অসুখ ফেলে এসেছি, ভাই।

রঙ্গিণীর হাত ধরে ডাক্তার ঘোষ বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন।

পরের দিন ভর্ত্তি হবার সময় ডাক্তার ঘোষ লিখিয়ে দিলেন, মেয়েটির নাম হেমপ্রভা; আমি ওর গার্জ্জেন; বাপ মারা গেছেন। কাশীর ডাক্তার ব্যানার্জ্জির পালিতা কন্যা। তাঁর বড় ছেলে বিলেতে, তার সঙ্গে ঈশ্বরের ইচ্ছা হ'লে, বিবাহ দেবার স্থির আছে। ওর খরচ-পত্রের সমস্ত ভার আমার ওপর।

রঙ্গিণীর নবজন্মলাভে হেমপ্রভার নূতন জন্ম। সে রঙ্গিণীর চেয়ে বছর পনেরর বয়সে ছোট।—এই কথাগুলি ব'লে হেমপ্রভা হাস্‌লেন।

আমরা সবাই অবাক হয়ে বসে রইলাম, সেই শীতের সন্ধ্যাবেলায়। মনে কত কথাই আসে, কিন্তু সাহস হয় না জিজ্ঞেস্ করতে।

মনে হল, ললিত কি ফেরেন নি ? অম্বু ডাক্তার কি আর বেঁচে নেই ? সে কার অসুখ হ'য়েছিল ?

কিন্তু হেমপ্রভার মুখ দেখে স্পষ্টই আমরা বুঝতে পারছিলুম যে রঙ্গিণীর গল্পের যবনিকাপাত হ'য়ে গেছে। মাথা খুঁড়েও আর একটি কথা বা'র হবে না।

রেবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপি চুপি বললে আমার কানে কানে—এ যদি সত্যি হয় ত কি বলেচি···

বললুম, চুপ রেবা···হেমপ্রভাকে অবিশ্বাস ?

রেবা কিন্তু দুর্দ্দম !

ভারতীয় প্রাচ্য কলা-পরিষদ ও বাঙ্গালীর শিল্প-শিক্ষা

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের নব্য শিক্ষা-তন্ত্রে, আমাদের স্কুল ও কলেজে, একটি বড় ও শক্তিমান জ্ঞানের বাহন ও সাধনকে নির্ব্বাসিত করে রাখা হয়েছে—সেটি হ'ল,—কলাবিদ্যা ও সৌন্দর্য্যের বিজ্ঞান। মানুষের স্বাভাবিক মানসিক বৃত্তির সহিত এই সৌন্দর্য্য-বিদ্যার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই বৃত্তির সাধনা ও শিক্ষা বর্জ্জন করে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি ও উচ্চ-শিক্ষার ভাগ্য-বিধাতারা, আমাদের জাতীয় শিক্ষাকে যেন চিরকালের জন্য অঙ্গহীন ও পঙ্গু করে রেখেছেন। এই কলা-'শিক্ষাহীন' 'শিক্ষার' ফলে, আমরা যে শুধু কলা-শিল্পের মর্ম্ম গ্রহণ করবার শক্তি ও যোগ্যতা হারিয়েছি তা নয়, উপরন্তু চিরকালের জন্য আমাদের মন কলা-লক্ষ্মীর রত্নমন্দিরের বিরুদ্ধে 'বিমুখী ভাব' ধারণ করে বসেছে, তাঁর রত্ন-বেদীর উজ্জ্বল ও নির্ম্মল পাবক-শিখার স্পর্শ থেকে আমাদের বঞ্চিত করে, সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের সিংহদ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে। পশ্চিম দেশে এমন বিশ্ব-বিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, বা পাঠশালা নাই, যেখানে কলা-সাধনার কিছু-না-কিছু ব্যবস্থা আছে। শুধু উচ্চ-শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলে নয়, নিম্ন ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগেও সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির উন্মেষ ও স্বাভাবিক স্ফুরণ ও পরিণতির উদ্দেশে কলাবিদ্যার জ্ঞান ও সাধনার বেশ একটা বড় স্থান দেওয়া হয়। এই শিক্ষার সুযোগ কেবল যে প্রাথমিক রেখা-চিত্র (elementary drawing) ও দৃষ্টি-শক্তির শিক্ষার (visual training) নানা ব্যবস্থাসূত্রে করা হয়, তা নয়, পরন্তু প্রাচীন ও নবীন নানা ওস্তাদ শিল্পীদের কলা ও সাধনার সঙ্গে অল্প বয়সের বালক-বালিকাদের সংযোগ ও পরিচয়ের নানা সুব্যবস্থা এখন য়ুরোপ ও আমেরিকার নানা বিদ্যাপীঠের শিক্ষা-প্রণালী ও পদ্ধতির অপরিহার্য্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের প্রচলিত বিদ্যাপীঠে কলাবিদ্যা এখনও স্থান-চ্যুত ও 'জাতিচ্যুত' হয়ে রয়েছে। 'কেতাবীবিদ্যার' অত্যধিক সম্মান ও প্রভাবে, যে-বিদ্যা লিখিত ও পঠিত ভাষার মধ্যে ধরা দেয় না, সে-বিদ্যাকে আমরা যথেষ্ট অবজ্ঞা ও সন্দেহের চোখে দেখতে শিখেছি —আর এই 'লিখিত পঠিত' ভাষাকেই জ্ঞানের একমাত্র পথ বলেই মেনে নিয়েছি। এর ফলে, সকলপ্রকার নেত্র-গ্রাহ্য বিদ্যা (visual knowledge) ও শিল্পকর্ম্ম অবজ্ঞার কর্ম্মনাশার অতল-জলে সমাধি লাভ করেছে। আমাদের দেশের পুরাতন ও নূতন পদ্ধতির নানা কারুশিল্পের (Industrial Arts) শোচনীয় দুর্দ্দশা যে আমাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ও শিল্প-বুদ্ধির অপমান ও শিক্ষাহীনতার ফল, এ কথা আমরা অনেক সময়ে উপলব্ধি, ও অনেক সময়ে স্বীকার করতে চাই না। "স্বদেশী প্রচেষ্টার" প্রেরণায় ও তাড়নায়, আমাদের কারুশিল্পের ক্ষেত্রে,—নানা নূতন 'স্বদেশ-জাত' শিল্পদ্রব্যের উৎপত্তি ও প্রচলন হয়েছে এবং হচ্ছে। এই নূতন পর্য্যায়ের শিল্প-সম্ভারের অধিকাংশ 'স্বদেশ-জাত' 'শিল্পদ্রব্য' শিল্পের স্পর্শ হতে,—রূপ-রসের মধুময় আলোক ও দীপ্তি হতে, একেবারে বঞ্চিত। রূপ-রসের অলৌকিক ইন্দ্রজালে, কলা-বুদ্ধির

সুকৌশলে, অনেক সাধারণ সামান্য ব্যবহারের জিনিষ—এমন একটা নূতন শ্রী ও দিব্য-মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠে, যাহার স্পর্শ পেয়ে এই সাধারণ ব্যবহারের উপকরণগুলি একটা নূতন আকর্ষণ ও 'মূল্য' লাভ করে। যে-সব শিল্পজাত দ্রব্য এই সৌন্দর্য্যের স্পর্শ হতে বঞ্চিত, বেচা-কেনার হাটের প্রতিযোগিতায় তারা চিরকাল পিছিয়ে পড়ে থাকে। এইজন্য পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষা ও ব্যবসায়-ক্ষেত্রে—'কারু-শিল্পে কলা-কৌশলের প্রয়োগ' (application of art to industry) সম্বন্ধে নানা আলোচনা ও ঘোষণা সর্ব্বদাই শোনা যায়। বিদেশের মনীষীরা অনেকদিন স্বীকার করে নিয়েছেন, যে, কলা-বিহীন কারু-শিল্প পশুত্বেরই নামান্তর (industry without art is brutality)। ব্যবসায়-বুদ্ধির দিক দিয়ে এটা খুব সত্য কথা যে, যে-জিনিষে কলা-কৌশলের ছাপ আছে বিশ্বের বেচা-কেনার হাটে তার বাজার-দর খুব বেশী। জাপানের অতি তুচ্ছ জিনিষ, জাপানের জাতীয় কলার কল্যাণ-টীকা কপালে নিয়ে, য়ুরোপ ও আমেরিকার বাজারে প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে, প্রতিষ্ঠা-লাভ করেছে। পক্ষান্তরে ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য রূপের সৌন্দর্য্যে হীন হয়ে দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। আমাদের দেশের কারুশিল্প আবার কলা-লক্ষ্মীর কল্যাণ স্পর্শ না পেলে, এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আপনার স্থান অধিকার কর্‌তে পার্‌বে না। সুতরাং অর্থকরী শিল্পের ক্ষেত্রেও, কলা-লক্ষ্মীর আরাধনা ও সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির সাধনার একান্ত আবশ্যক হয়েছে।

অবশ্য শিল্প-সাধনার এক ক্ষেত্রে নবীন-ভারত অনেকটা সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এটা হ'ল, চিত্র-কলা-বিদ্যার নানা নবীন প্রচেষ্টা। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নায়কতায় বাংলা দেশের নবীন শিল্পীরা নব-পর্য্যায়ের নবীন চিত্র-শিল্পে একটা নূতন প্রাণের স্পন্দন ও নব-জাগরণের উদ্বোধন এনে দিয়েছেন। এই প্রচেষ্টা বহু প্রতিভাবান শিল্পীর সাধনা ও সাহায্য পেয়ে কয়েক বৎসরের মধ্যে যথেষ্ট সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দেশে ও বিদেশে বাংলার নবীন শিল্পীদের চিত্রপট যথেষ্ট আদর ও সম্মানে অভিনন্দিত হয়েছে। বাংলার নবীন শিল্পীরা প্রমাণ করেছেন যে, শিল্পের ক্ষেত্রে নবীন-ভারতের এমন অনেক কথা বলবার আছে—যে কথা, যে বার্ত্তা পশ্চিম-দেশের গুরুদের বিদ্যাপীঠের 'শেখা-বুলির' প্রতিধ্বনিমাত্র নহে। ভারতের নিজস্ব সাধনার ভাণ্ডার যে এখনও শূন্য হয় নাই সাহিত্যক্ষেত্রে সে-কথা প্রমাণ করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে সে কথা প্রচার করছেন আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ। বাংলার নবীন-শিল্প-সাধনার বিশেষত্ব এই, যে, বাংলার নবীন-সাহিত্যে পশ্চিম-দেশের যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি জাজ্জ্বল্যমান রয়েছে, বাংলার নবীন-চিত্র-শিল্পে তাহার বিশেষ কোনও চিহ্নই পাওয়া যায় না। এই নিজস্ব ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য,—এই স্বারাজ্যের জয়টীকা বাঙ্গালীর চিত্র-শিল্পের বড় গৌরবের কথা।

এই নবীন শিল্প-সাধনার আর একটা দিক আছে। সেটা হ'ল কাজের পর্য্যায়, বা অর্থকরী বিভাগ। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকেরা অর্থ-উপার্জ্জনের নানা ক্ষেত্রে প্রবেশ চেষ্টায় কি পরিমাণ বিপর্য্যস্ত লাঞ্ছিত ও পরাজিত হচ্ছেন, তা এই অর্থসঙ্কট ও অন্নসঙ্কটের দিনে কাহারও অবিদিত নাই। দেশের 'চাকরীর' বাজার ও ব্যবসায়-কারবারে গ্রাজুয়েটের 'মূল্য' কি, তার কথা প্রকাশ্যে বলতে অনেকের লজ্জা করে। কিন্তু স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে যাদের প্রবেশলাভ ঘটেনি, এমন অনেক 'নিরক্ষর' বাঙ্গালী শিল্পী শিল্পের অক্ষর শিখে, বাঙ্গালার নবীন-শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করে অনেক গ্রাজুয়েটের চেয়ে বেশী উপার্জ্জন করেছেন ও করছেন। অবশ্য সকলের ভাগ্যে লক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভ সমানভাবে ঘটেনি। কিন্তু সকলেই প্রায় প্রমাণ কর্‌তে পেরেছেন, যে, ভারতের শিল্পের ক্ষেত্রে একটা নূতন উপার্জ্জনের পথ আবিষ্কৃত হতে পারে। সকলে মিলে ঐ একই 'লিখিত পঠিত' বিদ্যার সংকীর্ণ ক্ষেত্রে নিষ্ফল প্রতিযোগিতা না করে শিল্পের নূতন ক্ষেত্রে অর্থ-উপার্জ্জনের সুযোগ খুঁজে নিতে পারেন, এ কথাটা যে আংশিকভাবে সত্য তাহা প্রমাণ হয়েছে। ভারতের চিত্রশিল্পে কৃতিত্ব লাভ করে দুচার-জন বাঙ্গালী যুবক এমন সব উচ্চ-বেতনের পদ পেয়েছেন, যে, সে-সব পদ অনেক M. A. এবং P. R. S.

উপাধিধারী শিক্ষিত যুবকের ভাগ্যে ঘটে নাই। সম্প্রতি ইণ্ডিয়া অফিসের নূতন আবাস-গৃহ অলঙ্কৃত ও চিত্রিত করতে ভারত-সরকার নিজব্যয়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করে পাঁচজন ভারতীয় শিল্পীকে বিলাতে পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে চারজন বাঙ্গালী,—এবং বাংলার নবীন পদ্ধতির চিত্রকলার কৃতী সাধক। এঁরা কেহই 'লিখিত পঠিত' বিদ্যায় পারদর্শী নহেন, কিন্তু তুলি চালাতে বেশ ক্ষিপ্রহস্ত। বাঙ্গালীর কলমের খোঁচায় অনেক অসম্ভব জিনিষ সম্ভব হয়েছে, বাঙ্গালীর তুলির খোঁচায় নূতন কীর্ত্তি অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়ে ক্রমশঃ গৌরবের বস্তু হয়ে উঠেছে।

বাংলা দেশে শিল্পসাধনার শিক্ষাকেন্দ্র দুই চারটি আছে। তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন হ'ল সরকারী 'স্কুল অফ আর্ট'। বে-সরকারী যে কয়টি স্কুল আছে তাহার মধ্যে প্রধান হ'ল বিশ্বভারতীর 'কলাভবন' ও কলিকাতার প্রাচ্য কলাপরিষদের (Indian Society of Oriental Art) সংলগ্ন কলাশালা। এই কলাপরিষদের সাম্বৎসরিক প্রদর্শনী কলিকাতার শিক্ষিত ও মনীষী সমাজে খুব খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করেছে। ভারতের নানা স্থান ও বিদেশ থেকে অনেক সমঝদার সমালোচকেরা এই প্রদর্শনী প্রতিবৎসর দেখতে আসেন ও প্রীতি ও শ্রদ্ধার মাল্য দিয়ে যান। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই পরিষদের একটি ছোট স্কুল ও বিস্তৃত সাজপাটের সুন্দর কলাশালা আছে। এই স্কুলের প্রবেশিকা ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত সরকারী স্কুল হতে অনেক স্বতন্ত্র। সাধারণ স্কুলের কড়া নিয়মের বাঁধা-ধরা এই শিল্পশালায় বর্জ্জন করা হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা উচ্চ-মঞ্চের ব্যবধান এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে পাশাপাশি বসে ছবি আঁকেন। ভারতের প্রাচীন শিল্পশালায় এই ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে খুব একটা ঘনিষ্ঠ অতি-পরিচয়-লাভের সুবিধা ও সুযোগ, এই শিক্ষারীতির প্রধান অঙ্গ। গুরু বা শিক্ষকের শিক্ষা-পদ্ধতি হ'ল, নিজে হাতেকলমে কি রীতি প্রণালীতে চিত্র করছেন, শিষ্যকে তাহার অনুশীলন করবার সুযোগ দান। চিত্রশিল্পের চাক্ষুষ পরীক্ষা-ক্ষেত্রে (experiment) হাতেকলমে চিত্র-চর্চ্চার ও পট-লিখনের দেখবার সুযোগে বেশ একটা 'ছোঁয়াচ', একটা মাদকতা আছে,- যা শিক্ষকের 'কথার' ব্যঞ্জনায় পাওয়া যায় না। চিত্র-বুদ্ধি ও কল্পনা-শক্তির সহজ স্ফুরণ হয় চিত্র-চর্চ্চার মধুর পরিবেশের মধ্য দিয়ে,—ছবি তৈয়ারীর প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ পর্ব্বের মধ্য দিয়ে। এক প্রদীপ থেকে যেমন আর একটি প্রদীপ জ্বলে উঠে, তেমনই সাধক-শিল্পীর সাধনার ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভে তাঁর সাধনকালের উন্মীলিত ও উদ্বুদ্ধ সৌন্দর্য্য-শক্তির প্রজ্জ্বলিত মানসিক স্পর্শ পেয়ে, শিক্ষার্থীর নিজের ভিতরের শক্তি ও সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি আপনি ফুটে উঠে। এই বিকাশ, এই উন্মীলন,—কোনও যান্ত্রিক, বাচনিক, কৃত্রিম, শিক্ষা-প্রণালীদ্বারা সিদ্ধ হয় না। এই শিক্ষা-পদ্ধতির ফলে দেখা গেছে, যে, দু-এক বৎসরের মধ্যে শিক্ষার্থীরা শিল্পতত্ত্বের মূলসূত্রগুলি অনায়াসে আয়ত্ত করে আপনার পথ অতি সহজেই আপনি কেটে নিতে পারেন। এদের শিক্ষা খুব একটা কৃত্রিম, যান্ত্রিক, অভ্যাস-তালিকার (programme) তাড়নায় ঘটে না, শিল্পসাধনার চাক্ষুষ পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের ফলে আপনি ফুটে উঠে।

এই পরিষদের স্কুলে কোনও পরীক্ষার বালাই নাই, কোনও সার্টিফিকেটের ছাড়-পত্র নাই। কোনও শিক্ষার্থীর শিক্ষা-পর্ব্ব শেষ হয়েছে কি না সেটা আচার্য্য বিচার করে বলে দেন। কোনও ছাত্র কৃতী হয়ে উঠেন দু-বৎসরে, কারুর লাগে তিন, কারুর লাগে চার বৎসর। ইতিপূর্ব্বে কোনও ছাত্র আশাপ্রদ হাতের কাজ দেখাতে না পারলেই বিদ্যালয় থেকে আগেই অবসর নিতে হয়।

সম্প্রতি এই বিদ্যালয়ে একটি নূতন মহিলা-বিভাগ খোলা হয়েছে। এর বেশ একটা সার্থকতা আছে বলে মনে হয়। বাংলা দেশের মহিলারা শুধু যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, তাঁদের শক্তির প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, সম্প্রতি রাজনীতির কঠিন ও বিপদ সঙ্কুল পথে তাঁরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে অদ্ভুত সাহস, সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

রাজনীতির দ্বন্দ্বক্ষেত্রে নারীর অধিকার ন্যায্য কি না, শোভনীয় কি না, তাহা বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু বাঙ্গালীর মানসিক শক্তির অপরার্দ্ধ যে বাঙ্গালীর নারী-শক্তিতে নিহিত ও নিমজ্জিত আছে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে নারী-শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। দু-চারজন কৃতী মহিলা-শিল্পীর কথা বাদ দিলে, সাধারণতঃ শিল্পের ক্ষেত্রে বাঙ্গালা দেশের, তথা ভারতের, মহিলা-সমাজ ভারতের শিল্প-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। নবীন শিল্পকলার নূতন বিকাশের নানা নূতন পথ খুলে দেবার তাঁদের যে উচ্চ অধিকার ও নিজস্ব শক্তি আছে, শ্রদ্ধেয়া সুনয়নী দেবীর অলৌকিক চিত্রকলায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। কবিতার কুঞ্জবনে মহিলাদের যে স্নিগ্ধ-মধুর কলধ্বনি সর্ব্বদা শোনা-যায়, তার প্রতিধ্বনি, রূপরেখা ও বর্ণ সঙ্গীতের জগতে এখনও ফুটে উঠেনি। ললিতকলার সাধনা-পীঠে বাঙ্গালী মহিলাদের নিশ্চয় নূতন বার্ত্তা ও বাণী প্রচারের অধিকার ও শক্তি আছে। এই শক্তির লীলা-স্পর্শ হতে বঞ্চিত হ'লে বাঙ্গালীর চিত্র-শিল্প চিরকালই অঙ্গহীন ও শক্তিহীন হয়ে থাক্‌বে। বাংলার গৃহ-লক্ষ্মীদের পূতসাধনার কল্যাণ-স্পর্শ পেলে ভারতের কলালক্ষ্মীর পদ্মবনে আবার নূতন কমল ফুটে উঠবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন*

আজ যাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য আসিলাম, তিনি পার্থিব সম্বন্ধে আমার মাতুল ছিলেন। সাধারণতঃ মাতুল সম্পর্কে যাহা বুঝায় এ তাহা নহে। সাংসারিক মাতুল সম্পর্ক হইতে কত অধিক মধুর সম্পর্কে সম্পকিত ছিলাম তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে আমি অক্ষম। শৈশব হইতে সন্তান যেমন পিতার ক্রোড়ে আদর-যত্নে প্রতিপালিত হয়, আমরাও সেই প্রকার তাঁহার পবিত্র নিঃস্বার্থ স্নেহ প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম। পিতার স্নেহ-প্রীতি অদৃষ্টে ঘটে নাই বটে, আমাদের মামা তাঁহার অন্তরের নিঃস্বার্থ ভালবাসা আমাদের প্রতি এত অধিক ঢালিয়া দিয়াছেন, যে, সে স্নেহ-ভালবাসা যাহারা সম্ভোগ করিয়াছে তাহারাই একমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, অপরের বুঝিবার সাধ্য নাই। তিনি আমাদের পিতৃস্থানীয় ছিলেন এবং পিতার অধিক যত্ন ও স্নেহে আমাদের প্রতিপালন করেন এবং আজীবন এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ-চিন্তা হইতে বিরত হন নাই।

আমাদের পরম পূজনীয় মাতুল মহাশয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৯শে মে শুক্রবার পাবনা জেলার অন্তঃপাতী সাহাজাদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি অল্পবয়সেই পিতৃ-মাতৃহীন হন। আমার স্বর্গগতা জননীর মুখেই শুনিয়াছি, তাঁহাদের পিতা ও মাতা উভয়েই অতি ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। চারি পাঁচ বৎসরের শিশু পিতৃমাতৃহীন হইয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনীর (আমার জননীর) ক্রোড়ে আশ্রয় পাইলেন। মা কি তখন ভাবিয়াছিলেন এই শিশুভ্রাতাই তাঁহার সারাটা দীর্ঘজীবনের অবলম্বন হইবেন। প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর এই চিরকুমার ভ্রাতার পরিচর্য্যা করিয়া মাত্র নয় মাস পূর্ব্বে প্রায় পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তিনি

* আদ্য শ্রাদ্ধবাসরে ভাগিনেয়ী শ্রীমতী বিনোদিনী চৌধুরী কর্তৃক

ভাইভগিনী ছিলেন। ইঁহার বড় আর এক মামা ছিলেন। সেই বড় মামা মাতামহীর দ্বিতীয় সন্তান। আমার এই মামা ছিলেন চতুর্থ। সকলের ছোট একটি ভগিনী। আমার মাতামহের নাম রামজয় ঘোষ। মাতামহীর নাম ৺ব্রহ্মময়ী। তাঁহারা দুজনই অতি শান্ত-প্রকৃতি, সরল দয়ালু ও সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন। অতি কষ্টে বড়-মামা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া বৃহৎ পরিবারের ভার গ্রহণ করেন। তিনি অকালে মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে এই ছোটমামাকেই পরিবারের সকল ভার গ্রহণ করিতে হইল। বড়মামা হাজারিবাগে ডাক্তার ছিলেন। এখান হইতে অসুস্থ হইয়া দেশে গেলেন। তখন ছোটমামা হাজারিবাগ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এইখানেই তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। তাহার পর সরকারী বৃত্তি পাইয়া কলিকাতা সিটি কলেজ হইতে আই-এ ও বি-এ পাশ করিয়া পরিবারের ভার লইলেন। সাংসারিক অনটনের জন্য আর এম-এ পড়িতে পারিলেন না। অর্থোপার্জ্জনের জন্য চাকুরীতে প্রবেশ করিলেন। বড়মামা যখন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ছোটমামাও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। বড়মামার মৃত্যুতে বড় ভগিনীর তিন সন্তান, অর্থাৎ আমরা তিন ভাই বোন, এক বালবিধবা ভগিনী, বিধবা ভ্রাতৃবধূ সকলের ভার মামার উপর পড়িল। তিনি সকলকে দেশ হইতে লইয়া আসিলেন, কেবলমাত্র আমার মা কিছুকাল দেশে রহিলেন। মামা কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণময়ীকে ব্রাহ্মসমাজে আনিয়া বিবাহ দেন। তিনিও মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে একটি কন্যা রাখিয়া পরলোকগমন করেন। বিধবা ভগিনীকেও ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ দেন, কিন্তু ভগিনীপতি তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পরলোকগমন করিলেন। তখন এই অপোগণ্ড শিশুচতুষ্টয়ের ভারও তাঁহারই স্কন্ধে পড়িল। আমাদের দুই ভগিনীকে শিক্ষা দিয়া ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ দেন। কি ত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতা, কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি এই সকল কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত, অথচ তিনি ছিলেন চিররুগ্ন, তিনি পঞ্চাশ পার হইবেন এ কথা কখনও তখন ভাবি নাই।

যে-বৃহৎ লাইব্রেরী তাঁহার বিদ্যার পরিচয়, তাহা রহিল, তাহা ত নির্জ্জীব। তিনি ছিলেন জীবন্ত লাইব্রেরী। আমার স্বামী বলেন, যে, যখনই কিছু জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে তৎক্ষণাৎ বইখানি আনিয়া স্থানটি

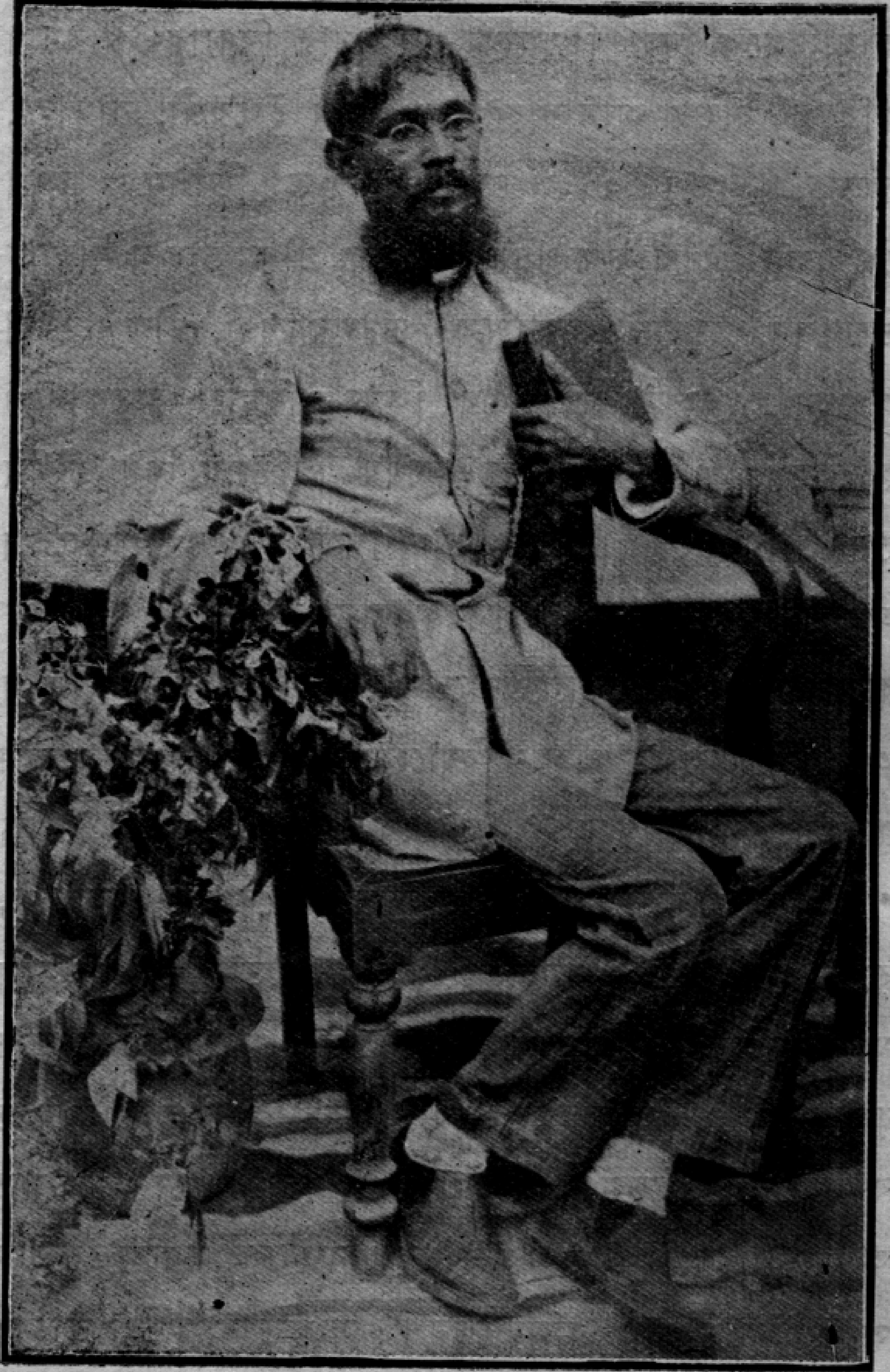

পরলোকগত মহেশচন্দ্র ঘোষ

বাহির করিয়া দিয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিতে যে লাইব্রেরী দিয়া এক মিনিটে কাজ হইত, এখন সেজন্য এক ঘণ্টা খাটিতে হইবে। আমার মামার চারি সহস্রাধিক গ্রন্থপূর্ণ বিশ হাজার টাকা মূল্যের এই লাইব্রেরী তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করিয়াছেন এবং যা কিছু নগদ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাও এই লাইব্রেরীর রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতিকল্পে ব্যয় করিবার জন্য আদেশ দিয়া গিয়াছেন। ইহাতে সকল প্রকার প্রাচীন ও নবীন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম্ম, ও সাধারণ

সাহিত্য, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, জীবনচরিত প্রভৃতি সকল প্রকার গ্রন্থই আছে। কিন্তু মামাকে বলিতে শুনিয়াছি এত দার্শনিক গ্রন্থ ভারতবর্ষের আর কোনো এক লাইব্রেরীতে আছে কি না সন্দেহ উপন্যাসের বইগুলি তিনি হাজারিবাগ ইউনিয়ন ক্লাবে ও আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। মামার বিদ্যার পরিমাণ করিতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা। তিনি ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পালি ও গ্রীক ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। যখন দেখিলেন খৃষ্টধর্ম্ম আলোচনা করিতে গ্রীক ভাষার সাহায্য প্রয়োজন, তখনই বৃদ্ধবয়সে ভগ্নশরীরে গ্রীক ভাষা অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন এবং কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইলেন। খৃষ্টতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক অভিনব কথা তিনি শুনাইয়া গিয়াছেন। পালি ভাষা শিক্ষা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অমূল্য উপদেশ-সকল জগতকে দান করিলেন। শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু ঠিকই লিখিয়াছেন—"দেশের কল্যাণ তিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যে যাহা করিয়াছেন তাহা লোকের উপলব্ধি করিতে সময় লাগিবে।" তাহার একটি কারণ এই বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বুদ্ধের নির্ব্বাণ-ও উপনিষদের ঋষিগণের ব্রহ্ম, এই দুইয়ের মধ্যে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটি স্বরূপের একতা রহিয়াছে। বুদ্ধদেবকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একরূপ নাস্তিকই সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার এই আবিষ্কারে সে মত অনেক পরিমাণে খণ্ডিত হইয়াছে। বাইবেল সম্বন্ধেও তিনি অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার রচিত ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকের টীকা ও টিপ্পনীতে পণ্ডিতেরাও মুগ্ধ হইয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক প্রভৃতি ঋষির দার্শনিক মত অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও তিনি ভগ্নদেহে রুগ্নাবস্থায় গীতা-তত্ত্ব বিষয়ে যে-সকল সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পণ্ডিতদিগেরও গবেষণার বিষয়। বৈদিক ভাষাতেও তাঁহার যথেষ্ট দখল ছিল। তাঁহার সমগ্র লেখাবলী সংগৃহীত হইলে বড় বড় গ্রন্থ হইবে। তিনি বিদ্যার্জ্জন করিয়াছেন জ্ঞানলাভের জন্য। সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান তিনি লাভ করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মধ্যান-নিরত ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবন যাপন করিয়া অন্তে ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন। ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তিনি ভাবে বিভোর হইতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া দুইটি ব্রহ্মসঙ্গীত করিতাম। সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তিনি কোন্ রাজ্যে চলিয়া যাইতেন, সে রাজ্যের খবর আমার জানা নাই। সঙ্গীতান্তে কোনো কোনো দিন তাঁহাকে যেন সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। এমন কি, কোনো কোনো দিন ভয়ও পাইয়াছি।

জ্ঞানের এরূপ একনিষ্ঠ সেবক সচরাচর মিলে না। তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। জীবনে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন জ্ঞানার্জ্জনে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। দারপরিগ্রহ করেন নাই বলিয়া যে তিনি পারিবারিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নাই, তাহা নহে। এ বিষয়েও তাঁহার ত্যাগ অতুলনীয়। যখন চল্লিশ টাকা মাত্র বেতন পাইতেন তখন ভাগিনেয়ীদিগকে কলিকাতায় বোর্ডিংয়ে রাখিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রাতঃকালীন জলযোগ ছিল ভাত ও আলুসিদ্ধমাখা এক দলা। কিন্তু সেকথা তিনি আমাদিগকে জানিতে দেন নাই, পাছে আমরা খরচ কমাইয়া আপনাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত করি। এক ভাগিনেয়কে কলিকাতায় রাখিয়া পড়াইতেন। যখন তাহার এম-এ পরীক্ষার জন্য টাকা পাঠাইলেন, তখন মামার সেভিংস্ ব্যাঙ্কের খাতায় গোটাকয়েক পয়সা মাত্র রহিল। সেদিনও এক ভাগিনেয়—যে তাঁহার অনুমতি না লইয়াই বিদেশ চলিয়া গিয়াছে, তাহার দুরবস্থার কথা শুনিয়া অনেক টাকা পাঠাইলেন, যদিও সে তাঁহার কাছে টাকা চাহিতে সাহস করে নাই। কোন প্রার্থী তাঁহার নিকট আসিয়া প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। যদি কেহ ধার করিতে আসিত এবং বুঝিতেন যে তাহার ধার শোধ করিবার ক্ষমতা নাই, পুনরায় ফিরিয়া পাইবার আশা ত্যাগ করিয়াই তাহাকে টাকা দিতেন। তিনি নিজে কষ্টে পড়িয়াও কখনও ঋণ করেন নাই। দোকানদারের টাকা মাস পড়িবামাত্র দিয়া আসিতেন। কোনো পাওনাদার টাকার তাগাদায় কখনও তাঁহার বাড়ী আসে নাই। সকল সৎকার্য্যে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতা ও ভগিনীর নামে যে ফণ্ড করিয়াছেন, মৃত্যুর এই ক'দিন পূর্ব্বেও তাহাতে দুইশত টাকা দিয়াছেন। তাঁহার বিশাল হৃদয়ে তিনি সমগ্র প্রাণীজগতকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিরামিষাশী ছিলেন, জীবে দয়ার জন্যই তিনি বলিতেন—"যদি আমাকে মদ ও মৎস্যমাংসের অন্যতরকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করে তাহা হইলে আমি মদই গ্রহণ করিব, মৎস্যমাংস গ্রহণ করিব না।" সাধারণতঃ মানুষেরা মনে করে, চাকরবাকরকে দশ পাঁচটাকা দিয়া কিনিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহাদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করা অন্যায় হয় না। তিনি অন্য অপেক্ষা অধিক বেতন দিতেন। তিনি চাকরবাকরের কদর বাড়াইয়া দিতেছেন বলিয়া বন্ধুদের মিষ্ট অনুযোগও তাঁহাকে সহিতে হইয়াছে। তবুও তাহাদের দ্বারা একটু বেশী কাজ করাইয়া লইতে হইলে তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের আহার্য্য প্রস্তুত করাইয়া রাখিতেন। তাঁহার অতিথি-সৎকারের কথা এক বন্ধু যাহা লিখিয়াছেন তাহাই পাঠ করিতেছি—

"গত ১৯১৬ সালের জুলাই মাসে হাজারিবাগে শ্রদ্ধেয় মহেশবাবুর সহিত পরিচিত হই। প্রথম পরিচয়েই তাঁহার সরলতা, অকপট প্রাণখোলা হাস্য, ও স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ ও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হই। দেখিলাম কঙ্কালসার দেহখানির মধ্যে এক মহাপ্রাণ প্রেমবাহু প্রসারিত করিয়া বিশ্বমানবকে আলিঙ্গন করিবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। যতই তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে লাগিলাম, ততই এই প্রেমের অভিনব অভিব্যক্তির পরিচয় পাইতে লাগিলাম। দেখিলাম, তাঁহার এই প্রেম নিঃস্বার্থ ও উদার। হাজারিবাগের আপামরসাধারণ নরনারী বালক বৃদ্ধ সকলেই তাঁহার এই প্রেমে মুগ্ধ ও বশীভূত। পীড়িতের গৃহে প্রেমিক মহেশচন্দ্রের সাদর কুশল সম্ভাষণ ও প্রাত্যহিক পরিদর্শন তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য। জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। বিদ্যালয়ের ছাত্রগুলির তিনি ঐকান্তিক হিতাকাঙ্ক্ষী ও অকপট সুহৃদ। তাঁহার গৃহে ছাত্রগুলির অবাধ প্রবেশাধিকার। গুরু ও শিষ্যের পবিত্র সম্বন্ধ যে এমন সৌহার্দ্দবন্ধনে সুশীতল ও সুমধুর হইতে পারে তাহা পূর্ব্বে দেখি নাই। দেখিলাম মহেশচন্দ্রের প্রেমের এই এক অপূর্ব্ব পরিণতি। দরিদ্রগণকে ঔষধ-বিতরণ তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য। অভাবগ্রস্ত ও বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য প্রদানে তিনি অকাতর। চিররোগী চিরউদাসীন, অথচ লোকের দুঃখ বিমোচনে সদাই তৎপর। তাঁহার কোমলতার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—উপাধিতে তাঁহার কোনই আসক্তি ছিল না, বরং তাহার বিপরীত। কিন্তু পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া যখন তাঁহাকে বেদান্তরত্ন উপাধি দিলেন তখন স্বীকার না করিলে উপাধিদাতাকে অসম্মান করা হয়, কেবল এই বিবেচনাতেই সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

"সজ্ঞানে কাহারও প্রতি অবিচার করিতে তিনি স্বভাবতঃই অপারগ ছিলেন। কিন্তু অন্যের অন্যায় অবিচার অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারিতেন। যাহারা ঘর পুড়াইয়া দিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল, তাহাদের প্রতিও শত্রু শব্দ ব্যবহার করিতে দিলেন না। কিন্তু অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাদের ছেলেপুলের সাহায্য করিয়াছেন।"

আমার মামাকে প্রাণ খুলিয়া যাঁহারা হাস্য করিতে দেখিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার সরল প্রাণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রাণ নিষ্পাপ ও অকলঙ্ক না হইলে এমন হাসি বাহির হয় না। একবার এখান হইতে কলিকাতা যাইবার সময় সব ঠিক্‌ঠাক্ করিয়াও মোটরকারের গোলমালে যাওয়া হইল না। মামা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'তোমাদের আজ যাওয়া হ'ল না।' আমি বলিলাম, 'আপনি হাসছেন, মামা, আমার কিন্তু ভাল লাগছে না।' মামা যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, 'আমি ত ওরকম হেসেই থাকি।' হাস্যামোদে তিনি যোগ দিতেন। তিনি সুরসিক ছিলেন। তবে আনন্দ অপেক্ষা জীবনের পূর্ণতাকে লক্ষ্যস্থলে রাখিতেন। সেইজন্য 'আমি বাছিয়া লব না তোমারই দান,' রবিবাবুর এই গানটি তাঁহার অতি প্রিয় ছিল।

আমার মামার দেহ যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন শারীরিক বল তাঁহার কিছুই ছিল না। কিন্তু

আলস্যকে তিনি প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন। বিশৃঙ্খলতা তাঁহার ছিল না। নিজের কাজ নিজে গুছাইয়া করিতেন। অলস ব্যক্তি কখনও সময়মত কাজ করিতে পারে না। কিন্তু মামার দৈনন্দিন কার্য্য দেখিয়া অন্যেরা ঘড়ি মিলাইতে পারিত, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহাকে কোনো পুস্তকের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে শায়িত থাকিলেও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যাইয়া বই লইয়া আসিতেন। শত সহস্রবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মামাকে দেখিয়া বুঝিয়াছি মানুষের শক্তি তার দেহে নয়—মাথায়। মাথাটা শরীরের ক্ষীণতার অনুপাতে এমনই বড় ছিল যে, পাগড়ী পরিয়া দাঁড়াইলে তাঁহাকে পাঞ্জাবী, শিখ বলিয়া মনে হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে শীতে তিনি পাগড়ী পরিতে বাধ্য হইতেন। মামা মনের জোরে বাঁচিয়া থাকিতেন ইহাই বিশ্বাস করিতে হয়। আহার-বিষয়ে এমন সংযম ও লোভদমন দেখা যায় না। ঘ্রাণ ও স্বাদ গ্রহণ শক্তি ছিল অত্যধিক। সন্দেশ চাখিতে দিলে চুষিয়া ফেলিয়া দিতেন। বলিতেন, 'জিনিষটা কি তা ত জানাই হ'ল, খাইয়া পেট ভারী করিবার প্রয়োজন কি?' এই আহার-সংযমই তাঁহাকে বাষট্টি বৎসর বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল এবং এই অনাহারজনিত শীর্ণতার জন্যই কোন ওষুধপথ্য পরিণামে কার্য্যকরী হইল না, ইহাই অভিজ্ঞদের অভিমত। যাঁহারা তাঁহার খাদ্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিতেন, কি করিয়া তিনি এত বৎসর ধরিয়া এমন গুরুতর মানসিক শ্রম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হস্তপদাদির পরিচালন শক্তি যখন চলিয়া গেল, তখনও মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বিরাম হয় নাই। বসিবারও শক্তি নাই, শুইয়া শুইয়া বাড়ীর প্রত্যেক মানুষটির স্নানাহারের খবর লইতেছেন, মনোমত না হইলে ব্যবস্থা করিতেছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিনও যে-বন্ধু তাঁহাকে সকালে টাট্‌কা গরুর দুধ খাওয়াইতেছিলেন, মাখনওয়ালাকে ডাকিয়া উক্ত বন্ধুকে ঘি করিয়া দিবার জন্য মাখনের ফরমাস দিলেন এবং আদেশ দিলেন যে, একটা নূতন বয়েল কিনিয়া তাঁহাকে ঘি উপহার দিতে হইবে। যখন সামর্থ্য ছিল, নিজে যাইয়া দেখিতেন কে কি খাইতেছে। এখন শুইয়া শুইয়াই বলিয়া পাঠাইতেন যে—যাহা আছে তাহা যেন সকলেই সমানভাবে ভাগ করিয়া খায়। পুরুষেরা খাইয়া গেলে যা থাকে তাই নারীরা খাইবেন, এই ব্যবস্থা তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। এজন্য কত সময়ে না তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাইতে হইয়াছে। কোনো কাজই নিজে হাতে না করিলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। অন্যের সাহায্য লইতে তিনি নারাজ ছিলেন। মামা আমার কেবল দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন না, সাংসারিক সকল কাজেই পটু ছিলেন। জামা কাপড় মোজা নিজে হাতে রিপু করিতেন। আমরা যদি করিতে চাহিতাম, বলিতেন, তোমরা পারিবে না। তাঁর নিজের হাতে তৈয়ারী মশারি আজও ঘরে রহিয়াছে। উঠিবার ক্ষমতা নাই, "মেজদি বাতের ব্যথায় কষ্ট পাইতেছেন"—অমনি উঠিয়া নিজ হস্তে ওষুধ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ওষুধ প্রস্তুত করিয়াই ক্ষান্ত নন, ওষুধ নিয়ম-মত ব্যবহার করা হইতেছে কি না তাহার খোঁজও লইতেন। তিনি যখন একেবারে অসমর্থ হইলেন তখন আমি বলিলাম—ইজিচেয়ারে মাথার কাছে শুইয়া থাকি। মামা তখন অশ্রুনয়নে বলিলেন—"মা, আমার অনুতাপের মাত্রা আর বাড়িও না।" দুদিন আগে বলিলেন—"আমার জন্য তোমরা বড়ই কষ্ট পাইতেছ। আর বেশী দিন নাই—দু একদিন মাত্র।" কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিল, তৃতীয় দিন আসিতে দিলেন না। অন্যের কষ্ট দেখিতে পারিতেন না, কিন্তু নিজের কষ্টসহিষ্ণুতা ছিল অসাধারণ। এই যে এতদিন ভুগিলেন, একদিনের তরে একটা উঃ আঃ কাতরোক্তি সজ্ঞানে অজ্ঞানে মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। শুশ্রূষাকারীদের পক্ষে বিপদ হইত। একদিন গভীর নিঝুম রাত্রে আমরা আস্তেই বলিয়াছিলাম - মামার ত কোনো সাড়া নাই। বিছানা হইতে উত্তর আসিল—"আ-মি ম-রি নাই।" মৃত্যুর দিন প্রথম রাত্রিতে তাঁকে জানাইলাম, কাল ডাক্তার আনিয়া পরামর্শ করা যাইবে। তিনি বলিলেন—আর কি হবে? তাঁহার কথা তখনও বুঝি নাই। শেষরাত্রে মাসিমাকে ডাকিয়া বলিলেন—মেজদি, বিনো ধীরেনবাবুরা

সকালে ডাক্তার আনতে চান্—তা আন্‌বেন! তখনও বুঝিলাম না যে, ইহার অর্থ—ডাক্তার আনিতে তিনি আর আমাদের অবসর দিবেন না। মৃত্যুর দশ ঘণ্টা আগে রাডকের প্রকাণ্ড বইখানি জীর্ণ বুকের উপর রাখিয়া আমার রাত্রি জাগরণের ওষুধ নির্দ্ধারণ করিলেন, অন্য কাহাকেও করিতে দিলেন না। বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল, কিছুই ভুল হয় নাই। বৃহৎ লাইব্রেরীর কোন্ পুস্তক কোথায় তাহা শেষ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন। এই লাইব্রেরীর চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সে চক্ষু খুলিলেন পরপারে যাইয়া। আন্দাজ তিন ঘণ্টা আগে ডানহাতে ঘড়ি ধরিয়া বাঁ-হাতে ডান হাতের নাড়ী ধরিয়া বলিলেন—"বড় thready pulse, গণা যায় না।" আমার স্বামীকে বলিলেন—"আপনি ভাল নাড়ী দেখতে পারেন না।" বড় ঘামিতেছিলেন, তুই ঘণ্টা পূর্ব্বে বেশ শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমাদের সাহায্যে জামাটা ছাড়াইয়া লইলেন। এতক্ষণও কথা বলিতেছিলেন। এইবার কথা বন্ধ হইল। জ্ঞান তখনও ছিল। বুকের উপর হাত তুখানি রাখিয়া যেন ঘুমাইলেন। বসিবার ক্ষমতা ছিল না—এরূপভাবে বসিলে যোগস্থই মনে হইত। মৃত্যুর কোনো উৎপাতই লক্ষিত হইল না। এইরূপ অবস্থায় (১২ই জুন, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার) ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে মামার অমর আত্মা ব্রহ্মলোকবাসী হইলেন। এ লোকে হাহাকার, সে লোকে আনন্দধ্বনি!

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্র সাধনা—শ্রীশিবকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত ও প্রকাশিত। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

'রবীন্দ্র-সাধনা'য় লেখক কবির কাব্যসাধনার আলোচনা করেন নাই, কাব্যের ভিতর দিয়া কবির যে অধ্যাত্ম সাধনা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কাজেই 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালী', 'বলাকা' অপেক্ষা তাঁহাকে 'গীতাঞ্জলী' 'গীতিমাল্য', 'নৈবেদ্য' প্রভৃতি লইয়াই বেশীরকম আলোচনা করিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন, তিনি ভক্ত ও দার্শনিক। কাব্যের যেখানে তিনি নিছক কবি নহেন, সেই সব স্থানগুলি বুঝিবার ও উপভোগ করিবার পক্ষে পুস্তকখানি সাহায্য করিবে। পরিচ্ছেদগুলির নামকরণ সম্বন্ধে আর একটু সতর্ক হইলে ভাল হইত। 'প্রতিভার উন্মেষ' আরম্ভ হইয়াছে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' এবং শেষ হইয়াছে 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী'তে। কবির অধ্যাত্মবাদ, কবিধর্ম্ম ও ভগবৎপ্রেম, কবির জগৎ, কবির কল্পলোক প্রভৃতি কয়টি প্রবন্ধে বইখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সহজ পাঠ। প্রথম ভাগ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য পাঁচ আনা। সচিত্র।

সহজ পাঠ। দ্বিতীয় ভাগ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য সাড়ে তিন আনা। সচিত্র।

এই তুটি বই কলিকাতায় ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে পাওয়া যায়। যে সব শিশুর সবে মাত্র হাতেখড়ি হইয়াছে, তাহাদের জন্ম কবি এই তুখানি বহি লিখিয়াছেন। ইহা তাহারা আনন্দের সহিত দেখিবে এবং দেখিতে দেখিতে পড়িতে শিখিবে;—পড়িয়া আনন্দ পাইবে।

বহি তুখানির কবিতাগুলিতে কবিত্ব আছে, রবিবাবুর বহি হইলেও ইহা বলা দরকার এই জন্ম, যে, অনেক বুদ্ধিমান্ লোকও ছোট ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির উপযোগী করিয়া কিছু লিখিতে গিয়া এমন জিনিষ লেখেন যা সাহিত্য নয়। রবিবাবু শিশুদের জন্ম যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাহাদের ভাল লাগিবে, বুড়োদেরও ভাল লাগিবে। গদ্য গল্পগুলিও, অক্ষর পরিচয় এবং বানান শিখাইবার জন্ম লিখিত হইলেও, উপভোগ্য।

ভানুসিংহের পত্রাবলী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য এক টাকা। বিশ্ব-ভারতী-গ্রন্থালয়। ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্। কলিকাতা।

এই বহিখানির উৎসর্গে লেখা আছে—"এই পত্রগুলি দিয়ে যে পত্রপুট গাঁথা হ'য়েচে তার মধ্যে রাণুর প্রতি ভানুদাদার আশীর্ব্বাদ পূর্ণ রইলো।"

এই রাণুকে ভানু দাদা যখন চিঠিগুলি লিখিয়াছিলেন, তখন রাণু এত ছোট ছিল, যে, তাহাকে একথা বলিলে তাহার রাগ ও হিংসা হইত, যে, রবিবাবু কেবল তাহারই একার বন্ধু নহেন, এণ্ড্রুজ সাহেবকেও তিনি বন্ধু মনে করেন এবং হয়ত বর্ত্তমান সমালোচককেও কতকটা তাই মনে করেন। এখন সেই রাণু বড় হইয়াছে এবং সব কথা বুঝিতে শিখিতেছে। কিন্তু বোধ হয়, এই চিঠিগুলি চিরকাল তাহার কাছে সরস থাকিবে; কারণ বৃদ্ধ সমালোচকের কাছেও এগুলি অপূর্ব্ব ঠেকিতেছে। অনেক ভাষার অনেক সাহিত্যের সহিত আমার পরিচয় নাই; কিন্তু অল্প যাহা আছে, তাহাতে বলিতে পারি ছোট একটি মেয়েকে লেখা বৃদ্ধের এমন চিঠি বাংলা ছাড়া আর কোন সাহিত্যে আছে বলিয়া শুনি নাই।

অনেক পাঠক আছেন—বিশেষতঃ আজকালকার দিনে—যাঁদের রাষ্ট্রনৈতিক জিনিষ ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। বহিখানির

একটা পাতা হঠাৎ চোখে পড়িল। তাহাতে দেখি, রাষ্ট্রনীতিগ্রস্ত লোকদের জন্যও কিছু খোরাক আছে। যথা—

"আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম করে সইতে পারি, কিন্তু মর্ত্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবে আছো, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর হয় ত পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে। ভারতবর্ষে অনেক পাপ জমেছিলো, তাই অনেক মার খেতে হচ্চে। মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রভেদী হয়ে উঠেচে। তাই কত শত বৎসর ধরে মানুষের কাছ থেকে ভারতবর্ষ এত অপমান সইবে, কিন্তু আজও শিক্ষা শেষ হয় নি। ইতি, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬।"

সীবনী—শ্রীমতী ইন্দুসুধা ঘোষ, শান্তিনিকেতন, বোলপুর। মূল্য আট আনা। শান্তিনিকেতনের কারুসংঘ দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতায় বুক কোম্পানীর দোকানে পাওয়া যায়। এই বহিখানির 'পরিচয়ে' শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন :—"শ্রীমতী ইন্দুসুধার আঁকা এই সেলায়ের নমুনাগুলি শুধু ছাপার কাগজে ও কালিতে থাকবার জিনিষ নয়, এগুলির যথাযথ ও যথোপযুক্ত স্থান হচ্ছে মেয়েদের অঙ্গরাখায়। সোনা ও বিচিত্রবর্ণের সূত্রে গাঁথা হওয়াতেই এদের সার্থকতা। আমি শ্রীমতী ইন্দুসুধার এই শিল্প ও কারুকার্য্যের সম্যক্‌-রূপ আদর কামনা করি।"

র. চ.

"কৃষি-বিজ্ঞান"—রায় রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রণীত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২৩৮ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা (?)।

এই পুস্তকে ১০৮ পৃষ্ঠাব্যাপী মোটামুটি উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে এবং ১৩০ পৃষ্ঠা ধরিয়া কৃষি-বিজ্ঞানের কতক কতক বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। যখন উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত বেশী আলোচনা করা হইয়াছে তখন এই পুস্তকের "কৃষি-বিজ্ঞান" নাম ঠিক হয় নাই। অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু ভূপালচন্দ্র বসু কৃষিবিভাগের এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃত-বিভাগের শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও সরকারী কৃষিবিভাগের শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার দেব বইখানি দেখিয়াও দিয়াছেন। তবুও এই পুস্তকে বানান ভুল আছে, সে সব শুদ্ধিপত্রের অন্তর্গত করা হয় নাই—যেমন "Thalophyte," "Pterydophyte," "Bacilus," "Nyrotaceae" প্রভৃতি। বানান ভুল পূর্ণ পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত করা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে লজ্জার কথা। ভারতবর্ষে প্রচলিত কতকগুলি উন্নততর লাঙ্গলের চিত্র যেখানে দেওয়া হইয়াছে, লাঙ্গলের বর্ণনা অনুযায়ী চিত্রগুলি সেখানে ঠিক পর পর সাজান নাই। মান্দ্রাজ প্রদেশে প্রচলিত "পাভার" নামক একটি বপন-যন্ত্রের নির্ম্মাণ-প্রণালী দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ঐ যন্ত্রের একটি চিত্র দিলে পাঠকদিগের বোঝা সোজা হইত। কয়েকটা জলসেচন-যন্ত্রের ব্যবহার-বিধির সঙ্গে উহাদের চিত্র দেওয়া উচিত ছিল।

ঐ পুস্তকের ভূমিকায় অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "এই ধরণের কোন পুস্তক বাংলা ভাষায় নাই।" বাংলা ভাষায় ইহা অপেক্ষা ভাল ও নির্ভুল বহু পুস্তক, যেমন মিঃ এন্‌, জি, মুখার্জি প্রণীত "সরল কৃষি-বিজ্ঞান," মূল্য ১৲ টাকা ও কৃষি-তত্ত্ববিৎ বাবু প্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত "কৃষি ক্ষেত্র" (সপ্তম সংস্করণ) মূল্য দেড় টাকা, "মৃত্তিকা তত্ত্ব" (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য দেড় টাকা, "উদ্ভিদ খাদ্য" মূল্য ॥৹ আনা, "উদ্ভিদ জীবন" মূল্য ॥৹ আনা প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীসত্যশরণ সিংহ

বাতায়ন—শ্রীউমা দেবী প্রণীত। ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা. এম-সি-সরকার এণ্ড সন্স-এর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

এখানি কবিতার বই। ইহাতে চল্লিশটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা আছে। পুস্তকখানি সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যে মনোহর করিতে যত্ন ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করা হয় নাই। মোটা বাদামী রঙের কাগজে নূতন পাইকা টাইপে লাল কালিতে পরিষ্কার ছাপা। মলাটে একখানি ছোট ছবি, বাতায়ন-পার্শ্বে এক তরুণী। স্বীকার করিতেছি বইখানি পড়িবার জন্য তুলিয়া লইবার সময় মন একটু দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এ নিশ্চয় আধুনিক নারী লিখিত আধুনিক কবিতা—ঝাঁঝালো ধারালো স্পষ্ট অসঙ্কোচ। যখনকার যা। বাঙ্গালী মেয়ের চিরন্তন সলজ্জ ভঙ্গীটি যদি কবিতা-রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াই থাকে, ত করিয়াছে, দুঃখ করিয়া লাভ কি? সত্য কথাটা কেমন করিয়া প্রিয়ভাবে বলা যায় তাহাই ভাবিতে ভাবিতে বইখানি পড়িতে বসিলাম। পড়িতে পড়িতে মন যে কখন এই ছোট কবিতাগুলির মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহা জানিতেও পারি নাই। এক একটি কবিতা যেন এক একটি করুণ ছোট গল্প, পড়া শেষ হইয়া গেলেও মনে হয় তার পর, তার পর। অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য নাই, শব্দের ঘটা নাই, ছন্দ মিলের আড়ম্বর নাই, তবুও এই চতুর্দ্দশপদীগুলির শান্তসমাহিত শ্রী মনকে মুগ্ধ করে। মানব-সম্পর্ক লইয়াই সকল কবিতার গৌরব। জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, দিনেকের হাসি-কান্নাই কাব্যের সম্পর্কে আসিয়া অমূল্য ও অসামান্য হইয়া উঠে। গয়লা মেয়ে, মজুর বউ, ভিখারী ছেলে, পীড়িত শিশু, বুড়া চাকর, ময়রা বধূ—এমনি সব পাত্র-পাত্রী। ইহাদের প্রতিদিবসের অতি সাধারণ সুখ-দুঃখ লেখিকার করুণা-কোমল দৃষ্টি এবং সরল কৌতূহলের ভিতর দিয়া দেখা দিয়াছে বলিয়াই সেগুলি আমাদের প্রাণকে এমন-ভাবে স্পর্শ করে। পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ লিখিত একটি ছোট ভূমিকা আছে।

রামপ্রসাদ—শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। চাতরা শীতলা হোমিও হোম হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

ধর্ম্মমূলক নাটক। ভক্ত সাধক রামপ্রসাদ নাটকের নায়ক। গ্রন্থকারের ভক্তি আছে। কিন্তু গ্রন্থে নাটকত্ব নাই।

আত্মসমর্পণ যোগ—শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত, এবং ২৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থকার সুলেখক। অতএব রচনা হিসাবে বইখানা ভালই হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকারের চিন্তা সকল স্থানে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা বলিতে পারি না। "এই সিদ্ধ জীবনের গোড়ার কথা—আত্মসমর্পণ। নীচের টানকে উপরে উঠাইয়া, উহা ভাগবত প্রবাহ-রূপে সৃষ্টি করার ইহা সিদ্ধ নীতি। সেইখানেই যদি চুরি হয়, অহংকার বাঁচিয়া যায়; তাহা হইলে আর নবজন্ম লাভের আশা কোথায়?"

টানকে উঠানো কি? জীবনকে ভগবানের দিকে প্রবাহিত করাই কি ভাগবত-প্রবাহ? 'টান' এবং 'প্রবাহে'র পরই 'চুরি'? এই ধরণের সাঙ্কেতিক রচনার দোষ এই, লেখার টানে চিন্তা ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। গ্রন্থলেখক বলিতে চান, ধর্ম্ম যুক্তি-তর্কের কথা নয়, উপলব্ধির বিষয়, এবং নিগূঢ় সাধনতত্ত্বের অধিকারী হইতে হইলে গুরুই একমাত্র সহায়। কথাটা আংশিকভাবে সত্য। জ্ঞান হইতে ধর্ম্মকে পৃথক করিলে, ধর্ম্ম অন্ধকার রহস্যবাদে পরিণত হয় মাত্র। গ্রন্থকার স্থানে স্থানে নিজের সাধনা ও ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই ছায়াময় ভাষা ও রচনাভঙ্গীর অন্তরালে সব কথাই রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ধর্ম্ম বিজ্ঞান—শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ৩৪ নং নিউ থিয়েটার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থকার যে একজন প্রবীণ চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহার পরিচয় পুস্তকের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। এ যুগে আমরা সত্যকে সর্ব্বত্র খণ্ডিত-ভাবে দেখিতে পাই, সেজন্য সত্যের অখণ্ড অবিরোধী রূপ আমাদের চোখে পড়ে না। অথচ সেই রূপটিরই ভিতর দিয়া সত্যের চিরন্তন মূর্ত্তি-পরিগ্রহ চলিতেছে—ব্যষ্টি সমষ্টিতে পরিণত হইতেছে। "দেশ কাল ও পাত্রভেদে মানবসমাজের কল্যাণের জন্য যুগে যুগে যে-সকল খণ্ডভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহারই সমবায়ে জগতে একটি অখণ্ড-ভাবের ক্রমবিকাশ হইতেছে"—এই গভীর তত্ত্বটি গ্রন্থকার পরিস্ফুট করিয়া এক বিশ্বজনীন "প্রেমপরিবার" গঠনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সকলে পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

ক. ন.

বুকের ভাষা—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস। ৪১।১।১ সি মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। পৃষ্ঠা ১১৫, মূল্য এক টাকা।

ছোট গল্পের বই, চৌদ্দটী গল্প আছে। গল্পগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, কতকগুলি রূপক শ্রেণীর Prose Poem, বাকীগুলির বিষয় বাস্তব জীবন। কয়েকটি গল্প সত্যই ভাল লাগিয়াছে, বিশেষ করিয়া 'শরতের স্বপ্ন' ও 'বাড়ীর বৌ'। শেষোক্ত চিত্রটিতে বাঙ্গালী সংসারের পতিপুত্রহীনা তরুণী বিধবার দৈনন্দিন জীবনের কঠোরতা কি সুন্দর ফুটিয়াছে। লেখকের হাত মিষ্ট বলিয়াই একটা কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করি। শেষের গল্পটিতে এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যেগুলি শ্লীলতা বজায় রাখিয়া সাহিত্যে ব্যবহার করা দুরূহ। শব্দগুলি বাদ দিলেও গল্পের আখ্যান-বস্তু ক্ষুণ্ণ হইত না। আশা করি পরবর্ত্তী সংস্করণে লেখক এদিকে দৃষ্টি রাখিবেন।

বিদ্যুৎ লেখা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। পৃষ্ঠা ২০৮। মূল্য দুই টাকা।

উপন্যাসখানির ভাষা বেশ ঝরঝরে, কিন্তু পড়িয়া তেমন আনন্দ পাইলাম না—তাহার প্রধান কারণ আগাগোড়া কৃত্রিম ঘটনা ও কৃত্রিম চরিত্র-সৃষ্টিতে বইখানি পরিপূর্ণ। পড়িতে পড়িতে মনে হয় জীবনের বাস্তবতার দিককে বাদ দিয়া একটা প্রচারের ঝোঁকে বাছিয়া বাছিয়া লেখক এমন কতকগুলি ঘটনা ও চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রচার-কার্য্যের পরিপোষক। মন হইতে এই unrealityর ভাবটকু কিছুতেই দূর হয় না। তারিণী রায়, শিবনাথ, বিজয়, সতীশ—ইহারা সকলেই প্রচার-কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য যতটুকু ও যে ধরণের কথাবার্ত্তা বলা প্রয়োজন, তাহা ছাড়া অন্য রকমের কথা কেহ বলে নাই। এই কৃত্রিমতার আবহাওয়ায় বইয়ের কোনো চরিত্রই তেমন ফুটিতে পারে নাই।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাইড্রোপ্যাথি বা জলচিকিৎসা—স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি-এল প্রণীত। ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০।এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে এন্-সি, ব্রাদার্স এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৬৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৹

লুই কুনে নামক একজন জার্ম্মান পণ্ডিত মাটী, জল, রৌদ্র অগ্নি ও হাওয়ার সাহায্যে যাবতীয় রোগ চিকিৎসার বিধান আবিষ্কার করিয়াছেন। জলের সাহায্যই সর্ব্বত্র অধিক পরিমাণে আবশ্যক বলিয়া উক্ত প্রণালীর নাম "জলচিকিৎসা" দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সুস্থ ও অসুস্থ শরীরের লক্ষণ, পাঞ্চভৌতিক দেহ ও তাহার সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব, মনুষ্যদেহের সহিত মাটীর, জলের, উত্তাপের, বায়ু ও ব্যোমের বিভিন্ন সম্বন্ধ, বিবিধ প্রকারের স্নান-প্রণালী, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সরল উপদেশ প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে কয়েকখানি আরোগ্য-সংবাদসহ "সার্টিফিকেট" এবং পুস্তকের ভিতরে প্রকাশকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত, ইংরেজী ও বাঙ্গালা দুইখানি সাময়িক পত্রিকারও বিজ্ঞাপন দেখা যায়।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সহিত বিজ্ঞাপনের বাহুল্য দেখিলে সমস্ত জিনিষটাকে "ব্যবসাদারী" বলিয়া মনে হয়। স্বভাব-চিকিৎসা সম্বন্ধে আমাদের অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই, পুস্তকখানিও লোকের কাছে আদৃত হইয়াছে ও হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়; কিন্তু এই দৃষ্টিকটু বিজ্ঞাপনগুলি আগামী সংস্করণে বর্জ্জিত হইলে পুস্তক-খানির বৈশিষ্ট্য বর্দ্ধিতই হইবে।

সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত পুস্তক

১। গুরু নানক—শ্রীরাখালদাস কাব্যানন্দ
২। শান্তির উপায়—শ্রীকেশবলাল সাধু
৩। শতদল—শ্রীভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য
৪। জগন্মাতা—শ্রীরুক্মিনী দেবী
৫। চকুলো—সীতানাথ ব্রহ্মচৌধুরী
৬। হৃদ্দাদার—রায় তারকনাথ সাধু বাহাদুর
৭। পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি
৮। কলরব—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
৯। রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ—শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য্য
১০। কাচ ও মণি—মৌলভী একরামদ্দিন
১১। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন
১২। শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্য জীবন—শ্রীমতিলাল রায়
১৩। পথের গান—মহীউদ্দীন
১৪। জীবনীকোষ—শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার
১৫। চায়ের ধোঁয়া—অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
১৬। আলোর পাহাড়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন
১৭। কালুসর্দ্দার— ঐ
১৮। বিবর বিভব—শ্রীপঞ্চানন মিত্র

বিদায়ের অর্ঘ্য

শ্রীকামিনী রায়

[পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া রচিত, কিন্তু রচয়িত্রীর নিজের অসুস্থতা ও স্থানান্তর গমন বশতঃ ইহা যথাকালে যথাস্থানে নিবেদিত হইতে পারে নাই।]

হে পূতচরিত বন্ধু, হে ভ্রাতৃপ্রতিম হিতকারী,
চির-নিরলস কর্ম্মী, জ্ঞানের তপস্বী, ব্রহ্মচারী,
তোমার জীবনসূর্য্য দ্রুত যবে নামে অস্তাচলে
নিভৃত হৃদয়ে মোর কত স্মৃতি নীরবে উথলে।
কত শ্রদ্ধা দিনে দিনে এ অন্তরে লভিয়াছে ঠাঁই ;
কত কৃতজ্ঞতা, যারে জানাইতে ভাষা মিলে নাই ;
কত না বিস্ময় হেরি ভগ্নদেহে অজেয় উদ্যম
তেজস্বী আত্মার তব। জ্ঞানার্জ্জনে করিয়াছ শ্রম
জ্ঞানের আনন্দ লাগি। নানা দ্বন্দ্ব কোলাহল মাঝে
অক্ষুণ্ণ রেখেছ নিত্য চিন্তায়, কথায়, সর্ব্বকাজে
অন্তরে স্বাধীনতা। কাহারেও কর নাই ভয়,
স্নেহ বাঁধে নাই মোহে ; অন্ধ ভক্তি, অযথা সংশয়
প্রোজ্জ্বল মানস দীপ পারে নাই করিতে মলিন
অথবা নির্ব্বাণ। তুমি ক্ষুরধার পথে চিরদিন
চলিয়াছ অবহিত, দিয়া সেবা, বিলাইয়া স্নেহ
বিপন্ন পথিকে—তাও দূর হতে জানে নাই কেহ ;
যারে দেছ তার কাছে প্রতি-দান চাহ নাই কভু
নির্ম্মুক্ত ভাণ্ডার তব ভরিতেন জীবনের প্রভু।

নাহি পত্নী, নাহি পুত্র, তথাপি নিঃসঙ্গ নাহি ছিলে,
দেহী ও বিদেহী ঋষি, স্বদেশী, বিদেশী সাধু মিলে'
দিয়াছেন পুণ্য সঙ্গ। গেহে তীর্থ করিয়া স্থাপন
ধ্যানে অধ্যয়নে কত দূরস্থেরে করেছ আপন।

গোধূলি রাগিণী
শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সিদ্ধতপা ত্যজি তব পরিচিত এই তপোভূমি,
চক্ষুর না-দেখা পথে ঊর্দ্ধলোকে চলিয়াছ তুমি,
যেথায় সুকৃতি আর ভক্তি, জ্ঞান-বিশোধিতা, তব
রচিয়াছে তোমা তরে সাধনার ক্ষেত্র অভিনব।

হেথাকার শেষ দিনে পশ্চাতে চাহিয়া, অশ্রুজল
জানি ঝরিবে না তব; চিত্ত মম না হোক্ চঞ্চল
তোমারে বিদায় দিতে। তোমারে যে জানিয়াছি, তাই
দুর্ল্লভ সৌভাগ্য মানি, আর দেখা পাই কি না পাই।
তোমারে জেনেছে যারা, ছিল যারা তব স্নেহভাগী
অনিন্দ্য তোমার স্মৃতি তাদের অন্তরে রবে জানি।
তোমার জীবনসূর্য্য দ্রুত যবে নামে অস্তাচলে
কল্যাণকামনা তব বার বার এ হৃদে উথলে।
মাতার বাৎসল্য আর ভগিনীর স্নেহ, শ্রদ্ধা দিয়া
বিদায়ের অর্ঘ্য এই আজ, বন্ধু, এনেছি রচিয়া।

কলিকাতা, ৯ই জুন ১৯৩০।

হালামদের কথা

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

হালামরা সাধারণতঃ শ্রীহট্টজেলার দক্ষিণ অংশে লুশাই পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য স্থানসমূহে বাস করে। ইহারা পার্ব্বত্য টিপরা জাতির শাখা-বিশেষ। ইহাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সবই অদ্ভুত। বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালীদের সংস্পর্শে আসায় ইহারা কতকটা সভ্য হইয়াছে এবং নিজেদের প্রথাগুলি ক্রমশ পরিত্যাগ করিতেছে।

হালামরা ছোট ছোট পাহাড় বা টীলার উপর বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। উঁচু বাঁশের মাচার উপর বাড়ীগুলি তৈয়ারী। ধাপ-কাটা গাছের গুঁড়িতে প্রস্তুত সিঁড়ি বাহিয়া ঘরের বারান্দায় উঠিতে হয়। ঘরের ছাদ বাঁশ ও একরকম পাতায় ছাওয়া। প্রত্যেক হালামের বাড়ীতে একখানামাত্র ঘর থাকে। উহার একদিকে রন্ধনশালা এবং আর একদিকে পরিবারস্থ সকলের শুইবার স্থান। মাচার নীচে শূকর কুক্কুট প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষীর আস্তানা।

হালাম-পুরুষেরা সকলেই ধুতি ও জামা পরিধান করে। স্ত্রীলোকেরা একখানা পাচ হাত ধুতি বুকের কাছে গেরো দিয়া পরে এবং আর একখানা ছোট চাদর কটিতে জড়াইয়া রাখে, কেউ কেউ লম্বা হাতাওয়ালা একরকম

কোর্ত্তাও গায়ে দেয়। বয়স্কা নারীরা হাটে সওদা করিতে যাইবার কালে মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া থাকে।

অলঙ্কারের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ইহাদের কর্ণভূষণ। হালাম নারীদের এক এক কানে দুইটা করিয়া ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। কানের উপরদিককার ছিদ্রটি ছোট, কিন্তু তেলোর ছিদ্রটি মস্ত বড়। রূপা দস্তা অথবা টিনের তৈয়ারী একটা অলঙ্কার কানের উপরিভাগে পরানো থাকে আর তেলোর ছিদ্রের ভিতর আন্দাজ দুই ইঞ্চি ব্যাসের একটা গোল রূপার চাক্‌তি পরানো থাকে। এই গহনাগুলির দরুণ হালাম নারীদের কানগুলি ভারী বিশ্রী দেখায়। প্রত্যেক হালাম নারীই রূপার তৈরী একপ্রকার হার এবং কাঁচ, গিল্টি,কুঁচ ইত্যাদির মালা গলায় পরে। অবস্থাপন্ন নারীরা টাকা আধুলি এবং সিকিতে কোঁড়া বসাইয়া হাররূপে গলায় পরিয়া থাকে। বাহুতে কোনো গহনা পরিবার রেওয়াজ ইহাদের নাই। ইহারা কেশে এবং কর্ণভূষণে বনফুল পরিতে বড়ই ভালবাসে। যুবতীরা বনফুল দিয়া একে অপরের কেশবিন্যাস করিয়া দেয়। হালাম-পুরুষদের কানে পিতলের অঙ্গুরীয় এবং গলায় তুলসীর মালা।

হালাম স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা সকলেই মদ্য এবং ধূমপানে আসক্ত। ইহাদের হুঁকাগুলি অদ্ভুত ধরণের। মোটা একটা বাঁশের চোঙের ফুটার মধ্যে সরু আর একটি চোঙ বসানো থাকে। ঐ ছোট চোঙটির উপর কলিকা বসাইয়া তাহারা ধূম পান করে।

ভাত পচাইয়া ইহারা মদ তৈয়ার করে। পালা করিয়া এক একদিন এক এক বাড়ীতে মদ প্রস্তুত হয়। বাড়ীর উঠানের মধ্যে মদ্যপূর্ণ বড় বড় মৃৎপাত্র বসানো থাকে এবং স্ত্রী-পুরুষ সকলে সেগুলার চারিদিকে মণ্ডলাকারে বসে ও একটা সরু বাঁশের নল মৃৎপাত্রের ভিতর ঢুকাইয়া মদ্যপান করে। মদ খাইবার সময় কথা বলা কিংবা বাঁ হাত দিয়া নল ছোঁয়া ইহারা মহা দূষণীয় বলিয়া মনে করে। কচি কচি ছেলে মেয়েদের পর্য্যন্ত মদ্যপান এবং ধূমপান করিতে দেখা যায়।

শূকর এবং কুক্কুটমাংস ইহাদের অতি প্রিয় খাদ্য। কলাগাছ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া বেত ও মরিচচূর্ণ সংযোগে ইহারা এক অপূর্ব্ব ব্যঞ্জন তৈয়ার করে। ইহারা কাঁচা মাংস মরিচচূর্ণের সহিত ছেঁচিয়া এবং আগুনে পোড়াইয়া খাইতে খুব ভালবাসে। খাওয়ার পর কাহারও পাতে কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে পরিবেশনকারিণী তাহা তুলিয়া লইয়া যায় এবং অপরকে তাহা পরিবেশন করে। খাওয়া-দাওয়া চুকিলে একখানা কাপড় দিয়া উচ্ছিষ্ট ঝাড়িয়া মাচার নীচে ফেলিয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে খাওয়ার পর আঁচাইবার রেওয়াজ নাই।

হালাম যুবক-যুবতীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা প্রচলিত আছে। বিবাহের আগেই যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রণয় হইয়া থাকে। গভীর রজনীতে বাড়ীর সকলে নিদ্রিত হইলে পর প্রণয়ীরা নিজ নিজ প্রণয়িনীর সহিত দেখা করে। আগেকার দিনে হালাম যুবকেরা মাথায় দীর্ঘ কেশ রাখিত। তখন প্রণয়িনীরা বাঁশের কাঁকই দিয়া তাহাদের মাথার চুল আঁচড়াইয়া খোঁপা বাঁধিয়া দিত। বিবাহের আগে বরকে কনের বাপের বাড়ীতে পাঁচ বছর জন খাটিতে হয়। এই পাঁচ বছর বর কনে স্বামী-স্ত্রীর মত একত্রে বাস করে। খাটুনির মিয়াদ ফুরাইলে বরের পিতা মদ্য সহ (কমপক্ষে বারো কলস) কনের পিতার বাড়ীতে আসিয়া হাজির হয়। সেখানে সকলে মিলিয়া মদ্যপান করে। মদ্য-পাত্রসমূহের নিকটে একটা থালার উপর কিছু তুলা বিছানো থাকে। কনের জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় ভাইরা ইচ্ছামত টাকা, আধুলি সিকি ইত্যাদি ঐ থালার উপর রাখে—এ সমস্ত কনের প্রাপ্য। কনের বাপের বাড়ী হইতে বরকনেকে একসঙ্গে কনের মামার বাড়ীতে যাইয়া কিছুক্ষণ থাকিতে হয়। তারপর বরের বাপ বরকনেকে লইয়া বাড়ীতে চলিয়া আসে। বিবাহের পর সাতদিন পর্য্যন্ত কনের পক্ষের বাপের বাড়ীর কাহারও মুখদর্শন করা না কি মহাপাপ।

বর জন খাটিতে রাজি না হইলে কনের পিতাকে ষাট টাকা পণ দিতে হয়। মেয়ের অমত থাকিলে বাপ মা জোরজবরদস্তি করিয়া তাহার বিবাহ দিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে সময় সময় বিবাহচ্ছেদ হইয়া থাকে। পরস্পরের মনোমালিন্যের দরুণ স্ত্রী যদি স্বামীর ঘর ছাড়িয়া

চলিয়া আসে, তাহা হইলে স্বামীর নিকট সে ষাট টাকা দাবী করিতে পারে।

অন্যান্য পাহাড়ী জাতির মত ইহারাও জুম কৃষি করে। প্রথমে পাহাড়ের উপরকার জঙ্গল পোড়াইয়া দা দিয়া মাটি কোপাইয়া হরেক রকম তরিতরকারীর বীজ একসঙ্গে বপন করে। তারপর প্রথম বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই ধান্য রোপণ করে। ধান্য এবং কার্পাস ইহাদের প্রধান উৎপন্নদ্রব্য। পাহাড়ের উপর প্রত্যেকেরই এক একখানা করিয়া ছোট ঘর থাকে। সেগুলিতে তাহারা ধান্যাদি গোলাজাত করিয়া রাখে।

হালাম নারীরা খুব পরিশ্রমী। কৃষিকার্য্য হাট বাজার ইত্যাদি বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকেরাই করে। ইহাদের মধ্যে 'জুমের গান' নামক একশ্রেণীর সঙ্গীত প্রচলিত আছে। ক্ষেত্রে কাজ করিবার সময় স্ত্রীলোকেরা সুর করিয়া জুমের গান গাহিয়া থাকে।

পোষাক-পরিচ্ছদ কিংবা ঘর-গৃহস্থালীর দরকারী আসবাবাদির জন্য ইহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না। প্রত্যেক হালামের বাড়ীতেই চরকা ও তাঁত আছে। নিজেদের আবশ্যক বস্ত্রাদি হালাম-নারীরা নিজেরাই বুনিয়া থাকে। সূচীশিল্পেও ইহাদের অসাধারণ দক্ষতা আছে। হালাম-নারীরা এক মুহূর্ত্তও আলস্যে অতিবাহিত করে না।

বাঁশ ইহাদের বিশেষ একটি দরকারী জিনিষ। বাঁশ হইতে বেত তুলিয়া তাহা দ্বারা ইহারা এক ধরণের টুক্রি তৈয়ারী করে। সেগুলিকে বলে 'চাম্পুই'। ওগুলিতে তরিতরকারী ভরিয়া লইয়া হালাম নারীরা বাজারে বিক্রয় করিতে যায়। মাতুর, দোলনা, কাঁকই ইত্যাদি আরও নানা জিনিষ ইহারা বাঁশ দিয়া তৈয়ার করে।

প্রত্যেক হালাম বস্তীতেই একজন 'গালিম' বা গ্রাম-প্রধান এবং তাহার একজন সহকারী থাকে। গালিমের সহকারীকে 'গাবুর' বলা হয়। গ্রামের লোকদের ছোটখাটো অপরাধের বিচার ইহারাই করিয়া থাকে। গ্রামের মাতব্বরদের সম্মতি ছাড়া কিন্তু ইহারা কাহাকেও দণ্ড দিতে পারে না। 'গালিম' ও 'গাবুর' কোনো সামাজিক অপরাধ করিলে গ্রামবাসীরা সকলে একমত হইয়া তাহাদের জরিমানা করিতে পারে।

হালামরা ভূতপ্রেত এবং উপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। ইহাদের ভিতর কতকগুলি কুসংস্কার প্রচলিত আছে। কাহারও ব্যারাম হইলে ইহারা মনে করে যে, রোগাক্রান্ত লোকটির উপর ভূতের আবেশ হইয়াছে। তাই, ভূত ছাড়াইবার জন্য ওঝাকে ডাকাইয়া আনা হয়। ওঝাকে ইহারা 'অচাই' বলে। 'অচাই' আসিয়া রোগীর নাড়ী টিপিয়া বলে যে, তাহার উপর অমুক ভূতের আবেশ হইয়াছে এবং ভূত তাহার নিকট অমুক জিনিষ চাহিতেছে, 'অচাই'র কথামত ভূতকে তাহার প্রার্থিত জিনিষ দেওয়া হয়, একবারে ফল না হইলে, তিন তিনবার ওরূপ করা হয়।

তিন বছর বয়সের সময় ছেলেমেয়েদের কর্ণবেধ করা হইয়া থাকে; কর্ণবেধের সময় গুরুজনেরা তাহাদিগকে চরকায় কাটা সুতা ও চাউল মাথায় দিয়া ও মুখে একটু নুন দিয়া আশীর্ব্বাদ করে।

কেহ মরিলে পর ইহারা কতকগুলি ঝাঁঝ বাজাইয়া প্রতিবেশীদিগকে জানায়। তখন প্রতিবেশীরা স্ত্রী-পুরুষ সকলে মৃতব্যক্তির বাড়ীতে আসিয়া জমায়েৎ হয়। মেয়েরা সকলেই আঁচল ভরিয়া ফুল লইয়া আসে, শবদেহটিকে গরম জলে স্নান করাইয়া নূতন কাপড়-চোপড় পরাইয়া ঘরের ভিতর শোয়াইয়া রাখা হয় এবং দুইটি টাকা দিয়া তাহার দুই চোখ, ও লাল রঙের সুতা দিয়া মুখের ছিদ্র, ঢাকিয়া দেওয়া হয়; মেয়েরা সকলে মিলিয়া শবদেহটিকে ফুল দিয়া সাজায় এবং নিজেরাও কানে ফুলের দুল পরে। বয়স্কা নারীরা বিড়বিড় করিয়া কতকগুলি কথা আওড়াইয়া মৃতদেহটির উপর পানসুপারি রাখে, তার পর শবদেহটির নিকট প্রণতি করিয়া স্ত্রীপুরুষ পরস্পর পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলা ঝাঁঝ ও ঢোলক বাজিতে থাকে এবং স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিকা সকলে মিলিয়া মদ্যপান সুরু করে, নৃত্য শেষ হইলে একজন বয়স্কা নারী সকলের মাথায় কিছু কিছু তেল মাখাইয়া দেয়।

এই সমস্ত অনুষ্ঠান সমাধা হইলে শবদেহটিকে আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া আনা হয় এবং বাঁশের তৈরি সুন্দর শবাধারে স্থাপিত করিয়া দাহ করিবার জন্য নিবিড় জঙ্গলের ভিতর নদীতীরস্থ সৎকারভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়। স্ত্রীলোকেরা টুকরিতে করিয়া মদ্য, পুষ্প, ভাত-সিদ্ধ-করা কুক্কুটমাংস, কদলী, পান-সুপারি এবং একটি জীবন্ত কুক্কুটশাবক লইয়া শবের অনুগমন করে, দাহকার্য্য সমাধা হইলে মদ্য এবং কুক্কুট-মাংসাদি মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া সৎকার-ভূমিতে রাখিয়া দেওয়া হয় এবং কুক্কুটশাবকটিকে সে জায়গায় ছাড়িয়া দেওয়া হয় ও একটি গাছের ডাল মাটিতে পুঁতিয়া তাহাতে মৃতব্যক্তির 'চাম্পুই' এবং একটি পাখা বাঁধিয়া রাখা হয়। সৎকারান্তে বাড়ী ফিরিবার সময় সকলকেই একরকম গাছের ডাল ভাঙিয়া বাঁ হাতে করিয়া লইতে হয়, শেষে একই জায়গায় সবাইকে সেগুলি ফেলিয়া দিতে হয়।

পরদিন মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে পূজা হয় এবং 'অচাই' তুলসীর জল ছিটাইয়া ঘর শুদ্ধ করে।

ইহাদের বিশ্বাস মৃতব্যক্তি চিল কিংবা ঘুঘুপাখীর উপর চড়িয়া স্বর্গে যায় এবং সেখানে তার পাপপুণ্যের বিচার হয়।

কলেরা রোগে কাহারও মৃত্যু হইলে হালামরা তাহার মৃতদেহ দাহ করে না—কপালে আগুন ছোঁয়াইয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলে।

ইহারা বহু দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। তন্মধ্যে 'তুইরেংপা', 'তুইতুংপা', 'শিবরাই' প্রভৃতি প্রধান। তা ছাড়া ভূতপ্রেত এবং উপদেবতাদির পূজাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, ভূতপ্রেতাদির পূজা উপলক্ষ্যে ইহারা শূকর বলি দেয়।

'থলাইরই' পূজা ইহাদের সকলের চেয়ে বড় পূজা। হালামরা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমভাগে এই পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের মতে অগ্রহায়ণ মাস বৎসরের প্রথম মাস।

বাড়ীর উঠানের মধ্যে থানিকটা জায়গা সাফ্ করিয়া লইয়া কতকগুলি বংশখণ্ড মাটিতে পুঁতিয়া সেগুলির গায়ে আড়াআড়িভাবে আরও কতকগুলি বংশখণ্ড বাঁধিয়া রাখা হয় এবং ওগুলার উপর থানকতক তাঁতে-তৈরি কাপড় বিছাইয়া রাখা হয়। বাঁশগুলির গায়ে গুটিকতক সূক্ষ্মাগ্র মদ্যপূর্ণ বংশখণ্ড হেলান দেওয়া থাকে। বাঁশগুলিকে ইহারা চাঁচিয়া ছুলিয়া খুব সুন্দর করিয়া রাখে। 'অচাই' ফুল-পাতা-বাঁধা একগাছি চরকায়-কাটা লম্বা সুতা মাথায় জড়াইয়া বিড়-বিড় করিয়া মন্ত্র আওড়াইতে থাকে এবং এক একটি বাঁশ কাটিয়া ভিতরকার মদ মৃত্তিকায় প্রোথিত বংশখণ্ডগুলির উপর ঢালিয়া দেয়। 'অচাই'র সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন মাথায় সুতা বাঁধিয়া পূজাস্থানের নিকটে ঘুরিতে থাকে।

বংশখণ্ডগুলির সাম্‌নে একখানা পাতায় কিছু চাল রাখিয়া দেওয়া হয় ইহাই তাহাদের নৈবেদ্য। 'অচাই' এই নৈবেদ্যের উপর কুক্কুট বলি দেয়। পূজা শেষ হইলে, চাল এবং কুক্কুটের রক্ত একত্র করিয়া মাখানো হয়। এই পূজা উপলক্ষ্যে আন্দাজ পঁচিশ ত্রিশটা কুক্কুট বলি দেওয়া হয়। পূজাস্থানের নিকটেই একটা কড়াইয়ে কুক্কুটগুলা সিদ্ধ হইতে থাকে।

বাহিরের অনুষ্ঠানাদি শেষ হইলে 'অচাই' দা-হাতে ঘরের ভিতরে আসিয়া ঢোকে, মেঝের উপর তণ্ডুলপূর্ণ একটি মৃৎপাত্র বসানো থাকে, এই পাত্রটির কাছে কিছু তুলাও বিছানো থাকে। এখানে কুক্কুটগুলিকে অবিকল মুসলমানদের মত জবাই করা হয়। 'অচাই' প্রথমে কুক্কুটগুলির গলার অর্দ্ধেক কাটিয়া ফেলে, তারপর কুক্কুট রক্ত দ্বারা তুলা ভিজাইয়া লয় এবং একটা পাত্রে খানিকটা রক্ত রাখিয়া দেয়। শেষে দা-দিয়া কুক্কুটগুলির পেট ফুঁড়িয়া ভিতরে কিছু জল ঢালিয়া দেয় এবং নাড়ি-ভুঁড়ি টানিয়া বাহির করে।

এর পর দুইটি মদ্যপূর্ণ মৃৎপাত্রের সাম্‌নেও কুক্কুট জবাই করা হয়। তখন সকলে সার বাঁধিয়া বসে এবং একজন একটি বংশখণ্ড উপুড় করিয়া প্রত্যেকের হাতে একটু একটু মদ ঢালিয়া দেয়। ওই মদ প্রথমে মাথায় ঠেকাইয়া শেষে খাইতে হয়। অতঃপর সকলকে এক এক পাত্র মদ দেওয়া হয়। তখন সকলে সমস্বরে

বলিয়া উঠে 'চুবাই' 'চুবাই' (নমস্কার নমস্কার) এবং মদ্য পান করে। মদ্যপান শেষ হইলে একটি যুবতী সকলকে পান পরিবেশন করে।

যাহার বাড়ীতে পূজা সে সেইদিন গ্রামের লোকদের এক বিরাট ভোজ দেয়। দ্বিপ্রহরে খাওয়া-দাওয়ার পর মদ্যপান স্থুরু হয় এবং পরদিন দুপুর রাত পর্য্যন্ত পূরাদমে মদ খাওয়া চলিতে থাকে।

পূজার পরদিন ইহাদের নাচিবার পালা। প্রথমে 'গালিম' মাথায় একটি পাগড়ী বাঁধিয়া বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাচিতে আরম্ভ করে। অপর দুই ব্যক্তি দুইটি বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে থাকে এবং সকলে মিলিয়া বিষম হল্লা জুড়িয়া দেয়। গালিমের নৃত্য শেষ হইলে অচাইকে নাচিতে হয়। অচাই'র সঙ্গে এক বুড়ী একখানা রঙীন কাপড় ওড়নার মত কাঁধের উপর ফেলিয়া নৃত্য করে। বছরিপূজার সময় যুবতীদের নাচিবার রেওয়াজ নাই, কিন্তু অন্যান্য পূজাপার্ব্ব উপলক্ষ্যে যুবতীরা নৃত্য করিয়া থাকে।

প্রত্যেক হালাম বস্তীতে সর্ব্বসাধারণের পূজার জন্য নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটি ঘর থাকে। সেইটির নাম 'বারেইন'। সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া ঐ ঘর তৈয়ার করে। ফাল্গুন মাসে হালামরা 'বারেইনে'র চারিধারের জঙ্গল সাফ করে এবং ঘরের ভিটার মাটি কাটিয়া কতকগুলি ঢিবি তৈরি করে এবং সেগুলির গায় তুলা এবং চরকায় কাটা সুতা বাঁধিয়া রাখে।

হালামদের সবগুলি পূজার অনুষ্ঠানাদি অবিকল একই ধরণের। তবে কোনো কোনো পূজায় একটু আধটু ইতরবিশেষ যে নাই তেমন নহে। আজকাল হিন্দুদের অনেক পূজা-পদ্ধতি ইহারা গ্রহণ করিতেছে।

দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৭) বলিদ্বীপ—কারাঙ্-আসেম

পদণ্ডদের সঙ্গে আমার আজকে বেশ আলাপ জ'ম্‌ল। কবি বড়ই অসুস্থ বোধ ক'রছিলেন, একটু বিশ্রাম করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। কারাঙ্-আসেমে গুমট আর লোকজনের ভীড় তাঁর পক্ষে অস্বস্তিকর হ'য়ে প'ড়ছিল। এদেশে ডচেরা আধুনিক সুবিধা সব এনেছে, খালি আনেনি বিজলীর পাখা। আমাদের মধ্যে স্থির হ'ল, কারাঙ-আসেমে তাঁর অবস্থানকে সংক্ষেপ ক'রে দুই এক দিনের ভিতর তাঁকে কোনও নির্জ্জন পাহাড়ে' জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে।

রাজবাড়ীর উঠানের ছতরীওলা উঁচু চত্বরে ব'সে পদণ্ড কয়জনের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হ'ল। আরও দু তিন জন পদণ্ড আর অন্য বলিদ্বীপীয় ব্যক্তি এলেন। দ্রেউএস দোভাষীর কাজ ক'রতে লাগলেন। এদের সঙ্গে কথা ক'য়ে একটা জিনিস শুন্‌লুম—অল্প স্বল্প দু চার জন নিম্ন শ্রেণীর লোক মুসলমান হ'য়ে যাচ্ছে। আরব ব্যবসায়ীরা আর অন্য মুসলমানেরা স্থানীয় নিম্ন শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে স্থায়ী বা অস্থায়ী বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়, আর তাদের সম্পর্কের দু চারজন লোক এদের প্রভাবে প'ড়ে মুসলমান হ'য়ে যায়। উচ্চ শ্রেণীর লোকে এই ব্যাপারকে উপেক্ষার চক্ষে দেখে, এইমাত্র; প্রতীকারের চেষ্টা করে না। চার পাঁচ কোটি যবদ্বীপীয় আর অন্য মুসলমানদের মধ্যে মুষ্টিমেয়—দশলাখ মাত্র—বলিদ্বীপীয়দের সকলেই যে পৈতৃক ধর্ম্মে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকবে, তা সম্ভব নয়। পদণ্ডদের মধ্যে দেখলুম, কেউ কেউ এ বিষয়ে উদাসীন, ঠিক ভারতবর্ষের সাধারণ হিন্দুর মতন। একজন ব'ল্‌লেন, ধর্ম্ম তো সবই এক, আর মুসলমান হ'লেও এরা ঈশ্বরের নাম করে।

আবার দু চার জনকে এ সম্বন্ধে একটু সচেতও দেখলুম ; তাঁদের ইচ্ছা, সাধারণ্যে হিন্দু ধর্ম্মের উচ্চ চিন্তা আর ভাবগুলি প্রকাশ হয় ; কি ক'রে তা করা যায়, সে সম্বন্ধেও কেউ কেউ আমায় প্রশ্ন ক'রলেন। রাজা স্বয়ং এবিষয়ে খুব উৎসাহী। বলিদ্বীপ আগেকার মতন আর বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারছে না, কালধর্ম্মের প্রভাবে বাইরের জগতের সঙ্গে বলিদ্বীপের অধিবাসীদের মিশতে হবে ; এ ক্ষেত্রে জাতীয় সংস্কৃতি আর ধর্ম্ম থেকে কতটা শক্তি পাওয়া যাব, সে বিষয়ে বলিদ্বীপের অভিজাতজনগণ যে একটু চিন্তা ক'রতে আরম্ভ ক'রছেন, তার আভাস আমরা কিছু কিছু পেয়েছিলুম।

পদণ্ডদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু ব'লতে হ'ল। এদের জানা পৌরাণিক নাম সব আমি জানি, পৌরাণিক কাহিনী দু'চারটেও এদের সঙ্গে মিল্‌ল - এ দেখে এঁরা একটু হতভম্ব হ'য়ে গেলেন। সুদূর ভারত থেকে সুপ্রাচীন যুগে এঁদের ধর্ম্ম এসেছে, এ কথা এঁদের মনে যেন প্রথম প্রতিভাত হ'ল। কাগজে ম্যাপ এঁকে ভারতবর্ষের সংস্থান আর যবদ্বীপের সঙ্গে ভারতের যোগের পথ বুঝিয়ে দিলুম। পদণ্ডেরা মাথা নেড়ে নেড়ে দেশভাষায় এই সব বিষয়ে আপসে তুমুল আলোচনা ক'রে দিলেন।

এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। রাজার ওখানেই মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা হ'ল। ঠিক ছিল, আহারের পরে পাসাঙ্গাহান থেকে আমার ছবি বইটই আর ভারতবর্ষ থেকে পূজার তৈজসপত্রাদি যা এনেছি তা নিয়ে এসে পদণ্ডদের দেখাবো—রাজাও দেখবেন। আহার মিশ্র ডচ্-যবদ্বীপীয়-বলিদ্বীপীয় ধরণেই হ'ল। দুজন অভ্যাগত এলেন—Coen 'কুন' নামে একখানি জাহাজ বলিদ্বীপ হ'য়ে বলিদ্বীপের পাশের লম্বক-দ্বীপে যাচ্ছে, তার কাপ্তেন আর প্রথম অফিসার, রাজার সঙ্গে পরিচয় আছে, এঁদের জাহাজ বুলেলেঙ-এ একদিন থাক্‌বে, এঁরা সেই ফুরসতে একটু বেড়িয়ে যাচ্ছেন।

বিকালে 'সাদো' গাড়ী করে পাসাঙ্গ্রাহান থেকে আমার পূজার জিনিস আর লাণ্টার্ণ-স্লাইড আর বই-টই নিয়ে এলুম। যবদ্বীপ-বলিদ্বীপ যাত্রার সময় আমার প্রস্তাব-মত ক'লকাতার হিন্দু-মিশনের প্রতিষ্ঠাতা আর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত স্বামী সত্যানন্দ আমার পূজার সমস্ত বাসন-কোসন এক প্রস্থ কিনে দেন। এইগুলি,—আর সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলুম একখানা 'পুরোহিত-দর্পণ' আর অন্য আনুষ্ঠানিক পুস্তক—এই সমস্ত বেশ কাজে লেগেছিল। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমার ভারতের দেবমূর্ত্তি আর মন্দিরের আর ভারতীয় কলা সম্বন্ধীয় স্লাইড-চিত্র অনেকগুলি দিয়েছিলেন, যদি কোথাও লাণ্টার্ণ-সহযোগে বক্তৃতা দিই। বলিদ্বীপে লাণ্টার্ণ পাওয়া যায় নি—এখানে খালি স্লাইডই দেখানো গেল। রাজা পদণ্ডদের নিয়ে সেই ছতরীযুক্ত চত্বরে এসে ব'সলেন; কোপ্যারব্যার্গ দ্রেউএস্‌ও রইলেন। ইতিমধ্যে বাজারের গুজরাটী কাপড়ওয়ালারা কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এল। এদের সঙ্গে আমি হিন্দীতে কথা কইলুম, দ্রেউএস্ মালাইয়ে আলাপ ক'রলেন, খানিক পরে এরা চ'লে গেল। বিকালে কবিকে একটু হাওয়া খাইয়ে আনবার জন্য রাজা তাঁর মোটরে ক'রে পাঠিয়ে দিলেন। একটু দূরে সমুদ্রের ধারে Oedjoen উজুন্ ব'লে একটি জায়গায় রাজার এক বাগান আছে, সেখানে তাঁকে নিয়ে গেল। রাজা র'য়ে গেলেন। আমাকে ব'সে ব'সে আমাদের দেশের প্রচলিত পূজার অনুষ্ঠান সব দেখাতে হ'ল। আচমন থেকে সাধারণ পূজোর সব কর্ত্তব্যগুলি ব্যাখ্যা ক'রে ক'রে ব'লতে লাগলুম। এদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে উপবীত-ধারণের নিয়ম নেই। আমার পইতে দেখাতে হ'ল—এঁরা বলিলেন হাঁ, 'সস্‌ট্রা' বা শাস্ত্র-গ্রন্থে 'ইয়াজ্ঞোপাউঙ্গ্টা' বা যজ্ঞোপবীতের কথা আছে বটে, কিন্তু সে আগে 'রেসি' বা ঋষিরা তো প'রতেন। পূজার অনুষ্ঠান এঁরা তো বেশ নিবিষ্ট চিত্তে নানা প্রশ্ন সহকারে দেখ্‌তে লাগলেন, কতক কতক বিষয়ে এঁদের সঙ্গে মিল আছে ব'ললেন, আর বাকী জিনিস এদের কাছে অজ্ঞাত। 'পূজা' শব্দটী এঁরা ব্যবহার করেন না, বলেন 'ডেউ-অর্-চ-ানো' বা 'দেবার্চ্চনা'। এরা তারপরে নানা বিষয়ে প্রশ্ন ক'রতে লাগলেন। পদণ্ডদের বেশীর ভাগ প্রশ্ন হ'ল, মৃতের সৎকার, অন্ত্যেষ্টি-বিধি, শ্রাদ্ধ, এই সব নিয়ে। অশৌচ-বিষয়ে ব্রাহ্মণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের বারো দিন, বৈশ্যের পনেরো দিন,

বিধি আমাদের দেশে আছে আর তা তাঁদের দেশের বিধির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে দেখে, খুব যেন খুশী হ'য়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা ব'লতে লাগলেন। রাজা প্রশ্ন ক'রলেন, —জাতিভেদ, অসবর্ণ বিবাহ, সামাজিক রীতি-নীতি (যেমন বড়োভাইকে 'দাদা'র মতন সম্মানসূচক শব্দে সম্বোধন করা, বয়সে বড়ো ভাইপোর বয়সে ছোটো খুড়োকে প্রণাম করা উচিত কিনা) ইত্যাদি গুরু লঘু নানা বিষয়ে। আমি লণ্টার্ণের স্লাইড একে একে আলোর দিকে ধ'রে দেখাতে লাগলুম—স্লাইডগুলি হাতে হাতে ঘুরতে লাগ্‌ল—উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের বিরাট শিব আর বিষ্ণুর মন্দির, আর এদেশেও পূজিত নানা দেবতার মূর্ত্তি, এসব দেখাতে লাগলুম। এঁরা বেশ চমৎকৃত হয়ে দেখতে লাগলেন। আমিও মাঝে মাঝে এদেশের রীতি-নীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রতে লাগলুম। এইরূপে কথায় কথায় সন্ধ্যে হ'য়ে এলো। তখন আমাদের আলোচনা-সভা ভঙ্গ হ'ল। রাজা সব শেষে একটী প্রশ্ন ক'রলেন,—দেবতা, মন্দির, দেবার্চ্চনা, শ্রাদ্ধ, সদাচার, সামাজিক রীতি-নীতি পালন, এ সব তো বাহ্য অনুষ্ঠান, এ তো মানুষের জীবনের চরম উদ্দেশ্য হ'তে পারে না; মানুষের পক্ষে প্রধান আর প্রথম উদ্দেশ্য আর কর্ত্তব্য কি? —সমস্ত বিকাল ধ'রে যে সব বিষয়ে আমাদের আলোচনা হ'চ্ছিল, সে সমস্তকে যেন উল্‌টে দিয়ে এই প্রশ্ন; আমি এ রকম গভীর ভাবের কথার জন্য প্রস্তুত ছিলুম না। রাজার এই প্রশ্ন শুনে মনে কিন্তু বেশ আনন্দ হ'ল; আমি নিজে জবাব না দিয়ে, দ্রেউএস-এর মারফৎ ব'ললুম—এ কথার উত্তর আপনিই দিন, আপনাকেই আমি জিজ্ঞাসা ক'রছি। রাজা ব'ল্‌লেন—দেবতা টেবতা কিছুই নয়, অর্চ্চনা অনুষ্ঠান এ সমস্ত বাইরেকার কথা—মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে, নির্ব্বাণের জন্য সাধনা করা। রাজার শেষ কথা কানে যেন এখনও বাজ্‌ছে—তাঁর বলিদ্বীপের উচ্চারণে মালাই ভাষায় তিনি যখন ব'ল্‌লেন—'ডেউআ-ডেউআ টিডাঃ আপা—নির্‌ওআনা সাটু'—দেবতারা কিছু নয়—নির্ব্বাণই হ'চ্ছে একমাত্র বস্তু। সুদূর মালাই দ্বীপপুঞ্জে, সহস্র বৎসর কাল ধ'রে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থেকেও, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা, যে নির্ব্বাণ-মোক্ষের সাধনাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য,—কি ক'রে এদের মনে এমন ভাবে গেঁথে র'য়েছে, তা ভেবে বিস্মিত আর পুলকিত হ'তে হয়। আমি রাজাকে ব'ল্‌লুম—আপনি ঠিকই ব'লেছেন,—পুরুষার্থ যে এইই, তা আমাদের শাস্ত্রে বলে, শাশ্বত বস্তুর সাধনা জীবনের প্রথম আর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত; বাহ্যিক ধর্ম্মানুষ্ঠান, সামাজিক রীতি-নীতি পালন, সেবাধর্ম্ম, এ সব আনুষঙ্গিক। রাজার এই প্রশ্ন আর মন্তব্যের কথা পরে রবীন্দ্রনাথকে আমি বলি; তিনিও এই কথা শুনে বিশেষ খুশী হন; আমায় তিনি বলেন,—দেখ হে, মালাইজা'তের লোক এরা, এদের চিন্তা-প্রণালী আমাদের থেকে কত আলাদা, এরা দুনিয়া দেখে অন্য ভাবে, আমাদের সভ্যতার বাহ্য অনুষ্ঠান অনেকগুলি এরা যা নিয়েছে তা তার spectacular বা দৃষ্টি-সুন্দর ভাবের দ্বারাই বেশী আকৃষ্ট হ'য়েই যে নিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; আমাদের ইতিকথা আমাদের শিল্প-কলা এদের উপর তার প্রভাব সহজেই বিস্তার ক'রেছে; কিন্তু রাজা যে ভাবের কথা ব'ল্‌লেন, তাতে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে আমাদের সভ্যতার আধ্যাত্মিক বাণীও এরা ঠিক নিতে পেরেছে; আর তা না হ'লে এত বিরুদ্ধ প্রতিবেশ-প্রভাব সত্ত্বেও এরা এই সভ্যতাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে থ'াকতে পারত না। বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপের ভ্রমণ শেষ ক'রে পরে রবীন্দ্রনাথ যখন বলিদ্বীপের উপরে যে সুন্দর কবিতাটী লেখেন—যেটী প্রবাসীতে প্রকাশিত হ'য়েছিল আর যার কথা পূর্ব্বে অন্যত্র ব'লেছি,—তাতে, কারাঙ-আসেম-এর রাজার কথায়, আর তা ছাড়া অন্য দু-একটী খুঁটী-নাটী বিষয়ে, বলিদ্বীপীয়দের চরিত্রে আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে একটী অনপেক্ষিত গভীরতার আর অন্তর্মুখিতার পরিচয় পেয়েই, এই ছত্র কয়টী লিখ্‌তে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন—

পরের দিনে তরুণ ঊষা বেণুবনের আগে
জাগিল যবে নব অরুণ রাগে,—
নীরবে আসি দাঁড়ানু তব আঙন-বাহিরেতে;
শুনিনু কান পেতে,
গভীর-স্বরে জপিছ' কোন্ খানে
উদ্বোধন-মন্ত্র যাহা নিয়েছ' তব কানে—
একদা দোঁহে পড়েছি যেই মোহ-মোচন বাণী
মহাযোগীর চরণ স্মরি' যুগল করি' পাণি॥

রাজা তার পরে আমায় তাঁর লেখা ছোট্ট একখানি বই দিলেন। বইখানির নাম, Darmasoesila—dilahirkan oleh Anak Agoeng Bagoes Dj'lantik Stedehouder Karangasem Bali; অর্থাৎ 'বলিদ্বীপের কারাঙ-আসেমের স্টেডেহোউডর্ আনাক্ আগুঙ্ বাগুস্ জলান্তিক্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত (dilahirkan অর্থাৎ 'জাহির' করা—আরবী শব্দ যা আমরা 'জাহির' রূপে উচ্চারণ করি মালাইদের মুখে তা lahir 'লাহির' হ'য়ে দাঁড়ায়) "ধর্ম্মসুশীল" নামে পুস্তক।'

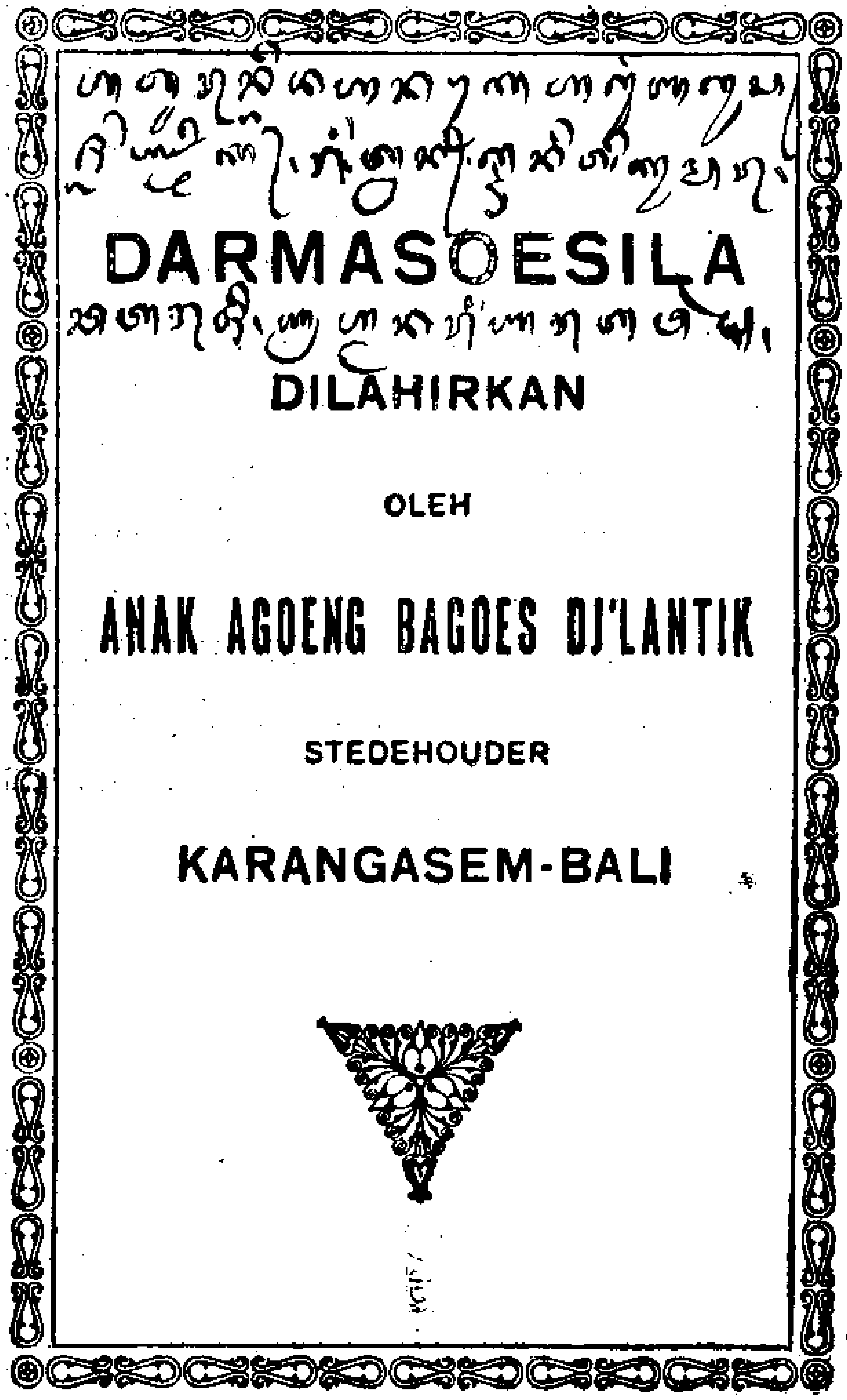
DARMASOESILA

DILAHIRKAN

OLEH

ANAK AGOENG BAGOES DJ'LANTIK

STEDEHOUDER

KARANGASEM-BALI

কারাঙ-আসেমের রাজা কর্ত্তৃক লিখিত পুস্তকের নামপত্র
(উপরে রাজার হস্তাক্ষর, বলিদ্বীপীয় লিপির নিদর্শন)

বইখানি ১৯ পৃষ্ঠার, ভাষা মালাই, ডচ্ বানানে রোমান অক্ষরে সুরাবায়ায় ছাপা। এখানিতে রাজা বলিদ্বীপের প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম আচার আর হিন্দু সমাজের একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা ক'রেছেন। উদ্দেশ্য—বলিদ্বীপের আর অন্য জায়গায় মালাই প'ড়তে পারে এমন লোক তাঁদের হিন্দু সংস্কৃতির আর ধর্ম্মের কথা জানুক্। বইখানির মোটামুটী আশয় ধ'রতে পারি;—এটী অনুবাদ ক'রে ফেলতে পারলে বেশ হয়—বলিদ্বীপের একজন অভিজাত ব্যক্তি পৈতৃক ধর্ম্মকে কি ভাবে নিচ্ছেন এ থেকে তা বেশ বুঝতে পারা যায়। রাজাকে অনুরোধ করায় বলিদ্বীপের অক্ষরে বইয়ের উপরে তিনি আমার নাম লিখে দিলেন।

স্থানীয় ডচ্ এসিস্টান্ট্-রেসিডেন্ট্ এলেন, সস্ত্রীক। লোকটী বেশ। কোপ্যার্ব্যার্গ্ আলাপ করিয়ে' দিলেন। ইনি মোটে এক মাস হ'ল সুমাত্রা থেকে বদলি হ'য়ে বলিদ্বীপে এসেছেন। ইনি সুমাত্রায় Battak বাত্তাক্ জাতির সভ্যতা রীতি-নীতি আলোচনা ক'রছেন। ব'ল্লেন যে অর্দ্ধসভ্য আর সভ্য বলিদ্বীপীয়, এই উভয় শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে তিনটী স্তরের মনোভাব বা সভ্যতা দেখতে পাওয়া যায়—আদিম, ভারতীয় হিন্দু (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য আর বৌদ্ধ), আর মুসলমান। বলিদ্বীপে আদিম হিন্দু-পূর্ব্ব যুগেরঅনেক জিনিস বিদ্যমান; এরা এখনও হিন্দু আছে, কিন্তু আশপাশের মুসলমানদের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারবে ব'লে তাঁর মনে হয় না। ব্যাপারীদের দ্বারাই সুমাত্রার অমুসলমান জঙলী জাতের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্ম বেশী ক'রে প্রসার লাভ ক'রেছে; বলিদ্বীপেও সেই রকমটা হবে ব'লে তিনি মনে করেন; তবে বলির লোকেদের একটা দৃঢ়-মূল হিন্দু সংস্কৃতি আছে; সেটা কতটা গভীর, এইবার তার পরীক্ষা হবে। তবে এটাও বিবেচ্য, এখানকার মুসলমান ধর্ম্ম নিরুপদ্রব, কোমল ভাবের; আর এই জন্যই তার শক্তি বেশী।

এই রকম নানা কথায় প্রথম রাত্রির খানিকটা কাটিয়ে

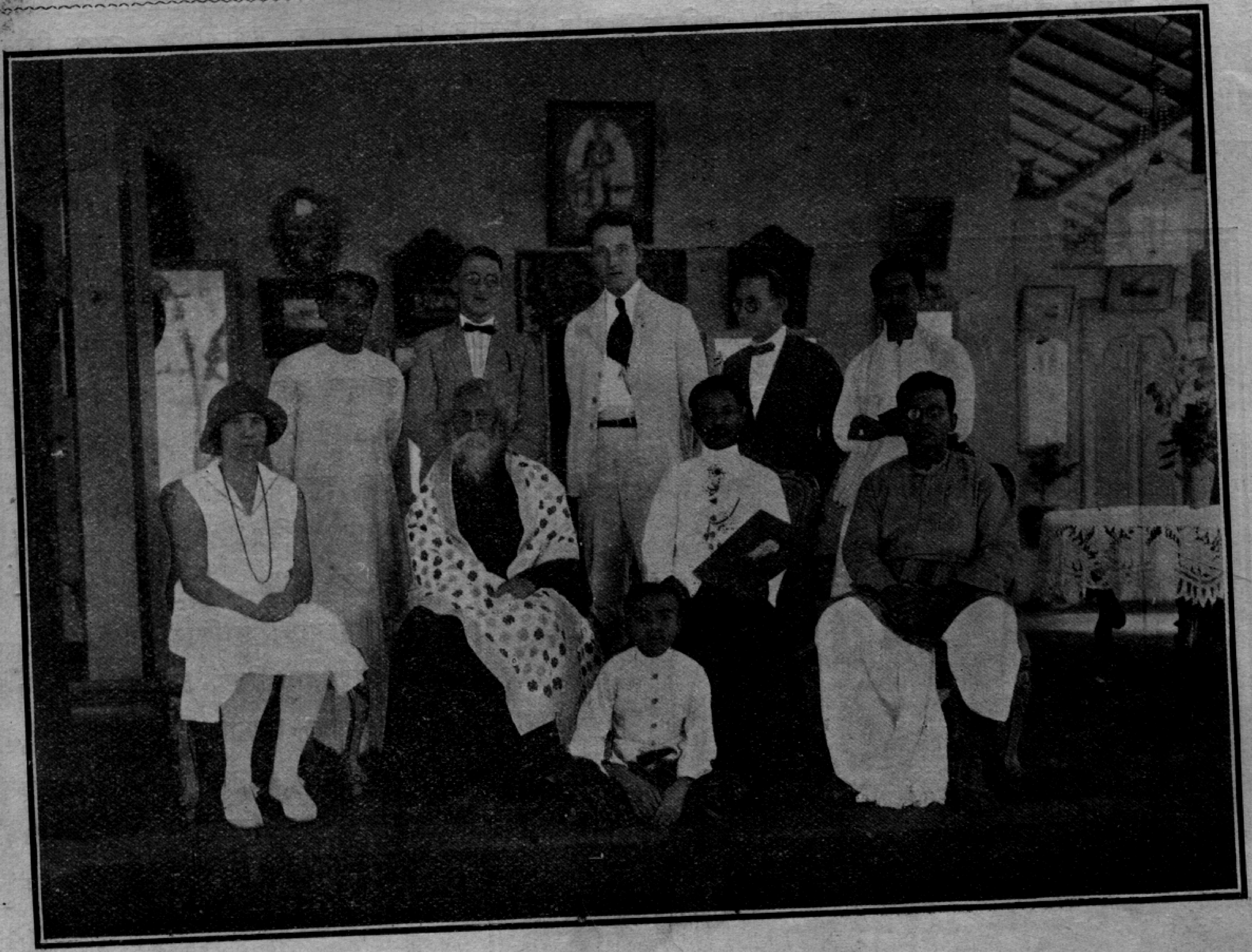

কারাঙ্-আসেমে রবীন্দ্রনাথ

দণ্ডায়মান—ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা, দ্রেউএস্, বাকে, কোপ্যার্ব্যার্গ, সুরেন্দ্রনাথ কর
উপবিষ্ট—বাকে-পত্নী, রবীন্দ্রনাথ, রাজা (পদতলে পুত্র), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পুরী থেকে রাত্রির মত বিদায় নিয়ে কোপ্যারব্যার্গ্, ধীরেন বাবু আর আমি পাসাঙ্গ্রাহানে ফিরলুম। রাত্রি বেশী হয় নি, কিন্তু গেঁয়ো শহরে লোক চলাচল খুবই ক'মে গিয়েছে। রাস্তার কুকুরগুলো ধুলোয় শুয়ে আছে, আমাদের পায়ের আওয়াজে উঠে তার-স্বরে ঘেউ ঘেউ আরম্ভ ক'রে দিলে; সারা-পথটা এই কুকুরের ডাকে বিরক্ত হ'তে হ'তে বাসায় ফেরা গেল। তারপর খেয়ে দেয়ে পাসাঙ্গ্রাহানের বারান্দায় ব'সে ব'সে অনেক রাত অবধি গল্প গুজব করা গেল।

২৮শে আগষ্ট ১৯২৭, রবিবার।—

কালকের মতন আজও সকালে সদর সড়কে নগরাভিমুখে গমনশীল গ্রামের মেয়েদের শোভাযাত্রা দেখা গেল। তারপরে স্নান আর প্রাতরাশ সেরে নিয়ে সকলে পুরী বা রাজবাটীর দিকে চ'ললুম। পথে চীনে ফোটো-গ্রাফওয়ালার দোকান থেকে স্থানীয় লোকেদের ছবি কিছু নিলুম। পুরীতে পৌঁছে দেখি, কালকেরই মতন পদণ্ডরা এসেছেন, আর রাজা তাঁর সেই তালপাতার পুঁথির ব্যাখ্যা শোনাবার জন্য প্রস্তুত। দ্রেউএস্কে কালকের মতন সংস্কৃত শ্লোকের কবির করা ইংরেজী তরজমা মালাইয়ে বুঝিয়ে দিতে হ'ল। রাজা তাঁর বাড়ীর মেয়েদের হাতে বোনা এক এক খণ্ড কাপড় আমাদের দিলেন—কতকগুলি কাপড় এদের মেয়েদের গায়ে ওড়নার মত ব্যবহৃত কাপড়, ঠিক জালের মতন; আর কতকগুলি লাল সবুজ রঙের রেশম আর সুতোয় মিশিয়ে লুঙ্গী বা সারঙের কাপড়; আমাকে

ঐ ধরণের লুঙ্গীর কাপড়ই একখানা দিলেন। কবিকে উপহার দিলেন ছুঁচে ক'রে রঙ্গীন রেশমের ফুল তোলা হাতে বোনা একখানা সাদা কাপড়। ইতিমধ্যে চীনে ফোটোগ্রাফার তার ছবি তোলবার সরঞ্জাম নিয়ে উপস্থিত আর একখানি দেন, তাতে ইউরোপীয় বেশে তিনি দাঁড়িয়ে, আর দুপাশে তাঁর দুই ছেলে; রাজার গলায় সেই ফিতের মতন চওড়া সোনার ঘড়ির চেন পরা।

পুত্রদ্বয়-সহিত কারাঙ-আসেমের রাজা

কারাঙ-আসেমের পূবে একটী প্রাচীন মন্দির আছে, মন্দিরটী একটি পাহাড়ের গায়ে, একটী স্বাভাবিক গুহাকে অবলম্বন ক'রে; এটীর নাম Goa Lawah বা 'বাদুড়-গুহা।' রাজা দুখানি মোটর হুকুম ক'রে দিলেন, কবির সঙ্গে আমরা সেটী দেখতে বা'র হ'লুম। কারাঙ্-আসেম রাজ্য ছাড়িয়ে যেতে হ'ল; সবুজের বন দিয়ে চমৎকার দৃশ্যের মধ্য দিয়ে—অনেকগুলি গ্রাম, বাজার, নারকেল বনের আর ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে, কখনও কখনও পাহাড়ের গা দিয়ে আর সমুদ্রের ধার দিয়ে এঁকে-বেঁকে রাস্তা; আর সর্ব্বত্রই এদেশের প্রিয়দর্শন সুবেশ পুরুষ আর এদেশের সুন্দরী তন্বী মেয়ের দল, গ্রামে গৃহকর্ম্মে, বাজারে বিকি-কিনিতে আর ধানের ক্ষেতে চাষের কাজে রত। এই 'বাদুড়-গুহা'র মন্দির একেবারে রাস্তার উপরেই। তেমন বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু নেই। মন্দিরটী হ'চ্ছে যেন ঘাসে ঢাকা হাতার মধ্যে পাশাপাশি কতকগুলি বাড়ী নিয়ে, ঘাসের মধ্যে

হ'ল, রাজার হুকুম মতন।—কবিকে আর রাজাকে নিয়ে আমাদের এক গ্রুপ তোলা হ'ল। এই ছবি পরে রাজা আমায় এক খণ্ড উপহার দেন। ছবিটীতে কবি রাজার উপহৃত বস্ত্রখণ্ড উত্তরীয়ের মতন গায়ে জড়িয়ে আছেন, আর কবি-কর্ত্তৃক উপহৃত তাঁর নিজের ছবি একখানি রাজা নিয়ে ব'সে আছেন। রাজা তাঁর নিজের ছবি আমায়

দু একটি ছোটো ছোটো ঘর, আর পাথরের বেদী, আর ছোটো ছোটো কাঠের থামের উপর দেবতার প্রতীক বা মূর্ত্তি রাখবার কুলুঙ্গীর মতন; মাঝামাঝি একটি গুহা, তার ভিতরে কতকগুলি বেদি; আমাদের সে অন্ধকারময় গুহার ভিতরে যাবার প্রবৃত্তি হ'লনা; গুহার মুখেই ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুড় গুহার ছাতে আর দেওয়ালে

ঝুলছে, আর কিচির-মিচির ক'রছে; দুচারটে উড়ে বেড়াচ্ছে, এদিক ওদিক ক'রছে; আর গুহাটি ভীষণ নোংরা আর দুর্গন্ধ। মন্দিরের অন্য গৃহ গুলি খালি প'ড়ে আছে, বেমেরামতী অবস্থায়; মন্দিরের ঘাস আগাছা আবর্জ্জনাও পরিষ্কার করা নেই। শুন্‌লুম, এদেশের মন্দিরগুলি সাধারণতো এই রকমই প'ড়ে থাকে, বহু মন্দিরে দেবমূর্ত্তি থাকে না, দৈনিক দেব-সেবাও হয় না; কেবল উৎসবের সময়ের মন্দির সাফ ক'রে সজ্জিত ক'রে দেবমূর্ত্তি বা দেবতার প্রতীক আনে, তখন খুব পূজার ঘটা লেগে যায়, আশপাশের গ্রাম থেকে বাদ্যভাণ্ড নৈবেদ্য খাদ্যদ্রব্য নিয়ে লোকেরা জমায়েত হয়—এদেশের মন্দিরের এইই হ'চ্ছে ব্যবহার বা সার্থকতা। বাদুড়-গুহা দেখে আমরা আবার সেই মনোহর দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে কারাঙ-আসেমের পুরীতে ফিরলুম, সাড়ে নটা থেকে এগারোটা পর্য্যন্ত দেড় ঘণ্টা চমৎকার ভাবে কাট্‌ল।

পুরীতে ফেরবার পরে রাজা তাঁর পুরাতন প্রাসাদ দেখাতে আমাদের নিয়ে গেলেন। নোতুন প্রাসাদের সামনে, একটা সরু পথ দিয়ে ঢুকতে হ'ল। পুরাতন বলিদ্বীপীয় পদ্ধতির বাড়ীর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই প্রাসাদটী। লাল ইটের দেয়াল, দেয়ালে বালী চুনকাম কিছু নেই; মাঝে মাঝে একরকম নরম পাথর, তাতে খুব নকশা কাটা—তাই দেয়ালে লাগানো আছে। আলাদা আলাদা দেয়াল দেওয়া কতকগুলি মহল। চার দিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা খানিকটা সমতল জায়গা, তার মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ এক একটি কুঠরী, উঁচু দাওয়া বা রোয়াক বা চাতালের উপরে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় প্রত্যেক চাতালের উপরে; আর কুঠরীগুলির প্রত্যেকটীর সামনে একটু ক'রে রোয়াক বা বারাণ্ডা। প্রত্যেক মহলে ঢোকবার জন্য উঁচু দরওয়াজা। একটা মহলকে বাগান বাড়ী বলা যায়। ভিন্ন ভিন্ন মহলের ঘরগুলির বারান্দার দেয়ালে বলিদ্বীপীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকা—নানা রঙীন ছবি, কাপড়ের উপরে এঁকে দেওয়ালে লাগিয়ে দিয়েছে। দেব-দানবের যুদ্ধ, কর্ম্মবিপাক বা নরকের দৃশ্য, অর্জ্জুন-বিবাহ বা অর্জ্জুনের তপস্যা, কিরাতার্জ্জুনীয়, অর্জ্জুনের পাশুপত অস্ত্রলাভ, নিবাত-কবচ রাক্ষসের সঙ্গে অর্জ্জুনের যুদ্ধ, সুপ্রভা নামে অপ্সরার সঙ্গে অর্জ্জুনের বিবাহ—এই সব ব্যাপার নিয়ে ছবি। কোনও কোনও চাতালে ওঠবার সিঁড়ির দুপাশে দানবমূর্ত্তি আর কোথাও বা অন্য মূর্ত্তি আছে, ঐ নরম পাথরের তৈরী। একটি ঘরের চাতালে সিঁড়ির উপর দুটি পদণ্ড বা ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি আছে—বেশ একটুখানি caricature বা ব্যঙ্গময় ভাবে তৈরী। আমার একটা ধারণা হ'য়ে গিয়েছিল যে, পদণ্ডরা সাধারণতো ততটা সুপুরুষ দেখতে হয় না—বলিদ্বীপের অন্য সাধারণ পুরুদের তুলনায় পদণ্ডদের যেন একটু কুশ্রীই বোধ হ'ত। এর কারণ কি তা ব'লতে পারি না। পদণ্ডদের দেহে ভারতের ব্রাহ্মণ-রক্ত কিছু বিদ্যমান আছে অনুমান করা যায়। তবে কি ভারতের ব্রাহ্মণ আর ইন্দোনেসীয় বা মালাই বলিদ্বীপীয়—এই দুই জা'তের মিশ্রণ দৈহিক সৌন্দর্য্যের পক্ষে উপযোগী হয় নি? যবদ্বীপের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ভারতীয় রক্ত যথেষ্ট বিদ্যমান, আর এদের অনেককে ভারতীয়দের থেকে পৃথক করা অনেক সময়ে দুষ্কর হ'য়ে পড়ে; কিন্তু এরা তো বেশ সুপুরুষ। আর একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রলুম: বলিদ্বীপে যখনই পদণ্ডদের ছবি আঁকে বা মূর্ত্তি তৈরী করে, তখনই তাতে একটু বিকট ভাবের, একটু ব্যঙ্গ করার যেন ইঙ্গিত থাকে। এর বা কারণ কি তাও বুঝ্‌তে পারলুম না। ঘরগুলির কাঠের চালের বাতায়, থামের গায়ে আর মাথায়, আর জানালা দরওয়াজায় বেশ খোদাই কাজ আছে। একটী প্রকোষ্ঠ দেখলুম বড়ো বড়ো চীনা ছবিতে ভর্ত্তি। ছবিগুলি বারান্দায় দেয়ালে আর থামে টাঙানো। বেশীর ভাগই হাতে আঁকা চীনা সুন্দরীদের মুখের রঙীন ছবি। চীনা প্রভাব সরাসরি চীন দেশ থেকে কিছু কিছু ইন্দোনেসিয়ায় এসে গিয়েছে, এদের শিল্পে, আর সঙ্গীতে। সমস্ত মহলগুলি পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে অবস্থায় আছে; তবে ঘরগুলিতে লোকজন বেশী থাকে ব'লে মনে হ'ল না। ঠিক একটি মহলে ঢোকবার সামনেই একটা ইটের দেয়াল দেখলুম; দেয়ালটীর ভিতর দিকে

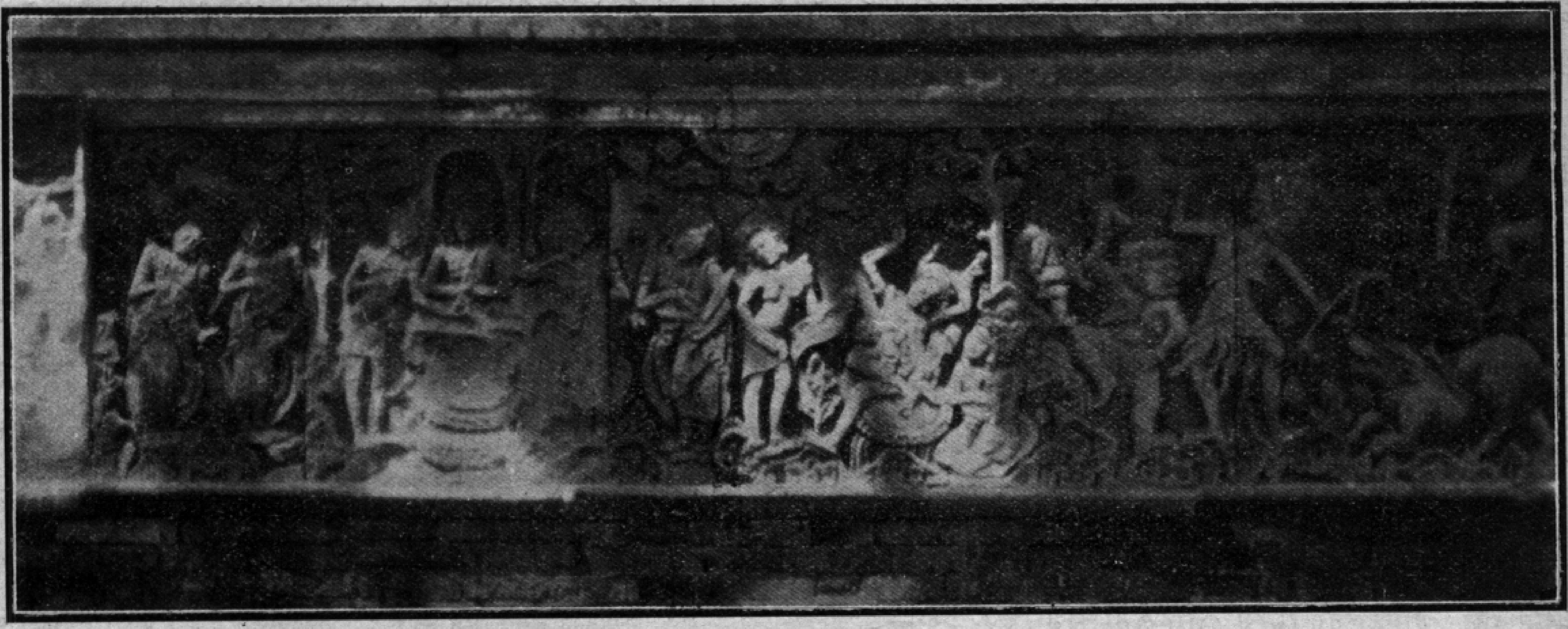

কারাঙ-আসেম্—প্রাচীন পুরী—ভাস্কর্য্যের নিদর্শন—কিরাতার্জ্জুনীয়-চিত্র
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র)

অর্থাৎ মহলের উঠানের দিকে, বেশ বড়ো খোদাই করা নরম পাথর একখানি লাগানো আছে; তাতে প্রাচীন বলিদ্বীপীয় ভাস্কর্য্যের একটী সুন্দর নিদর্শন বিদ্যমান,—কিরাতার্জ্জুনীয়ের দৃশ্য। অর্জ্জুনের তপস্যা, বরাহ-বধ, কিরাত-বেশী শিব আর তাপস অর্জ্জুনের যুদ্ধ প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী যবদ্বীপে আর বলিদ্বীপে খুবই জনপ্রিয় বস্তু। এই পাথরখানিতে খোদাই করা মূর্ত্তি জায়গায় জায়গায় ক্ষ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু এতে পৌরাণিক গল্পটি বলবার যে ভঙ্গীটি প্রকাশ পেয়েছে সেটী আমার বেশ লাগ্‌ল—এই ভাস্কর্য্যটিকে এদেশের শিল্পের একটি ভালো নিদর্শন ব'লেই মনে হ'ল। আমরা পরে আর একবার এই প্রাচীন পুরী দেখতে যাই, তখন শ্রীযুক্ত বাকে এর কতকগুলি ছবি তোলেন, এই প্রস্তরখোদিত চিত্রটীরও একটি ছবি নেওয়া হয়। একদিকে ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হ'য়ে চারজন অপ্সরা অর্জ্জুনের তপোভঙ্গ ক'রতে যাচ্ছে; অর্জ্জুন 'মিন্তারগ' বা 'বীতরাগ', নির্ব্বিকার চিত্তে যোগাসনে ব'সে আছেন; অপ্সরারা স্নান ক'রছে, তাঁকে প্রলুব্ধ করবার জন্য নানারূপ চেষ্টা ক'রছে; শেষে শিব প্রেরিত বরাহের আগমন, আর অর্জ্জুনের বাণ-নিক্ষেপ; অর্জ্জুণের সঙ্গে আছে তাঁর দুই খর্ব্বট অনুচর—এই অনুচরেরা ভারতে অজ্ঞাত। দ্বিতীয় দিন যখন আমরা পুরী আবার দেখতে যাই—৩০শে আগষ্ট তারিখে—সেদিন একটী মহলে একটি বলিদ্বীপীয় মেয়ে আর তার ছোট্ট একটি খোকাকে

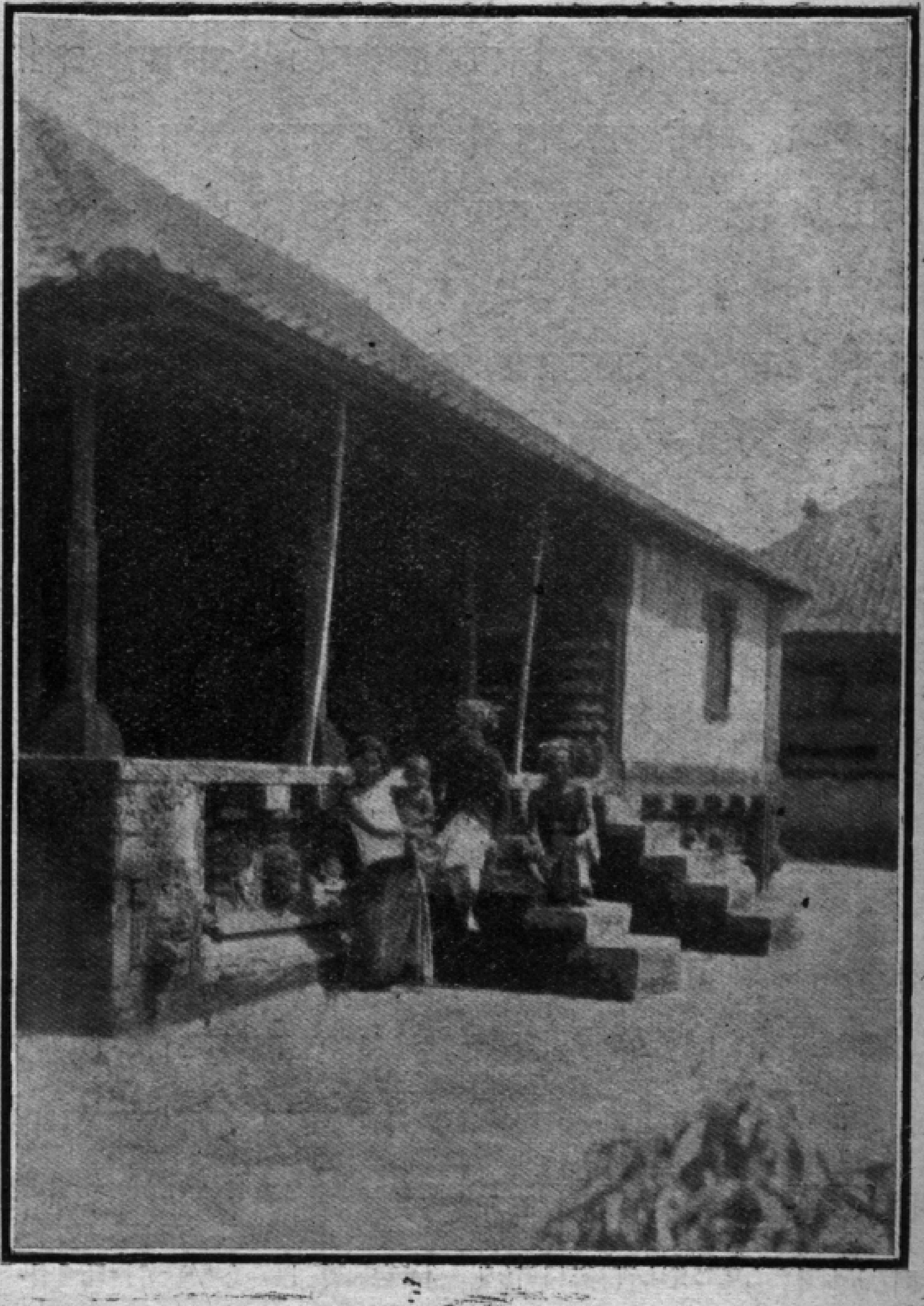

কারাঙ-আসেম—প্রাচীন পুরীর একটী ঘর
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র)

দেখি; আর দুজন পাইক বা রাজানুচরও ছিল। বাড়ীগুলির সঙ্গে প্রাচীন বলিদ্বীপীয় কাপড় পরা এদের এমন চমৎকার খাপ খাচ্ছিল যে কি আর ব'লবো। বাকের ছবিতে এরাও এসে গিয়েছে।—পুরীর মহলগুলি বেশ ফরদা জায়গা নিয়ে; ক'লকাতা শহরের উত্তরের পল্লীতে আমার বাড়ী, এই প্রশস্ত আঙিনা আর মধ্যে মধ্যে চার দিক খোলা এক এক খানা ঘর আমার দেখে বড়োই লোভনীয় বোধ হ'ল। একখানা ঘরের দরওয়াজার মাথায় 'চন্দ্রসংকাল' রীতিতে ছবি দিয়ে তারিখ জানানো হ'য়েছে—রাজা আমাদের দেখিয়ে ব্যাখ্যা ক'রে দিলেন, তারিখটা আমাদের শকাব্দতে দেওয়া—এসব দেশে শকাব্দই চ'ল্‌ত, বলিদ্বীপে এখনও চলে; তারিখ থেকে বোঝা গেল যে এই পুরীটী ২৩০ বছর আগে তৈরী।

প্রাচীন পুরী দেখে আমরা বাজারে গিয়ে খানিক ঘুরলুম, আর কিছু কিছু স্থানীয় বেতের কাজের মনি-ব্যাগ প্রভৃতি কিনলুম। তার পরে রাজবাটীতে ফিরে এসে পদণ্ডদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আর আলাপ। মাধ্যাহ্নিক আহার রাজবাটীতেই হ'ল। আমার অনুরোধ মত দুজন পদণ্ড—পদণ্ড ওক আর পদণ্ড বয়ন্ জিলান্তিক—বলিদ্বীপীয় পূজার অনুষ্ঠান দেখালেন। চত্বরের উপরে একটা কাঠের মাচা তৈরী ছিল,তাঁরা পূজার কাপড় চোপড় প'রে ব'স্‌লেন, পাশে আমিও ব'সলুম। মাথায় রঙীন কাপড়ের টোপরের মতন একটা শিরস্ত্রাণ বা মুকুট প'রলেন, এ-রকম মুকুট দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন দেবমূর্ত্তিতে পাওয়া যায়। গায়ে নেয়ারের ফিতের মতন সাদা কাপড়ের একরকম যেন ব্যাণ্ডেজ জড়ালেন,—কাঁধের উপর দিয়ে, কোমর দিয়ে; প্রাচীন যোগী আর সন্ন্যাসীর প্রস্তর মূর্ত্তিতে, আর ভোটদেশের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মূর্ত্তিতে এই রকম বন্ধনের ব্যবহার দেখেছি। আর ঢোলের আকারের কালো কাঠের দানার আর স্ফটিকের দানার মালা প্রচুর প'রলেন, কানে কাঠের দানার মাকড়ী লাগালেন। এখানকার পদণ্ডেরা দুশ্রেণীতে পড়েন—শিব-পদণ্ড ও বুদ্ধ-পদণ্ড। এঁদের সম্প্রদায়ের পার্থক্য কি কি তা বোঝা সম্ভব হয়নি। তবে শিব-পদণ্ডেরা ব্রাহ্মণ্য বিধির অনুগামী, আর বুদ্ধ-পদণ্ডরা বৌদ্ধ বিধির; আর শিব-পদণ্ডরা মাথার চুল ঝুঁটি ক'রে বেঁধে রাখেন, বুদ্ধ-পদণ্ডরা চুল লম্বা ক'রে ঘাড়ে পিঠে ফেলে রাখেন। পূজার মন্ত্র একটু একটু আলাদা, তবে মুদ্রা করেন উভয়েই। সামুনে কাষ্ঠাসনে তালপাতার আর ফুলের তৈরী দেবতার প্রতীক নিয়ে ব'সলেন, সামনে পঞ্চপাত্র, বাঁয়ে ঘণ্টা, বজ্র প্রভৃতি পিতলের তৈজস। এঁরা বিড় বিড় করে মন্ত্র ব'ল্‌তে ব'লতে অনুষ্ঠান ক'রে যেতে লাগ্‌লেন; আমি কৌতুহলের সঙ্গে দেখতে

পদণ্ডগণ কর্তৃক পূজানুষ্ঠান (প্রবন্ধকার, পদণ্ড ওক, পদণ্ড বয়ন্ জিলান্তিক)
(শ্রীযুক্তবাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র)

লাগলাম বটে, কিন্তু কিছুই বোঝা গেলনা। মনে বড়ো একটা আপশোশ র'য়ে গেল; ভাষা না জানা, পদণ্ডদের সঙ্গে বেশ কথাবার্ত্তা কইতে না পারা—এটা একটা অভেদ্য প্রাচীর।—পদণ্ডদের পাশে ব'সে তাঁদের অনুষ্ঠান দেখ্‌ছি এই অবস্থায় বাকে আর সুরেনবাবু আমাদের ছবি নিলেন। পদণ্ড ওক খর্ব্বকায় ব্যক্তি, গৌরবর্ণ সৌষ্ঠবশালী চেহারা, আর পদণ্ড বয়ন্ জিলান্তিক্ লম্বা পাতলা শ্যামবর্ণের ব্যক্তি, হঠাৎ তাঁর চেহারা দেখে ততটা শ্রদ্ধা হয় না।

রাজা আমায় একখানি হাতে আঁকা ছবির বই উপহার দিলেন। হল ঘরে তাঁর বৈঠকখানায় টেবিলের উপরে একখানা বই ছিল—সাধারণ ফুল-স্ক্যাপ কাগজের

সমস্তটা জুড়ে তাঁরই চিত্রকরের হাতের আঁকা তুলি-টানা রেখা-চিত্রের বই. বলিদ্বীপীয় পদ্ধতিতে কিরাতার্জ্জুনীয়ের ছবি খান ষাটেক এই বইয়ে আছে। প্রথম চিত্রে প্রভামণ্ডল-বেষ্টিত ইন্দ্র চারজন অপ্সরাকে পাঠাচ্ছেন অর্জ্জুনের তপোভঙ্গ ক'রতে; তার পরের চিত্রগুলিতে অপ্সরাদের আগমন, আর স্নান আর বেশভূষা ক'রে প্রস্তুত হওন; তার পরের কতকগুলি চিত্রে যোগাসনে উপবিষ্ট অর্জ্জুনের মন টলাতে অপ্সরাদের বিফল চেষ্টা; অপ্সরাদের ব্যর্থমনোরথ হ'য়ে দেবরাজের কাছে প্রত্যাবর্ত্তন; ইন্দ্রের তখন শিবের কাছে যাওয়া; বরাহ-মূর্ত্তি ধ'রবে যে দৈত্য, তার অর্জ্জুনের তপোভূমির কাছে আগমন, বিরাট বরাহ মূর্ত্তি ধারণ, অর্জ্জুনের বাণদ্বারা এই বরাহকে আঘাত, কিরাতবেশী শিবের আগমন, অর্জ্জুনের সঙ্গে কলহ আর যুদ্ধ, আর শেষে শিবের পাশুপত অস্ত্র দান; তারপরে ইন্দ্র-কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের নিকটে দূতপ্রেরণ, আর ইন্দ্রের কাছে অর্জ্জুনের গমন। এই সমস্ত বিষয়ে অনেকগুলি ছবি। পরেকার ঘটনারও কতকগুলি ছবি এই বইয়ে আছে—সে ঘটনাগুলি সংস্কৃত মহাভারত থেকে একটু পৃথক। সংস্কৃত মহাভারতে আছে অর্জ্জুনের সাহায্যে ইন্দ্র নিবাত-কবচ নামে কতকগুলি রাক্ষসকে সংহার করেন—ব্যস্; তার পরে অর্জ্জুনের মর্ত্তে পুনরাগমন। দ্বীপময় ভারতে 'নিবাত কবচ' নামটী নিয়ে 'নত কুবচ' বা 'ক্বচ' অর্থাৎ 'নাথ বা রাজা কুবচ' ব'লে এক অসুর-রাজের কল্পনা করা হ'য়েছে; এই অসুরকে ধ্বংস করবার জন্য ইন্দ্র অর্জ্জুনের পরামর্শ আর সাহায্য চান। স্বর্গে সুপ্রভা নামে একজন অপ্সরা অর্জ্জুনের প্রেমের পাত্রী হন; অর্জ্জুনের পরামর্শে সুপ্রভা 'নত-ক্চ' কে মোহাবিষ্ট করবার জন্য অসুর-রাজের প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, 'নত-ক্চ' সুপ্রভাকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে অবরুদ্ধ ক'রে রাখ্‌লে,—আর পরে সুপ্রভার ইঙ্গিতে অর্জ্জুন এসে অসুরকে সংহার ক'রলেন। তারপরে অজ্জুন সুপ্রভাকে নিয়ে দেবরাজের কাছে ফিরে এলেন, ইন্দ্র খুশী হ'য়ে সুপ্রভাকে অর্জ্জুনের হাতে সমর্পণ ক'রলেন। ছবির বইখানিতে নিবাতকবচ সংহার করবার জন্য অর্জ্জুন আর সুপ্রভা ইন্দ্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসছেন, তারপরে সুপ্রভা নিবাতকবচের সামনে উপস্থিত হ'য়েছেন, নিবাতকবচের আদেশ মত এক পরিচারিকা সুপ্রভাকে প্রাসাদে নিয়ে যাচ্ছে—এই পর্য্যন্ত কতকগুলি ছবি আছে। এই বইখানি আমি প্রশংসার দৃষ্টিতে রাজার বৈঠকখানায় ব'সে উল্‌টে পাল্‌টে দেখি। রাজা এটী আমায় দিতে চাইতে আমি একটু ফাঁফরে পড়ি, কিন্তু যখন তিনি জানালেন যে প্রতিদানে দেশ থেকে তাঁকে রামায়ণ আর মহাভারত পাঠিয়ে দিলে তিনি খুশী হবেন, তখন স্রেউএস্ আর বাকের পরামর্শে রাজার এই দান আমি গ্রহণ করি। রাজা বইখানির উপরে রোমান-মালাইয়ে তাঁর আর আমার নাম লিখে দিলেন, বইখানি যে তৎকর্ত্তৃক উপহৃত তাও লিখে দিলেন। এই ছবির বইখানি আমার বলিদ্বীপ-ভ্রমণের একটি অমূল্য স্মারক হিসাবে আর বলিদ্বীপের চিত্রশিল্পের একটি অতি সুন্দর নিদর্শন হিসাবে আমার কাছে আছে। পরে দেশে ফিরে এসে আমি রাজাকে আমার প্রতিশ্রুত বই পাঠিয়ে দিই - সংস্কৃত রাজা বুঝবেন না, তা দেবনাগরীতেই হোক বা বাঙলা অক্ষরেই হোক—আর সংস্কৃত মহাভারত দুর্ল্ভ গ্রন্থ—তাই 'প্রবাসী' কার্য্যালয় থেকে প্রকাশিত বাঙলা কাশীদাসী মহাভারত আর কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠিয়ে দিই; বইখানিতে রোমান মালাইয়ে এগুলি যে সংস্কৃত নয়, বাঙলা অনুবাদ, তাও লিখে দিই। রামায়ণ মহাভারতের এই সংস্করণ দুটি নন্দলাল বসু প্রমুখ আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ রূপকারদের আঁকা রঙীন ছবিতে ভরা—এই ছবিগুলি বলিদ্বীপের হিন্দুরাজার পক্ষে চিত্তাকর্ষক হবে অনুমান ক'রে পাঠাই; ছবিগুলির নীচে যথাজ্ঞান মালাই ভাষায় তাদের আশয় লিখে দিই। সঙ্গে অন্য বইও দুএকখানা পাঠাই। (এই রকম রামায়ণ মহাভারত বলিদ্বীপে অন্যত্রও পাঠিয়েছিলুম)। আর অভিধান আর ব্যাকারণ দেখে দেখে তৈরী ক'রে ক'রে মালাইয়ে একখানি চিঠি ও রাজাকে লিখি। পরে রাজার কাছ থেকে তার উত্তরও পাই।—ফরাসী পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সিলভ্যাঁ লেভি আর দু একজন বাঙালী ভ্রমণকারী যাঁরা পরে বলিদ্বীপে কারাঙ-আসেমে যান, রাজা তাঁদের এই রামায়ণ আর মহাভারত দেখিয়েছেন, শুনেছি।

আজ বিকালে কবি কারাঙ্-আসেম থেকে বিদায় নিলেন। কোপ্যারব্যার্গ ব্যবস্থা ক'রেছেন, কবি মধ্য-বলিতে পাহাড় অঞ্চলে 'তাম্পাক্-সিরিঙ' ব'লে একটি অতি সুন্দর নির্জ্জন আর ঠাণ্ডা জায়গায় থাকবেন। কারাঙ-আসেমে তাঁর আরও দুদিন থাকবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁর শরীরে আর বইছে না ব'লে তাঁকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া স্থির হ'ল। বিকাল পাঁচটায় কোপ্যারব্যার্গ আর সুরেন বাবুর সঙ্গে কবি যাত্রা করলেন। আমরা অর্থাৎ বাকে-দম্পতী, দ্রেউএস ধীরেনবাবু আর আমি আর দুটো রাতের জন্য কারাঙ-আসেমেই র'য়ে গেলুম।

(৮) বলিদ্বীপ—বেসাক্কিক্-এর মন্দির-দর্শন

২৯শে আগষ্ট ১৯২৭, সোমবার।—

পূর্ব্ব বলীতে পাহাড়ে' অঞ্চলের মধ্যে পাহাড়ের মাথায় কতকগুলি মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলি অতি বিখ্যাত, আর খুব প্রাচীন। স্থানটীর নাম Besakkik বেসাক্কিক্ (বা বেসাক্কিঃ)। আমাদের স্থির হ'য়েছিল যে আমরা কয়জনে মন্দির দেখে আস্‌বো। খানিকটা পথ মোটরে যাওয়া যাবে, তারপরে হয় হেঁটে না টাট্টুতে ক'রে। মন্দির যে কতটা দূরে, সে সম্বন্ধে কারো ধারণা ছিল না। চড়াই উতরাই পথ। কোপ্যারব্যার্গ আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন জায়গাটা খুব দূর নয়; তবে তিনি নিজে সেখানে যাননি। পরে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ ক'রলুম, যে বেশ দূর পথ, আর জায়গায় জায়গায় কষ্টকর পথও বটে। সকাল সাড়ে-সাতটায় প্রাতরাশের পরে আমরা পাঁচজনে যাত্রা ক'রলুম—স্ত্রীপুরুষে ডচ তিন জন, আর ভারতীয় আমরা দুজন। আমাদের পরণে ছিল ধুতি পাঞ্জাবী। চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে মোটরে ক'রে চড়াই পথে আমরা চ'লল্‌ম—পাহাড়ের গায়ে থরে থরে ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে, প্রচুর বাঁশের ঝাড়ের ভিতর দিয়ে, পাহাড় ব'য়ে এঁকে-বেঁকে আমাদের রাস্তা। আর সর্ব্বত্রই বলিদ্বীপের লোকেদের গতায়াত। Selat 'স্লাৎ' ব'লে একটি গাঁয়ে পৌছুলুম, শুন্‌লুম তারপরে মোটরে যাবার পথ আছে, কিন্তু সে পথ ভালো নয়। আমাদের মোটরওয়ালা আরও উত্তরে Moentjang 'মুনচাঙ' ব'লে একটি গাঁয়ে পৌছুলো, তখন বেলা নটা হবে। তারপরে আর মোটর যাবে না। স্থানটিতে একটি বড়ো বাজার আছে, ইট আর পাথরের ঘর বাড়ী অনেক আছে। এখানে টাট্টুই বেশী চলে দেখলুম, মালপত্র সব টাট্টুর পিঠে ক'রে নিয়ে যায়। বাজারে একটু ঘুরে বেড়ালুম—বাজারটী কারাঙ-আসেমেরই মতন। মেয়েদের কানের জন্য পাকানো তালপাতার আর কালো কাঠের গোঁজ বিক্রী হ'চ্ছে দেখলুম। কিছু ফল কেনা গেল, আর 'সালাক' ব'লে একরকম ফল চেখে দেখা গেল—আনারসের মতন। আমরা আমাদের নিয়ে যাবার জন্য টাট্টুর খোঁজ ক'রলুম, কিন্তু শুনলুম এত তাড়াতাড়ি টাট্টু পাওয়া মুস্কিল; আর স্থানীয় লোকেরা ব'ললে যে পথ তো খুব দূর নয়, হেঁটেই দেখে আসতে পার্‌বেন। একটি ছোকরা সঙ্গে জুট্‌ল, মুনচাঙে তার বাড়ী, সে বেসাক্কিক্-এর পথ জানে,

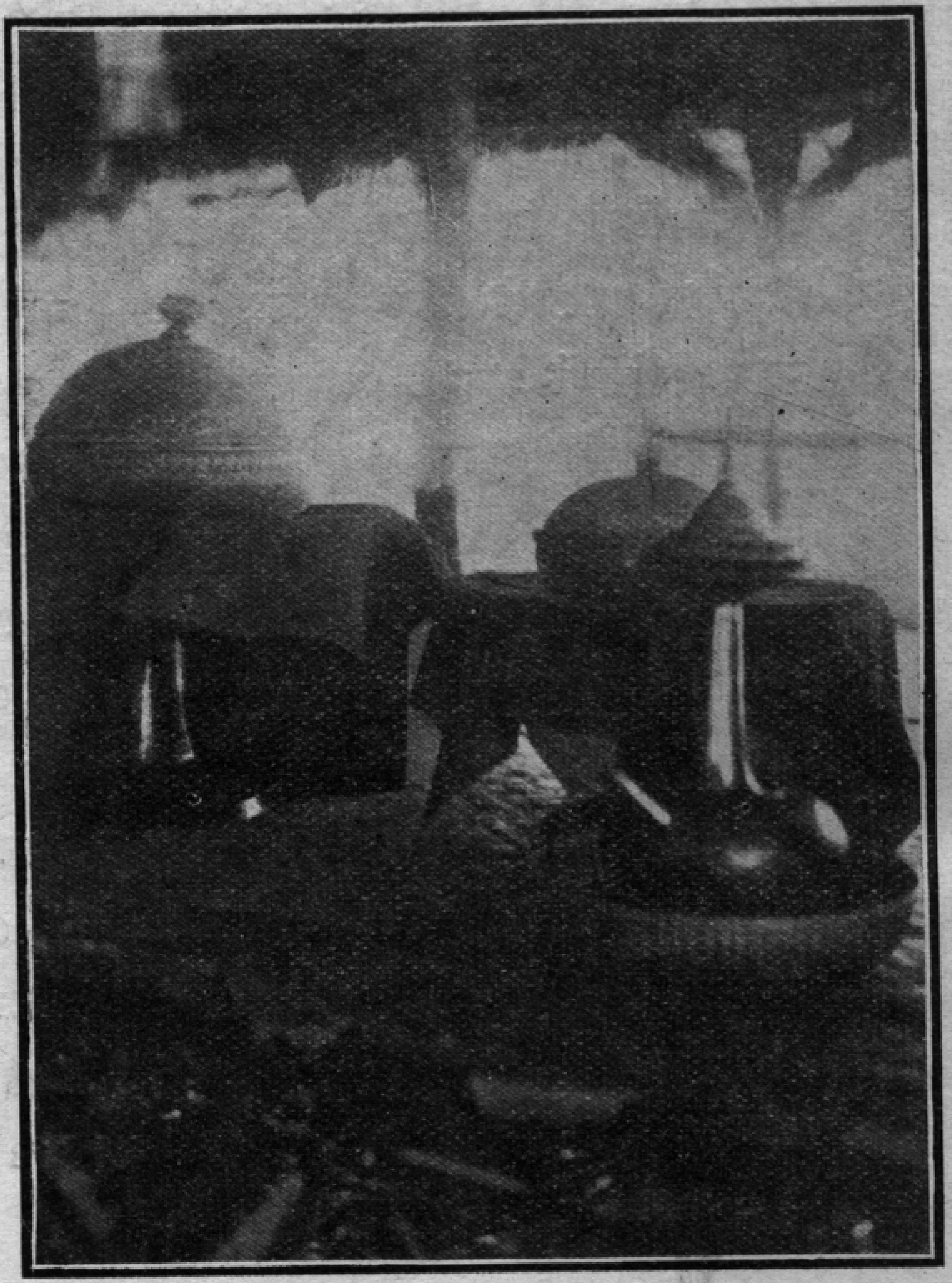

কারাঙ্-আসেম—সোনার তৈজস

প্রদর্শক হ'য়ে দেখিয়ে আন্‌বে। ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই ফিরে আসবো অনুমান ক'রে বেরুলুম। গাঁয়ের বাইরে এসেই পর্ব্বত-সঙ্কুল স্থানে একটী ছোটো নদী পেলুম—বেশ তোড়ের সঙ্গে চ'লেছে। নদীটার মাঝে চাবড়া চাবড়া পাথর প'ড়েছে, তার পাশ দিয়ে তর-তর শব্দে প্রচুর ফেনা আর জলের ছিটে তুলে নদী ছুটেছে। নদীর ধারে আর মাঝে চটান পাথরের উপরে ব'সে মেয়ের দল নাইছে, কাপড় কাচছে; গ্রাম্য লোকে আস্তে আস্তে নদী পেরুচ্ছে, টাট্টু পার ক'রছে। চারিদিকে পাহাড়, আর উঁচু পাহাড়ের গা কেটে কেটে ধানের ক্ষেত। নদী পেরুতে আমাদের ঝঞ্ঝাট হ'লনা - আমাদের ধুতি মালকোঁচা ক'রে পরা, জুতো খুলে হাতে ক'রে নিয়ে বেশ ওপারে গিয়ে উঠ্‌লুম। কিন্তু বাকের, বাকে-পত্নীর আর দ্রেউএস্‌এর হ'ল বিপদ; জুতো খোলো, মোজা খোলো, পেণ্টলেন, গোটাও, আবার ওপারে গিয়ে পা মুছে মোজা জুতো পরো। দ্রেউএস আর ধীরেন বাবু আগে আগে আমাদের সেখো বা পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে সঙ্গে চ'লে গেলেন, আমি পিছনে বাকেদের সঙ্গে রইলুম। বেচারীরা বড় মুস্কিলে প'ড়ল, খানিক পরে পাহাড়ের গায়ে ধানের ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে। ক্ষেতের আ'লের উপর দিয়ে যেতে হ'ল। আমার পক্ষে কোনও ঝঞ্ঝাট নেই—দিব্যি খালি পায়ে জুতো হাতে ক'রে আ'লের কাদার উপর দিয়ে যেতে লাগলুম; বাঁ দিকে এক-গোড়ালি আর কোথাও বা হাঁটুর কাছাকাছি পর্য্যন্ত জলে কাদায় ভরা ধানের এক থর ক্ষেত, আর ডানদিকে তার চাইতে নীচু থর, হাত দুই আড়াই নীচু,—একটু পিছ্‌লে প'ড়লেই হয় এ-দিকে নয় ও-দিকে প'ড়ে জলে আর কাদায় অন্ততো হাঁটু পর্য্যন্ত মাখামাখি হ'য়ে যাবে, যদি আছাড় নাও খাই। আমার হাতে একটি বেশ শক্ত বাঁশের ছড়ি ছিল—ছোটোখাটো লাঠি ব'ল্‌লেই হয়—বিন্ধ্যাচল থেকে আনা, বিজয়গড়ের বাঁশে তৈরী আর শিশির তেল রোদ্দুর আর রান্নাঘরের ধোঁয়ায় পাকানো,—পাহাড়ে বেড়াবার পক্ষে বেশ, বাকেদের সেটী দিলুম। কিন্তু তাতে কি হয়—দুচারবার বেচারীদের ক্ষেতের কাদায় গোড়ালী ডুবিয়ে নামতে হ'ল। ধানের ক্ষেতের আ'ল দিয়ে খানিক ক্ষণ গিয়ে আবার চড়াই,—আবার সেই পার্ব্বত্য নদীটী ২।৩ বার প্যর হওয়া। এখানটায় পথটা একটু কষ্টকর, কিন্তু পাহাড়ে' হাওয়ায় আর চমৎকার দৃশ্যে কষ্ট আমাদের ততটা লাগ্‌ল না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি সুন্দর। নদীটী উপল-বিষম আকা-বাঁকা খাত দিয়ে ত্বরিতগতিতে চ'লেছে, কোথাও কোথাও বা বিশাল শিলা-খণ্ডে বাধা পেয়ে সফেন গর্জ্জনের সঙ্গে সেই বাধাকে ঘিরে উপহাস ক'রে কাটিয়ে যেন নৃত্যছন্দে যাচ্ছে; এক একটী শিলাস্তূপ থাকায় নদীর গতিবেগকে যেন বাড়িয়ে দিয়ে আরও সুন্দর ক'রে তুলেছে। এস্থানে লোক-সমাগম কম; অনেক ক্ষণ ধ'রে চ'লে চ'লে জন-মানবের সঙ্গে দেখা হয় না; শুধু পায়ে-চলা পথ ধ'রে যাচ্ছি, কখনও কখনও দূরে উঁচু চড়াইয়ে অগ্রগামী বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছি; আর বাকে-দম্পতী কিঞ্চিৎ পশ্চাতে। এক জায়গায় নদী শেষবার পেরোবার সময়ে নদী-গর্ভস্থ প্রকাণ্ড গোলাকার একখণ্ড শিলা অতিক্রমণ ক'রেই দেখি, নদীরজল চারিদিকে শিলা-বেষ্টিত একটী স্বাভাবিক কুণ্ডের মত স্থলে জমা হ'য়ে চমৎকার একটি স্নানাগারের সৃষ্টি ক'রেছে, আর সেখানে শিলাসনের ধারে আবক্ষ জলে স্নান-নিরতা দুটী বলিদ্বীপের কন্যা; বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে এরা আমার দিকে চেয়ে রইল—এদের চোখে আদিমযুগের, সত্যযুগের সারল্য; চকিতের মত আমার মনে গ্রীক পুরাণোক্ত দেবকন্যাগণ সহ স্নাননিরতা কুমারী বনচারিণী দেবী আরতেমিস্‌ আর মৃগয়ার্থ বনে আগত শ্বগণ-পরিবেষ্টিত যুবক আক্তাইওন্‌-এর কাহিনী মনে এলো। আমি নদী পার হ'তে হ'তেই বাকে-দম্পতী সেখানে এসে প'ড়লেন, তাঁদের চোখেও প্রাচীন গ্রীক পুরাণের কল্পলোকের উপযুক্ত এই জীবন্ত চিত্রটী এড়াল না।

চড়াই উতরাইয়ের পথ ছেড়ে, একটী পাহাড়ের শ্রেণী ঐই ভাবে পেরিয়ে, আমরা খানিকটা সোজা পথ পেলুম। মাঝে একটী গ্রাম প'ড়ল, সেখানে লোকজনের সঙ্গে দেখা হল। আশেপাশে খুব না'রকেল গাছ; আমাদের তেষ্টাও পেয়েছে; কতকগুলি লোককে স্থানীয় লোক ব'লে মনে হল,—এরা আমাদের চারিদিকে ভীড় ক'রে

দাঁড়াল, এদের কাছে ডাব খেতে চাইলুম। দুটো ডাব পেড়ে এনে একটা ছোটো ভোজালীর মতন অস্ত্র দিয়ে মুখ কেটে আমাদের খেতে দিলে। হাত মুখ ধোবার দরকার হওয়ায় আমার সামনেই একটী চাষীর বাড়ীতে গিয়ে জল চাইলুম—বাড়ীর ভিতরে উঠানে কতকগুলি শূওর বেড়াচ্ছে, মুরগী চ'রছে, একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে পালিয়ে গেল, আঙিনার মাঝে বলিদ্বীপীয় পদ্ধতিতে উঁচু দাওয়ার উপর কতকগুলি ঘর; একটী বৃদ্ধা আর দুটী কম-বয়সী মেয়ে বেরিয়ে এলো,—দুজন ইউরোপীয়, একজন ইউরোপীল মেয়ে, আর অজ্ঞাত দেশের অধিবাসী আমাদের দুজনকে দেখে একটু তটস্থ হ'য়ে গেল। ত্রেউএস্ মালাইয়ে ব'লতে আমাদের একটি মাটির হাঁড়ি ক'রে জল আর একটা না'রকেল মালা দিলে; মুখ হাত ধুয়ে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলুম। ডাব দুটী প্রকাণ্ড; আমরা দুজন বাঙালী মিলে একটীর জল শেষ ক'রতে পারলুম না; ডাবের শাঁসটুকু বাদ দিলুম না, খুব মিষ্টি ডাব। অল্প দু'চার পয়সা দাম নিলে।

এর পরে আমারা যে পথ পেলুম, সেটা সমতল ভূমির উপর দিয়ে,—সরু মানুষ চলা পথের দুধারে খালি বাগান বাড়ী। এ পথটীও অনেকটা। তারপরে আবার চড়াই উতরাই—একজাগায় খাড়াই এত উঁচু আর এত পিছল যে ফিরতি পথে উতরাইয়ের সময়ে আমাদের পা ঘ'ষটে ঘ'ষটে কতকটা ব'সে ব'সে চ'ল্‌তে হ'য়েছিল। এই চড়াই উতরাইয়ের সময়ে আমরা আবার পাহাড়ের মধ্যে সামান্য ঢল-যুক্ত বেশ খানিকটা খোলা জমী পেলুম—ঘাসে ভরা কতকটা, কতকটা ধানের ক্ষেত। এই হাঁটা-পথ দিয়ে আমরা চ'লেইছি—পথে থাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি, বেসাকিক্ কত দূর,—জবাব পাই—বেশী দূর নয়; এ সেই উড়িষ্যার 'পোয়া-বাট'-র মতন। বেলা বারোটা বেজে গিয়েছে, সকলের ক্ষিদেও পেয়েছে; পথে একটী স্ত্রীলোক একটী ঝুড়িতে কলা নিয়ে বিক্রী ক'রতে ব'সেছে—দূরে দূরে ক্ষেতে যারা কাজ ক'রছে তাদেরই জন্য; আমরা কতকগুলি কলা কিনলুম; যদিও কলাগুলি অপুরুষ্ট কাঁচা-কাঁচা ছিল, তাই আমরা সানন্দে খেতে খেতে চ'ললুম। সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছে, একটা বাজে বাজে, এমন সময়ে সামনে খুব দূরে একটা ঢল জমি পেরিয়ে কতকগুলি অনুচ্চ পাহাড়ের মাথায় ইমারতের ছাত আর নেপালী মন্দিরের মত মন্দিরের মেরু বা চূড়া দেখা গেল; মন্দিরের সাম্‌নে একটী গ্রাম, গ্রামের সংলগ্ন সবুজে ভরা ক্ষেত। আমরা বেসাকিক্-এর কাছে এসে পৌছুলুম।

মহিলা-সংবাদ

লেডী বসন্তকুমারী দেবী।—পুরী বিধবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী লেডী বসন্তকুমারী দেবী গত ১১ই জুন পরলোকে গমন করিয়াছেন। ইনি লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি স্যর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সংসার হইতে দূরে সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে জীবনযাপন করিতেছিলেন। হিন্দু বিধবাদের দুঃখ-দুর্দ্দশায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল। তাহাদের দুর্দ্দশা-মোচনের জন্য তিনি সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহারই ফলস্বরূপ তিনি পুরীতে একটি বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়া তাহাই পরিচালন করিতেছিলেন। শীঘ্রই তাঁহাকে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে ভাবিয়া বিধবা-শ্রমের কর্ম্মভার একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের হাতে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি তাঁহার আরব্ধ কর্ম্মভার গ্রহণ করায় সুখী হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে বিধবাশ্রম এবং বালিকাবিদ্যালয়ে শ্রীমতী

তড়িৎবালা দাস বি-এ, বি-টি, মৃণ্ময়ী দত্ত এবং শ্রীমতী নলিনী ঘোষ শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেছেন। বসন্তকুমারী দেবী এতদিন স্বয়ং বিধবাশ্রমে উপস্থিত থাকিয়া ইহার পরিচালন কার্য্যে নানাভাবে সাহায্য করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বিধবাশ্রমের অনেক ক্ষতি হইল।

স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবী

শ্রীমতী অরুন্ধতী মিত্র ও তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী রেণুকা মিত্র নওগাঁর (রাজসাহী) উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের কন্যা। ইহারা দুই জনেই এবার পুণার "ভারতবর্ষীয় মহিলা বিদ্যাপীঠে"র প্রবেশিকা পরীক্ষায় অতিশয় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে শ্রীমতী অরুন্ধতী মহিলা বিদ্যাপীঠের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে ইহারা স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন নাই, বাড়ীতেই লেখাপড়া শিখিয়াছেন।

শ্রীমতী অরুন্ধতী মিত্র শ্রীমতী রেণুকা মিত্র

শ্রীমতী তারামতি বাঈ পাটেল। ইনি গুজরাটী মহিলাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এল-সি-বি [আইন] পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহারা পটিদার সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে এখনও অবরোধ প্রথা প্রচলিত।

শ্রীমতী তারামতি বাঈ পাটেল

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ—

রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডের 'স্পেক্টেটর' পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে বৃটিশের ভাবুকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতবর্ষ ও বৃটেনের সম্মিলন-সাধনের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে আতঙ্ক ও স্পর্দ্ধাপ্রকাশসূচক অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অনতিক্রমনীয় ফল বাদ দিলে, একথা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষ তাহার আধ্যাত্মিক গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজের কঠিন আদর্শ ও মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় নেতার শিক্ষা পালন করিয়াছে।

তিনি বলিয়াছেন, য়ুরোপ সদাশয়তা প্রকাশ করিয়া তাহার সভ্যতা প্রদর্শন জন্য এশিয়াতে যান নাই, পরন্তু অহমিকা ও ক্ষমতা প্রকাশের অসীম ক্ষেত্রের অন্বেষণে গিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, এশিয়া কখনই ইহা স্বীকার করিবে না যে, মনুষ্যত্ববিহীন শক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে চিরদিনের জন্য সাফল্য লাভ করিবে।

তবে তিনি বৃটেনের প্রতি ন্যায়পরতা প্রদর্শন করিয়া এ কথা বলিতে ত্রুটি করিবেন না যে, ধ্বংসসাধনে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন জাতি ও নিরস্ত্র জাতির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে যেরূপ নিগ্রহভোগের সম্ভাবনা, বৃটিশ শাসনে আমাদের ভাগ্যে তাহা ঘটে না, অন্য কোন সাম্রাজ্যতান্ত্রিক শাসকের অধীনে ইহা অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক যে লাঞ্ছনা-ভোগ করিতে হইত, তাহা নিশ্চিত।

যখন গভর্ণমেণ্টের স্বাভাবিক ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটান হয়, তখন অত্যাচার উৎপীড়নের জন্য লোকের অভিযোগ করা সাজে না।

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইহা বীরের ন্যায় আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করিবে এবং অত্যাচারে পরিবর্ত্তে অত্যাচার কখনই করিবে না।

"স্পেক্টেটর" পত্র ডাক্তার ঠাকুরের প্রবন্ধে টিপ্পনী করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের লক্ষ্য ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। ধীরপন্থী ভারতীয়গণের এ বিষয়ে অভিমত পরবর্ত্তীকালে লিখিত হইবে।

(বরিশাল)

বাংলার স্বাস্থ্য—

সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগের ১৯২৮ সনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলার স্বাস্থ্য যে কিরূপ শোচনীয় তাহা এই রিপোর্ট পর্য্যালোচনা করিলে অতি সহজেই প্রতীয়মান হইবে।

১৯২১ সনের সেন্‌সাসে বাংলা প্রদেশের লোক সংখ্যা হইয়াছিল ৪,৬৪,২২,২৯৩ জন, আলোচ্য বর্ষে ৭৫৬৮০টি শিশুর জন্ম হইয়াছে; ইহার পূর্ব্ব বৎসর জন্ম হইয়াছিল ১২৮৬৮৬৩ জনের, অর্থাৎ আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্ব বৎসর হইতে প্রায় ১০০,০০০ জন্ম-সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু এই বৎসরে মোট মৃত্যু ঘটিয়াছে ১১,৮৯,০১৫ জনের। তার পূর্ব্ব বৎসর মরিয়াছে ১১,৮৯,৩৭০ জন। সুতরাং মৃত্যুসংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর হইতে হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই বলিলেই চলে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা ছিল হাজার করা ২২৮৩, ১৯২৭ সনে সেই স্থলে হইয়াছে হাজার করা ১৭৮ এবং আলোচ্য বর্ষে হইয়াছে ১৭৮১ অর্থাৎ আলোচ্য বর্ষে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর হইতে সামান্য কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে কলেরা রোগে মৃত্যু অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯২৭ সনে কলেরায় মারা যায় ১১৮৩৭৭ জন, সেই স্থলে ১৯২৮ সনে মারা গিয়াছে ১৩৭২৪৫ জন অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১৬টি মৃত্যু বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং গত পাঁচ বৎসরের গড়ের প্রায় দ্বিগুণ মৃত্যু এই বৎসর ঘটিয়াছে।

গত ৫ বৎসর ধরিয়া বসন্ত রোগের প্রকোপ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯২৫ সনে এই রোগে মারা যায় ৪২৫১৪ জন আর আলোচ্য বর্ষে মারা গিয়াছে ৪৩৫৫৮ জন।

১৯২৬ সনে ম্যালেরিয়াতে মারা যায় ৪৫৮২০৮ জন, ১৯২৭ সনে মারা যায় ৪২৯১৪৩ জন, আর ১৯২৮ সনে মারা গিয়াছে ৩৬৮৬৯১ জন। ১৯২৭ সনে কালাজ্বরে মৃত্যু হয় ১১৮৫৫ জনের আর আলোচ্য বর্ষে সেই স্থলে মৃত্যু হইয়াছে ১০৭৪৬ জনের। জ্বররোগে মোট মৃত্যু ঘটে ১৯২৭ সনে ৭৮৯০০৬ জনের। সেই স্থলে আলোচ্যবর্ষে মৃত্যু ঘটে ৭৫২০০৭ জনের। এই রোগের দিক দিয়া স্বাস্থ্য বিভাগ অনেক খানি সাফল্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

(শান্তিপুর)

ভারতীয় মিলে স্বদেশী সূতার ব্যবহার—

ভারতের যে যে কাপড়ের কলে স্বদেশী সূতা ব্যবহৃত হয় তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) স্বদেশী মিল কোম্পানী, বোম্বাই।
(২) টাটা মিল, বোম্বাই।
(৩) মেকেঞ্জি পেটিট মিল, বোম্বাই।
(৪) জুবিলি মিল লিমিটেড, বোম্বাই।
(৫) বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, শ্রীরামপুর।
(৬) আকোলা কটন মিল কোং, আকোলা।
(৭) কেশরাম কটন মিল, বেঙ্গল।
(৮) নিউ বড়োদা মিল কোং, বড়োদা।
(৯) জিয়ানজিয়ারো কটন মিলস, গোয়ালিয়র।
(১০) মতিলাল হীরাভাই স্পিনিং এণ্ড উইভিং, আমেদাবাদ।

(১১) নন্দলাল ভাদুড়ী মিল লিমিটেড, ইন্দোর।
(১২) সরনারায়ণ স্পিনিং এণ্ড উইভিং, গোয়া।
(১৩) সীতারাম স্পিনিং এণ্ড উইভিং, কোচিন।
(১৪) সিটি অব আমেদাবাদ স্পিনিং এণ্ড ম্যাঃ।
(১৫) আমেদাবাদ স্পিনিং এণ্ড উইভিং, আমেদাবাদ।
(১৬) মহারাজা মিলস কোং লিমিটেড, বড়োদা।
(১৭) মোরারজি গোকুল দাস স্পিনিং এণ্ড উইভিং
(১৮) ব্রোচ ফাইন বাউণ্টস স্পিনিং এণ্ড উইভিং, বোম্বাই।
(১৯) দি গর্ডেন স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং।

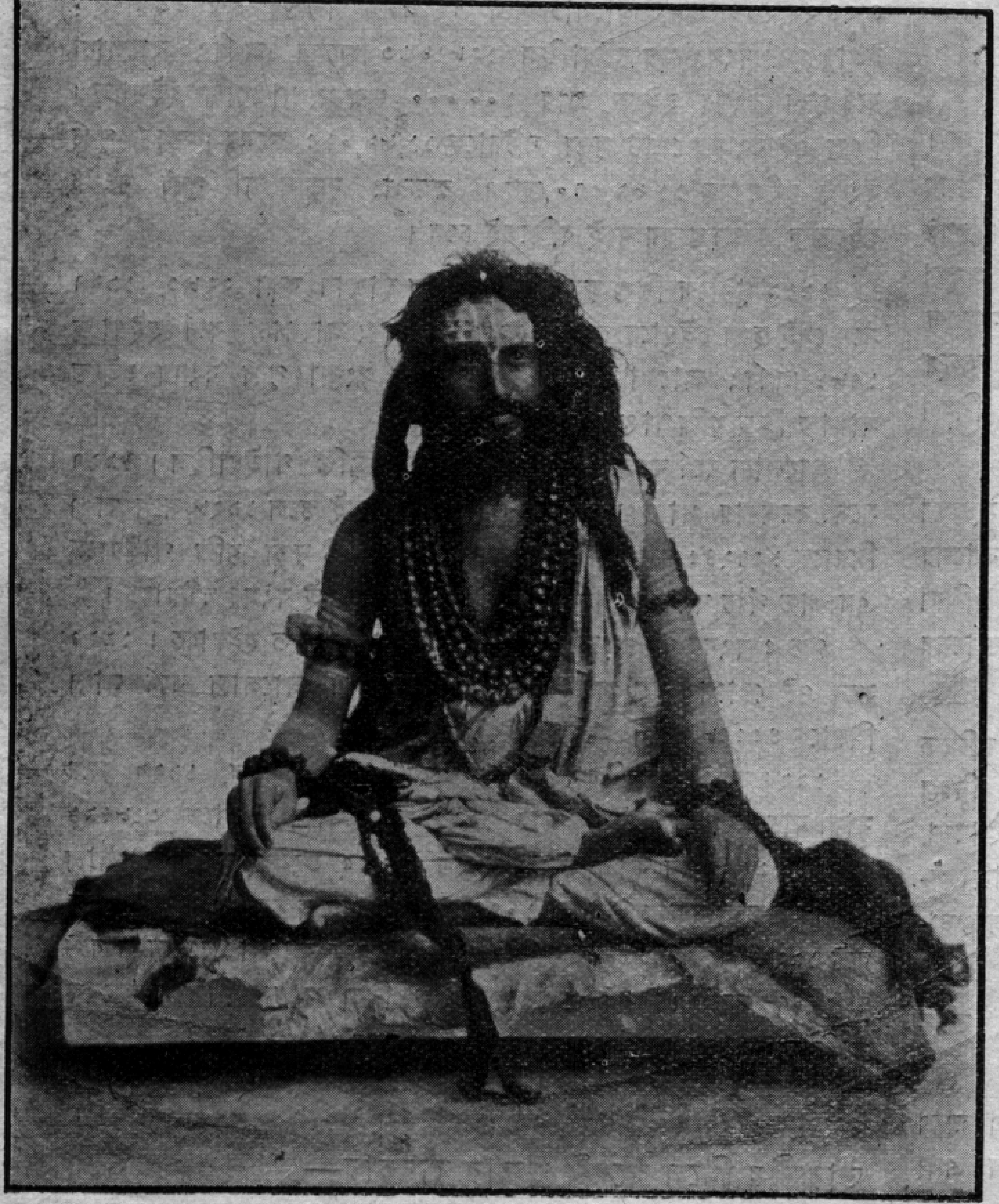

শ্রীশ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

(২০) প্রেম স্পিনিং এণ্ড উইভিং লিঃ।
(২১) দীনসোয়াদ পালিত মিল, বোম্বাই।
(২২) আর, বি, বংশীলাল আমির চাঁদ স্পিনিং এণ্ড উইভিং, ওয়ার্দ্ধা সি, পি।
(২৩) বোম্বে মিলস কোং লিঃ, বোম্বাই।
(২৪) গুজরাট কটন মিলস কোং লিঃ, আমেদাবাদ।
(২৫) আর, এস, রইলকচাঁদ মেহেতা স্পিনিং মিলস, ওয়ার্দ্ধা।
(২৬) নিউম্যানেকচক স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ, আমেদাবাদ।
(২৭) স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস, দিল্লী
(২৮) মোরাদাবাদ স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ, মোরাদাবাদ।
(২৯) আমেদাবাদ জুবিলী স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, আমেদাবাদ।
(৩০) রায়পুর ম্যানুফ্যাচারিং কোং লিঃ, আমেদাবাদ।
(৩১) মডেল মিলস লিঃ, নাগপুর সিটি।
(৩২) আরাদয় স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ।
(৩৩) কানপুর কটন মিলস কোং, কানপুর।
(৩৪) আলোকা মিলস লিমিটেড, আমেদাবাদ।
(৩৫) আমেদাবাদ ম্যানুফ্যাকচারিং এণ্ড ক্যালিকো প্রিণ্টিং কোং লিঃ, আমেদাবাদ।
(৩৬) ঢাকেশ্বরী কটন মিল, ঢাকা।

(শান্তিপুর)

—

শ্রীশ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী—

গত ১১ই আষাঢ় পরলোকে গমন করিয়াছেন। ১২৭৪ সালের বিক্রমপুর পশ্চিম পাড়া গ্রামে কুলীন বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে তাঁহার জন্ম। এই সুদীর্ঘ ৬৩ বৎসর কাল তিনি নানা ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ও সমন্বয়ে উদার নৈতিক জীবন যাপন করিয়া শাস্ত্র ও সদাচারের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তিনি এক বিশিষ্ট তান্ত্রিক সাধকের পুত্র। ছাত্রজীবনে তিনি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। যৌবনে তিনি বিখ্যাত সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অসাম্প্রদায়িক ভাবের সাধক হইয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। তিনি কাহারও কোন প্রকারের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া কেবল শক্তির প্রভাবে প্রত্যেকের স্ব স্ব বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের ঘোর সাম্প্রদায়িক বিরোধে তাঁহার ন্যায় আদর্শ সমন্বয়বাদীর অভাব সকলকে ব্যথিত করিবে।

ঢাকায় ও নিকটস্থ গ্রামে উপদ্রব

(একটি চিঠি)

ঢাকার শোচনীয় দাঙ্গা হাঙ্গামার বিস্তারিত বিবরণ আপনার নিকট নিশ্চয়ই পৌছিয়াছে। তবে নিজে সমস্ত দেখাশানা ও অন্যের কাছ হইতে জানার ভিতরে অনেকটা পার্থক্য থাকিয়া যায় এবং আমার মনে হয় আপনি নিজে যদি সমস্ত পরিদর্শন করিতেন, তবে খুবই ভাল হইত। সে যাহা হউক, আমি আজ এই দাঙ্গা-সম্পর্কীয় ব্যাপারেই কয়েকটি কথা লইয়া আপনার কাছে উপস্থিত হইতেছি এই আশাতে যে,—আমি যেদিক দিয়া আলোচনা করিতে চাই আপনার কাছ হইতে সে দিকটা আরও স্পষ্টতর ও সুচারুরূপে সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইতে পারিবে।

কায়েতটুলীতে অত্যাচারের সাক্ষী সুশীলা-নিবাস

আমি ঢাকাতেই থাকি এবং পূর্ণ দাঙ্গার সময় ঢাকাতেই ছিলাম ও সহরের বিপন্ন অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি। সহরের দাঙ্গা সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ গ্রামগুলিতে যে লুণ্ঠন চলিয়াছিল তা'র মধ্যে রুহিৎপুর গ্রামের লুণ্ঠনাবশেষ দৃশ্য নিজে দেখিয়া আসিয়াছি। ঢাকা সহরের দাঙ্গা সম্পর্কে বর্ত্তমানে হিন্দু মুসলমান উভয় পক্ষ একে অন্যকে দোষী করিবার চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু গ্রামের লুণ্ঠন সম্পর্কে হিন্দুদের দায়ী করিবার এতটুকু সূত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমার ইচ্ছা হয়, শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়কে এই সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি।

লুটপাট চিরদিন যুদ্ধোন্মত্ত সৈন্যসামন্ত অথবা লুণ্ঠন-বৃত্তি দস্যুরাই করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু রুহিৎপুরে কি

কায়েতটুলীতে আক্রমণের ফলে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেনের বাড়ীর দুরবস্থা

দেখিলাম? সেখানে আশেপাশের, এমন কি গ্রামস্থের ভিতরও, কতক মুসলমান গৃহস্থ স্ত্রী-পুরুষ হিন্দু গৃহস্থ বাড়ী সব অকাতরে লুণ্ঠন করিয়াছে। রুহিৎপুরে দেখিলাম প্রায় দুইশ' গৃহস্থ বাড়ী লুণ্ঠিত হইয়াছে। শত শত মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ, তা'দের সঙ্গে নাকি ১০।১২ বৎসরের বালকও ছিল—প্রত্যেক ঘরে ঢুকিয়া বাড়ীর যাবতীয় জিনিষপত্র, এমন কি ঘরের কপাট এবং দু'এক স্থলে ঘরের চালের টিন পর্য্যন্ত, খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। মাটি খুঁড়িয়া ডোবা পুকুর ইত্যাদি,—অর্থাৎ যে সব স্থানে গহনা অর্থাদি কি থালা বাসন ইত্যাদি গৃহস্থের লুকাইয়া রাখা সম্ভব—সে সবই ঘাঁটিয়া যাহা পাইয়াছে সবই লইয়াছে। এমন কি দরিদ্রের ধান ভানিবার ঢেঁকীটি পর্য্যন্ত তুলিয়া লইয়াছে। একটি দরিদ্র স্ত্রীলোক, যে তার বৃদ্ধ স্বামী ও

তা'র নিজের গ্রাসাচ্ছাদন কেবলমাত্র একটি ঢেঁকীর উপরই নির্ভর করিয়া চালাইতেছিল, তা'র ঢেঁকীটি লইয়া যাওয়াতে সে আমাদের কাছে যে কান্না কাঁদিয়াছিল তাহা ভুলিতে পারিব না। বাস্তবিক পক্ষে যাহারা বংশানুক্রমে শান্তিপূর্ণ গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিয়া

ঢাকা বংশালের একটি বাড়ী

আসিয়াছে, এরূপ স্ত্রী-পুরুষ দলে দলে এইভাবে গৃহস্থ বাড়ী লুণ্ঠন করিয়াছে, জগতের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বোধ হয় নিতান্ত বিরল। যখন ভাবি, অনেক মুসলমান আজ তাদের ঘরের মেয়েদেরও লুণ্ঠনকার্য্যে সঙ্গে আনিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, তখন তাহাদের নৈতিক অধঃপতন যে কতদূর গড়াইয়াছে, ভাবিলে অন্তর অবসন্ন হয়। মুসলমান মৌলবীগণ তো অনেক রকম 'ফতোয়া' জারি করেন,—এ সম্বন্ধে তাঁহারা কি 'ফতোয়া' দিতে চাহেন?

রুহিৎপুরে তিনটি জিনিষ চোখের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল—বর্ব্বরতা, কাপুরুষতা ও ইহার অন্তরালে

ঢাকা, বংশাল পাড়ায় শ্যামচাঁদ বসাকের আড়তের ধ্বংসাবশেষ

অপ্রত্যক্ষভাবে সয়তানী চাল। রুহিৎপুরে মুসলমান বর্ব্বরতা সম্বন্ধে এতক্ষণ লিখিয়াছি, হিন্দুর কাপুরুষতার চূড়ান্ত যা' দেখিলাম তাহাই এখন লিখিতে চাই। মুসলমানরা অনেকেই দূর হইতে, এমন কি নৌকাতে খাল পার হইয়া স্ত্রীপুরুষ-বালক সব লুট করিতে আসিয়াছে প্রকাশ্য দিবালোকে,—তাহাতে তা'রা প্রাণের ভয় করে নাই। আর নিজ নিজ বাড়ীতে পৈত্রিক ভিটাতে দাঁড়াইয়া হিন্দুরা তাহা রক্ষা করিতে দাঁড়ায় নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম হিন্দু স্ত্রীপুরুষ-বালক-বালিকা প্রায় সবই পাটক্ষেতে, কেহ বা নমঃশূদ্র পল্লীতে, কেহ বা দু'এক জন সাধুপ্রকৃতি মুসলমানবাড়ীতেও পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছে। তা'দের কাপুরুষতা ও একতার অভাব,—যা'তে নাকি তারা ২০০ঘর গৃহস্থ হইয়াও আত্মরক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হইতে পারে নাই,—এত সুস্পষ্ট-ভাবে চোখে পড়িয়াছিল, যে, তাহাতে লজ্জায় অবনত হইতে হয়। যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে তাহারা প্রায়ই ব্যবসায়ী-শ্রেণী—ব্রাহ্মণাদিও আছে। কিন্তু অনেক

বংশালের একটি বাড়ী

জায়গাতেই দেখা ও শোনা যায়, যে, মুসলমানরা নমঃশূদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের আক্রমণ করিতে সাহস পায় না—কারণ জানে যে, তাদের সাহস ও একতা আছে অথচ এদেরই হিন্দু-সমাজ কোণ-ঠাসা করিয়া রাখিয়াছে! দু'এক স্থলে মুসলমানরা না কি নমঃশূদ্রদেরও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর বিরুদ্ধে জাগিবার জন্য প্ররোচিত করিয়াছে শোনা যায়, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সফল হয় নাই। হিন্দুসমাজে আত্ম-ভেদে যে দুর্ব্বলতা আসিয়াছে আজ বুঝি তা'রই প্রায়শ্চিত্ত সুরু হইয়াছে!

মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্ততঃ কতক অংশও যে আজ এইরূপ হীনকার্য্যে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারিতেছে, আর এরূপভাবে ব্যবহৃত হওয়াতে তাদের যে কতদূর নৈতিক অধঃপতন সূচিত হইতেছে, তাহা কি তাঁদের

ভিতর যাঁরা শিক্ষিত তাঁরা ভাবিয়া দেখিবেন না? আমি শুনিয়াছি কোনো কোনো সাধুপ্রকৃতি মুসলমান এই সমস্ত লুটের জিনিষকে 'হারাম' বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁদের কি অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যভাবে এই ভাব

বংশালের একটি ডিস্পেন্সরীর দুরবস্থা

নিজেদের সমধর্ম্মীদের ভিতর প্রচার করা উচিত নয়? মুসলমান ধর্ম্মে কি বিশ্বজনীন সত্য বলিয়া কিছু নাই? পরন্তু লুণ্ঠন কি তাঁদের ধর্ম্মে অধর্ম্ম নয়? মুসলমানকে লুণ্ঠন করিলে পাপ, অন্যকে লুণ্ঠন করিলে পাপ নয়, তাঁদের ধর্ম্মে কি এইরূপ বলে? লুণ্ঠনকারীদের অনেকে না কি বলিয়াছে, যে, সাত দিন কোন আইন নাই, এইরূপ তারা শুনিয়াছিল। যেন আইনের ভয়ই একমাত্র ভয়—ধর্ম্মভয় বলিয়া তাদের কিছুই নাই।

একজন ঠাট্টা করিয়া বলিতেছিলেন, যে, আজ হিন্দু মেয়েরা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে স্বরাজ-পতাকা হাতে লইয়া, আর মোস্লেমনারী ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে লুট করিতে। একদিক দিয়া উভয়েই সমান, যে, উভয়েই গণ্ডীর বাঁধন অতিক্রম করিয়াছে! মুসলমান ভ্রাতারা এ সম্বন্ধে কি বলেন?

আর একটা কথাও ভাবিয়া দেখিবার আছে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্বরু হওয়ার পর ঢাকা সহরে হিন্দুনারীরা দলে দলে সহরের যে কোনো অলিগলি ঘুরিয়া সভাসমিতিতে যোগ দিয়াছে,—চাঁদা আদায় ইত্যাদি করিয়াছে—অনেক সময়ই কোনো পুরুষ সঙ্গে লওয়ার প্রয়োজন হয় নাই। মুসলমান ভ্রাতাদের দ্বারা কোনো প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে, এরূপ ভাবই তাদের মনে আসে নাই। আমি নিজে এই দাঙ্গার অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে শুধু একটিমাত্র মহিলা সহ কংগ্রেসের কাজে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত মুসলমান গাড়োয়ানের গাড়ীতে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াছি,—কোনো সংশয় বা সঙ্কোচ আসে নাই। বাস্তবিক এটা কত বড় বিশ্বাসের ভাব। আর আজ না কি মুসলমানেরা বলে, যে, কই হিন্দু স্ত্রীলোকেরা আজ স্বরাজ-পতাকা লইয়া বাহির হয় না? এখন তারা কই? তারা যে পূর্ব্বে অসঙ্কোচে মুসলমানদের মধ্য দিয়া বাহির হইতে পারিত, সেটাই তা'দের পক্ষে গৌরবের বিষয় ছিল, না আজ যে তা'রা পলে পলে তাদের ভয়ে শঙ্কিত, এটাই তা'দের গৌরবের? আশা করি, শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতারা ইহার উত্তর দিবেন।

মুসলমান লুণ্ঠনকারীরা না কি ঢাকার এক প্রভাবশালী মুসলমানের দোহাই দিয়াছে এবং তাঁহার হুকুমে তাহারা এরূপ করিতেছে ও তাঁহার রাজত্ব হইয়াছে এরূপ ভাবও প্রকাশ করিয়াছে। ধরিলাম মুসলমান রাজত্বই হইয়াছে,—কিন্তু তাহার কি এই নমুনা? বাদশাহের রাজত্ব হইলে তাঁর মুসলমান প্রজা

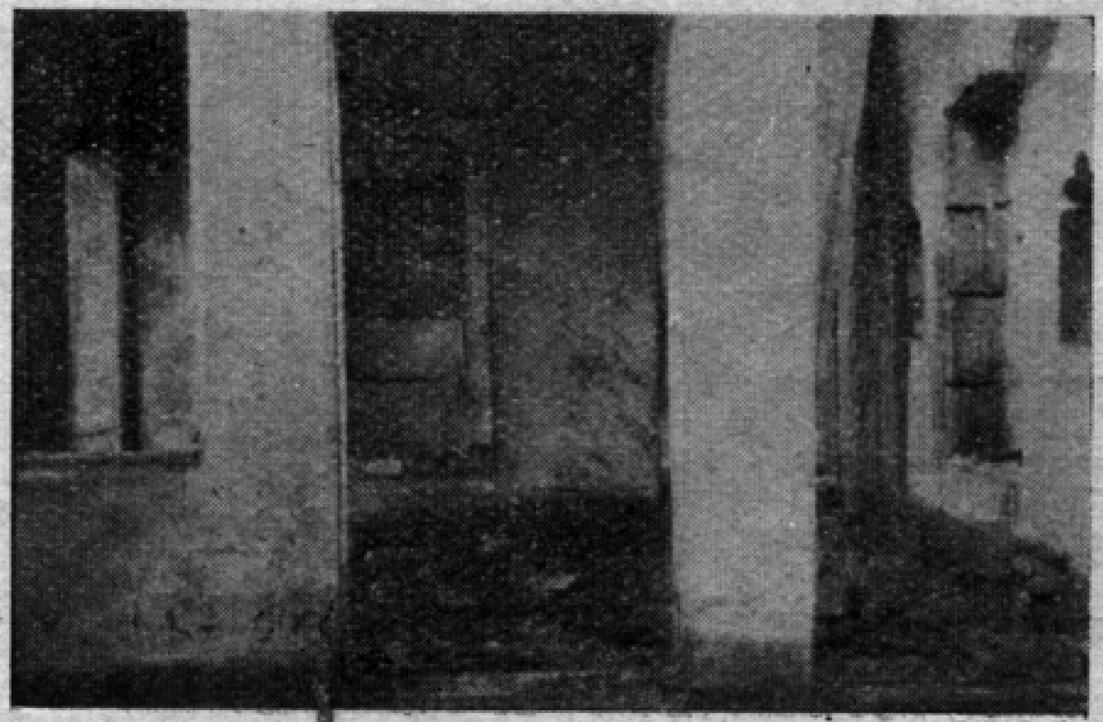

বংশালের একটি বাড়ীর লুণ্ঠনান্তে দুরবস্থা

ছাড়া অন্যধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদের ধন প্রাণ নিরাপদ থাকিবে না, ইহাই কি বাদশাহী রাজত্ব দ্বারা বুঝায় এবং তাহাই কি ইস্লাম-সভ্যতার গৌরববর্দ্ধক? শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতারা ইহার উত্তর দিবেন কি?

বাস্তবিকপক্ষে মুসলমান ভ্রাতাদের ভিতর যাঁরা শিক্ষিত, তাঁদেরই দায়িত্ব অধিক। যারা অশিক্ষিত ও অজ্ঞান, তাদের বুঝাইয়া দেওয়া তাঁদেরই কর্ত্তব্য। হিন্দুসমাজেও অনেক দোষ ছিল ও আছে। কিন্তু সেই দোষ দূর করিবার জন্য যুগে যুগে সংস্কারকেরও অভাব হয়

নাই। মুসলমান সমাজও যদি এখন নিজেদের দোষ দেখিয়া তাহা সংশোধন করিতে অগ্রসর না হন, তাহা হইলে ইহার ফল যে কি বিষময় হইবে তাহা ভাবা যায় না।

আমার যাহা লিখিবার ছিল লিখিলাম। আমি খুবই আশা করিতেছি, যে, আপনি এই দাঙ্গা সম্পর্কে খুব বিশদভাবেই 'প্রবাসী'তে আলোচনা করিবেন—বিশেষ করিয়া শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়কে এই সব বিষয়ে ভাবিয়া দেখিবার জন্য এবং তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিবার জন্য আহ্বান করিবেন। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিনে কোথায় হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া দেশের পরাধীনতা মোচন করিতে অগ্রসর হইবে—আর কোথায় এই শোচনীয় অবস্থা! কিন্তু তবুও আশা করিতেছি যে, বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া এই স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দিবেন।

জনৈকা হিন্দু-মহিলা।

সম্পাদকের মন্তব্য। এই চিঠিতে লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের লোকদিগকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

প্রবাসীর সম্পাদক।

খালাস

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বড়দিনের ছুটী হইয়াছে, নগেন্দ্রবাবু কলিকাতায় শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন।

নগেন্দ্রবাবু একজন পূর্ব্ববঙ্গের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি সম্প্রতি ফরিদসিংহ জেলার সদরে বদলি হইয়াছেন। পূর্ব্ব স্থান হইতে বদলি হইবার সময় স্বীয় স্ত্রী-পুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া যান; বড়দিনের ছুটীতে তাঁহাদিগকে লইতে আসিয়াছেন।

এবার কলিকাতায় বড় ধুম। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন। শিল্পপ্রদর্শনী ত পূর্ব্বাবধিই খুলিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবুর শ্বশুরালয় ভবানীপুরে। তাঁহার শ্বশুরমহাশয় পেনসনপ্রাপ্ত সবজজ। তাঁহার তিনটী শ্যালক আছেন। একজন হাইকোর্টের উকিল। একজন গভর্ণমেণ্ট আপিসে কেরাণীগিরি করেন। অপরটি তাদৃশ কিছু করেন না—সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান।

নগেন্দ্রবাবুর বয়ঃক্রম সাতাইশ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ডেপুটী হইয়াছেন। ইনি এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন, বিদ্যা বুদ্ধি যথেষ্টই আছে, সেইজন্য ইঁহার শালী-শালাজগণ ইঁহাকে নিঃসঙ্কোচে 'ঘটীরাম' বলিয়া ডাকেন। মূর্খ ডেপুটীর নামই দীনবন্ধু "ঘটীরাম" রাখিয়াছিলেন। খোঁড়াকে খোঁড়া, কানাকে কানা বলিলেই তাহাদের রাগের বা দুঃখের কারণ হয়। পদ্মচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি তাহা পরিহাস বলিয়াই গণ্য করে। নগেন্দ্রবাবুও ঘটীরাম সম্ভাবিত হইলে রাগ করিতেন না।

কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্বদিন। ডেপুটীবাবু চা পান করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার ছোট শ্যালক ও শ্যালিকাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে।

গিরীন্দ্রনাথ বলিল—"ফরিদসিংহে এখন আর কোন হাঙ্গামা আছে না কি?"

"হাঙ্গামা হুজুৎ এখন আর কিছু নেই।"

ইন্দুমতী বলিল—"স্বদেশী কেমন চলছে?"

"মন্দ চলচে না। তবে ফরিদসিংহে যাবার আগে কাগজে যে রকমটা পড়তাম তেমন ত কৈ দেখি নে।"

সত্যেন্দ্র বলিল—"তা-ত হবারই কথা। বরাবর সমান তেজটা থাকে না। এই কলকাতাতেই প্রথমে যে রকম দেখেছিলাম—"

ডেপুটী বাবু বলিলেন—"তোমাদের কলকাতার চেয়ে ফরিদসিংহে স্বদেশী ঢের বেশী জোরে চলছে। প্রকাশ্যভাবে সেখানে একখানি বিলিতি কাপড় কেনে কার সাধ্য। এক এক লাঠি কাঁধে ছেলেরা রাস্তায় পাহারা দিয়ে বেড়াচ্চে।"

ছোট শ্যালক বলিল—"জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেরা?"

"অধিকাংশই তাই। অন্য ইস্কুলের ছেলেরাও আছে।"

"মাষ্টারেরা কিছুই বলে না?"

"হাল ছেড়ে দিয়েছে।"

"পুলিস?"

"পুলিসকে তারা থোড়াই কেয়ার করে। বৈকালে বাজারে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছি, পুলিস ঘুরছে আর ছেলেরা বলচে—'এজি এজি সিপাহী, দেখো হাম পিকেট করতা হায়'—আর পিকেটিং করছে।"

ইহা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। সত্যেন্দ্র বলিল—"আচ্ছা নগেনবাবু, আপনি ফরিদসিংহে গিয়ে এবার খোকাকে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি ক'রে দেবেন ?"

নগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন—"আরে সর্ব্বনাশ ! চাকরী যাবে।"

"চাকরী না গেলে আপনি দিতেন ?"

"নিশ্চয়ই। তার আর কথা আছে ?"

গিরীন্দ্র বলিল—"এমন চাকরী করেন কেন ?"

"খাব কি ?"

"কেন আপনার ত ল লেকচার কমপ্লিট রয়েছে। ওকালতিটা পাশ্ করে দিব্যি বড়দাদার সঙ্গে হাইকোর্টে বেরুতে আরম্ভ করুন।"

"আর কি বুড়ো বয়সে এগজামিন পাশ করা পোষায় ভাই ?"

ইন্দুমতী বলিল—'ফিরিঙ্গীর চাকরী ছাড়বেন না তাই বলুন। আচ্ছা আপনি বলুন ত আপনি স্বদেশীর সপক্ষে না বিপক্ষে ?"

"সপক্ষে। এই দেখ না পঞ্চাশ টাকার দেশী কাপড়-চোপড় কিনে এনেছি নিয়ে যাব ব'লে।"

"কেন, সেখানে দেশী কাপড় পাওয়া যায় না নাকি ?"

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিল—"বুঝতে পারিস্ নে ইন্দু, সেখানে কিন্‌লে পাছে সাহেবরা জানতে পারে, এই ভয়ে এখান থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।"

নগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন—"তাতেই বা ক্ষতি কি। লুকিয়ে পুণ্যকর্ম্ম করাতে কি কোন হানি আছে ?"

"তা নেই। তবে প্রকাশ্যে যেন পাপ করবেন না।"

এই সময় বাহিরে সমবেতকণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। সকলে বলিল—"ঐ মাতৃপূজক সমিতি কংগ্রেসের জন্যে ভিক্ষা ক'রতে এসেচে।"

সকলে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন প্রায় পঞ্চাশ জন যুবক ও বালক, মাথায় পীতবর্ণ পাগড়ী, কেহ বা খোল বাজাইতেছে, কেহ বা পঞ্চম বাজাইতেছে, কাহারও হস্তে বন্দে মাতরম্ অঙ্কিত ধ্বজা, একজনের হস্তে একটি বৃহৎ থালা, তাহাতে অনেক টাকা পয়সা রহিয়াছে, সকলে সমস্বরে গান করিতেছে—

কে কোথা আছিস জনম ভূমির
ভকত সন্তান,
মায়ের পূজা হবে, আয় নিয়ে আয়
কে কি করিবি দান।
কার আছে সোনা, কার আছে রূপা,
অঞ্জলি ভরিয়া আন,
ও ভাই, এমন সুদিন কবে আর পাবি,
দিয়ে নে ভরিয়ে প্রাণ।
যার বেশী নাই দিক সে কিঞ্চিৎ,
ছেড়ে লাজ অপমান।
যার কিছু নাই, সে দিক কেবল
ব্যথিত হৃদয় খান॥

বাটীর সকলেই কেহ টাকা, কেহ আধুলি, কেহ সিকি, থালার উপর দিতে লাগিলেন। নগেন্দ্রবাবু একখানি দশ টাকার নোট থালায় রাখিয়া দিলেন।

নোটখানি দেখিয়া খাতা পেন্সিলধারী একজন যুবক আসিয়া বলিল—"মহাশয়ের নাম ?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"নাম দরকার কি ?"

"পাঁচ টাকার বেশী হ'লে নাম লিখে নেওয়ার নিয়ম আছে।"

তবে লিখুন "জনৈক বন্ধু।"

সত্যেন্দ্র বলিল—"ওহে লেখ জনৈক ডেপুটী। ইনি পূর্ব্ববঙ্গের একটী ডেপুটী।"

গিরীন্দ্রবাবু বলিলেন—"না—না। জনৈক বন্ধু ব'লেই লিখে নাও।"

যুবকগণ তাহাই লিখিয়া লইয়া গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হইয়াছে। ফরিদসিংহ বাজারের রাস্তায় কতিপয় বিদ্যালয়ের বালক পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল। দেখিল, একটি সওদাগরের দোকান হইতে এক ব্যক্তি এক টিন বিস্কুট হাতে করিয়া বাহির হইল।

দেখিবামাত্র ছেলেরা তাহার সঙ্গ লইল। একজন বলিল, "ওহে, কি রকম বিস্কুট কিন্‌লে দেখি ?"

লোকটি বিস্কুটের বাক্স দেখাইল।

ছেলেরা বলিল—"ছি ছি, এ যে বিলাতী।"

"কাহে বাবু, বিলাতী তো আচ্ছা হায়।"

"তুমি হিন্দু না মুসলমান ?'

"মুসলমান।"

একজন ছেলে বলিল—"বিলাতী চিজ্ হারাম হায়।"

লোকটি বলিল—"তোবা, তোবা। ঐসা বাৎ মৎ বলিয়ে বাবু।"

"কত দাম নিলে ?"

"দেড় রুপিয়া।"

"অ্যাঁ, দেড় টাকা ? এর চেয়ে ভাল, তাজা দেশী বিস্কুটের টিন এক টাকায় পাওয়া যায়।"

লোকটা সাহেবের চাপরাশি। তাহার মনিব একজন চা-কর, সম্প্রতি আসাম হইতে আসিয়া ডাকবাঙ্গলায় অবস্থান করিতেছেন। সে ভাবিল, সাহেব ত আমায় বিস্কুটের জন্য দেড় টাকাই দিয়াছে, এক টাকায় যদি ইহার অপেক্ষা ভাল বিস্কুট পাওয়া যায়, আমার আট গণ্ডা পয়সা লাভ। মন্দ কি ? তাই জিজ্ঞাসা করিল—"সচ্ বাত বাবু ?"

ছেলেরা একটু উৎসাহিত হইয়া বলিল—"হাঁ, সত্য বৈ কি। চল তোমাকে দেশী বিস্কুটের টিন দেখাই। এস, এ টিনটা ফিরিয়ে দেবে এস।"

চারি পাঁচজন বালক সে চাপরাশিকে লইয়া সওদাগরের দোকানে গেল। কিন্তু সওদাগর টিন ফিরিয়া লইতে কিছুতেই রাজী হইল না। সে বলিল—"একে স্বদেশীর জ্বালায় বিলাতী টিন আর বিক্রয় হয় না। মাল পড়িয়া পচিতেছে। একটা যদি বিক্রয় করিয়াছি ত উহা আর কোন ক্রমেই ফিরিয়া লইব না।"

তখন বালকেরা দোকানের বাহিরে আসিয়া নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, তাহারা নিজ ব্যয়ে এক টিন বিস্কুট কিনিয়া দিবে। চাপরাশিকে বলিল—"দেখ, তোমার ও টিন আমাদের দাও। আমরা এক টিন দেশী বিস্কুট তোমাকে কিনিয়া দিতেছি।"

চাপরাশিকে স্বদেশী দোকানে লইয়া গিয়া বালকেরা তাহাকে এক টিন দেশী বিস্কুট কিনিয়া দিল।

চাপরাশি বলিল—"বাবু ইস্কাতো দাম এক রুপিয়া। হামারা বাকী আট আনা পয়সা ?"

ছাত্রেরা দোকানে বলিল—"আট আনা পয়সা দিন ত। দেড় টাকাই আমাদের নামে লিখে রাখুন, কাল দিয়ে যাব।" আট আনা লইয়া বালকেরা চাপরাশিকে দিল।

চাপরাশি পয়সাগুলি পকেটে রাখিয়া বলিল—"বাবু, আচ্ছা বিস্কুট তো ?"

"বহুৎ আচ্ছা। থাকে দেখো। আউর কভি বিলাতি বিস্কুট মৎ খাও। হারাম হায়।"

'তোবা তোবা' বলিয়া চাপরাশি ডাকবাঙ্গলা অভিমুখে রওনা হইল।

ছেলেরা বলিল—"ভাই এ টিনটাকে "বন্দেমাতরম" করা যাক এস।" বলিয়া টিন খুলিয়া বিস্কুটগুলা রাজপথে ছড়াইয়া দিল। তখন সকলে 'বন্দেমাতরম' এবং 'বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত' এই গান করিতে করিতে বিস্কুটের উপর নৃত্য করিতে লাগিল। দুই এক মিনিটেই সমস্ত বিস্কুট চূর্ণ হইয়া রাজপথের সেই অংশ শুভ্র করিয়া ফেলিল। একজন খালি টিনটাকে পদাঘাতে তালতোবড়া করিয়া, এক লাথিতে রাস্তার পার্শ্বস্থিত ড্রেনে ফেলিয়া দিল। তখন সকলে আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল। চাপরাশি অল্প দূর হইতে এ সমস্ত ব্যাপারই দেখিল। আসাম হইতে নূতন আসিয়াছিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। পথচারী একজনকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু-লোগ পাগলা হুয়া না ক্যা?"

সে বলিল—"বন্দেমাতরম হইয়া অবধি লেড়কা লোক কাহাকেও বিলাতী জিনিষ কিনিতে দেয় না।"

"কেয়া বোলতা হায়? বন্দুক মারম?"

"নেই নেই, বন্দেমাতরম্।"

"উ ক্যা হায়?"

"ক্যা জানে ভাই। একঠো গালি হোগা। সাহেব লোগকো দেখনে সে আজকাল লেড়কা লোক ঐ বাৎ বোলতা হায়।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নগদ আট আনা পয়সা লভ্য করিয়া চাপরাশি প্রফুল্লমনে ডাক-বাঙ্গলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দেখিল সাহেব বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছেন।

চাপরাশিকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেঁও এত্তা দেরী কিয়া?" বলিয়া বিস্কুটের টিনটি হাতে করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। "হিন্দু বিস্কুট" দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই টিন চাপরাশির মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুঁড়িয়া মারিলেন। চাপরাশি বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়াছিল, মার খাইয়া নিম্নে পড়িয়া গেল। টিনের আঘাতে কপাল কাটিয়া রক্তপাত হইল।

সাহেব পতনে দৃক্‌পাত না করিয়া বলিলেন—"ড্যাম শূয়ার কা বাচ্চা—ইয়া দেশী বিস্কিট কাহে লায়া?"

চাপরাশি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বারান্দায় আসিল। "হুজুর—হাম বিলাতি বিস্কুট পহিলে লিয়া থা। লেকিন—"

"ক্যা হুয়া?"

"লেকিন ইস্কুলকে লেড়কা লোক—চাপরাশি আট আনা পয়সার মায়া ত্যাগ করিয়া বলিয়া যাইতেছিল যে, বালকগণের প্ররোচনায় দেশীয় বিস্কুটই ভাল শুনিয়া তাহাই লইয়াছে। কিন্তু সাহেব অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বাধা দিয়া বলিলেন—"ইস্কুলকে লেড়কা লোক? বন্দেমাতরম্? ছিন্ লিয়া?"

এতক্ষণে চাপরাশিপুঙ্গব অকূল সমুদ্রে কূল পাইল। বলিল—"হাঁ হুজুর, ছিন্ লিয়া।"

"কাহেকো দিয়া?"

"হুজুর, উনলোগ বিশ পঁচাশ আদমি—হাম একেলা, কেয়া করে?"

সাহেব বুঝিলেন, সংবাদপত্রে যাহা পাঠ করিয়া থাকেন, হুবহু তাহাই ঘটিয়াছে। বলিলেন—"ইউ ড্যাম কাউয়ার্ড, পুলিসকো কাহে নেই বোলায়া?"

চাপরাশি বলিল—"হাম পুলিস্ পুলিস্ বোলকে বহুৎ চিল্লায়া হুজুর। লেকিন কোই কনেষ্টবিল নেহি আয়া। লেড়কা লোক, বিস্কুট তোড়কে রাস্তামে ছিটায় দিয়া, আউর 'বন্দুক মারো' না ক্যা বোলকে সব বিস্কুট পায়েরসে চুর চুর কর দিয়া। হাম ক্যা করে; হুজুরকা চা ঠাণ্ডা হো যাতা হ্যায়, হামারা পাশ আপনা একঠো রূপিয়া থা, তো ঐ একঠো দেশী বকস্ লে লিয়া। এক রূপিয়া সে তো বিলাতী টিন দেতা নেই গরীব পরবর।"

সাহেব বলিলেন—"আচ্ছা, হাম ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকা পাশ অভি যাতা। লেড়কা লোককো হাম জেহেল মে ভেজেগা।" বলিয়া টুপী লইয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে চা-কর সাহেব ক্লব অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, জজ সাহেব, পুলিস সাহেব প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন মেম সাহেবও ছিলেন। জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিলিয়ার্ড খেলিতেছিলেন। জয়েণ্ট সাহেব, পুলিস সাহেব ও তাহাদের মেমদ্বয় তাস খেলিতেছিলেন। সাহেবরা হুইস্কি, পেগ এবং মেম সাহেবেরা ভার্মুথ পান করিতেছিলেন।

চা-কর সাহেব নিজ কার্ড ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পাঠাইয়া দেওয়া মাত্র তাঁহার আহ্বান হইল। তিনি প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—"Very sorry to intrude—" তাহার পর সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শুনিয়া আগুনের মত জলিয়া উঠিলেন। পুলিস সাহেবকে বলিলেন—"I say—this is serious."

পুলিস সাহেব বলিলেন—"আমি এখনই যাইতেছি।" বলিয়া তাসের হাত ডাক্তার সাহেবকে দিয়া বাহির হইলেন। আর্দ্দালিকে বলিলেন—"কোতোয়ালী দারোগাকো অভি ডাকবাংলামে আনে কহো।"

সাহেবদ্বয় তখন ডাকবাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চা-কর বলিলেন—"Tis really very good of you to take so much trouble."

পুলিস সাহেব বলিলেন, "দিন দিন বন্দেমাতরম" নিউসেন্স অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহা নিশ্চয়ই জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেদের কাজ।"

চা-সাহেব বলিলেন—"While we wait for your Daroga, may I offer you a peg?"

"Thanks, I don't mind."

বোতল গেলাস ও সোডাওয়াটার বাহির হইল। হাভানা চুরুট বাহির হইল। দুই জনে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, বাঙ্গালীর বেয়াদবী, গবর্ণমেণ্টের শিথিলতা, বিলাতে 'শ্বেতবাবু'গণের স্বদেশদ্রোহিতা সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দারোগা কসিমুল্লা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

পুলিস সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"দারোগা আজ বাজারমে দাঙ্গা হুয়া জানতা?"

"হাঁ হুজুর, অভি খবর মিলা।"

"ক্যা action লিয়া?"

"হুজুর, ফরিয়াদীকা তল্লাসমে জমাদার মোতায়েন কিয়া।"

"ফরিয়াদী ইহাঁ হ্যায়, ইতালা লিখ লেও।"

"যো হুকুম হুজুর"—বলিয়া দারোগা চাপরাশিকে লইয়া বারান্দায় গেল। আলোকাদি সংগ্রহ করিয়া এজাহার লিখিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, মনিবকে যেমন বলিয়াছিল, চাপরাশি দারোগাকেও সেইরূপ বলিল। লিখিতে লিখিতে দারোগা বলিল—"কোথাও জখম আছে?"

চাপরাশি, সাহেবের প্রহারে তাহার কপালে যে জখম হইয়াছিল, তাহাই দেখাইয়া দিল।

চা-কর সাহেব ইহা দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিল—"ড্যাম নেটিভগণ এইরূপ মিথ্যাবাদীই বটে।" দারোগা লিখিয়া লইল—"বাদী কপালে জখম ও কাপড়ে রক্তের দাগ দেখাইল।"

এতেলা গ্রহণ হইলে—পুলিস সাহেব হুকুম দিলেন—"আজ রাত্রেই যেমন করিয়া পার আসামী গ্রেপ্তার করিতে হইবে। রাত্রে জামিন চাহিলে জামিন দিবে না।" হুকুম দিয়া চা-করকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া পুলিস সাহেব প্রস্থান করিলেন।

দারোগা চা-কর সাহেবকে বলিল—"হুজুর আপনার এই চাপরাশিকে আসামী সেনাক্ত করিবার জন্য একটু ছুটি দিতে হইবে।"

"All right, চাপ্‌রাশি যাও। দারোগা সাথ আসামী দেখলাও।"

চাপরাশি বলিল—"হুজুর, অনেক ছেলে,তাহাতে রাত্রি হইয়াছিল। চিনিতে পারিব কি ?"

সাহেব রাগিয়া বলিলেন—"শূয়ার নেহি পচানে সকো, হাম তুম্‌কো ডিস্‌মিস্ করেগা।"

"বহুৎ খুব হুজুর"—বলিয়া চাপরাশি প্রস্থান করিল। দারোগা তাহার সহিত আর কোন অনুসন্ধান মাত্র না করিয়া একবারে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে গিয়া উপস্থিত হইল। শিক্ষকেরা তখন কেহ ছিলেন না। ছাত্রেরাও অনেকে অনুপস্থিত ছিল। একটি ঘরে চারি পাঁচটি ছেলে প্রদীপ জ্বালিয়া পাঠ মুখস্থ করিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে তিনজনকে চাপরাশি অম্লানবদনে সেনাক্ত করিয়া দিল। দারোগা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল। বলা বাহুল্য এই বালকগণের মধ্যে কেহ কিছুই জানিত না। বালকত্রয় বলিল—"দারোগা সাহেব, আমাদের কেন গ্রেপ্তার করিতেছ ? আমরা কি করিয়াছি ?"

দারোগা বলিল—"কি করিয়াছ তাহা আদালতেই মালুম হইবে।" বলিয়া দারোগা তিনজন কনেষ্টবলের জিম্মায় তাহাদিগকে থানায় পাঠাইয়া দিল।

তাহার পর দারোগা চাপরাশিকে হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া সরকারী ডাক্তারের দ্বারায় তাহার জখম পরীক্ষা করাইয়া সার্টিফিকেট লেখাইয়া লইল। শেষে বলিল—"থানায় চল।"

"কেন ?"

"আসামী চিনিবার জন্য।"

"আসামী ত চিনিয়া দিলাম।"

"আরে না না। ছেলেদের ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিবে এস। কাল কোন ডেপুটীবাবু আসিলে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে তাহাদের মিশাইয়া দাঁড় করাইয়া দিবে। তখন তোমায় আসামী চিনিয়া বাহির করিতে হইবে। না পারিলে মোকর্দ্দমা ফাঁসিয়া যাইবে, চালান হইবে না। থানায় এস, ভাল করিয়া সেই তিনজনাকে চিনিয়া রাখ।"

"দেরী হইলে সাহেব গোসা হইবে যে।"

"যাও সাহেবের কাছে ছুটি লইয়া আইস।"

চাপরাশি গিয়া সাহেবের কাছে সকল কথা বলিয়া ছুটি চাহিল। সাহেব ছুটি দিলেন এবং মনে মনে বলিলেন—"ড্যাম নেটিভ পুলিস, এই রকম dishonestই বটে।"

দারোগা তখন, বাজার ও অন্যত্র হইতে আরও তিন চারিজন লোক এবং সওদাগরকে সাক্ষী-স্বরূপ ডাকাইয়া আনিল। পুলিসের শাসনে তাহারা যাহা দেখিয়াছে তাহা এবং যাহা দেখে নাই তাহাও সাক্ষী দিতে স্বীকৃত হইল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত থানায় বসিয়া বালকত্রয়কে

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই মোকর্দ্দমার বিচারভার পড়িল ডেপুটি নগেন্দ্রবাবুর উপর।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ডেপুটিবাবু কাছারী হইতে ফিরিয়া জলযোগাদি অন্তে, অন্তঃপুরের বারান্দায় বসিয়া আরাম করিতেছেন।

নগেন্দ্রবাবুর গৃহিণী বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী। তাঁহার নাম চারুশীলা। চারুশীলা আসিয়া পতির পার্শ্বে উপবেশন করিলেন; বলিলেন—"আজ মনটা এমন ভার ভার দেখছি কেন ?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"না—এমন কিছু নয়।"

গৃহিণী কিন্তু শুনিলেন না। পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। শেষে ডেপুটীবাবু বলিলেন—"ছেলেদের মামলাটা, এত লোক থাক্‌তে আমার ঘাড়েই চাপিয়েছে।"

চারুশীলা বলিলেন—"তোমার কাছে হবে ? সে ত ভালই হ'ল। আমার বরং ভাবনা ছিল।"

"কি ভাবনা ?"

"যে কার কাছে বা মোকর্দ্দমাটা পড়ে, হয়ত সাহেবদের খুসী করবার জন্যে অবিচার করে ছেলে তিনটিকে জেলেই পাঠাবে। তোমার কাছে হ'ল, আমি নিশ্চিন্ত হলাম।"

তাঁহার স্বাধীনচিত্ততায় স্ত্রীর এই সরল বিশ্বাসে ডেপুটীবাবু মনে মনে হাসিলেন। বলিলেন,—"যদি প্রমাণ হয়, তা হ'লে ত ছেলেদের সাজা দিতে হবে। আমি ত আর অবিচার করে তাদের খালাস দিতে পারব না।"

চারুশীলা বলিলেন—"ছি! অবিচার কেন করবে। যদি বাস্তবিক প্রমাণ হয়,—ওরা আমার আপনার ছেলে হলেও আমি খালাস দিতে বল্‌তাম না। কিন্তু আমি যে রকম শুনলাম, ছেলেদের ত কিছু দোষ নেই।"

"কোথায় শুনলে ?"

"এই সেদিন মুন্সেফবাবুর বাড়ীতে বউভাতে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেকে বল্লেন যে ছেলেরা চাপরাশিকে রাজি করে তার কাছ থেকে বিলিতি বিস্কুটের টিন কিনে নিয়েছে ; নিয়ে ভেঙ্গেছে। কেড়েও নেয়নি, মারেও নি। তা ছাড়া যে তিনজন ছেলেকে পুলিশ ধরেছে তারা মোটে সেখানে ছিলও না, কিছুই জানে না।"

ডেপুটীবাবু একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"এ সকল প্রমাণ হয় তবে না।"

"খুব প্রমাণ হবে। কত লোকে দেখেছে, কত লোকে জানে।"

"আর যদি প্রমাণ না-ই হয়, তবে না হয় কিছু জরিমানা করে ছেড়ে দিও। আহা ছেলেমানুষ, না বুঝে যদি একটা অন্যায় কাজ করেই থাকে, তবে কি তাদের জেলে দেবে, যেমন অন্য কয়েক জায়গায় হ'য়েছে ?"

কিন্তু ডেপুটীবাবুর মনের বিষণ্ণতা দূর হইল না। এই সময় আর্দ্দালি আসিয়া একখানি পত্র দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব লিখিয়াছেন কল্য প্রাতে ৮টার সময় ডেপুটীবাবু যেন গিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

পরদিন যথাসময়ে পোষাক পরিয়া নগেন্দ্রবাবু সাহেব ভবনে উপস্থিত হইলেন। আরও কয়েকজন ব্যক্তি দর্শনার্থী হইয়া বাহিরে বারান্দায় একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। নগেন্দ্রবাবু কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। এক মিনিট পরে চাপরাশি আসিয়া তাঁহাকে আফিস কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল ও বলিল—"সাহেব ছোট হাজরী খাইতেছেন, এখনই আসিবেন।"

সাহেব আসিয়া করমর্দ্দন করিয়া নগেন্দ্রবাবুকে বসাইলেন

"এখন স্বাভাবিক অবস্থাই ত দেখা যায়।"

"স্বদেশীওয়ালাদের মধ্যে বিশেষ কোনও উত্তেজনা নাই ?"

"কৈ তেমন ত কিছু দেখি না।"

"This Swadeshi is a damned rot ;—নগেন্দ্রবাবু আপনি স্বদেশী সম্বন্ধে কি মনে করেন ?"

"আজ্ঞা—"

"যথার্থ স্বদেশী—অর্থাৎ দেশের শিল্পোন্নতির যথার্থ চেষ্টা, সে খুব ভাল। তাহার প্রতি আমাদের সকলেরই সহানুভূতি আছে। কিন্তু এই হাল্লা,—কাপড় পোড়ান, এ সব কি ?"

নগেন্দ্রবাবু অপরাধীর মত বলিলেন—"ওগুলো ভাল নয়।"

"By the way—সেই বিস্কিটের মোকর্দ্দমাটা আপনার ফাইলে আছে না ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"উঃ—ছেলেদের কি স্পর্দ্ধা! গরীব চাপরাশিকে মারিয়া কপাল ফাটাইয়া দিয়াছে। বিস্কিটগুলা রাস্তায় ছড়াইয়া তাহার উপর পৈশাচিক নৃত্য করিয়াছে। এসব ছেলে এখন হইতে যদি কঠিন শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয় তবে বড় হইলে ইহারা চোর ডাকাত হইয়া উঠিবে। ইহাদের বিশেষ শিক্ষা হওয়া আবশ্যক।"

নগেন্দ্রবাবু মেঝের কার্পেটের উপর দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া নীরব রহিলেন।

সাহেব বলিলেন—"নগেন্দ্রবাবু, ফরিদসিং কিরূপ স্থান মনে হইতেছে ? আমি ত দেখিতেছি এখানে সমস্তই বড় দুর্ম্মূল্য।"

কথোপকথনের বিষয় পরিবর্ত্তনে নগেন্দ্রবাবু খুসী হইয়া বলিলেন—"হাঁ মহাশয়, সব জিনিষই এখানে বড় দুর্ম্মূল্য। দুধ চারি আনা করিয়া সের।"

"আমি যখন ভাগলপুরে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম, সেখানে টাকায় ছয়টা করিয়া বড় বড় মুর্গী পাওয়া যাইত। এখানে এক টাকায় আড়াইটা তিনটার বেশী পাওয়া যায় না। সেখানে আট টাকায় বাবুর্চ্চি, বেয়ারা, প্রভৃতি পাইতাম। এখানে পনেরো টাকা দিতে হয়।"

"হাঁ সাহেব। চাকর-বাকরও এখানে বড় মহার্ঘ। আমাদের অল্প বেতন, কিছুতেই সঙ্কুলান করিতে পারি না।"

"আপনি এখন কোন্ গ্রেডে আছেন ?"

"আড়াই শত।"

"কত দিন ?"

"প্রায় তিন বৎসর।

"তি—ন—বৎ—স—র! Shame! 'Tis a downright shame! আমি আপনার Service Book দেখিয়া তিন শত টাকার গ্রেডে উন্নতির জন্ম শীঘ্রই কমিশনার সাহেবকে লিখিব।"

নগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়া সাহেবকে ধন্যবাদ দিলেন। ক্রমে সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"Well Nagendra Babu, I won't detain you longer"—বলিয়া স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।

যাইবার সময় বলিলেন—"স্বদেশী সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ পাইলেই আমাকে আসিয়া জানাইবেন। This Swadeshi must be stamped out at any cost."

বেতনবৃদ্ধির সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"হাঁ হুজুর। আমার যথা সাধ্য আমি তাহা করিব।"

বাহিরে যাহারা পূর্ব্বাবধি দর্শনার্থী হইয়া বসিয়াছিল, তাহাদের প্রতি গর্ব্বিত দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্রবাবু গাড়ীতে উঠিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধার্য্য দিনে বালকত্রয়ের বিচার আরম্ভ হইল। যেদিন তাহারা গ্রেপ্তার হয়, তাহার পরদিন কয়েকটি প্রধান উকীল বাবু জামীন হইয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারাই নিজ অর্থব্যয়ে, নিজ বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া, মোকর্দ্দমার তদ্বির ও পরিচালনা করিতেছেন।

চাপরাশি পূর্ব্ব উক্তিই বজায় রাখিল। জেরায় তাহাকে আসামীর উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন সাহেব তাহাকে বিস্কুটের টিন ছুঁড়িয়া মারিয়া কপালে রক্তপাত করিয়াছে কি না। সে অস্বীকার করিল। বলিল, কীল চড় দ্বারায় ছেলেরাই ও জখম উৎপন্ন করিয়াছে।

চা-কর সাহেবও, ড্যাম-নেটীভের পদানুসরণ করিয়া, বিস্কুটের টিন ছুঁড়িয়া মারা সাফ্ অস্বীকার করিলেন।

বাজারের কয়েকজন লোক, পথে বিস্কুট ভাঙ্গা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিল, কিন্তু আসামীকে সেনাক্ত করিতে পারিল না। ভাঙ্গা বিস্কুটের টিনটা এবং ধূলিমিশ্রিত বিস্কুটের গুঁড়া কাগজে মুড়িয়া পুলিস কর্ত্তৃক 'এগজিবিট' হইল।

সওদাগর আসামীত্রয়কে সেনাক্ত করিয়া বলিল, ইহারা এবং অপর কয়েকজন চাপরাশিসহ বিস্কুটের টিন ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছিল। বাবুরা বাহির হইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ পরে দূর হইতে মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি শুনিয়াছিল। জেরায় বলিল, ইস্কুলের ছেলেরা তাহার দোকানের নিকট পিকেট করিয়া তাহার অনেক ক্ষতি করিয়াছে বটে, কিন্তু তজ্জন্ম ছেলেদের উপর তাহার কোনও রাগ বা শত্রুতা নাই।

হাঁসপাতালের ডাক্তার বলিলেন—"কপালের জখম কোনও শাণিত কঠিন বস্তুর দ্বারা হইয়াছে।" জেরায় বলিলেন—"চড় দ্বারা ওরূপ জখম হওয়া অসম্ভব।"

বাদীর সাক্ষী শেষ হইলে সাফাই সাক্ষীর জন্ম দিন ধার্য্য হইল।

স্বদেশী দোকানের কর্ম্মচারী আসিয়া প্রকৃত ঘটনা বলিল, আরও বলিল, যে ছাত্রগণ দোকানে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ডকে কেহ নাই।

একজন ডাক্তার বলিলেন, তিনি পথ দিয়া যাইতেছিলেন, চাপরাশি স্বেচ্ছায় বিলাতী বিস্কুটের টিন ছেলেদের দিয়াছে দেখিয়াছেন। দেশী বিস্কুট কিনিবার জন্ম ছাত্রদের সঙ্গে সে স্বদেশী দোকানে গিয়াছে তাহাও দেখিয়াছেন। পুলিসের জেরায় ডাক্তারবাবু স্বীকার করিলেন যে স্বদেশী দোকানে তাঁহার দুই শত টাকার শেয়ার আছে এবং তিনি নিজে একজন পাকা স্বদেশী।

ডাকবাঙ্গলার খানসামা আসিয়া সাক্ষ্য দিল। চা-কর সাহেব যে চাপরাশিকে টিন ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন তাহা সে বলিল। সেই টিনে কপাল কাটিয়া জখম হইয়াছে; বাজার হইতে যখন আসে তখন জখম ছিল না। পুলিসের জেরায় খানসামা স্বীকার করিল যে উকীল বাবুগণ মাঝে মাঝে তাহার নিকট ভৃত্য পাঠাইয়া মুর্গীর রোষ্ট, কাটলেট, প্রভৃতি ফরমাইস দেন। সন্ধ্যার পর একটু গা-ঢাকা হইলেই ভৃত্যগণ আসিয়া সে সব খাদ্য লইয়া যায়। তাহাতে মাসে মাসে তাহার কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন হইয়া থাকে।

মোকর্দ্দমা শেষ হইল। হুকুম হইল, সপ্তাহ পরে রায় বাহির হইবে।

ইতিমধ্যে দেখা গেল ডেপুটীবাবু দুই তিন দিন ধড়াচূড়া বাঁধিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে গেলেন। লোকে কানাকানি করিতে লাগিল।

রায়ের দিন আদালতগৃহ লোকে লোকারণ্য। বিস্তর ইস্কুলের বালক আসিয়াছে। অন্যান্য লোকও আসিয়াছে।

রায় বাহির হইল। আসামীগণ সকলে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে। প্রত্যেকের তিনমাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা।

রায় শুনিয়া ছেলের দল বন্দেমাতরম বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পুলিস অনেক কষ্টে গোল থামাইয়া বালকগণকে আদালত-গৃহ হইতে অপসৃত করিয়া দিল।

আসামী পক্ষের প্রধান উকিল কালীকান্তবাবু রায় চাহিয়া পাঠ করিলেন। বিচারক লিখিয়াছেন, বাদীর সাক্ষীগণের উক্তিতে অনেকস্থলে অনৈক্য দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সকল minor discrepancies—উহাতে বরং এই প্রমাণ হয় যে সাক্ষীরা শিখানো নহে। সত্য বটে কোন কোন সাক্ষী বলিয়াছে হাঙ্গামার সময় পনেরো কুড়িজন ছেলে ছিল। আবার কেহ কেহ বলিয়াছে পঞ্চাশ ষাট জন ছিল, কিন্তু কেহই গণনা করিয়া দেখে নাই অনুমানে ভুল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বাদী বলিয়াছে ছেলেরা চড়-চাপড় মারিয়া তাহার কপালে ক্ষত করিয়াছে। কিন্তু ডাক্তার বলিতেছেন কোন কঠিন শাণিত দ্রব্যে ঐ ক্ষত হইয়াছে, চড়-চাপড়ে হইতে পারে না, ইহার উপর আসামীর উকিল বিশেষ জোর দিয়া বলিতেছেন যে ঘটনা মিথ্যা। কিন্তু আমার বিবেচনায় ঐ সময়ে বাদী এত ভীত ও বিমূঢ় হইয়াছিল যে বালকেরা তাহাকে ঠিক কি প্রকারে আঘাত করিয়াছে তাহা স্মরণ রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সাফাই সাক্ষীগণের যে সমস্ত কথাই মিথ্যা তাহার কোন সংশয় নাই। সকলেই তথাকথিত স্বদেশীর দল। উকিল বলিয়াছেন ডাকবাঙ্গলার খানসামা নিরপেক্ষ সাক্ষী, উহার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু জেরায় দেখা যাইতেছে খানসামা উকিল বাবুগণের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি। সে বারমাসের খরিদ্দারকে চটাইয়া আসাম হইতে আগত সাহেবের পক্ষাবলম্বন করিয়া সত্য বলিতে পারে না। ইত্যাদি।

উকীলবাবু রায়ের নকল বাহির করিয়া লইয়া জজ সাহেবের নিকট আপিল দায়ের করিয়া জামিনের হুকুম লইলেন।

এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র বালকগণ ভীষণরবে বন্দেমাতরম ধ্বনি করিয়া উঠিল। কোথা হইতে একখানা গাড়ী আনিয়া তাহাতে বালকত্রয়কে বসাইয়া, ঘোড়া খুলিয়া নিজেরা গাড়ী টানিয়া সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইল এবং সমস্বরে গাহিতে লাগিল—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে—
মোদের বাঁধন টুটবে ততই।...

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেদিন ডেপুটীবাবু ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চোর যেন চুরি করিয়া ফিরিল। খুনী যেন খুন করিয়া আসিয়াছে। ডেপুটীবাবুর চক্ষু অবনত, মুখ কালিমাময়।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, চারুশীলা মুখখানি বিমর্ষ করিয়া চুপ করিয়া বারান্দার কোণে বসিয়া আছেন। ডেপুটীবাবু বুঝিলেন এ বিমর্ষতার কারণ কি।

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীর নিকট অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি গো, অমন করে বসে কেন?"

চারুশীলা নিরুত্তর।

"কি হয়েছে?"

"মাথাটা ধরেছে।"

"মাথা ধরেছে? কখন ধরল? এস দেখি রুমালে একটু ওডিকলোন ভিজিয়ে মাথায় বেঁধে দিই। এখনি সেরে যাবে।"

চারুশীলা স্বামীর দিকে না চাহিয়া বলিলেন—"থাক্ দরকার নেই।"

ভাবগতিক দেখিয়া নগেন্দ্রবাবু সরিয়া গেলেন।

দাসী তাঁহার চা ও জলখাবার আনিয়া দিল। অন্যদিন গৃহিণী এসময় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি অনুপস্থিত। নগেনবাবু জলখাবার খাইতে গেলেন, কিন্তু তাহা গলা দিয়া যেন নামিতে চাহে না। বুকের ভিতরটা কে যেন পাথর বোঝাই করিয়া দিয়াছে। জলখাবার ফেলিয়া রাখিয়া কেবল চাটুকু নিঃশেষে পান করিলেন।

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া ধূমপান করিলেন। শেষে উঠিয়া অপরাধীর মত আবার স্ত্রীর নিকট গেলেন। তিনি তখনও সেইরূপ ভাবেই বসিয়া আছেন।

ধীরে ধীরে বলিলেন—"মাথাটা একটু সারল?"

চারুশীলা সঙ্কেতে জানাইলেন, সারে নাই।

নগেনবাবু তাহার হাতটি ধরিয়া বলিলেন—"এস এস উঠে এস। আজ একটা ভাল খবর আছে, ব'লব মনে ক'রে কত আমোদ ক'রে এলাম, আর তুমি রাগ করে বসে রইলে।"

স্বামীর আগ্রহাতিশয্যে চারুশীলা উঠিয়া আসিলেন। নগেনবাবু বলিলেন—"আজ সাহেব আমার ৫০৲ বেতন বৃদ্ধির জন্যে কমিশনার সাহেবকে অনুরোধপত্র লিখেছেন।"

একথা শুনিয়া চারুশীলার চক্ষুযুগল দিয়া প্রবলবেগে অশ্রু বহিল।

নগেনবাবু বলিলেন—"ওকি, চোখের জল ফেল কেন?" বলিয়া একহাতে স্ত্রীর হাতটি ধরিয়া, অন্যহাতে চোখের জল মুছাইতে চেষ্টা করিলেন।

চারুশীলা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন—"ওগো আজ আমায় মাপ কর। আজ আমার কাছে এস না, কোন কথা বলো না।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

নগেন্দ্রবাবু বাহিরে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। আর একবার তামাকের হুকুম করিলেন। ধূমপান করিতে করিতে তাঁহার মানসিক অশান্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, যেদিন কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেদিন কি ছিলেন, আর আজ কি হইয়াছেন। আজ চারুশীলা তাঁহাকে কাছে আসিতে কথা কহিতে বারণ করিয়াছে। আজ তিনি পতিত, কলঙ্কিত। পবিত্র বিচারাসনে বসিয়া, জানিয়া শুনিয়া, আজ তিনি অবিচার করিয়া আসিয়াছেন। আজই কি প্রথম? কিসের জন্য? কেবল দগ্ধোদরের জন্য। বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষা সাধনার ফল, ধর্ম্মবুদ্ধি, বিবেক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা,---শুধু দগ্ধোদরের জন্য ভাসাইয়া দিয়াছেন। ছি! ছি! পূর্ব্বকালে অর্দ্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত ডেপুটীরা ঘুষ লইত। তাহাদের মার্জ্জনা ছিল। সুশিক্ষাভিমানী নগেন্দ্রবাবু গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পদবৃদ্ধিস্বরূপ ঘুষ লইয়া বিচারাসন কলঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার কি মার্জ্জনা আছে?

ডেপুটীবাবু এই সকল কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। শেষে অস্থির হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। চাদর লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। অন্ধকার অন্ধকার পথ খুঁজিয়া সেই পথগুলিতে অনেকক্ষণ বেড়াইলেন।

সারারাত্রি ভাল নিদ্রা হইল না।

পরদিন কাছারী বন্ধ ছিল। প্রভাতে উঠিয়া ভৃত্যকে বলিলেন—"আজ মফস্বল যাইব।" সকালে আহারাদি করিয়া প্রস্তুত হইলেন।

ইহা শুনিয়া চারুশীলা আসিলেন। স্বামীর মুখপানে চাহিয়া

তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া সতীর মন করুণায় দ্রবীভূত হইল। কাছে আসিয়া বলিলেন "কবে ফিরবে?"

"কাল সকালেই ফিরব।"

"দেরী কোরো না।"

"কেন দেরী হ'লে তোমার দুঃখ কি?"

স্বামীর এই অভিমানবাক্যে চারুশীলার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"ওকি—ওকি—শান্ত হও। এখনি কেউ এসে পড়বে।"

কিন্তু চারুশীলার দুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"তোমার এ দুঃখ আমি আর দেখতে পারি নে। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন কি করলে তুমি সুখী হও বল।"

চারুশীলা স্বামীবক্ষ হইতে মুখ অপসৃত করিয়া বলিলেন—"আমায় একটি ভিক্ষা দেবে?"

"কি, বল।"

"এ চাকরী ছাড়। যে চাকরী বজায় রাখবার জন্যে অধর্ম্ম করতে হয় সে চাকরীতে কাজ কি? আমি তোমার তিন শো টাকা চাইনে। আমি এ ধনদৌলত সোনারূপো চাইনে। তুমি যদি মাষ্টারী করেও আমায় মাসে ৫০৲ টাকা এনে দাও, আমি তাইতেই সংসার চালিয়ে নেব।"

একথা শুনিয়া ডেপুটীবাবু এক মুহূর্ত্ত মাত্র ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন—"তাই হবে।"

বাহিরে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ট্রেনের সময় সন্নিকট। ডেপুটীবাবু বলিলেন—"তাই হবে। তুমি কেঁদ না।" বলিয়া পত্নীকে সস্নেহে চুম্বন করিয়া বাহিরে আসিলেন।

* * * *

পরদিন প্রভাতে চাপরাশি ডাক লইয়া আসিল। ডেপুটীবাবু তখনও মফস্বল হইতে ফেরেন নাই। চারুশীলা দেখিলেন কয়েকখানি চিঠির সঙ্গে এক বোঝা সংবাদপত্র। এত সংবাদপত্র কোন দিন আসে না। একখানি খুলিয়া দেখিলেন, "সন্ধ্যা" পত্রিকা। "করিদ-সিংহে যাত্রাম-লীলা" নামক একটি প্রবন্ধ রহিয়াছে—তাহার চারিপার্শ্বে লাল কালীর রেখাঙ্কিত। ছাত্রদের মোকর্দ্দমার উল্লেখ করিয়া 'সন্ধ্যা' তাহার নিজস্ব অপভাষায় নগেন্দ্রবাবুকে ভয়ঙ্কর গালি দিয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করিবার ধৈর্য্য চারুশীলার রহিল না। অপর একখানি পত্রিকা খুলিয়া দেখিলেন, তাহাও ঐ তারিখের "সন্ধ্যা"—ঐ প্রবন্ধ লাল পেন্সিলদ্বারা রেখাঙ্কিত। এইরূপ গণিয়া দেখিলেন, ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেটে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সেই তারিখের সতেরখানা "সন্ধ্যা" কলিকাতা হইতে সকৌতুকে নগেন্দ্রবাবুর নামে পাঠাইয়া দিয়াছে। পাছে স্বামীর দৃষ্টিপথে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় সমস্ত "সন্ধ্যা"গুলি চারুশীলা লইয়া জ্বলন্ত চুল্লীমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

বেলা ৯টার সময় ডেপুটীবাবু ফিরিলেন এবং তাড়াতাড়ি আহারাদি করিয়া কাছারী গেলেন।

চারুশীলা পুত্রকে বলিলেন—"আজ ইস্কুল গেলি নে?

"না আজ যাব না।"

"কেন, ছুটি আছে নাকি?"

"না।"

"তবে?"

"ইস্কুল গেলে ছেলেরা আমায়"---বলিয়া বালক আর বলিতে পারিল না। তাহার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যেই পথেঘাটে অন্যান্য বালকেরা তাহাকে অপমান করিয়াছে।

চারুশীলা বুঝিলেন। বলিলেন---"আচ্ছা তবে থাক্। আমারও একটু কাজ আছে।"

দ্বিপ্রহরে গাড়ী ডাকিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি বাহির হইলেন। কালীকান্তবাবু উকীলের বাড়ী গিয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

সেদিন সেখানে আরও দুই তিনটি উকীলের স্ত্রী সমবেত হইয়াছিলেন। চারুশীলাকে দেখিয়া অন্যান্য মহিলারা কোন কথা বলিলেন না। মুখভার করিয়া রহিলেন। কালীকান্তবাবুর স্ত্রী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। কিন্তু সে অভ্যর্থনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত সাদর নহে।

চারুশীলা বসিয়া, অন্যান্য কথার পর ছেলেদের মোকর্দ্দমার কথা তুলিলেন।

একটি মহিলা বলিলেন—"ওটা বড়ই দুঃখের বিষয় হয়েছে।"

কালীকান্তবাবুর স্ত্রী বলিলেন---"আপিলে বোধ হয় টিঁকবে না, ওঁরা বলছিলেন।"

একজন বলিলেন---"তবে যদি স্বদেশী মোকর্দ্দমা বলে সাহেবেরা অবিচার করে।"

চারুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপিলের দিন কবে হয়েচে জানেন?"

"কবে ঠিক বলতে পারি নে। শীঘ্রই হবে।"

"ছেলেরা কলকাতা থেকে কোন ভাল ব্যারিষ্টার নিয়ে আসুক।"

"সে অনেক টাকা খরচ। ছেলেরা কোথায় পাবে? এঁরাই ক'রবেন এখন।"

চারুশীলা অবনত মস্তকে বলিল—"টাকা আমি দেব।"

এ কথায় সকলে একটু বিস্মিত হইলেন। কালীকান্তবাবুর স্ত্রী বলিলেন—"আপনি দেবেন কেন?"

চারুশীলার মনে যাহা ছিল, মুখে তাহা ব্যক্ত করিলেন না। করিলে তাহা পতিনিন্দার মত শুনায়। কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুইটি জলপূর্ণ হইয়া আসিল। বলিলেন—"আপনারা এই মোকর্দ্দমায় ছেলেদের সাহায্যের জন্য কত টাকা ব্যয়, কত ত্যাগ স্বীকার করছেন। আমি কি এর জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার করবার অধিকারী নই? আমি এই এক জোড়া বালা এক জোড়া অনন্ত এনেছি। এ বেচলে হাজার টাকার উপর হবে। এই টাকা দিয়ে কলকাতা থেকে ছেলেদের আপিলের দিন কোন ভাল ব্যারিষ্টার আনাবার ব্যবস্থা করুন। আমার মনে একটু শান্তি যাতে পাই, তার উপায় করুন।" ইহা বলিতে বলিতে চারুশীলার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিল।

কালীকান্তবাবুর স্ত্রী গহনাগুলি লইলেন। বলিলেন—"আচ্ছা, উনি বাড়ী আসুন, ওঁকে বলবো।"

এই ঘটনায় অন্যান্য মহিলাগণের মনও দ্রবীভূত হইল। তাঁহারা তখন চারুশীলার সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে চারুশীলা বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বভবনে ফিরিয়া আসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ছেলেদের আপিল শেষ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে বড় ব্যারিষ্টার আনা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। জজ সাহেব আপিল ডিসমিস করিলেন। ছেলেরা জেলে গিয়াছে। হাইকোর্টে মোশানের বন্দোবস্ত হইতেছে।

এদিকে নগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী যে গহনা বিক্রয় করিয়া ছেলেদের সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কানেও একথা উঠিয়াছে। শুনিয়া অবধি তিনি নগেন্দ্রবাবুর উপর বড় কঠোর আচরণ করিতেছেন। ইতিমধ্যে একদিন কার্য্যোপলক্ষে সাহেব খাসকামরায় নগেন্দ্রবাবুকে তলব করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করেন নাই। আমলার মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া এবার সাহেবকে কাজ বুঝাইয়া দিতে হইয়াছিল।

কয়েকদিন পরে নগেন্দ্রবাবুর একটা রায়, জজ সাহেব উল্টাইয়া দিলেন। এই উপলক্ষে নগেন্দ্রবাবুর দোষ না থাকিলেও, কার্য্যে ভুল ধরিয়া সাহেব আমলাগণের সমক্ষেই নগেন্দ্রবাবুকে অভদ্রভাবে কটূক্তি করিলেন।

নগেন্দ্রবাবু কর্ম্মত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুতই হইয়াছেন। কলিকাতায় গিয়া আইন পরীক্ষা দিয়া, ওকালতী করিবেন, মাঝে মাঝে স্বামী স্ত্রীতে এ বিষয়ে জল্পনা কল্পনা হইয়া থাকে। মাসখানেকের মধ্যেই কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন ইহাই আপাততঃ স্থির হইয়াছে।

জজ সাহেব কর্ত্তৃক ছেলেদের আপিল ডিসমিসের দুই এক দিন পরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে কুঠিতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। পূর্ব্বে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাঝে মাঝে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে যাইতেন, ইদানীং আর যান নাই।

সেদিন প্রভাতে পোষাক পরিয়া, গাড়ী করিয়া, নগেন্দ্রবাবু সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত হইলেন। নিজ কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের রীতি ছিল, হাকিম কিম্বা বড় জমিদার আসিলে আপিস কামরায় তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করাইতেন। চুনাপুঁটিদের লোক আসিলে তাহাদিগকে বারান্দার বেঞ্চে বসিয়া থাকিতে হইত। আজ চাপরাশি ফিরিয়া তাঁহাকে আপিস কামরায় না লইয়া গিয়া সেই বেঞ্চিতে বসিতে অনুরোধ করিল!

সেখানে কয়েকজন চুনাপুঁটী পূর্ব্ব হইতেই বসিয়াছিল। তাহাদের সহিত একাসনে না বসিয়া নগেন্দ্রবাবু পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বুঝিলেন, সাহেব তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া অপমান করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ বেড়াইবার পর ভিতর হইতে একজন চাপরাশি ছুটিয়া বাহির হইয়া বলিল—"বাবু, জুতাকা আওয়াজ মত করিয়ে, সাহেব গোস্‌সা হোতা হায়। বেঞ্চপর বৈঠিয়ে।"

দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিয়া নগেন্দ্রবাবু বেঞ্চে উপবেশন করিলেন। চুনাপুঁটীগণ তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে একটু সরিয়া বসিল।

ইতিমধ্যে আরও দুইজন সেলামার্থী আসিয়া বেঞ্চে বসিল। নগেন্দ্রবাবু রুমাল বাহির করিয়া মুহুর্মুহু কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন। ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

ক্রমে সাহেব ছোট হাজরী সারিয়া আপিস কামরায় আসিলেন। প্রথম ডাকিয়া পাঠাইলেন নগেন্দ্রবাবুকে নয়। যাঁহারা নগেন্দ্রবাবুর পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের একে একে ডাক পড়িল। যাঁহারা পরে আসিয়াছিলেন তাঁহাদেরও ডাক পড়িল। শেষে নগেন্দ্রবাবু একা বেঞ্চে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

এই সময়টা তাঁহার যে কি ভাবে কাটিয়াছিল তাহা তিনিই জানেন এবং তাঁহার ইষ্টদেবতাই জানেন। এই সময়ের মধ্যে নগেন্দ্রবাবু দন্তে দন্ত দৃঢ়বদ্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, কর্ম্মত্যাগ করিবেন এক মাস পরে নহে অদ্যই।

অবশেষে নগেন্দ্রবাবুর ডাক পড়িল। তিনি ক্রোধে মাতালের মত টলিতে টলিতে সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিলেন।

অন্য দিনের মত সাহেব আজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন না।

"গুড মর্ণিং সার।"

"গুড মর্ণিং বাবু।"

বাবু!—অন্যদিন হইলে সাহেব বলিতেন—নগেন্দ্রবাবু। সাহেব বিলক্ষণ জানিতেন, শুধু "বাবু" বলিয়া সম্ভাষিত হইলে পদস্থ বাঙ্গালী অপমান বোধ করে।

নগেন্দ্রবাবু ইহাও লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিল, এই আঘাতে কোনও নূতন বেদনা অনুভব করিলেন না।

সাহেব চুরুট মুখে করিয়া বলিলেন---"সহরে এখন স্বদেশীর অবস্থা কিরূপ?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন---"ভালই।"

"শুনিয়া সুখী হইলাম। ইহা বিস্কিট মোকর্দ্দমায় কঠিন শাস্তির সুফল।"

নগেন্দ্রবাবু মনে মনে একটু হাসিলেন, বলিলেন---"আপনি বোধ হয় আমার কথাটা ভুল বুঝিয়াছেন। ভালই---অর্থাৎ স্বদেশীর পক্ষে ভালই, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নয়। সেই মোকর্দ্দমার পর হইতে লোকের স্বদেশী পণ দৃঢ়তর হইয়াছে।"

সাহেব যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া নগেন্দ্রবাবুর মুখপানে চাহিলেন। বলিলেন---"তবে ভালই কেন বলিলেন? আপনিও একজন স্বদেশী নাকি?"

নগেন্দ্রবাবু গর্ব্বিতভাবে বলিলেন---"স্বদেশী আন্দোলন হইয়া অবধি এক পয়সার বিলাতী জিনিষ আমার গৃহে আসে নাই।"

সাহেবের মুখ ও কর্ণ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। তিনি জানিতেন, অনেক সরকারী কর্ম্মচারী লুকাইয়া লুকাইয়া স্বদেশীব্রত রক্ষা করে, কিন্তু সাহেবের সাক্ষাতে এমন করিয়া দর্প ত কেহ করে না। তিনি বুঝিলেন যে এই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া, নগেন্দ্রবাবু সদ্যপ্রাপ্ত অপমানের প্রতিশোধ লইতেছেন। সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে এই নীতির অনুসরণ করিয়া সাহেব বলিলেন---"হাঁ আমি শুনিয়াছি, বাঙ্গালী মহিলারা স্বদেশী বিষয়ে পুরুষগণের অপেক্ষাও দৃঢ়তর।" বলিয়া সাহেব একটু

হাসির ভাণ করিলেন। একটু পরেই বলিলেন---"By the way---শুনিলাম নাকি আপনার স্ত্রী ঐ মোকর্দ্দমার আপিলে হাজার টাকা দিয়া ছেলেদের সাহায্য করিয়াছেন? ইহা সত্য না কি?"

"সত্য। হাইকোর্টে মোশেন হইবে, তাহার খরচও বহন করিতে আমার স্ত্রী প্রস্তুত হইয়াছেন।"

সাহেব নিজ স্থৈর্য্য আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। আবার তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন—"এটা কি গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ নয়?"

নগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"সম্ভবতঃ, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার স্ত্রী গবর্ণমেন্টের চাকর নহেন।"

ক্রোধের সহিত বিস্ময় ভাবও সাহেবের মনে আধিপত্য করিতে লাগিল। তিনি এতদিন চাকরি করিতেছেন, এ প্রকার তেজের কথা ত বাঙ্গালীর মুখে অদ্যাবধি শুনেন নাই। সাহেব বুঝিলেন, আজ নগেন্দ্রবাবু তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আচ্ছা, তাহার অমোঘ ঔষধও সাহেবের কাছে আছে। তাহা প্রয়োগ করিলে চাকরিগতপ্রাণ বাঙ্গালী এখনি নতজানু হইয়া সাহেবের ক্ষমা ভিক্ষা করিবে।

এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন—"সে কথা যাউক। আজ যে জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি তাহা বলি। সম্প্রতি আপনার কাজকর্ম্মে অত্যন্ত শিথিলতা দেখা যাইতেছে। আপনি যদি এখনই সাবধান না হন, তবে আপনার বেতনবৃদ্ধির অনুরোধ-পত্র আমাকে ত প্রত্যাহার করিতে হইবেই, হয়ত বা আপনাকে ডিগ্রেড্ করিতেও বাধ্য হইতে পারি।"

এই কথা বলিয়া সাহেব নগেন্দ্রবাবুর মুখের পানে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিলেন---ঔষধ ধরিল কি না। বাবুর মুখ নিশ্চয়ই ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইবে এবং তিনি ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য আকুল হইয়া উঠিবেন।

কিন্তু তাহা হইল না। নগেন্দ্রবাবুর মুখে, অল্পে অল্পে, একটু ঘৃণা-মিশ্রিত হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন---"তাহা স্বচ্ছন্দে আপনি করিতে পারেন। কারণ উহাতে আমার কোনই ক্ষতি হইবে না।"

সাহেব অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন---"তাহার অর্থ কি?"

"আমি স্থির করিয়াছি, কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিব। অদ্যই আপিসে আমার কর্ম্মত্যাগপত্র আপনার হস্তগত হইবে। আমাকে মাসান্তে যাহাতে বিদায় দিতে পারেন, বিলম্ব না হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সে চেষ্টা করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।"

শুনিয়া সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বাঙ্গালী! বাঙ্গালী হইয়া, এত বড় চাকরিটা এক কথায় ছাড়িতে উদ্যত হইয়াছে?

নগেন্দ্রবাবু পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন। দেখিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন---"আমি আর আপনার সময় নষ্ট করিব না। গুড মর্ণিং।"

সাহেব অন্যমনস্ক হইয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন---"গুড মর্ণিং।"

* * * *

এক মাস কাটিল। আজ নগেন্দ্রবাবুর চাকরির শেষ দিন। বৈকাল বেলা দেখা গেল, তাঁহার এজলাসের বাহিরে বহুসংখ্যক স্কুলের বালক সমবেত হইয়াছে। অনেকের হাতে বন্দেমাতরম্ ধ্বজা।

তিনি বাহির হইবামাত্র বালকেরা তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিল। একখানা ফিটন গাড়ী আনিয়াছিল। তাহাতে নগেন্দ্রবাবুকে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিল।

কিন্তু নগেন্দ্রবাবু সম্মত হইলেন না।

বালকেরা জিদ করিতে লাগিল। বলিল ঘোড়া খুলিয়া আজ তাঁহাকে তাহারা টানিয়া লইয়া যাইবে।

পথ দিয়া একজন গ্রাম্য ও একজন নাগরিক নিরক্ষর লোক যাইতে-ছিল—ব্যাপারখানা বুঝিতে না পারিয়া গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—"একি, বাহে? বাবুর সাদি না কি?"

নাগরিক ব্যক্তি উত্তর করিল---"আমার পছন্দ হয়, বাবুর জ্বাল হয়েছিল, আজ খালাস হইছে।"

এদিকে, বালকেরা নগেন্দ্রবাবুকে টানিবার জন্য বিস্তর পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু নগেন্দ্রবাবু কিছুতেই রাজি হইলেন না; অন্য দিনের মতই পদব্রজে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দুই মাস ব্যাপী বিচ্ছেদের পরে আজ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হইল। *

* ১৩১৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসী হইতে পুনর্মুদ্রিত।

পঞ্চশস্য

"নো" নৃত্যের মুখোস—

জাপানী মুখোসের মধ্যে 'নো' মুখোস শ্রেষ্ঠ। প্রাচীন গিগাকু এবং বুগাকু নাচগানের মুখোসগুলিও সুন্দর কিন্তু তাহাতে জাপানের

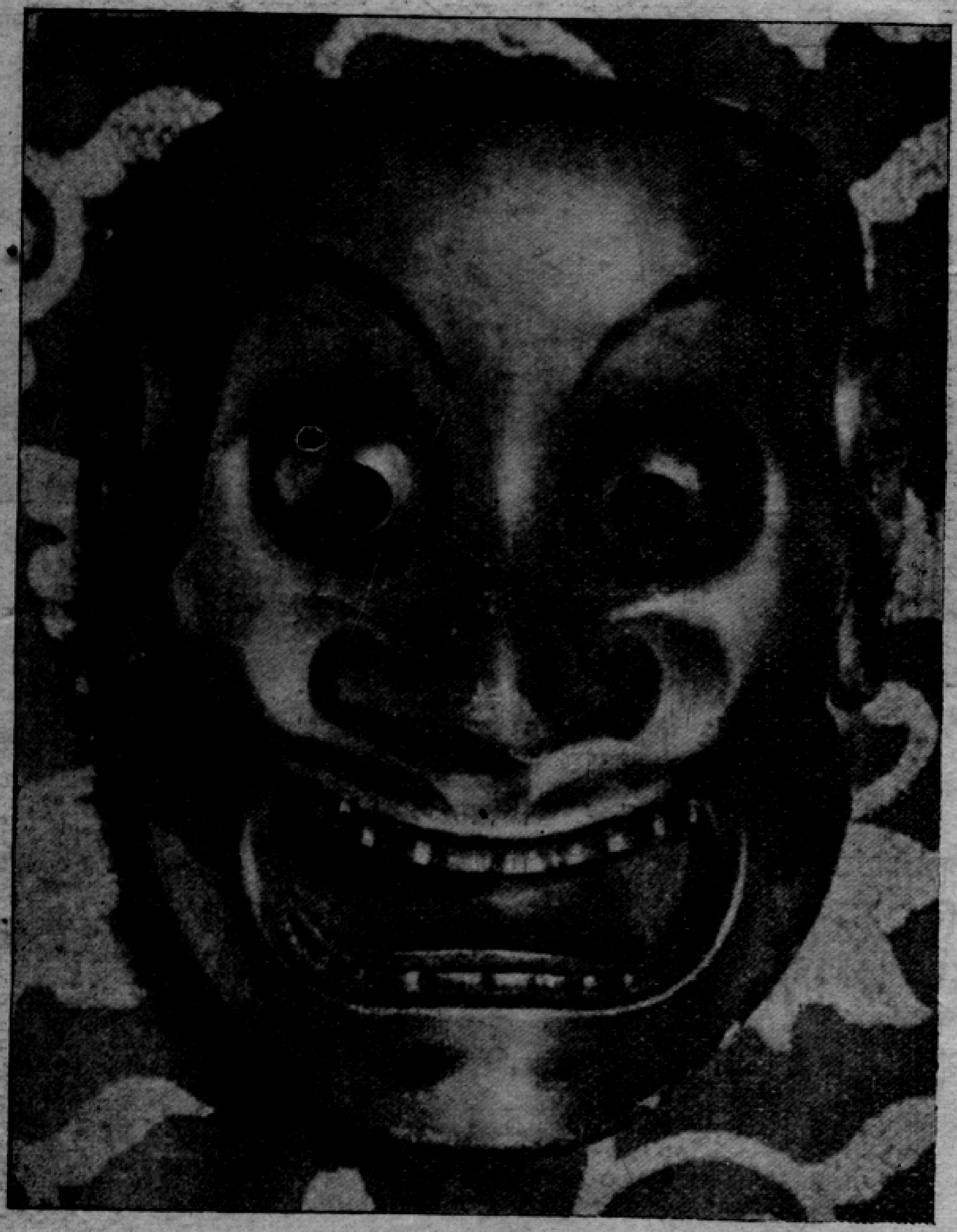

ডেমে ইয়োশিমিৎসু কৃত ওতোবিতে মুখোস (১৬১৬ খৃঃ অব্দ)

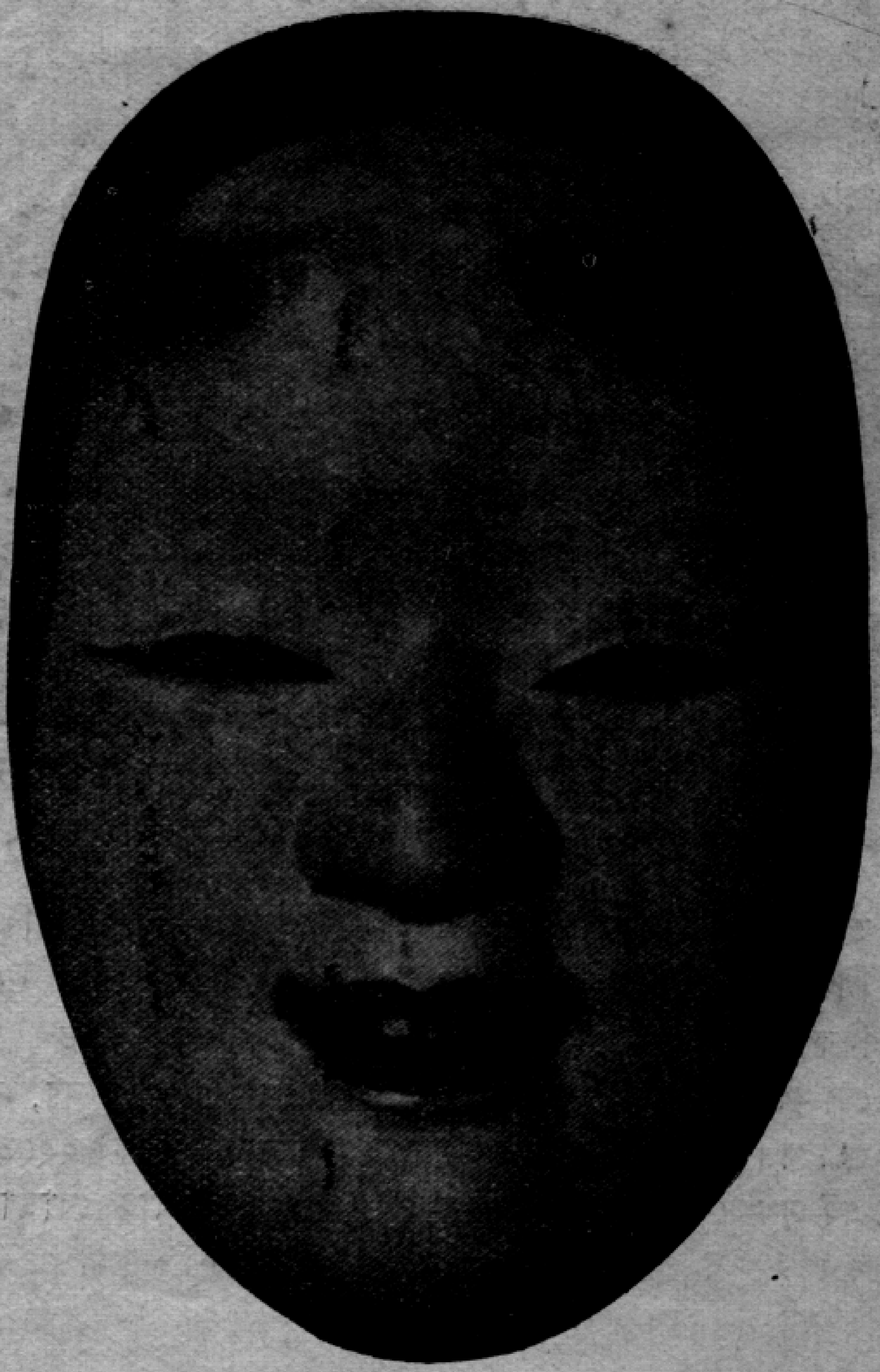

ইশিকাওয়া তাতশুয়েমন শিগেমাসা কৃত কুমোতে মুখোস (১২৮০খৃঃ অব্দ)

কোন বিশিষ্টতা দেখা যায় না। এইগুলি চীন, কোরিয়া এবং ইন্দো-চীনের মুখোসের অনুকরণে তৈরী। 'নো' মুখোসের উপর ইহাদের প্রভাব থাকিলেও নো মুখোস কালক্রমে এমন একটি স্বরূপ লাভ করিয়াছে যাহা সম্পূর্ণ জাপানী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সব দেশ হইতে জাপানে মুখোসের আমদানী সে সব দেশে এখন আর মুখোসের চিহ্নও নাই।

সপ্তম শতাব্দীতে সাম্রাজ্ঞী সুইকোর আমলে একজন কোরিয়াবাসী জাপানে প্রথম গিগাকু অভিনয় এবং কতকগুলি মুখোস আনে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব তখন জাপানে খুব বেশী। যুবরাজ সোতাকু তাইসি তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। জনসাধারণকে আনন্দ দিবার জন্য তিনি মন্দিরে গিগাকু অভিনয় প্রচলন করেন। মুখোসগুলি, কতকগুলি পোষাক, এবং একখানি পুরাতন পুঁথি হইতে মনে হয় গিগাকু একপ্রকার প্রহসন গোছের অভিনয় ছিল। বুগাকুর প্রচলন গিগাকুর কিছু পারে হয় এবং গিগাকু হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বুগাকু অতি গুরুগম্ভীর। বুগাকু মুখোসগুলি ছোট এবং কেবল মুখ আবৃত করিয়া রাখে। গিগাকু মুখোস সে তুলনায় অনেক বড় এবং প্রাচীন গ্রীক মুখোসের মত সমস্ত মাথায় পরিতে হয়। মূলতঃ গিগাকু মুখোসগুলি বস্তুতান্ত্রিক এবং বুগাকু মুখোস রূপক। নো-মুখোস এ দুইএর এক দলেও পড়ে না। নো-মুখোস ভাবহীন। একই মুখোসে দুঃখ, আনন্দ, রাগ কিংবা

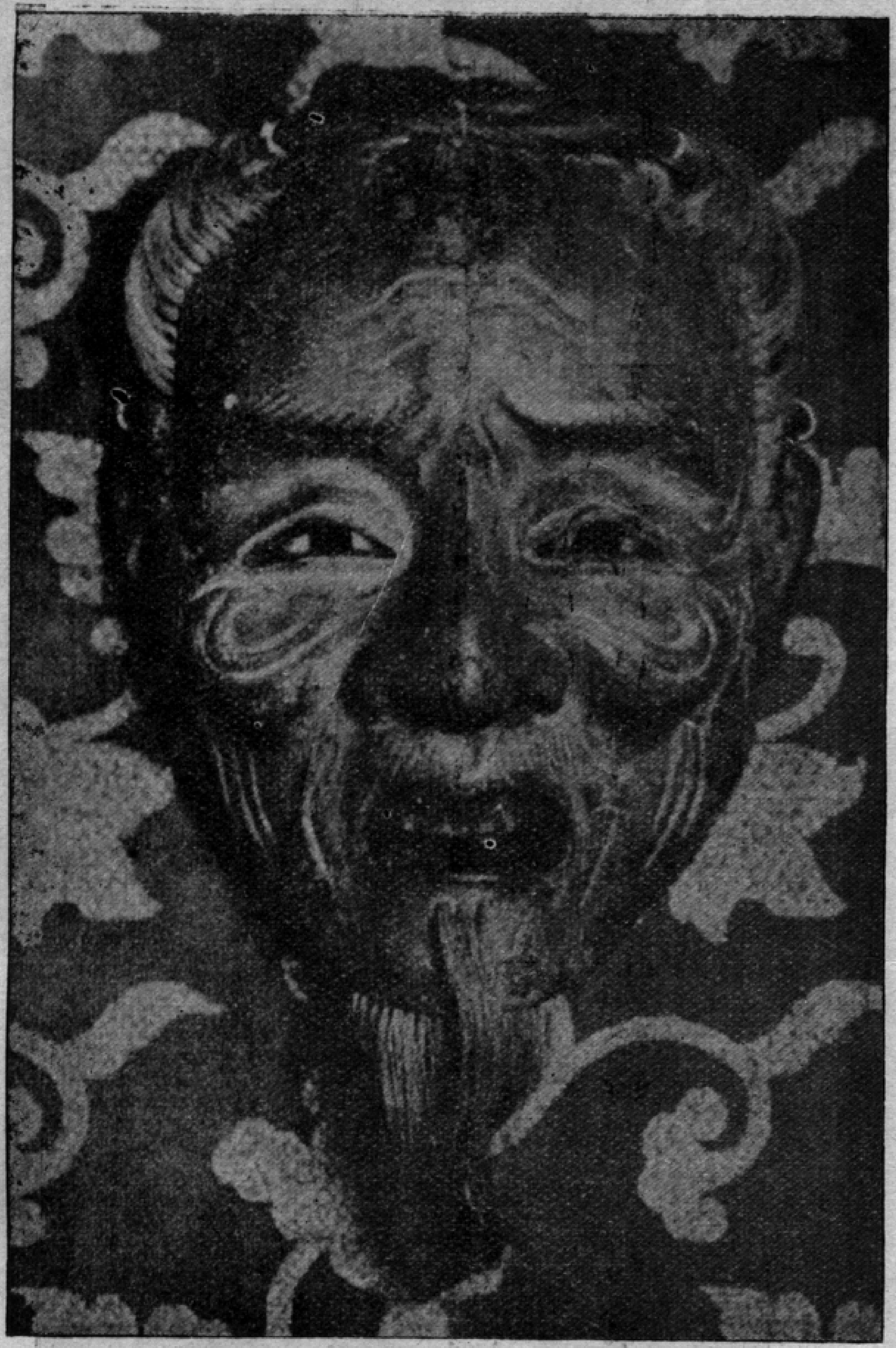

ফোজো মুখোস (১৩৭০ খৃঃ অব্দ)

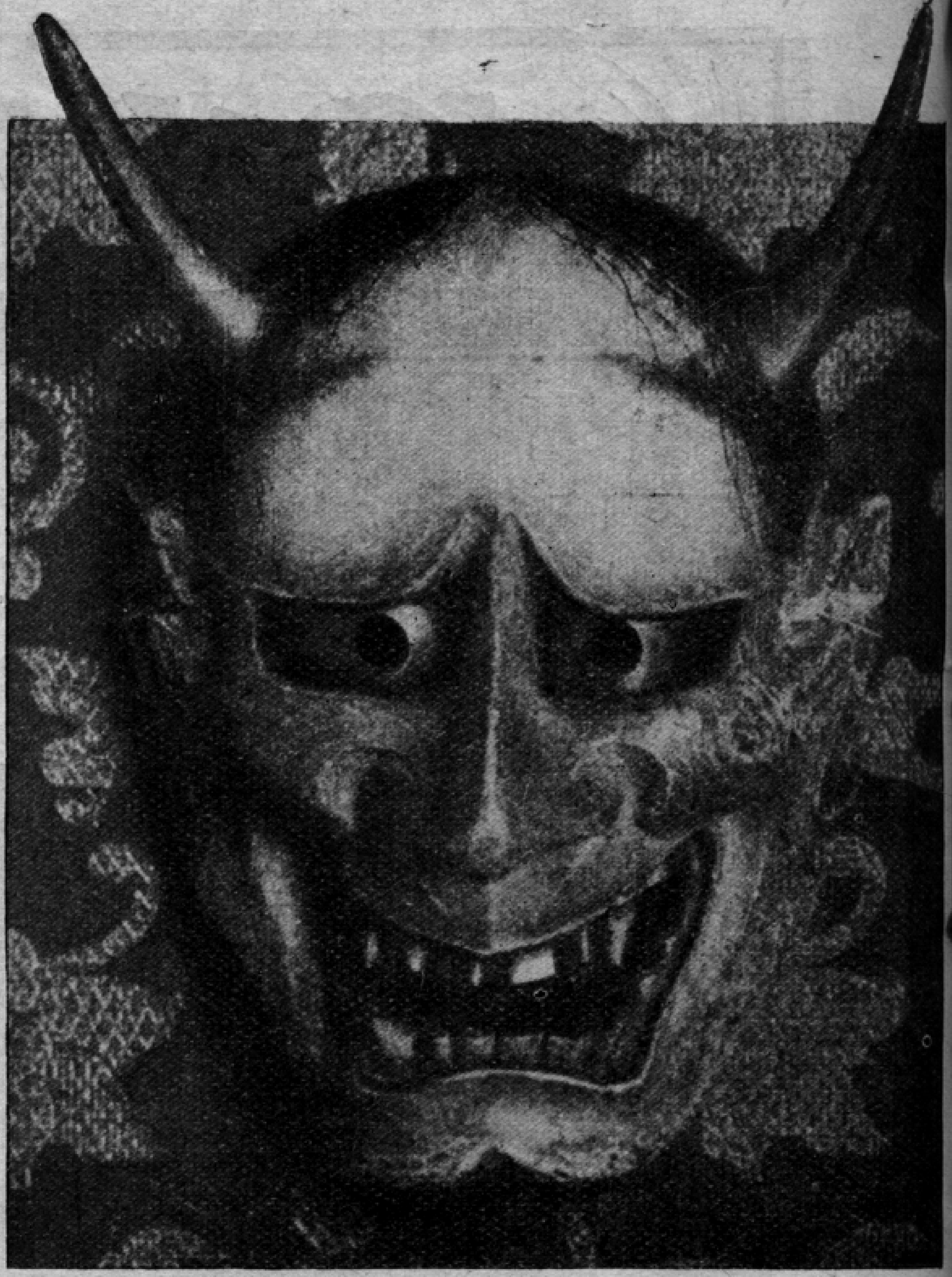

হান্না মুখোস (১২৮০ খৃঃ অব্দ)

ভয়ের ভাব আনা যায়। সম্পূর্ণতার দিক হইতে দেখিতে গেলে গিগাকু কিম্বা বুগাকুই শ্রেষ্ঠ কিন্তু অভিনয়ে মুখোসের উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিক হইতে নো-মুখোস চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। নো-মুখোসের মুখ সম্পূর্ণ বোজাও নয়; সম্পূর্ণ খোলাও নয়, বরং অর্দ্ধেক খোলা। এর ফলে এক একটা বিশেষ দিকে হইতে দেখিলে এই মুখ খোলাও দেখান যাইতে পারে আবার বোজাও দেখান যাইতে পারে। চোখের দৃষ্টিতে আরও বেশী বাহাদুরি আছে। এক রাজকুমারীর মুখোসের চোখের দৃষ্টি বক্রভাবে দেখিলে ঈর্ষ্যা-পরিপূর্ণ দেখায়, আবার সমান ভাবে দেখিলে তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ফিরিয়া আসে।

নো-অভিনয়গুলি নানাভাগে বিভক্ত—যেমন দেবতা, সৈন্য, রমণী, উন্মত্ত রমণী এবং দানব। প্রত্যেক দৃশ্যের উপযোগী মুখোস আছে। সেইগুলি যথাযথক্রমে ব্যবহৃত হয়।

মুরোমাটি যুগে নো-অভিনয় চরম উৎকর্ষ লাভ করে এবং সেই সময়ই নো-মুখোসের গঠন সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

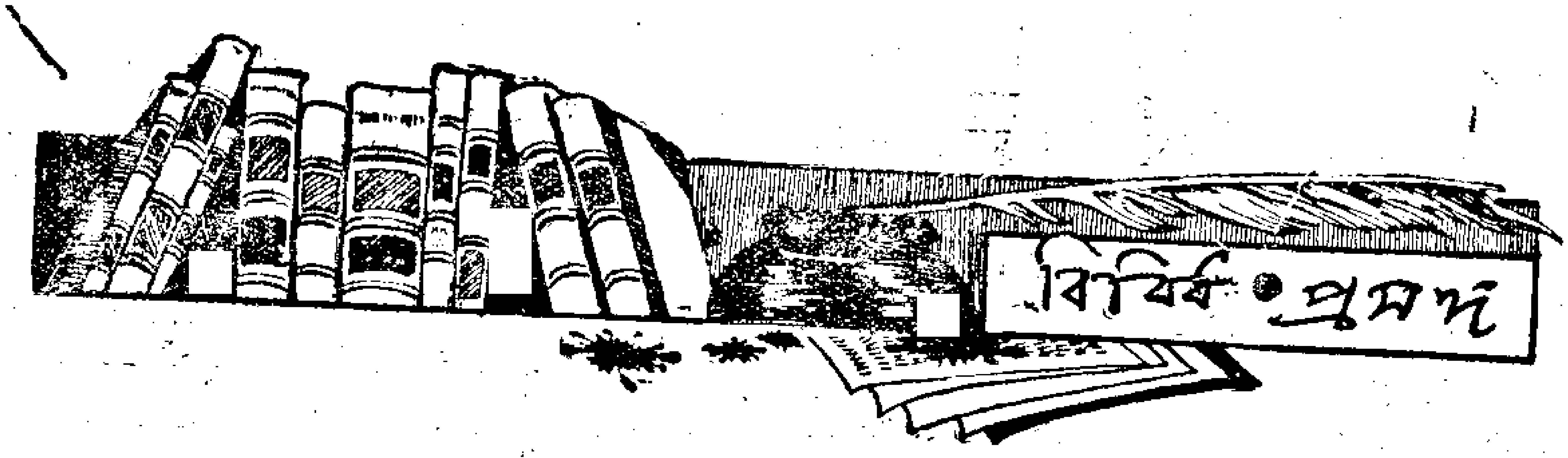

"গোল টেবিল"

"রাউণ্ড টেব্‌ল্" বা "গোল টেবিল" জিনিষটা কি তাহা আজকালকার দিনে স্মরণ রাখা দরকার।

কিম্বদন্তীতে ও কাব্যে আর্থার নামক ব্রিটেনের একজন ঐতিহাসিক বা অনৈতিহাসিক রাজার কাহিনী বর্ণিত আছে। "নাইট" বলিয়া পরিচিত তাঁহার বীর সহচরেরা যে টেবিল ঘিরিয়া বসিতেন, তাহা গোলাকার ছিল। টেবিলটি গোলাকার করা হইয়াছিল এইজন্য, যে, তাহা বেষ্টন করিয়া যাঁহারা বসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে পদমর্য্যাদায় যে সকলেই সমান, উহার গোল আকৃতি দ্বারা তাহা সূচিত হইবে।

"রাউণ্ড টেব্‌ল্" বা গোল টেবিলের সহিত এই সাম্যের ভাব জড়িত থাকায় "রাউণ্ড টেব্‌ল কন্‌ফারেন্স", বা "গোল টেবিল বৈঠক" কথাটির ঠিক মানে, এরূপ একটি মন্ত্রণাসভা বা আলোচনাসভা, যাহার উভয় পক্ষের এবং প্রত্যেক সভ্যের মর্য্যাদা ও ক্ষমতা সমান, যাহাতে কোন পক্ষ বরদাতা প্রভু এবং কোন পক্ষ বরপ্রার্থী ভিক্ষুক রূপে উপস্থিত হয় না। ক্রয়ারের অভিধানেও ইহার মানে এই রূপ লেখা আছে :—

"A conference between political parties in which each has equal authority, and at which it is agreed that the questions in disputes shall be settled amicably," ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের জন্য যাঁহারা পূর্ণস্বরাজ চাহিতেছেন, তাঁহারা ইংরেজ গবর্ন্মেণ্টের সহিত সমানে সমানে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে রাজী আছেন। যাঁহারা, নামতঃ না হইলেও, কার্য্যতঃ পূর্ণস্বরাজ চান, তাঁহারাও গোল টেবিল বৈঠক চান। কিন্তু যাঁহারা ইংরেজের অনুগ্রহে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই, ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের মত, উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার না করিয়া, গ্রহণীয় মনে করেন, তাঁহাদের বিবেচনায় টেবিলটা গোল না হইলেও চলিবে, এমন কি তাঁহাদের মধ্যে অনেকে টেবিলের চারি পাশে উপবেশনের পরিবর্ত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিতেও রাজী হইবেন।

—

লণ্ডনের কন্‌ফারেন্স বিষয়ে বড়লাটের বক্তৃতা

লণ্ডনে যে ইঙ্গ-ভারতীয় কন্‌ফারেন্স হইবে, সম্প্রতি বড়লাটের এক বক্তৃতায় তাহার কিছু বর্ণনা আছে। কিন্তু ঐ বক্তৃতার কোথাও কন্‌ফারেন্সটিকে রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স বলা হয় নাই। বড়লাটের এই সত্যবাদিতা প্রশংসনীয়। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক তথাকথিত নেতা এই বক্তৃতার পরেও এই কন্‌ফারেন্সটাকে রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স বলিতেছেন! যাহারা আত্ম-প্রতারিত হইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ও উন্মুখ, তাহাদিগকে সত্যের সম্মুখীন করিয়া দিলেও তাহাদের ভুল ভাঙিয়া দেওয়া সুকঠিন।

বড়লাটের বক্তৃতা হইতে ধ্রুব কোন আশার উদ্রেক হয় না। তাহার কারণ বলিতেছি।

ভারতবর্ষের যে-সব স্বাজাতিক ব্যক্তি (ন্যাশন্যালিষ্ট) অধুনা দেশের সম্বন্ধে শুধু কথা বলেন নাই এবং লেখেন নাই, কিন্তু দুঃখকে বরণ করিয়া দুঃখ পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে চাহিয়াছেন দেশের সম্মান বা ইজ্জত। তাঁহারা ইহা কার্য্যতঃ স্বীকৃত হইতে দেখিতে চাহিয়াছেন, যে, ভারতীয় লোকেরা নিজেদের হিতাহিত বুঝিতে সমর্থ এবং ভারতের হিত করিতে সমর্থ। সুতরাং তাঁহারা কার্য্যতঃ ইহাই চাহিয়াছেন, যে, দেশের প্রতিনিধিদের সহিত যদি ইংরেজ গবর্ন্মেণ্টের

প্রতিনিধিরা ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চান, তাহা হইলে ভারতীয় প্রতিনিধিদিগকে ভারতীয়েরাই নির্ব্বাচন করিবে। কিন্তু লণ্ডনের ইঙ্গ-ভারতীয় কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধি কাহারা হইবেন এবং কে তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করিবেন? ভারতবর্ষের ছোট বড় দলগুলি প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন না। ভারতবর্ষের বিদেশী গবন্মেণ্ট ভারতীয় প্রতিনিধিদিগকে মনোনীত করিবেন। ইহার মানে তলাইয়া বুঝা দরকার। ইহার অর্থ এই, যে, ইংরেজদের মতে আমরা এত মূর্খ ও অযোগ্য যে, আমাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার মত যোগ্যতাও আমাদের নাই; তাহাও তাঁহারাই দয়া করিয়া করিয়া দিবেন! ব্রিটিশ ও ভারতীয় উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা সমানে সমানে কথাবার্ত্তা চালাইলে তবে কন্‌ফারেন্সটা গোল টেবিল কন্‌ফারেন্স নামের যোগ্য হইত। কিন্তু আমাদের প্রতিনিধি পর্য্যন্ত তাঁহারা বাছিয়া লইবেন; তাহা হইলে টেবিলের গোলত্ব রহিল কোথায়? ইংরেজ যাহাদিগকে বাছিবেন, তাহারা যে ভারতবর্ষের প্রকৃত প্রতিনিধি তাহার প্রমাণ কোথায়?

বস্তুত এই কন্‌ফারেন্সটা হইবে এমন দুই পক্ষের মধ্যে যাহার একপক্ষ ইংরেজ এবং অপর পক্ষের সব "প্রতিনিধি" ইংরেজ না হইলেও পরোক্ষ ভাবে ইংরেজদেরই লোক; কেন না, তাহারাই তাহাদিগকে বাছিবে।

আমাদের প্রতিনিধি ইংরেজরা বাছিয়া লইবে, ইহার মধ্যে একটা গুরুতর অসঙ্গতি আছে। ভারতবর্ষীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির অধিকাংশ সভ্য ইংরেজদেরই আইন অনুসারে ভারতীয় নির্ব্বাচকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়। এই সভ্যেরা যদি ভারতবর্ষের প্রকৃত প্রতিনিধি হন, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, ভারতীয় নির্ব্বাচকেরা তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারে। তাহা যদি পারে, তাহা হইলে লণ্ডনের কন্‌ফারেন্সের জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে ভারতীয়েরা সমর্থ, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, অথচ ইংরেজ সরকার কার্য্যতঃ তাহা স্বীকার করিতেছেন না। ভারতীয়েরা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ, কিন্তু লণ্ডন কনফারেন্সের জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে অসমর্থ—এই উভয় মতের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?

ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন-যোগ্যতা অপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত যদি বলেন, যে, তাঁহাদেরই আইন অনুসারে ভারতীয়দিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত লোকেরা ভারতবর্ষের প্রতিনিধি নহেন, তাহা হইলে জগতের নিরপেক্ষ লোকেরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "তোমরা তবে জগদ্বাসীদিগকে কেন বলিয়া আসিতেছ, যে, ভারতবর্ষকে পার্লেমেণ্ট বা প্রতিনিধিসভা দিয়াছ? কেন বলিতেছ, গত দশ বৎসর কার্য্যতঃ ভারতের ডোমীনিয়ান ষ্টেটাস হইয়াছে? সত্য কথা তাহা হইলে এই, যে, তোমরা প্রতিনিধিতন্ত্র শাসন-প্রণালীর নামে ভারতীয়দিগকে একটা মেকি জিনিষ দিয়াছ।"

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলি যে বস্তুতঃ ভারতীয়দের প্রতিনিধিস্থানীয়, ইহা স্বীকার করায় ইংরেজদের মুস্কিলও আছে। কারণ, ইহা যদি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে তাহাদের মতকে ভারতীয়দের মত বলিয়া গ্রহণ করিতেও হইবে। সকলেই জানেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ও কোন কোন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা একাধিক বার যে ভারতবর্ষের জাতীয় দাবী অধিকাংশ সভ্যের মতে ধার্য্য করিয়া গবন্মেণ্টের ও জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে ডোমীনিয়ন ষ্টেটাসেরই দাবী করা হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাকে ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে ভারতীয়দের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যে, ভারতীয়েরা ডোমীনিয়নগুলির মত স্বশাসক হইতে চায়। তাহা হইলে আমাদের দাবী নির্দ্ধারণের জন্য আর লণ্ডন কন্‌ফারেন্সের প্রয়োজন থাকে না। কারণ, ভারতীয়েরা কি চায় তাহা জানা যদি এই কন্‌ফারেন্সের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহা ত আগে হইতেই জানা আছে।

ভারতীয়েরা কি চায়, তাহা ব্যবস্থাপক সভাগুলির বাহিরেও বার বার কথিত হইয়াছে। কংগ্রেসের সকল মতের সহিত প্রত্যেক ভারতীয় একমত না হউন, সকলকে

ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে, সকল সম্প্রদায় ও প্রদেশের লোকদের ইহা বৃহত্তম সভা। কংগ্রেসবহির্ভূত লোকেরাও ইহা আজকাল স্বীকার করিতেছেন। জাতীয় উদারনৈতিক সংঘেও (ন্যাশন্যাল লিবার্যাল ফেডারেশনেও) সকল প্রদেশের ও সম্প্রদায়ের লোক আছেন। কিন্তু এই সভার সভ্যসংখ্যা ও প্রভাব কংগ্রেসের চেয়ে অনেক কম। দেশের কেবল এই দুটি সভাতেই সকল প্রদেশের ও সম্প্রদায়ের লোক আছেন। কংগ্রেস আগে ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস লইতে রাজী ছিলেন; এখনও কার্য্যতঃ ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ সব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা পাইলে আপাততঃ তাহাতেই মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মোতীলাল এবং কংগ্রেসের অন্য নেতারা রাজী হইতেন। সাম্প্রদায়িক সভাগুলির মধ্যে মস্লেমলীগ, হিন্দু মহাসভা, শিখদের সভা, মান্দ্রাজ অঞ্চলের অ-ব্রাহ্মণ সভা উল্লেখযোগ্য। ইহাঁরা কেহই ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস অপেক্ষা কম কিছু চান নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ডোমীনিয়ন ষ্টেটাসই ভারতীয়দের নিম্নতম রাষ্ট্রনৈতিক দাবী। অতএব এই দাবী নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কোন কন্‌ফারেন্সের প্রয়োজন ছিল না।

গত মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের লোকেরা বার বার ঘোষণা করিয়াছিলেন, যে, পৃথিবীতে সব জাতির সেল্‌ফ্-ডিটারমিনেশ্যনের অর্থাৎ নিজ নিজ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নির্ব্বাচনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যুদ্ধ করা হইতেছে। অথচ ভারতবর্ষকে যুদ্ধের অবসানে সে অধিকার দেওয়া হয় নাই, এখনও দেওয়া হইতেছে না।

কন্‌ফারেন্সের ব্যবস্থা দিল্লীতে না করিয়া লণ্ডনে করাতেও ত ভারতবর্ষকে হেয় করা হইয়াছে। আলোচিত হইবে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, ব্রিটেনের নহে। অতএব কন্‌ফারেন্সের প্রয়োজন থাকিলে তাহা ভারতবর্ষেরই কোথাও করিলে সঙ্গত হইত।

ভারতের প্রতিনিধিনির্ব্বাচন

ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরা ভারতীয়দের দ্বারাই নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। তাহা ব্যবস্থাপকসভাগুলির নির্ব্বাচিত সভ্যদের দ্বারা হইতে পারিত। কিন্তু এখন কংগ্রেসওয়ালা প্রায় সব সভ্য পদত্যাগ করায় ব্যবস্থাপক-সভাগুলি আগেকার মত দেশের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারে না। অতএব এখন কংগ্রেস, উদারনৈতিক সংঘ, মস্লেম লীগ, হিন্দু মহাসভা, শিখসভা ও অব্রাহ্মণসভাকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে বলিলে ঠিক্ হয়। অবশ্য, কংগ্রেসকেই অর্দ্ধেকের কিছু উপর সভ্য নির্ব্বাচন করিতে দেওয়া উচিত; কারণ কংগ্রেস দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিনিধিস্থানীয়।

ইঙ্গ-ভারতীয় কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষের লোকেরা কিরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চায় তাহা জানিবার জন্য কোন কন্‌ফারেন্সের প্রয়োজন নাই, দেখাইয়াছি। তাহাদের ন্যূনতম ও নিম্নতম দাবী ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস। অবশ্য, যদি কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্য ইহাতে রাজী না হন, তাহা হইলে তাঁহাদের ঈপ্সিত পূর্ণস্বরাজের জন্যই তাঁহারা চেষ্টা করিবেন। কিন্তু আমরা দেশের বর্ত্তমান লোকমত যতটা বুঝিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, পূরা ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস্ হইলেই এখন দেশ অনেকটা সন্তুষ্ট হইতে পারে, যদিও ব্যক্তিগত ভাবে অনেকে আমাদের মত পূর্ণস্বরাজের পক্ষপাতী।

ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস সকল ডোমীনিয়নে ঠিক্ এক রকম নয়। ভারতবর্ষের জন্য উহা যেরূপ হওয়া চাই, সেই ব্যবস্থার ক্ষুদ্র বৃহৎ অংশগুলি স্থির করিবার নিমিত্ত এবং ভবিষ্যতে নির্দ্দিষ্ট কোন একটি তারিখে পূর্ণ ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস হইবার পূর্ব্বে আপাততঃ কোন কোন বিষয়ে অস্থায়ী বিধি কি হওয়া চাই, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কন্‌ফারেন্স দরকারে হইতে পারে।

কন্‌ফারেন্স ডাকিবার ইংরেজ-পক্ষের অন্য উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু সেটা যে কি, তাহা কেবল অনুমান করা যায়, ঠিক করিয়া বলা যায় না। সেই উদ্দেশ্য অনুমান করিতে গেলেই অবশ্য রাজনৈতিক কূট চা'লের কথা উঠিবে। লর্ড আরুইন বা মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড-বা মিঃ বেন্ কূট

চা'ল চালিতেছেন, কিংবা ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট কূট চাল চালিতেছেন, এরূপ কিছুই বলা যায় না। কিন্তু মোটের উপর স্বদেশবাসী ও ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে মত যেরূপ এবং ব্রিটেনের শ্রমিক, উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দলগুলির আপেক্ষিক সংখ্যা ও শক্তি যেরূপ, তাহাতে কার্য্যতঃ কন্‌ফারেন্সটা যেরূপ দাঁড়াইতে পারে, তাহারই আলোচনা করিতে চাই।

—

ইঙ্গ-ভারতীয় কন্‌ফারেন্সে ঐকমত্যসাধন

লর্ড আরুইন তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, লণ্ডনের কন্‌ফারেন্সে যাহা সকলের বা অধিকাংশের মনঃপূত হইবে, তাহাকে ভিত্তি করিয়া ভারতীয় ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি বিল পার্লেমেণ্টে উপস্থিত করা হইবে। মনঃপূত জিনিষটি ভোট লইয়া, না অন্য কি প্রকারে স্থির করা হইবে জানি না।

মতের মিল প্রথমতঃ ভারতীয়দের নিজের মধ্যে হওয়া চাই, তাহার পর ভারতীয়-পক্ষ ও ইংরেজ-পক্ষের মধ্যে হওয়া চাই।

ইংরেজরা যোগ্যতম ভারতীয়দিগকেই ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলিয়া মনোনীত করিবেন, ইহা মানিয়া লওয়া যায় না। যে সব ভারতীয় ভারতবর্ষে ইংরেজদের পূর্ণ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়, অধিকাংশ ইংরেজ তাহাদিগকেই ভারতের যোগ্যতম প্রতিনিধি মনে করে। তাহার পর, যাহারা ইংরেজ-প্রভুত্ব কতকটা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়, তাহাদিগকেও অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংরেজরা ভারতবর্ষের কতক লোকের প্রতিনিধি মনে করিতে পারে। কিন্তু যাহারা ইংরেজ-প্রভুত্বের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ চায়, তাহাদিগকে ভারতের প্রতিনিধি মনে করা ইংরেজদের পক্ষে স্বাভাবিক নহে। অথচ এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদিগেরই প্রভাব ভারতবর্ষে অধিকতম ও বিস্তৃততম; কারণ, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি ও দুঃখ এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়া আছে এবং অনেকে সহ্য করিয়াছে।

এই সব কথা বিবেচনা করিলে, ইংরেজরা কিরূপ ভারতপ্রতিনিধি মনোনীত করিবে, তাহা বুঝা কঠিন নয়। এমন কতকগুলি লোক মনোনীত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না যাহাদের পরস্পরের মতের মিল হওয়া কঠিন। এমন কতকগুলি লোক মনোনীত হওয়া বিচিত্র নয় যাহারা ভারতবর্ষের জন্য ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস অপেক্ষা অনেক নিম্ন অধিকারই চাহিবে। এমন কতকগুলি লোক মনোনীত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় হইবে না যাহারা এমন সব জিনিষ চাহিবে যাহা কোন কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল, কিন্তু যাহা সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে অনিষ্টকর, যাহা ভারতীয়দিগকে কখন একজাতি হইতে দিবে না এবং চিরকাল নানাদলে বিভক্ত, দুর্ব্বল ও পর-পদানত রাখিবে।

কিন্তু যদি অঘটন ঘটে, যদি ইংরেজদের মনোনীত ভারতের তথাকথিত প্রতিনিধিরা সত্য সত্যই গণতান্ত্রিক ও হিতকর কিছু চাহিয়া বসে, তাহা হইলেও পার্লেমেণ্টে পেশ করিবার জন্য তদনুসারে বিল না হইবার সম্ভাবনা আছে। ভারত-পক্ষ যাহা বলিবেন, ইংরেজ-পক্ষ তাহাতে রাজী না হইতে পারেন—না হইবারই কথা। প্রমাণ, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট। এই কমিশনে সব ব্রিটিশ দলের লোক ছিল। অথচ তাহারা এমন একটা জিনিষ তৈরি করিয়াছে যাহা ভারতবর্ষের সব রাজনৈতিক দল ও ধর্ম্মসম্প্রদায় গ্রহণের অযোগ্য মনে করিয়াছে।

ভারতবর্ষের পক্ষে গ্রহণের যোগ্য এরূপ কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা লণ্ডন কন্‌ফারেন্সে ব্রিটিশ ও ভারতীয় উভয় পক্ষের মত অনুসারে নির্দ্ধারিত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না।

লর্ড আরুইন বলিতেছেন, কন্‌ফারেন্সটা ফ্রী অর্থাৎ স্বাধীন বা অবাধ হইবে। কিন্তু গোড়াতেই যে গলদ। ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে যাহারা কথা বলিবে তাহাদিগকে বাছিয়া লইবে ইংরেজরা—ইহা কিরূপ স্বাধীনতা? ইংরেজদের লোক বাছুন ইংরেজরা, আমাদের লোক বাছি আমরা; তাহা হইলে অবাধ ও স্বাধীন কন্‌ফারেন্স হইতে পারে, নতুবা নহে।

আর, যদি স্বাধীনতা থাকেও, তাহা হইলেও তাহা কথা বলিবার স্বাধীনতা মাত্র; নিজেদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নিজেরাই

প্রণয়ন করিবার স্বাধীনতা নহে। প্রথমতঃ, ভারতীয় "প্রতিনিধি"দের মধ্যে মিল চাই। দ্বিতীয়তঃ, ভারত-পক্ষ ও ইংরেজ-পক্ষের মিল চাই। তাহার পর, যাহা উভয় পক্ষের মতানুযায়ী ঠিক্ তদনুসারে পার্লেমেণ্টের বিল্ প্রণীত হইবে, লর্ড আরুইন এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেন নাই। তিনি কেবল বলিয়াছেন, উভয়পক্ষের মতানুযায়ী জিনিষটিকে বিলের ভিত্তি করা হইবে। যাঁহারা বিল রচনা করিবেন, তাঁহারা উভয় পক্ষের নির্দ্ধারিত জিনিষটি হইতে তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক কেবল বা বেশী পরিমাণে এমন অংশগুলি লইতে পারেন, যাহা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

—

কংগ্রেস ও লণ্ডনের কন্‌ফারেন্স

বড়লাটের বক্তৃতার ভাবটা এরূপ, যে, কংগ্রেস ইচ্ছা করিলে লণ্ডনের কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে পারেন। আবার, সরকার পক্ষ হইতে এমন কথাও বলা হইয়াছে, যে, নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা বন্ধ না করিলে মহাত্মা গান্ধীকে কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে আহ্বান করা হইবে না—যেন মহাত্মা গান্ধী কন্‌ফারেন্সে যাইবার জন্য সরকার-পক্ষের পায়ে ধরিয়া ধর্না দিতেছেন!

যাহা হউক, সকলে স্বীকার করুন বা না-করুন, ইহা নিশ্চিত, এরূপ কোন ব্যবস্থা নির্ব্বিবাদে ভারতবর্ষে চালান যাইবে না যাহাতে কংগ্রেসের মত নাই—অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর মত নাই। ইহা ভারতবর্ষের কংগ্রেসবিরোধী উদারনৈতিক দল জানেন এবং দেশবাসীকে ও গবর্ন্মেণ্টকে স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন। গবর্ন্মেণ্ট ইহা জানেন কি না বলিতে পারি না—তাঁহারা সম্ভবতঃ কংগ্রেসকে বাদ দিয়াই একটা কিছু চালাইতে চাহিবেন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, তাহা চলিবে না। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনপ্রণালী কংগ্রেসের মনঃপূত ছিল না, সুতরাং গবর্ন্মেণ্ট এপর্য্যন্ত বিনাবাধায় তদনুসারে কাজ করিতে পারেন নাই।

গবর্ন্মেণ্ট মনে করিতে পারেন, দমননীতি প্রয়োগ দ্বারা কংগ্রেসকে জনবলহীন ও কাবু করিয়া নিজেদের অভিপ্রেত ব্যবস্থা চালাইবেন। কিন্তু যদিই কংগ্রেস আপাততঃ কাবু হয়, তাহা হইলেও পূর্ণস্বরাজলাভের চেষ্টা অদূর ভবিষ্যতে পুনঃপুনঃ হইতে থাকিবে। তাহাতে ইংরেজদের পক্ষে শান্তিতে রাজত্ব করা চলিবে না, এবং ভারতবর্ষে বিলাতী জিনিষ বেচিয়া লাভবান্ হওয়াও চলিবে না। অতএব, কংগ্রেসের প্রতিনিধিদিগকে কন্‌ফারেন্সে লইয়া যাইবার চেষ্টা করা গবর্ন্মেণ্টের পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচায়ক হইবে। লর্ড আরুইনের বক্তৃতার আগে, মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত মোতীলাল কিরূপ সর্ত্তে কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে রাজী হইতে পারেন, তাহা বলিয়াছিলেন। আমরা মনে করি না, যে, লর্ড আরুইন এমন কিছু নূতন কথা বলিয়াছেন যাহাতে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মোতীলালের মত বদলাইতে পারে। তথাপি, যদি সরকার-পক্ষ মনে করেন, যে, বড়লাটের বক্তৃতায় রাজনৈতিক সিচুয়েশ্যন্ বা পরিস্থিতির কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহারা কংগ্রেসের নেতাদিগকে ঐ বক্তৃতা পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কাগজে এইরূপ গুজব বাহির হইয়াছে, যে, ম্যাক-ডোনাল্ড সাহেব গান্ধীজীর নিকট কোয়েকার সম্প্রদায়ের একজন ইংরেজ দূত পাঠাইয়াছেন, তাহা সত্য কি না জানি না। কিন্তু মহাত্মাজী ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তি হইলেও, তিনি কংগ্রেসকে নিজের মত জানাইতে পারেন, কংগ্রেস কি করিবেন সহকর্ম্মীদের সহিত পরামর্শ না করিয়া তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে তাঁহার অনিচ্ছুক হইবারই কথা। অতএব পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, মিঃ আব্বাস তৈয়বজী, শ্রীমতী সরোজনী নাইডু, পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, ডাক্তার সৈয়দ মামুদ প্রভৃতি কংগ্রেসনেতাদিগকে অন্ততঃ এক পক্ষ কালের জন্য মুক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিবার সুযোগ দিলে কংগ্রেসের কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের পক্ষে সুবিধা হয়। তাহা না করিলে, কংগ্রেসের প্রধান অধিকাংশ নেতাকে কারারুদ্ধ করিয়া

রাখিয়া, "কন্‌ফারেন্সে যোগ দেওয়া কংগ্রেসের স্বেচ্ছাধীন," এরূপ ভাব প্রকাশ করিলে তাহা উপহাসের মতই প্রতীত হইবে।

সরকার-পক্ষ হইতে এই আপত্তি হইতে পারে, যে, কারারুদ্ধ কংগ্রেসনেতাদিগকে একত্র হইবার সুযোগ দিলে তাঁহারা আইনলঙ্ঘনপ্রচেষ্টাকে প্রবল করিবার মন্ত্রণাও আঁটিবেন। এরূপ সন্দেহ হইলে, তাঁহাদের মন্ত্রণাস্থল কোন কারাগারে করিলেই হইবে, এবং তাঁহাদিগকে মুক্তি না দিয়া বড় কোন কারাগারে একত্র কিছু দিন রাখিয়া পরে এখনকার মত ভিন্ন ভিন্ন জেলে রাখিয়া দিলেই হইবে। সেখান হইতে তাঁহাদের বক্তব্য মুখে বা পত্রদ্বারা বাহিরে পৌঁছিবার পথ ত গবন্মেণ্ট বরাবরই নিজের আয়ত্ত রাখিয়াছেন।

কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে আমাদের মত

আমরা কোন রাজনৈতিক দলের লোক নহি, এবং ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য বিশেষ কোন ক্ষতি বা দুঃখ সহ্য করি নাই, করিতে প্রস্তুত আছি বলিয়াও কার্য্যতঃ দেখাই নাই। সুতরাং লণ্ডনের ইঙ্গ-ভারতীয় কন্‌ফারেন্সে কাহারও যাওয়া উচিত কি না, সে বিষয়ে কাহাকেও পরামর্শ দিবার আমাদের অধিকার নাই। কিন্তু সার্ব্বজনিক সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা সাংবাদিকদিগের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যপালন জন্য আগেই কোন কোন কথা লিখিয়াছি। এখন আমাদের সিদ্ধান্ত বলিতেছি। ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস্ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রণীত হইবে, পরিষ্কার ভাষায় এইরূপ প্রতিশ্রুতি না পাইলে কোন দলের লোকেরই কন্‌ফারেন্সে যাওয়া উচিত নয়, কংগ্রেসের লোকদের ত নয়ই।

যদি গবন্মেণ্ট ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে না পারেন, তাহা হইলে, কেন তাহা পারেন না, সে বিষয়ে ঐতিহাসিক হিসাবে অসত্য কোন কারণ সরকারী লোকদের উল্লেখ না করাই ভাল। এইরূপ একটা কারণ এই বলা হয়, যে, "কিছু করা না-করা পার্লেমেণ্টের হাত; আগে হইতে কেমন করিয়া বলা হইবে কিরূপ বিল পার্লেমেণ্টে পেশ করা যাইবে?" তাহার উত্তর এই—"পার্লেমেণ্ট কি করিবেন, সে বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি আমরা চাহিতেছি না; ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট পার্লেমেণ্টে ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস্ দিবার বিল উপস্থিত করিবেন, এই প্রতিশ্রুতি চাহিতেছি।" সত্য বটে, এরূপ বিল পার্লেমেণ্টে উপস্থিত করিলে শ্রমিক দলের পরাজয় হইয়া তাঁহারা সরকারীক্ষমতাচ্যুত হইতে পারেন। সেই বিপৎসম্ভাবনা তাঁহাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে। ভারতবর্ষের হিত করিতে যাইয়া তাঁহারা পার্লেমেণ্টে হারিয়া যাইবার আশঙ্কার মধ্যে যাইতে রাজী নহেন, অথচ ভারতহিতৈষী বলিয়া পরিচিত হইবার সখটুকুও তাঁহারা ছাড়িতে পারেন না।

ইংরেজদের জানা উচিত, যে, ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকেরা ইতিহাস পড়িয়াছে। যতদিন তাহারা সংঘবদ্ধ এবং খুব বেশী সংখ্যায় "মরিয়া" না হইতেছে, ততদিন তাহাদিগকে অধীন রাখা সহজ হইতে পারে, কিন্তু অনৈতিহাসিক মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাদিগকে ঠকান যাইবে না। ভারতবর্ষকে একটা কিছু দিবার আগে যেমন "প্যাক্‌ট্" ('packed") প্রতিনিধিদলের অর্থাৎ নিজেদের অভিপ্রায়সিদ্ধির অনুকূল ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সহিত অনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে কন্‌ফারেন্স্ করা হইবে, কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, আয়ার্ল্যাণ্ড প্রভৃতিকে স্বরাজ দিবার আগে সেরূপ কোন কন্‌ফারেন্স করা হয় নাই। সমান দুই পক্ষের মধ্যে স্বরাজের বন্দোবস্ত হইতেছে, এইভাবে কোন কোন স্থলে আলোচনা হইয়াছিল। গত কংগ্রেসের অধিবেশনের আগে লর্ড আরুইন যে গান্ধীজী প্রভৃতিকে বলিয়াছিলেন, লণ্ডনের কন্‌ফারেন্সে দাসত্ব হইতে পূর্ণ স্বাধীনতা পর্য্যন্ত সব বিষয়ের আলোচনা হইতে পারিবে, অনভিপ্রেত হইলেও তাহাতে ভারতবর্ষের প্রতি অবজ্ঞাই সুচিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ ভিক্ষুক, তাহাকে যাহা দেওয়া হইবে তাহা অনুগ্রহের দান, সুতরাং তাহার জন্য দাসত্বের ব্যবস্থারও আলোচনা হইতে পারে, এরূপ কল্পনা লর্ড আরুইনের মনে ও মুখে আসিয়াছিল। কানাডা, আয়ার্ল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতিকে

ব্রিটেন বাধ্য হইয়া স্বরাজ দিয়াছিল, সুতরাং কোন ব্রিটেন-প্রতিনিধি দাসত্বের ব্যবস্থার কল্পনাটাও উল্লেখ করিতে সাহস পান নাই। আমাদের বিবেচনায় ভারতবর্ষও যতদিন নিজে নিঃসংশয় বিশ্বাস করিতে না পারিতেছে এবং অবশ্যস্বীকার্য্য ভাবে অন্যের নিকট প্রমাণ করিতে না-পারিতেছে, যে, সে ভিক্ষুক নহে, নিজের দাবী আদায় করিয়া লইতে সমর্থ, তত দিন কোন ভারতীয়ের ব্রিটেনের সহিত কোন কন্‌ফারেন্সে যাওয়া উচিত নয়। ভিক্ষুকের মন ও ভিক্ষুকের পদ লইয়া গেলে ভিখারী-বিদায় যেরূপ হয়, তাহাই হইবে। তাহাতে যাঁহারা রাজী আছেন, তাঁহারা নিজেদের জন্য লণ্ডনে যাইতে পারেন, কিন্তু দয়া করিয়া এইটুকু করিবেন, যে, ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া ভারতবর্ষকে অপমানিত করিবেন না।

কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ (?) প্রভৃতির মত

দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রুর এক বন্ধু লণ্ডন হইতে তাঁহাকে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন, লর্ড আরুইনের বক্তৃতার বিষয় অবগত হইয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, মিস্টার এণ্ড্রুজ প্রভৃতি বলিয়াছেন, যে, লণ্ডনের কন্‌ফারেন্সে ভারতীয়দের এখন সহযোগিতা করা উচিত। স্যার তেজ বাহাদুরের কোন্ বন্ধু তার করিয়াছেন, জানা দরকার, এবং তিনি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মত কিরূপে জানিলেন, তাহাও জানা দরকার। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ের মত কিরূপ হইবে, অনুমান করিতে পারিতেছি না। কয়েক দিন হইল এণ্ড্রুজ সাহেব আমাদিগকে বিলাত হইতে তারযোগে জানান—"I have always advocated Independence, not Dominion Status," "আমি বরাবর পূর্ণ-স্বাধীনতার সমর্থন করিয়া আসিতেছি, ডোমীনিয়ন ষ্টেটাসের নহে।" সুতরাং তিনি যে হঠাৎ বড়লাটের "ধরি মাছ না-ছুঁই পানী" বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। তাঁহার ভারত-হিতৈষণা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছি না। কিন্তু তিনি স্বদেশপ্রেমিক ইংরেজ; এই কারণে তাঁহার প্রত্যেক মতের অনুসরণ কোনও ভারতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে না-করিতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ বোধ হইতেছে। কিছু দিন আগে দৈনিক কাগজে বাহির হইয়া গেল, রবিবাবু প্যারিসে বলিয়াছেন তিনি রোজ ২।৩ খানা ছবি আঁকিতেছেন, কবিতা লিখিতেছেন না, রাজনীতিতে তাঁহার অরুচি বাড়িতেছে, ইত্যাদি। অথচ তিনি এরূপ কোন কথাই কাহাকেও বলেন নাই। এবিষয়ে তাঁহার নিজের চিঠি স্বচক্ষে পড়িয়া একথা লিখিতেছি। সুতরাং স্যার তেজ বাহাদুরের অপ্রকাশিতনামা বন্ধু যাহা তার করিয়াছেন, রবিবাবুর সম্বন্ধে তাহা সত্য না-হইতে পারে। যাঁহারা দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দেন নাই এবং দেশের সব অবস্থাও যাঁহারা দূর হইতে জানিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা খুব মহৎ হইলেও নির্দ্দিষ্ট কোন একটি পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ তাঁহারা দিতে অসমর্থ, এবং দিলেও সংগ্রামলিপ্ত লোকেরা তাহার অনুসরণ করা অকর্ত্তব্য মনে করিতে পারেন, রবীন্দ্রনাথের ইহা ভাল করিয়া জানিবার বুঝিবার কথা। এইজন্য মনে হইতেছে স্যার তেজ বাহাদুরের বন্ধু কবির সম্বন্ধে হয়ত ঠিক খবর পান নাই ও দেন নাই। অবশ্য নানা কারণে কবির বিবেচনার ভুলও ঘটিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুটি কথার উল্লেখ করিতেছি। কবির আধুনিক দুটি বিলাতী লেখায় লর্ড আরুইনের এবং ইংরেজ জাতির যে প্রশংসা আছে, তাহা তাঁহার মতে সত্য হইলেও আমাদের বিবেচনায় ঠিক্ প্রাসঙ্গিক নহে এবং এরূপ প্রশংসা দ্বারা তাঁহার ইংরেজ দমননীতির প্রতিবাদ নিন্দাবাদ ও সমালোচনার জোর কমিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ ইংরেজ ছাড়া অন্য কোন সাম্রাজ্যশাসক জাতির অধীন হইলে অত্যাচার আরও অনেক বেশী হইত, এই অপ্রাসঙ্গিক কথার দ্বারাও তাঁহার সমালোচনা দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিতে পারেন, "আমি সত্য কথা

লিখিয়াছি।" তিনি সাম্রাজ্যস্থাপক সব জাতির সব কীর্ত্তি পড়িয়াছেন কিনা, জানি না; কিন্তু কি হইলে কি হইত, সেরূপ অনুমান তাঁহার মত প্রতিভাশালী ব্যক্তির অনুমান হইলেও তাহার মূল্য বেশী নয়।

দেশে এমন অনেক ব্যাপার ঘটিতেছে, যাহার খবর, বিদেশে প্রকাশিত হওয়া দূরে যাক্, ভারতবর্ষেরই খবরের কাগজে বাহির হইতেছে না। সুতরাং বিদেশপ্রবাসী ভারতীয়দিগের খুব বুঝিয়া সুঝিয়া হিসাব করিয়া কথা বলা উচিত।

—

লর্ড আরুইন ও বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা

বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টার খুব নিন্দা করিয়াছেন এবং দেশে যত কিছু অশান্তি উচ্ছৃঙ্খলতা, রক্তপাত আদি ঘটিতেছে তাহার জন্য একমাত্র এই প্রচেষ্টাকেই দায়ী করিয়াছেন। এই প্রকার নিন্দা করা খুব সহজ। কারণ, মুদ্রাযন্ত্র ও খবরের কাগজের প্রতি প্রযোজ্য সাধারণ ফৌজদারী আইন এবং বিশেষ অর্ডিন্যান্স এপ্রকার নিন্দার সমুচিত সমালোচনা ও জবাব দেওয়া সাংঘাতিক করিয়াছে।

ভারত-সেবক সমিতির সহকারী সভাপতি পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য-পদ ত্যাগ করিবার নিমিত্ত বড়লাটকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দমননীতিপ্রয়োগজনিত অত্যাচার তাঁহার পদত্যাগের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। বড়লাট উত্তরে বলিয়াছিলেন, পুলিশ কেবল মাত্র ন্যূনতম বল প্রয়োগ করিয়াছে ও করিয়া থাকে। তাঁহার আধুনিক বক্তৃতাতে কেবল ঐটুকু বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই। যে সব সরকারী কর্ম্মচারী দমননীতি প্রয়োগ করিতেছেন, তাঁহাদের অবিমিশ্র প্রশংসাও করিয়াছেন। যথা—

"Speaking generally, I have nothing but commendation for the servants, both Civil and Military, who have been doing their duty with great steadiness and courage, in conditions of the severest provocation and often of direct risk to their lives. Several, I speak of the police, have been brutally murdered and in many cases they and their families are subjected daily to the grossest forms of persecution."

পুলিসের লোক কয় জন নিহত হইয়াছে, এবং কে তাহাদিগকে কেন কি অবস্থায় বধ করিয়াছে, বড়লাট তাহা বলেন নাই।

তাঁহার প্রত্যেকটি কথা বাস্তব ঘটনা ও তথ্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা, তাহার বিচার করিতে হইলে বেসরকারী পক্ষের কি বলিবার আছে, তাহাও বিবেচিত হওয়া অবশ্যক ছিল। কিন্তু বেসরকারী লোকেরাও অন্ততঃ কতকটা বিশ্বাসযোগ্য, কাহারও এরূপ ধারণা থাকিলে বোধ করি তাঁহার দ্বারা দেশ-শাসন ও দমনের কাজ চলে না।

খুব ভক্ত ও সাধু লোকদেরও কখন কখন ভগবানের ন্যায়কারিতা প্রভৃতিতে সন্দেহ জন্মে। কিন্তু সিবিল ও মিলিটারী কর্ম্মচারীদের ন্যায়কারিতা প্রভৃতি সম্বন্ধে লর্ড আরুইন একেবারে নিঃসংশয়। তিনি শাসক না হইয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে সাধক হইলে বিশ্বাসবলে সিদ্ধপুরুষ হইতে পারিতেন।

—

বঙ্গে অত্যাচারের অভিযোগ

মেদিনীপুর জেলায় ও বঙ্গের অন্যত্র লোকদের উপর অত্যাচার হইয়াছে, এইরূপ অভিযোগ খুব মৃদু আকারে কোন কোন কাগজে বাহির হইয়াছিল। কাঁথি অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টের কোন কোন অংশ কোন কোন কাগজে ছাপা হইয়াছিল। সরকারী মতে উক্ত কমিটির রিপোর্টে লিখিত অভিযোগ মিথ্যা। ঐ বিষয়ে সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভায় তর্কবিতর্ক উপলক্ষ্যে যাহা কথিত হইয়াছিল, এসোসিয়েটেড প্রেসের তাহার রিপোর্টের কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

SIMLA, JULY 12.

Mr. K. C. Neogy, resuming the debate in the Assembly on the Round Table Conference, said that the Viceroy had emphasized his determination to fight the Civil Disobedience movement. "I have no other desire except to uphold law and order and have nothing in common with civil disobedience, but if the Government must fight, it must fight clean.

"The Home Member contradicted Sir Cowasji Jehangir's statement yesterday that innocent persons were deliberately assaulted. I declare what Sir Cowasji said was quite true. It is happening not

only in Bombay, but all over India. The Home Member has either his eyes shut or is incompetent to hold the present office. This is nothing but the spirit of Dyer, the spirit of Jallianwala Bagh, that is stalking the land today. Jalianwalas are being enacted all over India. If the Home Member pretends ignorance, I can only say he is not fit to discharge the obligation of the office he holds and I do not consider he is loyal to the Viceroy, because I have no doubt about the sincerity of the Viceroy in his desire to promote an atmosphere of peace and goodwill in this land.

Facts in Bengal

"My experience of Bengal enables me to bear testimony to the reign of terrorism that is going on there. The Government, instead of prosecuting the papers for publishing stories which the Government thought were incorrect, has gagged the press. Here is a picture in a paper showing a boy of ten unconscious because of the use of the hunter by the District Magistrate of Midnapur. Has Government prosecuted the paper for saying so and proved it to be untrue?"

Contai Firing

Mr. K. C. Neogy on Government Communique.

Continuing, Mr. Neogy referred to non-official inquiry committee set up to enquire into the Contai firing and police excesses in the sub-division. The president of the committee was Mr. J. N. Basu, president of the Indian Association, a Liberal politician, about whose position the law member, present in the house, would bear testimony. This committee, of which the speaker was a member and secretary, included no Congressman and its members were all opposed to civil disobedience. The committee, when it visited a village, was arrested on the plea that it was inciting the people (cries of "shame, shame") and an innocent person following the committee was assaulted. Later the members of the committee were released.

Gagging The Press

The Committee's report had been ready for some time, but Government's policy of gagging the press was so complete that not only not a single newspaper in Bengal would publish it, but not a single printing-press would print it. That was why, Mr. Neogy said, he had come to the Assembly to voice from this place his report.

Mr. Neogy read copious extracts from the report of the Committee to put them on the record of the Assembly. He said that the villagers were in a state of panic through police terrorism. The Committee had the evidence of women molested, one in the presence of a Magistrate.

Mr. H. G. Haig, Home Member, intervening, drew attention to the Bengal Government's communique that enquiries showed that these allegations about women were false.

Mr. Neogy: That communique is a lie. Let me publish this report and then you prosecute me for it, instead of believing a communique issued from a factory of lies.

Mr. Jayakar:—Has Government ascertained through whose instrumentality this matter was investigated by the Bengal Government?

Mr. Haig:—I have only a copy of the communique.

Mr. Neogy said that the conclusions of the Committee were that people were non-violent and prepared to suffer the legal consequences of breaking the salt laws, but Government resorted to terrorism. "People were breaking only the salt laws. But the authorities had broken all other laws, including the laws of humanity."—"Asociated Press."

—

সাইমন রিপোর্ট সম্বন্ধে বড়লাট

বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, সাইমন কমিশন রিপোর্ট সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য তিনি দেশী রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এবং ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের প্রতিনিধিগণের সহিত তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবেন। কংগ্রেস ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে বড় ও প্রভাবশালী প্রতিনিধিসভা। তাহার প্রধান প্রধান নেতাদিগকে জেলে পুরিয়া কংগ্রেসবহির্ভূত অন্য সবদের সঙ্গে তোফা আলোচনা হইবে!

—

শান্তিনিকেতনের কারু-সঙ্ঘ

শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ছবি আঁকা ছাড়া অন্য নানা রকম শিল্পও সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে শিখান হয়। এখানে শিক্ষা পাইয়া শিল্পীরা দেশের সর্ব্বত্র জ্ঞানবিস্তার করুন, ইহা বাঞ্ছনীয় বটে। কিন্তু শিক্ষাপ্রাপ্ত সব ভাল ছাত্র অন্যত্র চলিয়া গেলে মৌচাকটি ভাঙিয়া যাইবে। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। এইজন্য শান্তিনিকেতনে কারু-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রীত হইয়াছি। সর্ব্বসাধারণ যদি সঙ্ঘের সভ্যদিগকে কাজ দেন ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেন, তাহা হইলে কলাভবনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর মত অপেক্ষাকৃত অল্প আয়েই সন্তুষ্ট হইয়া অনেক ভাল শিল্পী শান্তিনিকেতনেই থাকিতে পারিবেন। কারু-সঙ্ঘ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা নীচে মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যাইবে।

শান্তিনিকেতন কলাভবনে শিল্পিগণ এই সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন এখানে সংবাদ দিয়া সকলেই অল্প আয়াসে এক স্থানে নিজ নিজ প্রয়োজন মত শিল্পদ্রব্য বা তাহার নূতন ডিজাইন করাইয়া লইতে পারিবেন। বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত কারু-শিল্পসমূহের আয়োজন আছে :—

ছবি—জলবর্ণ (Water colour), তৈলবর্ণ (Oil colour), বইয়ের ছবি ও বিজ্ঞাপন (Book illustration and poster);

মূর্ত্তি (Designs and portraits in clay, terra-cota and plaster of Paris);

সূচীশিল্প (Embroidery);
বাটিকের কাজ (Battique work on handkerchiefs hand bags, table cloths and door curtains);
প্রাচীর চিত্র (Fresco);
বাসন এবং গহনার নূতন ডিজাইন;
দারুশিল্পের নূতন ডিজাইন (Furniture);
এতদ্ভিন্ন গৃহসজ্জার জন্য সকল রকম শিল্পদ্রব্যের ডিজাইন উপযুক্ত মূল্যে উপযুক্ত সময়ে করিয়া দেওয়া হয়।
পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা:—
সম্পাদক কারুসঙ্ঘ, কলাভবন, শান্তিনিকেতন পোঃ।

—

চৈন বিদ্যাপীঠ দ্বারা আহূত হিন্দু অধ্যাপক

চীনের পেকিং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তথায় হিন্দু দর্শনের অধ্যাপনার জন্য কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ অধিকারী মহাশয়কে আহ্বান করিয়াছেন। চৈনিক বিদ্যাপীঠের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে তিন বৎসরের জন্য চান। অধিকারী মহাশয় জ্ঞানবত্তায় যোগ্য লোক; এবং তাঁহার সৌজন্যে চৈনিক ভদ্রলোকদের মনে ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হইবে। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিত। রবীন্দ্রনাথ চীনে কতিপয় সহচর সহ গিয়া সেই দেশের সহিত ধর্ম্ম ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের প্রাচীন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করিয়া আসিয়াছেন। অধিকারী মহাশয় চীনের উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসর শিক্ষা দিলে সেই সম্বন্ধসূত্র ছিন্ন হইতে পাইবে না।

—

মুসলমান সমাজ ও কংগ্রেস

অনেক আগে হইতে এই ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা হইয়া আসিতেছে, যে, মুসলমানদের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনই যোগ নাই—যদিও অনেক প্রসিদ্ধ মুসলমান কংগ্রেসের সভাপতি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রবলতম প্রচেষ্টার সহিত মুসলমানদের কোনই যোগ নাই, ইহাও প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে। অথচ সব প্রদেশেই এই প্রচেষ্টার সম্পর্কে অনেক মুসলমান অভিযুক্ত হইয়া জেলে যাইতেছেন। মুসলমান মহিলাও বাদ যান নাই। বোম্বাই হাইকোর্টের জজ পরলোকগত বদরুদ্দীন তৈয়বজী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী লুকমানীর পিকেটিং করা অপরাধে চারি মাস সশ্রম জেল হইয়াছে। তাঁহার বয়স পঁয়ষট্টি বৎসর।

বিহারে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের পর ভাগলপুরের বাবু দীপনারায়ণ সিংহ নেতা নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার পর কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ ব্যারিষ্টার সৈয়দ হাসান ইমাম তথাকার প্রাদেশিক কংগ্রেসনেতা হইবেন। তাঁহার জেল হইলে তাঁহার ভ্রাতা ভারত গবর্ন্মেণ্টের শাসন-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম সভ্য সৈয়দ স্যার আলি ইমাম নেতৃত্ব করিতে রাজী হইয়াছেন এবং কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন।

অপেক্ষাকৃত বা সম্পূর্ণ অপ্রসিদ্ধ অনেক মুসলমানও দেশে স্বরাজ স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। পেশাওয়ারে যে এত উপদ্রব হইয়া গেল, তাহার কারণই এই, যে, মুসলমানপ্রধান প্রদেশের রাজধানী উক্ত মুসলমান-প্রধান শহরে বিস্তর মুসলমান স্বরাজের জন্য সর্ব্বস্বপণ ও প্রাণপণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে চূড়ান্ত দুঃখভোগও অনেকে করিয়াছেন।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে, যে, "ইঁহারা ভাগবখরার বেলায় অংশ এবং ন্যায্য পাওনা অপেক্ষা বেশী অংশ চান, কিন্তু ক্ষতি ও দুঃখ সহ্য করিবার সময় ইঁহাদের দেখা পাওয়া যায় না," এই অপবাদ সকল মুসলমানের প্রতি প্রযোজ্য নহে।

—

ছাত্রসমাজ ও 'দেশের কাজ'

রাজনৈতিক কোন আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীদের যোগ দেওয়া উচিত কিনা, স্বাধীন গণতন্ত্র দেশসকলে এ প্রশ্ন ও তাহার আলোচনা উগ্র আকার ধারণ করে না; কারণ, সে-সব দেশে ছাত্রদের ভাল কিসে হইবে, আলোচ্য বিষয় তাহাই; ছাত্রেরা কোন আন্দোলনে যোগ দিলে গবর্ন্মেণ্টের কি অসুবিধা হইবে তাহা বিবেচ্য নহে। কেন না, স্বাধীন গণতন্ত্র দেশে দেশের লোক ও গবর্ন্মেণ্ট বলিতে দুটা সম্পূর্ণ আলাদা মনুষ্যসমষ্টি বুঝায় না। পরাধীন দেশে এই প্রশ্ন ও তাহার আলোচনা একটা গুরুতর

সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়; কারণ, গবর্ন্মেণ্টনামক মনুষ্য-সমষ্টি নিজেদের প্রভুত্ব ও মুনফা ছাড়িতে চান না বলিয়া স্বরাজ লাভ চেষ্টা হইতে যত লোককে পারেন নিবৃত্ত রাখিতে প্রয়াস পান।

ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশে ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে সরকারী নানা সার্কুলার ও অন্য চেষ্টা যে কেবল তাহাদের কল্যাণ-কামনা হইতে উদ্ভূত নহে, তাহার দু' একটা প্রমাণ দিতেছি। সরকারপক্ষ বলেন, ছাত্রেরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিলে তাহাদের পড়াশুনার ক্ষতি হইবে, উত্তেজক আন্দোলনে তাহাদের সমুদয় বা কতক সময় গেলে অধ্যয়ন ও জ্ঞান লাভের জন্য তাহারা যথেষ্ট সময় দিতে পারিবে না, উত্তেজক আন্দোলনে যোগ দিলে তাহাদের চিত্তচাঞ্চল্য ও চিত্তবিক্ষেপ জন্মিয়া জ্ঞানলাভের দিকেই প্রধানতঃ তাহাদের মনের ঝোঁক থাকিবে না, ইত্যাদি। গড়ের মাঠে ফুটবল খেলার সময়, ঘোড়দৌড়ের সময়, ছাত্রেরা যে দর্শকরূপে রোদে জলে পুড়িয়া ভিজিয়া অনেক দিন অনেক ঘণ্টা সময় কাটায়, তাহাতে তাহাদের পড়াশুনার সুবিধা হয়, পড়াশুনার জন্য বেশী সময় তাহাদের হয়, জ্ঞানলাভই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই বোধ জন্মে, মনে কোন উত্তেজনা বা চাঞ্চল্যের কারণ জন্মে না, ইহা কেহ বলিতে পারেন কি? অথচ সরকার বাহাদুর কখনও ত ফুটবল ম্যাচ ও ঘোড়-দৌড় দেখিয়া সময় নষ্ট করার বিরুদ্ধে কোন আদেশ প্রচার করেন নাই। খোলা মাঠে কতকটা সময় যাপন করিলে তাহার দৈহিক কিছু উপকারিতা অস্বীকার করি না; কিন্তু রাজনৈতিক কাজ উপলক্ষ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলেও কখন কখন সেরূপ উপকার হয়। পতিতা নারীরা যে সব থিয়েটারের অভিনেত্রী, বিস্তর ছাত্র প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সেখানে অভিনয় দেখে। তাহাতে তাহাদের অর্থব্যয় ও স্বাস্থ্যহানি হয়, মানসিক শুচিতা কমে, এবং কাহারও কাহারও চরিত্রভ্রংশও ঘটে। ইহাতে অধ্যয়নে অনুরাগ বাড়ে এবং অধ্যয়নের জন্য সময় বেশী পাওয়া যায়, এরূপ কেহ বলিতে পারেন না। কিন্তু সরকার বাহাদুর এ বিষয়ে কোন উপদেশ দেন না, হুকুম জারী করেন না। বলা বাহুল্য আমরা সব রকম অভিনয়ের বিরোধী নহি। সিগারেট বিড়ি খাইলে, অন্ততঃ অপরিণতবয়স্ক ছাত্রদের ক্ষতি হয়। গবর্ন্মেণ্ট এই কুঅভ্যাস দমনের কি চেষ্টা শিক্ষকদের দ্বারা বা অন্য উপায়ে করাইতেছেন? মদ্যপান আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের (অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানদের) শাস্ত্র অনুসারে পাপ, এবং বিজ্ঞানও ইহার অনিষ্টকারিতা সম্মুখে কোন মদ্যপায়ীকে মদ না-খাইতে বলিলে তাহার কারাদণ্ড হইবার অর্ডিন্যান্স হইয়াছে। **এই অর্ডিন্যান্স কি ছাত্রদের চারিত্রিক উন্নতির জন্য জারী করা হইয়াছে?**

আমরা বরাবরই সাধারণতঃ স্কুলের ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার বিরোধী। কিন্তু উপরকার ক্লাসের ছাত্রেরাও রাজনৈতিক সভায় গিয়া কখনও বক্তৃতা শুনিবে না কিম্বা কোন সভার বেঞ্চি সাজাইবে না, আমাদের মত এ রকম নয়। অবশ্য এমন অনেক বক্তার এমন বক্তৃতা আছে, যাহা বালক কেন বৃদ্ধেরও না শুনাই ভাল। কিন্তু রাজনৈতিক বক্তৃতা মাত্রেই খারাপ এরূপ কোন সাধারণ নিয়ম নির্দ্দেশ করা যায় না। স্কুলের বড় ছাত্রেরা তাহাদের বিতর্ক সভায় রাজনৈতিক বিষয়ে নিজেরা তর্কবিতর্কও করিতে পারে। বস্তুতঃ, তাহারা বড় হইয়া নির্দ্দোষ যে যে সার্ব্বজনিক কাজ করিতে পারে, তাহার সহিত সংস্পর্শ ছাত্রাবস্থাতে ঘটিলেই তাহাদের মহা অনিষ্ট হইবে, আমরা এরূপ মনে করি না। একথা কলেজের ছাত্রদের পক্ষে আরও বেশী খাটে। রাজনৈতিক ও অন্যবিধ আন্দোলন সম্পর্কে স্কুলের ছাত্রদের বেশী স্বাধীনতা থাকা উচিত।

কিন্তু মোটের উপর যিনি ছাত্র তিনি প্রধানতঃ বিদ্যার্থী, ইহা সত্য কথা। কিন্তু বিদ্যা জিনিষটি কি? "সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে", "তাহাই বিদ্যা যাহা মুক্তির অনুকূল"। মুক্তি প্রধানতঃ মানুষের অন্তরের বন্ধন মোচন অর্থেই ব্যবহৃত হয়, এবং সেরূপ মুক্তি না ঘটিলে স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের মানুষেরও দাসত্ব কাটে না। কিন্তু বাহিরের বন্ধন না ঘুচিলে মানুষের আভ্যন্তরীণ বন্ধনও যায় না। পরাধীন দেশসকলে এমন অসাধারণ মানুষ অতি অল্পসংখ্যক থাকিতে পারেন, যাঁহারা বাহিরের বন্ধনকে ভয় করেন না, গ্রাহ্য করেন না, এবং যাঁহাদের অন্তরের অজ্ঞানতাপাশ মোহপাশ প্রবৃত্তিপাশ আদি ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ পরাধীন দেশের মানুষেরা বাহিরে ও ভিতরে দাস। এবং যে-সব অসাধারণ মানুষের কথা বলিলাম, তাঁহারাও বাহিরের বন্ধনের ভয়ের অতীত হইলেও নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিতে পারেন না—যেমন কারারুদ্ধ মহাত্মা গান্ধী।

আমাদের স্কুলকলেজসকলে পরোক্ষভাবে অজ্ঞাতসারে কোন কোন ছাত্রের ভিতরের বন্ধন মোচনের সুবিধা হয়ত হয়, কিন্তু অধিকাংশের তাহা হয় না, এবং সাক্ষাৎ-ভাবে তাহাদিগকে বন্ধনমুক্ত করিবার চেষ্টা ত হয়ই না। বাহিরের যে বন্ধন, অর্থাৎ অধীনতা বা দাসত্ব, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য উপদেশ দান এবং তাহার উপায়

কলেজের ছাত্রেরা চায়, সে সব স্কুলকলেজে হইতে পারে না। সুতরাং "সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে," এইরূপ বিদ্যালাভ আমাদের স্কুলকলেজসকলে প্রধানতঃ বা বেশী করিয়া হয় না। ছাত্রদের কতকটা অজ্ঞতা ঘুচে, কেরানীগিরি, পণ্ডিতী, মাষ্টারী, ওকালতী প্রভৃতি দ্বারা কিছু রোজগারের উপায় হয়, কিন্তু দেশের পক্ষে সকলের চেয়ে বেশী ধনাগমের উপায় শিখান হয় না, চারিত্রিক উন্নতিও কাহারও কাহারও হয়, ইতিহাস পড়িয়া বাহিরের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছাও কাহারও কাহারও হয়, কিন্তু প্রচলিত স্কুলকলেজপাঠ্য ভারতেতিহাসগুলিতে অনেক মিথ্যা কথা থাকায় অনেক ছাত্রের খুব অনিষ্টও হয়।

এই সব কথা বিবেচনা করিলে মনে হয়, আমাদের স্কুলকলেজগুলি ছাত্রছাত্রীদিগকে তাহাদের ভবিষ্যৎ মনুষ্যোচিত জীবনের জন্য প্রস্তুত করে, ঠিক্ একথা বলা চলে না। সুতরাং ইহাও ঠিক্ বলা চলে না, যে, যেহেতু তাহারা অল্পবয়স্কদিগকে মানুষ করিতেছে অতএব তাহাদের এই মানুষ-করা কাজে কোন বাধা না-জন্মানই উচিত। তথাপি, আমরা বরাবর ইহা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি এবং বলিয়া আসিতেছি, যে, কতকটা জ্ঞান দিবার কতকটা মানুষ করিবার যখন অন্য শিক্ষালয় আমাদের নাই, তখন যাহা আছে তাহাতেই ছাত্রছাত্রীরা কিছু শিক্ষা পাক্। কিন্তু তাহাতেও ঐতিহাসিক মিথ্যাশিক্ষা ও কুশিক্ষার প্রশ্রয় কোনক্রমেই দেওয়া উচিত নহে।

ইহা গেল সাধারণ সময়ের ও সাধারণ অবস্থার কথা। কিন্তু এখন দেশের অবস্থা সাধারণ নহে, সময়ও সাধারণ নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার আর্কার্ট সাহেব স্বয়ং একজন শিক্ষক—তিনিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। ছাত্রদের প্রতি তাঁহার ব্যবহার এবং তাঁহার প্রতি ছাত্রদের ব্যবহার যথাযোগ্য হইয়াছে। তিনি সীণ্ডিকেটের পক্ষ হইতে ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন, ইহা করা সাধারণ রীতি নহে, কিন্তু অসাধারণ অবস্থা উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে ইহা করিতে হইতেছে। ইহার উত্তরে ছাত্রেরাও বলিতে পারে, তাহারা যাহা করিতেছে তাহাও দেশের অসাধারণ অবস্থার জন্য করিতেছে। যাহা হউক, এরূপ কথা-কাটা-কাটি করা বা করিতে প্ররোচনা দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ছাত্রেরা যাহা করিতেছে, সে সম্বন্ধেই কিছু বলিতে চাই।

যাহারা পরিশ্রম করিয়া, বেতন দিয়া ও পরীক্ষার ফী দিয়া পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিল, পিকেটিং দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা উচিত হয় নাই। মানুষের স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই যে আমরা একথা বলিতেছি তাহা নহে; কারণ, কখন কখন জোর করিয়াও মানুষকে কুকাজ হইতে নিবৃত্ত করা উচিত, যেমন বিষপান হইতে। কিন্তু ওকালতী পাশ করা বিষপানের তুল্য নহে। এবং সরকারী আদালতে এখন কেহ ওকালতী করিতে না চাহিলেও স্বরাজের আমলে তাঁহার ওকালতী করার প্রয়োজন হইতে পারে।

যাহারা পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিল, তাহাদিগকে পরীক্ষা দিতে দিয়া পরে অন্ততঃ পরীক্ষার ফল বাহির না-হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কোন 'দেশের কাজে' প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলে চলিত না কি? পরীক্ষার হলের সম্মুখে তাহাদিগকে যেমন এক জায়গায় পাওয়া গিয়াছিল, তেমন এক জায়গায় তাহাদিগকে পাওয়া না গেলেও তাহারা দুরধিগম্য নহে। পরীক্ষার পর যাহাদিগকে 'দেশের কাজে' পাওয়া যাইত না, পরীক্ষা দিতে না-দিয়া কি তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছে, বা পাওয়া যাইবে? মানব প্রকৃতি সাধারণতঃ যেরূপ, তাহাতে যাহারা পরীক্ষা দিতে পাইল না তাহাদের বরং রাগ হইবারই কথা। তবে, এ কথা সত্য বটে, পরীক্ষাদানে বাধা পাইয়া যদি কেহ কেহ ওকালতীর ইচ্ছা ছাড়িয়া দিয়া দেশের ধনবৃদ্ধির কোন উপায়ে মন দেন, তাহাতে তাঁহাদের ও দেশের উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে।

শিক্ষালয়সমূহে পিকেটিং করা সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিবার আছে। এই পিকিটিঙের উদ্দেশ্য কি স্কুল-কলেজগুলি ভাঙিয়া দেওয়া? এগুলি অবিমিশ্র অমঙ্গলের উৎপাদক নহে। সুতরাং যদি ইহাদের জায়গায় উৎকৃষ্টতর কিছু প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করা না যায়, তাহা হইলে এগুলি ভাঙিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী আমরা নহি।

কাগজে দেখিয়াছিলাম, আপাততঃ তিনমাসের জন্য শিক্ষা বন্ধ রাখিয়া ছাত্রদিগকে 'দেশের কাজে' লাগান পিকেটিঙের উদ্দেশ্য। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে ইহাতে আমাদের অমত না থাকিতে পারে। যুদ্ধের সময় বিলাতে ও ইয়োরোপের অন্য অনেক দেশে বিস্তর ছাত্র শিক্ষালয়ের পরিবর্তে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিল। কিন্তু বঙ্গে যাহারা শিক্ষালয়ে যাইবে না তাহারা বাস্তবিকই কি 'দেশের কাজ' করিবে? এই যে লম্বা গ্রীষ্মের ছুটি গিয়াছে, ইহার মধ্যে দেশের কতকগুলি ছাত্র তাহা করিয়াছে, অন্যেরা—বোধ হয় অধিকাংশ—করে নাই। সম্ভবতঃ শিক্ষা বন্ধ করিলে অধিকাংশ ছাত্র আলস্যে কাল কাটাইবে, দেশের কাজ করিবে না। তথাপি, যদি কতক ছাত্রও করে, তাহা ভাল। কিন্তু তাহারা স্বাবলম্বী হইবে, না অভিভাবকের উপর নির্ভর করিবে? তাহারা যাহা

করিবে, তাহাতে অভিভাবকদের মত থাকিলে কোন কথা উঠিবে না; কিন্তু অভিভাবকদের মত না থাকিলে দেশের কাজে নিযুক্ত কর্ম্মীদের ব্যয়নির্ব্বাহ কে করিবে, জানিতে হইবে।

এ কথা বিশেষ করিয়া কলিকাতার সেই সব ছাত্রদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য যাহারা মফঃস্বল হইতে আসিয়াছে। পড়াশুনা বন্ধ করিলে অনেক পিতামাতা তাহাদের কলিকাতার খরচ না দিতে পারেন। পিতামাতার অমতে দেশের কাজের জন্য তাহারা কলিকাতায় থাকিলে দুটি প্রশ্ন উঠে। কে তাহাদের খরচ জোগাইবে? পিতামাতার অবাধ্য হওয়া কি উচিত? যদি কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিসমষ্টি, বা সমিতি টাকা দেন, তাহা হইলে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হইয়া গেল। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সাধারণ ভাবে দিতে গেলে বলিতে হয়, সাধারণতঃ পিতামাতার অবাধ্য হওয়া উচিত নয়। কিন্তু স্থল-বিশেষে অবস্থাবিশেষে নিজের বা দেশের শ্রেয়োলাভের জন্য গুরুজনের অমতেও কাজ করা কর্ত্তব্য হইতে পারে। অবশ্য, সেস্থলে কর্ম্মীকে গুরুজনের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার আশা ছাড়িতে হইবে।

এইরূপ যুক্তি শুনিয়াছি, পিকেটিঙের উদ্দেশ্য, শিক্ষা বন্ধ হইলে অনেক ছাত্র মফঃস্বলের গ্রামে নগরে চলিয়া যাইবে ও সেখানে দেশের কাজ করিবে। কিন্তু কয়জন করিবে?

যাহারা দেশের কাজ করিবে, তাহারা যদি স্বেচ্ছায় করে, কিম্বা যুক্তিতর্কের ফলে দেশের কল্যাণার্থ অবলম্বিত কোন পন্থায় বিশ্বাসবান্ হইয়া করে, তাহা হইলে ভাল।

নেতৃত্বের কথাও বিশেষ করিয়া ভাবিতে হইবে। যুবা বয়সে নেতৃত্বের শক্তি চরিত্রের দৃঢ়তা কাহারও জন্মে না, এমন নয়। কিন্তু সাধারণতঃ নেতা হইবার যোগ্যতা বিকশিত হয় অভিজ্ঞতা হইতে এবং তাহা একটু বয়স না হইলে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদেরও বয়স সাধারণতঃ তত নয়। মহাত্মা গান্ধীর মত নেতার পরিচালনায় সকল বিষয়ে সংযত, শুচি ও নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া দেশের কাজ করা সুমহৎ শিক্ষা—যাহা স্কুলকলেজে হয় না। কিন্তু গান্ধী ত দেশে একটি; এবং তাঁহার সমতুল্য না হইলেও তাঁহার সদৃশ বহু নেতা কারাগারে। ছাত্রদিগকে চালাইবে কে? আমরা বিশেষ করিয়া কলিকাতার কথাই বলিতেছি।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন, অনেক শিক্ষিত অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোক ত বেকার বসিয়া আছে; তাহাদিগকে দেশের কাজে লাগাইবার চেষ্টা না করিয়া ছাত্রদিগকে লইয়াই কেন টানাটানি করা হইতেছে? বেকার লোকদিগকে দেশের কাজে লাগাইবার চেষ্টা হইতেছে কিনা, এবং অন্ততঃ সেরূপ কতক লোকও দেশের কাজ করিতেছেন কিনা, বলিতে পারি না—কারণ, কোন প্রচেষ্টার সহিত আমাদের যোগ নাই। হয়ত এরূপ কতকগুলি শিক্ষিত লোক দেশ-সেবক হইয়াছেন। ছাত্রদের উপর বেশী করিয়া টান পড়িবার ও দাবী হইবার কারণটি ভুলিলে চলিবে ন। যাহাদের শিক্ষা বা অর্দ্ধশিক্ষা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং যাহাদিগকে সংসারের ভার লইতে এবং পোষ্য পোষণের চিন্তা করিতে হইতেছে, তাহাদিগকে নানা ধান্দায় ফিরিতে হয়। সেই কারণে দেশসেবার চিন্তা তাহারা করিতে পারে না, অবসরও পায় না। যদি বলেন, যত দিন কোন কাজকর্ম্ম না জুটিতেছে, বৃত্তি নির্ব্বাচন না হইতেছে, ততদিন তাঁহারা দেশসেবক হউন না? তাহার উত্তর এই, যে, তাহাতে কাজকর্ম্মের চেষ্টা করা চলে না; এবং আজকাল দেশের কাজে কেহ একবার নামিলে তাহার সরকারী কাজ পাওয়া দুর্ঘট হয়, সওদাগরী আপিসে ঢোকাও শক্ত হয়, এবং পুলিসের খাতায় নাম উঠায় স্বাধীন দোকানদারী আদিতেও ব্যাঘাত ঘটে। এইরূপ নানা কারণে, এখন আমাদের দেশে—এবং বোধ হয় স্বাধীনতালিপ্সু সব দেশেই—যৌবনের আদর্শপরায়ণতা, অভয়, দুঃখসহনক্ষমতা, উৎসাহ, শক্তি, সাংসারিক ক্ষতি লাভ গণনায় অনাসক্তি ও অনভ্যাস এবং সংসারভারবিমুক্ততা ছাত্রছাত্রীদের যে-পরিমাণে আছে, অন্য কোন শ্রেণীর লোকের সে পরিমাণে নাই। এই কারণে শৃঙ্খলিত বিপন্ন দেশের প্রকৃত উদ্ধারার্থী নেতাদের এবং ব্যক্তিগত প্রাধান্যলোভী ব্যক্তিদের দৃষ্টি বেশী করিয়া ছাত্রদের উপর পড়ে। প্রকৃত দেশহিতকামী ব্যক্তিদের প্রভাব যে-সকল ছাত্রের উপর পড়িবে, তাহাদের কল্যাণ হইবে। তাঁহারা নিজে অগ্রণী হইয়া বলিবেন, "এসো"। অন্যেরা আরামে ঘরে থাকিয়া বিপৎসঙ্কুল কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবে, "যাও"।

স্কুলকলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও বর্ত্তমান প্রচেষ্টা

যে-সব স্কুলকলেজের কর্ত্তৃপক্ষ শিক্ষালয় বন্ধ করাইবার চেষ্টার বিরোধী—বিরোধী তাঁহারা সবাই—তাঁহারা বলেন, লেখাপড়া বন্ধ করিলে ছাত্রছাত্রীদের মহা অনিষ্ট হইবে, শিক্ষালয়গুলি উঠিয়া যাইবে, তাহাতে দেশের প্রভূত ক্ষতি হইবে, ইত্যাদি। আমরাও বিশ্বাস করি, দেশের সকল অবস্থাতেই শিক্ষালয়ের প্রয়োজন। কিন্তু স্কুলকলেজের কর্ত্তারা একটু চিন্তা করিবেন, তাঁহারা কিরূপ শিক্ষা দেন, এবং ছাত্রদের ও দেশের ভবিষ্যতের

জন্যই তাঁহারা উদ্বিগ্ন, না নিজ নিজ অর্থাগমের পথ বন্ধ হওয়ার চিন্তাটাও তাহার মধ্যে আছে।

ছাত্রেরা তিনমাস শিক্ষা বন্ধ রাখিতে বলিতেছে। এমন কোন ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে হইতে পারে কি, যে, যাহারা সমস্ত সেশুনের বেতন দিবে, কিন্তু তিন মাস বা ছয় মাস পরে ক্লাসে উপস্থিত হইবে, তাহারাও পড়াশুনায় কাঁচা না থাকিলে যথাসময়ে পরীক্ষা দিতে পারিবে? কোন ছাত্রের সহিত আমাদের কথা হয় নাই, কিন্তু অনুমান হয়, যেসব ছাত্র নিজেরা দেশের কাজ কিছুদিন করিতে চায় তাহারা অন্য ছাত্রদিগকেও শিক্ষালয় হইতে দূরে রাখিতে চাহিতেছে এইজন্য, যে, সকলেরই সমান অবস্থা হইলে ভবিষ্যতে সকলের শিক্ষা ও পরীক্ষার একটা ব্যবস্থা হইতে পারিবে; কিন্তু এখন যদি কতক ছাত্র ক্লাসে যায় তাহা হইলে অনুপস্থিত অন্যদের ভবিষ্যতে কোন গতি হইবে না।

—

ছাত্রছাত্রীদের কর্ত্তব্য

আমরা নিজে যেরূপ বিপদের সম্মুখীন হই নাই, অন্য কাহাকেও সেরূপ বিপদাশঙ্কার মধ্যে যাইতে বলা অনুচিত মনে করি। কিন্তু দেশের কাজ—বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী অনেক কাজ—নিশ্চিত বিপদের মধ্যে না যাইয়াও করা যায়। তাহার একটি বলিতেছি।

বোম্বাই হইতে কিছু দিন আগে খবর আসিয়াছিল, যে, কর্ম্মীরা ঐ শহরের তিন লক্ষ লোকের নিকট হইতে কেবল স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিবার প্রতিজ্ঞা সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ শহরের লোকসংখ্যা মোটামুটি দশ লক্ষ। যে তিন লক্ষ প্রতিজ্ঞা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি যদি বাড়ীর কর্ত্তাদের নিকট পাওয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে বোম্বাইয়ের অধিকাংশ লোক স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, বলিতে হইবে। বাংলা দেশেরও ছোট বড় সব শহরে ও গ্রামে বাড়ী বাড়ী গিয়া কর্ম্মীরা গৃহস্থদিগকে স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতে পারেন। যাঁহারা এই কাজ করিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে বিক্রয়ার্থ দেশী কাপড় থাকিলে আরও ভাল হয়; কেহ দেশী কাপড় কিনিতে চাহিলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ দেওয়া চলে। অবশ্য সব রকমের কাপড় বা বেশী কাপড় কর্ম্মীরা সঙ্গে রাখিতে পারিবেন না—যাহা পারেন, তাহাই ভাল। যাঁহাদের কাপড় বিক্রী করিবার সুবিধা বা ইচ্ছা হইবে না, তাঁহারা কেবল স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতে সকলকে অনুরোধ করিয়া বেড়াইবেন। এই কাজ ছাত্রছাত্রীদের দ্বারাও তাঁহাদের অবসরসময়ে হইতে পারে।

আন্দোলনের সময় অনেক ছাত্র 'স্বদেশী' প্রচার এবং দেশী কাপড় বিক্রী করিতেন।

—

মহেশচন্দ্র ঘোষ

সুপণ্ডিত ও সাধু শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন মহাশয় ৬২ বৎসর বয়সে হাজারীবাগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে অন্যত্র যে একটি কবিতা ও দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল, তাহা হইতে পাঠকেরা তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইবেন। তিনি অকপট মানবপ্রেমিক ও ভক্তসাধক ছিলেন। সত্যের সন্ধানে তাঁহার জীবন ব্যতীত হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল; তাঁহার লাইব্রেরী তাহার পরিচায়ক। অনেক ধনী লোক ঘর সাজাইবার আসবাব হিসাবে বহি কিনেন। তিনি ধনী ছিলেন না, পড়িবার জন্য বহি কিনিতেন। ডাকে প্রতিসপ্তাহে তাঁহার নিকট বহি আসিত। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এরূপ ছিল, যে, আমরা তাঁহাকে তাঁহার জানা কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া চিঠি লিখিলে ফেরত ডাকেই, অনেক সময়ে ফুলস্কেপ কাগজের ৮।১০ পৃষ্ঠাব্যাপী, উত্তর আসিত, এবং সেই উত্তরে বহু গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ থাকিত। তাঁহার পরলোকগমনে প্রবাসী ও প্রবাসীর সম্পাদক একজন পরম হিতকারী ও অতি শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু হারাইল। তাঁহার দানের মূল্য বুঝিতে শিক্ষিত সমাজের সময় লাগিবে।

—

সরকারী দর কষাকষি

বাংলা সরকারের প্রধান সেক্রেটারী হপ্‌কিন্স্ সাহেব সম্প্রতি এই মর্ম্মের একটি সার্কুলার জারী করিয়াছেন, যে, সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহাদের পোষ্য ও পরিবারবর্গের সকলের রাজনৈতিক মত ও কাজের জন্য দায়ী করা হইবে। এই সব 'গলগ্রহ' লোকেরা ('dependants') নিরুপদ্রব আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টায় যোগ দিলে, তৎসংশ্লিষ্ট সভাআদিতে উপস্থিত থাকিলে, কংগ্রেসের কোন কাজে চাঁদা দিলে, তাহাদের পালক চাকরেদের শাস্তি হইবে, ইহা ত সুস্পষ্ট। অধিকন্তু সার্কুলারটিতে আছে, যে, তাহারা নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টার সহিত সম্পর্কিত ("allied") কোন প্রচেষ্টার সহিত সম্পর্ক রাখিলেও পালক সরকারী কর্ম্মচারীদের শাস্তি হইবে।

হিন্দু সমাজে ও মুসলমান সমাজে এবং কোন কোন স্থলে দেশী খৃষ্টিয়ান সমাজেও বহু একান্নবর্ত্তী পরিবার আছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের কেবল কর্ত্তা বা বয়োজ্যেষ্ঠ

থাকে, এমন নয়। অনেকস্থলে রোজগার অনেকেই করে। তাহাদের মধ্যে সরকারী চাকর্যে থাকিতে পারে, স্বাধীন ব্যবসায়ীও থাকিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে কেহ কাহারও উপর নির্ভর করে না, কেহ কাহারও গলগ্রহ নহে। সুতরাং একজন যদি সরকারী চাকর্যে হন, তাহা হইলে সরকার কি অন্যদের মত ও কাজের জন্য তাঁহাকে দায়ী করিবেন? তাহা খুব অদ্ভুত বিচার হইলেও বিপন্ন গবর্মেণ্টের পক্ষে অসম্ভব হইবে না।

আর যদি কেহ কেহ বাস্তবিকই অরোজগারী হন, তাহা হইলেও কি গবর্মেণ্ট তাঁহাদেরও স্বাধীনতা ক্রয় করিয়াছেন? বেতন ত দেন একজনকে, অথচ স্বাধীনতা কিনিতে চান অনেকের! এটা অত্যন্ত বেশী দরকষাকষি নয় কি? অবশ্য এক্ষেত্রে ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে (স্বাধীনতা-) ক্রেতা সরকার ক্ষমতাশালী প্রভু বটে; কিন্তু ক্ষমতার সব রকম প্রয়োগ সফল হয় না।

বৃদ্ধ পিতামাতাকে পালন অনেক সরকারী চাকর্যেকে করিতে হয়। পুত্রেরা তাঁহাদের প্রতি প্রভুত্ব বা অভিভাবকত্ব করিতে গেলে তাহা হিন্দু ভাব, প্রথা ও রীতির বিরুদ্ধ হইবে। পুত্র পিতামাতাকে পালন করিতে বাধ্য, আমরা হিন্দুরা ইহাই বিশ্বাস করি। এই পালনব্যয়ের বিনিময়ে তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিনিয়া লইলাম, এরূপ যে মনে করে সে সুপুত্র নয়, হিন্দুও নয়। ভার্য্যাকে পালন করিতে পতি বাধ্য, কিন্তু পতি কেমন করিয়া পালন করিবেন তাহা তিনি ভাবিবেন, পত্নীর স্বাধীনতার মূল্য পালনব্যয়, ইহা সুপতি মনে করিতে পারেন না; পত্নীও মনে করিতে বাধ্য নহেন। যে রত্নাকর পরে মহর্ষি বাল্মীকি হইয়াছিলেন, তাঁহাকে তাঁহার পিতা মাতা ও ভার্য্যা যাহা বলিয়াছিলেন, কৃত্তিবাসী রামায়ণের গোড়ার কয়েকটা পৃষ্ঠায় তাহা পড়িলে এই বিষয়ে হিন্দুধারণা কি তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। অবশ্য, সরকারী কর্ম্মচারীরা এক এক জন আস্ত রত্নাকর বা এক এক জন হবু বাল্মীকি, এরূপ কিছু বলিয়া বা ইঙ্গিত করিয়া আমরা তাঁহাদিগকে অপমানিত বা সম্মানিত করিতে চাই না।

প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীনচেতা পুত্র পুত্রী, ভ্রাতুষ্পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রভৃতির সুনিপুণ ও সফলকাম কারাধ্যক্ষ হইতে সরকারী চাকর্যেরা সকল স্থলে পারিবেন কিনা, সন্দেহ। অনেক স্থলে অন্তর্বিদ্রোহ, গৃহবিচ্ছেদ ও গৃহত্যাগ ঘটিতে পারে। ভার্য্যা যদি বিদ্রোহিনী হন, তাহা হইলে চাকর্যে মহাশয় কি করিবেন? ব্রিটিশ আদালতে মানিত হিন্দু আইনে ডিভোর্স নাই। যদি 'সরকারী' স্বামী ও 'বেসরকারী' স্ত্রীতে রাজনৈতিক মত ও আচরণে প্রভেদ ঘটে, তাহা হইলে ঐ স্বামী ঐ স্ত্রীকে খোরপোষ দিতে বাধ্য থাকিবেন না, গবর্মেণ্ট এরূপ আইন করিবেন কি? কিন্তু যদি স্ত্রীও রোজগারী হন, তাহা হইলে তিনি কি ডিপেণ্ডেণ্ট বা 'গলগ্রহ' বিবেচিত হইবেন? এবং তিনি পিকেটিং করিলে স্বামীর চাকরী যাইবে কি?

হপ্‌কিন্স সাহেব যেমন সার্কুলার জারী করিয়াছেন, বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যুগেও সেইরূপ একটা আদেশ সরকারী কর্ম্মচারীরা পাইয়াছিলেন। তাহা উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তেইশ বৎসর পূর্ব্বে ১৩১৪ সালের ভাদ্রের প্রবাসীতে "খালাস" শীর্ষক একটি পরিহাসাত্মক গল্প লিখিয়াছিলেন। তাহা প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হইল।

ভারতবর্ষে নানা রকম শ্রেণীভেদ থাকায় স্বরাজ লাভের এবং অন্য নানাদিকে উন্নতি করিবার বাধা হইয়াছে। এখন আর একটি বাধা সৃষ্ট হইতে চলিল। সরকারী লোক ও বেসরকারী লোক, এই পংক্তিভেদ আগে হইতেই আছে। এখন সরকারী চাকর্যেদের বাড়ীর ছেলেমেয়েদের এবং পুরাঙ্গনা ও বৃদ্ধদের বেসরকারী লোকদের বাড়ীর ঐরূপ ব্যক্তিদের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশা করিতে হইলেও পরস্পরের রাজনৈতিক মতামত ও চালচলন জানিয়া লওয়া নিরাপদ হইবে। কথিত আছে, ইংরেজরা জাতিভেদ মানে না; কিন্তু যদি—অবশ্য আমাদেরই গ্রহবৈগুণ্যে—নূতন জাতিভেদের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে তাহাদের বেশী আপত্তি হইবে কি?

বর্ত্তমান ১৯৩০ সালে যে সাতটি অর্ডিন্যান্স জারী হইয়াছে, তাহার একটিতে আছে, যে, কেহ কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে চাকরী ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ উপরোধ উত্ত্যক্ত আদি করিলে তাহার শাস্তি হইবে। আলোচ্য সার্কুলারটি পড়িয়া একজন সরকারী চাকর্যেরও চিত্তবিক্ষোভ জন্মিবে না, বোধ হয় না। অতএব, আমাদের বিবেচনায়, সার্কুলারটি আরও অধিক মুন্‌শিয়ানার সহিত লিখিত হইলে ভাল হইত। একেবারে লিখিত ও মুদ্রিত না হইলে ত খুবই ভাল হইত। কিন্তু পূর্ণতার দিকে ক্রমশঃ অগ্রগামী এই জগতে পূরা ভাল ত কিছু পাওয়া যায় না—এমন কি ব্রিটিশ রাজত্বেও না। সুতরাং হঠাৎ পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা না-করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক।

—

"চলন্তিকা"

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মানবচরিত্রজ্ঞ ও সুরসিক গল্পলেখক বলিয়া ছদ্মনামে পরিচিত। বেঙ্গল কেমিক্যালের তৈরি কতকগুলি জিনিষের নামকরণ তিনি

করিয়াছেন বলিয়া আমাদের সন্দেহ হওয়ায় তাঁহার শব্দ-রচনানৈপুণ্যও আমরা অনুমান করিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন "চলন্তিকা" নামক তাঁহার অভিধানখানি হাতে পড়ায় সেই অনুমান যথার্থ মনে হইতেছে।

ইহার নাম হইতেই বুঝা যায়, ইহাতে বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে। "আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সুপ্রচলিত শব্দকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং এই সকল শব্দের যথোচিত বিবৃতির স্থান করিবার জন্য অল্পপ্রচলিত শব্দ যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হইয়াছে। বাংলায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ এবং অধুনা অপ্রচলিত প্রাচীন বাংলা শব্দ দেওয়া হয় নাই।" যাহা সহজে নাড়া-চাড়া করিতে পারা যায় অথচ যাহাতে মোটামুটি কাজ চলে, গ্রন্থকার এরূপ একটি অভিধান রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

অভিধানখানিতে ছাব্বিশ হাজারের অধিক শব্দের বিবৃতি আছে। তদ্ভিন্ন বানান, ণত্ব ষত্ব-বিধি, সন্ধি,শব্দরূপ, ক্রিয়ারূপ, সংখ্যাবাচক শব্দ, অশুদ্ধ শব্দ প্রভৃতি বিষয়ক ও বহু পারিভাষিক শব্দসম্বলিত বিস্তৃত পরিশিষ্ট আছে।

আমরা আমাদের সাধারণ কাজের জন্য ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেছি।

যিনি ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিবেন, তিনি ইহার কিছু খুঁৎ দেখাইতে পারিবেন। সেরূপ খুঁৎ প্রথম সংস্করণে অনিবার্য্য।

পুস্তকখানির আয়তন ও মূল্য বেশ সুবিধাজনক হইয়াছে।

—

"ইংলণ্ড স্বরাজের যোগ্য কি না?"

ভারতবর্ষে—আপনা আপনি কিম্বা দুষ্ট লোকদের প্ররোচনায়—হিন্দু মুসলমানে কিংবা জাতিতে জাতিতে সাংঘাতিক বিবাদ হয় বলিয়া এবং কখন কখন এক ধর্ম্মের লোক অন্য ধর্ম্মের লোকদের প্রতি অবিচার করে বলিয়া ভারতবর্ষকে স্বরাজের অযোগ্য মনে করা হয়। বোম্বাই হইতে একজন ইউরোপীয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "দি উঈক" অর্থাৎ "সপ্তাহ" নামক একখানি কাগজ বাহির হয়। উহাতে সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "Is England fit for swaraj?" "ইংলণ্ড কি স্বরাজের যোগ্য?" এই প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে তাহার কারণ উক্ত সম্পাদকের ভাষায় গত ৩রা জুলাইয়ের "দি উঈক" হইতে নীচে উদ্ধৃত হইল।

British die-hards whose oracle is the *Morning Post*, oppose tooth and nail the grant of a Dominion Status to India on the specious plea among others that the antagonism betweeen the different religious sections in this country is so strong and unreasonable that the British must perforce remain, if for nothing else, at least to keep the scales even between them. The position taken is that India wi'l be unfit for self-government so long as the minority cannot expect justice and fair play from the major community. By way of comment we reproduce below what appeared in *The Universe* (London) of June 6th, and could quote many similar or worse instances where Protestant intolerance and bigotry has deprived Catholics of their due rights and privileges as *e. g.* the shameful attempt, happily frustrated, to prevent the Liverpool Catholics from obtaining the site for their proposed Cathedral, even though they offered £35,000 more than any one else. *The Universe* writes:—

"Charges of anti-Catholic prejudice in the appointment of doctors and nurses are made by a correspondent in the *Liverpool Daily Post*. The correspondent quotes the case of a doctor who applied for the post of medical officer. His qualifications were acknowleged unanimously, but after his interview with the selection committee the chairman recalled him and asked his religion. The doctor replied that he understood they required a medical officer, not a chaplain.

"However," writes the correspondent, "his appointment went through, as otherwise the reason for a change of decision would have been obvious."

It is alleged that an applicant for the post of sister tutor at a local hospital, a woman of outstanding ability, the author of books on her profession, failed to get the vote of any Protestant member of the selection committee. The correspondent states that his own daughter, a State-registered nurse with the additional qualification of C. M. B., who applied for a hospital post, was not invited to an interview after she had, on request, stated her religion."

The letter concludes: "Every Catholic realizes that the request to 'state religion' seals his doom."

So the pertinent question arises:—Is England fit for self-goverment?

এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারা যায়। স্বাধীন দেশেও যে জাতিতে জাতিতে দাঙ্গাহাঙ্গামা খুনাখুনি হয়, অথচ সেজন্য ইংরেজরা তাহাদিগকে স্বাধীনতার অযোগ্য মনে করে না, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমেরিকার ঐরূপ একটি দাঙ্গা সম্বন্ধে গত ৫ই জুলাইয়ের একটি রয়টারের টেলিগ্রাম উদ্ধৃত করিতেছি।

EMELLE (ALABAMA) JULY 5.

Two Whites and six Negroes were killed in a fierce racial battle originating from the sale of motor car battery by a White to a Negro.

Two Whites and one Negro were shot with revolvers, and two Negroes were burnt to death in a house and one hanged by the mob.—Reuter.

—

ঢাকার হাঙ্গামা

ঢাকার হাঙ্গামা সম্বন্ধে গত মাসের প্রবাসীতে যে চিঠিগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে কিছু কিছু ভুল ছিল—দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে একেবারে নির্ভুল খবর পাওয়া কঠিন। কয়েকটি ভুল নীচে সংশোধিত হইল। সংখ্যাগুলি পত্রাঙ্ক ও স্তম্ভ।

৪২৯।১। ভবানীবাবুরা নন্দীপরিবারকে ঢাকা হলে লইয়া আসেন নাই; পুলিসের ডেপুটী স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কাদিরি তাহাদিগকে ঢাকা মিউজিয়মে পৌঁছাইয়া দেন এবং সেখান হইতে তাঁহার চাপরাসী তাঁহাদিগকে ঢাকা হলে পৌঁছাইয়া দেয়। ২৫শে মে ঢাকা হলে আশ্রিতদের সংখ্যা ৭০০ হইয়াছিল।

৪২৯।২। কয়লার দোকান পুড়ায় নাই, লুট করিয়াছিল। ঢাকা হলের ছেলেরা কেহ কেহ খাইতে পায় নাই, সকলে উপবাসী ছিল না।

৪৩০।২। "কাপড়ের দোকানের লুণ্ঠনাবশেষ পুলিশের লোকে লইয়া গিয়াছে, লোকে এইরূপ বলাবলি করিয়াছিল," এইরূপ হইবে।

৪৩২।২। চোরাই মাল বিক্রী সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছিল, তাহা এইরূপ হইবে—"কোন কোন দোকানী এই রকমে দোকান খোলা রেখেছে জান্‌তে পেরে তাদের দোকান থেকে জিনিষ কেনা ছেড়ে দেওয়া গেছে।"—ঘুষ "অনেক" লেক্‌চ্যারারদের নিকট হইতে চায় নাই, কোন কোন লেক্‌চ্যারারের নিকট চাহিয়াছিল। ভবেশ নন্দীর গ্রেপ্তার অর্ডিন্যান্স অনুসারে হয় নাই, অন্য অভিযোগে।—বাবুপুরা থানা নয়, পুলিশ সেকশ্যন।

৪৩৪।২। মুসলমান গুণ্ডারা কনষ্টেবলকে ধরিয়া লইয়া ছোরা লাঠি দেখাইয়া ভয় দেখাইয়াছিল, টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করে নাই।

৪৩৬।১। "গেট বাহিরের দিকে খোলে," হইবে।

আমাদের গত সংখ্যার বিবিধ-প্রসঙ্গের কোন কোন কথারও সমালোচনা পাইয়াছি। যথা—

৪৬৫।২। "একজন মুসলমান হিন্দু কর্ত্তৃক হত হয়, এই অনুমানে নির্ভর করিয়া মুসলমানেরা দাঙ্গার সূত্রপাত করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের ঠিক উত্তর নির্ণয় করা হয় নাই—(ক) মৃতব্যক্তি মুসলমান কি না? (খ) মৃত্যু স্বাভাবিক রোগজনিত, না হত্যাজনিত? (গ) হত্যাজনিত হইলে, হন্তা হিন্দু না মুসলমান?"

৪৬৫।১। "হিন্দুদের ধনপ্রাণ রক্ষা করবার চেষ্টা আরও কোন কোন মুসলমান করেছেন, সেগুলিও লেখা ভাল। যথা,—ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইস্‌লামিয়া ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ মুসা, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ দলীলউদ্দীন, সব-জজ মিঃ হাসিবুদ্দীন; ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা বিভাগের দপ্তরী ও তার ভাই মুসলমান গুণ্ডাদের পায়ে ধ'রে নিবৃত্ত কর্‌তে গিয়ে প্রহৃত হয়েছে এবং তা'রা ঢাকা ছেড়ে পালিয়েছে। শোনা যায়, কেউ কেউ স্বীকার করেছে যে তা'রা দলে যোগ দিতে না চাওয়াতে তা'রা হিন্দুপক্ষপাতী ব'লে নিন্দিত হ'য়েছে এবং মারপিটের ভয়ে দলে ভিড়ে হল্লা ক'রেছে, প্রতিরোধকারী হিন্দুরা আস্‌ছে কি না, তাই পাহারা দিয়েছে, কিন্তু নিজেরা গৃহদাহে লুটে খুনজখমে যোগ দেয় নি। কায়েতটুলী আক্রান্ত হ'লে পুলিশ ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কাদিরি বাবুপুরা পুলিশ সেক্‌শুনে এসে পুলিশের সাহায্য চেয়ে লালবাগ থানায় ও পুলিশ আপিসে ফোন্ ক'রে কোনো সাহায্য পান নি, নাকি কোথাও পুলিশ ছিল না। তিনি যখন ফোন্ করেন, তখন সেখানে নলিনীকান্ত ভট্টশালী উপস্থিত ছিলেন এবং ভট্টশালীর যে রিপোর্ট 'ঈষ্ট বেঙ্গল টাইমস্' ছেপেছে, তা' থেকে মুসলমানের এই চেষ্টার কথাটুকু বাদ দিয়ে দিয়েছে।"

৪৭৪।১। "ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট্ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মুসলমান কর্ম্মচারীর আহ্বানে ঢাকা-হল দেখিতে গিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ নাই।"

"যখন ভয়ে কেহ ঘরের বাহির হইতে পারে না, তখন ঢাকার হিন্দুসভার লোকেরা মোটর-বাসে করিয়া পাড়ায় পাড়ায় লোককে সাহস ও সান্ত্বনা দিয়া বেড়াইয়াছেন, আহত ও পীড়িতদের ডাক্তার ও ঔষধ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, দুঃস্থ ও নিঃস্বদের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, বিপন্ন পরিবারদের শঙ্কাজনক স্থান থেকে উদ্ধার করিয়া

স্থানান্তরে বা আশ্রয় দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভগ্ন দগ্ধ বাড়ীর ও দোকানের ফটোগ্রাফ লওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, এবং এখনও তাঁরা ক্ষতিগ্রস্তদের দিয়া মোকদ্দমা রুজু করাইতেছেন, মোকদ্দমার পরামর্শ দিতেছেন, আদালতে যাতায়াতের জন্য মোটর-বাস বাড়ীতে বাড়ীতে পাঠাইতেছেন। ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায় এজন্য তাঁদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ এবং এজন্য তাঁরা সমগ্র হিন্দুসমাজের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। হিন্দুসভার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস উকীল মহাশয়ের নাম এই সাহায্যদানের কাজ সম্পর্কে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ঢাকার বাহিরেও এই ভয়ঙ্কর সময়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাহায্য দিয়াছেন, বা বিরোধ যাহাতে না বাধে, তাহার চেষ্টা করিয়াছেন।"

—

বিশ্বভারতীর রিপোর্ট

বিশ্বভারতীর ১৯২৯ সালের রিপোর্ট পড়িয়া বুঝা যায়, কাজ ভালই চলিতেছে। কলেজ বিভাগে ছাত্রছাত্রী ঐ সালে বাড়িয়াছিল।

এ সালে সর্ব্বত্র কমিয়াছে। কিন্তু বিশ্বভারতীতে বাড়িতেও পারে, কারণ, সেখানে পিকেটিং নাই। যাঁহারা নিজেদের প্রকৃত উন্নতির এবং ভবিষ্যতে মানবের সেবার জন্য সদ্য সদ্য দেশের কাজে প্রবৃত্ত না হইয়া জ্ঞানার্জ্জনে কিছু কাল ব্যাপৃত থাকিবেন, তাঁহারাও দেশের কাজে ব্যাপৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মত স্বদেশপ্রেমিক।

শ্রীনিকেতনের কাজ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। নূতন যে বিস্তৃত ভূখণ্ড লওয়া হইয়াছে, তাহাতে চাষ হইলে ক্রমে ক্রমে শ্রীনিকেতন স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারে।

বিশ্বভারতীতে সাধারণ লেখাপড়া ছাড়া সঙ্গীত চিত্রাদি ললিতকলা প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামের উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে। বস্তুতঃ, বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা ভাল করিয়া হইলে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবজীবনের অন্তর ও বাহিরের সহিত যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সংস্পর্শ স্থাপিত হইবে, ভারতের অন্য কোন বিদ্যাপীঠে তাহা নাই। এখনও, বিজ্ঞান ছাড়া, অন্য সব দিকে সংস্পর্শ আছে। বিজ্ঞান যে একেবারেই শিক্ষা দেওয়া হয় না, তাহা নহে।

ছাত্রীদের শিক্ষার ইহা উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। স্বাস্থ্যকর ও জনকোলাহল হইতে দূরবর্ত্তী খোলা মাঠে ইহা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহারা অসঙ্কোচে চলাফিরা করিতে পারে; এবং সাধারণ লেখাপড়া ছাড়া সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, মূর্ত্তিগঠন, সূচীশিল্প, নানাবিধ গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি শিখিতে পারে, তাহার জন্য অতিরিক্ত বেতন দিতে হয় না।

বিশ্বভারতীর আগেকার ব্যবস্থা হইতে দুটি প্রভেদ লক্ষিত হয়। নিকটবর্ত্তী কোন কোন গ্রামের বালক-বালিকাদিগকে এখনও তাহাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু আগে যেমন শান্তি-নিকেতনের ছাত্রেরাও পড়াইত, এখন তাহা হয় না। পড়ান এখনও হয়ত ভালই হয়, কিন্তু শান্তি নিকেতনের ছাত্রদের সহিত গ্রামের প্রাণের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। অতিথিশালায় যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের আদর-যত্ন করিবার কতকটা ভার আগে ছাত্রদের উপর থাকায় তাহাতে ছাত্রদের উপকার হইত। এখন বন্দোবস্ত অন্যবিধ। এই উভয় প্রভেদে আগেকার চেয়ে ছাত্রেরা পড়িবার সময় একটু বেশী পায় কিনা জানি না, কিন্তু সম্ভবতঃ হৃদয় মন বড় হইবার সুযোগ কিছু কমিয়াছে। এই দুইটি বিষয় বিবেচনা করিতে কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি।

—

মেডিক্যাল ছাত্র ও অন্য ছাত্র

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় অন্য সব কলেজ আপাততঃ বন্ধ করায় মত দিয়াছেন. অথচ মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ করায় আপত্তি করিয়াছেন, ইহাতে কেহ কেহ তাঁহার সমালোচনা করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় ইহাতে অসঙ্গতি নাই। মেডিক্যাল ছাত্রদিগকে কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালে রোগীর শুশ্রূষাদি করিতে হয়। এইজন্য তাহাদের শিক্ষা বন্ধ রাখা চলে না। তা ছাড়া, দেশে সাধারণ গ্রাডুয়েট, আইন গ্রাডুয়েট এক বৎসর না বাড়িলেও চলে, কিন্তু চিকিৎসক এখনও অনেক বাড়া দরকার।

সাধারণ কলেজের শিক্ষা বন্ধ রাখা সম্বন্ধে আলোচনা আগে করিয়াছি।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেসে, শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নগর প্রবেশ

শ্রীকনু দেশাই

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩০শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৩৭

৫ম সংখ্যা

প্রাচীন ভারতে বন্দুক ছিল না

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

নানা জনে রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে বন্দুক ও কামান দেখিয়াছেন। অনেকে আগ্নেয়াস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, এই এই নামে ভুলিয়াছেন; নালীক, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী, প্রভৃতিকে বন্দুক কিংবা কামান মনে করিয়াছেন। প্রাচীন অধুনা-অজ্ঞাত দ্রব্যের স্বরূপ-নির্ণয় চিরকাল দুরূহ। কিন্তু সেটা কি বলা যত কঠিন, সেটা কি নয়, বলা তত কঠিন নয়। আমি এখানে 'নেতি-নেতি' বলিতে যাইতেছি।

কিন্তু নেতি-বচন দ্বারা মনস্তোষ হয় না, দ্রব্যটি কোন্ বর্গের (class), তাহা জানিতে কৌতূহল হয়। কোন কোন অস্ত্রের নামের অর্থ বিচার দ্বারা এবং কদাচিৎ আসত্তি দ্বারা তাহার বর্গ অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু সকল অস্ত্রের নয়। নামের অর্থ দ্বারা বর্গের পর গণ (genus), ও জাতি (species) নির্ণয় হইতে পারে না। এ নিমিত্ত অস্ত্রের দ্রব্য, নির্মাণ, প্রয়োগ ও কর্ম, এই চারি জানা আবশ্যক হয়। প্রাচীন ধনুর্বেদে হয়ত এই চারি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন বহু শাস্ত্রের ন্যায় প্রাচীন ধনুর্বেদও লুপ্ত হইয়াছে। এখন কদাচিৎ সংক্ষিপ্ত কিংবা খণ্ডিত সংস্করণ পাওয়া যায়। তাহাতে যাবতীয় যুদ্ধাস্ত্রের সবিশেষ বর্ণনা নাই। বর্ণনার প্রয়োজনও ছিল না; কে জ্ঞাত দ্রব্যের বিবরণ অন্বেষণ করে? আমরা কলম দিয়া লিখি। কিন্তু কেহ নানাবিধ কলমের স্বরূপ বর্ণনা করেন নাই, সে বর্ণনা কেহ খোঁজেও না। কিন্তু কালে হয়ত কলম দিয়া লেখা উঠিয়া যাইবে, সকলেই অক্ষর-কল টিপিয়া লিখিতে থাকিবে। তখন শরের কলম, খাগের কলম, কঞ্চির কলম, পালখের কলম, লোহার কলম ইত্যাদি কলম কেমন, তাহার নিমিত্ত গবেষণা করিতে হইবে। প্রাচীনকালের যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধেও গবেষণা করিতে হইতেছে।

আমরা এখনও ধনু দেখিতে পাই; জানি ইহা দ্বারা দূর হইতে শর নিক্ষেপ করিতে পারা যায়।*

* এখানে একটা প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়িতেছে। ডাকাত হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত কেহ কেহ যষ্টিযুদ্ধ ও অসিযুদ্ধ শিখিতেছেন। কিন্তু এই দুয়ের দোষ এই, ডাকাতকে নিকটে আসিতে দিতে হয়। সেটা বিপজ্জনক। যে যতদূর হইতে শত্রুকে আঘাত করিতে পারে, সে তত নিরাপদ। এই হিসাবে পাথর ও ইটাল ছুঁড়িতে শেখা ভাল। ধনুর্বিদ্যা শেখা আরও ভাল। বালক-বালিকা সকলেই শরাভ্যাস করিতে পারে। গুলতই দ্বারা বাঁটুল ছুঁড়িতে শিখিয়া রাখিলে দূর হইতে ডাকাত তাড়াইতে পারা যায়। বাঁশের বাখারির গুলতই আর চিট্‌কা মাটির পোড়া বাঁটুল পিস্তলের কাজ করে, কিন্তু প্রাণঘাতী হয় না। আমার জন্মস্থান ডাকাতের দেশে। আমরা বাল্যকালে 'ছড়ি' (বুক পর্যন্ত উচ্চ সরু লাঠি), ধনুক, গুলতই লইয়া খেলা করিতাম।

কিন্তু ধনু একপ্রকার ছিল না। এখানে ধনুর্বর্গের ভাগ দেখাইতেছি।

ধনুর্বর্গ

- মহাযন্ত্র — গুণ যন্ত্রদ্বারা আকর্ষ্য
  - বাণ-নিক্ষেপের
  - পাষাণ-নিক্ষেপের
- ধনুঃ — গুণ বাহুবলে আকর্ষ্য
  - দারু নির্মিত (কার্মুক)
  - বংশ নির্মিত (চাপ)
  - শৃঙ্গ নির্মিত (শার্ঙ্গ)

ইত্যাদি।

রামায়ণ মহাভারতাদিতে অস্ত্রের কর্ম, এবং বিশেষ বিশেষ অস্ত্রের প্রয়োগও লিখিত আছে। কদাচিৎ অস্ত্রের বিশেষণ দ্বারা নির্মাণও জানিতে পারা যায়। যেখানে কেবল নামটি আছে, আর কিছুই নাই, সেখানে অস্ত্রটি অজ্ঞাত থাকিবে। বলা বাহুল্য, ধনু যেমন অস্ত্র নয়, যন্ত্র; বন্দুক ও কামানও অস্ত্র নয়; নিক্ষেপের যোগ্য না হইলে অস্ত্র বলিতে পারা যায় না। যদি বন্দুককে অস্ত্রও বলি, ইহা অগ্নিময় অস্ত্রও নয়, অগ্নিবলে প্রেরক অস্ত্র বলিতে হইবে। ইহাতে নল চাই, অগ্নিচূর্ণ বা বারুদ চাই, আর চাই ধাতুময় বটিকা বা গুলিকা। যদি বারুদ না পাই, যদি বাহুবল ব্যতীত অগ্নিবল না পাই, তাহা হইলে বন্দুক বা কামান হইতে পারে না।

যে যে অস্ত্রে বন্দুক বা কামান মনে হইয়াছে, সে সে অস্ত্র বিচার করিতেছি।

১। সূর্মি, সূর্মী। নামটি মনু-সংহিতায় (১১।১০৪) আছে। অর্থ ধাতুময় প্রতিমা; 'অয়োময়ী প্রতিকৃতি'। গুরু-পত্নী-গামীকে 'জ্বলন্ত' সূর্মী আলিঙ্গন করাইয়া বধের ব্যবস্থা ছিল। বোধ হয়, সূর্মী সুষির (ফাঁপা) হইত, এবং ভিতরে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখিয়া 'জ্বলন্ত' করা হইত। ধাতু পুড়িতে পারে না; অতএব 'জ্বলন্ত' অর্থে তাপে দীপ্ত বুঝিতে হইতেছে।

স্মৃতির এই সূর্মীকে কেহ কামান মনে করেন নাই, বেদের সূর্মীকে মনে করিয়াছেন। ঋগ্‌বেদে (৭।১।৩) সূর্মী শব্দ আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, 'জ্বালা'। অগ্নিকে 'জ্বালা' (তাপ) দ্বারা দীপ্ত হইতে বলা হইয়াছে। বোধ হয় সু-ঊর্মি = সূর্মি। ঊর্মি দীপ্তি, দীপ্তির তরঙ্গ। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪।৫।৯।২) 'সূর্মী' অর্থে সায়ণ 'শোভনা ঊর্মি-যুক্তা নদী' বুঝিয়াছেন। কিন্তু অন্যত্র (১।৫।৭।৬) 'কর্ণকাবতী সূর্মী' আছে। সায়ণ লিখিয়াছেন, "জ্বলন্তী লোহময়ী স্থূণা সূর্মী সা চ কর্ণকাবতী ছিদ্রবতী অতএব জ্বলন্তীত্যর্থঃ।" স্থূণা গৃহের স্তম্ভ, খুঁটি। তাহার মধ্যে ছিদ্র আছে, মাথায় কানা আছে। অতএব লোহার নল অর্থ পাইতেছি। 'জ্বলন্তী' অর্থ 'তাপে দীপ্যমানা' বুঝিতে হইতেছে। ঋগ্‌বেদে (৮।৬৯।১২), 'সূর্ম্যং সুষিরামিব' আছে। সূর্মি যে সুষির, তাহা এখানে স্পষ্ট হইয়াছে। এখানে 'জ্বলন্তী' নাই। অতএব বেদের সূর্মী ধাতুময় নল, তাহা আগুনে তপ্ত হইয়া 'জ্বলন্তী' হইতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও এই অর্থ বুঝিয়াছেন। অতএব সূর্মী শব্দের দুই অর্থ পাইতেছি। সু-ঊর্মী, শোভনতরঙ্গ-যুক্ত; আর, লৌহময় নল। এই দুই অর্থের একটাতেও বন্দুক কামান নাই। সায়ণ চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টশতাব্দে ছিলেন। তখন বন্দুক কামান প্রচলিত ছিল। বেদের সূর্মী এরূপ কিছু হইলে তিনি 'সূর্মি' অর্থে নালীকাস্ত্র বলিতেন।

২। সীস। অথর্ববেদে 'সীস' দ্বারা শত্রুবিনাশের কথা আছে। কেহ কেহ এই সীসকে বন্দুকের সীস-ধাতুময় বটিকা মনে করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বেদের সূক্ত ও সায়ণের ভাষ্য পড়িলে বন্দুকের গুলি পাওয়া যাইবে না। যথা, অথর্ববেদে (১।১৬।২), বরুণদেব সীসকে বলিতেছেন, 'হে সীস, অগ্নি তোমায় রক্ষা করিতেছেন। রাক্ষসাদি বিনাশের নিমিত্ত ইন্দ্র আমায় সীস দিয়াছেন।' এখানে সায়ণ 'সীস' শব্দে নদী-সীস, নদীফেন এই পরিভাষা উদ্ধার করিয়াছেন। বোধ হয়, অথর্ববেদের নদীফেন আয়ুর্বেদে সমুদ্রফেন নামে খ্যাত। সে যাহা হউক, 'সীস' সীসকধাতু নয়। সায়ণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা হইতে বুঝিতেছি, দ্বেষ্য-মরণার্থে অভিমন্ত্রিত সীসচূর্ণ-মিশ্রান্ন প্রদান করা হইত। অমাবস্যার রাত্রে। শুধু নদী-ফেন নয়, তাহার সহিত লৌহচূর্ণ কৃকলাসশির থাকিত। কৌটিল্য তাঁহার "অর্থশাস্ত্রে" এইরূপ

প্রয়োগকে 'পরঘাত প্রয়োগ' বলিয়াছেন। মন্ত্রিত 'বাণ' মারিয়া শত্রু বধ করিতে পারা যায়, এ বিশ্বাস এখনও আছে, সে 'বাণ' ধনুকের লৌহফল-বিশিষ্ট শর নহে, অভিমন্ত্রিত উপকরণ।

উক্ত শত্রু-মারক সীস একটু পরেও (১।১৬।৪) আছে। সায়ণের ভাষ্য এই,—হে শত্রু, যদি তুমি আমার গো অশ্ব ভৃত্য পুত্র হিংসা কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে 'সীস' দ্বারা এমন মারিব যে পারিবে না।" এখানেও আভিচারিক মন্ত্র সহযোগে 'সীস' দ্বারা শত্রুবধের কথা। এই 'সীস,' বন্দুক নিক্ষেপ্য সীসক ধাতু নয়।

(৩) আগ্নেয়াস্ত্র। অর্থ, অগ্নিময় অস্ত্র। অস্ত্র, যেটা নিক্ষিপ্ত হয়। বন্দুক নিক্ষিপ্ত হয় না, বন্দুক অস্ত্র বলিতে পারা যায় না; বন্দুক যন্ত্র, নিক্ষিপ্ত গুলি অস্ত্র বটে। আগ্নেয়াস্ত্র যে ধনুদ্বারা নিক্ষিপ্ত হইত, ইহা যে বাণ-বিশেষ, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যথা, রামায়ণে ("বঙ্গবাসী"র সংস্করণে, লং। ১০০) শ্রীরাম 'ধনু'দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তিনি ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা রাবণ বধ করিয়াছিলেন (লং।১১০)। এই ব্রহ্মাস্ত্র কেমন? "দীপ্তং নিশ্বসন্তমিবোরগম্ জাজ্বল্যমানং সুপুঙ্খং সধূমং।" স [রামঃ] রাবণায় সংক্রুদ্ধো ভৃশমায়ম্য কার্মুকং। চিক্ষেপ পরমায়ত্তঃ শরং মর্ম-বিদারণম্॥"—রাম কার্মুক অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়া মর্ম-বিদারণ শর নিক্ষেপ করিলেন। শরটি প্রজ্জ্বলিত, জ্বলিবার সময় সাপের মত শোঁ শোঁ শব্দ করিতেছিল। মৎস্যপুরাণে ("বঙ্গবাসী"র,১৫৩ অঃ),জম্ভাসুর বধের নিমিত্ত ইন্দ্র কর্ণপ্রান্ত পর্যন্ত 'শরাসন' আকর্ষণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র বাণ ত্যাগ করিলেন। এইরূপ, মহাভারতে আছে। ব্রহ্মশির, ব্রহ্মাস্ত্র, এবং রামায়ণের ঐষিকাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, সৌরাস্ত্র প্রভৃতি সব, আগ্নেয়াস্ত্রের ভেদ।

কেবল বাণে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া নিক্ষিপ্ত হইত না। অন্য অগ্নিও শত্রুসেনার মধ্যে ফেলা হইত। রামায়ণে (লং। ৭৩) ইন্দ্রজিৎ স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিকণা-সম্বলিত শূল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এত ক্ষিপ্র-হস্তে ও বেগে অগ্নিময় অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইত যে, লক্ষ্য-শত্রু বাম কিংবা দক্ষিণে সরিয়া দাঁড়াইবার অবসর পাইত না।

৪। শতঘ্নী। একদা অনেক লোককে হত করিতে পারে। কিন্তু একমাত্র কামানের গোলাই যে পারে, তাহা নয়। কৌটিল্যে শতঘ্নী চলযন্ত্রবর্গের মধ্যে। টীকাকার লিখিয়াছেন, বহু-লৌহ-কণ্টক-সমাচ্ছন্ন বৃহৎ স্তম্ভ, দুর্গ-প্রাকারে স্থাপিত হয়। বৈজয়ন্তী কোষে (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দের আদ্যে), শতঘ্নী "অয়ঃ-কণ্টক-সংছন্না মহাশিলা।" রামায়ণের টীকায় "শতঘ্নীচ চতুর্হস্তা লৌহ-কণ্টকিনী গদা, ইতি বৈজয়ন্তী।" শব্দকল্পদ্রুমে বিজয়-রক্ষিত, "অয়ঃ-কণ্টক-সংছন্না শতঘ্নী মহতী শিলা।" অর্থাৎ শিলাস্তম্ভের গায়ে লোহার কাঁটা পুতিয়া রাখা হইত শত্রুসেনা প্রাকারে উঠিবার উপক্রম করিলে তাহাদের উপরে স্তম্ভটি ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইত। তাহারা কাঁটায় বিদ্ধ ও শিলার ভারে পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। যথা, রামায়ণে (লং। ৩ "লঙ্কাপুরীর কবাটবদ্ধ চারি দ্বারে দৃঢ় ও বৃহৎ ইষু-উপল-যন্ত্র (শর ও পাষাণ নিক্ষেপের যন্ত্র) এবং শাণিত কৃষ্ণায়সময় শত শত শতঘ্নী আছে।" কৃষ্ণায়সময়,—ইস্পাতের কণ্টকময়। কামান শাণিত হয় না। হনুমান লঙ্কায় গিয়া "শতঘ্নী মুষলায়ুধ" শতঘ্নী ও মুষল নিক্ষেপের সেনা দেখিতে পাইল (সুং। ৪)। দুই আয়ুধই পিষিয়া মারে, এই কর্মসাদৃশ্য হেতু কবির পরে পরে মনে হইয়াছে। শতঘ্নী রণস্থলে লইয়া যাওয়াও হইত। রাম-রাবণের যুদ্ধে, রাক্ষসেরা যুদ্ধস্থলে শতঘ্নী লইয়া গিয়াছিল (লং। ৭৮)। মহাভারতেও (দ্রোণপর্ব) চাকার উপরে শতঘ্নী বাহিত হইয়াছিল। বহুকাল পরে, ১২শ খ্রীষ্ট শতাব্দের পরে, বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্করণে শতঘ্ন, কামান হইয়াছে। প্রাচীন নামের অর্থ ধরিয়া অর্থান্তরপ্রাপ্তির ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে।

৫। ভুশুণ্ডী। শব্দটি ভু-শুণ্ডী, কি ভুশুণ্ডী, তাহা জানা নাই। অমরাদি-কোষে নাই। বৈজয়ন্তী কোষে, ভুশুণ্ঠী। অর্থ, "দারুময়ী বৃত্তায়ঃ-কীল-সঞ্চিতা।" বোধ হয়, গোল লৌহ পিণ্ডাগ্র গদাবিশেষ। প্রয়োগ দেখি। মৎস্যপুরাণে (১৫১ অঃ), "হরি কৃতান্ত তুল্য ভুশুণ্ডী গ্রহণ করিয়া শুম্ভের মেষবাহন 'পিপেষ,' পিষিয়া মারিলেন। এইরূপ পূর্ববর্ত্তী অধ্যায়ে, "শৈলবৎ গুরু ও ভীষণ ভুশুণ্ডী দ্বারা নিশাচরদিগকে নিষ্পিপেষ,' পিষিয়া মারিলেন। রামায়ণে (লং। ৬০), "নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে

জাগাইবার নিমিত্ত রাক্ষসেরা ভুশুণ্ডী, মুষল ও গদা দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। মহাভারতে (দ্রোণ, ১৭৭), "খড়্গ, গদা, ভুশুণ্ডী, মুসল, শূল, শরাসন, ও হস্তীচর্মসদৃশ বর্ম।" এখানে গদা ও মুসলের মাঝে ভুশুণ্ডী থাকাতে মনে হয় উহা তদ্বৎ কিছু হইবে।

কিন্তু মহাভারতের (আদি, ২২৭) টীকাকার নীলকণ্ঠ (খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দ) ভুশুণ্ডী অর্থে লিখিয়াছেন, "পাষাণ ক্ষেপণ-চর্মরজ্জুময় যন্ত্র।" এই যন্ত্র অদ্যাপি আছে। এক টুকরা চর্মের দুই প্রান্তে হ্রস্ব ও দীর্ঘ দোড়ী বাঁধিয়া চর্মের উপরে পাষাণ রাখিয়া বেগে ঘুরাইয়া হ্রস্বরজ্জু ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পাষাণখণ্ড বেগে দূরে গিয়া পড়ে। ছেলেরা তালপাতা কিংবা দু-ভাঁজ দোড়ীর করে। বাঁকুড়ায় বলে, 'ডেলাস' (ডেলা অস্ত্র ?)। আরামবাগ (হুগলী জেলা) অঞ্চলে বলে 'ইটাল চণ্ডী।' শুণ্ডাকার বলিয়া বলিয়া শুণ্ডী, ভূমি পর্যন্ত লম্বিত বলিয়া হয়ত ভূ-শুণ্ডী। নীলকণ্ঠের ভুশণ্ডী এইরূপ হইবে। বশিষ্ঠ-ধনুর্বেদেও এই অর্থ। সেখানে আছে, পদাতি-সেনা ভুশণ্ডী কিংবা ধনু ধরিয়া গাছের আড়ালে থাকিয়া কিংবা গাছে চড়িয়া যুদ্ধ করিবে। অর্থাৎ ভুশুণ্ডী দ্বারা পাষাণ কিংবা ধনুদ্বারা শর নিক্ষেপ করিবে।

(৬) ঔর্বাগ্নি। কেহ কেহ ঔর্বাগ্নি, বারুদ মনে করিয়াছেন, কিন্তু বারুদকে অগ্নি বলিতে পারা যায় না। রামায়ণ মহাভারতে, ঔর্বাগ্নি, বড়বানল। রামায়ণে (কিঃ। ৪৪), সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে চতুর্দিকে বানর (অনার্য-মানুষ) পাঠাইলেন। বলিলেন, "পূর্বদিকে সপ্তরাজ্যোপশোভিত যব-দীপ ও সুবর্ণ-দীপ (সুমাত্রা) অন্বেষণ করিবে। ব্রহ্মা জলোদ-সাগরে ঔর্বঋষির কোপজ তেজে সর্বভূতভয়াবহ বৃহৎ অশ্বীমুখ করিয়াছেন। সে অদ্ভুত তেজে চরাচর বিনষ্ট হইয়া থাকে। বড়বামুখে পতনের ভয়ে প্রাণীগণের নাদ শুনিতে পাওয়া যায়।" এই বর্ণনা আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপের। সুমাত্রার নিকটস্থ ক্রাকাতোয়া গিরির ভয়ঙ্কর উৎক্ষেপ প্রসিদ্ধ। বোধ হয় পূর্বকালেও এইরূপ উৎক্ষেপ হইত এবং তাহা দেখিয়া রামায়ণে লেখা। আগ্নেয়গিরিটি দেখিতে বড়বামুখ মনে হইতে পারে। মহাভারতে ঔর্ব-উপাখ্যান আছে। অতএব ঔর্বাগ্নি বা বড়বানল বহু পূর্বকালে দৃষ্ট হইয়াছিল।

(৭) নালীক। শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী তাঁহার বহু শ্রমসাধ্য "মহাভারত-মঞ্জরী"তে প্রাচীন বহু বৃত্তান্ত সঙ্কলন দ্বারা আমাদের শ্রম লাঘব করিয়াছেন। তিনি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে পূর্বকালের বন্দুক কামানের নাম নির্দেশ করিয়াছেন। উপরে দেখিয়াছি, আগ্নেয়াস্ত্র, ব্রহ্মশির অস্ত্র ও বেদের সূর্মি বন্দুক নয়। এখন দেখি, নালীক ও বন্দুক এক কিনা। নালীক শব্দের অর্থ নল। নালীক, নলাকার অস্ত্র। কি রূপ? নালীক ও নারাচ প্রায়ই একত্র উল্লিখিত হইয়াছে, যেন উভয়ের মধ্যে প্রয়োগ কিংবা কর্মে সাদৃশ্য ছিল। নারাচ জানি, সমগ্র লৌহময় বাণ, নির্ভট ও শিরাল। ভারী বলিয়া এই বাণ যে-সে ছুঁড়িতে পারিত না। তখন সরু নলের কল্পনা আসিয়া থাকিবে। দৃঢ় ও লঘু করিতে গেলেই নলাকার চাই। বৈজয়ন্তী লিখিয়াছেন, নালীক—বাণ। প্রয়োগ দেখি। রামায়ণে (আরণ্য, ২৫), "শ্রীরাম-নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণাগ্র নালীক ও নারাচ এবং বিকর্ণী দ্বারা ছিদ্যমান হইয়া নিশাচরেরা ভীম আর্তস্বর করিতে লাগিল।" এখানে স্পষ্ট লিখিত আছে, রামের "ধনুর্গুণ-চ্যুত বাণ।" নালীক, বোধ হয়, সুষির কিন্তু সূচ্যগ্র বাণ। কর্ণী, যে শরফলে কর্ণ আছে, দেহে বিদ্ধ হইলে মাংস না ছিঁড়িয়া উঠাইতে পারা যায় না। এই কারণে ধর্মশাস্ত্রে কর্ণীবাণ নিক্ষেপ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বিকর্ণী বোধ হয় দ্বিকর্ণীর রূপান্তর। কর্ণী ও দ্বিকর্ণী। রামায়ণে (আরণ্য, ২৬), "রাম এক শত কর্ণীদ্বারা এক শত রাক্ষস বধ করিলেন।" মহাভারতে (ভীষ্ম, ৯৫, ৩১) "কর্ণি-নালীক-সায়কৈঃ," (ভীষ্ম। ১০৬, ১৩) "কর্ণি-নালীক-নারাচৈঃ।" সায়ক অর্থে বাণ। বোধ হয়, কর্ণি, নালীক এক পদ। নালীকের কর্ণ থাকিত, সুতরাং বাণটি আরও ভীষণ। (সৌপ্তিক পর্বে ১০, ১৫), "কর্ণি-নালীক-দংষ্ট্রস্য খড়্গ-জিহ্বস্য সংযুগে।" যাহার দংষ্ট্রা কর্ণি-নালীক, জিহ্বা খড়্গ। নালীক সূচ্যগ্রই বটে। স্ত্রী পর্বে (২০), "মহাত্মা ভীষ্ম কর্ণি-নালীক ও নারাচ প্রভৃতি শরনিচয় নির্মিত শয্যায় শয়ান আছেন।" এখানে নালীক স্পষ্ট শর।

বন্দুক-উদ্ভাবনার পর উহা নলাকার বলিয়া নালীক

নাম পাইয়াছিল। নালাস্ত্র, নালীকাস্ত্র নামকরণে একটু দোষও ঘটিয়াছিল। বন্দুক অস্ত্র নয়, ধনুর ন্যায় যন্ত্র। আশ্চর্য্য এই, শুক্রনীতিসার অস্ত্র ও শস্ত্র দুইভাগে আয়ুধ ভাগ করিয়াও নালিকাস্ত্র বলিয়াছেন। ইহাতেও সন্দেহ হয়, এই নাম প্রাচীন নয়।

(৭) অয়ঃ-কণপ। মহাভারতে (আদি। ২২৭, ২৫), বোধ হয় এই একটি স্থানে শব্দটি আছে। অন্য স্থানে থাকিলে "মহাভারত-মঞ্জরী"-কর্তার চোখে পড়িত। কৃষ্ণ ও অর্জুন অগ্নির ভোজন-তৃপ্তির নিমিত্ত খাণ্ডববন রক্ষা করিতেছেন, "অয়ঃ-কণপ-চক্রাশ্ম-ভুশুণ্ডী-উদ্যত-বাহবঃ," হাতে অয়ঃ-কণপ, চক্রাশ্ম, ও ভুশুণ্ডী লইয়া। নীলকণ্ঠ তিনটিই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ভুশুণ্ডীর অর্থ পূর্বে দেখিয়াছি, পাষাণ-ক্ষেপণ চর্মরজ্জু। চক্রাশ্ম—"অতিদূরে বড় বড় পাষাণ নিক্ষেপের কাষ্ঠময় যন্ত্র। ইহার ঘূর্ণনবেগে পাষাণ নিক্ষিপ্ত হয়।" চক্র নাম হইতে বুঝিতেছি, এটি কাষ্ঠময় চক্র। সে যাহা হউক, পাষাণ-ক্ষেপণের দুইটি যন্ত্র পাইলাম। "অয়ঃকণপং—অয়ঃকণান্ লৌহগুলিকাঃ পিবতীতি তথাবিধমাগ্নেয়ৌষধি-বলেন গর্ভসম্ভূতা লোহগুলিকাস্তারকা ইব বিকীর্যন্তে যেন তৎযন্ত্রং লোহময়ং। "যে লোহময় যন্ত্রের গর্ভস্থ লৌহ-গুলিকা আগ্নেয় ঔষধিবলে তারকার ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া পড়ে।" অবিকল বন্দুক! কিন্তু বন্দুক, লোহগুলিকা পান করে না, বমন করে। আর হাতে বন্দুক থাকিলে কৃষ্ণার্জুন পাষাণ ছুঁড়িতে গেলেন কেন? চক্রাশ্ম নিশ্চয় গুরুভার, নইলে অতিদূরে মহান্ পাষাণ নিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। "চক্রাশ্ম" এক পদ কিনা, কে জানে। সে যাহা হউক নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যায় সন্দেহ হইতেছে। অমর-কোষে (লিঙ্গ-সংগ্রহবর্গ, ২০) কণপ শব্দ আছে। ক্ষীরস্বামী অর্থ করিয়াছেন, প্রাস-বিশেষ। ভানুজি-দীক্ষিত লিখিয়াছেন, কণং পাতি পিবতি বা। অর্থ যাহাই হউক, অমরের কোন কোন সংস্করণে শব্দটি 'কণপ' নয়, 'কণয়।' সর্বানন্দ অর্থ করিয়াছেন, শরভেদে। কেশব কোষেও কণয় শরভেদে। ইহাতে কণপ নাই। মহেশ্বর টীকায়, কুণপ আছে; কণপ, কণয় নাই। কণপ শব্দের প্রচলিত অর্থ, শব। অমরে এই অর্থ। কিন্তু মহেশ্বর দিয়াছেন, কুণপ শরভেদে। শব্দকল্পদ্রুমে, কুণপ শব্দের এক অর্থ বড়্শা ইতি ভাষা। অতএব দেখা যাইতেছে, কণপ, কণয়, কুণপ,—একেরই তিনরূপ। নাগরী প য অক্ষরে ভ্রম হইত। সে যাহা হউক অয়ঃ-কণপ লোহার বড়্সা পাইতেছি। ইহার দণ্ড কাঠের না হইয়া লোহার। পাষাণের তুল্য এটি নিক্ষেপ্যও বটে। মৎস্যপুরাণে (১৫০-৭৩), "চক্র কুণপ প্রাস ভুশুণ্ডী পট্টিশ," পরে পরে একত্র আছে। মহাভারতের শ্লোকটিতেও "কণপ ভুশুণ্ডী" আছে। নীলকণ্ঠ খ্রীষ্ট ষোড়শ শতাব্দে ছিলেন, এবং বন্দুক কামান দেখিয়াছিলেন। ইদানী আমরা যেমন বন্দুক কামান দেখিয়া প্রাচীন নানা অস্ত্রে বন্দুক কামান পাইতেছি, তিনিও তেমনি পাইয়া থাকিবেন।

(৮) অয়োগুড়। কোথাও লৌহগুলিকা দেখিলে কিন্তু বারুদ না দেখিলে, বন্দুক কল্পনা মিথ্যা। মৎস্য-পুরাণে (১৫৩-১৩৩), "জম্ভাসুর দেব-সৈন্যের প্রতি প্রাস পরশ্বধ চক্র বাণ বজ্র মুদ্গর কুঠার খড়্গ ভিন্দিপাল এবং অয়োগুড় বর্ষণ করিতে লাগিল।" অয়োগড় = অয়োগুল, লৌহগুলিকা। কিন্তু কে জানে লোহার গুলি ঢিলের মতন ছোঁড়া হইত কি না।

আমার অনুমানে ভারতেই বন্দুক কামানের উদ্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের সপ্তম শতাব্দের পূর্বে নয়। এ বিষয় অন্য এক প্রবন্ধে দেখা যাইবে। মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ ধরিলেও উহার বর্ত্তমান রূপ খ্রীষ্টের পূর্বের। রামায়ণেরও তাই। যে যে স্থানে আরও পরবর্তী কালের কথা আছে, তাহা যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে নয়। মৎস্যপুরাণের আদি মহাভারতের কালে হইলেও উহাতে নূতন যোজনা খ্রীষ্টের পর তিন চারি শত বৎসর চলিয়াছিল।

লীলা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

একটি করে' তৃণ একটি মাস বহি'
চঞ্চুপুটে সযতনে,
ছোট্ট পাখীদুটি বেঁধেছে নীড়খানি
নিভৃত ভাণ্ডীরবনে!
ফুলের বুকে সুখে দুজনে মধু খায়,
ফুলেরই বাসে পাশে দুজনে ঘুম যায়,
ভুলা'তে দুজনারে দুজনে গান গায়—
দুজনে বসে' তাই শোনে।

ছোট্ট পাখীদুটি, কত-না আশা বুকে,
বেঁধেছে ছোট বাসাখানি,
বিরাট ধরণীর অজানা কোন্ কোণে—
কতই ছোট সে না জানি!
যতই ছোট হোক্, ভাবনা-ভয়ে ভরা,
ব্যথার কাঁটাঘরে নিয়ত বাস করা,
কখন্ কোন্ দিকে কবে যে পড়ে ধরা—
কে কোথা নিয়ে যায় টানি'!

ভাঁটের থোকা ভরি' বিকশে মঞ্জরী
ফাগুনী হাওয়া গায়ে লেগে,
পাখীর বুকে ঠোঁটে দ্বিগুণ রং ফোটে
কণ্ঠে স্বর ওঠে জেগে;
তিনটি ছোট ডিমে ভরেছে বাসাখানি,
শিয়রে জাগে তারি ছোট্ট দুটি প্রাণী,
পাখাতে ঢাকি' তারে আদরে লয় টানি'
অজানা ব্যাকুলতা বেগে!

ক্ষুদ্র জীবনের মুগ্ধ খেলা হেরি'
রুদ্রদেব বুঝি হাসে;
দীপ্ত জ্যোতি তারি রৌদ্র-রূপধারী
ঊর্দ্ধে ফুটে নীলাকাশে!
সংখ্যাতীত জীব পঙ্কে মাথা কুটে,
উপরে নাকি তারি শূন্যে ফুল ফুটে!
নমিছে লীলা হেরি' ভক্ত করপুটে,
চক্ষু ধারাজলে ভাসে!

ভাঁটের ভাঙা বুকে এসেছে ভাঁটা পড়ে',
ফুলের মেলা হ'ল কাণা;
কালোর পাল তুলে' কালের বৈশাখী
কাননে দিল আসি' হানা;
মোহের বন্ধনে দণ্ড যেন দিতে
মাতিল সমীরণ গরজি' ধরণীতে,
কোথায় দুখসুখ দুঃখসুখাতীতে,
কে করে কারে আজি মানা!

কোথায় গেল উঠে' ভাঁটের খোলাভাঁটি,
কোথায় গেল উড়ে' পাখী,—
কোথায় গেল ভেঙে সাধের বাসাখানি,
কোথায় শাখা, কোথা শাখী?
বিধবা ডানাভাঙা লুটায় ভুঁয়ে পড়ি',
শূন্যে উঠে হাসি 'হা-হা'য় হাওয়া ভরি'!
বৈতরণীতীরে তরণী পার করি'
মরণে দিবি কে রে ফাঁকি!

প্রয়াগের চিঠি

শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভৌমিক

সূর্য্যদেব অস্তাচলের অন্তরালে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। সন্ধ্যার তিমিরাবরণে চারিদিক ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। দিনের শেষরশ্মি তখনও আকাশের গা হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় নাই। কৃষ্ণবিহারী ক্লান্ত পদবিক্ষেপে, শুষ্ক অপ্রসন্নমুখে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। হাতের পুঁটুলিটি রকের একপার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, "লতি! লতি! দেখদিকি কাণ্ডটা একবার! এই ভরসন্ধ্যে,—এরা সব গেল কোথায়?"

পথ হইতে স্বামীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর সুরবালার কানে গেল। তাড়াতাড়ি কলসীকক্ষে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কেন, হ'ল কি তোমার? চেঁচিয়ে পাড়াসুদ্ধ যে একেবারে তোলপাড় করে তুলেছ?"

কৃষ্ণবিহারী বলিলেন, "সন্ধ্যে উৎরে গেল, তবু বাড়ীতে পিদীমটা পর্য্যন্ত জ্বল্‌লো না।"

সুরবালা জলের কলসীটা রান্নাঘরের বারান্দায় নামাইয়া রাখিয়া আর একটু সুর চড়াইয়া বলিলেন, "এই ত কেবল পুকুরের ঘাটে জল আন্‌তে গিয়েছি।"

ভোরের কুয়াসা যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্তর্হিত হইয়া যায়, কৃষ্ণবিহারীর ক্রোধের উত্তাপও তেমনি সুরবালার এক ফুৎকারে শীতল হইয়া আসিল। তিনি আর কোনো কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সুরবালা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিতে জ্বালিতে বলিলেন, "নাও, ঐ ঘটিতে জল আছে, হাত পা ধোও এখন।"

কৃষ্ণবিহারী ঘটিটা লইয়া চোখে মুখে জল দিয়া বলিলেন, "লতি গেল কোথায়, লতি? পাড়া বেড়িয়ে এখনও ফেরেনি বুঝি? নাঃ, এদের জ্বালায়—"

সুরবালা তখন তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া প্রণাম করিতেছিলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এই আবার বকুনি আরম্ভ হ'ল। ফেরেনি, ফেরেনি! তাতে তোমার কি?"

কৃষ্ণবিহারী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "দেখ, ছেলে-মেয়েদের অমন আস্কারা দেওয়া মোটেই ভাল নয়।"

সুরবালা স্বামীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিলেন, "ভাল না হয়, মন্দই হবে। তাতেই বা কি? তুমি ত একবার ভাল হয়ে কত কি করলে?"

কত কি তিনি করিয়াছেন, না করিয়াছেন, সে কথা লইয়া আর কথা না বাড়াইয়া কৃষ্ণবিহারী হুঁকাটি লইয়া আপন মনে তামাক সাজিতে বসিয়া গেলেন।

সুরবালা ক্ষণকাল স্বামীর শুষ্ক আনত মুখখানার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আজ দুপুরে এলে না যে? খাওয়া-দাওয়া করলে কোথায়?"

কৃষ্ণবিহারী মুখ হইতে হুঁকাটা সরাইয়া বলিলেন, "খাওয়া-দাওয়া আবার কোথায় হবে?"

"একটু জলটলও খাওনি?"

"সে না খাওয়ার মধ্যেই। নিতাই ছোঁড়াটা ঐ কুবরে ব্যাটার দোকান থেকে দু'পয়সার চিঁড়ে-মুড়কি এনে দিয়েছিল; রাম হে, সে কি খাওয়া যায়?"—বলিয়া হুঁকায় একটা টান দিয়া কৃষ্ণবিহারী বলিলেন, "এমন কাজের চাপও পড়েছে আজকাল। সকাল বেলায় হরেনকে ডেকে বল্‌লাম, আরে! কাছারীর দিকে যাস্ ত একবার। গিয়ে—"

সুরবালা মহা বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিলেন, "নাঃ, তোমার আর বুদ্ধিসুদ্ধি হ'ল না। বিয়ের বাজারে দু'পয়সা পাওয়া যেত, সে আর তুমি হতে দিলে না দেখছি।"—বলিয়া লুণ্ঠিত অঞ্চলটা উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, "তাই যদি হবে, তাহলে ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছি কি জন্যে? বি-এ পাশ ছেলে আমার—"

"বি-এ পাশ করার আবার দোষটা কি হ'ল ?"

"দোষ হ'ল না ?—ছেলে যদি গিয়ে তোমার সাহায্য করে, তাহলে কি বি-এ পাশের মান থাকে, না বিয়ের বাজারে আর তেমন আদর থাক্‌বে ?"

২

আষাঢ়ের মেঘমুক্ত আকাশ। শুভ্রোজ্জ্বল রৌদ্রে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। সেদিন সুরবালার হাতে কত কাজ,—তাড়াতাড়ি করিয়াও সব সামলাইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। ঘরধোয়া, বাসন-মাজা, তরকারির জোগাড়, গোয়াল-ঘর পরিষ্কার করা—এসব দৈনন্দিন কাজ ত আছেই; তাছাড়া পুত্র হরেন্দ্র-নাথের ময়লা একটা জামা আর দুইখানি ধুতি আজ এই বেলার মধ্যেই পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। হরেন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে সকালে মাতাকে বেশ করিয়া তাড়া দিয়া বলিয়া দিয়াছে। ঠিকা ঝি আসে নাই। আজ ছয় দিন হইল, সে তাহার বোন্‌ঝির বিবাহের কুটুম্বিতা রক্ষা করিতে গিয়াছে। সুরবালার একা সমস্ত কাজ সারিয়া উঠিতে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া উঠিল। চট্‌পট্‌ একটু তেল মাখিয়া ঘড়া গামছা লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া স্নানের ঘাট অভিমুখে যাইতেই তিনি দেখিতে পাইলেন, সে-ই সকাল হইতে একটুখানি দড়িতে গরুটি তেমনি অবস্থায় খোঁটার সহিত বাঁধা রহিয়াছে। গাছের ছায়া কখন সরিয়া গিয়াছে;—সম্পূর্ণ অনাবৃত স্থানে দ্বিপ্রহরের সেই কাঠফাটা রৌদ্রে বেচারী অভুক্ত দাঁড়াইয়া ধুঁকিতেছে। সুরবালাকে দেখিয়া মুখ তুলিয়া ম্লান কাতরদৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিল।

কৃষ্ণবিহারী সকালবেলায় কাছারীতে যাইবার পূর্ব্বে প্রত্যহ গরুটিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া তাহার জাব ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া যান। আবার দ্বিপ্রহরে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। আজ অতি-প্রত্যূষে মনিবের বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য তাঁহাকে বাহিরে যাইতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি গরুটির সেরূপ কোনো ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই।

সুরবালা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। "ওমা! গরুটাকে এখনও খেতে দেওয়া হয়নি। সকাল থেকে রোদেই বাঁধা রয়েছে। আহা বেচারী!" সুরবালা ঘড়া গামছা নামাইয়া রাখিয়া গরুটাকে খোঁটা হইতে খুলিয়া ঘরে লইয়া গিয়া বাঁধিলেন, তারপর তাহার সম্মুখে কতকগুলি শুষ্ক বিচালি আনিয়া দিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "একা আমি কোন্ দিকেই বা তাল সাম্‌লাব। যেদিকে না যাব—যেদিকে না দেখব—সেইদিকেই একটা বিতি-কিচ্ছি কাণ্ড হয়ে পড়বে। আর এই ঝি? ঝি মাগী আজ ছ' দিন হ'ল, তার বোনঝির বিয়েতে গিয়েছে,—আসুক ঘুরে সে একবার! ভাত মাইনে ওকে এবার ভাল করেই দেব।" শেষটায় সুরবালা তাঁহার যত ক্রোধ সব ঝির উপর আরোপ করিয়া মনের ঝাল ঝাড়িতে ঝাড়িতে স্নানের ঘাটে চলিয়া গেলেন।

আহারাদি শেষ হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণবিহারী ঘরের মেঝেয় একখানা মাদুর পাতিয়া বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, "আজ মাঝেরপাড়া থেকে লোক এসেছিল চিঠি নিয়ে।"

সুরবালা পান সাজিতে সাজিতে বলিলেন, "কি লিখেছে?"

কৃষ্ণবিহারী হাতের হুঁকাটা বৈঠকের উপর রাখিয়া দিয়া জামার পকেট হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া আনিয়া স্ত্রীকে পড়িয়া শুনাইলেন।

সুরবালা বলিলেন, "কই, তোমার টাকার কথা ত কিছু লেখেনি?"

কৃষ্ণবিহারী একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তাই ত দেখ্‌ছি। যা-ই হোক, আমি ত বাবা যা চেয়েছি, তার আধ পয়সার কমে ছাড়ব না। আমার কাছ থেকে পালাবে কোথায়?"—বলিয়া হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া গোটা-দুই টান দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ—ঐ সঙ্গে মেয়ের একখানা কুষ্ঠীও পাঠিয়ে দিয়েছে।"

সুরবালা স্বামীর হাতে গোটা-দুই পান দিয়া বলিলেন, "মেয়ের বয়স হ'ল কত?"

"বয়স?"—বলিয়া কৃষ্ণবিহারী জামার অপর পকেট হইতে কোষ্ঠীখানা বাহির করিয়া আনিয়া খানিকক্ষণ বেশ ঠাহর করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এই গত কার্ত্তিক মাসে ষোল বছরে পড়েছে।"

"মা" গো! এত বড় মেয়ে ঘরে রেখেছে কেমন করে! এই ত আমার মিনি, চোদ্দয় পড়তে-না-পড়তে তার বিয়ে হয়ে গেল। তাতেই লোকে কত কি যে বল্লে! হাতী মেয়ে, ধিঙ্গি মেয়ে, অত বড় মেয়ে ঘরে রেখে অন্নজল মুখে রোচে কি করে?—শুনতে শুনতে আমার কান দুটো একেবারে ভোঁতা হয়ে গেল।" বলিয়া মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিয়া হঠাৎ সুরবালা বলিয়া উঠিল, "ষোল বচ্ছর বয়েস! না, ও মেয়ের সঙ্গে আমি ছেলের বিয়ে দেব না।"

কৃষ্ণবিহারী সুরবালার মুখের কাছে ডান হাতটা নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "তুমি বোঝ না। মেয়ের বয়স হয়েছে, তাতে আমাদের সুবিধে বই অসুবিধে নেই। এখন মেয়ের বাবাকে যে দিকে ঘোরাব, সেইদিকে ঘুরবে,—যা চাইব, তাই দেবে। পাওনাটা বেশ মোটা-মুটি রকমই আদায় করতে পারা যাবে।"

সুরবালা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তা যদি হয়, সে ত বেশ ভাল কথা। এই দেখ না কেন, আমার ঐটুকু ত মেয়ে, তার বিয়েতে কত টাকাই যে খরচ করতে হয়েছে। বাবা! রবি সেনের ঘরের সে দেনা আজও শোধ হয়নি। মেয়ের বিয়ের সুদে আসলে আদায় করা চাই কিন্তু। হ্যাঁ - আমাদের বুঝি কেউ ছেড়ে কথা কয়েছে তখন?"

৩

রামলোচন রায়ের সাংসারিক অবস্থা দিন দিন হীন হইয়া পড়িতেছিল। আয় হইল অল্প, অথচ ব্যয়ের মাত্রা বাড়িয়া উঠিল;—ইহাতে যে রাজার ভাণ্ডারও শূন্য না হইয়া যায় না। কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান বলিয়া গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের যথেষ্ট খাতির মর্য্যাদা ছিল। এজন্য রামলোচন মনে মনে বেশ গর্ব্ব অনুভব করিতেন।

পূর্ব্বে রায়-পরিবারের অবস্থা সচ্ছল ছিল। গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের জমিজমা, বিষয়-সম্পত্তি বেশ ভাল মতই ছিল। কিন্তু ক্রমে বংশবৃদ্ধি হওয়ায় সম্পত্তি কতকগুলি অংশে বিভক্ত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। উত্তরাধিকার-সূত্রে রামলোচন যাহা পান, তাহাতেই তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া আসিতেছিল। সঞ্চয় না হইলেও তাঁহার সংসারে কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু একটির পর একটি কন্যাদায় উপস্থিত হইয়া রামলোচনকে বিব্রত করিয়া তুলিল। প্রথমা কন্যা সূর্য্যমুখীর বিবাহ তিনি বেশ ধুমধামের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন; এজন্য তাঁহাকে মহাজনের দ্বারে হাত পাতিতে হয় নাই। দ্বিতীয় কন্যা চারুবালার বিবাহ তেমনি ভাবেই হইল বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ ঋণ না করিয়া পারিলেন না। তারপর কয়েক বৎসর যাইতে-না-যাইতে তৃতীয় কন্যা নলিনীবালা বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিল। রামলোচন মনে মনে কন্যার বিবাহের জন্য সচেষ্ট হইলেন;—দেখিতে শুনিতে চেষ্টা করিতে নলিনীর বয়স হিন্দু বিবাহ-পদ্ধতির গণ্ডী ছাড়াইয়া অনেক দূরে চলিয়া গেল। কূল-কিনারা কিছুই হইল না। দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় রামলোচনের অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠিতে লাগিল।

৪

একটু পূর্ব্বে পার্শ্বের বাড়ীর প্রবীণারা আসিয়া মেয়ের বিবাহের কথা লইয়া যে বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়া গেলেন, তাহাতে ব্রজেশ্বরী জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন। এরূপ ঘটনা যে সংসারে বিরল নয়, এই ভাবিয়া তিনি কতকটা শান্ত হইলেন বটে, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে তাঁহাকে যেন কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। শেষটায় তাঁহার সব ক্রোধ গিয়া পড়িল স্বামীর উপর।

রামলোচন চটি জোড়াটা পায়ে দিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেই ব্রজেশ্বরী উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, তুমি মনে ভেবেছ কি বল ত?"

রামলোচন স্ত্রীর প্রদীপ্ত মুখখানার পানে চাহিয়া বলিলেন, "এখন আবার তোমার কি হ'ল?"

"ব'ল তুমি মনে কি ভেবেছ?"

"আরে ছাই, বলই না কথাটা খুলে।"

"কেন, মেয়ের বিয়ে কি দিতে হবে না? এমনি আইবুড় আর কতকাল থাকবে ব'ল? ষোল পেরিয়ে সতেরোতে পড়বে।"

রামলোচন একটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "চেষ্টা ত করছি।"

ব্রজেশ্বরী আর একটু সুর চড়াইয়া বলিলেন, "তুমি চুপ

করে বসে থাকতে পার, কিন্তু লোকের কথায় কথায় এদিকে যে আমার কান দুটো ঝাঁঝরা হয়ে গেল।"

রামলোচন অপ্রতিভমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ব্রজেশ্বরী স্বামীর দিকে একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিলেন, "সেদিন যে রামনগরের ছেলেটার কথা বল্‌ছিলে, তার কি হ'ল? সেই কৃষ্ণবিহারী বাবুর ছেলে?"

রামলোচন ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন, "তারা যে টাকা চায় ঢের। ছেলে ভাল।"

"ছেলে ভাল?"

"হ্যাঁ—বেশ ভাল।"

"খু-ব লেখাপড়া জানে?"

"জানে না? একেবারে বি-এ পাশ।"

"বি-এ পাশ? সে বুঝি খুব-ই পড়াশোনা?"

"আরে বাপরে! বলে কি? বি-এ পাশ, সে কি সোজা কথা! একটা মানুষের মতন মানুষ! জ্ঞানবুদ্ধির সাগর—যাকে ব'লে শিক্ষিত! কেষ্ট-বিষ্টু একটা কিছু হ'ল বলে।"

"তাহ'লে তুমি সেই ছেলেটির জন্যই চেষ্টা কর। টাকা খরচের ভয়ে পেছপা হয়ো না যেন। আমাদের আর ত ছেলেমেয়ে নেই যে ভাব্‌বে।" বলিয়া মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "হ্যাঁগা, রামনগর এখান থেকে কতদুর?"

রামলোচন মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন, "মাইল চোদ্দ পনের হবে, এখান থেকে সোজা দক্ষিণে। জায়গাটাও মন্দ নয়—হাটবাজার, পোষ্ট আপিস, এ সবই আছে। আর একটা মস্ত সুবিধা রেল ষ্টেশন বেশী দূরে নয়।"

ব্রজেশ্বরী দক্ষিণ হস্তটা ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, "এই যেমন আমাদের মদনপুর ইষ্টিশান।"

বেলা শেষ হইয়া আসিল। অপরাহ্ণ-সূর্য্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণ গাছের পাতায় পাতায় ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল। মাথার উপর খণ্ড ধূসর মেঘগুলি উড়িয়া উড়িয়া কোন্ অজানা দেশে চলিতেছিল।

রামলোচন বৈঠকখানা-ঘরে একটা তক্তপোষের উপর চিন্তিত মুখে বসিয়া আছেন। পার্শ্বে একটা আলো ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছিল। একটু পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে কৃষ্ণ দ্বিতীয়ার চন্দ্রালোক তখন সিক্ত ধরণীর বক্ষে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

হঠাৎ বাহিরে খড়মের খট্‌খট শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া রামলোচন ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "আসুন, আসুন। বাড়ী ফির্‌লেন কখন?"

শিরোমণি মহাশয় রামলোচনের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "এই দুপুর—বেলা তখন প্রায় দুপুরই হবে। উঃ—জলকাদায় রোদ্দুরে টো টো করে ঘুরে দেহটা বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মনে কর্‌লেম, আজ আর কোথাও বেরব না—"

"তারপর কেমন হ'ল এবার?"

"আরে ভায়া! সে কথা শুনে আর কাজ নেই। আর কি সে কাল আছে? গুরু ব্রাহ্মণ বলে লোকের সে ভক্তিই নেই। কলি! ঘোর কলি! এই ত সেদিন এক শিষ্যবাড়ীতে একজন আমাকে বলে বস্‌লে 'স্বার্থের উপর যাদের এত আকর্ষণ, তারা কি অন্যকে ত্যাগের পথে নিয়ে যেতে পারে?' শুনে আমি ত অবাক। তোমাদের সব ভাল?"

রামলোচন চুলের মধ্যে বাম হস্তের অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে বলিলেন, "এক রকম আর কি।"

শিরোমণি মহাশয় রামলোচনের চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানার পানে চাহিয়া বলিলেন, "তারপর, মেয়ের বিয়ের কতদূর কি কর্‌লে?"

"সেই ত হয়েছে এখন মস্ত ভাবনা। ঠিক কিছুই হয়নি এ পর্য্যন্ত।"

"আরে বাপরে বল কি? এখনও চুপ করে বসে আছ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেয়ের বয়সও ত কম হ'ল না। যত সত্বর হয় একটা ঠিক করে ফেল। বড় মেয়ে,—আর কি ঘরে রাখা উচিত? এতে প্রত্যবায় ত হয়ই, তাছাড়া—যাক্, এখন যাতে শীগ্‌গিরই বিয়েটা হয়ে যায়, সেই চেষ্টা দেখ।"

রামলোচন গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিলেন। তাঁহার

মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ নীরব বসিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "সেই কৃষ্ণবিহারীবাবুর ছেলেটা কি—"

শিরোমণি মহাশয় ওষ্ঠাগ্রে একটু হাসি টানিয়া বলিলেন, "তখন যদি কথাটায় কান দিতে ভায়া, তাহ'লে কি মেয়ের বিয়ে নিয়ে এত ভুগতে হত? তুমি আমার আত্মীয় বলেই কথাটা তুলেছিলাম। কর্ত্তব্যের শেষ করলে কি না একখানা বাজে রকমের চিঠি লিখে;—দেনাপাওনার কথাটার কাছ দিয়েও ঘেঁসলে না। আরে! দু'পয়সা বেশী খরচ হ'লে কি হয়? ছেলেটি যে রত্ন—বি-এ পাশ!"

রামলোচন শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা—ওরা যা চেয়েছে, তাই-ই আমি দিতে স্বীকার।"

শিরোমণি মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সে আর হচ্ছে না এখন। আমি ঐ রাস্তা হয়েই আসছি। তোমার গিয়ে ঐ বালিগঞ্জে না কি টালিগঞ্জে ওরা আরও তিন হাজার টাকা বেশী পাচ্ছে। ছেলের মাতুল সে বিয়ের উদ্যোগ করছেন। ধরতে গেলে তিনিই ছেলেটিকে পড়িয়েছেন কি না।"

রামলোচন দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমি তার চেয়েও বেশী দেব, দয়া করে আপনি আর একবার চেষ্টা করুন।"

৫

শ্রাবণের এক শুভদিনে বেশ ধুমধামের সঙ্গে হরেন্দ্রনাথের সহিত নলিনীবালার বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। লোকের মুখে প্রশংসা আর ধরে না—হাঁ, জামাইয়ের মতন জামাই। যেমন গায়ের রং, তেমনি চেহারা, আর গুণের ত কথাই নাই। একেবারে বি-এ পাশ। সার্থক টাকা-খরচ!

আশ্বিন মাস আসিল। জলদমালা অপসৃত হইয়া গিয়া আকাশমণ্ডল স্বচ্ছ সুনীল হইয়া উঠিল। বিহগকুলের আনন্দ কাকলী গৃহে গৃহে আগমনীর বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল।

বয়স্থা মেয়ে বলিয়া আশ্বিন মাস পড়িতে-না-পড়িতেই শ্বশুরবাড়ীর লোক আসিয়া নলিনীবালাকে লইয়া গেল।

মহালয়ার পূর্ব্বদিন ব্রজেশ্বরী স্বামীকে বলিলেন, "মেয়ের বিয়ে ত দিলে খুব খরচ-পত্তর করে দিয়ে থুয়ে; এখন পূজোর তত্ত্বটা আবার সেই মত হওয়া চাই, বুঝলে? অমন রত্ন জামাই, হেলফেলা যেন না দেখায়!"

রামলোচন বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিলেন, "তাই ত।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "দেখো, যেন এই নিয়ে শেষটায় আবার নিন্দে না হয়। সবই যখন হয়েছে, ওটুকু কি আর আটকাবে?

রামলোচন তেমনিভাবে বলিলেন, "সে ত সত্যিই।"

যাহা হউক ষষ্ঠীর দিন রামলোচন যথোপযুক্ত পূজার তত্ত্ব জামাইবাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। কুটুম্ববাড়ীর মিষ্টকথায় তত্ত্ববাহীরা খুসী হইয়া ফিরিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে শারদোৎসব শেষ হইয়া গেল, দেশের আনন্দ-স্রোতে ভাটা পড়িয়া আসিল। ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন রামলোচন স্ত্রীকে বলিলেন, "চল, এইবার আমরা গঙ্গাস্নান করে আসি।"

ব্রজেশ্বরী স্বামীর দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিলেন,"যে দায় থেকে ভগবান আমাদের মুক্ত করছেন! বাবা! কন্যাদায় বিষম দায়! সত্যিই গঙ্গাস্নানটা আমাদের শীগগিরই সেরে ফেলা দরকার। যাবে কোথায়? নৈহাটি, না নবদ্বীপ?"

রামলোচন বলিলেন, "আমি ত মনে করছি, প্রয়াগ পর্য্যন্ত যাব।"

"প্রয়াগ? সে যে অনেকদূর! আর সেখানে গেলে ত মাথা মুড়োতে হয়। সেবার আমাদের গ্রাম থেকে আমার পিসীমা আর আরও পাঁচ ছ'জন গিয়েছিল। ওমা! ফিরে এলে দেখি, সকলেরই মাথা মুড়ানো।"

"মেয়ের বাবার কেবল মাথা মুড়ালেই চলবে না, মাথায় ঘোলও ঢালতে হবে। তবে ত কন্যাদায়ের ঠিকমত প্রায়শ্চিত্ত করা হবে।"

"সত্যিই বলেছ তুমি। মানুষ যেন এমন দায়ে কখনও না পড়ে।"

"কাপড়চোপড়, পোঁট্‌লাপুঁট্‌লি—যা নেবে বেঁধে-ছেঁদে নাও। আগামী পরশুই বেরিয়ে পড়া যাবে, কি বল?"

একটু ভাবিয়া ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "ফিরতে ত ঢের বিলম্ব হবে, বাড়ীঘরের কি ব্যবস্থা করলে ?"

রামলোচন বলিলেন, "সে ব্যবস্থা করেছি।"

ব্রজেশ্বরী তেমনিভাবে বলিলেন, "তারপর, জমি-জমা ? এবারের আমন ধানগুলো—"

রামলোচন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, "সে ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছে।"

দুই দিন পর রাত্রির ট্রেনে রামলোচন সস্ত্রীক প্রয়াগের পথে যাত্রা করিলেন। গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া তিনি তাঁহার নূতন বৈবাহিক মহাশয়কে লিখিলেন :—

শ্রীহরি

প্রয়াগ।

বৈবাহিক মহাশয়,

আজ পাঁচ দিন হইল এখানে আসিয়াছি। কবে যে দেশে ফিরিব, কি এইখানেই জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটাইয়া দিতে হইবে, তাহা ভগবানই জানেন। বোধ হয় শেষের ব্যবস্থাটাই তাঁহার একান্ত অভিপ্রায়। দেশে যাইয়া কোথায় দাঁড়াইব, আর কি ধরিয়া থাকিব ?—আমি আজ নিঃস্ব—রিক্ত—গৃহহীন। সেজন্য আমার একটুও দুঃখ নাই, কারণ জামাই ত পাইয়াছি, বি-এ পাশ। ইহার অধিক আমার কাম্য আর কি থাকিতে পারে ? যেখানে গিয়াছি, সেখানেই ঐ একই কথা, আমার কন্যার কোনো মূল্য নাই; আছে আমার রক্তক্ষয় করা অর্থের দাম। কন্যার জনক হওয়ার পাপ-ক্ষালন আমাকে করিতেই হইবে। দেখিলাম আর কোনো উপায় নাই—সমাজে মুখ দেখানও ভার হইয়া উঠিয়াছে, শেষে দিনের আলোয় বাহির হওয়াও হয়ত চলিবে না; তখন বিষয়-সম্পত্তি, বাড়ী-ঘর বন্ধক দিয়া আপনার সমস্ত দাবি পূরণ করিয়া কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইলাম। তারপর পাওনাদারকে আমার যত-কিছু—সব লিখিয়া দিয়া ঋণমুক্ত হইয়া মাত্র ত্রিশ টাকা সম্বল লইয়া এই পবিত্র ক্ষেত্রে আসিয়া মাথা মুড়াইয়াছি।—গঙ্গাস্নান ত দুবেলাই চলিতেছে। বোধ হয় আমার সমস্ত পাপ এতদিনে ক্ষালন হইয়াছে। দেশে আর কিছুদিন অপেক্ষা করিলে সেই সবৃদ্ধিমূল ঋণের দায়ে ভাগ্যে যাহা ঘটিত, তাহা আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

যাহা হউক, এসব আমি হাসিমুখেই গ্রহণ করিয়াছি। কারণ, কন্যাদায় সর্ব্বাপেক্ষা বড় দায়। সেই দায় হইতে যে মুক্ত হইয়া আমার জাতি বাঁচিয়া মুখরক্ষা হইয়াছে, ইহাই আমার পরম ভাগ্য। নাই বা প্রাণ বেশী দিন বাঁচিল, প্রাণের অপেক্ষা মানের মূল্য যে বড়, ইহা সকলেই জানে। আপনার কোন দোষ নাই; আপনি পুত্রের পিতা; বিধাতা যাহা আপনার পাওনা বলিয়া লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা আদায় করিয়া লইতে অপরাধ কি ? আমার নলিনীবালা রহিল। তাহাকে একটু দেখিবেন, এই আমার শেষ অনুরোধ। ভাল আছি। ইতি

নিবেদক—শ্রীরামলোচন রায়

চিঠি পড়িয়া কৃষ্ণবিহারী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, "আমার নতুন বেয়াই মশাই ত কন্যাদায়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে একেবারে দেশ ছেড়ে প্রয়াগে গিয়ে হাজির ! কিন্তু টাকাগুলো আমার ভাগ্যেই বা ক'দিন ? অর্দ্ধেক ত বিয়ের খরচেই গেছে। এদিকে হরেন বাবাজী ত একেবারেই বেকার। কতদিনে যে একটা চল্লিশ টাকার চাকরী জুটবে জানি না। গৃহিণী এমন রত্ন দিয়ে কার লাভ কি হ'ল বল্‌তে পার ?"

একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস সুরবালার অন্তর মথিত করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

হুগলীর পল্লীকবি রসিক রায়

শ্রীমনোমোহন নরসুন্দর

দেশবন্ধু একবার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"বাংলার খাঁটি লোক-সাহিত্য ও গ্রাম্য-সাহিত্য দিন দিন লুপ্ত হ'তে চলেছে। এদিকে কারও লক্ষ্য নাই।" কবিওয়ালারা চল্‌তি কথার ভিতর দিয়া জীবনের যে আদর্শ গাহিয়া যাইত সহজ কথায় সাধারণের বোধগম্য ভাষায়—পুরাণের, ভাগবতের, গীতার, রামায়ণের, মহাভারতের বিশেষ বিশেষ চরিত্রের দোষগুণ বিচার করিয়া সাধারণের কাছে যে আদর্শ প্রচার করিত, সে প্রচারের কাল আর নাই। যাত্রাওয়ালার দল এখনও কোনো রকমে টিকিয়া আছে।

একশত বৎসর আগেকার কথা—বাংলার রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট-সংযোগে নাটকীয় অভিনয় সুরু হয় নাই। কবিওয়ালার তর্জ্জা এবং যাত্রাওয়ালার যাত্রা-গানে তখন বাংলার পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিত। সহরেই যাত্রা-গান ও কথকতার প্রাধান্য ছিল বেশী।

উভয় দলের তর্ক কবিওয়ালাদিগের গানের এক প্রধান অঙ্গ, আবার মস্ত বড় কলঙ্কের মূলও ছিল বটে। যে দল তর্কে জিতিত সেই দলেরই খাতির বেশী হইত। এই খাতিরের উপরই পয়সা-উপায়ের ভিত্তি স্থাপিত ছিল। তাই বিধিমত শাস্ত্রের বিচার অনেক সময়ে মাঠে মারা যাইত। অশিক্ষিত শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য ইহাদিগকে বাধ্য হইয়া অন্যায় কুতর্কের আশ্রয় লইতে হইত। এই তর্কের হাত এড়াইয়া নির্ম্মলভাবে লোক-শিক্ষা দিবার ইচ্ছায় দাশুরায়ের মনে এক নূতন প্রেরণা জাগিল। সেই প্রেরণার ফলেই বাংলা-সাহিত্যে পাঁচালীর আমদানী। সরলপ্রাণ পল্লীকৃষকের মনে তখন কবির দলের গানের মস্ত বড় মোহ। সেই মোহ কাটাইয়া পাঁচালীকে জয়লাভ করিতে হইবে। ব্যাপারটি বড় সহজ ছিল না। কবিওয়ালারা যে কেমন করিয়া জনসাধারণের মনের উপর এতটা আধিপত্য করিয়া বসিল তাহার ঐতিহাসিক আলোচনা করিলে মনে হয়, রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর রাজসভায় গীত হইবার পর যখন ভারতের প্রভু-পরিবর্ত্তনে সাহিত্যের আসর রাজ-সভায় বসিবার সুযোগ হারাইল, তখন একদল লোক ভাঙিয়া-চুরিয়া এক নূতন তথ্যের সন্ধান লইয়া রাজ-সভা হইতে বঞ্চিত হইয়া পৌরসভায় আসর জুড়িয়া বসিল।

কবির সঙ্গীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের একটি অঙ্গ, এবং ইংরেজের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজন-সভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে, এই গানগুলি তাহারই প্রথম পথপ্রদর্শক।"

সাধারণের বাহবা পাইবার জন্য বাধ্য হইয়া কবি-ওয়ালাদিগকে সাহিত্যরসকে বিকৃত করিয়া উত্তেজনার সৃষ্টি ও অনুপ্রাসের ঘটা—এই উভয়েরই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

বাংলা-সাহিত্যে দাশরথি রায়কে প্রথম পাঁচালীকার বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তরুণ কবিওয়ালা দাশরথি যেদিন কবির আসর ছাড়িয়া পাঁচালীর আসর সরগরম করিয়া তুলিলেন, সেইদিন লোকশিক্ষার প্রভাব অন্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হইল। কিন্তু লোকের বাহবা অর্জ্জন করিতে না পারিলে এই প্রকারের সাহিত্যিকের নাম হয় না। তার উপর পাঁচালী ত নূতন জিনিষ। এর জন্যই পাঁচালী-কারকেও ঐ একই প্রকার উত্তেজনা ও অনুপ্রাসের আশ্রয় লইতে হইল। তাহার ফলে পাঁচালীর মধ্যে (১) ছড়া ও (২) গানের সৃষ্টি।

পাঁচালীই বাংলার জনসাধারণের খাঁটি সাহিত্য। পথের কথা, নীতির কথা, পুরাণের কথা লইয়াই এগুলি রচিত। তাই কবিওয়ালাদিগের যুগে পাঁচালীকার

দাশরথি রায় সারা বাংলায় সমাদর লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তখন বাংলা-সাহিত্যের অতি দীন অবস্থা। বিদ্যাসাগরের প্রবল চেষ্টায় মাতৃভাষার অনুশীলন চলিতেছে।

লোকের মনোরঞ্জন করিতে হইলে, এবং লোকশিক্ষার আদর্শ স্থাপন করিতে গেলে অনেক জিনিষেরই আশ্রয় লইতে হয়। তাই পাঁচালীকারদের অনেক কবিতায় তদানীন্তন সমাজ, জাতির গলদ ও পাশ্চাত্য-সভ্যতাকে তীব্রভাবে নিন্দা করা হইয়াছে এমনও দেখিতে পাওয়া যায়।

দাশুরায়ের সমসাময়িক আর একজন পাঁচালীকার বাংলা-সাহিত্যে অনেকখানি স্থান জুড়িয়া বসিয়াছিলেন: সারা বাংলা তাঁর নাম না জানিলেও তাঁর কণ্ঠ এখনও নীরব হয় নাই। তাৎকালিক প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের নিকট তিনি সাহিত্য-স্রষ্টারূপে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। অভিধানকার সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই রসিক-সাহিত্য সম্বন্ধে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁহার অভিধানে রসিকচন্দ্র ও তাঁহার সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সমগ্র পশ্চিম বাংলায় তাঁর নাম আজও ছড়াইয়া আছে। কয়েকখানি পুস্তক তিনি অনুরোধে পড়িয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশের তাঁর কোনদিনই আগ্রহ ছিল না। নিরহঙ্কার কবি আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। পল্লীমায়ের কোলের অন্তরালে থাকিয়া নিজের সরল জীবন যাপন করিতেন। কবি বুঝিয়াছিলেন—

> "অপরার সমুন্নতি অবশ্য বাঞ্ছিত অতি,
> পরাবিদ্যা কিন্তু গতি জেনো মনে সার।"

খোল ও খঞ্জনীর তালে তালে পাঁচালীর গান আজকাল বাংলার পল্লীতে বড় দেখা যায় না। পুস্তকের আকারে দাশরথি রায়ের পাঁচালী বাজারে এখনও কিনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কবির পাঁচালী আজও হয়ত বটতলার দোকানে খোঁজ করিলে মিলিবে কি না সন্দেহ। তবুও তাহা এখনও হুগলী, বর্দ্ধমান, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া প্রভৃতি জেলার পল্লীতে পল্লীতে কালেভদ্রে গীত হইয়া থাকে। ইহা শ্রীযুক্ত গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের পাঁচালী বলিয়া এখন কথিত। তিনি স্বকণ্ঠে উহা গাহিয়া থাকেন।

পশ্চিম-বাংলায় গৌরবাবু একজন নামজাদা পাঁচালীকার, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। এখনও অনেকেই বেতারে গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের পাঁচালী শুনিয়া থাকেন। বাড়ীর গিন্নীরা এখনও গৌরবাবুর পাঁচালী শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কবি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কবির বাণী এখনও নীরব হয় নাই।

১২২৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমায় কবিবর রসিকচন্দ্র রায় তাঁহার মাতুলালয় পাড়ালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরিকমল রায় হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপালে বাস করিতেন। বড়া গ্রামের কিয়দংশ তাঁহার মাতামহের জমিদারী। মাতামহের সন্তান-সন্ততি না থাকায় রসিকচন্দ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন ও মাতুলালয়ে বড়া গ্রামেই আসিয়া বাস করেন।

তখনকার যুগে ইংরেজী শিক্ষার্থীরা অনেকেই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করিতেন। তজ্জন্য পিতা হরিকমল ছেলেকে উচ্চশিক্ষা দিতে নারাজ ছিলেন। তাই গ্রাম্য পাঠশালার তখনকার যুগে শিশুবোধক, চাণক্য শ্লোক ও পত্রদলিল পড়িয়া তাঁহার পাঠ সমাপ্তি হয়। তখন হইতেই রসিকচন্দ্রের কবি-প্রতিভার বিকাশ আরম্ভ হয়। দশ বৎসর বয়সে তিনি ছড়ার মত কবিতা বলিতে পারিতেন। এই অল্প অনুশীলনের ফলেই তিনি একাদশ খণ্ড পাঁচালী ও বহুতর খণ্ডকবিতা রচনা করিয়া একজন সুকবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

ষোল বৎসর বয়সে রসিকচন্দ্র তাঁহার এক সহাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রাধিকার রূপ-বর্ণনা লিখিয়াছেন—

> বর্ণ হেরে, স্বর্ণ পোড়ে চাঁপা পায় লাজ।
> হিঙ্গুল মিশ্রিত হরিতালেই কি কাজ॥
> চরণ বরণ হেরে জবা যায় দূর।
> অরুণ কোথায় লাগে কি ছার সিঁদুর॥
> রূপের তুলনা দিতে কে আছয়ে আর।
> থাকুক উর্ব্বশী বসি রম্ভা কোন্ ছার॥
> তিলোত্তমা তার কাছে তিল উত্তমা নয়।
> রতিরূপে রতিতুল্য হয় কি না হয়॥

আঠার বৎসর বয়সে কবির প্রথম পুস্তক জীবন-তারা

প্রকাশিত হয়। হাস্য করুণ ও আদিরসের সমবায়ে জীবনতারা পাঠকের মনে আনন্দরসের সৃষ্টি করিত। অশ্লীল অংশবিশেষের জন্য গভর্ণমেণ্ট উহা বন্ধ করিয়া দেন। অশ্লীল অংশ পরিহারপূর্ব্বক নব্য জীবন-তারা পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১২৪৫ হইতে ১২৫০ সালের মধ্যে কবির নব্যজীবনতারা ও ছয়খণ্ড পাঁচালী রচিত হয়।

রসিকচন্দ্র প্রত্যুৎপন্নমতি ও স্বভাবজাত কবি-প্রতিভার গুণে অনেক কবিওয়ালাকে কবিগান, তর্জ্জার উত্তর, তাহা ছাড়া বাউল কীর্ত্তনীয়া ও যাত্রাওয়ালাকে আবশ্যক-মত গান বাঁধিয়া দিতেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত রসিকচন্দ্রের বিলক্ষণ বন্ধুত্ব ছিল। উভয়েই সমবয়স্ক ছিলেন। একদিন কার্য্যোপলক্ষে রসিকচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"আমাদের দেশে ছেলেদের পাঠোপযোগী কবিতা পুস্তকের বড়ই অভাব, আপনাকে এই অভাব পূরণ করিতে হইবে।"

রায় মহাশয় বলিলেন—"বর্ত্তমান কালের শিক্ষার ধারা ঠিক আমার জানা নাই; কাজেই একাজ আমার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। বিদ্যাসাগর মহাশয় পাকা জহুরী ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন স্বভাবকবি রসিকচন্দ্র উপস্থিত-রচনায়ও বিলক্ষণ পটু। তাঁহার পরীক্ষা করিবার কৌতুক হইল। তিনি বলিলেন – 'রায় মহাশয় আপনাকে একটু রচনা শুনাইতে হইবে।' বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণনীয় বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন —প্রভাত-বর্ণন। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়া চলিলেন, কবি আরম্ভ করিলেন—

রাতি পোহাইল ভাতি, দিল দিক সব
কল কল কুল কুল পাখী করে রব।
সোনার থালার মত উঠিল অরুণ
ছুটিল চৌদিকে তার কিরণ তরুণ।
গিরির চূড়ায় আর তরুর শাখায়
লাগিয়া সোনায় যেন জড়িত দেখায়।

—ইত্যাদি।

ঈশ্বরচন্দ্র ভাবিলেন এ হয়ত কবির পূর্ব্বরচিত কবিতা, তাহারই পুনরাবৃত্তি হইতেছে। তখন আবার একটি কবিতা বলিতে বলিলেন। বিষয় নির্দ্ধারণ হইল—পরোপকার। রায় মহাশয় বলিতে লাগিলেন—

শুন হ'য়ে একচিত, কথা নহে অনুচিত
করিতে পরের ভাল, ভুলো না রে ভুলো না।
পরদুঃখে দুখী হ'য়ে ভাল কর ভার লয়ে
কদাচ ভুলিয়া যেন রয়ো না রে রয়ো না।
কর করি নিজহানি, পরপক্ষে টানাটানি
পরের অহিত কথা কয়ো না রে কয়ো না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সন্দেহ দূর হইল। তিনি কবির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও শব্দযোজনার স্বাভাবিক শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সন্তুষ্ট হইয়া চুরি বিষয়ে একটি কবিতা বলিতে অনুরোধ করিলেন। রায় মহাশয়েরও বিরক্তি নাই, এমন পরীক্ষকের কাছে পরীক্ষা দেওয়াও গৌরবের কথা।

* * *

এ জগতে দোষ নাই চুরির সমান!
মন যায় ধন যায় আর যায় প্রাণ॥
দেশে অপবাদ অপরাধ কত।
সবার ঘৃণিত কাজ নিন্দা শত শত॥
একে পাপ যোগাযোগ তায় অনুযোগ!
কখনও চোরের দ্রব্য নাহি হয় ভোগ॥

সেকালের সেই সংস্কৃত শব্দবহুল, সমাস আড়ম্বরময় বাংলা-সাহিত্যে খাঁটি বাংলায় সহজ সুবোধ্য কবিতা প্রতিভাবান কবি ব্যতীত রচনা অসম্ভব। টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলালে'র মত তিনিও কতকটা পদ্যসাহিত্যে একটা বিশেষ পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। বাংলা দেশে তৎকালে পদ্যের স্রোত যেন মাঝরাস্তায় আসিয়া থামিয়া গিয়াছিল। কবি তাই আফশোষ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

হায় রে বঙ্গের পদ্য হায়! হায়! হায়!
পূর্ব্বের অপূর্ব্ব মান এখন কোথায়?
কত ছটা কত ঘটা কত দম্ভ ছিল
পদ রে! তোমার তেজ সকলি ঘুচিল॥
বিলাতী খেলাতি পদ্য দেখিয়া বিস্তার
বাঙালি! কাঙালী তোরে করেছে এবার।
পয়ার! দয়ার নাই তোর প্রতি টান।
হতিস্ বিলাতী বরং পেতিস্ সম্মান॥
বঙ্গের রঙ্গের পদ্য থাক্ থাক্ থাক্।
বাজুক কত না বাজে গদ্য-জয়ঢাক॥
ওরব নীরব হবে না, রহিবে এদেশে।
অক্ষয় মৃদঙ্গ তুই বাজিবি রে শেষে॥

প্রাচীন সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়া পদ্যের স্রোত

সাহিত্যে সমানভাবেই চলিয়া আসিয়াছিল। মধ্যে বৈষ্ণব-সাহিত্যের জোয়ার কিছুকাল প্রবলভাবে চলিয়াছিল, তারপর পদ্য-সাহিত্যে নানা অনাচার দেখা দিয়াছিল। খাঁটি সাহিত্যের প্রেরণা লইয়া বড় আর কোন কবি সাহিত্যের আসরে নামিত না। কবি হতাশ হন নাই ; তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

ও রব নীরব হবে না, রহিবে এদেশে।
অক্ষয় মৃদঙ্গ তুই বাজিবি রে শেষে॥

কবির সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সার্থক হইয়াছে। বিশ্বকবি-সভায় রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কাক ও কোকিল, পর্ব্বত ও ভুজঙ্গ, ব্যাঘ্র ও মুকুর-বিক্রেতা, প্রভাত প্রভৃতি আরও কয়েকটি খণ্ড কবিতা লইয়া তাঁহার পদ্য-সূত্র প্রথমভাগ রচিত হয়।

তারপর প্রাঞ্জলভাষায় লিখিত পদ্যসূত্র দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয়। পাঠকের কৌতুক নিবারণের জন্য পদ্য-সূত্র প্রথমভাগের প্রভাত শীর্ষক কবিতার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

গেল রাতি নানা জাতি, দিক ভাতি শোভিল।
সুধাময়, সুসময়, উষা হয় উদিত॥
ভাল ভাল উষাকাল হিমজাল ঘেরিল।
উপবন সুচিকণ, সুশোভন হইল॥
ক্ষিতিতল, সুশীতল, সুশীতল মাধবে।
দিক দশ, করে বশ পুষ্পরস সৌরভে॥
ফুল ফুটে ভৃঙ্গ ছুটে মধু লুটে উদ্যানে।
পাখী সবে প্রেমোৎসবে ডাকে তবে গগনে॥

কবি গৃহের অনতিদূরে বাগানের মধ্যে চণ্ডী-মণ্ডপে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি উহার নাম রাখিয়াছিলেন—শান্তিনিকেতন। তাঁহার শান্তি-নিকেতনের একমাত্র সঙ্গী ছিল দুর্গাচরণ পাঠক বলিয়া এক ব্রাহ্মণ-তনয়। দুর্গাচরণের যত্নে রসিকচন্দ্রের একাদশ পাঁচালী, ঘোর মন্বন্তর, জীবনতারা, শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমাঙ্কুর, হরিভক্তি চন্দ্রিকা,পদাঙ্কদূত, দশমহাবিদ্যা,বৈষ্ণবমনোরঞ্জন, শকুন্তলা-বিহার, বর্দ্ধমানচন্দ্রোদয়, নবরসাঙ্কুর, কুলীনকুলাচার, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতি কবিতা পুস্তক ক্রমান্বয়ে প্রচারিত হয়। রসিকচন্দ্র, গোবিন্দ অধিকারী, রাধাকৃষ্ণ, নবীন গুঁই, মহেশ চক্রবর্ত্তী ও লোকা ধোবাকে যাত্রা ; সোনাপটুয়া, শশী চক্রবর্ত্তী ও ত্রিপুরা বিশ্বাসকে পাঁচালী ; বাবুরাম প্রভৃতিকে কবি এবং নরোত্তম দাস, নকুড় দাস প্রভৃতিকে আবশ্যক মত কীর্ত্তন গীত ও ছড়া রচনা করিয়া দিতেন।

একবার জনৈক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বিশ্ববিদ্যা-লয়ের উপাধিধারী শিক্ষক প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন—"রায় মহাশয়ের ছন্দ অনেকটা একঘেয়ে। মাইকেলী ছন্দে তিনি যদি কিছু লিখিতে পারেন তবেই বুঝি তিনি লেখক।" নূতন ছন্দ - কথাটি শুনিয়া তাঁহার কৌতূহল হইল। পরে যদুগোপালের পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগে লক্ষ্মণের শক্তিশেল, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, সীতা ও সরমার কথোপকথন পাঠ করিয়া ছন্দটি তাঁহার ভাল লাগিল। ইহার ফলেই কবির নবরসাঙ্কুরের সৃষ্টি।

বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রচারে সমাজ যখন তোলপাড়, রায় মহাশয় সেই সময়ে উক্ত প্রথা প্রচলনের বিরুদ্ধে তদানীন্তন যাত্রাওয়ালা নবীন গুঁইকে এক কৌতুকাবহ পালা রচনা করিয়া দেন। এই সময় হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব আরও গাঢ়তর হয় এবং তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে রায় মহাশয় কুলীন-কুলাচার নামক একখানি বহুবিবাহ-নিবারক পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহা বিনামূল্যে সাধারণের নিকট বিতরিত হয়। রায় মহাশয় বহুবিবাহ ও বিধবা-বিবাহ উভয়েরই বিপক্ষে ছিলেন।

কবির নবরসাঙ্কুর নয়টি রস বর্ণনা করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হইয়াছিল, পরে মিত্রাক্ষর ছন্দে দ্বিতীয় পর্য্যায় নবরসাঙ্কুর রচনা করেন। উহার কয়েকটি পদ্য তৎকালীন জন্মভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে একটি কবিতা উদ্ধৃত হইল।

ভগ্নকুটীরে ব্রহ্মময়ী দর্শনে ফুল্লরা—

কে তুই সুন্দরী নারী, ব্যাধের আলয়।
ও তোর বদনে যেন চাঁদের উদয়॥
সুন্দরী সুন্দর রূপ দেখি যে গো তোর।
আসিতে পথে কি তোরে দেখে নাই চোর॥
পাকা তেলাকুচা যেন দুইখানি ঠোঁট।
অথবা তুলনা দিলে শিউলির বোঁট॥

শেষবয়সে তিনি তদানীন্তন অনেক সাপ্তাহিক,

পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতা, গান, পাঁচালী এ প্রদেশের অনেকেরই কণ্ঠস্থ আছে। প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার গৌর-মোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীও এই বড়া গ্রামে।

"কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক।" কবি শব্দের মৌলিক অর্থ—যিনি স্বরচিত কাব্যের দ্বারা ভগবানের স্তবগান করেন। অতীত ভারতে এই অর্থেই শব্দটি প্রযুক্ত হইত। কিন্তু কালক্রমে কবি শব্দের ব্যাপকতর অর্থ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ছিলেন সত্যকার কবি। বড় বড় কথা কহিয়া মনকে ফাঁকি দেওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তাই তিনি নিজের জ্ঞানকে সুস্পষ্ট করিবার জন্য, সত্যোপলব্ধিকে নির্ম্মল করিবার জন্য সেই সর্ব্বশক্তিমান পুরুষের আশ্রয় লইয়াছিলেন। অধ্যাত্ম সম্পদই চিরকাল ভারতবাসীর পরম সম্পদ।

রসিকচন্দ্রের পদ্য-সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায়—তিনি যেন একটি সর্ব্বতোব্যাপী পরমাশক্তির চেতনাময়ী অনুভূতি লইয়া সাহিত্যের আসরে নামিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র পাঁচালীগুলি যেন মানুষের জীবনপথের পাঁচালীর কথা। মানবাত্মার সকল সংসর্গের মধ্যে যেন পরমাত্মার সংসর্গ লাভের সন্ধান খুঁজিতেছেন। মিথ্যাকে পদদলিত করিয়া সত্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ মানবের পূর্ণপরিণতির লক্ষ্য। কবি এই আদর্শবাদ প্রচার করিবার নিমিত্ত জগতের যত অসত্য, প্রলোভন ও আবর্জ্জনাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দিন দিন গাঢ়তর হইতে থাকে। ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে রসিকচন্দ্রের কোন আড়ম্বর ছিল না। অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির কাছে তাঁর মত জ্ঞান, চরিত্র কত ক্ষুদ্র ভাবিয়া নিজকে সঙ্গোপনে রাখিতে ভালবাসিতেন। এইজন্য নাস্তিক আখ্যাও তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ব্যাকুল প্রাণে কাতরকণ্ঠে নিভৃত নিকেতনে বসিয়া "ইদানীঞ্চেন্তীতো মহিষ-গল-ঘণ্টা ঘন রবাৎ নিরালম্বো লম্বোদর জননী, কং যামি শরণম্" বলিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন।

শেষবয়সের রচিত তাঁহার শ্যামাসঙ্গীতের গানগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়—প্রেমাস্পদের জন্য প্রেমিকের কি আকুল প্রার্থনা। পার্থিব কোনো প্রকারের সম্পদই তাঁহার মনের উপর আধিপত্য করিতে পারে নাই। বৈষ্ণব কবিদের ব্রজগোপীদের মত ধূলিকঙ্কর কণ্টকময় পথকে সরল করিয়া তিনিও নিশীথ পথের পথিক হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার অনেক কবিতায় বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব লক্ষিত হয়।

বহির্মুখী মনটাকে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিতেছেন না; তাই আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

মন হলি না মনের মত।
তোরে বারে বারে বুঝাব কত।
বসে আছিস পাঁচটার মাঝে   তাতে দুটার অনুগত
ওরে বিষয় ভোলা, নটা খোলা
কোন ধন কি হবি হত।

শ্যামাসঙ্গীতে রসিকচন্দ্র ভক্তিপ্রবাহে গদগদ হইয়া আদ্যাশক্তির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

মা, মোর হৃদয়ে থেকো দেখ গো যেন ভুলো না।
চাই না আমি নির্ব্বাণ মুক্তি ওগো শবাসনা।
যদি আমায় দাও মা দৈন্য; তাও ভাল মা অন্নপূর্ণা
যেন দুর্গানাম ভিন্ন বলে না মম রসনা।

মা ভক্তবৎসল পুত্রের বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ২০শ হইতে ৭২ বৎসরের মধ্যে তিনি বিশেষ কোনো অসুখে ভোগেন নাই—চিত্ত-শান্তির প্রভাবে আধি-ব্যাধির স্থান ছিল না। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে পুত্র দাশরথিকে বলিয়া গিয়াছিলেন—"দাশু আজ শরীর ভাল নাই, কি জানি কি হয়।" সেই রাত্রে চারি ঘটিকার সময় পুত্রের দেয় গঙ্গাজল পান করিয়া তুলসীতলায় সকলের নিকট বিদায় লইয়া রসিকচন্দ্র সুদূর শান্তিনিকেতনের যাত্রী হইলেন।*

* ঊনবিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের সাহিত্যশাখায় পঠিত

গঙ্গাফড়িং

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

১

মা বললেন—দ্যাখো ত' বাবা বিশু, গঙ্গা সেই যে বাজারের পয়সা নিয়ে বেরল, আর ফেরবার নাম নেই! গাড়ীচাপা পড়লো কি কি……

এগ্‌জামিনের পড়া, তবুও বই ছেড়ে উঠ্‌তে হ'ল। মনে মনে বাঁদর গঙ্গারামের মুণ্ডপাত করতে করতে পথে বেরলাম।

সরু গলিটা পেরিয়ে বাঁ-হাতি মোড় ফিরতেই দেখি—ফুট্‌পাথের ওপর গ্যাসপোষ্টের পায়ের তলায় বেশ একটি ছোটখাটো ভিড় জমে উঠেছে, ছোট ছেলে থেকে আরম্ভ করে বুড়ো পর্য্যন্ত। ভিড়ের ভেতর থেকে টুং টুং ক'রে একটি ঘণ্টা বাজ্‌ছে, যেন গলায় লাল ফিতে দিয়ে ঘণ্টা-বাঁধা ছোট্ট ছাগলছানাটি তা'র মায়ের চারপাশে খেয়ালখুসীতে নেচে বেড়াচ্ছে।

ব্যাপার কি, দেখবার জন্যে এগিয়ে যেতেই গঙ্গার সঙ্গে চোখাচোখি। ও ত দে-ছুট্‌!

ভাবলুম, বাড়ীই গেল বোধ হয়।

ভিড়ের মধ্যে উঁকি মেরে দেখি—একখানা গোল পিচবোর্ডের ওপর ঘড়ির ডায়েলের মত এক, দুই, তিন, চার, এমনি বারো পর্য্যন্ত লেখা আর বোর্ডের ঠিক মাঝখানটিতে একটি কাঁটা ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে; যেখানে গিয়ে কাঁটাটি থাম্‌চে, সেই দাগ অনুযায়ী বিস্কুট, দেওয়া হচ্ছে। লটারি আর কি!

মন্দ নয়। ছেলেরা লোকটাকে ছেঁকে ধরেছে; কেউ পাচ্ছে এক পয়সায় দশখানা, কেউ বা একখানা, আবার কারু কপালে শূন্য।

আমিও এক পয়সা খেল্‌লুম, বরাতে মিল্‌ল পাঁচখানা।

বাড়ীতে ফিরে দেখি—ঘরের এক কোণে গঙ্গারাম নিয়ে বাজারে, ঝাড়া একঘণ্টা পরে ফির্‌ল খালি হাতে, দু'আনা ট্যাকে করে। মা ত রেগে অস্থির, বললেন—আজ তোকে মেরেই ফেল্‌বো হতভাগা, বাকী চার আনা কি ক'রেচিস্‌ বল্‌……

ও কিছুতেই বল্‌বে না, যেন শো'রের গোঁ। আমি আন্দাজে ব্যাপারটা অনেকখানি বুঝে নিলুম।

তারপর, ভুলিয়ে ভালিয়ে আসল কথাটি জান্‌তে পারলুম। বাজারে যাবার পথে ওর বন্ধু কেষ্টা আর রামার সঙ্গে ওর দেখা হয়, বিস্কুটের লটারী-খেলার ওখানে ওরা দাঁড়িয়েছিল। গঙ্গার হাতে পয়সা দেখে, ওর কাছ ছেকে দু'আনা দু'আনা চার আনা ধার নিলে—কেষ্টা আর রামা, লটারী খেল্‌বে বলে।

গঙ্গা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের খেলা দেখছিল, এমন সময় আমাকে দেখে ভোঁ-দৌড়!

২

আজ দু'বছর হ'ল গঙ্গাদের বাড়ীতে এসেচি। গঙ্গাকে পড়াই; ওখানেই খাই, থাকি।

আট বছরের গঙ্গা আমার চোখের সাম্‌নে বড় হয়ে দশ বছরে পা দিয়েছে। রোগা লিক্‌লিকে চেহারা; বড় বড় চোখ দু'টিতে স্পষ্ট বুদ্ধির আভা, মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া কালো কুচ্‌কুচে চুল। ওর মুখের দিকে চাইলে, যে জিনিষটি সব আগে চোখে পড়ে, সেটি হচ্চে ওর ওপর-ঠোঁটের বাঁ কোণটির ওপর একটি ছোট্ট মিশ-কালো তিল। ভোরের আকাশের শুকতারার মতই চমৎকার।

রোগা হ'লে কি হয়, অত্যন্ত চঞ্চল আর তেম্‌নি একগুঁয়ে ও। পড়্‌তে বসে ঘণ্টায় তিন চার বার উঠে পালায়; আবার মা'র কাছে তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে

ছোট্ট একটি বাছুর! হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—উঃ, আর ভাল লাগে না পড়্‌তে। কখন্ ছুটি হ'বে?...

প্রথম যেদিন ওদের বাড়ীতে এলুম, ওর মা ওকে সঙ্গে করে আমার কাছে দিয়ে গেলেন; বল্‌লেন—তুমি বাবা আমার ছেলের বয়সী, তোমাকে নাম ধরেই ডাক্‌বো, কেমন? এই দুষ্টুটাকে সাম্‌লাতে পারবে কি বিশ্বনাথ!

বল্‌লুম—কিছু ভাব্‌বেন না মা, সে আমি ঠিক করে নোব।

তারপর গঙ্গাকে জিগ্যেস্ করলুম—তোমার নাম কি ভাই খোকা?

ও বল্‌লে—শ্রীগঙ্গা......এই পর্য্যন্ত বলে মার মুখের দিকে তাকালো।

আমি হেসে বল্‌লুম—বেশ, বেশ, তোমাকে আমি বলবো গঙ্গাফড়িং, কেমন?

মা হেসে বল্‌লেন—তোমাকে কিন্তু গঙ্গা মাষ্টারমশাই বলে ডাক্‌বে না বিশ্বনাথ,—ও ব'লবে—বিশুদা।

আমি হেঁট হয়ে ওঁর পায়ের ধুলো নিলাম।

সহরের এক অপ্রশস্ত গলির উপর ছোট্ট একখানি একতালা বাড়ী।

স্নেহময়ী বিধবা মা আর দখিন্ হাওয়ার মত চঞ্চল এই ছেলেটিকে নিয়ে সংসার; তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে—ছেলের মাষ্টার আমি, অর্থাৎ গঙ্গাফড়িংয়ের বিশ্‌দা।

খেয়ালী ছেলেটিকে পড়ানোর চেয়ে গল্প বল্‌তে হয় বেশী। দুনিয়ার সমস্ত খবর ও জান্‌তে চায়। নায়েগ্রার তোড়কে বেঁধে কেমন ক'রে বিদ্যুৎ তৈরি হয়; এরোপ্লেন আকাশে ওড়ে কেমন করে; পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ধনী কে; নোবেল প্রাইজ কাকে বলে; এই রকমের যে কত প্রশ্ন ও ক'রে তার ঠিক্ নেই।

সেদিন পূর্ণিমার সন্ধ্যায় ছাদে মাদুর পেতে বসে আছি; গঙ্গা এসে বসলো আমার পাশটিতে।

বুকচাপা চারতলা বাড়ীখানার পেছন থেকে চাঁদ উঠলো।.. একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চাঁদের দিকে চেয়ে থেকে ও জিগ্যেস্ করলে—আচ্ছা বিশ্‌দা, চাঁদের বুকভরা ও কালো কালো ছোপগুলো কিসের?

আমি বল্‌লুম—চাঁদের মধ্যেও এই পৃথিবীর মত পাহাড়পর্ব্বত, বনজঙ্গল আছে, মানুষও আছে, তবে তারা অন্য রকম ...

ও ত একেবারে অবাক্। তারপর অনর্গল কত যে প্রশ্ন করে গেল তার ঠিক নেই। আমি চুপ করে শুনি, উত্তর দিই না, আর দেবই বা কি!

অশান্ত গঙ্গাফড়িংয়ের মধ্যে যে একটি ছোট্ট কবি ঘুমিয়ে ছিল, তা একদিন হঠাৎ ধরা পড়লো। ওর রাফ্ খাতা-খানা ঘাঁট্‌তে ঘাঁট্‌তে দেখি এক জায়গায় লেখা আছে—

'মাগো, আমায় হাতছানি দেয় ভোরের হাওয়ায়;
ডাকে আমায় সাঁজের তারা চোখের চাওয়ায়।'

ভাবলুম বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতার দু'লাইন ও খাতায় টুকে রেখেচে; কিন্তু সে ভুলও আমার ভাঙলো যখন ও একখানি ছোট্ট নীল রঙের বাঁধানো খাতা এনে আমায় দেখালে। খাতা বোঝাই কবিতা।

সত্যি অবাক্ হয়ে গেলুম। গঙ্গার মত দশ বছরের দুরন্ত ছেলে যে এমন কবিতা লিখতে পারে, এ-কথা কোনদিন ভাবতেও পারিনি। ওর কবিতার মধ্যে কাঠ্‌পিঁপড়ের গান শোনা যায়; বর্ষারাতের কোলাব্যাঙ ওর কাছে মনের গোপন কথাটি বলে গেছে; উচ্চিংড়ের এরোপ্লেনে চড়ে ও অনেকদূর পাড়ি দিয়েছিল; ঘাসের মধ্যে পথ-হারানো ফড়িং ওর কাছ থেকে পথ জেনে নিয়েছিল; দখিন হাওয়া চল্‌তে চল্‌তে ওর জান্‌লার সাম্‌নে থেমে ওকে সেলাম করে গিয়েছিল সেদিন ভোরবেলায়; সন্ধ্যাতারার চোখে ও ওর মরে-যাওয়া খেলার সাথী নন্দরাণীর মুখখানি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল সেদিন; এম্‌নি কত আবোল্ তাবোল্। ...

ওকে আমরা বারণ করিনি কোনদিনও, উৎসাহই দিয়েছি বরাবর কবিতা লেখবার জন্যে।

৩

আরও দু'বছর কেটে গেছে।

অনেকদিন পরে দেশে এসেছি।

হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি পাই, কল্‌কাতাথেকে গঙ্গার মা লিখেছেন। লিখেছেন ঃ—

"পরম কল্যাণবরেষু—

বাবা বিশু, তুমি যাবার তিন দিন পরে, তোমার গঙ্গাফড়িংও উধাও হয়েচে। কিছুতেই তাকে ধরে রাখতে পারলুম না বাবা! কি যে কাল রোগ এল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই বাছা আমার শেষ হয়ে গেল।

আশা করি ভাল আছ। আমার আশীর্ব্বাদ জেনো।

ইতি

তোমার গঙ্গাফড়িংয়ের মা—

পুনশ্চ—যাবার সময় গঙ্গা ব'লে গেছে—"মা, বিশ্‌দাকে আমার সেই নীল রঙের বাঁধানো খাতাখানা দিও। তুমি যখন কলকাতায় আস্‌বে আমার এখানেই এস।"

* * *

চঞ্চল গঙ্গাফড়িং পালিয়ে গেছে। তা ত যাবেই; দখিন্‌ হাওয়াকে কি ধরে রাখা যায়!

সবচেয়ে বেশী কষ্ট হয় যখন ভাবি, বাঙলার একটি সত্যিকারের কবি কুঁড়িতেই ঝরে গেল।

কণ্টক

শ্রীজগৎ মিত্র, বি-এ,

গোলাপ শুন গো, গোলাপ আমার
প্রাণের ফুল,
রূপের তলায় কেন গো জালায়
কাঁটার হুল ?
গন্ধ তোমার পাইনি, কভুও তুলিনি দল,
তবু যে গো হায় কণ্টক যায় হ'সু বিকল।
তবু যে ভুল—
চঞ্চরী-মন সঞ্চরি' ফেরে প্রেম-মধু আশে সে যে ব্যাকুল,
ফুল অতুল!
তোমারে ঘেরিয়া কত না কাব্য কত না স্বপ্ন কত না ভুল,
গোলাপ ফুল!

জগতে যত না সুখ আছে তার
বেশী যে দুখ;
যত বলা যায় নীরব ব্যথায়
বেশী যে মূক।
এত হাসি আর এত যে মিলন এত যে গান,
তা'রি সাথে সাথে না-গাওয়া গীতের আত্মদান!
গোলাপ ফুল,
তোমার কাঁটায় খুন্‌ ঝরে যা'র গান গেয়ে যায় সে বুলবুল—
—কি মশগুল!
প্রেম-বাগিচায় গন্ধ বিলায় কান্নাহাসির অরূপ গুল—
—রূপসী ফুল!

রাঢ়ের কয়েকটি পল্লী ভ্রমণ

শ্রীহরিহর শেঠ

প্রত্যূষে উঠিয়া কাটোয়া হইতে একখানি গাড়ী লইয়া দাঁইহাট যাত্রা করিলাম। ইহা কাটোয়া হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। আজকাল আমরা অনেকে প্রায়ই দেশ বিদেশে ভ্রমণে যাই; অনেক সময় বর্ম্মা, রেঙ্গুন, জাভা, জাপান প্রভৃতি স্থান বেড়াইয়া তথায় প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার নিদর্শনগুলি দেখিয়া পুলকিত হই; কিন্তু ঘরের পাশে যে-সব বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি ও হিন্দু-প্রাধান্যের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা দেখিবার আগ্রহ নাই। হুগলী জেলার মধ্যে দ্বারবাসিনী, পাণ্ডুয়া, মহানাদ প্রভৃতির ন্যায় রাঢ়ে কাটোয়া, দাঁইহাট, অগ্রদ্বীপ, বীরহাট প্রভৃতি এমন অনেক স্থান আছে যাহার পূর্ব্ব ইতিহাস উদ্ধার করিতে পারিলে অনেক জ্ঞাতব্য কথা জানা যাইবে। আজিও এ সকল স্থানের বনজঙ্গলের মধ্যে এমন-সব ধ্বংসপ্রায় ঐতিহাসিক নিদর্শন রহিয়াছে, যাহা অবলম্বন করিয়া তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধারসাধন সম্ভবপর হইতে পারে। আজিও যাহা দেখা যাইতেছে কাল-প্রভাবে তাহাও হয়ত নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু এমনই দেশের দুর্ভাগ্য, যাঁহাদের যত্ন চেষ্টা ও পরিশ্রমে এই কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইতে পারে, তাঁহাদের এদিকে আগ্রহ নাই। আর যাঁহাদের ইচ্ছা আগ্রহ আছে তাঁহাদের হয়ত সময় বা সামর্থ্যের অভাব। স্থানীয় কৃতবিদ্য লোকেরা এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে কাজ সহজ হয়।

পূর্ব্বকালে কাটোয়া হইতে দাঁইহাট পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানটাই যে একটা বা একাধিক পরস্পর-সংলগ্ন সহর ছিল, তাহা প্রাচীন সমৃদ্ধির লুপ্তপ্রায় ক্ষীণ নিদর্শনগুলি হইতে বেশ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যে পথ ধরিয়া দাঁইহাট যাইতে হয়, তাহা গঙ্গার ধার দিয়া গিয়াছে; কিন্তু গঙ্গা এক্ষণে বহুদূরে সরিয়া যাওয়ায় পথ হইতে উহা দৃষ্টিগোচর হয় না। গঙ্গাগর্ভ এখন কোথাও উদ্যান, কোথাও জঙ্গলে পরিপূর্ণ, আবার কোথাও বা আবাদ হইতেছে। এখনও যাহা কিছু প্রাচীন সমৃদ্ধির চিহ্ন দেখা যায় তাহা প্রায় পথিপার্শ্বেই অবস্থিত। এই স্থান পূর্ব্বকালে ইন্দ্রানী পরগণার কেন্দ্র ছিল। এখানে ইন্দ্রেশ্বর নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি গঙ্গাতটে এক সুবৃহৎ মন্দিরমধ্যে ইন্দ্রেশ্বর নামে শিব স্থাপনা করিয়াছিলেন। মুসলমান-বিজয়ে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই ইন্দ্রানী যে পূর্ব্বকালে অতি প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল, তাহা কবিকঙ্কণ চণ্ডীর নিম্ন-লিখিত অংশগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়।—

রাজাডাঙ্গার প্রাচীন শিবমন্দির

"মণ্ডলাহাট ডাইনে আছে, থাকিব হাটের কাছে,
আনন্দিত সাধুর নন্দন।
সম্মুখেতে ইন্দ্রানী, ভুবনে দুলভ জানি
দেব আইসে যাহার সদন॥"

* * *

"ডাহিনে লালিতপুর বাহিল ইন্দ্রানী।
ইন্দ্রেশ্বরে পূজা কৈল দিয়া ফুল পানি॥"

* * *

"লহনা খুল্লনা কাছে মাগিল মেলানি।
বাহিয়া অজয়নদ পাইল ইন্দ্রানী॥"

কথিত আছে, বার ঘাট তের হাটে এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল। তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কবি কাশীরাম দাস তাঁহার মহাভারতে এই দ্বাদশ ঘাটকে ভাগীরথী-তীরের দ্বাদশ তীর্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,

"ইন্দ্রানী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈশে ভাগীরথী॥"

এই সকল ঘাটের স্থান নির্ণয় করা এক্ষণে দুরূহ। এখানে একটি স্থানকে লোকে ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট বলিয়া দেখাইয়া থাকে। এখনও ইন্দ্রদ্বাদশীর দিন এই ঘাটে বহু যাত্রী স্নান করিতে আসেন।

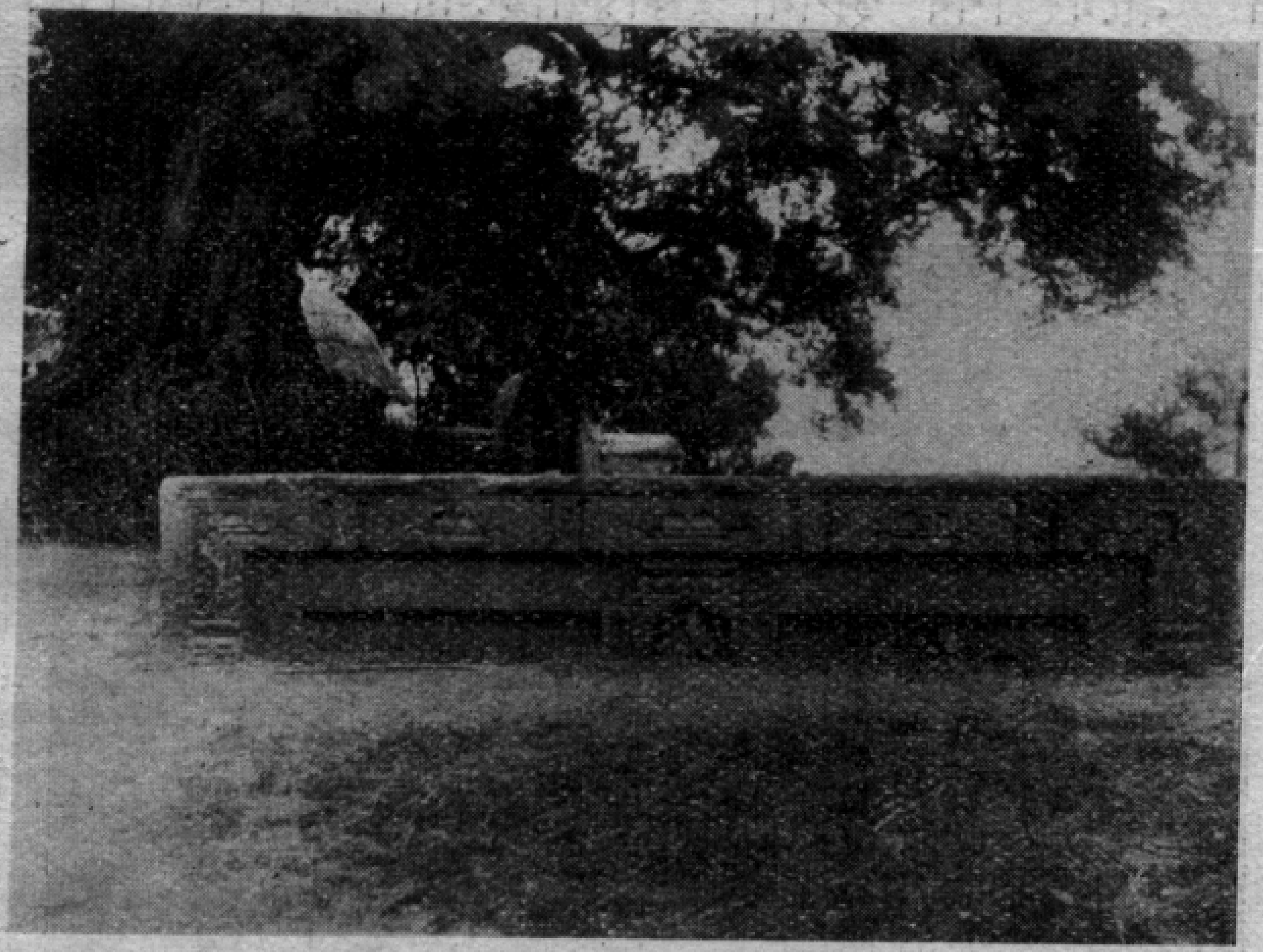

ইন্দ্রেশ্বরের মন্দিরের দ্বারদেশের উপরের প্রস্তরখণ্ড

মুকুন্দরাম ও কাশীরাম উভয়েই কাটোয়ার নাম না করিয়া ইন্দ্রানীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমিত হয়, সে সময় কাটোয়া অপেক্ষা ইহার প্রসিদ্ধি অধিক ছিল। কালক্রমে চৈতন্য-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের সংখ্যাধিক্যের সহিত কাটোয়ার নাম বিখ্যাত হইল, আর ইন্দ্রেশ্বর মহাদেব ইন্দ্রানীর রাজসম্পদ ও এখানকার সমৃদ্ধিগুলি লোপ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে নামও লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখন সে শিবমন্দির রাজবাড়ী ঘাট প্রভৃতির স্থান নির্ণয় করা প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

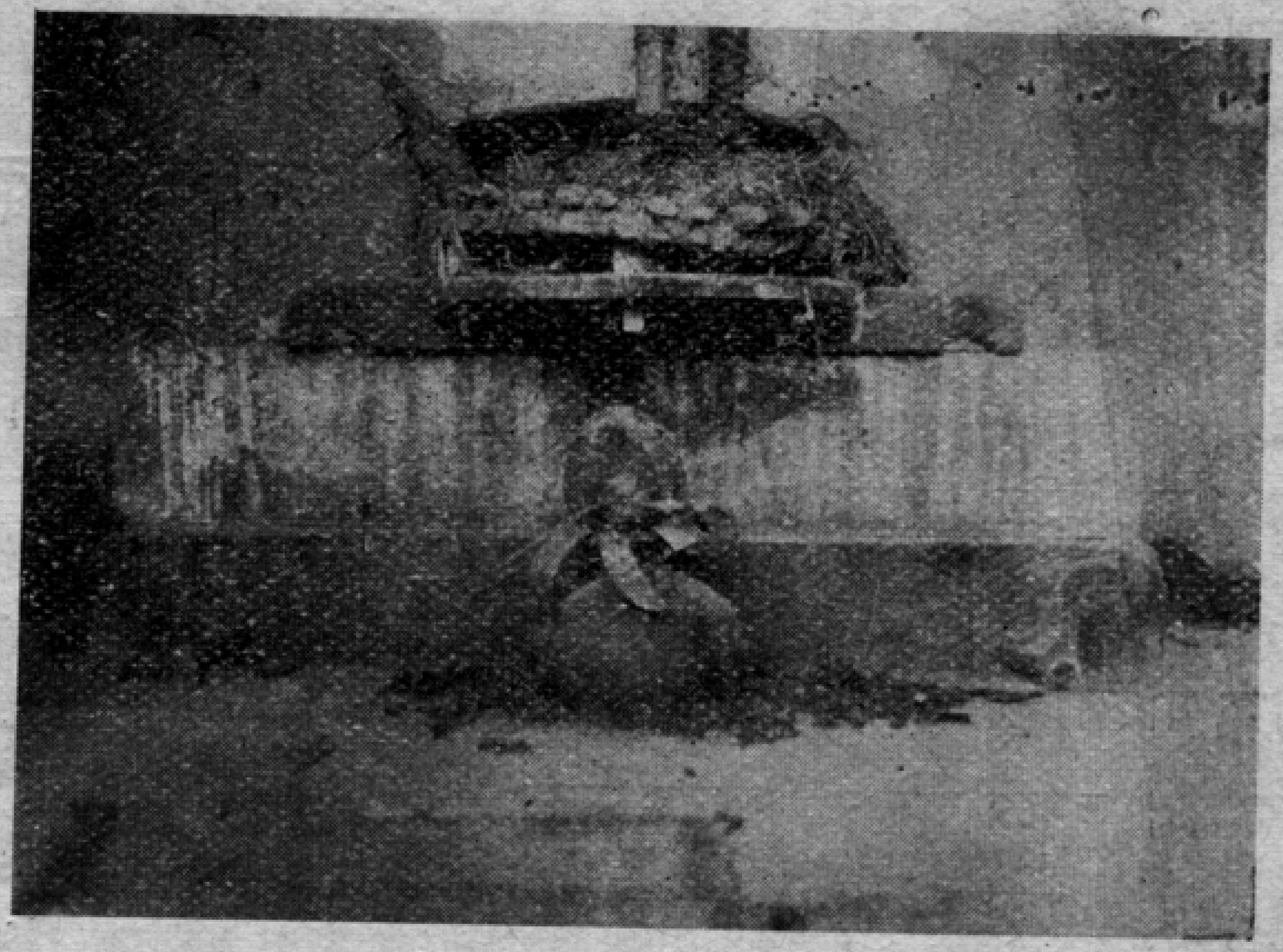

রামানন্দ-পূজিত সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের কালীর কাঠাম

দাঁইহাট আসিতে সর্ব্বপ্রথম পথিকের নয়ন আকৃষ্ট করে, পথিপার্শ্বে একটি কারুকার্য্য-খচিত অর্দ্ধ-প্রোথিত সুন্দর প্রস্তর স্তম্ভ। উহা কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরে নির্ম্মিত, কে কবে কোথা হইতে আনিয়া এখানে স্থাপিত করিয়াছে তাহা স্থানীয় লোকেরা কেহই বলিতে পারিল না। তথায় 'হনুমানের লাঠি' নামে ইহা খ্যাত। কেহ কেহ বলেন ইহা রাজবাড়ীর স্তম্ভ। আমার মনে হয়, এ অনুমান সত্য। উহার পার্শ্বেই হরগৌরীর মন্দির। ইহা একটি আড়ম্বরহীন চতুষ্কোণ গৃহ, দ্বার রুদ্ধ থাকায় ভিতরের বিগ্রহ দর্শনলাভ ঘটিল না। জনৈক মুসলমান কৃষককে জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, এই স্থানের নাম রাজার ডাঙ্গা। সে ব্যক্তি দূরে একটি স্থান দেখাইয়া বলিল—উহাই রাজার বাড়ী। একটি বাগান পার হইয়া কিছুদূরে আমাদের লইয়া গিয়া একটি প্রাচীন ভগ্নপ্রায় শিব-মন্দির দেখাইল।

সময় ও সুযোগের অভাবে ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা বন-জঙ্গলের ভিতর ঘুরিয়া দেখিতে পারিলাম না। কৃষকের নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া আমরা আর তিনটি অতি প্রাচীন মন্দির দেখিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। সে পথে গাড়ী যায় না, পদব্রজেই একটি মেঠো গ্রাম্যপথ ধরিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিলাম। দেখিলাম,

পথের একপার্শ্বে দুইটি, অপর পার্শ্বে একটি অতি জীর্ণ শিবমন্দির গাছপালার মধ্যে অর্দ্ধ-আবৃত অবস্থায় রহিয়াছে। দুইটির মধ্যে এখনও লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, অন্যটির দ্বারসমীপে লতাগুল্মাচ্ছন্ন থাকায় নিকটে যাওয়া সম্ভবপর হইল না। মন্দিরগাত্রে ইটের কাজগুলি দেখিলে উহা যে এক সময় বিশেষ সৌষ্ঠবপূর্ণ ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। এখানে এখন আর কোনো লোকালয় দৃষ্ট হয় না।

ইহা দেখিয়া আমরা আবার গাড়ীতে উঠিলাম। কিছু দূর যাইবার পর পথের পার্শ্বে ঠিক বাম দিকে একটি প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছের তলায় একখানি কারুকার্য্যময় সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ বৃহদায়তনের প্রস্তরখণ্ড দেখিলাম। উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮ ফুট ও প্রস্থে দেড় ফুট। ইহার মধ্যভাগে একটি দ্বিভুজ গণেশ-মূর্ত্তি আছে। অনেকেই অনুমান করেন ইহা ইন্দ্রেশ্বরের প্রবেশ-দ্বারের ঊর্দ্ধাংশ। ইহার গঠন এবং গণেশ-মূর্ত্তি দেখিয়া এ অনুমানও সত্য বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে যে হনুমানের লাঠির কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহাকে কেহ কেহ রাজবাড়ীর থাম বলিলেও উহাও

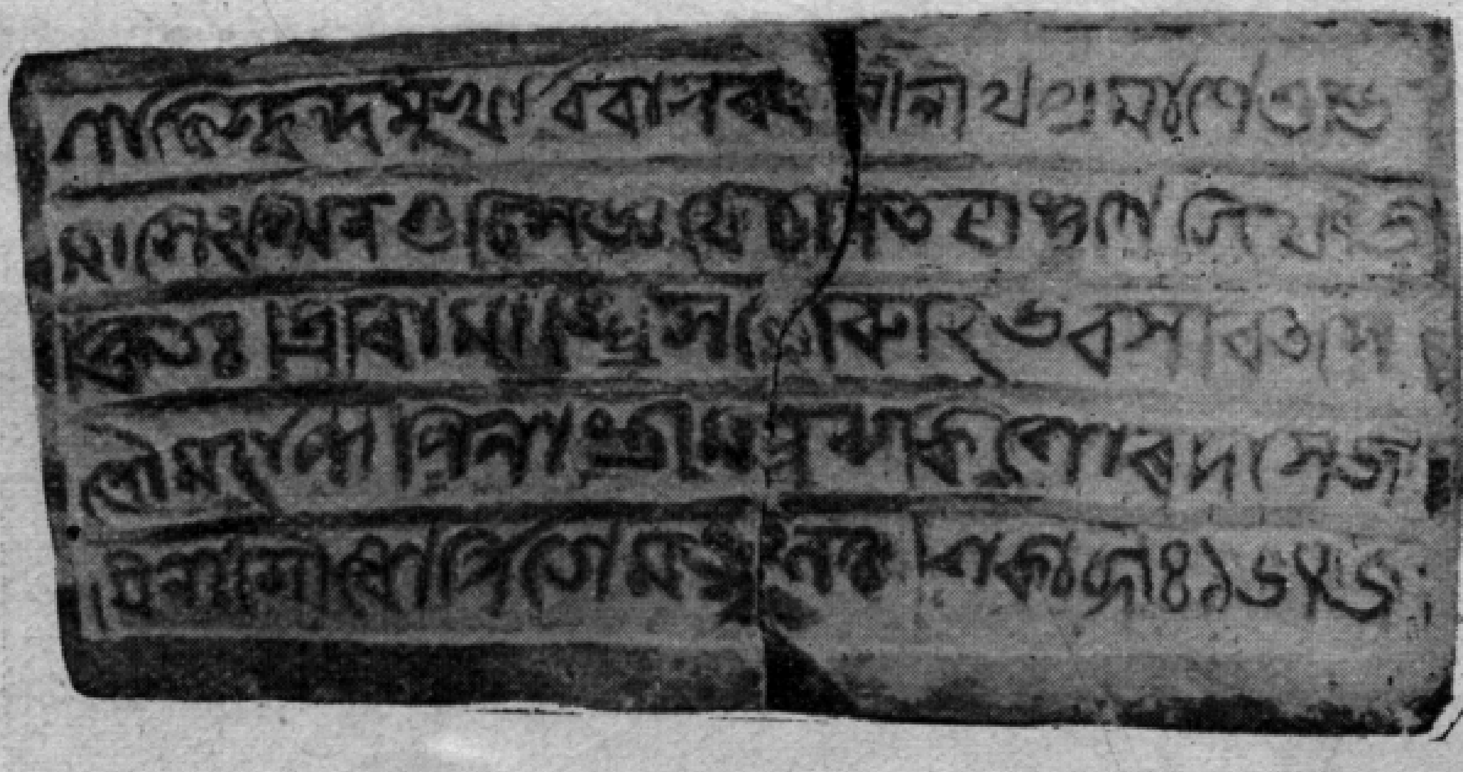

সুন্দরলাল তেওয়ারীর সমাধি-মন্দির-সংলগ্ন প্রস্তরলিপি

মন্দিরের অংশ হওয়া বিচিত্র নহে। এই নিদর্শনগুলি যেন পূর্ব্ববৈভবের সাক্ষ্য দিবার জন্য আজিও বিলুপ্ত না হইয়া ধরাপৃষ্ঠে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই-গুলি হইতে ইন্দ্রেশ্বরের অতীত গৌরব, উহার প্রস্তর-মন্দিরের সুবৃহৎ আয়তন ও সৌন্দর্য্যের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। এখানে আরও কতকগুলি ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত রহিয়াছে।

এই গ্রামের নাম বেড়া বা বীরহাট। এখানে বৈদ্যনাথ সরকার নামক এক প্রবীণ গ্রামবাসীর সাক্ষাৎ পাইলাম। ইহার নিকটেই নিকারি পাড়ায়

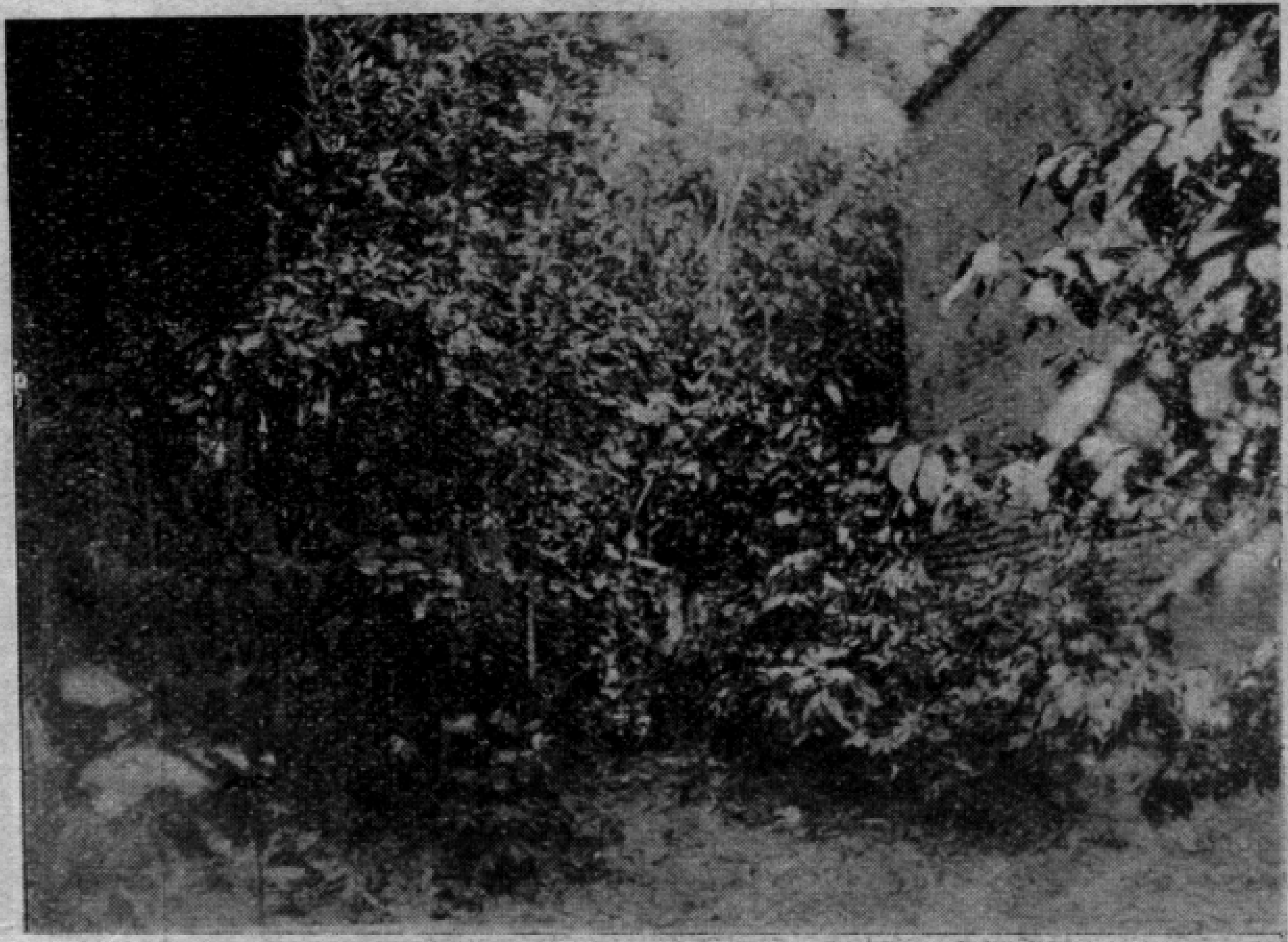

সাধক রামানন্দ রায়ের পঞ্চমুণ্ডী আসন

ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট ছিল, এইরূপ জনপ্রবাদ। পল্লীটি এ অঞ্চলে একটি পবিত্র স্থান। এককালে এখানে সুবিখ্যাত সাধক রামানন্দ, পূর্ণানন্দ, সুন্দরলাল তেওয়ারী প্রভৃতির পাট ছিল। আমরা ভদ্রলোকটির সহিত এই সকল পবিত্র স্থান দেখিতে যাইলাম। স্থানীয় জমিদার মহাশয়ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। প্রথমেই সিদ্ধেশ্বরীতলায় রামানন্দের পাট দেখিতে গেলাম। স্নিগ্ধ পল্লীর তরুচ্ছায়াতলে একটি মন্দির পার্শ্বে ইহা অবস্থিত। ইহা সিদ্ধেশ্বরী কালী-মন্দির। এখানে প্রতি বৎসর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি গঠিত হইয়া পূজা হইয়া থাকে। এই পূজার বৈশিষ্ট্য এই যে, একদিনের পরিবর্ত্তে অমাবস্যা, প্রতিপদ ও দ্বিতীয়া এই তিন দিবস এখানে পূজা হইয়া থাকে। কথিত আছে, সাধক রামানন্দ এই শ্যামা মায়েরই পূজা করিয়াছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের ঠিক উত্তরে রামানন্দ সিদ্ধিলাভ করেন। তৃণশষ্পসমাচ্ছন্ন তাঁহার পঞ্চমুণ্ডী আসন

আজিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। "শ্যামা দিগম্বরী রণ-মাঝে নাচো গো মা" প্রসিদ্ধ গানটি রামানন্দেরই রচিত।

মন্দিরের অদূরে একটি নাতিবৃহৎ পুষ্করিণী দেখাইয়া আমাদের প্রদর্শক ভদ্রলোকগণ বলিলেন, উহার নাম 'কেশে পুকুর,' তাঁহাদের মতে উহা মহাভারত-প্রণেতা কাশীরাম দাসের স্মৃতিজ্ঞাপক। ইহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য কোনো চেষ্টা করিয়া তখন একটা সিদ্ধান্তে আসা আমার দ্বারা সম্ভবপর নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, কাশীরাম দাসের জন্মস্থান যদি সিঙ্গি গ্রাম হয় তবে তাহা এখানে নহে।

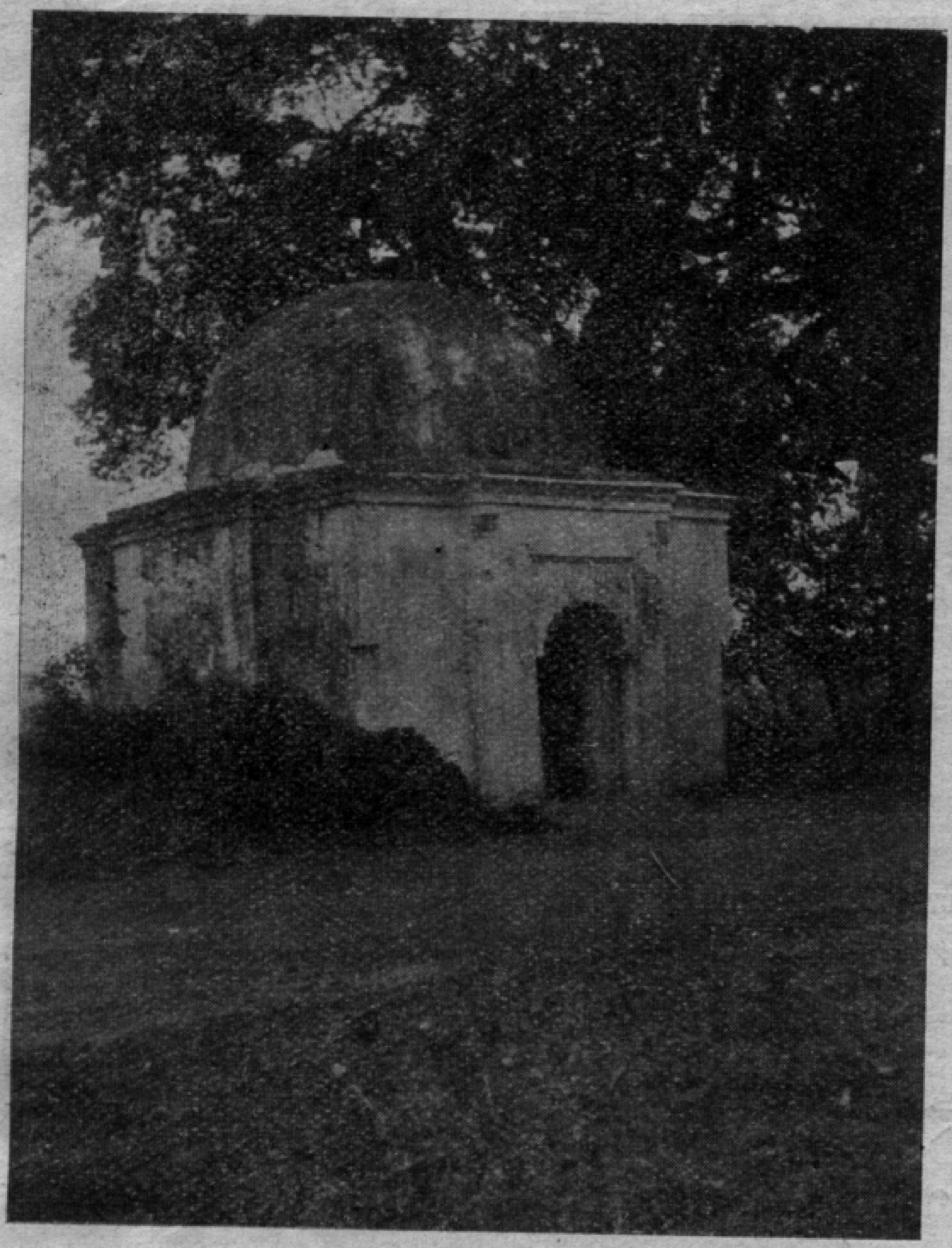

বদর সাহেবের আস্তানা

সমাজবাড়ী—দাঁইহাট

অল্প দূরে সুন্দরলাল তেওয়ারীর পাটে আমরা নীত হইলাম। এই স্থানে যাইতে আরও কতিপয় গ্রামবাসী আমাদের কাছে আসিলেন। তাঁহাদের মুখে এখানকার পূর্ব্বসমৃদ্ধির অনেক কথা শুনিলাম। সুন্দরলালের পাটে তাঁহার অনতিবৃহৎ সুন্দর সমাধি-

দাঁইহাটের বিষ্ণুমূর্ত্তি—ষষ্ঠীদেবী বলিয়া পূজিত

প্রাচীন ঘাট—দাঁইহাট
(কথিত আছে ইহা দ্বাদশ ঘাটের অন্যতম)

মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। উহার গাত্রে সংলগ্ন প্রস্তরফলক হইতে জানা যায় ১৬৭৬ শকে শিষ্য নন্দকিশোর দাস দ্বারা উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দাঁইহাট স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেব শর্ম্মণ মহাশয় আগ্রহসহকারে আমাদিগকে তাঁহার বাটীতে লইয়া গিয়া এখানকার অনেক কথা বলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পারিষদ শ্রীকৃষ্ণদাস ঠাকুরের পাট অনতিদূরে একাইহাটে ছিল। শোনা যায়, ভাস্কর পণ্ডিত এইখানেই দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন।

এস্থান হইতে বিদায় লইয়া দেওয়ানগঞ্জ নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এখানে বহুকাল পূর্ব্বে একটি সুবৃহৎ হাট ছিল; উহার প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান মাণিকচাঁদের নাম হইতে দেওয়ানগঞ্জ নাম হইয়াছে। বড় বড় অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় স্থানটি জনবহুল ছিল। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে এই প্রসিদ্ধ হাটের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত, এখন তাহা প্রায় এক মাইল সরিয়া গিয়াছে। বর্গীরা এই হাটের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। এস্থানে এক সময় বড় বড় পাথরের মন্দির ছিল। বদর সাহেবের আস্তানা এখানে একটি প্রসিদ্ধ মুসলমান দরগা। ইহা বদর শাহ আউলিয়ার সমাধি। এই দরগার কোনো কোনো স্থানে যে প্রস্তর বসান আছে, তাহার শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া বুঝা যায় উহা প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দিরের অংশ। বদর শাহ এই অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি এইরূপ, কোনো নৌকা বিপদে পড়িলে বদর সাহেবের পূজা মানত করিলে বিপদমুক্তি হইয়া থাকে। গঙ্গায় ঝড় উঠিলে অনেক মাঝিমাল্লাকে এখনও 'বদর বদর' বলিতে শুনা যায়। দেওয়ানগঞ্জের হাট এখন দাঁইহাটে উঠিয়া আসিয়াছে।

দেওয়ানগঞ্জ দাঁইহাটের অন্তর্বর্ত্তী বলিলেও হয়। এখানে পিতলের কাজ পূর্ব্বে খুবই ছিল। এই অঞ্চলের মত পাথরের দেব-দেবীর মূর্ত্তি গঠনে পারদর্শী ভাস্কর অন্যত্র খুব কমই আছে। ইহারা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে; এখন মাত্র এক ঘর আছে।

বর্দ্ধমানরাজের সমাজবাড়ী এই দাঁইহাটেই। ইহা কালনার সমাজবাড়ীর ন্যায় আড়ম্বরশালী না হইলেও, এখানে রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবু রায় হইতে মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানাধিপতিদের অস্থি সমাহিত আছে। ইহার অনতিদূরে পথিপার্শ্বে কতিপয় প্রস্তরমূর্ত্তি

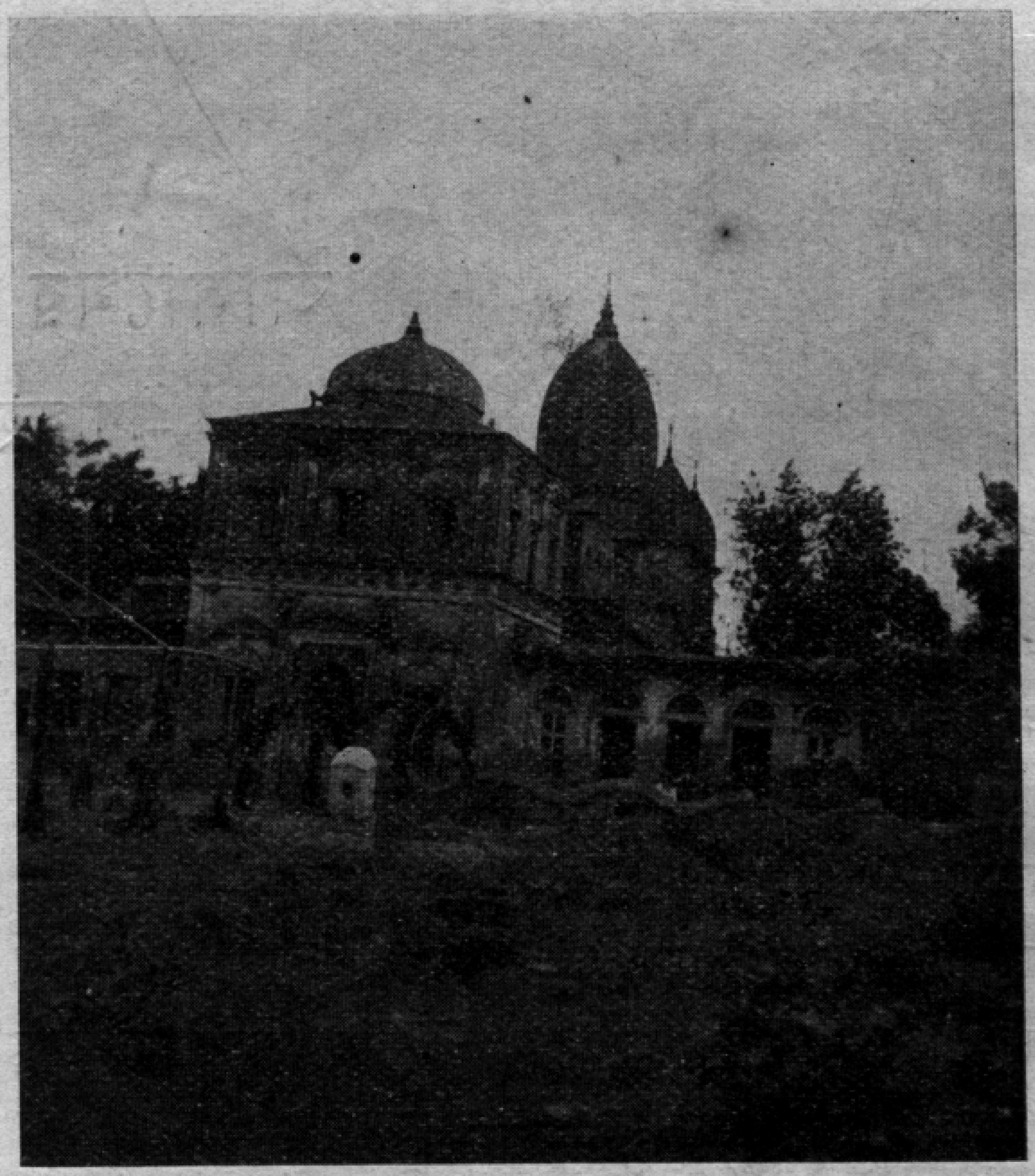

শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর প্রস্তর মন্দির—জগদানন্দপুর

দেখিলাম। তিনটির মধ্যে একটি অর্দ্ধভগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তি মনে হইল, অপর ভগ্নমূর্ত্তিটি ঠিক করিতে পারা গেল না। যেটি আজও অভগ্ন থাকিয়া ষষ্ঠী দেবী বলিয়া ভক্তের পূজা পাইতেছেন সেটি একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি।

দাঁইহাটে আর দেখিবার মধ্যে দ্বাদশ ঘাটের অন্যতম দুই একটি জীর্ণ ঘাট। আর আছে পাইকপাড়ার পার্শ্বে জঙ্গল শাহের গড়ের চিহ্ন। তসরের কাজের জন্যও দাঁইহাটের প্রসিদ্ধি আছে। নিকটবর্ত্তী গ্রাম জগদানন্দপুরে একটি সুন্দর সুবৃহৎ প্রস্তরমন্দির আছে, আমরা তথায় যাত্রা করিলাম। এখানে গাড়ী যাইবার উপায় নাই, অগত্যা মধ্যাহ্নের রৌদ্রে মাঠ ভাঙিয়া চলিলাম। রেল পার হইয়া প্রায় দেড় মাইলের পর আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। স্থানটি জনবিরল,

সত্যই ইহা এ অঞ্চলের একটি অদ্ভুত কীর্ত্তি। মন্দিরটি উচ্চে তিন তলারও অধিক হইবে, পাঁচটি চূড়া-বিশিষ্ট। মন্দির নাটমন্দির ভোগ-মন্দির প্রভৃতি সমস্তই কারুকার্য্য-মণ্ডিত। লোহিতাভ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে উত্তর-রাঢ়ীয় ঘোষ-চৌধুরী বংশের রাধানাথ ঘোষ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দির-মধ্যে শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের বিগ্রহ বিরাজিত। সমস্ত রাঢ় দেশের মধ্যে এরূপ সুবৃহৎ প্রস্তরমন্দির আর একটিও নাই।

আসামের কুকি জাতি

শ্রীলালতুদাই রায়

বাঙ্গালী পাঠকগণ আসামের পার্ব্বত্য কুকি জাতির নাম শুনিয়া থাকিবেন। কাছাড়, মণিপুর, লুসাই পাহাড় ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরার পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই কুকিজাতির বাস। আমি উক্ত কুকি-জাতীয় লোক। আমাদের সভ্যতা, বর্ব্বরতা, হিংস্রতা প্রভৃতি বিষয়ে নানা গল্প, আমাদের প্রতিবেশী বাঙ্গালী পাঠকগণ শুনিয়া থাকিবেন। আমিও আজ আমাদের অসভ্য সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে কিছু চেষ্টা করিতেছি,—বিশেষভাবে বাঙ্গালীদের নিকট। আমার গোত্র-পরিচয় অবগত হইয়া, পাঠকগণ নিশ্চয়ই আমার সর্ব্ববিধ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন, এই ভরসাতেই আমার এই প্রয়াস।

কুকিরা আপনাদিগকে কখনও কুকি বলিত না। কুকি বলিয়া কোন শব্দ তাহাদের ভাষাতে নাই। কখন কি ভাবে বলা যায় না, বাঙ্গালীগণ উহাদিগকে ঐ নামে ডাকিতে আরম্ভ করেন। উহার পর হইতেই কুকি শব্দের প্রচলন হইয়াছে। আজকাল কুকিরা আপনাদিগকে কুকি বলিয়াই পরিচয় দেয়। কুকি, লুসাই ও মণিপুরী একই জাতি। শারীরিক গঠনের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভাষাতে এত সাদৃশ্য আছে যে, তাহাতে স্পষ্টই উক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়। শ্রীচৈতন্য দেবের পর বৈষ্ণব ধর্ম্ম মণিপুরীদের মধ্যে প্রচারিত হওয়াতে, মণিপুরীরা, কুকি ও লুসাই জাতি অপেক্ষা শিক্ষাদীক্ষায় আজকাল বেশী উন্নত।

কুকিরা কখনও লেখাপড়া জানিত না। জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস কতকটা অনুমান করিতে হয়। প্রবাদ যে, কুকিরা "সিনলুং" হইতে এদেশে আসিয়াছে। উহারা মঙ্গোলিয়ান জাতিরই এক শাখা। সম্ভবতঃ বহুপূর্ব্বে চীনদেশের কোনও স্থান হইতে এদেশে আসিয়াছে। ঐ চীন হইতে সিন এবং সিন হইতেই সিনলুং শব্দ পরিবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

করুণাময় খৃষ্টান মিশনারীগণ যখন আমাদের কথা জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহাদের প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। আমাদের ত্রাণের জন্য তাঁহারা এমন প্রেম করিলেন যে তাহাতে আমাদের হাবুডুবু খাইতে হইতেছে। আমাদের উপযুক্ত আলোকের সন্ধান এ দেশে না পাইয়া সাতসমুদ্র তেরনদীর পার হইতে উৎকৃষ্ট বিজলীবাতি আনিয়া আমাদিগকে আলোকিত করিয়াছেন। আলোকিত অবস্থার পূর্ব্বে আমাদের অন্ধকার অবস্থার কথা কিছু বলা দরকার।

বাঙ্গালীদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি বিভাগ আছে এবং এক ব্রাহ্মণের মধ্যেই রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রভৃতি নানা শ্রেণী আছে, সেইরূপ কুকিদের মধ্যেও প্রধানতঃ দুইটি বিভাগ—খসাক এবং খটলাং বা ঠিয়াক। খসাকদের মধ্যে খবুং, সেকং, লেইরি, হমারলুসেই, কেইভং, লুংটাও এবং ঠিয়াকদের মধ্যে আমং, খজল, তোলর, বুট্টীল, ভাংকাল, শেলাতে, পাকুমাতে, টাইতে, প্রভৃতি

নানা শ্রেণী আছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীবিভাগানুসারে ভাষারও কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

কুকিরা বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু, যুদ্ধপ্রিয়, ও স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি। উহারা অন্যান্য অনেক পার্ব্বত্য জাতি অপেক্ষা শান্ত প্রকৃতির। পর্ব্বতে যাহাদের বাস, বাঘ ভালুক নেক্‌ড়ে যাহাদের প্রতিবেশী, তাহাদের যুদ্ধপ্রিয় হওয়াই স্বাভাবিক। কুকিরা চাষ করে, সুতা কাটে, কাপড় পরে, ভাত খায়, পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করে। গ্রামের প্রায় মাইল-খানেক দূরে কতকটা জঙ্গল পোড়াইয়া তাহাতে চাষের জমি তৈয়ার করে। তাহাতে ধান, তুলা, লাউ, কুমড়া, ভুট্টা, সীম, তিল, কচু, লঙ্কা,বেগুন, কাঁকুড় ইত্যাদির চাষ হয়। জমির একপার্শ্বে শস্য জমা রাখিবার বন্দোবস্ত করা হয়। সেখান হইতে মাঝে মাঝে নিজেদের ব্যবহারোপযোগী শস্য বাড়ীতে আনা হয়। একজনের শস্য অন্যজনে কদাচ স্পর্শ করিবে না। চুরি করিলে ক্ষেত্রদেবতা রাগ করেন এবং ক্ষেত্রদেবতা রাগ করিলে ফসল হইবে না—এই বিশ্বাসেই কেহ কখন চুরি করে না। (এই সমস্তই অন্ধকার যুগের কথা, আলোকিত যুগে সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে—তাহা পরে দেখান হইবে)। বাড়ীতে মুরগী, ছাগল, শূকর, মিথুন (এক প্রকার গরু), কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি পোষা হয়। মুরগী, ছাগল, শূকর, মিথুনের মাংস এবং বন্য শূকর, হরিণ, বন্যকুক্কুট ও নানা প্রকার পাখী শিকার করিয়া তাহাদের মাংস পোড়াইয়া বা রান্না করিয়া খাওয়া হয়। শাক-সব্জী সিদ্ধ করিয়া লবণ ও লঙ্কা যোগে ভাতের সঙ্গে খাওয়া হয়। লবণ নিজেরা তৈয়ার করে। তূলা হইতে সুতা কাটিয়া মেয়েরা কাপড় বুনে। মেয়েরা দুইখানা কাপড় পরে—ছোট একখানা কোমরে ও বড় একখানা বুকে জড়ান থাকে। পুরুষেরা চার-পাচ হাত দীর্ঘ কাপড় লুঙ্গীর মত পরে। শিকার বা যুদ্ধের পোষাক স্বতন্ত্র। বড় একখানা মোটা চাদর মাঝে ভাঁজ করিয়া দুই পাড়ের দিক সেলাই করিলে একটি থলিয়ার মত হয়। তাহাতে হাতের ও গলার জন্য ছিদ্র থাকে। উহাতে কাঁধ হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত আবৃত হয়। ছোট আর একখানা কাপড় কোমরে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। মাথায় পাগড়ী থাকে। কাজের সময় যুবকেরা চার-পাঁচ হাতের একখানা গামছা মাত্র পরে। আজকাল ক্রমশঃ পোষাকের পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে।

বহু পরিবার একত্রে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। কোন কোন গ্রামে ২৫০।৩০০ ঘর লোকও বাস করে। গ্রামে

প্রবন্ধ-লেখক—শ্রীযুত লালতুদাই রায়

একজন সর্দ্দার থাকেন, তাঁহাকে রাজা বলা হয়। রাজা তাঁহার অধীনস্থ প্রত্যেক শ্রেণী হইতে এক একজন মন্ত্রী গ্রহণ করিতেন। গ্রামবাসীদের আপদে বিপদে উঁহারা আবশ্যক-মত ব্যবস্থা করিতেন। ঝগড়া-বিবাদ উঁহারাই মীমাংসা করিয়া দিতেন। ব্যবস্থা বিচার সমস্তই রাজার ঘরে সম্পন্ন হইত। প্রত্যেক গ্রামবাসী রাজার আদেশ মান্য করিয়া চলিত। রাজা ছাড়া প্রত্যেক গ্রামেই একজন পুরোহিত ও একজন কর্ম্মকার থাকিতেন। যে-সমস্ত বিচার রাজা করিতে পারিতেন না, পুরোহিত নানা অভিনব উপায়ে সেই সব মীমাংসা করিয়া দিতেন। প্রতি বৎসর ফসল কাটা হইলে, রাজা, পুরোহিত ও কর্ম্মকার প্রত্যেকে এক এক ঝুড়ি ধান্য প্রতি গৃহস্থের নিকট কর স্বরূপ পাইতেন।

বাহিরের শত্রু এবং বন্য জন্তুর আক্রমণ হইতে গ্রামকে রক্ষা করিবার জন্য চারিদিকে কাঠের বেড়া থাকিত। গ্রামস্থ যুবকেরা পালা করিয়া রাত্রে গ্রাম পাহারা দিত। শিকারে ও যুদ্ধে আগে তীর ব্যবহৃত হইত, পরে বন্দুকের প্রচলন হইয়াছে। পাহাড়ীদের মধ্যে এমন যুবক নাই, যে বন্দুক ব্যবহার করিতে জানে না। সাপের মাথা হইতে বিষ কৌশলে তীরের ফলাতে মাখাইয়া রাখা হইত। সেই তীর যাহাকেই বিদ্ধ করুক তাহার আর নিস্তার ছিল না। কুকি অধিকৃত স্থানগুলি ইংরাজের অধিকারে আসিবার পূর্ব্বে ইহাদের নিজেদের মধ্যেও যথেষ্ট যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে।

কুকিদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা নাই। ছেলেমেয়ের বিবাহ পিতামাতাই দিয়া থাকেন। বিবাহের পর বধূ শ্বশুরঘরে গিয়া বাস করে ও শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করে। কুকিরা ভাত হইতে এক প্রকার মদ্য তৈয়ারী করে। তাহা পান করিলে বেশী নেশা হয় না বা বিশেষ কোন অনিষ্টও হয় না। যুবক-যুবতীরা ক্ষেত্রে কাজ করে। বৃদ্ধবৃদ্ধারা বাড়ী ঘর ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ের তত্ত্বাবধান করে। ক্ষেতে যাইবার পূর্ব্বে গ্রামের সমুদয় যুবক-যুবতী মদ্য পান করিয়া একত্রে দলবদ্ধ হইয়া ক্ষেত্রে রওয়ানা হয়। যুবকদের মধ্যে যাহার কণ্ঠস্বর অতিশয় মিষ্ট সেই দলের নেতা হয়। উক্ত নায়ক একটি ঢোলক ও শিঙ্গা বাজাইয়া গান করিতে থাকে। তাহার সঙ্গে সকলেই গান করিতে করিতে অগ্রসর হয়। সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিন ধরিয়া ক্ষেতের কাজ চলিতে থাকে।

যদিও খৃষ্টান মিশনারীগণ অস্বীকার করেন—তবুও আমরা কুকি সমাজকে বিরাট হিন্দুজাতিরই একটি অংশ মনে করি। সরকারী গণনায় কুকিদিগকে হিন্দু লেখা হয় না; পার্ব্বত্যধর্ম্মী বলিয়া লেখা হয়। তাহার নানা কারণ আছে,—তাহা এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কুকিরা পরমেশ্বরে বিশ্বাসী। ইহারা পরমেশ্বরকে "পাথিয়ান" বলে।

হিন্দুদের অনুরূপ বহুদেবতার পূজা শ্রাদ্ধাদি ও

প্রচারিত আছে যে পার্ব্বত্যজাতিরা ভূতোপাসক। ভূতের পূজা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা অস্বীকার করি না। খৃষ্টান ও মুসলমানদের সয়তান, বা বৌদ্ধদের মারের সম্বন্ধে যে বিশ্বাস, আমাদের ভূত সম্বন্ধে বিশ্বাসও তদপেক্ষা বিশেষ নিকৃষ্ট নহে। আমরা শিব, কালী, গঙ্গা, রামলক্ষ্মণ, ও লক্ষ্মীর পূজা করি। কুকিদের বিশ্বাস, দেবতারা সুখসম্পদ দেন—ভূতেরা শুধু রোগ, শোক ও দুঃখ দেয়। হিন্দুসমাজের যে-কোনও নিম্নস্তরের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আচরণের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। পূজাতে পশুবলি হয়। মদ্যপান, নৃত্য, বাদ্য ও সঙ্গীত সবই হয়।

আমাদের দিনগুলি ভালভাবেই চলিয়া যাইত। আমাদের অভাব অতি সামান্য ছিল এবং তাহা পূরণের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। গ্রামস্থ সমুদয় লোক এক পরিবারের লোকের মত বাস করিত। একজন অন্যজনকে বিপদের সময় প্রাণ দিয়াও সাহায্য করিত। সমুদয় অশান্তির মূল "স্বার্থ" জিনিষটি আমাদের মধ্যে বড় ছিল না।

অন্ধকার যুগের কথা সংক্ষেপে বলা হইল—এইবার আলোকিত যুগের কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মিশনারী মহাত্মারাই আমাদিগকে প্রেম দিয়া হঠাৎ এই আলোকে লইয়া আসিয়াছেন। অন্ধকার হইতে হঠাৎ এই তীব্র আলোকে আসিয়া আমাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়াছে। অন্ধকারে আমরা ছিলাম বরং ভাল। আলোকে যে চোখ যায়! পথও খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমাদিগকে পথের সন্ধান কে দিবে?

গৃহবিবাদে ও যুদ্ধবিগ্রহে দুর্ব্বল পার্ব্বত্যজাতি ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করিল। শাদা-লোক তাহাদের চোখে এক ভীতির বস্তু। সেই সময় মিশনারীরা গিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন,—'প্রভু যীশুকে বিশ্বাস কর—তোমরা পরিত্রাণ পাইবে। যীশু আমাদিগকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। তোমরা পশু, তোমরা অসভ্য, মূর্খ, বর্ব্বর, ভূত। তোমরা কিছু জান না। তোমরা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ কর। ইংরাজ খ্রীষ্টান, তাই

জুতা দিয়াছেন, টুপি দিয়াছেন, কোট দিয়াছেন, সিগারেট দিয়াছেন। আমার কথা শুনিলে তোমরাও এইরূপ পাইবে। অসুখ হইলে তোমরা ভূতের পূজা কর। তোমরাও ভূত। এই দেখ যীশু আমাকে কেমন সুন্দর ঔষধ দিয়াছেন।' পাদ্রী গ্রামস্থ কোন রোগীকে কিছু ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। জীবনে কখনও যে ঔষধ খায় নাই, ঔষধ খাওয়া মাত্রই হয় ত আরোগ্য লাভ করিল। খ্রীষ্টধর্ম্মে আর কি অবিশ্বাস থাকিতে পারে? অজ্ঞ সরল পার্ব্বত্যলোকেরা কতক ভয়ে, কতক বিস্ময়ে, কতক লোভে মিশনারীদের কথা শুনিতে লাগিল। ধীরে ধীরে কেহ কেহ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। কোন কোন সংক্রামক রোগের লক্ষণ এইরূপ শুনিয়াছি, নিজে কষ্ট পাইতেছে এবং অন্যের সঙ্গে মিশিলে অন্যেরও রোগ হইতে পারে এ কথা জানিয়াও রোগী অন্যের সঙ্গে মিশিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করে। আমাদের বেলাও তাহাই হইতেছে, যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহারা নিজে ভাল না থাকিলেও, অন্যকে সর্ব্বদা দলে টানিবার বিশেষ পক্ষপাতী। চা-বাগানের আড়কাঠির মত ইহাতে বেশ দুপয়সা রোজগারও হয়—প্রসাদী হ্যাট, কোট, জুতাও পাওয়া যায়।

মিশনারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ আমরা স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। সেখানে নাকি আমাদের 'সিট্ রিজার্ভ' হইয়া আছে। আমাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনের উপর আজ খ্রীষ্টান। গ্রামে গ্রামে খড় ও বাঁশের চার্চ্চ ও স্কুল স্থাপিত। আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে সিগারেট ও মাথায় টুপি।

আমাদের পিতা, পিতামহ ভূত ছিলেন ও বর্ব্বর ছিলেন, আর আমরা আজ ধাপে ধাপে স্বর্গের দিকে অগ্রসর হইতেছি। আমরা সভ্য হইয়াছি, আলোকিত হইয়াছি। সুতরাং পাঠকগণের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা আমাদিগকে আর ঘৃণা করিবেন না। আপনারা আমাদিগকে এখন আর ঘৃণা করিতে পারেনই না,—বরং আমরাই ত হিদেন ও পৌত্তলিক বলিয়া আপনাদিগকে কিছু কিছু ঘৃণা করিতে অভ্যাস করিতেছি।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার। ব্যক্তিগত বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের বিদ্বেষ বা নিন্দা প্রচার করা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কুকিদের অবস্থা আজ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যে-সব সমস্যা আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, তাহার কোনও মীমাংসা করিতে না পারিয়াই সুধিগণের সহায়তা-কামনায় এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। কুকিদের কথা আলোচনা করিতে গেলেই নানা অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা অনিবার্য্য। আমি অপ্রিয় কথাগুলি যথাসাধ্য বাদ দিয়াই লিখিবার চেষ্টা করিতেছি। এই অবাঙ্গালী অপটু লেখকের বাঙ্গালা লেখাতে তাহার উদ্দেশ্যের বিপরীত ভাব কেহ দেখিতে পাইলে, তাহা তাহার অনভ্যস্ত হস্তেরই দোষ মনে করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

মিশনারীগণ আমাদের জন্য কি কি করিয়াছেন ও করিতেছেন?—(১) অসভ্যজাতিকে সভ্য করিতেছেন। (২) ধর্ম্মহীন জাতিকে ধর্ম্ম দান করিতেছেন। (৩) সাহিত্য-হীন জাতিকে সাহিত্য দান করিতেছেন। (৪) ঔষধ দিতেছেন। (৫) মদ্যপান বন্ধ করিয়াছেন।

(১) মিশনারীরা আমাদিগকে সভ্য করিতেছেন। এই সভ্যতার অর্থ কি? সভ্যতার অর্থ যদি পোষাক-পরিচ্ছদ হয় তবে কথাটি ষোল আনাই সত্য বটে। প্রত্যেক দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, আবহাওয়া একরূপ নহে। যেখানের যে অবস্থা সেই অবস্থার সঙ্গে মিল করিয়া মানুষের আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিতে হয়। আজ যখন আমাদের পল্লীতে পল্লীতে হ্যাট্, কোট, বুট, সিগারেটের ধুম দেখি,—তখন কাকের ময়ূর সাজিবার গল্পই মনে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের অভাব অতি সামান্য ছিল, কিন্তু এখন নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টি হইতেছে, অথচ সেই অভাব মোচনের কোন নূতন বৈধ উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে না। উদ্দাম বিলাসিতাই যদি সভ্যতা হয়, তবে সেই সভ্যতাকে দূর হইতে নমস্কার করাই ভাল। আমাদের যা-কিছু সবই খারাপ, আর পাশ্চাত্যের যা-কিছু সবই ভাল, এই একটা ভাব সমাজের মধ্যে বিশেষভাবে যুবকদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এ ভাব আনিয়াছে কাহারা? আমাদের অর্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না,—এবং

আমাদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালও নয়। আমাদের মত অজ্ঞ ও অসমর্থ জাতির মাথায় এইরূপ সভ্যতার প্রচণ্ড বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই ভাবি ইহার শেষ কোথায়? যদি বলা যায়, আমাদের নানা কুসংস্কার দূর করা হইতেছে। হইতে পারে, একথা আংশিক সত্য, কিন্তু গাছের আগাছা কাটিতে গিয়া, যে মালী গাছেরই মূলচ্ছেদ করে, আজ আমাদের শিক্ষকেরাও সেইরূপ করিতেছেন না কি? কুকিরা মনে করিত, চুরি করিলে দেবতা রাগ করেন, আর দেবতা রাগ করিলে শস্য হইবে না, এবং আরও নানা অমঙ্গল হইবে। এই বিশ্বাসে কেহ কখনও চুরি করিত না। ইহা একটি কুসংস্কার। আর আজ যিনি খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন—তিনি চুরি করুন, নানা অসৎ কাজ করুন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, তার জন্য যে খ্রীষ্টই দায়ী। তিনি ত তাঁর আসন স্বর্গে রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং যাহা প্রাণ চায় কর—কেবল খ্রীষ্টকেই বিশ্বাস করিলেই হইল। এই বিশ্বাসের নাম সুসংস্কার। সভ্যতার উচ্চ সোপানে আমরা কিরূপ দ্রুত অগ্রসর হইতেছি, ইহা তাহার একটি মাত্র নমুনা। দরকার হইলে এইরূপ উদাহরণ অসংখ্য দেওয়া যাইতে পারে। কুকিদের সত্যবাদিতা, সরলতা, সাধুতা, বিশ্বাসপরায়ণতা, আতিথেয়তা প্রসিদ্ধ। কিন্তু এখন সভ্য হইয়া সত্যবাদী হইলে ব্যবসায়ই যে বন্ধ হইয়া যায়। সরলতা, সাধুতা ও বিশ্বাসপরায়ণতার কথা বলিবার দরকার নাই। এ সব ত বোকামি। নিজের আত্মীয়কুটুম্বও সব সময়ে গৃহে স্থান পান না, এই ত গেল আতিথেয়তা। সভ্যতা লাভ করিতে গিয়া আমাদের যা কিছু ছিল সবই হারাইলাম।

গ্রামে গ্রামে স্কুল ও চার্চ্চ আছে। লেখাপড়া শিখিবার জন্য আমাদের জাতির কিরূপ উৎসাহ তাহা নিজে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। ৩০।৩৫ বৎসরের লোকেও ১০।১২ বৎসরের বালকের সঙ্গে লেখাপড়া করিতেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মিশনারী বিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোনও বিদ্যালয় পাহাড়ে নাই, মিশনারীদের বিদ্যালয়ে অখ্রীষ্টান কোন ছেলেমেয়ে পড়ে এরূপ কথা কখনও শুনি নাই।

দেশীয় প্রচারককে পাস্তর বলে। গ্রামে গ্রামে পাস্তর আছে। এই পাস্তরগণ ও গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই ধর্ম্ম প্রচার করেন, লোককে খৃষ্টান করিবার জন্য ও পাশ্চাত্য ভাব দিবার জন্য যে কিরূপ প্রোপ্যাগাণ্ডা করা হয় তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। বলিতে গেলে সব সময় রুচি বা শ্লীলতা রক্ষা করা সম্ভব হইবে কিনা জানি না। আমরা অজ্ঞ, সাহিত্যহীন, নিরাশ্রয়, অরণ্যবাসী, নাবালক মাত্র। যে আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে তাহারই হাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি। যে আমাকে, আমার পূর্ব্বপুরুষকে, আমার দেশকে, শতমুখে নিন্দা করিতেছে—আমরা তাহারই সঙ্গে সহস্রমুখে আমাদেরই বাপান্ত করিতেছি ও মাথায় কুঠার মারিতেছি। এইভাবেই ধ্বংসের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়া আমরা সভ্যতা পাইতেছি—অন্ধকার হইতে আলোকে যাইতেছি।

(২) একটি ধর্ম্মহীন জাতিকে ধর্ম্মদান করা হইতেছে। আমরা কখনও ধর্ম্মহীন ছিলাম না। আমরা যদি ধর্ম্মহীন হই, তবে ভারতের ২০ কোটি হিন্দুর মধ্যে ১৫ কোটিই ধর্ম্মহীন। হইতে পারে, আমাদের কোন ধর্ম্মগ্রন্থ নাই, হইতে পারে, আমাদের মধ্যে ধর্ম্মের সম্যক বিকাশ হয় নাই, কিন্তু আমাদের যাহা আছে, তাহার উন্নতির চেষ্টা না করিয়া যে ধর্ম্মদান করা হইতেছে, তাহাতে মনে হয় গাছের মূলোচ্ছেদ করিয়া মাথায় জল দেওয়া হইতেছে, অথবা মেষের মাথা কাটিয়া বলদের স্কন্ধে যোগ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

আমাদের প্রকৃত অভাব ধর্ম্মের নয়। শিক্ষার কালচারের। ধর্ম্মদান ব্যাপারটা অনেকেই যত সোজা মনে করেন তত সোজা নয়, যে-সে লোক ধর্ম্ম দিতেও পারে না, লইতেও পারে না। কিন্তু আজ দেখিতেছি, যে-সে লোক ধর্ম্মদাতা সাজিয়া মোটা বেতন (অবশ্য আমাদের তুলনায়) পাইতেছেন এবং হাজার হাজার লোককে ধর্ম্মদান করিতেছেন। এই ধর্ম্মদান ব্যাপার একটি বাহ্যিক ভাণ নয় কি?

(৩) আমাদের কোন লিখিত গ্রন্থ ছিল না। আমাদের ভাষার কোনও বর্ণমালাও নাই। পাদ্রীদের কল্যাণে আমাদের ভাষায় রোমান বর্ণমালায় অনুদিত হইয়া

মাত্র কতকগুলি খৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ ও চার্চ্চের গানের পুস্তক ছাপা হইয়াছে। তাহাতে আমাদের সাহিত্যের যে কি হইল বুঝিতেছি না। রোমান বর্ণমালা একে বিদেশী, তার উপর আমাদের ভাষার যথার্থ উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। রোমান বর্ণমালা অপেক্ষা বাংলা বর্ণমালাতে আমাদের ভাষা ভাল লেখা হইবে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালীরা আমাদের প্রতিবেশী। আমাদের সমুদয় ব্যবসা বাঙ্গালীদের সঙ্গে। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা জানা আমাদের নিতান্ত দরকার। তার উপর বাংলার মত একটি উন্নত ভাষার মানসিক সম্পদের অধিকারী হইবার সুযোগ পাইলে আমাদের যথার্থ উপকার হয়। আমাদের সমগ্র জাতিই বাংলা ভাষা শিখিবার জন্য খুব উৎসুক। কিন্তু সুযোগ কোথায়? মিশনারীদের বিদ্যালয়ে সামান্য ইংরেজী মাত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রগণকে বেশী শিক্ষা প্রদান করা কর্তৃপক্ষ অনাবশ্যক মনে করেন, কোনও রকমে বাইবেলখানা পাঠ করিতে পারিলেই হইল। আবার যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাও এত অপ্রচুর যে, যদিও বা কোন ছাত্র মিশনারীদের বিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হইয়া শিলচর হাইস্কুলে ভর্তি হয়, তাহা হইলে সেখানে পড়া ভাল চালাইতে পারে না। মিশনারীদের স্কুলে কখনও বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। বিদেশী পোষাক আমাদের পোষাক হইয়াছে। পারি আর না পারি, বিদেশী আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি। বিদেশী বর্ণমালায় আমাদের লেখাপড়া চলিতেছে। প্রতিবেশী বাঙ্গালীর সঙ্গে আমাদের কথা কহিতে হইলে আমাদের ইংরেজীর আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় নাই! ইহাতে আমরা ক্রমশঃ এদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছি এবং ইহার একমাত্র কারণ এই মিশনারী আন্দোলন।

(৪) ঔষধ দেওয়া হইতেছে। ঔষধ দিয়া মিশনারীরা শুধু খ্রীষ্টান-পরিবারদের যথেষ্ট উপকার করিতেছেন,—ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে শিক্ষাহীন জাতির পক্ষে সবই বিড়ম্বনা। রোগ দিন দিন বাড়িতেছে। সুস্থ সবলকায় লোকের সংখ্যা দিন দিন কমিতেছে। পাহাড়ীরা নানা প্রকার গাছ-গাছড়া হইতে ঔষধ ব্যবহার করে। সেগুলি রোগে চমৎকার কাজ করিত। এখন এই সব অসভ্যতা। ঘরে ঘরে বিলাতী পেটেণ্ট ঔষধ দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্যে বিক্রয় করা হইতেছে। ডাক্তারখানাতে ডাক্তারের দরকার হয় না—কম্পাউণ্ডার বাবুরাই ধন্বন্তরী। অনেক সময়ে অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী হইয়া দাঁড়ায়। তবে পাহাড়ীরা এ সব বোঝে না, তাই রক্ষা।

মিশনারীরা ঔষধ দিয়া আমাদের উপকার করিতেছেন। সেই ঔষধ গলাধঃকরণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মিশনারীদের নিষ্কাম প্রেম ও প্রভু যীশুকে একমাত্র পরিত্রাতা বলিয়া দৃঢ় (অন্ধ নয়) বিশ্বাস করিতে ত্রুটি করিতেছি না।

(৫) যাহারা খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে, তাহারা কেহই মদ্য পান করে না। বাহির হইতে দেখিলে এ একটা মস্ত কাজ বটে। মদ্যপান না করাই ভাল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা নিজে ভাত হইতে এক প্রকার মদ্য তৈয়ার করিয়া উৎসবের সময় বা ক্ষেতের কাজ করিবার সময় পান করি। তাহাতে স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি করে বলিয়া কোথাও দেখি নাই। এই মদ্য বন্ধ করাতে আবালবৃদ্ধবনিতা সিগারেট ধরিয়াছে। পাঁচ বৎসরের শিশুরও সিগারেট না হইলে আর চলে না। কোনও জাতির মধ্যে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার একেবারে বন্ধ করা শক্ত। স্বাস্থ্যহানি ও অর্থহানির দিক হইতে মাদকদ্রব্যের বিচার করিলে কি দেখি? আমাদের দেশীয় মদ্য অপেক্ষা শুধু সিগারেটে কমপক্ষে এক হাজার গুণ খরচ বেশী। দেশীয় মদ্য প্রস্তুত করিতে আমাদের কোনও খরচ লাগে না। দেশীয় মদ্যে কাহারও স্বাস্থ্যের কোন প্রকার হানি করিতে আমি কখনও দেখি নাই। সিগারেট কি ক্ষতি করে তাহা ত চিকিৎসকগণের অভিমতই প্রামাণ্য। সিগারেটের মত চায়ের কাটতিও দিন দিন ভীষণভাবে বাড়িতেছে। আমাদের মত গরীব জাতির পক্ষে এই সব বালাই সুখের না হইয়া দুঃখেরই হয়।

আমাদের উপার্জ্জনও বেশী ছিল না, সেইরূপ অভাবও বড় ছিল না। ছেলেমেয়েরা পিতামাতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। বধূরা শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করিত। দিনগুলি আমাদের শান্তিতে যাইত। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্টে আছে—যীশুর ভাব পাইয়া ছেলেরা

পিতামাতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, পিতামাতারা ছেলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে।" এই কথার উপর খুব বেশী জোর দিয়া প্রচার করা হইতেছে। অধিকাংশ স্থলে যুবকেরাই পাশ্চাত্য চাকচিক্যে মোহিত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা যখন শুনিতে পায় পিতামাতার কথা শুনিবার দরকার নাই, তখন আর তাহাদিগকে কে রাখে? যুবক-যুবতীরা পিতা-মাতার অবাধ্য, অনেকস্থলে বৃদ্ধ পিতামাতাকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া যায়। গ্রাম্য পাস্তর (প্রচারক) মুসলমান মোল্লার মত গ্রামের একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁহার হুকুমই খোদার হুকুম। ছেলেমেয়ের উপর পিতামাতার কোন হাত নাই। তিনি যাহা বলেন তাহাই হয়। ছেলেমেয়ের বিবাহ পিতামাতাই দিত, এখন তাহা পাস্তরের ইচ্ছাধীন। তিনি যেখানে ইচ্ছা বিবাহ দিতে পারেন বা যখন ইচ্ছা বন্ধও করিতে পারেন। ইহাতে পিতামাতার বলিবার কিছু নাই। এই সব কারণে আমাদের পারিবারিক জীবন যে কিরূপ বিষময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বলিবার নয়।

মিশনারী আন্দোলন সকল প্রকারে আমাদিকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে। কে-ই বা বুঝিবে আর কাহার নিকটেই বা কাঁদিব? আমার স্বজাতীয় বৃদ্ধদের মধ্যে যাহারা এখনও খ্রীষ্টান হয় নাই, তাহারা সমাজে কোণঠাসা। তাহারা একে নিরক্ষর, তার উপর পাদ্রীদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত। আর দেশবাসীর নিকট আমরা ত বাঘ ভালুক বা এই রকম কিছু।

পতিত জাতিদের সাহায্য করিবার জন্য আজ সারা ভারতময় আন্দোলন চলিতেছে। আমরা পতিত, নিরাশ্রয়। বিরাট হিন্দুসমাজের দ্বারে আমরা ভিক্ষা-প্রার্থী, কৃপাপ্রার্থী। আমরা পতিত, অক্ষম, বা যাই হই, আমরা হিন্দুই। সমগ্র জাতির এককোণে আমরাও কি একটু স্থান পাইব না? আমরা কি এতটুকু সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব? মিশনারী আন্দোলন কি ভাবে আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা লিখিতে গেলে একখানা বৃহৎ পুস্তক হইবে। আমি অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছি।

খ্রীষ্টীয় আন্দোলন কেবল যে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহা নয়, ইহাতে সমস্ত দেশেরই একটি বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। আমি ধর্ম্মের দিক হইতে বলিতেছি না; কারণ শুধু ধর্ম্মের জন্য কাহারও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। ধর্ম্ম হিসাবে খ্রীষ্টধর্ম্মকে বা কোন ধর্ম্মকেই আমি অশ্রদ্ধা করি না। আমি দেশের দিক হইতে বলিতেছি, জাতীয়তার দিক হইতে বলিতেছি। আজ দেশের সমুদয় চিন্তাশীল ব্যক্তিই একটি কথা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছেন, "হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান না হইলে ভারতের কল্যাণ নাই।" এই হিন্দু মুসলমান সমস্যার জন্য দায়ী কে? হিন্দুরাই নহে কি? যখন মুসলমানরা এদেশে আসিয়াছিল তখন তাহাদের কয়জনই বা এদেশে স্থায়ীভাবে বাস করিয়াছিল। ভারতের প্রায় সমুদায় মুসলমানই ত এককালে হিন্দু ছিল। কেন তাহারা মুসলমান হইল? কেন ইহারা হিন্দু-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে এবং এই হিন্দু মুসলমান সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে? এর জন্য দায়ী কে? বলা যাইতে পারে, উচ্চবংশের হিন্দুরা কখনও স্বেচ্ছায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে না। হইতে পারে ইহা সত্য কথা। হিন্দুসমাজ তাহার নিম্ন শ্রেণীকে আপন গণ্ডীর মধ্যে রাখিতে পারেন না কেন? কেবল দল ছাড়া নয়, প্রতিপক্ষের দল বৃদ্ধি করা। এই সব দেখিয়া মনে হয়, আজ হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান ত হইতেছেই না, উপরন্তু আবার খ্রীষ্টান সমস্যা নামক তৃতীয় সমস্যা ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে। হিন্দুসমাজ আর কত কাল ঘুমাইবেন? এতদিনে অন্ততঃ ঠেকিয়াও শেখা উচিত ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের বিষয় চিন্তা করিয়া কোন কূলকিনারা পাই না। সুধিগণের উপদেশ ও সহানুভূতি পাইবার আশাতেই এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। কাছাড়, মণিপুর, লুসাই পাহাড়ের শত শত বর্গ মাইল ধরিয়া কেবল পাহাড় এবং এই পাহাড়ে হাজার হাজার পাহাড়ী লোক বাস করিতেছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে উহারা কিরূপ ভাবে দিন দিন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দেশের নিকট পর হইয়া যাইতেছে, তাহা কেহই বুঝিতেছেন না।

পাহাড়ীরাও বুঝিতেছে না। কিন্তু কালে এর ফল বিষময় হইবে এবং সেই বিষময় ফল সমগ্র দেশবাসীকেই ভোগ করিতে হইবে। ইহারা চিরকালই অসভ্য থাকিবে না। এখনও সময় আছে। এখনও দেশবাসীরা ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে টানিয়া লইতে পারিবেন। বিশেষতঃ পাহাড়ীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা কমিয়া গিয়াছে। প্রচারকগণের চরিত্রই বোধ হয় এর জন্য দায়ী। খ্রীষ্টানদের মধ্যে অনেকেই আজকাল নাম কাটাইয়া লইতেছে। ইহারা এখন বাহিরের কোন জিনিষ চাহিতেছে। এখনই যদি উহাদিগকে শিক্ষা ও ধর্ম্ম দিয়া সাহায্য করিতে কেহ অগ্রসর হন তবে যথার্থ উপকার হইবে। একটা অবলম্বন ভিন্ন কেহ থাকিতে পারে না। আমাদের মধ্যে যাহারা মিশনারী আন্দোলনে যোগ দেয় নাই বা একবার যোগ দিয়া সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে তাহারা আজ দেশবাসীর নিকট হইতে সারবান কিছু চাহিতেছে। কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া যদি কিছু না পায়, তবে "পুনর্মূষিক" হইয়া যাইবে।

নিষ্কলঙ্ক

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভাদ্রের অপরাহ্ন। বেলা পাঁচটা। দুঃসহ গরম। পাথর-বাঁধা সহরের পথ ও বাড়ীগুলো হাপরের মত গরম নিঃশ্বাস ছাড়ছে। চূণকাম-করা সাদা দেয়ালে রোদের আভা যেন চোখ ঝলসায়। পথের পাশে বকুল দেবদারুর দীঘল ছায়া যেন শীর্ণ, ক্লান্ত, আতপতপ্ত। দূরে অচল নদীজল সূর্য্যালোকে পাণ্ডুর, মৃতের মত স্তব্ধ।

সহরের এক নাট্যমন্দিরে স্থানীয় কয়েকজন ব্যারিষ্টার সম্মিলিত হয়েছেন। ছোট একটি কমিটি। কিছুদিন আগে ইহুদীদের ওপর অযথা বিষম অত্যাচারে যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের সম্বন্ধে সুবিচারের ব্যবস্থাই কমিটির উদ্দেশ্য। কমিটির সভ্যেরা সকলেই যুবা, উদীয়মান আইনজীবী। কর্ত্তব্যপরায়ণ, সজ্জন। যিনি যেখানে স্থান পেয়েছেন, সেখানেই বসেছেন—কেউ বেঞ্চে, কেউ বা ছোট একটা পাথরের টেবিলে—আর সভাপতি আসীন শূন্য "কাউণ্টারের" ভিতর দিকে। শীতকালে অভিনয়ের অবকাশে এখানে চা, কফি প্রভৃতি বিক্রী হয়।

বাইরে পথের কলরবে, রৌদ্রতাপে ও গরম হাওয়ার ঝাঁজে ব্যারিষ্টারদল অবসন্নপ্রায়। তদন্তের কাজ যেন গড়িয়ে চলেছে। সভ্যেরা কেবল উদাসীন নয়, ক্রমে যেন বিরক্ত হয়ে উঠছেন।

মনে মনে সবাই বাড়ীর কথা ভাবছেন। একবার এখানকার দরজার বাইরে পা বাড়াতে পারলে হয়—তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে অবিলম্বে বস্ত্রত্যাগ ও স্নান—দীর্ঘ স্নান। ভাবতেও যেন শরীর জুড়িয়ে যায়, দেহে যেন নববলের সঞ্চার হয়।

সভাপতি বোধ হয় এমনই একটা কিছু ভাবছিলেন—অধীরভাবে কাগজপত্র নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন—"আজকার কাজ সম্বন্ধে বোধ করি একটা বিবৃতি লিখতে হবে—অবশিষ্ট করণীয়·····"

কথা শেষ হবার আগেই তিনি শুনলেন দলের সর্ব্ব-কনিষ্ঠ সভ্যটির স্পষ্ট অথচ অনুচ্চ স্বগতোক্তি—"অবশিষ্ট করণীয় শীতল পানীয়···"

পদমর্য্যাদার সম্মান রাখবার জন্য সভাপতি তরুণ সভ্যটির দিকে কটাক্ষ হানলেন, কিন্তু হাসি চাপতে পারলেন না। সভা ভঙ্গ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তিনি সেই কথা বলতে উঠছেন, এমন সময় দরোয়ান এসে জানাল যে, সাতজন লোক বাইরে অপেক্ষা করছে। তাদের কি একটা জরুরী আরজী আছে।

আবার আরজী! সভাপতি অধীর দৃষ্টিতে সভার দিকে চাইলেন। "কি করা যায়?" সভাপতির প্রশ্ন

উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সভা সরব হয়ে উঠল। "আজ আর নয়!" কেউ বললে, "লিখিত দরখাস্ত পেশ করুক!" "যদি শীগগির শেষ করতে পারে—তবে!" "আর সময় পেলে না!"

সভাপতি কর্ত্তব্য স্থির করে ফেললেন, মাথা নেড়ে জানালেন, "তাদের আসতে বল।" পরে দরোয়ানকে ডেকে বললেন, "আমায় একগ্লাস সরবৎ—ঠাণ্ডা…"

দরজার বাইরে দরোয়ান ডাকল, "আপনারা ভিতরে যান, হুকুম হয়েছে।"

অদ্ভুতদেহ বিচিত্রবেশ এক অপূর্ব্ব অপ্রত্যাশিত মিছিল দরজায় দেখা দিল। দলের প্রথম ব্যক্তিটি দীর্ঘকায়, সবল ও সুবেশ। মুখ চোখের ভঙ্গী বেশ আত্মস্থ। প্যাঁসনে চশমা, জামায় রক্তগোলাপ, হাতে রূপা-বাঁধান আবলুসের ছড়ি ও নীল সিল্কের রুমাল। পরের ছয়জনকে দেখলে মন অসোয়াস্তিতে ভরে যায়। এমন বিরূপ অসঙ্গতি একসঙ্গে চোখে হঠাৎ পড়ে না। যেমন তেমন করে সংগ্রহ-করা জামা-কাপড় নয়, মনে হয় তাদের হাত পা, শরীরের অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তাদের নিজেদের নয়—যেমন তেমন করে সংগৃহীত, বিপর্য্যয় জোড়াতালির বৈষম্যের একটি স্তূপ। বয়স কারও খুব বেশী নয় অথচ প্রত্যেককে দেখলে বোঝা যায় যে, সংসার-সমুদ্রের অনেক বন্দরেই তারা ভিড়েছে। তাদের ব্যবহার অকুণ্ঠ, ভাবভঙ্গী বেশ সহজ, অথচ তারই তলে তলে যেন গোপন দুষ্টুমির ছাপ রয়েছে।

দলপতি নমস্কার জানিয়ে ধীর শান্ত কণ্ঠে বললে—"সভাপতি মহাশয়?"

পরিচয় দিয়ে সভাপতি প্রশ্ন করলেন,—"আপনাদের আরজী?"

রক্তগোলাপধারী ধীরোদাত্ত কণ্ঠে বললে, "আমরা—আপনাদের সামনে উপস্থিত এই ব্যক্তিবর্গ (এই বলে সে তার বন্ধুদের পানে হাত বাড়াল)—আমরা সকলে সম্মিলিত রষ্টভ-কারকভ-ওডেশা নিকোলেইভ তস্কর-সমিতির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরূপে আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি।"

তরুণ আইনজীবীর দল যে যার আসনে নড়ে বসল। সভাপতি নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ দুটো ভাল করে মেললেন। বিস্মিতকণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন, "সমিতি? কিসের সমিতি?"

দলপতির শান্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল, "তস্কর-সমিতি। আমার এই বন্ধুগণ আমায় তাঁদের মুখপাত্র নির্ব্বাচন করে বিশেষ সম্মানিত করেছেন।"

"বেশ…বেশ—" সভাপতি ভেবে ঠিক করতে পারলেন না, এ ক্ষেত্রে তাঁর কি বলা উচিত।

"ধন্যবাদ! আমাদের দলের এই সাতজনই সাধারণ চোর, অবশ্য প্রত্যেকের কাজের ধারা ভিন্ন।" পরে আবার সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে দলপতি বললে, "আমাদের সমিতি আপনার এই মহামান্য সভার কাছে সাহায্য ভিক্ষার জন্য আমাদের পাঠিয়েছেন।"

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না…বাস্তবিক… ব্যাপার যে কি…" সভাপতি নিতান্ত নিরুপায় ও অসহায়-ভাবে হাত নাড়তে লাগলেন, পরে বললেন, "আচ্ছা, আপনার বক্তব্য শেষ করুন।"

"যে ব্যাপারে, সাহসে ও শ্রদ্ধায় আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি, তা যেমন স্পষ্ট, তেমনি সহজ, আর তেমনি সংক্ষিপ্ত। আমি পাঁচ সাত মিনিটের বেশী আপনাদের বহুমূল্য সময় নষ্ট হতে দেব না। সে কথা আগে থেকেই আপনাদের নিবেদন করছি, কারণ বেলাও পড়ে এসেছে আর গরম ১১৫ ডিগ্রির মাত্রা বুঝি বা ছাড়িয়ে যায়।" বক্তা এই কথার পর পকেট থেকে সোনার সুন্দর দামী ঘড়িটা বার করে তার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। "আপনারা বোধ করি লক্ষ্য করেছেন যে, ইহুদীদের উপর অকথ্য অত্যাচারের শেষদিকের বীভৎস দিনগুলির সম্বন্ধে খবরের কাগজে যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে বহুবার এ ইঙ্গিত আছে যে, পুলিসের পয়সার লোভে অত্যাচারীদলের মধ্যে সমাজের নিম্নস্তরের বহু জীবের সঙ্গে সহরের চোরেরাও যোগ দিয়েছিল। সে দলে ছিল সহরের যত গুণ্ডা, মাতাল, বেকার, ভবঘুরে, ভিখিরী, ও বস্তির বাসিন্দা—কাগজের বিবরণে যথেষ্ট আভাস আছে যে, এ দলে না কি চোরেরও অভাব ছিল না। প্রথমে আমরা চুপ করে ছিলুম। কিন্তু

পরে ভেবে দেখেছি যে, সমস্ত শিক্ষিত সমাজের এই গুরুতর ও অন্যায় নিন্দার প্রতিবাদ নিতান্ত প্রয়োজন। আমি একথা বেশ ভাল করেই জানি যে, আইনের চোখে আমরা অপরাধী—আমরা সমাজের শত্রু। কিন্তু দয়া করে একবার এই সমাজ-শত্রুর কথা ভেবে দেখুন। যে-অপরাধে সে আজ সরাসরি নিন্দিত, সে-অপরাধ সে কোনদিনই করেনি; কেবল তাই নয়, সে অপরকেও এই পাপকাজে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বাধা দিতে প্রস্তুত। একথা বোধ করি বলা বাহুল্য যে, সাধারণ নাগরিকের চেয়ে এ অন্যায় নিন্দা ও অপমান তার বেশী করেই বাজবে। কিন্তু আমি স্পষ্টই জানাতে চাই যে, এই নিন্দার মূলে কোনো ভিত্তি নেই—না তথ্যের, না যুক্তির। দুচার কথায় আমার বক্তব্য আমি প্রমাণ করে দেব, অবশ্য মাননীয় সভ্যেরা দয়া করে যদি শোনেন।"

"বলুন", সভাপতি বিনা দ্বিধায় অনুমতি দিলেন।

"শুনতে চাই", "বেশ বলছেন", "বলে যান"—ব্যারিষ্টারদলের আগ্রহ ও সজীবতা এই রকম নানা উক্তিতে প্রকাশ হ'ল।

"আমার বন্ধুদলের মুখপাত্ররূপে আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের ব্যবসা হয় ত ঠিক ভদ্রজনোচিত নয়, কিন্তু বিপদসঙ্কুল নিশ্চয়ই; বাস্তবিক আমাদের কথা শুনলে আমাদের জন্যে সময় নষ্ট করেছেন বলে কোনদিন অনুতাপ হবে না। যাই হোক্, প্রাচীন ভাষায় যাকে বলে 'অবধান করুন।' কিন্তু সভাপতি মহাশয়, বেয়াদবি মাপ করবেন, গলাটা একটু ভিজিয়ে নিতে চাই।" দলপতি এই বলে দরোয়ানকে ডেকে ঠাণ্ডা সরবতের হুকুম দিল। পরে বললে, "আমি অবশ্য আমাদের ব্যবসার নৈতিক তত্ত্ব বা সামাজিক প্রয়োজনীয়তার বিচার করব না। আপনারা নিশ্চয়ই ফরাসী পণ্ডিতের ব্যঙ্গোক্তি জানেন। 'সম্পত্তি মাত্রেই চোরাই মাল!' কথাটা ব্যঙ্গ নিশ্চয়ই, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সম্পত্তির মালিক কেউ তো কথাটা উড়িয়ে দিতে পারলে না! এই ধরুন না—বাপ হয় তো নানা ফিকিরে লাখ টাকা জমিয়ে গেল; পেল কে?—না, তার বোকা, রোগা, আলসে, হাবা ছেলেটা—নিতান্ত হতভাগা, পরোপজীবী। লাখ টাকা জমা মানে কি? লাখ দিনের অন্নবঞ্চিত বহু লোকের হাড়ভাঙা পরিশ্রম-ফলে অন্যায় দাবি তো? কেন? কোন যুক্তির বলে? এ যুক্তি তো কারও জানা নেই। কাজেই, একথা কেন আপনারা স্বীকার করবেন না যে, আমাদের ব্যবসা হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের অতিরিক্ত সঞ্চয়ের প্রতিকার—বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় সম্পত্তি-লোভীর সৃষ্ট মানুষের অমানুষিক পরিশ্রম, অকথ্য অপমান, অবিচার ও অবহেলার প্রতিবাদ! একথা অস্বীকার করা চলবে না যে, আজই হোক বা কালই হোক, সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটবেই। বর্ত্তমান ব্যবস্থা সেদিন অচল হবে, দুঃখময় স্মৃতির মরণ-গহ্বরে সেদিন সম্পত্তির লোপ হবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাব আমরা—এই সম্পত্তি-পরিবেষ্টার দল···"

বক্তা একটু থেমে, দরোয়ানের হাত থেকে সরবতের গ্লাসটা নিয়ে টেবিলে রেখে দিল। "মাপ করবেন····আচ্ছা ভাই, এটা নিয়ে যাও···আর যাবার সময় দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিও।"

"জী, হুজুর"—দরোয়ানের কথার মধ্যে বিদ্রূপের স্বর বেজে উঠল।

সরবৎ-পানে পরিতৃপ্ত হয়ে দলপতি বক্তব্য সুরু করলে, "যাই হোক, আমি এ ব্যাপারের দার্শনিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক আলোচনায় আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাব না। কিন্তু একথা আমি বলবই যে, আর্ট বলতে যা বোঝায়, আমাদের ব্যবসাতে সেই জিনিষটি আছে। শিল্পসৃষ্টির উপাদান যা-কিছু, এর মধ্যে তার অভাব নেই। প্রেরণা, কল্পনা, উদ্ভাবনী শক্তি, উচ্চাশা—যাই বলুন—আর সেই সঙ্গে আছে বিজ্ঞান আয়ত্ত করবার বিপুল ধৈর্য্য, সুদীর্ঘ সাধনা। এর মধ্যে নেই যাকে আপনারা বলেন নীতি। আমার নিবেদন, আপনারা বিশ্বাস করুন, বাজে কথা বলে আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করবার আমার আদৌ প্রবৃত্তি নেই। কিন্তু আমার কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলতে চাই। বাইরের লোকের কাছে চোরের সাধনার কথাটা বাজে ও হাস্যকর হতে পারে, কিন্তু এ সাধনা কি সত্য নয়? আমাদের মধ্যে এমন লোকের সাক্ষাৎ মেলে

যার মধ্যে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও ভ্রমহীনতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, হস্তকৌশল—এ সব শক্তির অপূর্ব্ব সমাবেশ হয়েছে। সেই সঙ্গে আবার এমন স্পর্শগুণ আছে যে, তার কাজ দেখলে মনে হয়, ভগবানের রাজ্যে শুধু 'হাত সাফাই' করবার জন্যেই তার সৃষ্টি। পকেট-মারা যার ব্যবসা—তার আছে অব্যর্থ সন্ধান, ক্ষিপ্রকারিতা, লঘু কোমল পরশ, তা ছাড়া উপস্থিতবুদ্ধি, চারদিকে সমান নজর রাখবার অপূর্ব্ব শক্তি। কেউ কেউ আবার যেন সিন্দুক ভাঙবার জন্যেই জন্মেছে বলে মনে হয়। তারা ছেলে-বেলা থেকেই নানা রকম কলকব্জা নিয়ে মেতে আছে—হাতের কাছে যা পায়, ঘড়ি বা বাইসাইকেল, স্প্রিংয়ের খেলনা বা সেলায়ের কল, সব তাতেই যন্ত্র-সংযোজনা জানবার তাদের অদম্য আগ্রহ। তা ছাড়া এমন লোকেরও অভাব নেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর যাদের জন্মাবধি বিদ্বেষ।

"আপনারা অবশ্য এ সব নৈতিক অবনতি বলে নিন্দা করতে পারেন, কিন্তু আসল চোরকে পথভ্রষ্ট করবার ক্ষমতা কি আপনাদের আছে? চুরিই যার আজন্মবৃত্তি, তাকে কি কোনদিন বাঁধা কাজ দিয়ে, টাকার লোভ দেখিয়ে বা নারীর প্রেম দিয়ে ভদ্র জীবনের অচল ব্যবস্থায় আটকে রাখা যায়? এর কারণ কি? কারণ এই, সে ভালবাসে বিপদের চিরন্তন সৌন্দর্য্য, তার জীবনে আছে সর্ব্বনাশের ভীষণ মোহ, ভয় উদ্বেগের নিত্য অপূর্ব্বতা, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জীবনের দুর্দ্দম স্পন্দন—বিরাট উল্লাস! সর্ব্বাঙ্গে রক্ষাকবচ বাঁধা আপনাদের জীবন—আইন আছে, তালা চাবি, টেলিফোন, গুলি-গোলা, পুলিশ পল্টন···কত কি! আর আমরা বাঁচি আমাদের দক্ষতায়, চাতুর্য্যে আর ভয়হীনতার জোরে। আমরা যেন শেয়াল, আর সমাজ যেন কুকুর-পাহারায় হাঁসের পাল। আপনারা কি জানেন যে, গ্রামের শক্তিশালী ও শিল্পকুশল লোকমাত্রেই এই ব্যবসাতে চলে আসে। করবেই বা কি? শক্তিমানের পক্ষে সমাজবদ্ধ খর্ব্ব ক্ষুদ্র বৈচিত্র্যহীন জীবনে স্ফূর্ত্তি কোথায়?

"প্রেরণার কথাই বলি—মাঝে মাঝে কাগজে আপনারা এমন সব চুরির কথা পড়েন যা কল্পনায় ও কাজে অমানুষী বলে' আপনাদের ধারণা হয়। খবরের কাগজে সেগুলোর 'হেডিং' দেয় 'বিস্ময়কর চুরি', কিংবা 'অপূর্ব্ব অন্তর্দ্ধান', বা এই রকম একটা কিছু। কাগজের বিবরণ দেখে সমাজের সাধুসজ্জন বলেন, 'কি ভয়ানক! আহা, যদি এদের শক্তি ভাল কাজে লাগত—এমন উদ্ভাবনী শক্তি, এমন অপূর্ব্ব মানব-চরিত্র-জ্ঞান, এমন আত্মবিশ্বাস, এই দুর্জ্জয় সাহস ও বিচিত্র অভিনয়-দক্ষতা—সমাজের কি উপকারই হ'ত!' এ সজ্জনদের আমি বেশ জানি। পরের কথার জাবর কাটতে এরা বেশ পারে। এই সব বাজে কথা নিয়ত আওড়াবার জন্যেই এরা জন্মেছে। যাক, এদের কথায় সময় নষ্ট করব না, কিন্তু এরা কোনদিনই বুঝতে পারে না যে, প্রতিভা যেখানেই প্রকাশিত হোক, তার মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা সৌন্দর্য্য আছে। উন্নতির একটা নিজস্ব ধারা আছে এবং চুরি-বিদ্যারও অপূর্ব্ব উন্নতি করা সম্ভব!

"পরন্তু বাইরে থেকে যেমন মনে হয়, আমাদের ব্যবসা তত সহজ আর সুখের নয়। এতে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা, নিত্য অভ্যাস, কষ্টকর ও বহুদিনব্যাপী সাধনা বিশেষ দরকার। এর মধ্যে এমন শত শত সূক্ষ্ম কৌশল আছে যা নামজাদা বাজীকরও ধারণা করতে পারে না।

"আমি যে বাজে কথা বলছি না, তা প্রমাণ করবার জন্যে আমাদের কাজের দু-একটা নমুনা আপনাদের দেখাতে চাই।···আশা করি আইনের হাত থেকে বর্ত্তমান সময়টুকুর জন্যে আমরা মুক্ত······।

"একটা কথা—যদি এর পরে বিভিন্ন অবস্থায় আপনারা আমাদের কাউকে দেখেন আর চিনতে পারেন, তখন যেন আপনাদের নাগরিক ও ব্যবসায়িক কর্ত্তব্য করতে ত্রুটি না করেন, এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। কিন্তু আজ আমাদের প্রতি আপনাদের দয়ার কথা স্মরণ করে আপনাদের সম্পত্তি আমরা চিরকালই অস্পৃশ্য—পবিত্র জ্ঞান করব। যাক—এবার কাজ সুরু করা যাক্······"

বক্তা এই কথা বলে' দলের দিকে চেয়ে ডাকলে, "সিসোয়া, দয়া করে একবার এখানে আসুন তো?"

অসুরের মত প্রকাণ্ড এক জোয়ান এগিয়ে এল। একটু কুঁজো-মত লোকটা—লম্বা হাত তুখানা হাঁটু যেন ছাড়িয়ে যায়—কপাল এত ছোট যে দেখাই যায় না—ঘাড় বলে' শরীরে কোন অঙ্গ নেই—মুখে তার বোকার মত হাসি, বিব্রতভাবে সে ভ্রূ খুঁটতে লাগলো। ভাঙা গলায় সে বললে, "এখানে করবার আছে কি ?"

দলপতি সভার দিকে ফিরে বলতে লাগল, "এই সিসোয়াজীর বিশেষত্ব হচ্ছে সিন্দুক, লোহার বাক্স ইত্যাদি টাকাকড়ি রাখবার যত রকম আধার, তা ইনি খুলতে পারেন। রাত্রে কাজের সুবিধা করবার জন্তে ইনি মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক কারেণ্ট দিয়ে ধাতু গলিয়ে ফেলেন; তুঃখের বিষয়, এখানে এমন কিছু নেই যাতে এঁর বাহাতুরী প্রকাশ পায়। যেমন জবরদস্ত তালা হোক না কেন ইনি অবলীলায় খুলতে পারেন···আচ্ছা এই দরজাটা তো বন্ধ রয়েছে···"

পাশের একটা দরজার দিকে সবার চোখ পড়ল—তার উপরে বড় হরফে লেখা—"সাজঘর—প্রবেশ নিষেধ।"

সভাপতি বললেন, "হুঁ, দরজাটা তো বন্ধই দেখছি।"

দলপতি সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, "বেশ; সিসোয়া বাবুজী—দয়া করে একবার···"

সিসোয়া অলসভাবে বললে, "আরে এর আবার···"

পরক্ষণেই সে দরজার কাছে গেল। খুব সাবধানে সেটাকে নাড়া দিলে, পকেট থেকে চকচকে কি একটা ছোট যন্ত্র বার করলে, তার পর দরজার কলে কয়েকটা সামান্ত খুটখাট করে' বড় দরজাটা সটান খুলে ফেললে।

সভাপতি ঘড়ি-হাতে বসেছিলেন—ব্যাপারটা দশ সেকেণ্ডেই শেষ হ'ল।

দলপতি হেসে বললে, "বহুত আচ্ছা বাবুজী! আপনি এবার বিশ্রাম করুন।"

সভাপতি একটু ভয় পেয়েছিলেন। তিনি বললেন, "অবশ্য ব্যাপারটা খুবই চমৎকার, কিন্তু আপনার বন্ধু কি দরজাটা ফিরে বন্ধ করতে পারেন ?"

"মাপ করবেন—কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম।" দলপতি বিনীত উত্তর দিয়ে আবার সিসোয়াকে ডাকলে। সে যেমন নিঃশব্দে কপাটখানা খুলেছিল, তেমনি অলক্ষ্য-কৌশলে ত্বরিতে বন্ধ করে দিল। তারপর লম্বা তুখানা বাঁকা ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়ে থপ থপ করে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

"এইবার আমার আর এক বন্ধুর কৃতিত্ব দেখাব। ইনি রেল-ষ্টেশনে বা থিয়েটারে লোকের পকেট মারেন।" বক্তা বন্ধুটির দিকে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "আমার এ বন্ধুর বয়স এখনও খুব কম, তবে এঁর বর্ত্তমান কাজ দেখে আপনারা বেশ বুঝতে পারবেন যে, রীতিমত সাধনায় এঁর ভবিষ্যৎ কি বিরাট ও অদ্ভুত হতে পারে। ইয়াসা "

ডাক শুনে ইয়াসা এগিয়ে এল। রং সামান্ত ময়লা, গায়ে নীল রেশমের জামা, পায়ে চকচকে নরম চামড়ার বুট। বেদের মত তার পোষাক, পালোয়ানের মত দম্ভ-ভরা চলার ভঙ্গী, একচোখে ঈষৎ ভ্রূকুটি।

দলপতি আবার সভার দিকে ফিরে বললে, "যদি আপনাদের মধ্যে কেউ দয়া করে একবার পরীক্ষার জন্তে উঠে আসেন তবে যথেষ্ট বাধিত হব। আশা করি আমায় বিশ্বাস করবেন—এ শুধু খেলা দেখানো—আপনাদের লোকসানের কোনো ভয় নেই।"

দলের মাঝ থেকে ভাঁটার মত বেঁটে মোটা এক অল্প-বয়সী ব্যারিষ্টার উঠে এল। দলপতির দিকে ফিরে হাসি-মুখে বললেন, "আজ্ঞে আমি প্রস্তুত।"

ইয়াসা এতক্ষণ একমনে তার রেশমের দড়ি-জড়ানো কোমরবন্ধের মোটা ঝুরিটা নিয়ে খেলা করছিল, এবার সে ব্যারিষ্টারের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তার বাঁ হাত ঢেকে একখানা বড় রেশমী রঙ্গীন রুমাল ঝুলছে।

"মনে করুন আপনি ষ্টেশনে কাউকে তুলে দিতে গেছেন কিংবা কোথাও ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন—" ইয়াসা ব্যারিষ্টারের সঙ্গে কথা বলতে সুরু করল। গলাটি তার ভারি নরম, কথার অবাধ গতি। —"দেখেই বুঝলুম 'মাল'—কিছু মনে করবেন না, ধরুন আপনিই যেন 'মাল'—না না, আমি অন্যায় কিছু বলিনি! আমাদের ভাষায় শাঁসাল লোক যার কাছে কিছু পাবার আশা রাখি—কি পাব তা ঠিক নেই, তবে একবারে যে ভুয়ো নয় এই আর কি!

'মালের' কাছে থাকে কি ? কত কি—অন্য কিছু না থাকে তো ঘড়ি চেন। আচ্ছা তা রাখে কোথায় ? টাকার ব্যাগ— সেই বা থাকে কোন্ পকেটে ? কারও বা আবার সিগারেট কেস—সোনার, রূপার—আচ্ছা পকেট কটা ?··· এখানে, এখানে এই একটা, আর···এমনি করে হিসাব করে কাজে লাগতে হয়···"

ইয়াসা সপ্রতিভভাবে কথা বলছিল, জলজলে চোখদুটো ছিল ব্যারিষ্টারের চোখের উপর। শেষের কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে সে অত্যন্ত দ্রুত ভদ্রলোকের শরীরের স্থানগুলো নির্দ্দেশ করছিল—কি কৌশলপূর্ণ তার ভঙ্গী।

"তা ছাড়া বুকে একটা পিন থাকে—টাইপিন— আমরা অবশ্য সে সব ছুঁই না—আজকালকার যে সব ভদ্রলোক—আসল পাথর তো কেউই পরে না! যাক— আমি তখন তার কাছে এগিয়ে যাই—ভদ্রলোকের মত তার সঙ্গে কথা জুড়ে দিই—পায়ে পা ঠেকিয়ে আলাপ আর কি! বলি, মশাই দয়া করে দেশলাইটা একবার··· এমনি কিছু তারপর···তার মুখের দিকে সোজা চেয়ে থাকি·· এই এমনি করে···আর···দুটি আঙুল—ব্যস্—এই দুটি আঙুল—এই আর এই···" ইয়াসা এই বলে ব্যারিষ্টারের মুখের কাছে মাঝের দুটো আঙুল নানা ভঙ্গীতে নাড়তে লাগল।

"দেখলেন তো ? খালি দুটো আঙুলে যা কিছু—এতে অদ্ভুত কিছু নেই—রাম, দুই, তিন—ব্যস্···একেবারে বোকা না হ'লে এ শিখতে আর ক'দিন। যা-কিছু কায়দা এইমাত্র—এর আর অদ্ভুত কি! আচ্ছা, নমস্কার।"

ইয়াসা অভিবাদন জানিয়ে একটু টাল খেয়ে গেল, যেন কাজ শেষ করে নিজের জায়গায় গিয়ে বসবে।

"ইয়াসা!" দলপতি বেশ জোর করে ডাকলে। তার ডাকের যেন একটা অর্থ ছিল। সাড়া নেই। আবার দলপতি ডাক দিল, এবার স্বর যেন একটু কঠোর।

ইয়াসা থামল। সে ব্যারিষ্টারের দিকে পিছন ফিরে ছিল—দলপতিকে যেন অনুনয়ে কি জানাল, কিন্তু দলপতি কঠোর দৃষ্টিতে মাথা নাড়ল।

"ইয়াসা!"—দলপতির কণ্ঠে রাগের ঝাঁজ।

"ধ্যাৎ!"—ইয়াসার মুখে ঈষৎ বিরক্তি। সে এবার ব্যারিষ্টারের দিকে চেয়ে বললে, "আপনার ছোট ঘড়িটা দেখুন তো, মশাই?" কণ্ঠ তার তীক্ষ্ণ।

ব্যারিষ্টারের যেন হঠাৎ চেতনা এল—"তাই তো!"

"এই তো এখন বলছেন 'তাই তো'"—ইয়াসা যেন ব্যারিষ্টারের বোকামিতে বিশেষ রেগেছে—"আপনি যখন আমার ডান হাতের আঙুলের তারিফ করছেন, ততক্ষণে বাঁ হাতে·· সে দুটো আঙুলেই এই রুমালের তলায়। এইজন্যেই রুমালটা ঝোলান। আমি অবশ্য আপনার চেনে হাত দিই নি—ওটি কোনো মক্কেলের দান—বাজে মাল—ঘড়িটি সোনার, তাই নিজে রেখেছি —আর হারানো ঘড়ির স্মৃতির জন্যে চেনটি আপনার পকেটে—" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ইয়াসা ঘড়িটা ফিরিয়ে দিল।

ব্যারিষ্টার হতভম্ব। অপ্রতিভভাবে বললে, "খুব বাহাদুরী···হ্যাঁ···আমি একটুও জানতে পারিনি।"

ইয়াসা সদর্পে বললে, "এই তো আমাদের কায়দা।" হেলে দুলে সে সঙ্গীদের মাঝখানে ফিরে গেল।

এই অবসরে বাকি সরবৎটুকু একনিঃশ্বাসে শেষ করে দলপতি সভাকে সম্বোধন করলে, "এবার একটু নতুন খেলা দেখুন—তিনটি তাসের—টেক্কা, ছক্কা, বিবি—তে-তাসের কেরামতি—রেলে ষ্টীমারে মেলায় যা চলে মাত্র তিনখানি তাসে সহজে—কিন্তু আপনারা বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন···"

"না না, সে কি! খুব চমৎকার!"—সভাপতি সস্মিত-ভাবে সভার মনোভাব প্রকাশ করলেন। "তবে আমার একটা প্রশ্ন আছে—অবশ্য যদি কিছু মনে না করেন— আপনার বিশেষত্ব কি?"

"বিলক্ষণ······আমার বিশেষত্ব—না, এর আর মনে করবার কি আছে—আমি এই হীরে মুক্তোর দোকান, আর ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক······" বক্তার কথাগুলো মৃদু হাসিতে মিলিয়ে গেল। "অন্য কাজের চেয়ে এটা যে সোজা তা যেন ভাববেন না। তা মন্দ কি, গোটাচারেক ভাষা শিখেছি—জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরেজী ও ইটালিয়ান, তা-ছাড়া অপভ্রংশ দু'চারটে ভাষার সঙ্গেও পরিচয় রাখতে

হয়। • যাক্, সভাপতি মশায়, আরও দুএকটা খেলা দেখবেন কি ?"

সভাপতি একবার ঘড়িটি খুলে দেখলেন। "দুঃখের বিষয়, সময় বড় সংক্ষেপ। তার চেয়ে আপনাদের বক্তব্যটা কি, সেইটে আলোচনা করলে ভাল হয় না ? কারণ, আপনারা যে-সব খেলা দেখালেন তাতে আপনাদের গুণের তো যথেষ্ট পরিচয় পেলুম···কি বলেন ?"—সভাপতি এই বলে ঘড়ি-হারান ব্যারিষ্টারের দিকে চাইলেন।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি সায় দিলেন, "সে আর বলতে ···"

দলপতি যেন দয়া করে এঁদের কথাটা মেনে নিলেন—"বহুৎ আচ্ছা, বড়বাবু, আপনার যন্ত্রপাতি রেখে দিন, ওগুলোর আর কোনো দরকার নেই।" শেষের কথাগুলো তিনি যাকে বললেন তাঁর মাথা-ভরা কোঁকড়া চুল, হাসি হাসি মুখ······আদুরে ছেলের ভঙ্গীতে হেলেদুলে সে নিজের জায়গায় চলে গেল।

দলপতি এবার সভাকে সম্বোধন করে বললে, "আর গোটা-দুই কথা বলে নিতে চাই। আশা করি এতক্ষণে আপনারা বেশ বুঝেছেন, সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের মনঃপূত না হলেও আমাদের এই কর্ম্মকৌশলে আর্টের অভাব নেই, এবং আমার বিশ্বাস এ বিষয়ে আমার সঙ্গে আপনারা একমত যে, এই কলা আয়ত্ত করতে বহুবিধ গুণের সবিশেষ প্রয়োজন। এ ছাড়া, দারুণ পরিশ্রম আছে, বিপদ-আপদ আছে,ভুল বোঝবার সম্ভাবনা আছে। শেষ কথা হচ্ছে যে, আপনাদের বোধ হয় এবার বিশ্বাস হয়েছে যে, বাইরে থেকে দেখলে বা হঠাৎ শুনলে যতই অদ্ভুত মনে হোক, এ কর্ম্মকৌশলে লোকের প্রীতি থাকা সম্ভব—একাজে কর্ম্মীর একটা শ্রদ্ধা থাকা সম্ভব। মনে করুন দেখি যে, বিখ্যাত মাসিকের পাতা ছাড়া যাঁর কাব্য সাহিত্য প্রকাশিত হয় না, দেশের এমন কোনো শক্তিমান নামী কবিকে যদি লাইন-পিছু এক আনা দাম ধরে কবিতা লিখতে বলা হয়—তাও আবার 'মাধুরী' বিড়ির বিজ্ঞাপন ; কিংবা যদি এই কথা রটনা হয় যে, আপনাদের মত নামী ব্যারিষ্টারদের কেউ বিবাহচ্ছেদ মামলার জাল সাক্ষী তৈরী করেছেন কিংবা তাড়িখানার মালিকের কাছে গাড়োয়ানদের আর্জ্জি লিখে দিয়েছেন—এটা ঠিক যে আপনাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কেউই সে কথা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু কুৎসা একবার রটলে তার বিষ ত ছড়িয়ে যায়, আর আপনাকে সেই বিষাক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার সব কষ্টটুকুই পেতে হয়। এই-বার ভাবুন দেখি—এই রকম একটা জঘন্য ও বিরক্তিকর কুৎসা আপনাদের সুনামের বুক চেপে বসেছে—শুধু তাই নয়, আপনাদের স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করে তুলেছে··· ··

"আমাদের—চোরদের—আজ এই দশাই হয়েছে—খবরের কাগজে আমাদের নামে এমনই কুৎসা রটনা হচ্ছে। কথাটা খুলে বলছি—সমাজের নিম্নস্তরে একদল নিতান্ত নচ্ছার লোক আছে—আমরা তাদের বলি 'গডাচর চন্দর'—দুঃখের বিষয়, সাধারণ লোকে তাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ ধরতে পারে না। এই 'গডাচর চন্দর' দলের না আছে লজ্জা, না আছে বিবেক—চরিত্রহীন আঘাটার জঞ্জাল, অশিক্ষিত, অভব্য অকর্ম্মার দল—চুরি করবার না জানে কৌশল, না আছে তার শিক্ষা, না তার সাধনা। বেশ্যার ঘাড়ে চেপে তাদের পয়সায় খেতে এদের কোনোদিনই ঘৃণা বাধও হয় না। দুটো পয়সার লোভে অন্ধকার গলিতে ছোটছেলের গলা টিপ্‌তে এরাই পারে—ঘুমন্ত লোককে খুন করে বুড়ীর ওপর অত্যাচারে প্রবৃত্তি শুধু এদেরই—আমাদের পেশাভুক্ত লোকের এরাই হ'ল লজ্জা—চৌর্য্যকলার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও প্রাচীন ঐতিহ্যের কোনো ধারই এরা ধারে না। সিংহের পিছনে দূরে দূরে যেমন শেয়ালের পাল ফেউ লাগে এরা ঠিক আমাদের পিছনে সেই রকম করে ঘুরে বেড়ায়। মনে করুন, বেশ একটা জবর কাজ উদ্ধার হ'ল—বলা বাহুল্য চোরাই মাল যাঁরা বিক্রী করেন তাঁদের তো প্রায় অর্দ্ধেকের ওপর দিতে হ'ল—তারপর, ঘুষবিমুখ অকলঙ্ক পুলিশ আছেন—এদের ভাগ-বাঁটোয়ারা করে যা রইল তা থেকে আবার এই জঞ্জালদের ভাগ দিতে হবে—কেউ হয়ত লোকমুখে শুনেছেন—কেউ হয়ত একচোখে দেখেছেন—কারও বা হঠাৎ সামনে পড়ে গেছি। এই নচ্ছারগুলোকে দিতেই হয়, না হলে হয়ত পুলিশে লাগাবে—

অবশ্য তারা যে পুলিশে লাগায় না তা নয়—প্রাপ্তির আশায় তারা সবই করে—কিন্তু আমরা যারা সৎ—আপনারা কথাটা শুনে হাসছেন—কিন্তু কথাটা না ব্যবহার করে থাকতে পারছি না—আমরা, যারা সৎচোর, এই সব 'বিচ্ছুর' দলকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ঘৃণা করি। তাদের আর একটা নাম আমরা দিয়েছি সেটা বিশ্রী গালাগালি—আপনাদের সাম্‌নে আর সে কুৎসিত কথা উচ্চারণ করব না। হাঁ, বলছিলাম কি, এই জঞ্জালের দল, এরাই কোনো লুট-তরাজ গুণ্ডামির খবর পেলে ছুটে আসে। গুণ্ডামির অপবাদও বুঝি সহ্য হয়, কিন্তু এই নচ্ছারদলের সঙ্গে আমাদের সংস্রব-কল্পনা শতগুণে অপমানজনক।

"ভদ্রমহোদয়গণ, আমি লক্ষ্য করেছি, আমার কথা শুনতে শুনতে বহুবার আপনাদের ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। আপনাদের মনোভাব আমি বুঝি। আমাদের এই আবির্ভাব—আপনাদের সাহায্যের জন্য আমাদের আর্জ্জী, এবং সবচেয়ে তস্কর-সমিতির মত একটা অভুতপূর্ব্ব ব্যাপার—তাদের প্রতিনিধি—তার দলপতি —যারা সবাই চোর সমস্ত জিনিষই এত নূতন, অদ্ভুত যে, শুনলেই হাসি পায়। কিন্তু বহিরঙ্গের বাধা ঘুচিয়ে একবার সমানে সমানে মানুষে মানুষে পরিচয় হয়ে যাক—

"আমাদের দলের সবাই শিক্ষিত, আমরা সবাই বই পড়তে ভালবাসি—আমরা যে কেবল অদ্ভুতকর্ম্মার কাহিনী পড়ি বাস্তব সাহিত্যিকের, একথা ঠিক নয়—আপনারা কি মনে করেন যে, যখন এই অন্যায় জঘন্য অত্যাচার চলছিল তখন ব্যথায় আমাদের বুক ফেটে রক্ত ঝরেনি—লজ্জায় আমাদের মাথা নীচু হয়নি? আপনারা কি সত্যই ভাবেন যে, যখন কসাক সৈন্যের চাবুকে দেশ জর্জ্জরিত হয়ে উঠে—মরিয়া মানুষ উন্মাদ হয়ে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেদিন আমাদের রক্তে আগুন লাগে না? একথা কি আপনারা বিশ্বাস করবেন যে, আমরা, এই চোরের দল, পরম আগ্রহে অসীম আনন্দে অদূরাগত মুক্তির চরণধ্বনির অপেক্ষা করছি!

"জানি—আমরা সবাই জানি—হয়ত আপনাদের মত আইনজীবীদের চেয়ে কিছু কম বুঝি—কিন্তু বেশ জানি এই-সব মারামারির গূঢ় অর্থ কি! কে যে কি উদ্দেশ্যে নিরীহ ইহুদীর উপর অত্যাচারের লোভ দেখিয়ে সাধারণ লোকের জাগ্রত ক্রোধ শান্ত করে তা জানি—এ দলে ও-দলে দাঙ্গা বাধিয়ে দেয় কোন্ সে শয়তান—এবিষম রক্তপাত—কার খেলা এই পিশাচ-প্রবৃত্তি লোকদের রক্ত-স্নানের উৎসব সৃষ্টি?

"কিন্তু এবার শেষ হয়ে এসেছে—আমলাতন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠেছে, তার অঙ্গবিকৃতি দেখতে পেয়েছি! মাপ করবেন, একটা রূপক বলি—

—এক দেশে এক পীঠস্থান ছিল—বিরাট মন্দিরে তার গভীর ক্ষুদ্র গর্ভগৃহে ছিল রক্তপিপাসু এক দেবতা—লোকচক্ষের অন্তরালে কালো আবরণের আড়ালে—পাণ্ডা-পূজারী ঘেরা! একদিন এক দুঃসাহসী দিল সে আবরণ ছিঁড়ে ফেলে। আলো যখন পড়ল, তখন সবাই দেখলে দেবতা সে নয়—অতিকায়, কুৎসিত খাদ্যলোলুপ এক মাকড়সা! লোকেরা তাকে মারবার জন্যে অস্ত্র নিক্ষেপ করলে—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার কেটে কেটে পড়তে লাগল। চরম যন্ত্রণার আবেগে সেই বিশ্রী ভয়ানক জানোয়ারের বীভৎস লোমশ পা-গুলো মন্দিরের চারপাশে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, আর সেই পাণ্ডা-পূজারীর দল—মৃত্যু যাদের অবধারিত—তাদের ভীত কম্পিত হাতে যাকে ধরতে পাচ্ছে, তাকেই সেই রাক্ষসের কবলে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে!

"কিছু মনে করবেন না। যা বল্লুম তা হয়ত উদ্ভট, সামঞ্জস্যহীন। একটু বিচলিত হয়ে পড়েছি—আমায় মাপ্ করুন! যা বলছিলুম—চুরি যাদের পেশা তারা সবাই অন্য সবাইয়ের চেয়ে ভাল করেই জানে কেমন করে ইহুদীদের এই অত্যাচারের ব্যবস্থা হয়। আমরা কোথায় না যাই—বাজারে, চায়ের দোকানে, শুঁড়িখানায়, বস্তীর মাটকোঠায়, থিয়েটারে, গির্জ্জায়—সর্ব্বত্রই আমাদের গতি। ভগবান আর মানুষের সামনে, ভবিষ্যৎ বংশীয়দের মুখ চেয়ে আমরা শপথ করে বলতে পারি কেমন করে পুলিশ এই হত্যা-উৎসবের আয়োজন করে, নিতান্ত নির্লজ্জভাবে—তাদের দুষ্কার্য্য তারা গোপন করবারও চেষ্টা করে না! তাদের মুখ আমরা চিনি—উর্দ্দী পরেই তারা ঘুরুক বা ছদ্মবেশেই ফিরুক। আমাদেরও তারা ডেকেছিল, কিন্তু এমন হীনাত্মা আমাদের মধ্যে কেউ নেই

যে ধনমানের ভয়েও অন্তত মৌখিক সম্মতি জানিয়ে তাদের খুশী করবার চেষ্টা করে!

"আপনারা অবশ্য জানেন, রুশ-সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেরা পুলিশের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে। যারা এই পুলিশের গোপন দুষ্কার্য্যের সাহায্য নেয় তারাও তাদের খাতির করে না। কিন্তু আমরা তাদের তিনগুণ—না দশগুণ ঘৃণা করি—গোয়েন্দা বিভাগের হাতে যন্ত্রণা পেয়েছি বলে নয়—অবশ্য সে যন্ত্রণা শুধু নয়—সে বিভীষিকা—চামড়ার চাবুক—দলের লোককে ধরিয়ে দেবার জন্যে বা স্বীকারোক্তি করাবার জন্যে অমানুষিক প্রহার—সেজন্যেও ঘৃণা করি; কিন্তু আমরা চোরেরা, যারা সবাই জেলে গেছি, আমরা, সবাই স্বাধীনতার উন্মত্ত উপাসক। তাই জেল-রক্ষীদের ওপর আমাদের অসীম ঘৃণা। আমার কথাই বলি। পুলিশ গোয়েন্দারা আমায় তিনবার যে যন্ত্রণা দিয়েছে আমি মরণাপন্ন হয়ে বেঁচেছি। আমার ফুসফুস লিভার একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। এখনও সকালে আমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠে, আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু আমায় যদি কেউ বলে যে গোয়েন্দা পুলিশের বড়কর্ত্তার সঙ্গে হাত মেলালে আমায় আর কোড়া লাগাবে না, আমি তখনি তা অস্বীকার করব!

"আর খবরের কাগজে লেখে যে, এদের কাছ থেকে আমরা টাকা নিয়েছি—জুডাস—কেনা-টাকা রক্তমাখা টাকা! না, কখনও নয়, এ অপবাদ কলঙ্ক আমাদের বুকে ছুরির মত বেঁধে—অসহ্য যন্ত্রণা দেয়। টাকা, শাসন, লোভ—কোন কিছুরই বদলে আমরা ভাড়াটে খুনে সাজতে পারি না—তাদের কাজে সাহায্য করতে পারি না···

"কখনও না···না না···" দলপতির কথায় সায় দিয়ে অন্য সবাই গুনগুন করে উঠল।

"শুধু তাই নয়", দলপতি বলতে লাগল, "আমাদের দলের অনেকেই এই দাঙ্গায় অত্যাচারিতের উপকার করেছে। আমাদের বন্ধু সিসোয়া—ইনি এক ইহুদী-পরিবারে বাস করেন—লোহার ডাণ্ডা নিয়ে একদল ভাড়াটে গুণ্ডার সঙ্গে যুদ্ধ করে সে পরিবারকে রক্ষা করেছেন—একথা ঠিক সিসোয়া বাবুজীর 'তাকৎ' আছে—ওঁর গায়ের জোরের কথা ও-অঞ্চলের সবাই ভাল করেই জানে, কিন্তু সে সময় বাবুজীকে মৃত্যুর সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল।

"এই যে দেখছেন মার্টিন—এই ভদ্রলোক—" দলপতি এই বলে একজনের দিকে আঙুল দেখালেন—পাতলা গড়ন দাড়ি-ওয়ালা একটি লোক—সুন্দর স্বপ্নালস চোখে সে সবার পিছনে দাঁড়িয়েছিল। "ইনি একটী ইহুদী বুড়ীকে ঐ কুত্তাদলের মুখ থেকে বাঁচিয়েছেন—বুড়ীকে ইহ-জীবনে ইনি কোনদিন চোখেও দেখেননি। অথচ এই জন্যে খুনের দল এঁর মাথা ফাটিয়েছে, হাত ভেঙে দিয়েছে, পাঁজরের একটা হাড় চুরমার করেছে—ইনি হাঁসপাতাল থেকে সবে বেরিয়েছেন। আমাদের দলের উৎসাহী সভ্যেরা এমনই কর্ত্তব্য করে থাকেন—অক্ষম যারা তারা কাঁদে—রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে ফুলে ওঠে।

"সেই হত্যা-উৎসবের রক্ত-মাখা দিনগুলো—মশাল-জ্বালানো রাত্রিগুলো কিছুই আমরা ভুলিনি। পথে পথে মেয়েদের সেই বুক-ফাটা কান্না, পথের ধূলায় ছড়ানো ছোট ছেলেমেয়ের খণ্ড বিখণ্ডিত দেহ—কিন্তু এ সবের জন্যে আমরা কোনদিন বিশ্বাস করি না যে, পুলিশ আর রাস্তার লোক এই পাপের মূল। এই সব বোকা ঘৃণ্য জীবগুলো আর এক হাতের অজ্ঞান যন্ত্র—যার পিছনে আছে নীচ মন আর শয়তানী ইচ্ছাশক্তি। চালক সেই।

"একথা সত্যি যে, চোরেরা আপনাদের আইন-গত ঘৃণার উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু আপনাদের মত মহৎ লোকদের যেদিন লড়াই করবার জন্যে চতুর, সাহসী বাধ্য লোকদের প্রয়োজন হবে, বিশ্বের সব চেয়ে মহৎ যে বাক্য—স্বাধীনতা—তার জন্যে যেদিন হাসিমুখে প্রাণ দেবার দরকার হবে, সে দিন কি ঘৃণায় আমাদের দূরে সরিয়ে দেবেন?

"বেশী কথা কি? ফরাসী বিদ্রোহে যে প্রথম প্রাণ আহুতি দিয়েছিল—সে তো এক বেশ্যা! আলগোছে তার পোষাকের প্রান্ত ধরে সে পথে আগড়ের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল 'সৈন্যদের মধ্যে মেয়েকে গুলি করতে কার সাহস আছে?' হায় ভগবান—" বক্তার গলার স্বর হঠাৎ চড়ে গেল—সামনের পাথরের টেবিলের ওপর দুম্

করে এক কীল বসিয়ে সে বললে, "তারা তাকে গুলি করে মেরেছে—কিন্তু মহান তার কীর্ত্তি—মৃত্যুহীন সে বাক্যের সৌন্দর্য্য !"

"যদি সে মহান শুভদিনে আপনারা আমাদের দূরে সরিয়ে দেন, সেদিন আমরা আপনাদের এই প্রশ্ন করব, 'বলি অকলঙ্ক স্বর্গদূতের দল, যদি মানুষের চিন্তার জোরে মানুষের অর্থ-মান প্রতিপত্তি খর্ব্ব হয় তবে আপনাদের মধ্যে কোন্ সরল ঘুঘুটি সরকারের চাবুক আর সারাজীবন দ্বীপান্তর থেকে মুক্তি পাবেন ?' ব্যস্, তারপর আপনাদের ছেড়ে আমরা চলে যাব—নিজেদের চোরেদের মজার আগড় তৈরি করে লড়াই দেব—এমন হাসিমুখে সম্মিলিত গানের সুরের মাঝখানে প্রাণ দেব, তখন হিংসেয় আপনাদের জান্ যাবে—আপনারা, যারা নাকি তুষারের চেয়ে নিষ্কলঙ্ক !

"এই দেখুন—আবার উত্তেজিত হয়ে গেছি—মাপ করবেন আমায়—আমার কথা শেষ হয়ে এসেছে—বুঝতেই পারছেন, খবরের কাগজের নিন্দায় আমাদের মন কি রকম বিকল হয়ে গেছে—আমাদের কথা সত্য বলে বিশ্বাস করুন এবং আমাদের নামে এই অন্যায় কলঙ্ক মোচনের একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমার আর কিছু বক্তব্য নেই।"

টেবিলের কাছ থেকে সরে গিয়ে দলপতি স্বদলে ভিড়ল। ব্যারিষ্টার-মহলে চাপা-গলায় শতেক আলোচনার অস্ফুট গুঞ্জন ছাপিয়ে সভাপতির কণ্ঠস্বর বেজে উঠল, "আপনার কথা আমরা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেছি—এ অন্যায় অপবাদ থেকে আপনাদের মুক্ত করবার জন্যে আমাদের যথাসাধ্য করব। সভার মুখপাত্র-স্বরূপ আমার বন্ধুবর্গের অনুরোধ-মত আমি আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ ও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি—নাগরিক কর্ত্তব্যে আপনাদের অসীম আগ্রহ। আমার দিক থেকে আমি দলপতি-মশায়ের করমর্দ্দনের অনুমতি প্রার্থনা করছি।"

পুরুষোচিত সবল ভঙ্গীতে দীর্ঘায়ত দুইটি পুরুষ গম্ভীর ভাবে পরস্পরের হাত চেপে ধরল।

ব্যারিষ্টারের দল নাট্যমন্দির থেকে একে একে বেরিয়ে পড়ছেন—জনচারেক টুপী রাখবার আলনার কাছে জড় হয়েছেন—আইজকে সাহেবের নতুন-কেনা ফ্যাসানে টুপীর কোন পাত্তা নেই—তার জায়গায় সুতীর একটা সস্তা টুপী ঝুলছে।

"ইয়াসা !" দলপতির কঠোর উচ্চস্বর দরজার বাইরে থেকে শোনা গেল।

"ইয়াসা ! এই শেষবার বলছি—কি-রে ?"

ভারী বড় দরজাটা খুলে গেল—দলপতি আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল—হাতে আইজাক সাহেবের সাধের নতুন টুপী—মুখে ভদ্রজনোচিত স্মিতহাস্য।

"মাপ করবেন—ভারি একটা ভুল হয়ে গেছে—টুপী বদলাবদলি হয়ে গিয়েছিল ও আপনারই ? মাপ করবেন..." পরে দরোয়ানকে ডাকিয়া বলিল, "আরে জিনিষ-পত্তর সামলাও না কেন ? চোখ থাকে কোথায়... দাও, ঐ নেকড়ার টুপীটা আমায় দাও। আচ্ছা আসি, আপনারা আমায় মাপ করলেন তো ?"

হাসিমুখে অভিবাদন করে চোরের সর্দ্দার তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে পড়ল। *

* রুশ-সাহিত্যিক A. I. Kuprin রচিত গল্পের অনুবাদ।

বাদশাহী বিচার-পদ্ধতি ও দণ্ডনীতি

শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু, এম্-এ

ভারতে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান আক্রমণ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে আরম্ভ হলেও খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর গোড়ায় আরবদেশীয় কাসিমের নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থ সিন্ধু প্রভৃতি দেশসমূহের বিরুদ্ধে যে অভিযান হয় তাহা আগেকারগুলোর তুলনায় ছিল বেশ বড় রকমের। দেশ-জয়ের পর আরবরা সিন্ধুদেশে যে রাজ্য স্থাপন করেন তার বিস্তার ছিল যেমন কম, তেমনি ছিল তার অস্তিত্ব অল্পস্থায়ী। তিন অঙ্কে সমাপ্ত মুসলমান কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ বিষয়ক নাটকটির প্রথম অঙ্ক এখানেই শেষ হয়; দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভ তুর্কী বংশীয় ঘজ্‌নী অধিবাসী মামুদের আক্রমণে এবং ইহার শেষ ঘোর-দেশজাত মহম্মদের ভারতজয়ের সঙ্গে; মোগল বংশীয় বাবরের আক্রমণ তৃতীয় অঙ্কের প্রারম্ভ এবং তাঁহার বংশধরগণের অধীনে রাজ্যস্থাপন ও বিস্তারে ইহার পরিসমাপ্তি।

সিন্ধুপ্রদেশে মুসলমান আমীর বা সম্ভ্রান্ত সর্দ্দাররাই নিজেদের জমিদারীতে ইংলণ্ডের "ফিউড্যাল" যুগের ব্যারন-দের মত ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। কোরাণ অনুযায়ী বিচার করতেন কাজী—মুসলমানের উপর ত বটেই, হিন্দুরাও তা থেকে বাদ যেতেন না, বিশেষ যখন হিন্দুমুসলমানে কোনো মামলা হ'ত। আর এ ক্ষেত্রে হিন্দুরাই হ'ত বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত, বিজিত যেমন হয়ে আসচে বিজেতার হাতে সেই আদিকাল হ'তে। রাজনীতিঘটিত মামলায় কি হিন্দু কি মুসলমান সকলের পক্ষে একই আইন ছিল। বাদী প্রতিবাদী উভয়ে হিন্দু হ'লে সে মামলা পেশ হ'ত হিন্দুদের পঞ্চায়েতীতে, যেখানে তাঁরাই ছিলেন বিচারের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। সাধারণ সরকারী বিচারালয়গুলো ছিল হিন্দুদের উপর পীড়ন করবার এক একটা যন্ত্র-বিশেষ। তখন যাজকদের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম, আর যাজকীয় বিধি না মেনে চলবার শক্তি বা সাহস স্বয়ং বাদশাহেরও দেখা যেত না।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর গোড়ায় এলেন ঘজনীর মামুদ তাঁর উদ্দাম প্রচণ্ড জিঘাংসা সঙ্গে নিয়ে। তিনি যেখানেই গেলেন সেখানেই রেখে গেলেন তাঁর প্রতিনিধি-স্বরূপ বিরাট ধ্বংসের প্রতিচ্ছায়া আর আর্ত্তের গগনভেদী মর্ম্মঘাতী হাহাকার। গৃহবিবাদনিরত মৃতপ্রায় হিন্দুজাতি তখন অধঃপতনের শেষসীমায় উপনীত; শক্তি ছিল না তাদের এই দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণকারীর গতির বেগ রোধ করে জননী-জন্মভূমির বা নিজেদের স্ত্রীকন্যার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখে। লুটপাট করতেই মামুদের ভারতবর্ষে আগমন; রাজ্যস্থাপনের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল না মোটেই, তাই লুটের বিপুল সামগ্রী নিয়েই তিনি নিজের জন্ম-ভূমির দিকে ফিরলেন।

মামুদের পদানুসরণ করে এলেন মহম্মদ, ঘজনী ও হিরাট মধ্যস্থিত দুর্জ্জয় দুরাক্রম্য গিরিসঙ্কুল উপত্যকা 'ঘোর' দেশ হ'তে। মধ্যযুগের খৃষ্টানগণ তাঁদের সেই চিরবাঞ্ছিত জেরুজালেম্ মুসলমানদের করতলগত হ'লে তার উদ্ধারকল্পে যুদ্ধযাত্রা করাটাকে যেমন ধর্ম্মকার্য্য মনে করতেন, খাঁটি মুসলমান ঘোর-এর মহম্মদ হিন্দুদের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' করতে তার চেয়ে কিছু কম গৌরব মনে করেন নি। ভারতে মুসলমান-রাজ্যের পুনরুদ্ধার বা পুনঃস্থাপন মানসে ও সেই সঙ্গে কাফিরদের বেশ একটু বড় রকমের শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তাঁর বিরাট বাহিনীর দুর্ব্বার শক্তি ভারতের উপর প্রয়োগ করলেন। জয়ের পর তাঁর অধীনস্থ কুতুবুদ্দীনের উপর অধিকৃত রাজ্য দিল্লীর শাসনভার দিয়ে নিজের দেশে ফিরে গেলেন। আর এখান হ'তে সুরু হ'ল রীতিমত বাদশাহী আমল।

তুর্কী-বংশসম্ভূত ও পরে দাসশ্রেণীভুক্ত কুতুব ও তাঁহার বংশধরগণ যাঁরা ভারত ইতিহাসে 'দাস' রাজা নামে খ্যাত এবং এঁদের পরবর্ত্তী বাদশাহরা যথা খাল্‌জী, তুঘলক্, লোদি, ও সৈয়দবংশীয়গণ যথাক্রমে ভারতের

রাজদণ্ড হস্তগত করেন। তাঁদের আমলের বিচার-ব্যবস্থা সেই আরবদের মতই ছিল, সেই সরকারী ও বেসরকারী বিচারালয়, সেই পঞ্চায়েৎ, সেই আমীর, সেই কাজী আর সেই যাজকসম্প্রদায়; আমীর নিজের জমিদারীতে শাসনকারী, কাজীর অধীনে বিচারভার ন্যস্ত, আর যাজক-সম্প্রদায়ের অসীম ক্ষমতা,—ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবর্ত্তন! খালজীকুলতিলক আলাউদ্দীন কিন্তু মোল্লাদের ক্ষমতা খর্ব্ব করে স্বীয় শক্তির ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার পরিচয় প্রদানে পশ্চাৎপদ হননি। তাঁর মতে 'আইন' ও বাদশাহ একার্থবোধক শব্দ; শাস্তিদান করাটা রাজারই বিশেষ স্বত্ব বা অধিকার। সুতরাং সময়-বিশেষে তিনি মোল্লাদের বিরুদ্ধেও রায় প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হতেন না। পঞ্চদশ শতাব্দীর 'ওয়ারস্ অফ দি রোজেস্' দেশের বীভৎস নগ্ন মূর্ত্তি প্রকাশ করলে পর, অত্যাচারপীড়িত ইংলণ্ডের জনসমূহ নিজেদের ধনজন রক্ষার্থ যেমন একজন ক্ষমতাশালী রাজার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে এবং সেই কারণবশতঃই টিউডর বংশীয়গণ নিজ ইচ্ছানুযায়ী রাজত্ব করলেও ষ্টুয়ার্ট-দিগের মত তাঁদের আমলে দেশে বিদ্রোহের তাণ্ডবলীলা পরিলক্ষিত হয়নি, সেইরূপ আলাউদ্দীন তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী বাদশাহদের তুলনায় স্বেচ্ছাচারী হলেও মোগল কর্ত্তৃক উপর্য্যুপরি আক্রান্ত ও তজ্জন্য ক্লিষ্টচিত্ত ও ব্যথিত প্রজাগণ আলাউদ্দীনের ন্যায় শক্তিমান রাজার বিরুদ্ধে তাঁর অবৈধ স্বেচ্ছাচারিতা সত্ত্বেও নিজেদের মাথা তুলতে সাহস পায় নি। সাধারণ জনসমাজে "ক্ষিপ্ত" আখ্যায় ভূষিত তুঘলক্ বংশীয় মহম্মদ, তাঁর আর যা-কিছু দোষ বা গুণ থাক্ না কেন, আলাউদ্দীন বা ইংলণ্ডের প্ল্যান্টাজেনেট বংশীয় দ্বিতীয় হেন্‌রির মত যাজকদের একচেটিয়া অধিকার নতমস্তকে মেনে নিতে মোটেই রাজি ছিলেন না। আর এর জন্য তাঁকে বেগ পেতে হয়েছেও যথেষ্ট। ক্ষুব্ধচিত্ত, অধিকারবিচ্যুত উলেমাগণ রাজার চরিত্রে অযথা দোষারোপ করতে কোন প্রকার ত্রুটি করেনি; এবং বোধ হয় এই কারণেই মুসলমান ইতিহাসকারেরা স্বকপোলকল্পিত ঘটনানিচয় নানাবর্ণে রঞ্জিত করে জগৎসমক্ষে বাদশাহকে অত্যাচারের পূর্ণাবতার বলে প্রচার করে গেছেন। কিন্তু ন্যায়প্রিয়তাই ছিল এই বাদশাহের একটি মহৎ গুণ। আদালতের খুঁটিনাটি যা-কিছু সবই তিনি নিজে দেখতেন এবং সময়-বিশেষে নিজের বিরুদ্ধেও আদালতের রায় মেনে নিয়েছেন এমন দেখা যায়। গোঁড়া মুসলমান ফিরোজের রাজত্বকালে পুরাতন ব্যবস্থা আবার নূতন করে ফিরে আসে। কোরাণানুযায়ী বিচার ত চলতেই লাগল, তার উপর আবার মোল্লারা তাদের লুপ্ত অধিকার ফিরে পেল। মুফতিরা আইন ব্যাখ্যা করত আর কাজী সাহেব দিতেন বিচারে রায়, এই ছিল তাঁর সময়ের ব্যবস্থা। সে সময়কার আইন ছিল বড়ই কঠোর ও অমানুষিক; পীড়ন করাই ছিল সত্যনির্দ্ধারণের একমাত্র পন্থা; সংশোধন করা ত দূরের কথা, অপরাধীকে প্রতিশোধ দেওয়াই ছিল শাস্তিদানের আসল উদ্দেশ্য। মোটের উপর সে সময়ের দণ্ডনীতির ব্যবস্থা মধ্যযুগ বা ফরাসী বিপ্লবের আগে ইউরোপ বা ইংলণ্ডে যেপ্রকার দোষীদের শাস্তিদান বা পীড়ন করার রীতি ছিল তাই মনে করিয়ে দেয়।

ভারত-আক্রমণকারী দুর্দ্দমনীয় তৈমুর ও চেঙ্গিসের বংশধর, স্বচ্ছতোয়া জাক্সারটেস্ নদীকূলস্থিত সমরকন্দ অধিবাসী বাবর লোদিদের পরাস্ত করে ভারতে মোগল রাজবংশ স্থাপন করেন। নিজেকে মোগলবংশজাত বলে প্রচার করতে তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, এবং স্বীয় ধমনীতে মোগল রক্ত প্রবাহিত ছিল ব'লে বিশেষ লজ্জিত হলেও তাঁর দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি ও তাঁর বংশধরগণ ঐতিহাসিকদের নিকট মোগল বলেই প্রচারিত হ'য়ে আস্‌চেন। আড়াই শত বৎসর স্থায়ী মোগলদের শাসন সময়ে ভারতে কিরূপ বিচার-ব্যবস্থা কায়েম ছিল জানবার জন্য নজির পাওয়া যায়।

মোগল আমলের বিচারপ্রণালীর মূলে শৃঙ্খলা বা পর্য্যায়ের খুবই অভাব দেখা যায়। স্থান বা জনসংখ্যা অনুযায়ী বিচারালয়ের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হ'ত না। সেজন্য স্থান-বিশেষে জনাধিক্য হলেও হয়ত আদালতের সংখ্যা ছিল কম—হোক্ না কেন সেখানে বিচারের ত্রুটি! আজকালকার ইংরেজ রাজত্বে আদালতগুলোর যেমন পর্য্যায় আছে—মহকুমার আদালত হ'তে আরম্ভ করে হাই-কোর্টে বা প্রিভি-কাউন্সিল পর্য্যন্ত আপিল যাবার যেমন বন্দোবস্ত আছে, তেমনটি কিন্তু সেকালে ছিল না, এটা

জোর গলায় বলা যায়। তারপর তখন ভিন্ন আদালতে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বিচারের কোনো বাঁধাবাধি নিয়ম দেখা যেত না। বাদশাহ নিজে ও তাঁর 'সদর' দেওয়ানী মামলা বিচার করতেন। এ ছাড়া বাদশাহকে যে ফৌজদারী মামলা বিচার করতে হ'ত না তাও নয়। আর কাজীর কাজ ছিল প্রধানতঃ ফৌজদারী মামলা নিয়েই থাকা। অবশ্য সময়ে সময়ে ইহারও ব্যতিক্রম হ'ত।

একাধিক ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে বেড়াতে বা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে এসে দিল্লী বা আগ্রায় বাদশাহী বিচার কিরূপ চলত তা নিজেদের ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখে গেছেন। বাদশাহের দরবার সাধারণতঃ "কোর্ট অফ অ্যাপীল"হলেও সময়ে সময়ে court of first instance ও ছিল। কতকগুলো বাছা মোকদ্দমা ছাড়া তিনি সবগুলোর বিচার করতেন না। আকবরের সময়ে সম্রাটের বিচারের কোন নিদ্দিষ্ট দিন ধার্য্য ছিল না; যেদিন তিনি বিচার করবেন ব'লে স্থির করতেন, সেদিন নাকাড়া বাজিয়ে লোকদের জানান হ'ত। কেহ কেহ বলেন যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময়ে রাজপ্রাসাদের বারান্দার সহিত একটি লোহার শিকল টাঙান থাকত। প্রজাবর্গ নিজেদের আর্জ্জি বা প্রার্থনাপত্র তা'তে বেঁধে দিত। পরে বাদশাহ সেগুলো নিজে দেখে যথাকর্ত্তব্য করতেন। ফিঞ্চ সাহেব (১৬১১ খৃঃ) জাহাঙ্গীরের সময়ে কেমন ক'রে বিচার-কার্য্য চ'লত তা বলে গেছেন। চারিটি তোরণবিশিষ্ট আগ্রা-দুর্গের পশ্চিমদিকেরটির নাম ছিল কাছারি ফটক; কারণ এখানে বসিতেন কাজীসাহেব, আর ছিল বাদশাহের উজীরের কাছারি বাড়ী। উজীর সাহেব রোজ সকালে তিন ঘণ্টা করে বিচারাসনে বসে খাজনা, বৃত্তি, ঋণ ও জমিজমা সংক্রান্ত যাবতীয় মামলার বিচার করতেন। প্রায় পাঁচ বছর পর টেরি সাহেব দেখেন যে, সম্রাট নিজে তাঁর দরবারের সন্নিহিত স্থানসমূহে সজ্ঘটিত ব্যাপারের মোকদ্দমা দেখতেন; secundum allegata ও probata সম্পর্কীয় মামলার বিচার তিনি নিজেই করতেন। বিচারকার্য্য যেমন তাড়াতাড়ি শেষ হ'ত, তেমনি হ'ত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাপ্রদান। দরবারের বাইরে প্রাদেশিক কর্ত্তারাও রাজার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে কসুর করতেন না। কোনো আইনের 'বই' ছিল না, বাদশাহ বা তাঁর প্রতিনিধির ইচ্ছাই ছিল তখনকার আইন। ডচ্ কর্ম্মচারী ফ্রানসিস্কো পেল্‌সায়ের্ট (১৬২১ খৃঃ) বলেন যে, জাহাঙ্গীর রাজ্য নিয়ে বড়-একটা মাথা ঘামাতেন না, কেবল শিকার নিয়েই থাকতেন ব্যস্ত। দরবারে কোনো প্রার্থী উপস্থিত হ'লে তার যা বলবার ছিল সব শুনে বাদশাহ উত্তরে 'হাঁ' বা'না'কিছুই না ব'লে তাঁর শ্যালক আসফ খাঁকে যথাবিহিত করতে বল্‌তেন, আর খাঁ সাহেব তাঁর ভগ্নী নূরজাহানের পরামর্শ ব্যতিরেকে কিছুই করতেন না। প্রত্যেক শহরেই একটি ক'রে কাছারি ছিল, যেখানে সপ্তাহে চারিদিন ক'রে গভর্ণর, দেওয়ান, বক্সী, কোতওয়াল এবং কাজী একত্রে বসে মামলার বিচার করতেন। চুরি, খুন প্রভৃতি মামলার বিচার কর্ত্তে হ'ত গভর্ণরকে। আসামী গরীব হ'লে তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হ'ত। অন্যান্য অপরাধে অপরাধীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হ'ত; বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ, ঝগড়া, লড়াই, ভয়প্রদর্শন প্রভৃতি মোকদ্দমা কোতওয়াল বা কাজী বিচার করতেন। পেল্‌সায়ের্ট তাঁর "Remonstrantie"তে বাদশাহ কর্ত্তৃক নিযুক্ত বিচারকদের কষাঘাত করতে ত্রুটি করেননি; তারা যে কিরূপ লোভী ছিল ও আসামীর নিকট হ'তে অর্থগ্রহণে কিরূপ ক্ষিপ্রহস্ত ছিল তা তিনি ব'লে গেছেন। তাদের লুব্ধ চাহনি ও তাদের লোলুপ মুখবিবর আসামীর মনে সদাই আতঙ্কের সৃষ্টি করত।

শাজাহান বা ঔরংজীবের আমলের বিচার-প্রণালীও যে পাওয়া যায় না এমন নয়। প্রতি বুধবার সকাল আটটার সময় সম্রাট দেওয়ানী খাসে আসন গ্রহণ করতেন এবং বেলা এগারটা পর্য্যন্ত বিচার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকতেন। তাঁদের চারিদিকে আদালতের বড় বড় কর্ম্মচারী, যেমন যাজকীয় বিধিবেত্তা কাজী, চিরপ্রচলিত প্রথারূপ আইন-শাস্ত্রে (Common Law) পারদর্শী আদিল, মুফ্‌তি, ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ উলেমা, নজিরজ্ঞ আইনবেত্তা, এবং কোতওয়াল বা নগররক্ষক প্রভৃতি স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট থাক্‌ত। বিশেষ দরকার ছাড়া অন্য কোনো কর্ম্মচারীর সেখানে প্রবেশ

নিষেধ ছিল। ফরিয়াদীদের একে একে রাজার নিকট নিয়ে যাওয়া হ'ত, এবং তাদের বক্তব্য কর্ম্মচারীরা বাদশাহকে জানাত। মোকদ্দমা শুনানীর পর উলেমার সাহায্যে বাদশাহ নিজে রায় দিতেন। দূরদেশ থেকে কোনো বিচার-প্রার্থী এলে পরে জামিন তদন্তের ভার প্রাদেশিক কর্ত্তার উপর পড়ত; হয় তিনি নিজেই বিচার করতেন,নয় বাদী ও ফরিয়াদীকে বাদশাহের কাছে আবার পাঠিয়ে দিতেন। ফরাসী পরিব্রাজক বার্ণিয়ে বলেন যে, সপ্তাহের এক নির্দ্দিষ্ট দিনে সম্রাট তাঁর গরীব প্রজাদের দশটি করে আবেদন নির্জ্জনে শুনতেন। এগুলো সাধারণতঃ কোনো সংব্যক্তি বা বড়লোক কর্ত্তৃক রাজার নিকট দাখিল হ'ত। চুরি বা ডাকাতির মামলায় চোর বা ডাকাতের প্রাণদণ্ড হ'ত এবং প্রাদেশিক কর্ত্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ করতে হ'ত। পাঠান-সম্রাট্ শের শাহের আমলেও এই আইনই বাহাল ছিল। গ্রামে কোনো চুরি বা খুন-খারাপি হলে ও অপরাধী ধরা না পড়লে, সমস্ত গ্রামকেই এর জন্য দায়ী করা হত। অপরাধী সনাক্ত না হ'লে গ্রামের মোড়লকে হয় কয়েদ না হয় অন্য কোন শাস্তি দেওয়ারই রীতি ছিল।

পূর্ব্বে একবার বলা হয়েছে যে, বাদশাহ ছাড়া 'সদর'-এর উপরও দেওয়ানি মামলা বিচারের ভার ছিল। কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, বিশেষ বিশেষ দেওয়ানি মামলা ছাড়া তিনি (সদর) সকলপ্রকার মামলার বিচার করতে পেতেন না। প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে সদর নিযুক্ত ছিল এবং সবগুলি সদরের উপর একটি শ্রেষ্ঠ সদর বা 'সদর-উস্-সদুর' থাকত; এই শ্রেষ্ঠ সদরই স্থান-বিশেষে 'সদর-ই-জহাঁ' বা 'সদর-ই-কুল' ব'লে অভিহিত হতেন। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি, পণ্ডিত বা ফকির কর্ত্তৃক প্রাপ্ত সরকারী বৃত্তি বা নিষ্কর জমিগুলির যথারীতি ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হ'ত এই সদরদের। তিনি ছিলেন সরকারী ভিক্ষাবিতরণ-কর্ত্তা, সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, সদরের ক্ষমতা নিতান্ত অল্প ছিল না, এবং ইচ্ছা করলে তাঁরা অসৎ উপায়ে অনেক রোজগার করতে পারতেন। সেইজন্য এই কার্য্যে চরিত্রবান লোককে বাহাল করা হ'ত। শুনতে পাওয়া যায়, আকবরের সময়ে এই কর্ম্মচারীরা নাকি যথেচ্ছাচারী ছিলেন ও উৎকোচ-গ্রহণে কোনো দ্বিধা বোধ করতেন না।

ফৌজদারী আদালতখানার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন কাজী সাহেব এবং তাঁর কাজ ছিল ঘটনা শুনানীর পর মুফ্তির সহায়তায় নিজের রায় প্রকাশ করা। মুফ্তির কাজটি যে কি তা বোঝাতে হ'লে বলতে হবে যে, আজকালকার অ্যাডভোকেট জেনারেল মহাশয়কে যে কাজ করতে হয়, তাঁকে অনেকটা তাই করতে হ'ত। অর্থাৎ সাক্ষীসাবুদ নেওয়ার পর ঘটনার সারমর্ম্ম পেশ করে কোন্ আইনটা ঘটনাপ্রসঙ্গে কতদূর খাটতে পারে বা কোন্ দণ্ড অপরাধীকে দিতে পারা যায় এই বিষয়ে কাজী সাহেবকে পরামর্শ দেওয়া। এইখানেই মুফ্তি কাজে রেহাই পেতেন। কিন্তু এই কাজে পারদর্শিতালাভের জন্য মুফ্তি মহাশয়কে চব্বিশ ঘণ্টাই আইনের বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতে হ'ত; কোথায় কোন্ মামলায় কি রায় দেওয়া হয়েছে, সেটা তাঁকে কণ্ঠস্থ রাখতে হ'ত; আইনের মারপ্যাচের মধ্যেই তিনি দিন কাটাতেন। নজিরের বিরুদ্ধে কাজী কোনো রায় দিলে, মুফ্তি অতি নম্রতা সহকারে বিচারককে বলতেন যে, এই জাতীয় ঘটনায় পূর্ব্বে অমুক সাজা দেওয়া হয়েছে আর তার নজির অমুক জায়গায় আছে; তিনি এই বইটি পড়ে নিজের রায় দিলে ভাল হয়, ইত্যাদি। তখন কাজী সাহেব মুফ্তির বক্তব্য অনুযায়ী নিজের বিচারাজ্ঞা দিতেন। কাজীদের যে খুবই আইনজ্ঞ হ'তে হ'ত এমন নয়, কারণ তাঁর কাজ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তাঁদের আইন জ্ঞানের ততটা দরকার হ'ত না, যতটা দরকার হ'ত সাধারণ বুদ্ধির ও আরবী ভাষায় বুৎপত্তির। তবে সাধারণতঃ এই চাকরীর জন্য আবেদনকারীদের আইন-জ্ঞানের প্রতি যে একেবারেই লক্ষ্য রাখা হ'ত না এমন নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের সত্যনিষ্ঠা নিরপেক্ষতা প্রভৃতি সদ্গুণের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখা হ'ত। মুসলমান আইনে নিরক্ষর ব্যক্তিকে কাজীর পদে বাহাল করার রীতি দেখ্তে পাওয়া যায়, কারণ কাজীর কার্য্য মাত্র অন্যের পরামর্শ অনুসারে নিজের বিধান দেওয়া। প্রজার স্বাভাবিক অধিকার বজায় রাখবার জন্যই এই পদের

উৎপত্তি ও অন্যের মতানুযায়ী রায় দেওয়াতেই ইহার সার্থকতা। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে গ্রীস দেশে আইন-অনভিজ্ঞ লোককে বিচারকের পদে নিযুক্ত করার রীতিতেও বোধ হয় এই মূল নীতিই নিহিত থাকতে পারে। বার্ণিয়ের বিবরণ থেকে জানা যায়, মোগল আমলে কাজীদের এমন ক্ষমতা ছিল না যে, তাঁরা পীড়নকারী প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বা জায়গীরদারদের হাত থেকে অত্যাচারপীড়িত প্রজাদের রক্ষা করেন। রাজধানী বা তন্নিকটস্থ স্থানসমূহে এরূপ ঘটনা দেখা না গেলেও, দূরদেশে শাসনকর্ত্তার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম, এবং তাঁরাই ছিলেন সেখানকার কর্ত্তা।

রাজধানী ছাড়া প্রত্যেক প্রদেশেই ছিল কাজীর আস্তানা। সবগুলি কাজীর উপরে ছিলেন এক শ্রেষ্ঠ কাজী, বা কাজী-উল্-কুজ্জৎ। তিনি সর্ব্বদাই বাদশাহের সঙ্গসুখ লাভ করতেন। যেখানেই সম্রাট গমন করুন না কেন, সঙ্গে যেতে হ'ত এই কাজী সাহেবকে। ইনিই ছিলেন বিচারের সময় রাজার ডানহাতস্বরূপ।

নূতন কাজীকে পদে বাহাল করবার সময় নিম্নলিখিত উপদেশগুলি দেওয়া হ'ত—

১। ন্যায়বিচারী, সৎপথাবলম্বী ও অপক্ষপাতী হবে।

২। বাদী ও প্রতিবাদীর সামনে বিচার করবে।

৩। কাছারী ছাড়া অন্য কোথাও বিচার করবে না।

৪। কাহারও নিকট হ'তে কোন রকম উপহার নেবে না বা যার তার মজলিশে বা নিমন্ত্রণে যাবে না।

৫। রায়, দলিল বা অন্যান্য আইন-ঘটিত কাগজপত্র এমন করে লিখবে যা'তে কেহ দোষ বার করে অপদস্থ না করে।

৬। দারিদ্র্যকেই নিজের গৌরব মনে করবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই উপদেশগুলি বড় একটা কাজে আস্‌ত না। কারণ কথিত আছে যে, কাজী সাহেবরা মোটেই উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করতেন না। কয়েকজন ছাড়া বেশীর ভাগ কাজীই ছিলেন অসৎকার্য্যের পূর্ণাবতার। ঔরংজীবের আমলের শ্রেষ্ঠ কাজী, আবদুল ওহ্‌হাব বোরা, তাঁর ১৬ বৎসর চাকরীর মধ্যে নগদ ৩৩ লক্ষ টাকা ছাড়া জহরৎ ও অন্যান্য অনেক মূল্যবান জিনিষ সঞ্চয় করেন। রাজ-দরবারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজীই যখন এইরূপ, তখন অন্য পরে কা কথা। আবার মধ্যে মধ্যে ভাল লোকও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আবদুলের পুত্র শেখ-উল্-ইসলাম-এর (যিনি পরে তাঁর পিতার পদ পান) চরিত্র ছিল ঠিক তাঁর পিতার উল্টা। অসদুপায়ে সঞ্চিত পিতার বিপুল সম্পত্তি তিনি স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নি, এবং দান-খয়রাতে সব খরচ করেন। কারও কাছ থেকে কোনো সওগাদ তিনি গ্রহণ করতেন না। শেখ-উল্-ইসলামের মত লোক ছিল খুবই অল্প, বেশীর ভাগ লোকই ছিল অত্যাচারী। তাই, বড় দুঃখে ঔরংজীব তাঁর আদালতগুলিকে 'পীড়নের কাছারী' আখ্যায় ভূষিত করেন; আর বোধ হয় কাজীদের অত্যাচারের জন্যই 'কাজীর বিচার' প্রভৃতি প্রবাদবাক্য জনসাধারণে এতদিন চলে আসছে।

প্রতি সপ্তাহের বুধবার ও শুক্রবার ছাড়া আর সবদিনে কাজী বিচারে বসতেন। শুক্রবার ছিল ছুটীর দিন—আজকালকার রবিবারের মত সেদিন কাজকর্ম্ম সবই বন্ধ থাকত। প্রতি বুধবার কাজী সাহেবদের স্ব স্ব প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার সঙ্গে দেখা করতে হ'ত। সকাল থেকে আরম্ভ করে দুপুর পর্য্যন্ত বিচারের কাজ চলতে থাকত।

কাজী কোরাণ অনুযায়ী নগরের জুমা মসজিদে বা জনসাধারণের সামনে বিচার করতেন। সময়-বিশেষে স্বীয় বাসস্থানে বিচার করবার ব্যবস্থা কোরাণে নিষেধ না থাকলেও, এটা বেশ স্পষ্ট বলা ছিল যে, যদি কাজী নিজের বাড়ীতে বিচার করেন, তাহলে সেখানে সকলকে যেতে দিতে হবে, এবং এরূপ বন্দোবস্ত করতে হবে যে, কারও যেন কোনপ্রকার অসুবিধা না হয়।

পূর্ব্বে একবার বলা হয়েছে যে, সদর বা কাজীর আদালত প্রাদেশিক রাজধানীতে অবস্থিত ছিল, এবং ইহাকে 'মহকুমা-ই আদালত' বলে অভিহিত করা হ'ত। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে এই যে, তাহলে ছোট ছোট গ্রামগুলিতে বিচারের কি ব্যবস্থা ছিল? অর্থশালীরা না হয় খরচ-খরচা করে নিজেদের অভিযোগ সদর আদালতে পেশ ক'রতেন, গরীবদের ত টাকা ছিল না,

তারা ক'রত কি? এরা নিজেদের মামলা, অভিযোগ প্রভৃতি কখন স্থানীয় পঞ্চায়েৎ, কখন বা শালিসের কাছে নিয়ে যেত। আর এখানে যে ফয়সালা হ'ত তা তাদের মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আবার এ-ও দেখা যায় যে, তা'রা কখন কখন বা নিজেদের লাঠির জোরে যা-হক একটা কিছু নিষ্পত্তি করত। এক্ষেত্রে লাঠি যার মাটি তার।

এই ত গেল মোগল আমলের বিচার-পদ্ধতির কথা; এবার সে-সময়কার আইন-কানুন সম্বন্ধে দুই চারিটি প্রয়োজনীয় কথা বলা যাক। এটা সহজেই অনুমেয় যে, তখনকার ব্যবহার-বিজ্ঞানের উৎপত্তি ভারতবর্ষের বাইরে হয়। কোরাণ বা তাহার টীকা অনুসারে বিচার চল্‌তি। প্রধানতঃ কোরাণের চারটি টীকাই দেখতে পাওয়া যায়, যথা হনাফি, মলফি, সফি, ও হন্‌বালি। এর মধ্যে প্রথমটিরই ভারতবর্ষে মোগলদের আমলে বেশী চলন ছিল। কোরাণ ছাড়া নজিরের উপরও দৃষ্টি রাখার বিধি দেখতে পাওয়া যায়; আইন-ব্যবসায়ীর মতামত যে মোটেই লওয়া হ'ত না এমনও নয়। কোরাণ ছাড়া নজির বা ব্যবহারশাস্ত্রজীবীর মতামতের মূল্য কম না হলেও বা সেই অনুসারে বিচারকার্য্য পরিচালিত হলেও বাদশাহের বা কাজীর স্বীয় মীমাংসার দ্বারা কোনো রীতি-নির্দ্ধারণ বা কোরাণের কোনো অস্পষ্ট ধারাকে স্পষ্ট করার মোটেই ক্ষমতা ছিল না; নজির ও আইনজ্ঞদের মত কোরাণকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা ছাড়া অপর কোনো নূতন কানুন বা মূলনীতি তাঁরা প্রণয়ন করতেন না। বস্তুতঃ কার্য্যক্ষেত্রে বিচারকগণকে সদাসর্ব্বদা আরবীয় লেখকগণ অনুমোদিত আইনশাস্ত্রের একটি চুম্বক নিজেদের নিকট রাখতে হ'ত। মাঝে মাঝে বিভিন্ন বাদশাহের রাজত্বসময়ে বিচারকার্য্যের সুবিধার জন্য একটি আইনের চুম্বক বা সারসংগ্রহ করা হয়। প্রায় দুইলক্ষ টাকা ব্যয়ে বড় বড় আইনবেত্তার সাহায্যে আইনের যে বইটি ঔরংজীব সঙ্কলন করান, সেটির নামকরণ হয়—"ফতোয়া-ই-আলমগিরি।"

মোগল আমলে মুসলমান বা হিন্দুদের জন্য ভিন্ন আইন চলিত ছিল না—উভয়ের জন্য এক আইন বিধিবদ্ধ ছিল। হিন্দুদের জন্য যে একমাত্র কাজীর বিচারালয় ছিল এমন নয়। তাদের মধ্যে স্বজাতীয় আদালত বা শালিসি-করণের ব্যবস্থাও লক্ষিত হয়ে থাকে। তবে উহার বেশী প্রচলন ছিল দক্ষিণাপথে। উদারনীতিজ্ঞ আকবরের সময় হিন্দুদের জন্য আলাদা আদালত স্থাপিত হয়। এখানে মনুর ব্যবস্থা মত বিচারকার্য্য সম্পন্ন হ'ত। কোনো কোনো ইংরেজ-লেখক হিন্দুদের আদালতে যে আইন প্রচলিত ছিল তাকে 'জেণ্টু কোড' বলে অভিহিত করেছেন।

বাদশাহী আমলে অপরাধীকে কি দণ্ড দেওয়া হ'ত জানার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্রে অপরাধকে তিনটি পর্য্যায়ে ভাগ করা হয়েছে; যথা—

১। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ

২। সমাজ, জাতি, বা রাজার বিরুদ্ধে অপরাধ

৩। ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে অপরাধ।

প্রথম অপরাধের শাস্তিবিধান-করণ স্বয়ং ঈশ্বরের অধিকার; দ্বিতীয় বা তৃতীয়টির উপর ব্যক্তিগত অধিকার। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, নরহত্যা প্রথম পর্য্যায়ভুক্ত নয়, হত্যাকারীরা হত ব্যক্তির আত্মীয়কে খেসারৎ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারলেই দায় হ'তে রেহাই পেত। আর যেখানে আত্মীয়েরা ক্ষতিপূরণে সন্তুষ্ট না হ'ত, সেখানে কাজীকে বিচার করে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতে হ'ত।

সেকালে শাস্তিবিধান-কার্য্যের চারিটি শ্রেণীবিভাগ ছিল, যেমন হিদ্, তাজির, কিসস্, ও তহসীর। যে শাস্তিতে খাস্ ঈশ্বরের অধিকার ছিল, তাকে বলত হিদ্। কোরাণ অনুযায়ী এই শ্রেণীর শাস্তির কোনরূপ ব্যতিক্রম করার কারও ক্ষমতা ছিল না—তা তিনি, যিনিই হন না কেন। এই প্রকার শাস্তিবিধান নিতান্ত উদ্দেশ্যবিহীন ব'লে মনে হয় না ও প্রজাগণকে অপরাধ হতে বিরত রাখাই এরূপ দণ্ডবিধানের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

হিদের কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল।—

১। ব্যভিচার দোষে অভিযুক্ত দোষীদের পাথর ছুঁড়ে মারা হ'ত। অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ সঙ্গমের জন্য একশটি বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা ছিল।

২। বিবাহিত নর-নারীর চরিত্রে অযথা ব্যভিচারিতা আরোপ করলে অপরাধীর দণ্ড ছিল আশীটি বেত্রাঘাত।

৩। মদ্য বা অপর মাদকদ্রব্য ব্যবহারের জন্য পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় দণ্ড দেওয়া হ'ত।

৪। চোরের ডান হাতটি কাটার বিধি ছিল (সরিক)। কোরাণেও এই ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। কোরাণের টীকাকাররা স্পষ্টই লিখেছেন যে,প্রথম অপরাধের জন্য ডান হাতের কব্জী কাটা হবে; দ্বিতীয় অপরাধে বাম পায়ের গোড়ালি অবধি; তৃতীয় অপরাধে বামহস্ত; চতুর্থ অপরাধে ডান পা। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, অপহৃত দ্রব্যের মূল্য চারি দিনার বা তার বেশী হ'লে অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদনের ব্যবস্থা হ'ত।

৫। রাহাজানির জন্য অপরাধীর হাত ও পা কেটে দেওয়া হ'ত। কিন্তু রাহাজানির সঙ্গে নরহত্যা সংশ্লিষ্ট থাকলে দোষীকে তরবারির দ্বারা বা ক্রুশে মেরে ফেলা হ'ত।

৬। স্বধর্ম্ম ত্যাগের শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড।

"তাজির" নামে অভিহিত দ্বিতীয় শ্রেণীর শাস্তিতে ঈশ্বরের কোন অধিকার ছিল না; কাজীর মতানুযায়ী দণ্ড নির্দ্ধারিত হ'ত। কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম দেখতে পাওয়া যায় না। এই জাতীয় শাস্তির উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

১। মৃদু ভৎসনা। ২। 'জির্' বা অপরাধীকে বল-প্রয়োগ সহকারে আদালত-দ্বারে নিয়ে যাওয়া বা জন-সাধারণ সমক্ষে অপদস্থ করা।

৩। কারাবাস বা স্বদেশ হ'তে নির্ব্বাসন।

৪। কানের উপর ঘুষি মারা বা বেত মারা। বেত্রাঘাতের সংখ্যা ছয় হতে উনচল্লিশ, বা কারও মতে পঁচাত্তর।

হন্‌ফি মতাবলম্বী আইনবেত্তা কর্ত্তৃক ফারসী ভাষায় সংগৃহীত "হেদায়া" নামক আইনশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, "জিদ্" অপরাধীর অবস্থাভেদ অনুযায়ী দেওয়া হবে; সদ্বংশজাত বা ধনশালী অপরাধীর জন্য কেবলমাত্র ভৎসনা প্রয়োগই যথেষ্ট বিবেচিত হ'ত। তাহাকে বেত্রাঘাত বা মুষ্ট্যাঘাত করা বা বলপ্রয়োগ সহকারে কাছারিবাড়ীতে নিয়ে যাওয়া অসঙ্গত ছিল।

অর্থদণ্ড, যাহাকে ফারসী ভাষায় "তাজির-উল্-মাল" বলে, অধিকাংশ কোরাণের টীকাকারের মতে অবৈধ বিবেচিত হওয়ায়, অপরাধীকে এই শাস্তি দেওয়া হ'ত না। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে ঔরংজীব কর্ত্তৃক গুজরাত বা অন্যান্য সুবা বা প্রদেশের দেওয়ান বা সচিবকে লিখিত ফরমানে অনুজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে যে, রাজপুরুষ, জমিদার বা সাধারণ লোক অপরাধ করলে তাঁদের যেন কারারুদ্ধ, কর্ম্মচ্যুত বা নির্ব্বাসিত করা হয়,কিন্তু যেন অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা না হয়।

ফারসী "কিসাসের" বাঙ্গলা প্রতিশব্দ 'প্রতিশোধ'। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে বা তাঁর কোনো আত্মীয় অপরাধীর নিকট ক্ষতিপূরণের জন্য দাবি ক'রতে পারত। তবে সাধারণতঃ নরহত্যা প্রভৃতি অভিযোগে বাদী এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হ'ত। বাদী দণ্ডবিধান প্রার্থনা করলে কাজীর গত্যন্তর ছিল না; বাদশাহ নিজে বা তাঁর কাজী কারও এমন ক্ষমতা ছিল না যে, শাস্তি অল্পবিস্তর লঘু করেন। হত ব্যক্তির আত্মীয়বর্গ ইচ্ছা করলে প্রতিবাদীর নিকট হ'তে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থ গ্রহণ করতে পারত। বাদী price of blood বা অর্থগ্রহণে স্বীকৃত হ'লে অপরাধীকে অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হ'ত না। ইংলণ্ডের Anglo-Saxon যুগের মত ছোটখাট অপরাধের শাস্তি ছিল, "a tooth for a tooth and an eye for an eye."

"তহসীর" অর্থে সাধারণ সমক্ষে অপরাধীকে অপমান-করণ। অপরাধীর মাথা মুড়িয়ে দেবার পর তাকে গাধার পিঠে, লেজের দিকে মুখ ক'রে চড়ান হ'ত; হয় তার সমস্ত শরীরে ধূলা মাখিয়ে দেওয়া হ'ত, না হয় তার গলায় একটি জুতার মালা পরান হ'ত; এবং পরে বাদ্য-সহযোগে সহরের রাস্তার উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে সহরের বাইরে তাড়িয়ে দেওয়ার রীতি ছিল। কখনও কখনও বা অপরাধীর মুখে কালি মাখান হ'ত, তবে তার সঙ্গে চূনও লাগান হ'ত কিনা জানা যায় না।

রাজদ্রোহিতা, রাজকোষস্থ ধন অপহরণ বা সময়ে খাজনা দিতে ত্রুটি করলে কি শাস্তি দেওয়া হবে তার কোনো বাঁধাবাঁধি নিয়ম দেখতে পাওয়া যায় না। বাদশাহ নিজের ইচ্ছানুযায়ী দণ্ডবিধান করতেন। সাধারণতঃ এই অপরাধে অভিযুক্ত লোকদের হয় হাতীর পায়ের তলায়

নিক্ষেপ করা হ'ত, না হয় মাটিতে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হ'ত, বা বিষধরের দ্বারা দংশন করান হ'ত।

উত্তমর্ণ অভিযোগ আনলে কাজী প্রথমে অধমর্ণকে ঋণশোধ করতে বলতেন। আজ্ঞা পালন না করলে বা পালনে অক্ষম হ'লে প্রতিবাদীকে কারাগারে পাঠান হ'ত।

নালিশের বিচার বৈধ বলে প্রতিপন্ন ছিল। প্রয়োজনবিশেষে কাজী সাহেব তাদের যথাশক্তি সাহায্য করতে ত্রুটি করতেন না।

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে ঔরংজীব কর্তৃক গুজরাট প্রদেশের দেওয়ানকে লিখিত একখানি 'ফরমান' সমসাময়িক দণ্ড-ধারার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ। চুরি, রাহাজানি, বা অন্যান্য অপরাধের শাস্তি কিরূপ হবে জানানই এই ফরমানের আসল উদ্দেশ্য। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, ফারমানে লিখিত দণ্ডবিধি কোরাণে লিপিবদ্ধ দণ্ড থেকে কিছু লঘুতর ছিল। আর একটি কথা। যাতে বিচারকেরা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বেশীদিন বিচারের ছলে কারাগারে আবদ্ধ না রেখে শীঘ্র শীঘ্র বিচারের কাজ শেষ করেন, এই উদ্দেশ্যেও ফরমানটি লিখিত হয়। ঔরংজীবের ফরমান বাহির হবার প্রায় সাত বৎসর পর দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্ব-কালে যে হেবিয়াস কোর্পাস আইনটির (১৬৭৯ খৃঃ) প্রচলন হয় তার মূলেও এই একই সত্য নিহিত ছিল।

এইবার ঔরংজীবের ফরমানের গোটাকয়েক দরকারী দফা আলোচনা করা যাক্।

১। সাক্ষীসাবুদ দ্বারা চুরি প্রমাণিত হ'লে কিংবা অপরাধী স্বয়ং দোষস্বীকার করলে ও 'হিদ' ন্যায় বিবেচিত হ'লে কাজী দণ্ডবিধান করতেন এবং যতক্ষণ না অপরাধী অনুতাপানলে দগ্ধ হ'ত ততক্ষণ তাকে কারারুদ্ধ করাই ছিল ন্যায়সঙ্গত।

২। শহরে খুব চুরি হ'তে আরম্ভ হ'লে এবং চোর ধরা পড়লে, তার মস্তকচ্ছেদ বা তাকে শূলে চড়ান হ'ত না, কারণ এটা তার প্রথম অপরাধ হ'তে পারে।

৩। প্রথম অপরাধে বা অপহৃত দ্রব্যের মূল্য চারি 'দিনার' (স্বর্ণ মুদ্রা)-এর কম হ'লে, চোরকে 'তাজির' বা ভৎর্সনা করা হ'ত। কিন্তু উহাতেও অপরাধীর কোন শিক্ষা না হ'লে এবং পুনরায় সে এই অভিযোগে অভিযুক্ত হ'লে যে পর্য্যন্ত না সে অনুতাপ করে সে পর্য্যন্ত তাকে কারাগারে রাখা হ'ত। এবারেও তার চৈতন্য না হ'লে অনেক দিন পর্য্যন্ত কারাবাস (সিয়াসৎ) বা প্রাণদণ্ড দেওয়া হ'ত। স্বত্ব প্রমাণিত হ'লে মালিক চোরাই মাল ফিরিয়ে পেতেন, নতুবা ইহা 'সরকারী খাজনায়' (বয়েত-উল্-মাল) জমা দেওয়া হ'ত।

৪। দুইবার চুরি করার পর প্রত্যেক বারেই হিদ দেওয়া সত্ত্বেও যদি কেহ পুনরায় চুরি করে বা চুরি করাটাই যদি তার স্বভাব হয়, তাহ'লে তাকে 'তাজির' দেওয়ার পর কারারুদ্ধ করা হ'ত। এতেও না শোধরালে তাকে যাবজ্জীবন কারাগারে পাঠান হ'ত।

৫। কবর খুঁড়ে মৃতদেহ বাহির করার অপরাধে, প্রথম অপরাধের জন্য মাত্র ভৎর্সনা। দ্বিতীয় বা পরবর্ত্তী অপরাধের জন্য নির্ব্বাসন বা হস্তচ্ছেদ।

৬। রাস্তায় ডাকাতী করার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজের দোষ স্বীকার করলে তাকে যথাযথ শাস্তিবিধান করা হ'ত। অপরাধ দোষীর প্রাণদণ্ডের উপযোগী না হ'লেও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বা বিচারক প্রাণদণ্ডের পক্ষ-পাতী হ'লে এই শাস্তিবিধানই যুক্তিসঙ্গত ছিল।

৭। চোরাই মাল কারও কাছ থেকে পাওয়া গেলে বা সে চোরের সহকারী ব'লে প্রমাণিত হ'লে প্রথম অপরাধের জন্য 'তাজির', দ্বিতীয় অপরাধের জন্য কিছু দিনের কারাবাস ও পরবর্ত্তী অপরাধে যাবজ্জীবন কারাবাস। চোরাই মাল উপরোক্ত তৃতীয় দফার ন্যায় মালিককে ফেরৎ দেওয়া হ'ত, নয় খাজনায় জমা দেওয়া হ'ত।

৮। পেশাদারী ডাকাতদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হ'ত।

৯। জমিদার অথচ পেশাদারী ডাকাতদের শাস্তি ৮ম দফার মত।

১০। কোন ঠগের বিরুদ্ধে পথিককে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে বধকরণের অভিযোগের প্রমাণাভাব হ'লেও তাকে তাজির এবং পরিশেষে কারারুদ্ধ করাই ছিল রীতি। অধিকন্তু ইহা তার পেষা বলে বিবেচিত বা প্রমাণিত হ'লে, বা সে জনসমাজে বা প্রাদেশিক কর্ত্তার নিকট এই কাজে নিযুক্ত

ব'লে পরিচিত থাকলে, বা হত ব্যক্তিকে গলা টিপে মেরে ফেলার কোনো চিহ্ন বা অপরাধ বাহির হ'লে, বা সুবাদার ও আদালতের অন্য কোন কর্ম্মচারীর নিকট এই কাজের জন্য দায়ী ব'লে বিবেচিত হ'লে তার প্রাণদণ্ড হ'ত।

১১। চুরি, রাহাজানি, লোককে গলা টিপে বা অন্য কোনো উপায়ে মেরে ফেলা বা তৎসংক্রান্ত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি সুবাদার বা আদালতের কর্ম্মচারীর নিকট অপরাধী বিবেচিত হ'লে তাকে কারাবাস দেওয়া হ'ত। কারও বিরুদ্ধে এই অপরাধ আনীত হ'লে সেই মুহূর্ত্তেই অভিযোক্তাকে কাজীর নিকট যথাবিধি অভিযোগ করতে হ'ত।

১২। ঘরে অগ্নিসংযোগ, জনসমাকীর্ণ স্থানে চুরি, ধুতুরা বা সিদ্ধি খাওয়ান প্রভৃতি অপকর্ম্মের জন্য ধৃত ব্যক্তিকে ভৎর্সনা ও কারাবাস এবং অনুতাপ করা সত্বেও পুনরায় এই অপরাধ করলে প্রাণদণ্ড দেওয়া হ'ত। বাড়ী পুড়ে যাওয়ার দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ করা হ'ত; এবং চোরাই মাল মালিককে ফেরৎ দেওয়া হ'ত।

১৩। বাদশাহের বিপক্ষে কোনো বিদ্রোহী যুদ্ধের আয়োজন করলে তাকে ধৃত ও কারারুদ্ধ করা গর্হিত বিবেচিত হ'ত না। তাদের ঘাঁটি আক্রমণ ক'রে যতক্ষণ না সে বা তার সহকর্ম্মিগণ ছত্রভঙ্গ হ'ত, তাদের আহত বা মুমূর্ষুদের বধ করাই রীতি ছিল। পলায়নকারীকে হত্যা বা আক্রমণ করা হ'ত না। বিপক্ষের কেহ বন্দী হ'লে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাদের দল ভেঙে যায়, ততক্ষণ তাদের বন্দী রাখা হ'ত বা মেরে ফেলা হ'ত, কিন্তু কেহ স্বীয় অপকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করলে তার বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি তাকে প্রত্যর্পণ করা হ'ত।

১৪। কৃত্রিম মুদ্রাকারীদের প্রথম অপরাধের জন্য 'তাজির' বা ভৎর্সনা করা হ'ত; ইহাতেও তা'দের স্বভাব না বদলালে তাদের কারারুদ্ধ করাই ন্যায়সঙ্গত ছিল। পরবর্ত্তী অপরাধ হেতু বহুকালের জন্য কারাদণ্ড বিধেয় ছিল।

১৫। কেহ জেনে শুনে কৃত্রিম মুদ্রা খরিদ করলে তাকে ১৪শ দফা অনুযায়ী দণ্ড দেওয়া হ'ত। তবে তফাতের মধ্যে এই ছিল যে, এ ক্ষেত্রে অপরাধীকে অনেকদিনের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হ'ত না।

১৬। কেহ না জেনে শুনে কৃত্রিম মুদ্রা ব্যবহার করলে তার জাল টাকাগুলিই কেবল নষ্ট ক'রে দেওয়া হ'ত।

১৭। নিজেকে অ্যালকেমিষ্ট ব'লে প্রচার করে কেহ অপরের সম্পত্তি হরণ করলে তাকে 'তাজির' ও কারাবাস দেওয়া হ'ত এবং পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় দফা অনুযায়ী মালিককে তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হ'ত।

১৮। বিষপ্রয়োগের দণ্ড 'তাজির' ও কারাবাস।

১৯। অসদুপায়ে পরের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা গ্রহণ করায় দণ্ড ছিল কারাবাস। তবে মালিককে তার জিনিষ ফিরিয়ে দিলে অপরাধ মার্জ্জনা করা হ'ত। প্রত্যর্পণের পূর্ব্বে অপহৃত স্ত্রী পুত্র বা কন্যার মৃত্যু ঘটলে অপরাধীর দণ্ড কঠিন 'তাজির' এবং পরে খালাস বা 'তাসির' ও নির্ব্বাসন। দূতী বা দুষ্কর্ম্মের উত্তরসাধকগণকে কারারুদ্ধ করা হ'ত।

২০। জুয়াখেলা অপরাধের জন্য 'তাজির' এবং কারাবাস। পুনরায় দোষ করলে অনেক দিনের জন্য কারাবাস। সম্পত্তি মালিককে প্রত্যর্পণ করা হ'ত বা সরকারে জমা রাখা হ'ত।

২১। শহরের বা গ্রামের মদ্যবিক্রয়কারীকে প্রহার দেওয়ারই ব্যবস্থা দেখা যায়। পরবর্ত্তী অপরাধের জন্য কারাবাস, যতদিন না অপরাধী শোধরায়।

২২। মদবিক্রয়কারীর জন্য ঘুষী ও কারাবাস। তবে কোনো পদস্থ কর্ম্মচারী এই অপরাধে অভিযুক্ত হ'লে ঘটনাটি বাদশাহের শ্রুতিগোচর করান হ'ত এবং অপরাধীর জন্য ব্যবস্থা প্রহার বা তিরস্কার।

২৩। সিদ্ধি বা অপর কোনো মাদকদ্রব্য বিক্রয়কারীর জন্য তীব্র ভৎর্সনা, উপর্য্যুপরি এই অপরাধের শাস্তি ছিল কারাবাস, যতদিন না সে স্বীয় কর্ম্মের জন্য অনুতাপ ক'রে।

২৪। জলে ডুবিয়ে মারা, কূয়ার মধ্যে ফেলে দেওয়া, পাহাড় বা ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া প্রভৃতি অপরাধের জন্য কারাবাস। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী

বা আত্মীয়েরা অপরাধীর নিকট হ'তে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থ পেত। পুনরায় এই অপরাধ করলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ত।

২৫। কোনো পরদারগামী অসৎ উদ্দেশ্যে অপরের বাড়ী প্রবেশ করলে তাজির এবং কারাবাস।

২৬। প্রাদেশিক কর্ত্তার কাছে মিথ্যা অভিযোগ এনে পরের অর্থক্ষতি করলে এবং এই অপরাধ অভিযুক্ত ব্যক্তির পেশা ব'লে প্রমাণিত হ'লে মৃত্যুদণ্ড, নতুবা ভর্ৎসনা ও কারাবাস। অপরাধীকে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ অর্থদণ্ড দিতে হ'ত।

২৭। কোনো বিধর্ম্মী স্ত্রী বা পুরুষ কোনো মুসলমানকে স্ত্রী বা পুরুষ দাসরূপে গ্রহণ করলে, কিংবা মুসলমান স্ত্রী গ্রহণ করলে বা কোনো মুসলমান বিধর্ম্মী স্ত্রী গ্রহণ করলে রাজকীয় বিধি অনুযায়ী দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। তবে কোনো বিধর্ম্মী ইহুদী বা খৃষ্টানকে যাদের People of the book বলা হ'য়েছে—দাস বা স্ত্রীরূপে গ্রহণ ক'রলে দণ্ড পেত না।

২৮। যদি কোনো বারাঙ্গনা, পরদারগামী, অস্বাভাবিক গমনকারী, মাতাল, প্রলোভন দ্বারা স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনাশকারী বা তার চেষ্টাকারী ও স্বধর্ম্মত্যাগী, কাজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বা কোনো দাসী বা দাস নিজেদের মালিকের কাছ থেকে পলায়ন করে এবং যদি তারা কোনো মহাজন ব্যবসায়ী বা দেওয়ানী কর্ম্মচারীর নিকট আইনের দোহাই দিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করে, তাহ'লে কাজীর পরামর্শানুযায়ী কাজ করাই বিধেয় ছিল।

২৯। হত্যার অভিযোগ প্রমাণিত হ'লে বা সে যে হত্যাকারী এটা খুবই সত্য বলে বিবেচিত হ'লে তাকে কয়েদ রেখে বাদশাহকে খবর দেওয়া রীতি ছিল।

৩০। কোনো বিধর্ম্মী সর্দ্দার অন্য কা'কেও নিজের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করার জন্য উৎসাহিত করলে মৃত্যুদণ্ডই ছিল ব্যবস্থা।

৩১। পরের ছেলেকে জোর ক'রে খোজা করার অপরাধে ভর্ৎসনা ও কারাবাস, অনুশোচনা করলে তার মুক্তি।

৩২। ফৌজদার বা অন্য কোনো কর্ম্মচারী দ্বারা কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি সুবাদারের কাছে প্রেরিত হ'লে সুবাদারকে বিশেষ অবধানতাসহকারে ঘটনা তদারক করতে হ'ত। সরকারী খাজনা সম্পর্কীয় মোকদ্দমায়, সুবাদার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রাজস্ববিভাগের কর্ম্মচারীর নিকট পাঠিয়ে দিয়ে যাতে মামলাটি শীঘ্র শীঘ্র শেষ হয় এরূপ আজ্ঞা দিত। তবে রাজস্বঘটিত মামলা না হ'লে উপরিলিখিত কোনো একটি দফা অনুযায়ী নিজেকে যথাবিহিত করতে হ'ত। মাসের মধ্যে একদিন সুবাদার 'কাছারী' বা 'পুলিশ চবুতরায়' অবরুদ্ধ কয়েদীদের খবর নিতেন। হয় নির্দ্দোষীকে মুক্তি দিতেন, নয় সত্বর যা'তে মামলাটি শেষ হয় এমন করতেন।

রাজস্ববিভাগীয় কোনো কর্ম্মচারী বা কোনো সাধারণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তি কোতওয়ালের অধীনস্থ কর্ম্মচারী দ্বারা ধৃত হয়ে কোতওয়ালির 'চবুতরায়', যাকে ইতিপূর্ব্বে 'পুলিশ চবুতরা' বলা হয়েছে—আনীত হ'লে কোতওয়াল নিজে অভিযোগ তদারক করতেন, নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হ'লে আসামীকে খালাস দিতেন; কখনও বা অভিযোক্তাকে আদালতে গিয়ে ব্যবস্থানুযায়ী নালিশ করতে বলতেন। রাজস্বসম্পর্কীয় মোকদ্দমায় কোতওয়াল সুবাদারকে ঘটনাটি জানিয়ে তার পরামর্শানুযায়ী 'সনদ' নিয়ে যথাবিহিত করতেন। কাজী সাহেব কোনো লোককে ধরে আনতে আজ্ঞা দিলে, কাজীর হুকুম ক্ষমতাবিশিষ্ট বিবেচনা ক'রে, কোতওয়াল আসামীকে হাজতে রাখতেন। কাজীর দ্বারা বিচারের দিন স্থির হ'লে আসামীকে আদালতে পাঠান হ'ত, পরন্তু বিচারের দিন ধার্য্য না হ'লেও তাকে প্রত্যহ আদালতে পাঠিয়ে যাতে শীঘ্র শীঘ্র মামলাটি শেষ হয়, কোতওয়ালকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হ'ত।*

* ভাগলপুর অধ্যাপক সঙ্ঘের ৩২শ অধিবেশনে পঠিত। যদুনাথ সরকার মহাশয়ের *Mughal Administration* হইতে এই প্রবন্ধের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে।

শব্দ-চয়ন

বাংলা ভাষায় গদ্য লিখ্‌তে নতুন শব্দের প্রয়োজন প্রতিদিনই ঘটে। অনেক দিন ধ'রে অনেক রকম লেখা লিখে এসেছি। সেই উপলক্ষ্যে অনেক শব্দ আমাকে বানাতে হ'ল। কিন্তু প্রায়ই মনের ভিতরে খটকা থেকে যায়। সুবিধা এই যে, বার বার ব্যবহারের দ্বারাই শব্দবিশেষের অর্থ আপনি পাকা হয়ে ওঠে, মূলে যেটা অসঙ্গত, অভ্যাসে সেটা সঙ্গতি লাভ করে। তৎসত্ত্বে সাহিত্যের হট্টগোলে এমন অনেক শব্দের আমদানি হয়, যা ভাষাকে যেন চিরদিনই পীড়া দিতে থাকে। যেমন 'সহানুভূতি'। এটা sympathy শব্দের তর্জ্জমা। 'সিম্প্যাথি'-র গোড়াকার অর্থ ছিল 'দরদ'। ওটা ভাবের আমলের কথা, বুদ্ধির আমলের নয়। কিন্তু ব্যবহারতঃ ইংরেজীতে 'সিম্প্যাথি'র মূল অর্থ আপন ধাতুগত সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই কোনো একটা প্রস্তাব সম্বন্ধেও সিম্প্যাথি-র কথা শোনা যায়। বাংলাতেও আমরা ব'লতে আরম্ভ করেছি—'এই প্রস্তাবে আমার সহানুভূতি আছে'। বলা উচিত, 'সম্মতি আছে', বা 'আমি এর সমর্থন করি'। যাই হোক্—সহানুভূতি কথাটা যে বানানো কথা এবং ওটা এখনো মানান-সই হয়নি, তা বেশ বোঝা যায়—যখন ও শব্দটাকে বিশেষণ করবার চেষ্টা করি। 'সিম্প্যাথিটিক্'-এর কী তর্জ্জমা হ'তে পারে, 'সহানুভৌতিক', বা 'সহানুভূতিশীল', বা 'সহানুভূতিমান্'? ভাষায় যেন খাপ খায় না—সেই জন্যেই আজ পর্য্যন্ত বাঙালী লেখক এর প্রয়োজনটাকেই এড়িয়ে গেছে। দরদের বেলা 'দরদী' ব্যবহার করি, কিন্তু সহানুভূতির বেলায় লজ্জায় চুপ ক'রে যাই। অথচ সংস্কৃত ভাষায় এমন একটি শব্দ আছে, যেটা একেবারেই তথার্থক। সে হচ্চে 'অনুকম্পা'। ধ্বনিবিজ্ঞানে ধ্বনি ও বাদ্যযন্ত্রের তারের মধ্যে সিম্প্যাথি-র কথা শোনা যায়---যে সুরে বিশেষ কোনো তার বাঁধা, সেই সুর শব্দিত হ'লে সেই তারটি অনুকম্পিত ও 'অনুধ্বনিত হয়। এই ত 'অনুকম্পন'। অন্যের বেদনায় যখন আমার চিত্ত ব্যথিত হয়, তখন সেই ত ঠিক 'অনুকম্পা'। 'অনুকম্পায়ী' কথাটা সংস্কৃতে আছে। 'অনুকম্পাপ্রবণ' শব্দটাও মন্দ শোনায় না। 'অনুকম্পালু' বোধ করি ভালোই চলে। মুস্কিল এই যে, দখলের দলিলটাই ভাষায় স্বত্বের দলিল হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র এই কারণেই 'কান, সোনা, চুন, পান' শব্দগুলোতে মূর্দ্ধন্য ণ-য়ের অনধিকার নিরোধ করা এত দুঃসাধ্য হয়েচে। ছাপাখানার অক্ষর-যোজকেরা সংশোধন মানে না। তাদের প্রশ্ন করা যেতে পারত যে, কানের এক সোনায় যদি মূর্দ্ধন্য ণ লাগ্‌ল, তবে অন্য শোনায় কেন দন্ত্য ন লাগে। 'শ্রবণ' শব্দের রফলা লোপ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মূর্দ্ধন্য ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ মতেই দন্ত্য ন হয়েচে। অথচ 'স্বর্ণ' শব্দ যখন রেফ বর্জ্জন ক'রে 'সোনা' হ'ল, তখন মূর্দ্ধন্য ণ-য়ের বিধান কোন্ মতে হয়? হাল আমলের নতুন সংস্কৃত পোড়োরা 'সোনা'কে শোধন ক'রে নিয়েচেন, তাঁদের স্বকল্পিত ব্যাকরণবিধির দ্বারা। এখন দখল প্রমাণ ছাড়া স্বত্বের অন্য প্রমাণ অগ্রাহ্য হ'য়ে গেল। 'শ্রবণ' শব্দের অপভ্রংশ শোনা শব্দ যখন বাংলা ভাষায় বানান-দেহ ধারণ করেছিল, তখন বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রাচ পণ্ডিতেরা বিধানকর্ত্তা ছিলেন—সেদিনকার বানানে কান সোনা প্রভৃতিরও মূর্দ্ধন্যত্ব প্রাপ্তি হয়নি।

কিছুকাল পূর্ব্বে যখন ভারতশাসনকর্ত্তারা 'ইণ্টার্‌ন্' সুরু ক'রলেন, তখন খবরের কাগজে তাড়াতাড়ি একটা শব্দ সৃষ্টি হ'য়ে গেল—'অন্তরীণ'। শব্দসাদৃশ্য ছাড়া এর মধ্যে আর কোনো যুক্তি নেই। বিশেষণে ওটা কী হতে পারে, তাও কেউ ভাবলেন না। Externment-কে কি ব'ল্‌তে হবে 'বহিরীণ'? অথচ 'অন্তরায়ণ, অন্তরায়িত, বহিরায়ণ, বহিরায়িত' ব্যবহার ক'রলে আপত্তির কারণ থাকে না, সকল দিকে সুবিধাও ঘটে।

নূতন সংঘটিত শব্দের মধ্যে কদর্য্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা।' প্রথমতঃ শিক্ষার মূলের দিকে বাধ্যতা নয়, ওটা শিক্ষার পিঠের দিকে। বিদ্যাদান বা বিদ্যালাভই হচ্চে শিক্ষার মূলে—তার প্রণালীতেই 'কম্পাল্‌শন্'। অথচ 'অবশ্য-শিক্ষা' শব্দটা বলবামাত্র বোঝা যায় জিনিষটা কি। 'দেশে অবশ্য-শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা উচিত'—কানেও শোনায় ভালো, মনেও প্রবেশ করে সহজে। 'কম্পাল্‌সারি এডুকেশন'-এর বাংলা যদি হয় 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা', 'কম্পাল্‌সারি সাবজেক্ট' কি হবে 'বাধ্যতামূলক পাঠ্য-বিষয়'? তার চেয়ে 'অবশ্য-পাঠ্য বিষয়', কি সঙ্গত ও সহজ শোনায় না? 'ঐচ্ছিক' (optional) শব্দটা সংস্কৃতে পেয়েছি, তারি প্রতিবর্গে 'আবশ্যিক' শব্দ ব্যবহার চলে কি না, পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করি। ইংরেজীতে যে সব শব্দ অত্যন্ত সহজ ও নিত্য প্রচলিত, দরকারের সময় বাংলায় তার প্রতিশব্দ সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন তাড়াতাড়ি যা হয় একটা বানিয়ে দিতে হয়। সেটা অনেক সময় বেখাপ হ'য়ে দাঁড়ায়, অনেক সময় মূল ভাবটা ব্যবহার করাই স্থগিত থাকে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় হয় ত তার অবিকল বা অনুরূপ ভাবের শব্দ দুর্লভ নয়। একদিন 'রিপোর্ট' কথাটার বাংলা করবার প্রয়োজন হয়েছিল। সেটাকে বানাবার চেষ্টা করা গেল, কোনটাই মনে লাগল না। হঠাৎ মনে পড়ল কাদম্বরীতে আছে 'প্রতিবেদন'---আর ভাবনা রইল না। 'প্রতিবেদন, প্রতিবেদিত, প্রতিবেদক'---যেমন ক'রেই ব্যবহার করো, কানে বা মনে কোথাও বাধে না। জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি---'ওভারপপ্যুলেশন'---বিষয়টা আজকাল খবরের কাগজের একটা নিত্য আলোচ্য; কোমর বেঁধে ওর একটা বাংলা শব্দ বানাতে গেলে হাঁপিয়ে উঠ্‌তে হয়;---সংস্কৃত শব্দকোষে তৈরি পাওয়া যায়, 'অতিপ্রজন'। বিদ্যালয়ের ছাত্র সম্বন্ধে 'রেসিডেণ্ট', 'নন-রেসিডেণ্ট' বিভাগ করা দরকার, বাংলায় নাম দেবো কি? সংস্কৃত ভাষায় সন্ধান ক'রলে পাওয়া যায় 'আবাসিক', অনাবাসিক'।...

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৬) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি?

য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি?—এপ্রশ্ন আজকাল য়ুরোপীয়েরাও জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছেন।...য়ুরোপের গত যুদ্ধ সে দেশের লোকের আত্মপ্রসাদের সুখস্বপ্ন ভাঙিয়ে দিয়েছে। উক্ত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায়

হঠাৎ জেগে উঠে তারা এটা কি, ওটা কি, জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছে। য়ুরোপের লোক পরস্পর মারামারি কাটাকাটি ক'রে মরণের মুখে অগ্রসর হয়েছিল; সে কাঁড়া কাটিয়ে উঠে এখন তাদের প্রধান ভাবনা হয়েছে, কি ক'রে তারা ভবিষ্যতে আত্মরক্ষা করবে। ফলে সকল জাতিকে একদলবদ্ধ করবার চেষ্টা সে দেশের পলিটিসিয়ানরা করছেন।...কিন্তু মনোরাজ্যে ঐক্য স্থাপন না করতে পারলে য়ুরোপীয়ের জীবনে যে ঐক্য থাকবে না, ধ'রে-বেঁধে যে ফ্রান্সের সঙ্গে জার্ম্মানীর পিরীত করানো যাবে না,—এই মোটা সত্যটি সে দেশের সূক্ষ্মদর্শী লোকদের চোখে পড়েছে।...

প্রথমেই এ বিষয়ে জনৈক জর্ম্মান পণ্ডিতের মত শোনা যাক্। Dr. Haas য়ুরোপের একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, এবং সেই সঙ্গে সহজ দার্শনিক। কারণ, তিনি জাতিতে জর্ম্মান।...

পুরাকালে ভারতবর্ষে বৈদান্তিকরা যখন বলেন যে, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা," তখন মীমাংসকরা উত্তরে বলেন, এ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? ব্রহ্ম যদি থাকেন ত এত বড় সত্য সম্বন্ধে কার জ্ঞান নেই? দ্বিতীয়তঃ, এ জিজ্ঞাসার ফলই বা কি? মানুষের কর্ম্মজীবনের উপর এ জ্ঞানের ফল কি? এ যুগেও তেমনি য়ুরোপের কর্ম্মীর দল, "য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি?"—এ প্রশ্ন শুনে এ কথা বলতে পারেন যে, য়ুরোপীয় সভ্যতা ব'লে যদি কোন বস্তু থাকে ত, সেই প্রকাণ্ড জল-জ্যান্ত সত্যের প্রতি কে অন্ধ? আর তার গূঢ় মর্ম্ম জেনেই বা কার কি লাভ? এ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের কর্ম্মজীবনের কি ইতরবিশেষ করবে?...

এখন এ জিজ্ঞাসার সার্থকতা কি, তা Deutsche Hochschule *fur* Politik-এর শিক্ষকের মুখে শোনা যাক্। য়ুরোপীয়েরা যে প্রকৃত পক্ষে একজাতি, এ বিষয়ে য়ুরোপের সকল জাতির সজাগ হওয়া উচিত, নচেৎ য়ুরোপীয় সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য। তিনি বলেছেন যে, অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, জ্ঞাতি-শত্রুতায় বলক্ষয় না ক'রে য়ুরোপের বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য হচ্ছে, তার সম্মিলিত শক্তির দ্বারা বহিঃশত্রুকে পরাভূত করা; আর এই বহিঃশত্রু হচ্ছে এসিয়া।...

যেমন উক্ত জর্ম্মান পণ্ডিতের মতে সমগ্র য়ুরোপ একমন, একপ্রাণ, তেমনি তাঁর বিশ্বাস, সমগ্র এসিয়াবাসীরাও একমন ও একপ্রাণ; আর সে মনের একমাত্র প্রবৃত্তি হচ্ছে, য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সমূলে বিনাশ করা। এ হচ্ছে ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মান কাইসরের প্রসিদ্ধ আবিষ্কার। কারণ, এসিয়াবাসীরা যে য়ুরোপের মারাত্মক শত্রু, তার কোনও বাহ্য প্রমাণ নেই। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে যে-এসিয়া মারবে—সে-এসিয়া বোধ হয় এখন গোকুলে বাড়ছে; কারণ, তার সন্ধান সকলে জানে না।...কিন্তু সে যাই হোক, পণ্ডিতমহাশয়ের বক্তব্য বোঝা যাচ্ছে। পৃথিবীর অপর ভূভাগের উপর যদি মালিকি-স্বত্ব বজায় রাখতে হয় ত, য়ুরোপীয়দের দলবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, এবং এই কারণেই তাঁর মতে "League of Nations, Disarmament, Economic conferences, Intellectual co-operation" প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে।...

য়ুরোপীয়দের বিশেষত্ব কোথায়, তার সন্ধান নিতে হ'লে প্রথমেই জানা দরকার, য়ুরোপ বলতে কি বোঝায়?

অধ্যাপক Haas-এর মতে য়ুরোপের অর্থ, একটি বিশেষ ভূভাগ নয়; কেন-না, পুরাকালে ভৌগোলিক-হিসেবে য়ুরোপের যে স্বাতন্ত্র্যই থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে সে স্বাতন্ত্র্য নেই, অন্ততঃ থাকবে না। কারণ, "Everything connected with space, position and distance is steadily dwindling in importance."...

অবশ্য অধ্যাপক Haas ঠিক যে কি বলেছেন, তা বোঝা যায় না দেশকালের ব্যবধান অতিক্রম করবার কৌশল আজ মানুষের করায়ত্ত তাই ব'লে নানাদেশের যে position বদলে গেছে, তা নয়—অবশ্য position ব'লে বস্তুর যদি কোন অবস্থা থাকে। নব-অঙ্কের ঠেলায় here শুনছি now হয়ে গিয়েছে। সে যাই হোক, বিলেতও ভারতবর্ষ হয়ে যায়নি, ভারতবর্ষও বিলেত হয়ে যায়নি। এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের physical ব্যবধান কমে গিয়েছে বলেই, তাদের ভিতর psychological ব্যবধানটা ফুটিয়ে তোলাই বোধ হয় অধ্যাপক মহাশয়ের উদ্দেশ্য। কারণ, এসিয়ার সঙ্গে য়ুরোপের decisive struggle-এর জন্য স্বদেশের যুবকদের মন প্রস্তুত করাই তাঁর অভিপ্রায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা মানুষের গুণাগুণের মূল সন্ধান করেছিলেন, এবং তা পেয়েছিলেন মাটির অন্তরে। বলা বাহুল্য যে, এ প্রবন্ধে আমি বাঙলা মাটিশব্দ সংস্কৃত পঞ্চভূত অর্থেই ব্যবহার করছি।...তারপর পণ্ডিতরা আবিষ্কার করলেন, সে ব্যাখ্যা অচল। একমাত্র জিওগ্রাফিই যে সভ্যতা গড়ে, এ কথা সত্য নয়। কারণ, তা যদি হয়, তা হ'লে Red-Indian-দের সঙ্গে বর্ত্তমান American-দের সভ্যতার, অর্থাৎ—কৃত্তিভের আকাশ-পাতাল প্রভেদ হত না। এর থেকে দেখা যায় যে, মানব-সভ্যতার অন্তরে soil নয়, race; ক্ষেত্র নয়, বীজই প্রবল। ক্ষেত্র ও বীজের বলাবলের বিচার মনুতেও আছে; অর্থাৎ এ সমস্যা বহু পুরাতন।

এই বস্তাপচা বিচার ethnology, anthropology প্রভৃতি নাম ধারণ ক'রে নব-বিজ্ঞানরূপে পরিচিত হ'ল। এই নব-বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করলেন যে, মানবজাতির মধ্যে Aryan নামে এক দেবজাতি আছে। সেই জাতিই মানবসভ্যতা অতীতে গড়েছে, আর ভবিষ্যতেও গড়বে। কারণ, progress পকরা তাদের জাতিধর্ম্ম। আর এই জাতি মাটি ফুঁড়ে উঠেছিল উত্তর-জর্ম্মানীতে। মানুষের মধ্যে য়ুরোপীয়রা শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাদের ধমনীতে নীললোহিত আর্য্যশোণিত তেড়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এ বিষয়েও তাদের মনে এখন সন্দেহ জন্মেছে। তাই অধ্যাপক Haas বলেছেন, "It is true that Europe is on the whole inhabited by Aryan peoples, but the same Aryans have produced quite a different culture in India."...

অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল ক্ষেত্রও নয়, বীজও নয়।

য়ুরোপ বলতে লোকে যা বোঝে, তার মর্ম্ম য়ুরোপের মাটির অন্তরেও পাওয়া যাবে না, য়ুরোপীয়দের দেহের অন্তরেও পাওয়া যাবে না। কারণ, মানব-সভ্যতার সৃষ্টি জিওগ্রাফি করে না, করে হিষ্টরি; মানুষের দেহ করে না, করে তার মন। এই কারণে, "It is only as a spiritual and cultural entity that Europe can have a meaning for us."...অধ্যাপক মহাশয় বলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিকরা, যথা—Voltaire, Rousseau প্রভৃতি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীময় মানুষের একই চরিত্র, এবং Pekin থেকে Paris পর্য্যন্ত মানুষমাত্রই এক গোত্রজ। আর সে গোত্রের নাম মানব-গোত্র।...কিন্তু আজকের দিনে "Biology teaches us that every kind of living organism has a world of its own." অর্থাৎ—মানুষমাত্রেই এক জগতে বাস করে না, কেউ করে ব্রহ্মার সৃষ্ট পৃথিবীতে, কেউ বা আবার বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট জগতে। অতএব মানুষে মানুষে কতক অংশে মিল থাকলেও, অনেক অংশে প্রভেদ আছে।...

সুতরাং এ ক্ষেত্রে "what is the specifically European element"-এরই অনুসন্ধান করতে হবে ;…কোন্ গুণে সকল য়ুরোপীয় এক, এবং অন্-য়ুরোপীয়দের সঙ্গে পৃথক, তাই হচ্ছে জিজ্ঞাস্য। এখন এ জিজ্ঞাসার মীমাংসা শোনা যাক।

য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল কোথায় নিহিত ? অধ্যাপক মহাশয় বলেন যে, এ সভ্যতা য়ুরোপীয় spirit থেকে উদ্ভূত হয়েছে।…এ প্রবন্ধে আমি European spirit-কে য়ুরোপীয় আত্মা বলব; কিন্তু সে আত্মাকে অহং অর্থেই বুঝতে হবে।

য়ুরোপীয় আত্মার বিশিষ্টতা যে কি, তার পরিচয় নিতে হবে উক্ত আত্মার আত্মপ্রকাশ থেকে।…বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতা হচ্ছে আসলে ব্যাবহারিক সভ্যতা।…

প্রকৃতির বশীকরণের মন্ত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছেন য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকরা। কিন্তু এ মন্ত্র লাভ করা সাধনাসাপেক্ষ। য়ুরোপীয় আত্মা এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে।…কিন্তু য়ুরোপীয়রা প্রকৃতিকে দাসীগিরি করাবার জন্য বিজ্ঞানের সাধনা করে নি, করেছিল শুধু তাকে প্রকৃষ্টরূপে জানবার জন্য। এ শাস্ত্রের প্রথম সূত্র হচ্ছে 'অথাতো প্রকৃতিজিজ্ঞাসা।'…

য়ুরোপীয় আত্মার ধর্ম্মই এই যে—"to organize everything with which it has to deal, to mould everything whether it be material or spiritual, in such a way that it constitutes a unity in multiplicity." অর্থাৎ—বহুকে এক ক'রে দেখবার এবং বহুকে এক সূত্রে গাঁথবার প্রকৃতি। এক কথায়, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জগৎকে organize করবার প্রবৃত্তি ও শক্তিই হচ্ছে য়ুরোপীয় আত্মার বিশেষত্ব।…

কিন্তু প্রকৃতিকে জানবার এবং বাগ মানাবার প্রবৃত্তি সার্থক হয়েছে এই জন্য যে, কি উপায়ে তাকে জানা যায়, সে পদ্ধতি গ্রীকরা উদ্ভাবন করে ; তার পর কি উপায়ে মানুষের উপর প্রভুত্ব লাভ করা যায়, তার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে রোমানরা। তার পর মধ্যযুগে য়ুরোপীয়েরা পরলোক জয় করবার জন্য যে আত্মশক্তি সঞ্চয় করে, সেই শক্তিই এ যুগে তারা ইহলোক জয় করবার কার্য্যে প্রয়োগ করেছে। অর্থাৎ—গ্রীকদের জ্ঞান, রোমানদের কর্ম্ম, এবং মধ্যযুগের ভক্তি, এই তিনে মিলেমিশে বর্ত্তমান technical civilization-এর সৃষ্টি করেছে। অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতাকে একটি ভগবদ্গীতা বলা যায়। কারণ, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তির সমন্বয়ে এই মহাকাব্য রচিত হয়েছে ; এবং বর্ত্তমানে য়ুরোপের পক্ককষায় মন থেকেই technical civilization উদ্ভূত হয়েছে। এই হচ্ছে য়ুরোপীয় আত্মার চরম পরিণতি। এই কথাটা বুঝতে পারলেই য়ুরোপের জাতিসমূহ ভবিষ্যতে আর পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করবে না। একেই বলে জ্ঞানে মুক্তি।…

এখন এ বিষয়ে একটি ফরাসী লেখকের মতামত শোনা যাক।

Lucien Romier বিজ্ঞান কিংবা দর্শনের আচার্য্য নন, তিনি একজন প্রবন্ধলেখক সাহিত্যিক মাত্র; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জর্ম্মান অধ্যাপকের কথার অপেক্ষা, ফরাসী সাহিত্যিকের কথা ঢের বেশী সহজবোধ্য।…Romier প্রথমেই প্রশ্ন করেছেন,—qu'est-ce que l'Europe ? অর্থাৎ—য়ুরোপ বস্তু কি ? তিনি বলেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ, আজকের দিনে বিশ্ব-মানবের কাছে য়ুরোপের নামডাক অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং য়ুরোপ বলতে কি বুঝায়, তা বুঝতে হ'লে, য়ুরোপের জিওগ্রাফির এবং ইকনমিক অবস্থার জ্ঞানই যথেষ্ট নয়,—উপরন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রধান গুণগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।…

কিন্তু য়ুরোপের material civilization য়ুরোপের যথার্থ civilization নয়।…একবার চোক তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই তাদের নিজের নিজের দেশকে exploit করতে শিখছে, এবং করছে, এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে য়ুরোপের মত সমান কৃতকার্য্য হবে।…

সত্য কথা এই যে, য়ুরোপকে সৃষ্টি করেছে প্রধানতঃ হিষ্টরি—জিওগ্রাফি নয় ; অর্থাৎ—য়ুরোপীয় সভ্যতার সৃষ্টি ও স্থিতির মূল কারণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক নয়—আর তার ভিত্তি হচ্ছে একটি বিশেষ "moral and intelletcual tradition."…বস্তুজগতের উপর প্রভুত্ব যথার্থ সভ্যতার ফলমাত্র—তার মূল নয়।

গ্রীক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা ও খৃষ্টধর্ম্ম—এই তিনে মিলে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে।

গ্রীকজাতি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ভিত্তি পত্তন ক'রে গিয়েছেন। রোমানজাতি সমাজরক্ষার ও রাজ্যশাসনের নিয়ম বিধিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রেয়র চাইতে শ্রেয়র মাহাত্ম্য যুগ যুগ ধ'রে প্রচার করেছে।

খৃষ্টধর্ম্মের idealism, গ্রীক realism, ও রোমান legalism-এর মিলনের ফলে য়ুরোপীয় মানব তার গৌরব লাভ করেছে।

কিন্তু Renaissance-এর যুগ হতেই গ্রীক বিজ্ঞান, খৃষ্ট নীতি, ও রোমান রাজনীতি পরস্পর পৃথক্ হ'তে সুরু করে। য়ুরোপীয় সভ্যতার balance ভঙ্গ হয়।…শেষটা পলিটিকাল materialism যখন য়ুরোপের লোকের মনকে গ্রাস করলে, তখন গ্রীক বুদ্ধি এবং খৃষ্ট ধর্ম্মনীতি মানুষের মন থেকে খসে পড়ল। ফলে য়ুরোপীয় সভ্যতার এখন এই দুর্দ্দশা ঘটেছে। অর্থাৎ তার বাহ্য ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু ভিতরটা ফোঁপরা হয়ে গিয়েছে।

পৃথিবীর অপরাপর জাতির কাছে য়ুরোপীয়েরা এখন আর একটা বড় সভ্যতার প্রতিনিধি ব'লে মান্য নয়। এ যুগে তারা চতুর বণিক অথবা নিপুণ শিল্পী বলেই গণ্য।…আর যখন পলিটিকাল nationalism এবং industrialism-এর মূলমন্ত্র হচ্ছে অপর জাতির সঙ্গে বিরোধ, তখন যে সব জাতিকে য়ুরোপ এই নব-মন্ত্রে দীক্ষিত করবে, এবং সে মন্ত্রের সাধনে সিদ্ধিলাভ করবার যন্ত্রপাতিও তাদের দেবে, সে সব জাতি য়ুরোপের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য নিশ্চয়ই প্রস্তুত হবে। এই হচ্ছে য়ুরোপের তথাকথিত নব-সভ্যতার কর্ম্মফল।

এখন দেখা গেল যে, জর্ম্মান বৈজ্ঞানিক ও ফরাসী সাহিত্যিক উভয়ই মনে করেন যে, সম্মুখে মস্ত বিপদ আছে—অর্থাৎ য়ুরোপীয় সভ্যতা এখন টলমল করছে। তার পর য়ুরোপীয় সভ্যতা যে গ্রীক জ্ঞান, রোমান রাজনীতি ও খৃষ্টধর্ম্ম, এ তিনের সমবায়ে গড়ে উঠেছে, এ বিষয়েও উভয়েই একমত। শুধু বর্ত্তমান সভ্যতার রূপগুণ সম্বন্ধে তাঁদের মতে মেলে না।

জর্ম্মান অধ্যাপকের মতে technical civilization হচ্ছে য়ুরোপীয় সভ্যতার চরম পরিণতি ; ফরাসী লেখকের মতে কিন্তু তা অবনতি। কারণ সভ্যতার যা প্রাণ—অর্থাৎ intellectual and moral tradition—বর্ত্তমান য়ুরোপ তার থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে।

ফরাসী লেখক বলেন যে, য়ুরোপের মনে আবার কেউ যদি ধর্ম্মজ্ঞান উদ্‌বুদ্ধ করতে পারে, তা হলেই য়ুরোপীয় সভ্যতা রক্ষা পায়, কিন্তু তা করবে কে ?…

য়ুরোপ যখন গ্রীক সাহিত্যের ও রোমান রাজনীতির সন্ধান পেলে,

তখন মধ্যযুগের সভ্যতার অবসান হ'ল। যেমন এ যুগে আমরা য়ুরোপের জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গের সন্ধান পেয়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অবলম্বিত ভক্তিমার্গ ত্যাগ করেছি।...

এর থেকে দেখা যায় যে, কোন জাতিবিশেষ যে অংশে সভ্য, সে অংশে অমর। শুধু তাই নয়, যে-ই সত্যের সন্ধান পাক না কেন, সে সত্য সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। গ্রীক জাতি মারা গেল, কিন্তু তার দর্শনবিজ্ঞান সাহিত্যের উত্তরাধিকারী হ'ল বিশ্বমানব। রোমান জাতি বিনষ্ট হ'ল, কিন্তু তার সাহায্যে য়ুরোপের তির্য্যক্ সামান্ত অসভ্য জাতিরা মধ্যযুগের সভ্যতা গ'ড়ে তুল্লে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সাহায্যে। মধ্যযুগের ব্রহ্মবিদ্যা (theology) গ'ড়ে উঠেছে আরিষ্টটলের দর্শনের ভিত্তির উপর; এবং তার খৃষ্টসঙ্ঘ (church) গ'ড়ে উঠেছে রোমান রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুকরণে।

সভ্যতা বল্‌তে অধিকাংশ লোকে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও আর্ট বোঝে না—বোঝে অর্থ ও স্বার্থ; এবং তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুলও নয়। অর্থ ও কাম, প্রবৃত্তিরেষা নরাণাম্।...বর্ত্তমান য়ুরোপ, যে বিদ্যার বলে মানুষে অর্থ সৃষ্টি করতে পারে, সে বিদ্যা অর্জ্জন করেছে। এ হিসাবে science-কেই য়ুরোপীয় মনের চরম পরিণতি বলা অত্যুক্তি নয়।

কিন্তু গ্রীক দর্শন ও রোমান আইন যেমন ও দুই সভ্যতার একচেটে জিনিষ নয়—বিশ্বমানবের সম্পত্তি; তেমনি modern science-ও বর্ত্তমান য়ুরোপের একচেটে জিনিষ নয়। এ বিদ্যা বিশ্বমানব শিখবে, এবং ফলিত বিজ্ঞানও বিশ্বমানবের করায়ত্ত হবে। ফলে এ বিষয়েও য়ুরোপের বর্ত্তমান প্রাধান্য আর থাকবে না। য়ুরোপীয় অর্থে এসিয়াও সভ্য হবে। এর জন্য য়ুরোপের ভয় পাবার কোনও দরকার নেই। কোনও সভ্যসমাজকে অপর কোন সভ্যসমাজ বিনাশ করে নি। সভ্যতার প্রধান শত্রু যে অসভ্যতা, য়ুরোপের ও এসিয়ার ইতিহাসের পাতায় পাতায় তা লেখা আছে।

এ তো গেল বহিঃশত্রুর কথা। এ ছাড়া ধ্বংসের মূল জাতির অন্তরেও থাকে। য়ুরোপের material civilization-এর মূলে যদি এই মনোভাব থাকে যে, য়ুরোপীয়েরা পরের খাটনির ফল ভোগ করবে আর পরের দেশ লুটে খাবে, তা হ'লে অবশ্য গ্রীস-রোমের মতই তার ধ্বংস অনিবার্য্য।...

য়ুরোপীয় সভ্যতার spirit হচ্ছে অহঙ্কার—এই মনের পাপই য়ুরোপের প্রধান শত্রু; এবং Haas-প্রমুখ পণ্ডিতরা এ পাপের প্রশ্রয় আজও দিচ্ছেন।

(বসুমতী, আষাঢ় ১৩৩৭) শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

—

ঋণব্যবসায়ে সংহতি

ভারতের মনীষিগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চারিটি বস্তুই বিভিন্ন লোকের পক্ষে ও বিভিন্ন অবস্থায় সেবনীয় বলিয়া মনে করিতেন। আজকাল ভারতবর্ষে অর্থের অভাবই বহু অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অর্থের অভাব দূর করিতে হইলে কৃষির উন্নতি, লুপ্তশিল্পের পুনরুদ্ধার, নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠা, এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি আবশ্যক। এই সকল কার্য্য সংসাধিত করিবার জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজন। জগতের উন্নত জাতিসমূহের মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।...

ভারতবর্ষে যে সকল ব্যাঙ্ক আছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত। এই সকল ব্যাঙ্কে ভারতবাসীর টাকা আমানত থাকে, কিন্তু ঐ টাকা দ্বারা ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের সহায়তা খুব কম পরিমাণেই হইয়া থাকে। ভারতবাসী দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্কের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এ অবস্থায় বঙ্গদেশের ঋণ-প্রতিষ্ঠানগুলি (Loan offices) দেশের একটি বিশেষ প্রয়োজন সাধন করে। এই ঋণ-প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশীয় ব্যাঙ্ক এবং দেশীয় মহাজন এই উভয়ের একটি মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া আছে। বঙ্গদেশের সামাজিক ও অর্থনীতিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য হইতেই এই লোন আফিসগুলির উৎপত্তি।...

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুরে প্রথম লোন আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন লোন অফিসের সংখ্যাপ্রায় ৮০০ দাঁড়াইয়াছে। যদি দেশের আর্থনীতিক প্রয়োজনবশতঃ এই সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিত, তবে ইহা সবিশেষ আনন্দের ব্যাপার হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক স্থলেই অবৈধ প্রতিদ্বন্দ্বিতাই এই সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ। যাহা হউক, এই লোন আফিসগুলির একটা সার্থকতা আছে। যে টাকা পূর্ব্বে ঘরে আবদ্ধ হইয়া থাকিত, লোন আফিসগুলি স্থাপিত হওয়ার পর হইতে সে টাকা এখন কাজে লাগিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক দরিদ্র কৃষক ও বিপন্ন ব্যক্তিকে মহাজনের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে। ইহাদের দ্বারা দেশের আর একটি মহৎ উপকার সংসাধিত হইয়াছে। লোন অফিস প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে দেশে সুদের হার কতক পরিমাণে কমিয়াছে।...

বঙ্গদেশের ঋণপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কাজ টাকা ধার দেওয়া। ইহাদের পরিচালকগণ যদি এই কাজের ভিতরেই নিজেদের চেষ্টা আবদ্ধ রাখেন, তাহা হইলেই ভাল হয়। কিন্তু কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, তাঁহারা অধিক পরিমাণে লাভবান হইবার জন্য নানা প্রকারের ব্যবসায়ের সহিত জড়িত হইয়া পড়েন। একসঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের কাজ করিতে গেলে কোনও কাজই সুসম্পন্ন করা যায় না। বিশেষতঃ ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞতাবশতঃ লোকসান হওয়া অসম্ভব নহে।

ঋণদান-বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। লোন আফিসগুলি অধিকাংশস্থলে জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিয়া থাকেন। তাঁহারা গহনা, কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়াও টাকা ধার দিয়া থাকেন। ইহাতে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কোন কোন স্থলে বিনা বন্ধকে শুধু লোকের জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়। এ সকল স্থলে টাকা আদায় হওয়া দুষ্কর হইয়া থাকে। জমিদারগণ অনেক সময় টাকা ধার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের এই অর্থ প্রায়ই বিলাসিতার জন্য ব্যয়িত হয়, এবং উহা হইতে দেশের কোনও উপকার সাধিত হয় না। জমিদারদিগকে টাকা ধার দেওয়ার আর একটি অসুবিধা আছে। বন্ধকী জমিদারী অনেক সময়ে লোন আফিসের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, এবং উহাদের টাকা আবদ্ধ হইয়া যায়। লোন আফিসের কর্ত্তৃপক্ষেরা এই প্রকারের কাজ যত কম করেন ততই ভাল।

যাহাতে কৃষি, শ্রমশিল্প, ও ব্যবসায়ের সুবিধা হয় এই ভাবে টাকা ধার দিলে, লোন আফিসগুলির শ্রীবৃদ্ধি হয় ও দেশের উপকার হয়। হুণ্ডির কারবার যদি লোন আফিসের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষভাবে গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধি হয় এবং ব্যবসায়ের একটা অভাব মোচন হয়। গুদামস্থিত মাল কিংবা রেল ও ষ্টীমারের

রসিদ বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিলে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না।

লোন আফিসের টাকা লাভজনকভাবে খাটাইতে হইলে একটি "সমষ্টি ব্যাঙ্ক" (Federal Bank) আবশ্যক। অনেক সময় দেখা যায় যে, যখন মফঃস্বলে লোন আফিসের হাতে টাকা পড়িয়া থাকে তখন কলিকাতায় টাকার বিশেষ টানাটানি। আবার এমনও ঘটে যে, যখন কলিকাতায় টাকা সচ্ছল, মফঃস্বলে টাকার বিশেষ দরকার। যদি লোন আফিসগুলির একটি সমষ্টি-ব্যাঙ্ক কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে উভয় অবস্থাতে টাকার সদ্ব্যবহার হইতে পারে। এই Federal Bank অন্যান্য স্থল হইতে টাকা আমানত রাখিয়া লোন আফিসগুলিকে প্রয়োজন মত অর্থ সাহায্য করিতে পারে।...

কোন কোন ছোট সহরে একাধিক লোন আফিস পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছেন। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। যদি ইঁহারা একত্র হন, তবে সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানটি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতে পারে। প্রত্যেক লোন আফিসের আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্তও যাহাতে সন্তোষজনক হয়, সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অনেক লোন আফিসের ডিরেক্টারগণ সময়াভাববশতঃ কার্য্য-পরিচালন-বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন না। এস্থলে তাঁহাদের ডিরেক্টার পদ আটকাইয়া রাখা উচিত নহে। অনেক ডিরেক্টার দূরদর্শিতার সহিত কার্য্য পরিচালন করেন না। তাঁহারা লভ্যাংশ (dividend) অতিরিক্ত পরিমাণে অংশীদারগণকে দেন, এবং উপযুক্তরূপ গচ্ছিত অর্থ-ভাণ্ডার (Reserved Fund) গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন না। ইহার ফলে লোন আফিসগুলির ভিত্তি দৃঢ়তা লাভ করে না। সুদের হারও অনেক স্থলে অত্যধিক। অল্প সুদে টাকা খাটাইলে লোন আফিসের কাজের পরিসর বাড়ে, এবং সাধারণেরও সুবিধা হয়। প্রত্যেক লোন আফিসের হিসাব যাহাতে ঠিকভাবে রাখা হয় এবং নিয়মিত অডিট হয়, এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কর্ম্মচারী-নিয়োগ-বিষয়ে লোন আফিসের কর্ত্তৃপক্ষগণের সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। সুশিক্ষিত কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী না পাইলে লোন আফিসের উন্নতি সম্ভবপর হইবে না। যাহাতে ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়, সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আবশ্যক।...

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশের ঋণ-প্রতিষ্ঠানগুলির সমবেতভাবে কার্য্য করিবার কোনও সুযোগ ছিল না। এখন "ব্যাঙ্কসংঘ" প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এই অভাব দূর হইয়াছে। প্রত্যেক লোন আফিসের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আমার একান্ত নিবেদন এই যে, তাঁহারা সকলেই এই সংঘভুক্ত হউন। "সংহতিঃ কার্য্যসাধিকাঃ"—এই পুরাতন বাক্যটি সকলেরই সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক-সংঘ পত্রিকা,
(বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৩৭) শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাদ্র-লক্ষ্মী

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

কাল্‌ও সারা রাত শূন্য-সিন্ধু
মন্থিল দেবাসুর ঃ—
মেঘ-'মন্দরে' বিজুরী-'বাসুকী'-
মন্থন-রজ্জুর
বিজড়ি' বন্ধ, আঁকড়ি' প্রান্ত
সে কি আলোড়ন অবিশ্রান্ত ;
বারিধিক্ষোভ শ্রাবণ-প্লাবনে
ছাপিল দিগ্‌-সুদূর !

মন্থন-শেষ প্রত্যূষে আজি
শান্ত অসীমা-কূল,—
সেথায় ফুটেছে শুচিসুশুভ্র
ভাদ্র-পদ্মফুল ।
কক্ষে অমৃত-আলোক-গাগরী,
চক্ষে নবীন জীবন জাগরি'
লক্ষ্মী দাঁড়াল পদ্মদলে সে
পরশি' শ্রীপদমূল !

অনাসক্তিযোগ*

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

স্বামী আনন্দ প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সপ্রেম অনুরোধে আমি যেমন শুধু সত্য প্রয়োগের উদাহরণস্বরূপ আত্মকথা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, শ্রীগীতার অনুবাদের বিষয়েও ঠিক তেমনি ঘটিয়াছিল।

"আপনি সমগ্র গীতার অনুবাদ করিয়া তাহার যে টীকা করা প্রয়োজন তাহা করিলে আমরা একবার সেটা পড়িয়া দেখিব এবং তখনি আপনি গীতার যে অর্থ করেন তাহা বুঝিতে পারিব। এখানকার ওখানকার কয়েকটা শ্লোক হইতে অহিংসানীতি প্রতিপাদন করা আমার ভাল বলিয়া মনে হয় না।" অসহযোগের যুগে স্বামী আনন্দ আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন, কথাটা আমার ঠিক মনে হইয়াছিল; আমি তখন উত্তর দিয়াছিলাম, "অবসর পাইলে করিব।" পরে যখন জেলে গেলাম তখন কিছু গভীরভাবে গীতা অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পাইলাম। লোকমান্যের জ্ঞানের ভাণ্ডার পড়িলাম। তিনি পূর্ব্বেই অত্যন্ত প্রীতির সহিত মারাঠী, হিন্দী এবং গুজরাতী অনুবাদ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, যদি মারাঠী না পড়িতে পারি- ত যেন গুজরাতী নিশ্চয়ই পড়ি। জেলের বাহিরে ত পড়িতে পারি নাই, কিন্তু জেলে গুজরাতী অনুবাদ পড়িলাম। তাহা পড়িয়া গীতার সম্বন্ধে আরও পড়িতে ইচ্ছা হইল এবং গীতা-সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলাম।

গীতার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল ১৮৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দে, এড্‌উইন্ আর্ণল্ডের পদ্যানুবাদের ভিতর দিয়া। তাহাতে গীতার গুজরাতী অনুবাদ পড়িবার তীব্র ইচ্ছা হইয়াছিল এবং যতগুলি অনুবাদ হাতে পাইয়াছিলাম পড়িয়াছিলাম। কিন্তু এই পড়া আমাকে সকলের সমক্ষে আমার নিজের অনুবাদ উপস্থিত করিবার অধিকার দেয় না—বিশেষত আমার সংস্কৃতজ্ঞান অল্প এবং গুজরাতীতে আমার পাণ্ডিত্যের দাবী নাই বলিয়া। তবে আমার এই অনুবাদ করিবার ধৃষ্টতা কেন হইল?

গীতাকে আমি যে-ভাবে বুঝিয়াছি সেইভাবে আচরণ করিবার প্রযত্ন আমার এবং আমার কয়েকজন সঙ্গীর সর্ব্বদাই আছে। আমাদের পক্ষে গীতা অধ্যাত্ম জীবনের নিদান গ্রন্থ। তদনুযায়ী আচরণ করিতে নিত্যই ব্যর্থতা আসিতেছে, তবুও আমাদের চেষ্টার ত্রুটি নাই। এই ব্যর্থতার ভিতরেই আমরা সফলতার উদীয়মান আলোর আভা দেখিতে পাইতেছি। এই ক্ষুদ্র দলটি যে অর্থ কর্ম্মে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এই অনুবাদে সেই অর্থই দেওয়া হইল।

তাহা ছাড়া স্ত্রীলোক, বৈশ্য এবং শূদ্র যাঁহাদের অক্ষর-জ্ঞান অল্পই, যাঁহাদের মূল সংস্কৃত গীতা পড়িবার সময় বা ইচ্ছা নাই, অথচ যাঁহাদের গীতারূপ আশ্রয়ের বিশেষ প্রয়োজন, এই অনুবাদ বিশেষ করিয়া তাঁহাদেরই জন্য। আমার গুজরাতী জ্ঞান অল্প হওয়া সত্ত্বেও সেই অল্প জ্ঞানের দ্বারাই গুজরাতবাসিগণের আমার উপর যে দাবি, তাহা পূরণ করিবার তীব্র ইচ্ছা আমার সর্ব্বদাই আছে। আমি এটা বিশেষ করিয়া চাই যে, যখন চারিদিকে অশ্লীল সাহিত্যের প্রবল বন্যা বহিয়া যাইতেছে তখন হিন্দুধর্ম্মের এই অদ্বিতীয় গ্রন্থের সরল অনুবাদ গুজরাতী জনসাধারণের সম্মুখে আসে এবং তাহার সাহায্যে তাহারা এই বন্যার প্রতিরোধ করিবার শক্তি লাভ করে।

এই ইচ্ছার এই অর্থ নয় যে, আমি অন্যান্য গুজরাতী অনুবাদকে অবহেলা করিতেছি। তাহাদের স্থান ত আছেই, কিন্তু আমি জানি না, সে সকল অনুবাদের

---

* মহাত্মাজীর মূল গুজরাতী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার অনুবাদের প্রস্তাবনা হইতে শ্রীঅনাথনাথ বসু কর্ত্তৃক অনূদিত।

পিছনে অনুবাদকগণের আচারজাত অনুভূতির কোনও দাবি আছে কি না; এই অনুবাদের পিছনে আমাদের আটত্রিশ বৎসরের আচরণের চেষ্টার দাবি আছে। এইজন্য আমার একান্ত আগ্রহ যে, আমার যে-সকল গুজরাতী ভ্রাতা ও ভগিনীরা ধর্ম্মজীবন অভ্যাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই অনুবাদ পাঠ ও বিচার করিয়া তদ্দ্বারা শক্তিলাভ করেন।

এই অনুবাদে আমার সঙ্গীগণের পরিশ্রম রহিয়াছে। আমার সংস্কৃত জ্ঞান অত্যন্ত অপূর্ণ হওয়ার জন্য শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস না থাকায় এই অনুবাদ বিনোবা, কাকা কালেলকার, মহাদেব দেশাই এবং কিশোরলাল মশরুবালা দেখিয়া দিয়াছেন।

২

এইবার গীতার অর্থের বিষয় বলিব। ১৮৮৮–৮৯ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম গীতা দেখিলাম তখনই আমার মনে হইয়াছিল যে, ইহা ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে, বরং ইহাতে ভৌতিক যুদ্ধের বর্ণনাচ্ছলে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে নিরন্তর যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছে তাহারই বর্ণনা আছে। অন্তরের যুদ্ধকে সরস করিয়া দেখাইবার জন্য এখানে মানুষ যোদ্ধার কল্পনা করা হইয়াছে। এই প্রথম উপলব্ধি ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং গীতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচার করার পর দৃঢ়তর হইয়াছে। তাহা ছাড়া মহাভারত পাঠ করার পর এই বিচার আরও দৃঢ় হইয়াছে। আধুনিক অর্থে মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া আমি গণনা করি না। তাহার বিশেষ প্রমাণ আদিপর্ব্বেই আছে। গ্রন্থোক্ত পাত্রগণের অমানুষী এবং অতিমানুষী উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া ব্যাসদেব রাজাপ্রজার ঐতিহাসিকতার উচ্ছেদসাধন করিয়াছেন। মূলে তাঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু মহাভারতে ব্যাসদেব তাঁহাদের অবতারণা করিয়াছেন ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই।

মহাভারতকার ত ভৌতিক যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিলেন না, বরং প্রমাণ করিলেন তাহার ব্যর্থতা। তিনি বিজেতাকে কাঁদাইলেন, তাহাদের দিয়া অনুতাপ করাইলেন এবং দুঃখ ছাড়া আর কিছুই বাকি রাখিলেন না।

গীতা এই মহামন্ত্রের শিরোমণি। তাহার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভৌতিক যুদ্ধ ব্যবহার শিখাইবার ছলে স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা-লক্ষণ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। আমার ত মনে হয় ভৌতিক যুদ্ধের সঙ্গে স্থিতপ্রজ্ঞের কোন সম্বন্ধ নাই, একথা তাহার লক্ষণের মধ্যেই রহিয়াছে। সামান্য একটা পারিবারিক বিবাদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্ণয় করিবার জন্য গীতার ন্যায় গ্রন্থের রচনা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

গীতার শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান শুদ্ধ ও পূর্ণজ্ঞান কিন্তু কাল্পনিক।

এখানে কৃষ্ণ নামক অবতারকে অস্বীকার করা হইতেছে না। শুধু ইহাই বলা হইতেছে যে, পূর্ণ কৃষ্ণ কাল্পনিক। পূর্ণাবতারের কল্পনা পরে করা হইয়াছে। অবতার কথার অর্থ শরীরধারী পুরুষবিশেষ। জীবমাত্রেই ঈশ্বরের অবতার, কিন্তু লৌকিক ভাষায় আমরা সকলকে অবতার বলি না। যে পুরুষ তাঁহার যুগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মভাবপূর্ণ, উত্তরকালের জনসাধারণ তাঁহাকেই অবতাররূপে পূজা করে। ইহাতে আমি কোন দোষ দেখি না। ইহা দ্বারা ঈশ্বরের মহত্ত্বকে ক্ষুণ্ণ করা হয় না, সত্যকেও আঘাত করা হয় না। "আদম ভগবান নহেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের জ্যোতি হইতে স্বতন্ত্রও নহেন।" যাঁহার মধ্যে সেই যুগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইয়াছে, তিনিই বিশেষ অবতার। এইরূপ দৃষ্টি দিয়া দেখিলে শ্রীকৃষ্ণরূপী পূর্ণাবতার আজও হিন্দুধর্ম্ম-সাম্রাজ্যে একচ্ছত্রাধিপত্য করিতেছেন।

ইহার মধ্যেই মানুষের প্রিয়তম এবং চরমতম আকাঙ্ক্ষার সূচনা রহিয়াছে। ঈশ্বরত্বে পৌছিতে না পারিলে মানুষের আশা মিটে না, শান্তি মিলে না। ঈশ্বরত্ব লাভ করিবার চেষ্টাই একমাত্র সত্য পুরুষার্থ। ইহাই আত্মদর্শন। এই আত্মদর্শনই সকল ধর্ম্মগ্রন্থের এবং গীতারও উপপাদ্য বিষয়। কিন্তু গীতাকার এই বিষয় প্রতিপাদন করিবার জন্য গীতা রচনা করেন নাই। গীতার উদ্দেশ্য আত্মার্থীকে আত্মদর্শন-

লাভের এক অদ্বিতীয় উপায় প্রদর্শন করা। যে বস্তু হিন্দু-ধর্ম্মগ্রন্থে নানাস্থানে দেখা যায়, গীতায় তাহাই অনেকরূপে অনেকভাবে অনেক শব্দের ভিতর দিয়া পুনরুক্তি-দোষ স্বীকার করিয়াই পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

কর্ম্মফলত্যাগ এই অদ্বিতীয় উপায়।

এই মধ্যমণির চতুষ্পার্শ্বে গীতার সমগ্র পুষ্পরাজি গ্রথিত। ভক্তি, জ্ঞান, ইত্যাদি তারকামণ্ডলরূপে তাহার চারিপাশে সাজান আছে। যেখানে দেহ সেখানেই কর্ম্ম, তাহা হইতে কাহারও মুক্তি নাই। তবুও দেহকে প্রভুর মন্দির করিয়া তাহার দ্বারা যে মুক্তি পাওয়া যায়, সকল ধর্ম্মই ইহা প্রতিপাদন করিয়াছে। কিন্তু কর্ম্মমাত্রেরই কয়েকটি দোষ আছে। মুক্তি ত দোষহীনেরই লভ্য। তাহা হইলে কর্ম্মবন্ধন হইতে, অর্থাৎ দোষস্পর্শ হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে কেমন করিয়া? গীতা ইহার উত্তর অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা, যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিয়া, কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া, সমস্ত কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া—অর্থাৎ দেহমন এবং বাক্যকে শ্রীভগবানে আহুতি দিয়া।"

কিন্তু নিষ্কামভাব, কর্ম্মফলত্যাগ, শুধু মুখের কথা নয়; ইহা মাত্র বুদ্ধিরই প্রয়োগ নহে; ইহা হৃদয়মন্থন হইতে আসে। এই ত্যাগশক্তি উৎপন্ন করিবার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। অনেক পণ্ডিতেই এক প্রকারের জ্ঞান অবশ্য লাভ করেন; বেদাদি তাঁহাদের কণ্ঠাগ্রে বাস করে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভোগাদিতে লীন হইয়া রহিয়াছেন। যাহাতে জ্ঞানের আতিশয্য শুষ্ক পাণ্ডিত্যে পরিণত না হয় তাহার জন্য গীতাকার জ্ঞানের সহিত ভক্তিকে মিলাইয়াছেন এবং তাহাকেই প্রথম স্থান দিয়াছেন। ভক্তি বিনা জ্ঞান ব্যর্থ। তাই বলিয়াছেন—"ভক্তি করিলে জ্ঞান অবশ্যই পাইবে।" কিন্তু ভক্তি মাথার মূল্যেই কিনিতে হয়। সেইজন্য গীতাকার স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায়ই ভক্তের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অর্থাৎ গীতার ভক্তি বীর্য্যহীনতা নহে, অন্ধ শ্রদ্ধা নহে। গীতায় বর্ণিত উপচারগুলির বাহ্য চেষ্টা বা ক্রিয়ার সহিত অত্যন্ত সামান্যই যোগ আছে। মালা তিলক অর্ঘ্য আদি সাধন[illegible] ভক্তগণ ব্যবহার করুন, কিন্তু সেগুলি ভক্তির লক্ষণ নহে। যিনি অদ্বেষ্টা, যিনি করুণার ভাণ্ডার, যিনি মমতাশূন্য, নিরহঙ্কার, যাঁহার কাছে সুখ ও দুঃখ, শীত ও উষ্ণ সমান, যিনি ক্ষমাশীল, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, যাঁহার আত্মা সংযত, সংকল্প দৃঢ়, যিনি মন এবং বুদ্ধি শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়াছেন, যিনি লোকের ভয়ের কারণ নহেন, যাঁহার কোন লোকেই ভয় নাই, যিনি হর্ষ শোকভয়াদি হইতে মুক্ত, যিনি পবিত্র, কার্য্যদক্ষ হইয়াও তটস্থ, যিনি শুভাশুভ ত্যাগ করিয়াছেন, শত্রুমিত্রে যাঁহার সমভাব, মান অপমান যাঁহার কাছে তুল্যমূল্য, যিনি স্তুতিদ্বারা উৎফুল্ল বা নিন্দাদ্বারা দুঃখিত না হন, যিনি মৌনব্রতী, [illegible] স্থিরবুদ্ধি, তিনিই ভক্ত। এ ভক্তি আসক্তিপূর্ণ নর-নারীর পক্ষে লাভ করা সম্ভবপর নহে।

ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, জ্ঞান লাভ করা বা ভক্ত হওয়ার নামই আত্মদর্শন। আত্মদর্শন ইহা হইতে ভিন্ন বস্তু নহে। যেমন একটি টাকা দিয়া বিষও আনা যায়, অমৃতও আনা যায়, তেমনি জ্ঞান অথবা ভক্তির দ্বারা বন্ধনও আসিতে পারে, মুক্তিও আসিতে পারে, এমন হইতে পারে না। এস্থলে সাধন ও সাধ্য একেবারে অভিন্ন না হইলেও প্রায় অভিন্ন। সাধনের চরম গতি মোক্ষ, এবং গীতায় মোক্ষের অর্থ পরম শান্তি।

কিন্তু এইরূপ জ্ঞান ও ভক্তিকে কর্ম্মফলত্যাগরূপ নিকষে কষিয়া লইতে হইবে। লৌকিক কল্পনায় শুষ্ক পণ্ডিত জ্ঞানীরূপে পরিগণিত হন, তাঁহাকে কোন কর্ম্মই করিতে হয় না, হাতে ঘটিটা তোলাও তাঁহার কাছে কর্ম্মবন্ধন। যজ্ঞশূন্য যেখানে জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত সেখানে ঘটিটা তোলার মত তুচ্ছ লৌকিক কর্ম্মের স্থান কোথায়?

লৌকিক কল্পনায় ভক্ত অর্থে ধরা হইয়াছে নির্ব্বীর্য্য মালাজপ-নিরত ব্যক্তি; সেবাকর্ম্মেও তাঁহার মালা-জপে বিক্ষেপ আসে। এইজন্য তিনি শুধু খাওয়া-পরা আদি ভোগের সময়ই মালা ত্যাগ করেন—কখনও ময়দা পেষার জন্য বা রোগীর সেবা করিবার জন্য নহে।

কোপাই
শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

এই দুই প্রকারের লোককে গীতা স্পষ্টই শুনাইয়া দিয়াছে যে, "কর্ম্ম বিনা কেহই সিদ্ধিলাভ করে নাই; জনকাদিও কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানী হইয়াছিলেন। যদি আমিও আলস্যরহিত হইয়া কর্ম্ম না করি তাহা হইলে এই লোক ধ্বংস হইবে।" একথার পরও সাধারণ লোকের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে?

কিন্তু একভাবে কর্ম্মমাত্রই বন্ধনস্বরূপ একথা অবিসম্বাদী। অপরদিকে দেহধারীমাত্রকেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক কর্ম্ম করিতে হয়, শারীরিক ও মানসিক চেষ্টামাত্রই কর্ম্ম। তাহা হইলে কর্ম্মনিরত মানুষ কেমন করিয়া বন্ধনমুক্ত হইতে পারে? আমি যতদূর জানি, গীতায় এ প্রশ্নের যেরূপ সমাধান করা হইয়াছে, অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থেই সেরূপ করা হয় নাই। গীতায় বলা হইয়াছে—"ফলাসক্তি ছাড় এবং কর্ম্ম কর, নিরাশী হও এবং কর্ম্ম কর। নিষ্কাম হইয়া এই কর্ম্ম কর।" গীতার এই উক্তি ভুল বুঝিবার উপায় নাই। কর্ম্ম যে ছাড়িল তাহার পতন হইল; কর্ম্ম করিতে করিতেই ফল ত্যাগ করিলে ত উন্নতি হইল।

এস্থলে ফলত্যাগের এই অর্থ কেহই করে না যে, ত্যাগী কোন ফল পান না। গীতার কোথাও এই অর্থ নাই। ফলত্যাগের অর্থ ফলের বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ। প্রকৃতপক্ষে ফলত্যাগী হাজার গুণ ফল লাভ করেন। গীতার ফলত্যাগে অক্ষুণ্ণ শ্রদ্ধার পরীক্ষা রহিয়াছে। যে লোক পরিণাম চিন্তা করে, সে বহুবার কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হয়। সে অধীর হইয়া উঠে, তাহাতে সে ক্রোধের বশীভূত হয়, তখন সে যাহা করা উচিত নহে তাহাই করে, এবং এক কর্ম্ম হইতে দ্বিতীয়ে এবং দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়ে জড়িত হইয়া পড়ে। পরিণাম-চিন্তাকারীর অবস্থা বিষয়ান্ধের মতই হয় এবং শেষে সে-ও বিষয়ীর মত সারাসার নীতি-অনীতির বিচার ত্যাগ করিয়া ফললাভের জন্য যে-কোন উপায় অবলম্বন করে এবং তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করে। ফলাসক্তির এইরূপ কটু পরিণাম হইতে মুক্তির উপায়-স্বরূপ, গীতাকার অনাসক্তি অর্থাৎ কর্ম্মফলত্যাগের সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিয়াছেন এবং অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভাষায় তাহা জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, ধর্ম্ম ও অর্থ পরস্পর বিরোধী, "ব্যবসায় প্রভৃতি লৌকিক ব্যাপারে ধর্ম্মের স্থানও নাই, ধর্ম্ম রক্ষাও হয় না, ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা মোক্ষেরই জন্য হইতে পারে। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে ধর্ম্ম শোভা পায়, অর্থের ক্ষেত্রে অর্থ।" আমার মতে গীতাকার এই ভুল ধারণার নিরাকরণ করিয়াছেন। তিনি মোক্ষ এবং লৌকিক ব্যবহারের মধ্যে কোন ভেদ রাখেন নাই এবং ব্যবহারের মধ্যেই ধর্ম্মের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমার মনে হয়, গীতায় বলা হইয়াছে যে, যে-ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে অভ্যাস না করা যায়, তাহা ধর্ম্মই নয় অর্থাৎ গীতার মতে যে-সকল কর্ম্ম আসক্তি-বিনা করাই যায় না, তাহা পরিত্যাজ্য। এই সুবর্ণ নিয়ম মানুষকে বহু ধর্ম্মসঙ্কট হইতে বাঁচাইতেছে। এই মত দ্বারা হত্যা, ব্যভিচার, মিথ্যাচার প্রভৃতি সহজেই ত্যাজ্য হইয়া পড়ে। মানুষের জীবন সরল হয় এবং সরলতা হইতেই শান্তি উৎপন্ন হয়। পরিণাম সম্বন্ধে বেপরোয়া ভাবও ফলত্যাগের অর্থ নয়। পরিণাম, উপায়-বিচার এবং তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজন। এগুলা হইলে যে লোক পরিণামের ইচ্ছা না করিয়াই সাধনের মধ্যে তন্ময় হইয়া যাইতে পারে সে-ই ফলত্যাগী।

এইরূপ দৃষ্টি দ্বারা বিচার করিতে করিতে আমার এরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল যে, গীতার শিক্ষা যে কার্য্যে পরিণত করিতে চাহে তাহাকে স্বভাবতই সত্য এবং অহিংসা পালন করিতে হয়। ফলাসক্তি না থাকিলে মানুষের পক্ষে অসত্য বলিবার বা হিংসা করিবার লোভ হয় না। হিংসা বা অসত্যমূলক যে-কোন কার্য্যই বিচার করা হউক না কেন, দেখা যাইবে যে, তাহার পিছনে নিশ্চয়ই ফলাকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু অহিংসার প্রতিপাদন করাই গীতার উদ্দেশ্য নহে। গীতার যুগের পূর্ব্বেও অহিংসা পরমধর্ম্মরূপে গণ্য হইত। গীতার উদ্দেশ্য ছিল অনাসক্তিরূপ সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই কথা স্পষ্টই দেখা যায়।

কিন্তু যদি অহিংসাই গীতার সিদ্ধান্ত হয়, কিংবা অনাসক্তির মধ্যে অহিংসা সহজেই আসে, তাহা হইলে

গীতাকার কেমন করিয়া ভৌতিক যুদ্ধের উদাহরণ গ্রহণ করিলেন? গীতার যুগে অহিংসা ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইলেও ভৌতিক যুদ্ধ অত্যন্ত সাধারণ বস্তু ছিল বলিয়া গীতাকার এরূপ উদাহরণ গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, করার কারণও ছিল না।

কিন্তু ফলত্যাগের মহত্ত্ব বিচার করিতে গিয়া গীতাকারের হৃদয়ে কি সিদ্ধান্তের উদয় হইয়াছিল এবং অহিংসার মর্য্যাদার সীমা তিনি কিভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এবিষয়ে আমাদের বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। কবি মহত্ত্বের আদর্শ জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। তাহার দ্বারা একথা বলা চলে না যে, তিনি তাঁহার মতবাদের মহত্ত্ব পূর্ণভাবে জানেন বা জানিয়া পূর্ণভাবে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন। ইহাতেই কবির কাব্য এবং মহত্ত্ব। কবির অর্থের অন্ত নাই। মানব-চরিত্রের যেমন, মহাকাব্যের অর্থেরও তেমনি বিকাশ হইয়াই চলে। ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, অনেক গভীর শব্দের অর্থ নিত্যই পরিবর্ত্তিত হইতেছে; গীতার অর্থ সম্বন্ধে সেই কথা বলা যাইতে পারে। গীতাকার নিজেই মহত্ত্বপূর্ণ কঠিন শব্দগুলির অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতার যেখানে সেখানে দেখিলেই একথা বোঝা যাইবে। গীতার যুগের পূর্ব্বে সম্ভবতঃ যজ্ঞে পশুহিংসা প্রচলিত ছিল, কিন্তু গীতার কথিত যজ্ঞে কোথাও তাহার গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। সেখানে জপযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে একথা সূচিত হইয়াছে যে, যজ্ঞের অর্থ মুখ্যভাবে পরোপকারের জন্য শরীরের উপযোগ। তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায় মিলাইয়া অন্য অর্থও করা যাইতে পারে, কিন্তু পশুহিংসা-ঘটিত অর্থ কোনমতেই করা যাইতে পারে না। গীতায় বর্ণিত সন্ন্যাস-সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। গীতায় বলা হয় নাই যে, কর্ম্মমাত্রের ত্যাগই সন্ন্যাস। গীতার সন্ন্যাসী অতিকর্ম্মী এবং অতি-অকর্ম্মী উভয়ই। গীতাকার এইরূপে মহত্ত্বপূর্ণ শব্দগুলির ব্যাপক অর্থ করিয়া আমাদের ভাষায় অর্থের ব্যাপকতা বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন। গীতাকারের প্রযুক্ত শব্দগুলি হইতে একথা ঠিকই প্রতিপাদন করা যায় যে, সম্পূর্ণ ফলত্যাগীর পক্ষে ভৌতিক যুদ্ধ অসম্ভব নহে। কিন্তু চল্লিশ বৎসর ধরিয়া গীতার শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে কর্ম্মে পরিণত করিবার সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া বিনীতভাবে একথা আমাকে বলিতে হইতেছে যে, সত্য ও অহিংসা পূর্ণভাবে পালন না করিলে সম্পূর্ণভাবে কর্ম্মফলত্যাগ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব।

গীতা সূত্রগ্রন্থ নহে। গীতা মহান্ ধর্ম্মকাব্যবিশেষ। তাহার মধ্যে যত গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারিবে, ততই নূতনতর এবং সুন্দরতর অর্থ পাইবে। জনসাধারণের সুবিধার জন্য তাহাতে একই কথা বহুবার বলা হইয়াছে। এইজন্য যুগে যুগে গীতার অর্থ পরিবর্ত্তিত হইবে এবং বিস্তারলাভ করিবে। কিন্তু গীতার মূলমন্ত্র কোনদিনই পরিবর্ত্তিত হইবে না। সে মন্ত্র যে-কোন ভাবে সাধন করা যাইতে পারে, জিজ্ঞাসু তাহার যে-কোন অর্থ করিতে পারেন।

গীতা বিধিনিষেধ নির্দ্দেশ করে নাই। একের পক্ষে যাহা বিহিত তাহাই অপরের পক্ষে নিষিদ্ধ হইতে পারে। বিশেষ কালে বিশেষ দেশে যাহা বিহিত, অন্য কালে অন্য দেশে তাহাই নিষিদ্ধ হইতে পারে। মাত্র ফলাসক্তি নিষিদ্ধ, অনাসক্তি বিহিত।

গীতায় জ্ঞানের মহিমা স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু গীতা বুদ্ধিগম্য নহে, হৃদয়গম্য, তাই তাহা শ্রদ্ধাহীনের জন্য নহে। গীতাকার বলিয়াছেন—

"যে তপস্বী নহে, ভক্ত নহে, যে শুনিতে চাহে না এবং যাহার আমার প্রতি বিদ্বেষ আছে তাহাকে তুমি এই (জ্ঞানের) কথা কখনও বলিও না।" ১৮।৬৭

"কিন্তু যে এই পরম গুহ্য জ্ঞান আমার ভক্তকে দান করিবে, সে-ই পরম ভক্তির জন্য নিঃসন্দেহে আমাকে লাভ করিবে।" ১৮।৬৮

"সেই সঙ্গে সঙ্গে যে দ্বেষ-রহিত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করিবে সে-ও মুক্তি লাভ করিয়া যেখানে পুণ্যবান্ বাস করেন সেই শুভলোক লাভ করিবে।" ১৮।৭১

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৭)

ছুটি ফুরাইলে অপু বাড়ী হইতে রওনা হইল।

ষ্টেশনে আসিয়া কিন্তু ট্রেন পাইল না, গহনার নৌকা আসিতে অত্যন্ত দেরী হইয়াছে, ট্রেন আধঘণ্টা পূর্ব্বে ছাড়িয়া দিয়াছে।

সর্ব্বজয়া ছেলের বাড়ী হইতে যাইবার দিনটাতে অন্যমনস্ক থাকিবার জন্য কাপড়, বালিশের ওয়াড় সাজিমাটি দিয়া সিদ্ধ করিয়া বাঁশবনের ডোবার জলে কাচিতে নামিয়াছে—সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অপু বাড়ীর দাওয়ায় জিনিষপত্র নামাইয়া ছুটিয়া ডোবার ধারে গিয়া পিছন হইতে ডাকিল—ওমা! ..

সর্ব্বজয়া ভুলিয়া থাকিবার জন্য দুপুর হইতেই কাপড় সিদ্ধ লইয়া ব্যস্ত আছে। চমকিয়া পিছন দিকে চাহিয়া আনন্দ-মিশ্রিত সুরে বলে—তুই!...যাওয়া হ'ল না?...

অপু হাসিমুখে বলে—গাড়ী পাওয়া গেল নাঃ—এস বাড়ী—

বাঁশবনের ছায়ায় মায়ের মুখে সেদিন যে অপূর্ব্ব আনন্দের ও তৃপ্তির ছাপ পড়িয়াছিল, অপু পূর্ব্বে কোনো দিন তাহা দেখে নাই—বহুকাল পর্য্যন্ত মায়ের এ মুখখানা তার মনে ছিল। সেদিন রাত্রে দুজনে নানা কথা। অপু ছেলেবেলাকার গল্প শুনিতে চায় মার মুখে—নিশ্চিন্দিপুর সেখানকার সে-সব অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাত্রি, অপূর্ব্ব সে-সব সন্ধ্যার মায়া গল্পগুলির সঙ্গে মাখানো। শুনিতে, শুনিতে মন তাহার অসীম তৃপ্তি ও স্নিগ্ধতায় ভরিয়া ওঠে।

পরদিন সে কলিকাতায় ফিরিল।

কলেজ সেইদিনই প্রথম খুলিয়াছে, প্রমোশন পাওয়া ছেলেদের তালিকা বাহির হইয়াছে, নোটীশ বোর্ডের কাছে রথযাত্রার ভিড়—সে অধীর আগ্রহে ভিড় ঠেলিয়া নিজের নামটা আছে কিনা দেখিতে গেল।

আছে। দু' তিনবার বেশ ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিল। আরও আশ্চর্য্য এই যে, পাশেই যেসব ছেলে পাশ করিয়াছে অথচ বেতন বাকী থাকার দরুণ প্রমোশন পায় নাই, তাহাদের একটা তালিকা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে অপুর নাম নাই, অথচ অপু জানে তারই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বেতন বাকী!

সে ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া ভিড়ের বাহিরে আসিল। কেমন করিয়া এরূপ অসম্ভব সম্ভব হইল, নানাদিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও তখন কিছু ঠাহর করিতে পারিল না। দু তিন দিন পরে তাহার এক সহপাঠী নিজের প্রমোশন বন্ধ হওয়ার কারণ জানিতে আপিস্-ঘরে কেরানীর কাছে গেল, সে-ও গেল সঙ্গে। হেডক্লার্ক বলিল—একি ছেলের হাতের মোয়া হে ছোক্‌রা!.. কত রোল? .....পরে একখানা বাঁধানো খাতা খুলিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই ত্যাখো রোল টেন্ লাল কালির মার্কা মারা রয়েছে—দু মাসের মাইনে বাকী—মাইনে শোধ না দিলে প্রমোশন দেওয়া হবে না, প্রিন্সিপালের কাছে যাও, আমি আর কি করবো?

অপু তাড়াতাড়ি ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে গেল—তাহার রোল নম্বর কুড়ি—একই পাতায়। দেখিল অনেক ছেলের নামের সঙ্গে লালকালিতে 'ডি' লেখা আছে অর্থাৎ ডিফল্টার্—মাহিনা দেয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে নামের উল্টা দিকে মন্তব্যের ঘরে কোন্ মাসের মাহিনা বাকী তাহা লেখা আছে। কিন্তু তাহার নামটাতে কোনো কিছু দাগ বা আঁচড় নাই—একেবারে পরিষ্কার মুক্তার মত হাতের লেখা জলজ্বল্ করিতেছে—রায় অপূর্ব্ব কুমার—লাল কালির একটা বিন্দু পর্য্যন্ত নাই!......

ঘটনা হয়ত খুব সামান্য, কিছুই না—হয়ত এটা সম্পূর্ণ কলমের ভুল, না হয় কেরানীর হিসাবের ভুল, কিন্তু অপুর মনে ঘটনাটা গভীর রেখাপাত করিল।

মনে আছে অনেকদিন আগে ছেলেবেলাতে তাহার দিদি যেবার মারা গিয়াছিল, সেবার শীতের দিনে বৈকালে নদীর ধারে বসিয়া ভাবিত, দিদি কি নরকে গিয়াছে? সেখানকার বর্ণনা সে মহাভারতে পড়িয়াছিল, ঘোর অন্ধকার নরকের দেশে শত শত বিকটাকার পাপী ও তাহাদের চেয়েও বিকট যমদূতের হাতে পড়িয়া তাহার দিদির কি অবস্থা হইতেছে! কথাটা মনে আসিতেই বুকের কাছটায় কি একটা আটকাইয়া যেন গলা বন্ধ হইয়া আসিত—চোখের জলে কাশবন শিমুলগাছ ঝাপ্‌সা হইয়া আসিত, কি জানি কেন সে তাহার হাস্যমুখী দিদির সঙ্গে মহাভারতোক্ত নরকের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যেন কোনমতেই খাপ খাওয়াইতে পারিত না। তাহার মন বলিত না—না—দিদি সেখানে নাই—সে জায়গা দিদির জন্য নয়।

তারপর ওপারের কাশবনে ম্লান সন্ধ্যার রাঙা আলো যেন অপূর্ব্ব রহস্য মাখানো মনে হইত—আপনা আপনি তাহার শিশুমন কোন্ অদৃশ্য শক্তির নিকট হাতজোড় করিয়া প্রার্থনা করিত—আমার দিদিকে তোমরা কোনো কষ্ট দিও না—সে অনেক কষ্ট পেয়ে গেছে—তোমাদের পায়ে পড়ি তাকে কিছু বোলো না—

ছেলেবেলার সে সহজ নির্ভরতার ভাব সে এখনও হারায় নাই। এই সেদিনও কলিকাতায় পড়িতে আসিবার সময়ও তাহার মনে হইয়াছিল—যাই না, আমি ত একটা ভাল কাজে যাচ্ছি—কত লোক ত কত চায়, আমি বিদ্যে চাচ্চি—আমায় এর উপায় ভগবান ঠিক করে দেবেন—তার এ নির্ভরতা আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়াছিলেন দেওয়ানপুরের হেডমাষ্টার মিঃ দত্ত। তিনি খৃষ্টান ছিলেন—ভক্ত ও বিশ্বাসী খৃষ্টান। তিনি তাহাকে যে-সব কথা বলিতেন অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে সে ভাবের কথা বলিতেন না। শুধু গ্রামার এ্যালজেব্রা যাহা অপর ছেলেদের সঙ্গে কহিতেন তাহা নয়—কত উপদেশের কথা, গভীর বিশ্বাসের কথা, ঈশ্বর, পরলোক, অন্তরতম অন্তরের নানা গোপন বাণী। কেমন করিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল এ বালকের মনের ক্ষেত্রে এ সকল উপদেশ সময়ে অঙ্কুরিত হইবে।

* * *

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি, রাস্তায় ফেরিওয়ালা হাঁকিতেছে 'পেয়ারাপুলি আম', 'ল্যাংড়া আম'—দিন রাত টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি, পথেঘাটে জল কাদা। এই সময়টার সঙ্গে অপুর কেমন একটা নিরাশ্রয়তা ও নিঃসম্বলতার ভাব জড়িত হইয়া আছে, আর-বছর ঠিক এই সময়টিতে কলিকাতায় নতুন আসিয়া অবলম্বন-শূন্য অবস্থায় পথে পথে ঘুরিতে হইয়াছিল, কি না জানি হয়, কোথায় না জানি কি সুবিধা জুটিবে—এবারও তাই।

ঔষধের কারখানায় এবার আর স্থান হয় নাই। এক বন্ধুর মেসে দিনকতক উঠিয়াছিল, এখন আবার অন্য একটি বন্ধুর মেসে আছে। নানাস্থানে ছেলে-পড়ানোর চেষ্টা করিয়া কিছুই জুটিল না, পরের মেসেই বা চলে কি করিয়া? তাহা ছাড়া এই বন্ধুটির ব্যবহার তত ভাল নয়, কেমন যেন বিরক্তির ভাব সর্ব্বদাই—তাহার অবস্থা সবই জানে অথচ একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল সে মেস্ খুঁজিয়া লইতে এত দেরী কেন করিতেছে—এ মাসটার পরে আর কোথাও সিট কি খালি পাওয়া যাইবে? অপু মনে বড় আহত হইল। কিছু না বলিয়া সে গলির ভিতর হইতে বাহির হইয়া শুনিল মোড়ের মাথায় কাগজ-বিক্রেতারা হাঁকিতেছে, ভারি কাণ্ড হ'ল বাবু, জারমানি জাহাজ ডুবিয়ে দিল বাবু। খবরের কাগজ বিক্রয় করিলে কেমন হয়? কলিকাতার খরচ চলে না? মাকেও ত·····

অপু সব সন্ধান লইল। তিন পয়সা দিয়া নগদ কিনিয়া আনিতে হয় খবরের কাগজের আপিস হইতে চার পয়সায় বিক্রী, এক পয়সা লাভ কাগজপিছু। কিন্তু মূলধন ত চাই, কাহারও কাছে হাত পাতিতে লজ্জা করে, দিবেই বা কে? এই কলিকাতা সহরে এমন একজনও নাই যে তাহাকে টাকা ধার দেয়? সে সুদ দিতে রাজী আছে। সমীরের কাছে যাইতে ইচ্ছা হয় না, সে ভাল করিয়া কথা কয় না। ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে কারখানার তেওয়ারী-বৌয়ের কাছে গিয়া সব বলিল। তেওয়ারী বৌ সুদ লইবে না। লুকাইয়া দুটা মাত্র টাকা

বাহির করিয়া দিল, তবে আশ্বিন মাসে তাহারা দেশে যাইবে, তাহার পূর্ব্বে টাকাটা দেওয়া চাই।

ফিরিবার পথে অপু ভাবিল—বহুর পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করে, মায়ের মত দ্যাখে, আহা, কি ভাল লোক!

পরদিন সকালে সে ছুটিল অমৃতবাজার পত্রিকা আপিসে। সেখানে কাগজবিক্রেতাদের মারামারি, সবাই আগে কাগজ চায়। অপু ভিড়ের মধ্যে ঢুকিতে পারিল না—কাগজ পাইতে বেলা হইয়া গেল। তাহার পর আর এক নূতন বিপদ—অন্য কাগজওয়ালাদের মত কাগজ হাঁকিতে পারা ত দূরের কথা, লোকে তাহার দিকে চাহিলে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, গলা দিয়া কোনো কথা বাহির হয় না। সকলেই তাহার দিকে চায়, সুশ্রী সুন্দর ভদ্রলোকের ছেলে কাগজ বিক্রয় করিতেছে, এ দৃশ্য তখনকার সময়ে কেহ দেখে নাই—অপু ভাবে—বা রে, আমি কি চড়কের নতুন সঙ নাকি? খানিক দূরে আর একটা জায়গায় চলিয়া যায়। কাহাকেও বিনীতভাবে মুখের দিকে না চাহিয়া বলে—একখানা খবরের কাগজ নেবেন? অমৃত বাজার?

কলেজে যাইবার পূর্ব্বে মাত্র আঠারোখানি বিক্রয় হইল। বাকীগুলা এক খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা তিন পয়সা দরে কিনিয়া লইল। পরদিন আবার তাই। এবার লজ্জাটা অনেকটা কমিল, কিন্তু হাঁকিতে পারিল না, সেটা একেবারেই অসম্ভব তাহার দ্বারা; ট্রামে অনেকগুলা কাগজ কাটিল, বোধ হয় বাঙ্গালী ও ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া হউক বা যেজন্যই হউক তাহার নিকট হইতেই সকলে কাগজ লইল। দুজন হিন্দুস্থানী কাগজ-বিক্রেতা ছোক্‌রা তাহার সহিত ঝগড়া বাধাইল—নামিবার সময় ট্রামের পা-দানিতে একজন ছোক্‌রা ইচ্ছা করিয়া তাহার পা মাড়াইয়া দিল। অপুও কাগজের বাণ্ডিল নামাইয়া রাখিয়া ধাঁই করিয়া ছোক্‌রাটির নাকে মারিল এক ঘুষি। খুব গোলমাল বাধিত, হিন্দুস্থানী ফিরিওয়ালারা একযোগে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলও, পথযাত্রীদের অনেকে কিন্তু অপুর পক্ষে হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিল।

মাসের শেষে অপু মাকে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিল। একদিন কলেজ লাইব্রেরীতে সে বসিয়া আছে, হঠাৎ হলে খুব হৈ চৈ উঠিল। সে গিয়া দেখে কোথাকার একজন ছেলে লাইব্রেরীর একখানা বই নাকি চুরি করিয়া পলাইতেছিল, ধরা পড়িয়াছে—তাহারই গোলমাল। অপু তাহাকে চিনিল—একদিন আর বছর সে ঠাকুরবাড়ীতে খাইতে যাইতেছিল, ওই ছেলেটিও বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটের দত্তবাড়ী দরিদ্র ছাত্র হিসাবে খাইতে যাইতেছিল। শীতের রাত্রি, খুব বৃষ্টি আসাতে দুজনে এক গাড়ী-বারান্দার নীচে ঝাড়া দুঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকে। ছেলেটি তখন অনেকদূর হইতে হাঁটিয়া অতদূরে খাইতে যায় শুনিয়া অপুর মনে বড় দয়া হয়। সে নামও জানিত, মেট্রোপলিটান্ কলেজে থার্ড ইয়ারের ছেলে তাহাও জানিত, কিন্তু কোনো কথা প্রকাশ করিল না। কলেজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পুলিসের হাতে দিবার ব্যবস্থা করিতে-ছিলেন, দর্শনের অধ্যাপক বৃদ্ধ প্রসাদদাস মিত্র মধ্যস্থতা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

অপুর মনে বড় আঘাত লাগিল—সে পিছু পিছু গিয়া অখিল মিস্ত্রি লেনের মোড়ে ছেলেটিকে ধরিল। ছেলেটির নাম হরেন। সে দিশাহারার মত পথ হাঁটিতেছিল, অপুকে চিনিতে পারিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অত্যন্ত অচল হইয়াছে, ছেঁড়া কাপড়, চারিদিকে দেনা, দত্তবাড়ী আজকাল আর খাইতে দেয় না—বর্দ্ধমান জেলায় দেশ, এখানে কোনো আত্মীয়স্বজন নাই। অপু মির্জাপুর পার্কে একখানা বেঞ্চিতে তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া বসাইল, ছেলেটার মুখে বসন্তের দাগ, রং কালো, চুল রুক্ষ, গায়ের সার্ট কব্জির অনেকটা উপর পর্য্যন্ত ছেঁড়া। তাহার নিজের চোখে জল আসিতেছিল, বলিল—তোমাকে একটা পরামর্শ দি শোনো—খবরের কাগজ বিক্রি করবে? বাদামভাজা খাওয়া যাক এস—এই বাদাম ভাজা—এদিকে এস, দাও চার পয়সা—বেশ ভালো কাজ, আমি একটা টাকা দিচ্ছি। কাল আমার সঙ্গে যেও কিনিয়ে দোবো।

পূজা পর্য্যন্ত দুজনের বেশ চলিল। পূজার পরই পুনর্মূষিক—তেওয়ারী বৌয়ের দেনা শোধ করিয়া যাহা

থাকিল, তাহাতে মাসিক খরচের কিছু অংশ কুলান হয় বটে, বেশীটাই হয় না। আবার একবেলা খাওয়া, ছাতু, ময়লা কাপড়, কাপড়-কাচা সাবান সব উপসর্গই আসিয়া জুটিল। সেকেণ্ড ইয়ারের টেষ্ট পরীক্ষাও হইয়া গেল, এইবারই গোলমাল—সারা বছরের মাহিনা ও পরীক্ষার ফী দিতে হইবে অল্পদিন পরেই।

উপায় কিছুই নাই। সে কাহারও কাছে গিয়া কিছু চাহিতে পারিবে না—হয়ত পরীক্ষা দেওয়াই হইবে না। সত্যই ত, এত টাকা—এতো আর ছেলেখেলা নয়? মন্মথকে একদিন হাসিয়া সব কথা খুলিয়া বলে। মন্মথ শুনিয়া অবাক হইয়া গেল, বলিল—এসব কথা আগে জানাতে হয় আমাকে! মন্মথ সত্যই খুব খাটিল। নিজের দেশের বার লাইব্রেরীতে চাঁদা তুলিয়া প্রায় পঞ্চাশ টাকা আনিয়া দিল, কলেজে প্রোফেসরদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া ফেলিল, ইউনিভারসিটী ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে পাওয়া গেল গোটাকুড়ি টাকা। অল্পদিনের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকগুলি টাকা আসিতে দেখিয়া অপু নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু বাকী বেতন একরূপ শোধ হইলেও তখনও পরীক্ষায় ফিএর একপয়সার জোগাড় নাই, মন্মথ ও বৌবাজারের সেই ছেলেটি বিশ্বনাথ—দুজনে মিলিয়া ভাইস্-প্রিন্সিপ্যালকে গিয়া ধরিল, অপূর্ব্বকে কলেজের বাকী বেতন কিছু ছাড়িয়া দিতে হইবে।

এদিকে ঔষধের কারখানায় থাকিবার সুবিধার জন্য অপু পুনরায় একবার কারখানার ম্যানেজারের নিকট গেল। এই মাসতিনেক সে যদি সেখানে থাকিবার সুবিধা পায়, তবে পরীক্ষার পড়াটা করিতে পারে। এর ওর মেসে ত সারা বছর অস্থিতপঞ্চকভাবে থাকিয়া তেমন পড়াশুনা হয় নাই। ম্যানেজার অনুমতি দিলেন না। কারখানার আর সকলে অপুকে চিনিত, পছন্দও করিত, তাহারা বলিল—ওহে তুমি একবার মিঃ লাহিড়ীর কাছে যেতে পার? ওর কাছে বলাই ভুল—মিঃ লাহিড়ী কারখানার একজন ডিরেক্টার, তাঁর চিঠি যদি আন্‌তে পার, ও সুড়্ সুড়্ করে রাজী হবে এখন। ঠিকানা লইয়া অপু উপরি উপরি তিন চার দিন ভবানীপুরে মিঃ লাহিড়ীর বাড়ীতে গেল, দেখা পাইল না, বড়লোকের বাড়ী, গাড়ীবারান্দার ধারে একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া বসিয়া চলিয়া আসে।

সেদিন রবিবার। ভাবিল, আজ আর দেখা না করিয়া আসিবে না। গিয়া শুনিল, মিঃ লাহিড়ী বাড়ী নাই বটে, তবে বেলা এগারোটার মধ্যে আসিবেন। খানিকক্ষণ বসিয়া আছে, এমন সময় একজন ঝি আসিয়া বলিল—আপনাকে দিদিমণি ডাকচেন—

অপু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কোন্ দিদিমণি তাহাকে ডাকিবেন এখানে? সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—আমাকে? না—আমি ত—

ঝি ভুল করে নাই, তাহাকেই। ডানধারে একটা বড় কাম্‌রা, অনেকগুলা বড় বড় আলমারী, প্রকাণ্ড বনাত-মোড়া টেবিল, চামড়ার গদি-আঁটা আরাম চেয়ার ও বসিবার চেয়ার। সরু বারান্দা পার হইয়া একটা চক-মিলানো ছোট পাথর-বাঁধানো উঠান। পাশের ছোট ঘরটায় হাতল-হীন চেয়ারে একটি আঠারো উনিশ বছর বয়সের তরুণী বসিয়া টেবিলে বই কাগজ ছড়াইয়া কি লিখিতেছে, পরনে সাদাসিদে আটপৌরে লালপাড় শাড়ী, ব্লাউজ, ঢিলা খোঁপা, গলায় সরু চেন, হাতে প্লেন বালা—অপরূপ সুন্দরী! সে ঘরে ঢুকিতেই মেয়েটি হাসিমুখে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অপু স্বপ্ন দেখিতেছে না ত? সকালে সে আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছে!...নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করিয়াও করা যায় না—আপনা-আপনি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—লীলা!

লীলা মৃদু মৃদু হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়াছিল। বলিল—চিন্‌তে পেরেচেন ত দেখ্‌চি?...আপনাকে কিন্তু চেনা যায় না—ওঃ কতকাল পরে—আট বছর খুব হবে—না?

অপু এতক্ষণ পরে কথা ফিরিয়া পাইল। সম্মুখের এই অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী লীলাও বটে, না-ও বটে। কেবল হাসির ভঙ্গি ও এক ধরণের হাত রাখিবার ভঙ্গিটা পরিচিত-পুরানো।

সে বলিল, আট বছর—হাঁ তা—তো—তোমাকেও

দেখ্‌লে চেনা যায় না। অপু আপনি বলিতে পারিল না, মুখে বাধিল, লীলার সম্বোধনে সে মনে আঘাত পাইয়াছিল।

লীলা বলিল—আপনাকে দুদিন দেখেচি, পরশু কলেজে যাবার সময় গাড়ীতে উঠচি, দেখি কে একজন গাড়ীবারান্দার ধারে বেঞ্চিতে বসে—দেখে মনে হ'ল কোথায় দেখেচি যেন—আবার কালও দেখি বসে—আজ সকালে বাইরের ঘরে খবরের কাগজখানা এসেচে কিনা দেখ্‌তে জান্‌লা দিয়ে দেখি আজও বসে—তখন হঠাৎ মনে হ'ল আপনি! তখনই মাকে বলেচি, মা আস্‌চেন—কি করচেন কল্‌কাতায়? রিপনে—? বাঃ তা এতদিন আছেন একদিন এখানে আস্‌তে নেই?

বাল্যের সেই লীলা!—একজন অত্যন্ত পরিচিত, অত্যন্ত আপনার লোক যেন দূরে চলিয়া পর হইয়া পড়িয়াছে। 'আপনি' বলিবে না 'তুমি' বলিবে দিশাহারা অপু তাহা ঠাহর করিতে পারিল না। বলিল, কি করে জান্‌ব? আমি কি ঠিকানা জানি?

লীলা বলিল—ভাল কথা, আজ এখানে হঠাৎ কি করে এসে পড়লেন?

অপু লজ্জায় বলিতে পারিল না, যে সে এখানে থাকিবার স্থানের সুপারিশ ধরিতে আসিয়াছে। লীলা জিজ্ঞাসা করিল—মা ভাল আছেন? বেশ—আপনারও বুঝি সেকেণ্ড ইয়ার? আমার ফাষ্ট ইয়ার আর্টস্‌।

একটি মহিলা ঘরে ঢুকিলেন।

অপু চিনিল, বিস্মিতও হইল। লীলার মা মেজ-বৌরাণী, কিন্তু বিধবার বেশ।

আট দশ বৎসর পূর্ব্বের সে অতুলনীয় রূপরাশি এখনও একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া না গেলেও দেখিলে হঠাৎ চেনা যায় না। অপু পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। মেজবৌরাণী বলিলেন—এস এস বাবা, লীলা কালও একবার বলেচে, কে একজন বসে আছে ঠিক বর্দ্ধমানের সেই অপূর্ব্বর মত—আজ আমাকে দিয়ে বললে, ও আর কেউ নয় ঠিক অপূর্ব্ব—তখুনি আমি ঝিকে দিয়ে ডাকতে পাঠালাম—বসো দাঁড়িয়ে কেন বাবা? ভাল আছ বেশ? তোমার মা কোথায়?

অপু সঙ্কুচিতভাবে কথার উত্তর দিয়া গেল। কি আন্তরিকতার সুর। যেন কত কালের পুরাতন পরিচিত আত্মীয়তার আবহাওয়া। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। অপু কি করিতেছে, কোথায় থাকে, মা কোথায় থাকেন, কি করিয়া চলে, এবার পরীক্ষা দিয়া পুনরায় পড়িবে কিনা, নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন। তারপর তিনি চা ও খাবারের বন্দোবস্ত করিতে উঠিয়া গেলেন।

মেজবৌরাণী বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলে অপু বলিল—ইয়ে তোমার বাবা কি—

লীলা ধরা গলায় বলিল—বাবা ত···এই তিন বছর হ'ল···এখানে এটা মামার বাড়ী—

—মিঃ লাহিড়ী বুঝি—

—দাদা মশায়—উনি ব্যারিষ্টার, তবে আজকাল আর প্র্যাক্‌টিশ করেন না—বড়মামা হাইকোর্টে বেরুচ্ছেন আজকাল। ও বছর বিলেত থেকে এসেচেন।

চা ও খাবার খাইয়া অপু বিদায় লইল। লীলা একবার বাড়ীর ভিতর দিয়া বাইরে আসিয়া বলিল—বড়-মামার মেয়ের নেম্‌-ডে পার্টি, অর্থাৎ অন্নপ্রাশন, সাম্‌নের বুধবারে এখানে বিকেলে আস্‌বেন অবিশ্যি অপূর্ব্ববাবু—ভুল্‌বেন না যেন—ঠিক কিন্তু।

পথে আসিয়া অপুর চোখে প্রায় জল আসিল। 'অপূর্ব্ব বাবু'!···লীলাই বটে, কিন্তু ঠিক কি সেই এগারো বছরের কৌতুকময়ী সরলা স্নেহময়ী লীলা?···কোথায় যেন বাধিতেছে। তবুও কি আন্তরিকতা ও আত্মীয়তা···আর নিজের আপনার লোক জেঠাইমাও ত কলিকাতায় আছেন—মেজবৌরাণী সম্পূর্ণ নিস্পর হইয়া আজ তাহার বিষয়ে যত খুঁটিনাটি আন্তরিক আগ্রহের প্রশ্ন করিলেন, জেঠাইমা কোনো দিন তাহা করিয়াছেন?···

বাসায় ফিরিয়া কেবলই লীলার কথা ভাবিল। তাহার মনের যে স্থান লীলা দখল করিয়া আছে ঠিক সে স্থানটিতে আর কেহই ত নাই। কিন্তু সে এ-লীলা নয়। সে-লীলা স্বপ্ন হইয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে—আর তাহার দেখা মিলিবে না। সে ঠিক বুঝিতে পারিল না আজকার সাক্ষাতে সে আনন্দিত হইয়াছে কি ব্যথিত হইয়াছে।

বুধবারের পার্টির জন্য সে টুইল সার্টটা সাবান দিয়া কাচিয়া লইল। ভাবিল, নিজের যাহা আছে তাহাই পরিয়া যাইবে, চাহিবার চিন্তিবার আবশ্যক নাই। তবুও যেন বড় হীনবেশ হইল। মনে মনে ভাবিল হাতে যখন পয়সা ছিল, তখন লীলার সঙ্গে দেখা হ'ল না—আর এখন একেবারে এই দশা, এখন কিনা!

লীলার দাদামশায় মিঃ লাহিড়ী খুব মিশুক লোক। অপুকে বৈঠকখানায় বসাইয়া খানিকটা গল্পগুজব করিলেন, বলিলেন, তিনি তাহার কথা সবই শুনিয়াছেন, সে যে এখন কলেজ পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিতেছে ইহাতে খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও উৎসাহ দিলেন। লীলা আসিল, সে ভারি ব্যস্ত, একবার দু চার কথা বলিয়াই চলিয়া গেল। কোনো পার্টিতে কেহ কখনো তাহাকে নিমন্ত্রণ করে নাই, সে-সব অভিজ্ঞতাও নাই। যখন এক এক করিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও মহিলাগণ আসিতে আরম্ভ করিলেন, তখন অপু খুব খুসি হইল। কলিকাতা সহরে এ রকম ধনী ও উচ্চশিক্ষিত পরিবারে মিশিবার সুযোগ—এ বুঝি সকলের হয়? মাকে গিয়া গল্প করিবার মত একটা জিনিষ পাইয়াছে এতদিন পরে! মা শুনিয়া কি খুসিই যে হইবে!

বৈঠকখানায় অনেক সুবেশ যুবকের ভিড়, প্রায় সকলেই বড়লোকের ছেলে, কেহ বা নতুন ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিয়াছে, কেহ বা ডাক্তার, বেশীর ভাগ বিলাত-ফেরৎ।

কি লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্ক হইতেছিল। কর্পোরেশন ইলেক্শনের ব্যাপার লইয়া কথা কাটাকাটি। অপু এ বিষয়ে কিছু জানে না, সে একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পাড়াগাঁয়ের কোন-একটা মিউনিসিপ্যালিটির কথায় সেখানকার নানা অসুবিধার কথাও উঠিল।

একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখে সোনা-বাঁধানো চশমা, একটু টানিয়া টানিয়া কথা বলিবার অভ্যাস, মাঝে মাঝে মোটা চুরটে টান দিয়া কথা বলিতেছিলেন—দেখুন মিঃ সেন এগ্রিকালচারের কথা যে বল্‌চেন, ও সখের ব্যাপার নয়- ও কাজ আপনার আমার নয়, ইট্ মাষ্ট বি ব্রেড্ ইন্ দি বোন্—জন্মগত একটা ধাত গড়ে না উঠলে শুধু কলের লাঙ্গল কিনলে.ও হয় না—

প্রতিপক্ষ একজন ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের যুবক, সাহেবী পোষাক পরা, বেশ সবল ও সুস্থকায়। তিনি অধীর-ভাবে সাম্‌নে ঝুঁকিয়া বলিলেন - মাপ করবেন রমেশবাবু, কিন্তু একথার কোনো ভিত্তি আছে বলে আমার মনে হয় না, আপনি কি বল্‌তে চান তা হ'লে এডুকেশন, অর্গ্যানিজেসন, ক্যাপিটাল—এসবের মূল্য নেই এগ্রিকালচারে? এই যে—

—আছে, সেকেণ্ডারি—

—তবে চাষার ছেলে ভিন্ন কোনো শিক্ষিত লোক কখনো ওসবে যাবে না?…কারণ ইট্ ইজ্ নট ব্রেড্ ইন্ হিজ বোন্?…অদ্ভুত কথা আপনার—আমার সঙ্গে কেম্ব্রিজে একজন ছাত্র পড়তো—লম্বা লম্বা চুল মাথায়, সুন্দর চেহারা, ধরণধারণে ট্রু পোয়েট। হয়ত সারারাত জেগে হল্লা করছে, একটা বেহালা নিয়ে বাজাচ্চে—আবার হয়ত দেখুন সারাদিন পড়চে বসে কি লিখ্‌চে—নয় তো ভাবচে—ডিগ্রি নিয়ে চলে গেল বেরিয়ে ক্যানাডায়…গবর্ণমেণ্ট হোমষ্টেড ল্যাণ্ডে জংলী জমি নিলে—ছোট্ট একটা কাঠের কুঁড়েঘরে সেই দুর্দ্ধর্ষ শীতের মধ্যে তিন চার বৎসর কাটালে—হোমষ্টেড ল্যাণ্ডের নিয়ম হচ্চে টাইটল্ হবার আগে পাঁচবৎসর জমির ওপর বাস করা চাই—থেকে জমি পরিষ্কার করলে, নিজের হাতে রোজ জমি সাফ করে—লোকজন নেই, দুশো একার জমি, ভাবুন কতদিনে—

— ইংরেজ অবিশ্যি?

ওদিকে একদলের মধ্যে আলোচনা বেশ ঘনাইয়া আসিল। একজন কে বলিয়া উঠিল—ও সব মর‍্যালিটী, আপনি যা বল্‌চেন, একটু এ্যান্টিডেটেড্ হয়ে পড়েচে—এটা তো আপনি মানেন যে ওসব তৈরি হয়েচে বিশেষ কোনো সামাজিক অবস্থায়, সমাজকে বা ইন্‌ডিভিডুয়ালকে একটা প্রোটেক্‌শন্ দেবার জন্যে, সুতরাং —

—বটে, তাহ'লে সবই সুবিধাবাদী আপনারা। নর্ম্যাটিভ ভ্যালু বলে কোনো কিছুর স্থান নেই দুনিয়ায়? …ধরুন যদি—

অপু খুব খুসি হইল।

কলিকাতার বড়লোকের বাড়ীর পার্টিতে সে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা ছাড়া শিক্ষিত বিলাত-ফেরং দলের মধ্যে এভাবে! নাটক-নভেলে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা কখনো হয় নাই। সে অতীব খুসির সহিত চারিধারে চাহিয়া একবার দেখিল—মার্ব্বেলের বড় ইলেট্রিক ল্যাম্প কড়ি হইতে ঝুলিতেছে, সুন্দর ফুল-কাটা ছিটের কাপড়ে ঢাকা কৌচ, সোফা, দামী চায়না—বড় বড় গোলাপ, মোরাদাবাদের পিতলের গোলাপপাশ। নিজের বসিবার কৌচখানা সে দু'একবার অপরের অলক্ষিতে টিপিয়া টিপিয়া দেখিল কি নরম গদিটা! তাহা ছাড়া এধরণের কথাবার্ত্তা—এই ত সে চায়! কোথায় সে ছিল পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের ছেলে—তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মামজোয়ানের স্কুলে পড়িতে যাইত, সে এখন কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে!

অপু যে বিশেষ কোনো কথাবার্ত্তা মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল তাহা নয়, কিন্তু এমন আলোকোজ্জ্বল ঘর ও সুন্দর সাজসজ্জা, সুবেশ নিমন্ত্রিতের দল, ও মার্জ্জিত কথাবার্ত্তার—এ-ধরণের একটা উৎসবের মধ্যে তাহার উপস্থিতি ও পাঁচজনের একজন হইয়া বসিবার আত্মপ্রসাদে ঘরের তাবৎ উপকরণ ও অনুষ্ঠানকে যেন সে সারা দেহ মন দ্বারা উপভোগ করিতেছিল।

কৃষিকার্য্যে উৎসাহী ভদ্রলোকটি অন্য কথা তুলিয়াছেন, কিন্তু অপুর দক্ষিণ ধারের দলটি পূর্ব্ব আলোচনাই চালাইতেছেন এখনও। অপুর মনে হইল, সে-ও এ আলোচনায় যোগদান করিবে. আর হয়ত এ ধরণের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশিবার সুযোগ জীবনে কখনও ঘটিবে না। এই সময় দু এক কথা এখানে বলিলে সে-ও ত একটা আত্মপ্রসাদ! ভবিষ্যতে ভাবিয়া আনন্দ পাওয়া যাইবে, লোকের কাছে গল্প ত।..

ছিপছিপে চেহারায় ভদ্র লোকটিকে অপুর বেশ লাগিতেছিল—মুখে বেশ বুদ্ধি ও শিক্ষার ছাপ, কি কথায় তিনি বলিলেন—ও সব মানিনে বিমলবাবু, দেহ একটা এঞ্জিন—এঞ্জিনের যতক্ষণ ষ্টীম থাকে, চলে—যাই কলকব্জা বিগড়ে যায় সব বন্ধ—

অপু অবসর খুঁজিতেছিল, এই সময় তাহার মনে হইল এবিষয়ে সে কিছু কথা বলিতে পারে। সে দু' একবার চেষ্টা করিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া কতকটা আনাড়ি কতকটা মরীয়ার ভাবে আরক্ত মুখে বলিল—দেখুন মাপ করবেন, আমি আপনার মতে ঠিক মত দিতে পারিনে—দেহটাকে এঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করুন ক্ষতি নেই, কিন্তু যদি বলেন দেহ ছাড়া আর কিছু নেই—

ঘরের সকলেই তাহার দিকে যে কতকটা বিস্ময়, কতকটা কৌতুকের সহিত চাহিতেছে, সেটুকু সে বুঝিতে পারিল—তাহাতে সে আরও অভিভূত হইয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু চাপিবার চেষ্টায় আরও মরীয়া হইয়া উঠিল।

একজন বাধা দিয়া বলিল—মশায় কি করেন, জান্‌তে পারি কি?

—আমি কিছু করি নে—আই-এ পাশ করেচি।

এবার পাঁস্‌নে চশমা পরা যে যুবকটি এঞ্জিনের কথা তুলিয়াছিল, সে বলিল, ইউনিভার্সিটির আরও দু এক ক্লাস পড়ে এসে এ তর্কগুলো করলে ভাল হয় না?

সে এমন অতিরিক্ত শান্তভাবে কথাগুলা বলিল যে, ঘরসুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অপুর মুখ দাড়িমের মত লাল হইয়া উঠিল।

সে আরও মরীয়ার সুরে বলিল—ইউনিভার্সিটির ক্লাসে না পড়লে যে কিছু জানা যায় না একথা আমি বিশ্বাস করিনে—আমি একথা বলতে পারি আমি ত কলেজে পড়ি নে, কিন্তু চ্যালেঞ্জ করচি কোনো ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র যে-কোনো কলেজের, হিষ্ট্রিতে কি ইংলিশ পোইট্রিতে—কিংবা—জেনারেল নলেজে—ইচ্ছে করেই আমি কলেজ ছেড়েচি।

সকলে আরও এক দফা হাসিয়া উঠিল।

তারপর তাহারা নিজেদের মধ্যে অন্য কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইল। অপু আধ ঘণ্টা বসিয়া থাকিলেও তাহার অস্তিত্বই যেন সকলে ভুলিয়া গেল। উঠিবার সময় তাহারা

নিজেদের মধ্যে করমর্দ্দন ও পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল, তাহার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না।

যেভাবে সকলে তাহাকে উড়াইয়া দিল, বা মানুষের মধ্যে গণ্য করিল না তাহাতে অপু অপমানে ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার পাশ কাটাইয়া সকলে চলিয়া গেল—কেহ একটা প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিল না, তাহার সম্বন্ধে কেহ কোনো কৌতূহলও দেখাইল না অপু মনে মনে ভাবিল—বেশ, না বলুক কথা—আমি কি জানি না জানি, তার খবর ওরা কি জানে? যে জান্‌ত অনিল—

সেও চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় লীলা আসিয়া তাহাকে নিজে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। বলিল মা, অপূর্ব্ববাবু না খেয়েই চুপি চুপি পালাচ্ছিলেন—

একটি ছোট আট নয় বছরের ছেলেকে দেখাইয়া বলিল—একে চেনেন অপূর্ব্ববাবু? এ সেই খোকামণি, আমার ছোট ভাই, এর অন্নপ্রাশনে আপনাকে একবার আসতে বলেছিলুম, মনে নেই? লীলার কয়েকটি সহপাঠিনী সেখানে উপস্থিত, ইতিপূর্ব্বে যে মহিলাটি 'আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী' গানটি করিয়াছিলেন, তাঁহার ছোট বোন, নাম দীপ্তি, লীলারই এক ক্লাসে পড়ে, লীলা পরিচয় করাইয়া দিল। তাহার পর সে সকলকে বলিল—তোমরা জান না অপূর্ব্ববাবুর গলা খুব ভাল, তবে গান গাইবেন কিনা জানিনে' মানে বেজায় লাজুক, আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আস্‌চি, একটা অনুরোধ রাখবেন অপূর্ব্ববাবু?

অপু অনেকের অনুরোধ-উপরোধে অবশেষে বলিল—আমি বাজাতে জানি নে—কেউ যদি বরং বাজান—

দীপ্তি অর্গ্যানের কাছে গিয়া বসিল। অপুর গলা খুব সুন্দর, সকলে পর পর দু তিনটি গান শুনিল।

লীলার মা মাঝে মাঝে তাহাকে আসিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিলেন।

তবুও রাত্রে বাসায় ফিরিতে ফিরিতে তাহার মনে হইতেছিল আর কখনও এখানে সে আসিবে না। বড়লোকেরসঙ্গেতাহার কিসের খাতির—দরকার কি

যেদিন অপুর পরীক্ষা আরম্ভ হইবে তাহার দিন্-পাঁচেক আগে অপু পত্রে জানিল মায়ের বড় অসুখ, হস্তাক্ষর তেলিবাড়ীর বড় বৌয়ের।

সন্ধ্যায় সময় অপু বাড়ী পৌছিল।

সর্ব্বজয়া কাঁথা গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া মনে হয়, অপুকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর উঠিয়া বসিল। অনেক দিন হইতেই অসুখে ভুগিতেছে পরীক্ষার পড়ার ব্যাঘাত হওয়ার ভয়ে খবর দেয় নাই, সেদিন তেলি-বৌ জোর করিয়া নিজে পত্র দিয়াছে। এমন যে কিছু শয্যাগত অবস্থা তাহা নয়, খায় দায়, কাজকর্ম্ম করে। আবার অসুখও হয়। সন্ধ্যা হইলেই শয্যা আশ্রয় করে, আবার সকালে যথারীতি উঠিয়া গৃহকর্ম্ম সুরু করে। চিরদিনের গৃহিণীপনা এ অসুস্থ শরীরেও তাহাকে ত্যাগ করে নাই।

অপু বলিল—উঠো না বিছানা থেকে মা—শুয়ে থাক—দেখি গা?

—তুই আয় বোস্—ও কিছু না—একটু জ্বর হয়, খাই দাই—ও এমন সময়ে হয়েই থাকে। বোশেখ মাসের দিকে সেরে যাবে তুই যে মেয়েকে পড়াস, সে ভাল আছে ত?

সর্ব্বজয়ার রোগশীর্ণ মুখের হাসিতে অপুর চোখে জল আসিল। সে পুঁটুলি খুলিয়া গোটাকতক কমলা লেবু, বেদানা, আপেল, বাহির করিয়া দেখাইল। জিনিষপত্র সস্তায় কিনিতে পারিলে সর্ব্বজয়া ভারি খুসী হয়। অপু জানে মাকে আমোদ দিবার এটা একটা প্রকৃষ্ট পন্থা। কমলালেবুগুলা দেখাইয়া বলে—কত সস্তায় কল্‌কাতায় জিনিষপত্র পাওয়া যায় দ্যাখো—লেবুগুলো দশ পয়সা—

প্রকৃতপক্ষে লেবুগুলার দাম ছ আনা।

সর্ব্বজয়া আগ্রহের সহিত বলিল—দেখি? ওমা, এখানে যে ওগুলোর দাম বারো আনার কম নয়—এখানে সব ডাকাত।

চার পয়সায় এক তাড়া পান দেখাইয়া বলিল—

সর্ব্বজয়া ভাবে এবার ছেলের সংসারী হইবার দিকে মন গিয়াছে, হিসাব করিয়া সে চলিতে শিখিয়াছে।

অপু ইচ্ছা করিয়াই লীলার সঙ্গে সাক্ষাতের কথাটা ওঠায় না। ভাবে, মা মনে নানা দুরাশা পোষণ করে, হয়ত এখনি বলিয়া বসিবে—লীলার সঙ্গে তোর বিয়ে হয় না?···দরকার কি, অসুখের মধ্যে মায়ের মনে সে-সব দুরাশার ঢেউ তুলিয়া?

এমন সব কথা কখনো অপু মায়ের সাম্‌নে বলে না, যাহা কি না মা বুঝিবে না। জগৎ সংসারটাকে মায়ের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের উপযোগী করিয়াই সে মায়ের সম্মুখে উপস্থিত করে।

দিন-তিনেক সে বাড়ী রহিল। রোজ দুপুরে জানলার ধারের বিছানাটিতে সর্ব্বজয়া শুইয়া থাকে, পাশে সে বসিয়া নানা গল্প করে। ক্রমে বেলা যায়, রোদ প্রথমে ওঠে রান্নাঘরের চালায়, পরে বেড়ার ধারের পাল্‌তে মাদার গাছটার মাথায়, ক্রমে বাঁশঝাড়ের ডগায়। ছায়া পড়িয়া যায়···বৈকালের ঘন ছায়ায় অপুর মনে একটা বিপুল নির্জ্জনতা ও সঙ্গীহীনতার ভাব আনে।

সর্ব্বজয়া হাসিয়া বলে—পাশটা হ'লে এবার তোর বিয়ের ঠিক করিচি এক জায়গায়। মেয়ের দিদিমা এসেছিল এখানে, বেশ লোক—

অপু চতুর্থদিন সকালে চলিয়া গেল, কালই পরীক্ষা। চুকিয়া গেলেই আবার আসিবে। শেষরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া শোনে, সর্ব্বজয়া রান্নাঘরে ইতিমধ্যে কখন ঘুম হইতে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে, ছেলের সঙ্গে গরম পরোটা দেওয়া যাইবে।

সর্ব্বজয়ার এরকম কোনদিন হয় নাই। অপু চলিয়া যাওয়ার দিনটা হইতে বৈকালে তাহার এত মন হু হু করিতে লাগিল, যেন কেহ কোথাও নাই, একটা অসহায় ভাব, মনের উদাস ভাব। কত কথা, সারা জীবনের কত ঘটনা, কত আনন্দ ও অশ্রুজলের ইতিহাস একে একে মনে আসিয়া উদয় হয়। গত একমাস ধরিয়া এসব কথা মনে হইতেছে। নির্জ্জনে বসিলেই বিশেষ করিয়া···ছেলেবেলায় বুধী বলিয়া গাই ছিল বাড়ীতে···বাল্যসঙ্গিনী হিমি-দি, দুজনে একসঙ্গে দো-পেটে গাঁদাগাছ পুতিয়া জল দিত···একদিন হিমি-দি ও সে বন্যার জলে মাঠে ঘড়া-বুকে সাঁতার কাটিতে গিয়া ডুবিয়া···আর একটু হইলেই সেদিন···

বিবাহ···মনে আছে সেদিন দুপুরে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল ···তাহার ছোট ভাই তখন বাঁচিয়া, তাহাকে লুকাইয়া নাড়ু দিয়া গিয়াছিল হাতের মুঠায়। ছোট্ট ছেলেবেলার অপু···কাঁচের পুতুলের মত রূপ···প্রথম স্পষ্ট কথা শিখিল, কি জানি কি করিয়া শিখিল 'ভিজ্জে'। একদিন অপুকে কদ্‌মা হাতে বসাইয়া রাখিয়াছিল। কেমন খেলি ও খোকা?

অপু দন্তহীন মুখে কদ্‌মা চিবাইতে চিবাইতে ফুলের মত মুখটি তুলিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—ভিজ্জে। হি, হি—ভাবিলে এখনও সর্ব্বজয়ার হাসি পায়।

সেদিন দুপুর হইতেই বুকে মাঝে মাঝে ফিক্-ধরা বেদনা হইতে লাগিল। তেলি-বৌ আসিয়া তেল গরম করিয়া দিয়া গেল। দু তিনবার দেখিয়াও গেল। সন্ধ্যার পর কেহ কোথাও নাই। একা, নির্জ্জন বাড়ী। জরও আসিল।

রাত্রে খুব পরিষ্কার আকাশে ত্রয়োদশীর প্রকাণ্ড বড় চাঁদ উঠিয়াছে। জীবনে এই প্রথম সর্ব্বজয়ার একা থাকিতে ভয় ভয় করিতে লাগিল। শেষরাত্রে একবার যেন মনে হইল, সে জলের তলায় পড়িয়া আছে, নাকে মুখে জল ঢুকিয়া নিঃশ্বাস একেবারে বন্ধ হইয়া আসিতেছে···একেবারে বন্ধ। সে ভয়ে এক গা ঘামিয়া ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। সে কি মরিয়া যাইতেছে? এই কি মৃত্যু?··সে এখন কাহাকে ডাকে? জীবনে সর্ব্বপ্রথম এই তাহার জীবনের ভয় হইল—ইহার আগে কখনও ত এমন হয় নাই? পরে নিজের ভয় দেখিয়া তাহার একদফা ভয় হইল। ভয় কিসের? না—না—সে এ রকম নয়। ও কিছু না।

কিন্তু ভয় যেন যায় না, মরিতেও ভয় হয়। কত চুরি, কত পাপ, চুরি যে কত করিয়াছে তাহার কি ঠিক আছে? ছেলেমেয়েকে খাওয়াইতে অমুকের গাছের কলার কাঁদিটা, অমুকের গাছের শশাটা লুকাইয়া রাখিত

তক্তপোষের তলায়···ভুবন মুখুয্যেদের বাড়ী হইতে একবার দশ পলা তেল ধার করিয়া আনিয়া ভাল মানুষ রাণুর মায়ের কাছে পাঁচপলা শোধ দিয়া আসিয়াছিল, মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিল—পাঁচ পলাই ত নিয়ে গিছলাম ন'দি—বোলো সেজঠাকুরঝিকে। সারাজীবন ধরিয়া শুধু দুঃখ ও অপমান।

অনেক রাত্রে ভয়ের ভাবটা কমিয়া গেল।

সে ছেলেমানুষ, খঞ্জনপাখীর মত তার ডাগর ডাগর নীল চোখ, মুখ তরুণ সুন্দর চুল কোঁকড়া কোঁকড়া··· একটু মুখচোরা, একটু ভালমানুষ, জগতের ঘোরপেঁচ সে কিছুই একেবারে বোঝে না, কোথায় যায়···যায়··· যায় . যায় নীল আকাশ বাহিয়া বহুদূরে প্রসারিত তার গতিপথ। সুনীল মেঘপদবীর অনেক ওপরে, মেঘের ফাঁকে যাইতে যাইতে কোথায় মিলাইয়া যায়।

বুঝি মৃত্যু আসিয়াছে—কিন্তু তাহার ছেলের বেশে, তাকে আদর করিয়া আগু বাড়াইয়া লইতে—এতই সুন্দর।

কি হাসি! কি মিষ্টি হাসি ওর মুখের!

পরদিন সকালে তেলিবাড়ীর বড়বৌ আসিল। দরজায় রাত্রে খিল দেওয়া হয় নাই। খোলাই আছে, বড়বৌ আপন মনে বলিল—রাত্রে দেখচি মা-ঠাক্‌রোণের অসুখ বড্ড বেড়েচে, খিলটাও দিতে পারেন নি।

বিছানার ওপর সর্ব্বজয়া যেন ঘুমাইতেছে। তেলি-বৌ একবার ভাবিল ডাকিবে না—কিন্তু পথ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া উঠাইতে গেল। সর্ব্বজয়া কোনো সাড়া দিল না, নড়িলও না। বড়বৌ আরও দু একবার ডাকাডাকি করিল, পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া সে নিকটে আসিয়া ভাল করিয়া দেখিল।

পরক্ষণই সে সব বুঝিল।

(১৮)

সর্ব্বজয়ার মৃত্যুর পর কিছুকাল অপু এক অদ্ভুত মনোভাবের সহিত পরিচিত হইল। প্রথম অংশটা আনন্দ-মিশ্রিত—এমন কি মায়ের মৃত্যু-সংবাদ প্রথম যখন সে তেলিবাড়ীর তারের খবরে জানিল, তখন প্রথমটা তাহার বাঁধন-ছেঁড়ার উল্লাস—অতি অল্পক্ষণের জন্য—নিজের অজ্ঞাতসারে। তাহার পরই নিজের মনোভাবে তাহার দুঃখ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এ কি! সে চায় কি! মা যে নিজেকে একেবারে বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছিল তাহার সুবিধার জন্য! মা কি তাহার জীবনপথের বাধা? ···কেমন করিয়া সে এমন নিষ্ঠুর, এমন হৃদয়হীন···

তারপর আসিল একটা তীব্র ঔদাসীন্য সব বিষয়ে, সকল কাজে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ানক নির্জ্জনতার ভাব। পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছিল, কলিকাতায় থাকিতে একদণ্ডও ইচ্ছা হয় না, অথচ যাইবার জায়গাও ত নাই! এবার সে একটা ছোট একতলা বাড়ীর নীচের কুঠুরিতে সারা বছরটা কাটাইয়াছিল, একটা ছোট গলির ভিতর বাড়ীটা। কুঠুরিতে তাহার সঙ্গে আর-একজন ক্যাম্বেল স্কুলের ছাত্র থাকে, ছাত্রটিরই একটা ইক্‌মিক্ কুকার আছে, দুজনে তাহাতে রাঁধিয়া খাইত। ইহার পর অপু আর কখনও ইক্‌মিক্ কুকারের রান্না খাইতে পারে নাই জীবনে কোনদিন—কুকারের গন্ধটার সঙ্গে এই দিনগুলির গভীর ঔদাসীন্য, শোক, নির্জ্জনতার ভাব এমন ঘনিষ্টভাবে মিশিয়া গিয়াছিল।

ছোট ঘরটাতে গুমট গরম। চৈত্র বৈশাখ মাসের গরমে এতটুকু হাওয়া চলাচল করে না, কেবলই মনে হয় অনেক দিন আগে বর্দ্ধমানে লীলাদের বাড়ীর সেই আস্তাবলের পাশের ঘরটার কথা, সেই রকমই বিশ্রী, অপরিসর অন্ধকার। অমনি সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে মায়ের কথা, সেখানে যে মা ছিল,দুঃখের সাথী হইয়া মা-ও যে যুঝিয়াছে, তাহাকে কি কিছু জানিতে দিত! ···মন আরও পাগল হইয়া ওঠে, কেমন যেন পালাই পালাই ভাব হয় সর্ব্বদা, অথচ পালাইবার স্থান নাই, মুখের দিকে চাহিবার কেহ নাই, আহা বলিবার কেহ নাই, জগতে সে একেবারে একাকী—সত্যসত্যই একাকী।

এই ভয়ানক নির্জ্জনতার ভাব এক এক সময় অপুর বুকে পাথরের মত চাপিয়া বসে, কিছুতেই সেটা সে কাটাইয়া উঠিতে পারে না, ঘরে থাকা তাহার পক্ষে তখন আর সম্ভব হয় না। গলিটার বাহিরে বড়

লোকজন, ছেলেমেয়ে। বড় মোটর গাড়ীতে কোনো সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের মেয়েরা বাড়ীর ছেলেমেয়েদের লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, অপুর মনে হয় কেমন সুখী পরিবার!···ভাই, বোন, মা, ঠাকুরমা, পিসিমা, রাঙা-দি, বড়-দা, ছোট কাকা। যাহাদের থাকে তাহাদের কি সব দিক দিয়াই এমন করিয়া ভগবান দিয়া দেন!

অন্যমনস্ক হইবার জন্য এক একদিন সে ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটের লাইব্রেরীতে গিয়া বিলাতী ম্যাগাজিনের পাতা উলটাইয়া থাকে। কোথায় খনিতে গ্যাস ফুটিয়াছে, কে একজন রেস খেলার বাজিতে দশ হাজার পাউণ্ড জিতিয়াছে··যুদ্ধের দায়ে বিলাতে বাড়ী বাড়ী পোড়ো জমিতে আলুর চাষ, মটরশুটির চাষ চলিতেছে, কিন্তু যেমন কাহারও মায়ের ছবি, কি মা ও ছেলের সংবাদ, কি মা-ছেলে পাশাপাশি ছবি বাহির হইয়া পড়ে, অমনি অপু বইখানা মুড়িয়া ফেলে, বুকের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা দারুণ শূন্যতা, একটা অনির্ব্বচনীয় বেদনা··

বাহিরে আসিয়া ভাবে যাই বরং মাঠে একটু বেড়িয়ে আসি—কি হবে বসে বসে?

কোথাও বেশীক্ষণ বসিবার ইচ্ছা হয় না, শুধুই কেবল এখানে-ওখানে, ফুটপাথ হইতে বাসায়, বাসা হইতে ফুট-পাথে। এক জায়গায় বসিলেই শুধু মায়ের কথা মনে আসে জোর করিয়া মনে আসে, বন্যার স্রোতের মত জোরে, কত সময়ের কত কথা, রাশি রাশি অসংখ্য। উঠিয়া ভাবে, গোলদিঘীতে আজ সাঁতারের ম্যাচের কি হ'ল দেখে আসি যাই বরং—কলিকাতায় থাকিতে ইচ্ছা করে না, মনে হয় বাহিরে কোথাও চলিয়া গেলে শান্তি পাওয়া যাইত··যে-কোনো জায়গায়, যে কোনো জায়গায়···মনসাপোতার বাড়ীতে চাবি দিয়া আসিয়াছে, আসিবার সময় সর্ব্বজয়ার জাঁতিখানা, নখ কাটিবার নরুণটা, একটা সিঁদুর কৌটা, যে পুরানো তালি দেওয়া লেপটা শীতকালে মা গায়ে দিত—সেগুলিকে সঙ্গে আনিয়াছে—মা বিনা সেখানকার ঘর শূন্য, ভোঁ ভোঁ করিতেছে—সেখানে সে আর ফিরিবে না কখনও।

পাহাড়ে, জঙ্গলে, হরিদ্বারে, কেদার-বদরীর পথে—মাঝে মাঝে ঝরণা, নির্জ্জন অধিত্যকায় কত ধরণের বিচিত্র বন্যপুষ্প, দেওদার ও পাইন বনের ঘন ছায়া, সাধু-সন্ন্যাসী, দেবমন্দির, রামচটি, শ্যামচটী, কত বর্ণনা ত সে বইয়ে পড়ে, একা বাহির হইয়া পড়া মন্দ কি? ···কি হইবে এখানে সহরের ঘিঞ্জি ও ধোঁয়ার বেড়া-জালের মধ্যে?

কিন্তু পয়সা কৈ? তাও ত পয়সার দরকার। তেলিরা কুড়ি টাকা দিয়াছিল মাতৃ-শ্রাদ্ধের দরুণ, নিরুপমা নিজ হইতে পনেরো, বড়বৌ আলাদা দশ। অপু সে টাকার এক পয়সাও রাখে নাই, অনেক লোকজন খাওয়াইয়াছে। তবুও সামান্যভাবে তিল-কাঞ্চন শ্রাদ্ধ করিতে অপুর বুকের মধ্যে কেমন করিয়াছিল, কৃতী হইলে সে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করিত।

দশপিণ্ড দানের দিন সে কি তীব্র বেদনা! পুরোহিত বলিতেছেন—প্রেতা শ্রীসর্ব্বজয়া দেবী·· অপু ভাবে কাহাকে প্রেত বলিতেছে? সর্ব্বজয়া দেবী প্রেত? তাহার মা, প্রীতি আনন্দ ও দুঃখ মুহূর্ত্তের সঙ্গিনী, এত আশাময়ী, হাস্যময়ী, এত জীবন্ত যে ছিল কিছুদিন আগেও, সে প্রেত? সে 'আকাশস্থ নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ?'

তারপরেই মধুর আশার বাণী—আকাশ মধুময় হউক, বাতাস মধুময় হউক, পথের ধূলি মধুময় হৌক্, ওষধি সকল মধুময় হউক বনস্পতিগণ মধুময় হউক, সূর্য্য, চন্দ্র, অন্তরীক্ষস্থিত আমাদের পিতা মধুময় হউন।

সারাদিনব্যাপী উপবাস অবসাদ, শোকের পরে অপুর মনে সত্য সত্যই মধুবর্ষণ করিয়াছিল চোখের জল সে রাখিতে পারে নাই। হে আকাশের দেবতা, বাতাসের দেবতা, তাই করো, মা আমার অনেক কষ্ট ক'রে গিয়েচে, তার প্রাণে তোমাদের উদার আশীর্ব্বাদের অমৃতধারা বর্ষণ কর।

এই অবস্থায় শুধুই ইচ্ছা করে যারা আপনার লোক, যারা তাহাকে জানে ও মাকে জানিত, তাহাদের কাছে যাইতে। এক জেঠাইমারা আছেন—কিন্তু তাহাদের

সহানুভূতি নাই, তবু সেখানেই যাইতে ইচ্ছা করে। তবুও মনে হয় হয়ত জেঠাইমা মায়ের সম্বন্ধে দু পাঁচটা কথা বলিবেন এখন, দুটা সহানুভূতির কথা হয়ত বলিবেন ··

(১৯)

মাস-তিনেক এভাবে কাটিল। এ তিন মাসের কাহিনী তাহার জীবনের ইতিহাসে একটা একটানা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের কাহিনী। ভবিষ্যৎ জীবনে অপু এ গলিটার নিকট দিয়া যাইতে যাইতে নিজের অজ্ঞাতসারে একবার বড় রাস্তা হইতে গলির মোড়ে চাহিয়া দেখিত, আর কখনও সে ইহার মধ্যে ঢোকে নাই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে সে একদিন খবরের কাগজে দেখিল যুদ্ধের জন্য লোক লওয়া হইতেছে, পার্ক ষ্ট্রীটে তাহার আপিস। দুপুরে ঘুরিতে ঘুরিতে সে গেল পার্ক ষ্ট্রীটে। অনেক লোকের ভিড়, অপু একজন আধাবয়সী লোককে জিজ্ঞাসা করিল—রিক্রুটীং অফিসারের ঘর কোন্‌টা জানেন? লোকটা বলিল—সামনের ঘরে সাহেব আছে, যান্ না—

একজন থাকী পোষাক পরা ছোক্‌রা সাহেব চেয়ারে বসিয়া কি লিখিতেছিল। সে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করিল—আমি যুদ্ধে যেতে চাই—

সাহেব মুখ না তুলিয়াই বলিল—ফর্ম্মে দরখাস্ত কর—টেবিলে একরাশি ছাপানো ফর্ম্ম পড়িয়াছিল, অপু একখানা তুলিয়া পড়িয়া বলিল—কোথাকার জন্যে লোক নেওয়া হবে?

—মেসোপোটেমিয়া, রেলওয়ে ও ট্রান্সপোর্ট বিভাগের জন্য। তুমি কি টেলিগ্রাফ জানো—না মোটর-মিস্ত্রী?

অপু বলিল, সে কিছুই নহে। ও সব কাজ জানে না, তবে অন্য যে-কোন কাজ কি কেরাণীগিরি···সাহেব বলিল—না, দুঃখিত। আমরা শুধু কাজ-জানা লোক নিচ্ছি—বেশীর ভাগ মোটর ড্রাইভার, সিগ্‌ন্যালার, ষ্টেশন মাষ্টার এই সব।

এই অবস্থায় একদিন লীলার সঙ্গে দেখা। ইতস্ততঃ লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ডালহাউসি

করিতেছে, সাম্‌নে একখানা হল্‌দে রঙের বড় মিনার্ভা গাড়ী ট্রাফিক পুলিসে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল—হঠাৎ গাড়ীখানার দিক হইতে তাহার নাম ধরিয়া কে ডাকিল।

সে গাড়ীর কাছে গিয়া দেখিল, লীলা আরও দুই তিনটি অপরিচিতা মেয়ে। লীলার ছোট ভাই ড্রাইভারের পাশে বসিল। লীলা আগ্রহের সুরে বলিল—আপনি আচ্ছা ত অপূর্ব্ববাবু? তিন চার মাসের মধ্যে আর দেখা করলেন না কেন বলুন ত? মা সেদিনও আপনার কথা—

অপুর আকৃতিতে একটা কিছু লক্ষ্য করিয়া সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—আপনার কি হয়েচে? অসুখ থেকে উঠেচেন নাকি? শরীর—মাথার চুল অমন ছোট ছোট, কি হয়েচে বলুন ত?

অপু হাসিয়া বলিল—কই না কি হবে—কিছু ত হয় নি?

—মা কেমন আছেন?

—মা? তা মা—মা তো নেই?·· ফাগুন মাসে মারা গিয়েচে।

কথা শেষ করিয়া অপু আর একদফা পাগলের মত হাসিল।

হয়ত বাল্যের সে প্রীতি নানা ঘটনায়, বহু বৎসরের চাপে লীলার মনে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, হয়ত ঐশ্বর্য্যের আঁচ লাগিয়া সে মধুর বাল্যমন অন্যভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল ধীরে ধীরে, অপুর মুখের এই অর্থহীন হাসিটা যেন একখান তীক্ষ্ণ ছুরির মত গিয়া তাহার মনের কোন্ গোপন মণিমঞ্জুষার রুদ্ধ ঢাকনির ফাঁকটাতে হঠাৎ একটা সজোর চাড়া দিল, একমুহূর্ত্তে অপুর সমস্ত ছবিটা তাহার মনের চোখে ভাসিয়া উঠিল—সহায়হীন, মাতৃহীন, আশ্রয়-হীন, পথে পথে বেড়াইতেছে—কে মুখের দিকে চাহিবার আছে?

লীলার গলা আড়ষ্ট হইয়া গেল, একটু পরে সামলাইয়া লইয়া বলিল, আপনি আমাদের ওখানে কবে আস্‌বেন বলুন—না, ওরকম বললে হবে না। একথা আমাদের

কেমন ঠিক ত ?…সেবারকার মত করবেন না, কিন্তু—ভাল কথা, আপনার ঠিকানাটা বলুন ত কি ?… ভুলবেন না, কিন্তু—

গাড়ী চলিয়া গেল।

বাসায় ফিরিয়া অপু মনের মধ্যে অনেক তোলাপাড়া করিল। লীলার মুখে আজ সে একটা আন্তরিকতার ছাপ দেখিয়াছে, বর্ত্তমান অবস্থায় মন তাহার এই আন্তরিকতার স্নেহস্পর্শটুকুরই কাঙ্গাল বটে—কিন্তু এই বেশে কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না, এই জামায় এই কাপড়ে, এ ভাবে। থাক্ বরং।

তিনদিন পরে তার নিজের নামের একখানা পত্র আসিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল—মা ছাড়া আর ত কাহারও পত্র সে কখনও পায় নাই, কে পত্র দিল ?

পত্র খুলিয়া পড়িল :—

অপূর্ব্ববাবু,

আপনার এখানে আসবার কথা ছিল সোমবারে, কিন্তু আজ শুক্রবার হয়ে গেল, আপনি এলেন না। আপনাকে মা একবার অবিশ্যি অবিশ্যি আস্‌তে বলেচেন, না এলে তিনি খুব দুঃখিত হবেন। আজ বিকেল পাঁচটার সময় আপনার আসা চাই-ই। নমস্কার নেবেন।

লীলা

কথাটা মনের মধ্যে সে অনেক তোলাপাড়া করিল। কি লাভ গিয়া ? ওরা বড়মানুষ, কোন্ বিষয়ে সে ওদের সঙ্গে সমান যে ওদের বাড়ী যখন-তখন যাওয়া ? মেজবৌরাণী যে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই কথাটা তাহার মনে অনেকবার যাওয়া-আসা করিল—সেইটা, আর লীলার আন্তরিকতা। কিন্তু মেজবৌরাণী কি আর তার মায়ের অভাব দূর করিতে পারিবেন ? তিনি বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বধূ। তাহার মায়ের আসন হৃদয়ের যে স্থানটিতে, সে শুধু তাহার দুঃখিনী মা অর্জ্জন করিয়াছে তাহার বেদনা, ব্যর্থতা, দৈন্যদুঃখ, শত অপমান দ্বারা—ছয় সিলিণ্ডারের মিনার্ভা গাড়ীতে চড়িয়া কোনো ধনীবধূ—হউন্ তিনি স্নেহময়ী, হউন্ তিনি মহিমময়ী—তাঁহার সেখানে প্রবেশাধিকার নাই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। প্রথম বিভাগের প্রথম সতের জনের মধ্যে তাহার নাম বাংলাতে ইউনিভার্সিটিতে প্রথম হইয়াছে, এজন্য একটা সোনার মেডেল পাইবে। এমন কেহ লোক নাই যাহার কাছে খবরটা বলিয়া বাহাদুরী করা যাইতে পারে। কোনো পরিচিত বন্ধুবান্ধব এখানে নাই—ছুটিতে সব দেশে গিয়াছে। জেঠাইমার কাছে যাইবে ?…গিয়া জানাইবে জেঠাইমাকে ?…কি লাভ, হয়ত তিনি বিরক্ত হইবেন, দরকার নাই যাওয়ায়।

(ক্রমশঃ)

বিশ্ববধূ

শ্রীনীলিমা দাস

তুমি শুধু আছ বসি একান্তে আপন মনে বিশ্ব-অন্তঃপুরে
আপনার সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য মাঝে মগ্নচিত্ত আপনি বিলীন !
ঘেরি তব চারিধার রূপ-রস-গন্ধ-ভরা বসন্ত নবীন
ঢালিছে সুরভি-ধার ; যেন কোন্ দূরশ্রুত বাঁশরীর সুরে
সমীরণ মৃদুবহ—চুম্বন-চঞ্চল ; ওই মধুর মধুরে
নিত্য শোভাময় হাসি হাসে বন-কুসুম-কলিকা ; নিশিদিন
গগন-অঙ্গনে জলে দীপ্ত তারকার দীপ ; বিরাম-বিহীন
ধ্বনিছে জলদ-শঙ্খ,—ডাকি' যেন আনে কাছে সুদূর মৃত্যুরে !

যুগ যুগান্তর ধরি ধরণীর মুগ্ধমত্ত যত কবিকুল
হেরি সেই অপরূপ নীরব আরতি-লীলা রাতুল চরণে
আপনারে রিক্ত করি সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দেয় সজল নয়নে।
অবশেষে চিত্ত করি মধুসিক্ত কহি ওঠে আনন্দে আকুল, —
"চিরপ্রিয়া ওগো বধূ ! এবার হেরিনু সব, আজি শেষক্ষণে
গুণ্ঠনের যবনিকা অপসারি দেখাও ও মু'খানি অতুল !"

আওরংজীবের ব্যক্তিত্ব

প্রবাসীর গত বৈশাখ সংখ্যায় মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যর যদুনাথ সরকার, সি-আই-ই মহাশয় লিখিত "আওরংজীবের জীবন-নাট্য" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক উক্ত সম্রাটকে বহু গুণে ও বহু বিশেষণে বিভূষিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার দুই একটি বক্তব্য লিখিতেছি।

সম্রাট আওরংজীবকে লেখক "একজন মহাপুরুষ, মহা সাধু ও সজ্জন" বলিয়াছেন। মাননীয় লেখক মহাশয় কোন্ ভাবে এবং কোন্ অর্থে এই তিনটি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে যে লক্ষণ এবং গুণ থাকিলে কোন ব্যক্তিকে "মহাপুরুষ" কিংবা "মহা সাধু" বলা যাইতে পারে উক্ত সম্রাটের তাহা ছিল কি না তাহা আমাদের বিদিত নহে। অবশ্য উক্ত সম্রাট একজন মিতাচারী, মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী, সাহসী ও সমর-কৌশলাভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে; কিন্তু কেবল ঐ গুণগুলি ছিল বলিয়াই তাঁহাকে আমরা "মহাপুরুষ" বা "মহা সাধু ও সজ্জন" আখ্যা দিতে রাজি নহি। কারণ, তাঁহার দোষও যথেষ্ট ছিল। সম্রাটের অনুগৃহীত বা তাঁহার ধর্ম্ম ও মতাবলম্বী কোন কোন ঐতিহাসিক ঐরূপ আখ্যা দিয়া থাকিলেও, কোন পক্ষপাতশূন্য ঐতিহাসিক সম্রাটকে ঐরূপ গুণশালী বলিয়া প্রচার করিয়াছেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখি নাই। ইতিহাসে তাঁহার যে যে কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ আছে তাহাতে আমরা তাঁহাকে একটি নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ণ, স্বার্থপর, ঘোর হিন্দুবিদ্বেষী, অনুদার-প্রকৃতিবিশিষ্ট গোঁড়া লোক বলিয়া দেখিতে পাই। তাঁহার নিজের সিংহাসন লাভের জন্য ও তাহা নিরাপদ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেকগুলি নিষ্ঠুর ও অসৎ কার্য্য করিতে হইয়াছিল। রাজনীতির দিক দিয়া তাহার কোন আবশ্যকতা থাকিলেও তাহা কোন মহাপুরুষের বা মহা সাধুর ও সজ্জনের করণীয় নহে। মুরাদকে প্রবঞ্চনা করিয়া যুদ্ধে নামাইয়া স্বার্থসিদ্ধির পর তাহাকে কৌশলে বন্দী করিয়া হত্যা করা, যুবরাজ দারাকে ও তাঁহার পুত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করান, পিতা সম্রাট শাজাহানকে বন্দী করা প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা তিনি স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছিলেন। যশোবন্ত সিংহকে কৌশলে বিনাশ করিবার মানসে আফগানিস্থানে পাঠানো এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পরিবারবর্গকে লাঞ্ছনা করা, শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা ইত্যাদি কার্য্য উক্ত সম্রাটের প্রতিহিংসা-বৃত্তির পরিচায়ক। তিনি যে রাজনীতিতে পটু ছিলেন তাহাও আমরা স্বীকার করি না। কারণ, "বৃক্ষ ফলেন পরিচীয়তে"। তিনি যে রাজনীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার জীবদ্দশাতেই অত বড় মুঘল-সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা "কঠোর অদৃষ্টের হাতে পুরুষকারের পরাজয় নহে।" ইহা তাঁহার কৃতকার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল। একটা সংখ্যায় গরিষ্ঠ, সুসভ্য এবং অভিমানী (sensitive) জাতির উপর শুধু দমননীতি চালাইয়া তাহাকে বশে রাখিবার বা ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিলে তাহা যে কখনও ফলবতী হইতে পারে না, আওরংজীবের রাজত্ব তাহাই স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিতেছে। তাঁহার ধর্ম্মের গোঁড়ামির জন্য মুঘল- করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজ তাঁহার অনুষ্ঠিত আর্থিক ও রাজনৈতিক অত্যাচারে ও তাহাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপের ফলে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুজাতির উপর জিজিয়া কর স্থাপন এবং বারাণসী, মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থানের প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরগুলির ধ্বংসসাধন তাঁহার দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দুস্থান হইতে হিন্দুধর্ম্ম লোপ করা তাঁহার জীবনের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিতে পারে এবং উহা তাঁহার ধর্ম্মানুমোদিতও হইতে পারে, কিন্তু ইহা কখনই মহাপুরুষের বা মহাসাধুর করণীয় নহে। মাননীয় লেখকের মতে উক্ত সম্রাটের জীবন "ট্রাজেডীর" একটি সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত। আমরা বলি, ঐ ট্রাজেডীর কারণ তাঁহার বুদ্ধির দোষ এবং অদূরদর্শিতা। তিনি যদি প্রকৃত রাজনীতি-বিশারদ হইতেন তাহা হইলে হয়ত আজ ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য প্রকার হইত।

শ্রীনীরদকুমার বক্সী

মুসলমান ও নমঃশূদ্রের সহযোগিতা

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে জনৈকা হিন্দু মহিলা লিখিত "ঢাকা ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে দাঙ্গা" শীর্ষক লিপির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় "কোন কোন স্থলে মুসলমান গুণ্ডাগণ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের বিরুদ্ধে নমঃশূদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দুদের প্ররোচিত করিয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্য-বশতঃ সফল হয় নাই"—সংবাদটি একেবারে নির্ভুল নহে। ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের দোলাইগঞ্জ ষ্টেশন হইতে দুই মাইল পূর্ব্বে মাতুয়াইল নামক গ্রামে যে বীভৎস লুট ও গৃহদাহ হইয়াছে তাহা মুসলমান ও নমঃশূদ্রের সমবায়ে। এই গ্রামে নমঃশূদ্রগণ সংখ্যায় প্রায় মুসলমানদের সমকক্ষ। এই সময়ে নমঃশূদ্রগণ এতদূর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, উহারা 'ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ' আর একটিও রাখিবে না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ দেখিলেই আক্রমণ করিত।

শ্রীসন্তোষকুমার রায়

"ঢাকায় ও নিকটস্থ গ্রামে উপদ্রব"

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে 'ঢাকায় ও নিকটস্থ গ্রামে উপদ্রব' সম্বন্ধে জনৈক হিন্দু মহিলার চিঠি পড়িলাম। যে-সমস্ত ভয়াবহ ও অমানুষিক কাণ্ড সেই অঞ্চলে হইয়াছে, তাহাতে কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেরই লজ্জায় ও ঘৃণায় মাথা হেঁট করা উচিত। এই দুই জাতি যুগে যুগে এই দেশে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছে এবং করিবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এই রকম অমানুষিক সাম্প্রদায়িক বিবাদ এ দেশের ইতিহাসে বিরল।

চিঠিতে বর্ণিত ঘটনাবলীর কোন প্রতিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, তবে ইহাতে মুসলমানদিগকে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন করা হইয়াছে। আমি সেগুলি উল্লেখ করিয়া যতদূর পারি উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

১। "যখন জাতি অনেক মুসলমান ...

অধঃপতন যে কতদূর গড়াইয়াছে, ভাবিলে অন্তর অবসন্ন হয়। মুসলমান মৌলবীগণ তো অনেক রকম ফতোয়া জারি করেন—এ সম্বন্ধে তাঁরা কি ফতোয়া দিতে চাহেন?"

২। "মুসলমান ধর্ম্মে কি বিশ্বজনীন সত্য বলিয়া কিছু নাই? পরস্ব লুণ্ঠন কি তাঁদের ধর্ম্মে অধর্ম্ম নয়? মুসলমানকে লুণ্ঠন করিলে পাপ, অন্যকে লুণ্ঠন করিলে পাপ নয়, তাদের ধর্ম্মে কি এই বলে?"

১। 'নৈতিক অধঃপতন' বলিতে গেলে সমগ্র ভারতবাসীরই হইয়াছে। ইহার মাত্রা কোথায় বেশী, কোথায় কম, ইহা সম্যক্‌রূপে বিচার করা অসম্ভব। যেখানে দুই দলে মারামারি কাটাকাটি হয়, সেখানে নৈতিকতার কথা কাহারও মনে না থাকাই সম্ভব। শিক্ষিত ও সভ্যভব্যদের কলহ-সম্পর্কেও এই কথা বলা যাইতে পারে। সুরাট কংগ্রেসে কোন সাম্প্রদায়িক বিবাদের কথা ছিল না; আর সেখানে উপস্থিত সকলেই সভ্যভব্যই ছিলেন; তবুও সেখানে মাথা কাটাকাটি হইয়াছিল। * লুণ্ঠনকার্য্য মারামারিরই একটা পরিণতি, বিশেষতঃ অশিক্ষিত বর্ব্বরদের মধ্যে। যে-সমস্ত মুসলমান নরনারীর লুণ্ঠনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই অতি নিম্নস্তরের। মানুষের ভিতরকার পশু যখন ক্ষেপিয়া উঠে, তখন যে হিন্দু হিন্দুত্ব, মুসলমান মুসলমানত্ব ভুলিয়া যাইবে ইহাতে বিচিত্র কি? বলে ও দলে প্রবল ও পুষ্ট থাকিলে সমান অবস্থায় হিন্দু নরনারীরাও ঐ রকম লুণ্ঠন করিত, ইহা ভাবা বোধ হয় অন্যায় হইবে না। + কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিমের আরা প্রভৃতি জেলায় আমাদের বকরীদ পর্ব্বোপলক্ষে গো কোরবাণীর জন্য সেখানকার মুসলমানদের উপর সংখ্যাধিক হিন্দুরা যে অমানুষিক অত্যাচার, হত্যা, ও লুটতরাজ করিয়াছিল, তাহা ভাবিলেও গা শিহরিয়া উঠে। * মুসলমান মৌলবীগণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এ রকম স্থলে মৌলবী ও তার ফতোয়া, ব্রাহ্মণ ও তার শাস্ত্র + একেবারেই নিষ্ফল। বিশেষতঃ বাংলাদেশে খাঁটি মৌলবীর চেয়ে নকল মৌলবীই এত বেশী যে, তাদের ফতোয়ার কথা না বলাই ভাল।

লেখিকা মহোদয়ার দ্বিতীয় প্রশ্ন গুরুতর। প্রশ্নে তাঁর শিক্ষা ও জ্ঞানের চেয়ে ভাব-প্রবণতারই বেশী পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। নতুবা তিনি নিশ্চয় জানেন, বা তাঁহার নিশ্চয়ই জানা উচিত, যে, 'বিশ্বজনীন সত্য' সব ধর্ম্মেই বিরাজিত। পরন্তু লুণ্ঠন আমাদের ধর্ম্মানুমোদিত ত নহেই, বরং ইহা সর্ব্বতোভাবে মহাপাপ। 'মুসলমানকে লুণ্ঠন করা পাপ, অন্যকে লুণ্ঠন করা পাপ নয়', ইহা বাজে কথা—লুণ্ঠন কার্য্যটাই পাপ। ‡

গোলাম মোর্ত্তাজা

---

* এস্থলে সুরাটে রাজনৈতিক দলাদলি-প্রসূত কলহের সহিত গ্রামলুণ্ঠনের সাদৃশ্য অনুমান, মস্তিষ্কের বিশেষ অবস্থা প্রসূত বলিয়া মনে হয়। —প্রবাসীর সম্পাদক

+ লেখক আবালবৃদ্ধবনিতা মুসলমানদের দ্বারা গ্রামলুণ্ঠনের মধ্যে বলের পরিচয় পাইয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া থাকিবেন। ব্যাঘ্রাদি জীবের বলশালিতাও অবশ্যস্বীকার্য্য। প্রবাসীর সম্পাদক

* ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে, জেলায়, নগরে ও গ্রামে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু সংখ্যায় বেশী। সংখ্যায় বেশী হিন্দুরা কোথায়ও সংখ্যায় কম মুসলমানদের চেয়ে অধিক বলশালী কি না, জানি না। কিন্তু ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য, যে, শান্তির সময়ে লুণ্ঠনাদি কাজ মুসলমানদের দ্বারা বেশী হইয়াছে। মুসলমান লেখকেরা আরার ঘটনাটার উল্লেখ করিয়া হিন্দুদিগকে সমান দোষী প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ ঘটনা আর কয়টি ঘটিয়াছে? ঢাকার নিকটস্থ গ্রামগুলিতে হিন্দুরা কি দোষ করিয়াছিল? —প্রবাসীর সম্পাদক

+ ব্রাহ্মণেরা মুসলমানদের গ্রামলুণ্ঠনের ফতোয়া কখনও দিয়াছিল, এরূপ সত্য কথা দূরে থাক্, এরূপ অপবাদও আগে শুনি নাই। —প্রবাসীর সম্পাদক

‡ লেখক এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছেন, অতঃপর তাহার দ্বিগুণ অন্য কথা লিখিয়াছেন। তাহা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া ছাপিলাম না। মুসলমানদের সম্বন্ধে হিন্দুদের অনেক ধারণা ও ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত না হইতে পারে; তেমনই হিন্দুদের সম্বন্ধে মুসলমানদের ধারণা ও ব্যবহারে দোষ থাকিতে পারে। কিন্তু তৎসমুদয়ের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। —প্রবাসীর সম্পাদক

পুস্তক-পরিচয়

আমার জীবনী—প্রণেতা শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই পুস্তকে সত্যের অপলাপ বা অতিরঞ্জন নাই,—জীবনের ঘটনাবলী নির্ভীকভাবে বিবৃত হইয়াছে।

এদেশের হীনাবস্থ ভদ্রলোকের ছেলেরা যাহারা মনীষা-সম্পন্ন, তাহারা কত প্রকার কষ্টের মধ্যে থাকিয়া মানুষ হয়, তাহা এই পুস্তকে বেশ অঙ্কিত হইয়াছে। এদেশের অনেক ছাত্রকে তদপেক্ষাও অনেক বেশী কষ্টভোগ করিতে হয়। পূর্ব্বে বাঙ্গালার অনেক ছাত্রেরই ভাগ্য প্রায় এইরূপ ছিল।

এই জীবনীতে শিখিবার কথা অনেক আছে। যাঁহাদের ভাগ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান দর্শন ঘটে নাই, তাঁহারা অতি সংক্ষেপে অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত ঐ সকল স্থানের সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। আমি নিজেও অনেকগুলি দ্রষ্টব্য অথচ অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থান সম্বন্ধে অনেক কথা এই পুস্তক হইতে শিখিলাম।

ইঞ্জিনিয়ারিং, জরিপ, চামড়া-পাকান, এলুমিন্যামের দ্রব্য প্রস্তুত, চা-প্রস্তুতের প্রণালী প্রভৃতি অনেক অজানা শিল্প সম্বন্ধেও অনেক তথ্য এই পুস্তকে আছে। সেগুলি এরূপভাবে লিখিত যে, সাধারণ পাঠকেরও অরুচিকর নহে; বরং সুখপাঠ্য ও আগ্রহের উৎপাদক।

অদম্য উৎসাহ বলে মানুষে কত কঠিন কাজ করিতে পারে, এই জীবনীতে তাহার নিদর্শন অনেক আছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যতই প্রতিকূল হউক না কেন, ভোলানাথ দমিবার লোক নহেন; তাহাতেই তাঁহার জয়লাভ হইয়াছে।

তাঁহার চরিত্রের অন্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে তাঁহার তেজস্বিতা ও সত্যনিষ্ঠা প্রধান। অন্য দেশে এই গুণগুলি লোককে অতি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু এই পরাধীন দেশে এই শ্রেষ্ঠ গুণ দুটি ভোলানাথের অনেক লাঞ্ছনার কারণ হইয়াছিল।

বইখানি আগাগোড়া পড়িলে লেখকের আরও কতকগুলি চারিত্রিক

বৈশিষ্ট্য মনে স্পষ্ট অঙ্কিত হয়। সেগুলি—তাঁহার আত্মনির্ভরশীলতা, আর সর্ব্বোপরি ঐশী শক্তিতে পূর্ণবিশ্বাস।

লেখক বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক হইলেও তাঁহার ভাষা ও লিখন-ভঙ্গী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের ন্যায়। মোটের উপর বইখানি সুলিখিত উপন্যাসের ন্যায় আকর্ষক।

শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ

গীতায় স্বরাজ্য (১ম খণ্ড)—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীসতীশচন্দ্র পাকড়াশী; ঢাকা। মূল্য এক টাকা। পৃঃ ১২০।

গীতার বহুপ্রকারের টীকা হইয়াছে। বিভিন্ন টীকাকার বিভিন্ন দৃষ্টি লইয়া স্বীয় মতের অনুকূলভাবে গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একই গ্রন্থের এত ভিন্ন অর্থের মধ্যে সবগুলিই সঙ্গত হইতে পারে না; কোন কোনটাতে টীকাকারের মত প্রতিপাদনের জন্য গীতাকে বাহন-রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে মাত্র।

বর্ত্তমান গ্রন্থের একটি বিশেষত্ব আছে। নভর স্বাধীনতা লাভ-চেষ্টার প্রথম যুগে যাঁহারা স্বরাজ্যসাধনার জন্য বহু দুঃখকষ্ট, নির্ব্বাসন নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, গ্রন্থকার তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম এবং নেতৃস্থানীয়। গীতাই সে যুগে তাঁহাদের সাধনার আদিগ্রন্থ ছিল এবং তাহারই মধ্যে তাঁহারা তাঁহাদের আদর্শের আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। গীতার যে অর্থ তাঁহারা সেদিন করিয়াছিলেন, সেই অর্থের অনুযায়ী আদর্শই তাঁহারা সাধনা করিয়াছিলেন এবং তাহাকেই কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইখানেই এই ব্যাখ্যার বিশেষত্ব এবং এইজন্যই ইহা সকলের প্রণিধানযোগ্য। বর্ত্তমান খণ্ডে মাত্র প্রথম চারিটি অধ্যায়ের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আমরা সাগ্রহে বাকি খণ্ডগুলির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিব।

গ্রন্থের রচনা সুখপাঠ্য, ছাপাও ভাল, তবে মাঝে মাঝে বর্ণাশুদ্ধি আছে।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

স্বদেশ-মঙ্গল—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত এবং ২১, রাজাবাগান জংশন রোড, কলিকাতা, এরিয়ান লাইব্রেরী হইতে শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশ-প্রীতির যে ধারা বহিয়া আসিতেছে, বইখানি তাহারই ইতিহাস। দেশপ্রেম জাতির জীবনে দুই ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এক জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং আন্দোলনের ভিতর দিয়া, আর এক সাহিত্যের ভিতর দিয়া। মূল এক হইলেও বিষয় হিসাবে এ দুটি জিনিষ বিভিন্ন। লেখক দেখাইয়াছেন, ডিরোজিও এবং তৎশিষ্য রামগোপাল ঘোষ আধুনিক স্বাদেশিকতার প্রবর্ত্তক। "প্রতীচীর অনেক কু-সামগ্রীর সঙ্গে দুই একটা ভাল জিনিষও এ দেশে আসিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ 'পেট্রিয়টিজম'-এর নাম করিতে পারি।" লেখক দুটি বিষয়কে একত্রে না মিশাইয়া ফেলাতে বইখানি সহজ ও সরস এবং রচনা সুখপাঠ্য হইয়াছে। রামায়ণে ও বিষ্ণুপুরাণে কি ভাবে দেশ-প্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে, উপক্রমণিকায় তাহা আলোচনা করিয়া পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লেখক বঙ্গসাহিত্যে স্বাদেশিকতার সূচনা দেখাইয়াছেন। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া দেশবন্ধু পর্য্যন্ত যে ধারা ক্রমোচ্ছ্বসিত-ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে, আজিকার জাতীয় আত্মবোধের দিনে সে বিবরণ বড়ই চিত্তাকর্ষক বলিয়া মনে হইল। দেশভক্তির প্রথম উচ্ছ্বাস, বঙ্কিম-যুগ, নাট্যসাহিত্যে স্বদেশপ্রেম, পূর্ব্ববঙ্গে দেশাত্মবোধের গান, কংগ্রেস যুগ, স্বদেশী যুগ প্রভৃতি অধ্যায়ে লেখক বইখানিকে ভাগ করিয়াছেন। সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতির এই সুনিবদ্ধ এবং ধারাবাহিক ইতিহাস গ্রন্থকারের গবেষণার ফল। লেখকের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করি। বইখানিতে অনেক জানা লেখকের লেখার অজানা উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিয়া এবং অজ্ঞাতপ্রায় লেখকের পরিচয় পাইয়া পাঠক খুসী হইবেন।

পরিণয়—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত এবং ৪১।১।১সি মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

উপন্যাস। কলিকাতায় বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসী নায়কের বিদ্যা ও বধূ লাভ, ইহাই গল্পের বিষয়। নায়ক বেচারা অত্যন্ত ভালমানুষ। এই সব মামুলি উপন্যাসে কোনরূপ ক্ষমতার আশা করা অন্যায়।

ভূদেব-নির্ব্বাণ—বিদ্যাদিত্য শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত এবং মেদিনীপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

কাব্য। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পারলৌকিক লীলা অবলম্বনে লিখিত। উনবিংশ শতাব্দীতে ইহা চলিতে পারিত, আজিকার দিনে এ কাব্য অচল।

বিরহ-শতক—শ্রীমতিলাল দাশ, এম-এ, বি-এল প্রণীত এবং ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, এম-সি-সরকার এণ্ড সন্স হইতে শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

কবিতার বই। অনেক সময় ছন্দ ভঙ্গ হইলেও, দু'এক জায়গায় কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

কলরব—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত এবং ১৩ নিমতলা লেন, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কবিতার বই। 'জনম'-এর সঙ্গে 'নিমকহারাম', 'ছাড়ব'র সঙ্গে 'কলরব', 'এলে না'র সঙ্গে 'লাগে না', 'হানিলে'র সঙ্গে 'সাজালে' প্রভৃতির মিল পত্রে পত্রে পাওয়া যাইবে। ভক্তি না থাকিলে 'প্রভু' বলিয়া কবিতা লেখার মত অসহ্য কৃত্রিমতা আর কিছু নাই।

পথের গান—মহীউদ্দীন প্রণীত এবং ১৫ নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

কবিতার বই। 'আমি অগ্নি', 'আমি ঝঞ্ঝা', 'আমি সর্ব্বনাশা', 'ধ্বংস', 'প্রলয়' 'খুন' প্রভৃতি থাকিলেও কয়েকটি কবিতার মধ্যে কাব্যের গতি ও বেগ আছে। লেখক নিজের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিতে পারিলে ভাল হইত।

শতদল—শ্রীভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন প্রণীত এবং ৭৫ বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বি-সি-শেঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

গীতিকাব্য। ভাবে নূতনত্ব না থাকিলেও কয়েকটি ছোট কবিতা ভাল লাগিল। 'পাপরাশি', 'ব্রহ্মচর্য্য' প্রভৃতি গীতিকবিতায় যত না থাকে ততই ভাল।

মহুয়া—মহাম্মদ গোলাম জিলানি প্রণীত এবং যশোহর, পোঃ সুখপুরিয়া, কমলাপুর হইতে গোলাম রছুল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা ছয় আনা।

কবিতার বই। গীতিকাব্যের সুর অনেকগুলি কবিতার মধ্যে আছে।

পরাণে লুকানো গভীর বেদনা, নয়নে বরষা ছল ছল।
জানি না কেমনে ভাসাব তরণী, অসীম সাগর টলমল।

—উপভোগ্য।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

(৩১)

আজ জাহাজ রেঙ্গুন পৌঁছিবার দিন। সকাল হইতেই যাত্রীদের মধ্যে জিনিষপত্র গুছাইয়া পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিবার বড় ধুম লাগিয়া গিয়াছে। ডাঙার জীবের প্রাণ কয়েকদিন জলের উপর থাকিয়াই একেবারে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, আজ আবার ডাঙায় নামিবার সম্ভাবনায় সকলেই উৎফুল্ল। যাহারা এই তিন দিন খালি মুড়ি দিয়া শুইয়া থাকিয়াই কাটাইয়া দিয়াছে, তাহারাও আজ উঠিয়া বসিয়াছে, সহযাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছে। যাহারা নূতন ব্রহ্মদেশ যাইতেছে তাহারা পুরানো বাসিন্দার কাছে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মগের মুল্লুকের গল্প শুনিতেছে। পুরাতন প্রবাসীও নিজের বহুদিন-সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া বেশ একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে।

জলের রং ফিকা সবুজ হইয়া আসিয়াছে, দিক্‌চক্রবালের কাছে তটভূমির অস্পষ্ট রেখা দেখা যায়। যাত্রীদের মধ্যে মহিলা যাঁহারা, তাঁহারা এরই মধ্যে সব কাজকর্ম্ম সারিয়া নামিবার জন্য ফিটফাট হইয়া বসিতে পারিলে বাঁচেন। ছেলেমেয়েদের সাজসজ্জা এরই মধ্যে একরকম সারা হইয়া গিয়াছে। কর্ত্তাদের কোনোই তাড়া দেখা যায় না, কেহবা নিশ্চিন্ত মনে খবরের কাগজ পড়িতেছেন, কেহ চুরুট ফুঁকিতেছেন, এমন কি এক আধজন তাস খেলিবার জোগাড় পর্য্যন্ত করিতেছেন। গিন্নিদের তাড়া আসিলে বলিতেছেন, "রোস রোস, এখনও কম করে চার ঘণ্টা দেরি আছে। তার ভিতর পঞ্চাশবার কাপড় ছাড়া হয়ে যাবে। এখনই কি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে যেতে চাও?"

মায়ার কেবিনেও গোছান চলিতেছিল। একলা মানুষ, কাজ বেশী নাই, কিন্তু তাও যেন অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না। মায়ার মুখ বড় গম্ভীর, কি যেন একটা ভাবনা তাহার মনে গভীর ছায়াপাত করিয়াছে, কিছুতেই ক্ষণমাত্রও সেটার হাত হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই। অন্যমনস্কভাবে সে কাপড়-চোপড় পাট করিয়া সুটকেসে ভরিয়া রাখিতেছিল।

হঠাৎ কেবিনের দরজায় ঠক্‌ঠক্ করিয়া শব্দ হইল। মায়ার মুখে একটুখানি হাসি দেখা দিল। সে উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া বলিল, "এখনও আমার ঢের কাজ বাকি, প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগবে।"

আগন্তুক যে দেবকুমার তাহা বলাই বাহুল্য। সে বলিল, "যেমন-তেমন করে ঠেসে রেখে দিন না? এর পর ত খুলে আবার গুছিয়ে রাখতেই হবে।"

মায়া হাসিয়া বলিল, "কিন্তু জিনিষগুলোর চিরদিনের মত শ্রাদ্ধপিণ্ডি হয়ে যাবে যে! আপনারও বোধ হয় এখনও গোছান হয়নি? আপনার হ'তে হ'তে আমারও হয়ে যাবে।"

দেবকুমার ক্ষীণ হাস্য করিয়া বলিল, "আমার আবার গোছান? পুরুষমানুষকে ভগবান গোছান জিনিষ অগোছাল করবার জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন। দেখেন না যে পরিবারে গৃহিণী খুব গোছাল হয়, কর্ত্তা হয় ঠিক তার উল্টো। মেয়ে অগোছাল যেমন দেখতে বিশ্রী লাগে, গোছাল পুরুষমানুষ দেখলে তেমনি হাস্যকর লাগে।"

মায়া বলিল, "মন্দ নয়। নিজেদের দোষগুলোকেও গুণ বলে খাড়া করে দিচ্ছেন? ভগবান আপনাদের নিশ্চয় ওরকম করে সৃষ্টি করেন নি, বাড়ীর আত্মীয়স্বজনে আদর দিয়ে দিয়ে ওরকম করে তুলেছে। বিশেষ করে মা-মাসীর দল। আমাদের দেশের মেয়েদের ধারণা যে, ছেলেদের দিয়ে কোনো রকম কাজ করান ভয়ানক অশোভন ব্যাপার। তারা শুধু স্কুলে গিয়ে পড়বে, এবং বাড়ী এসে আবদার করবে এবং সর্দ্দারী করবে। তাই সব এ রকম ছেলে তৈরি হয়।"

দেবকুমার বলিল, "শুধু এদেশের মা-মাসী নয়, জগৎসুদ্ধ মা-মাসীই তাহলে এই রকম বল্‌তে হয়। আমাদের দেশের ছেলেদের চেয়ে ইউরোপের ছেলেদের 'মেনট্যালিটি'র খুব যে তফাৎ আছে, তা ত মনে হয় নি।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "তারাও ঠিক আপনার মত অগোছাল বুঝি?"

দেবকুমার বলিল, "আমি ত তাদের কাছে সোনার চাঁদ। বাঙালীর ছেলে বড়জোর জিনিষপত্র কাপড়-চোপড়ই লণ্ডভণ্ড করে রাখে, তারা নিজেদের এবং পরের জীবনসুদ্ধ লণ্ডভণ্ড করে দেয়। গোছান সংসারের দোহাই একেবারেই মানে না।"

মায়া কি যেন বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। আধ মিনিট খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমার কাজটা সেরে নিই আগে।"

দেবকুমার বলিল, "সেই ভাল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করার চেয়ে বসে বসে গল্প করতে ভালও ঢের লাগে, এবং ডেকের উপর বসে গল্প করাটা স্বাভাবিক বলেই সহযাত্রীরা বেশী হাঁ করে চেয়ে থাকে না। অবশ্য আমরা খুব বেশী 'কনসিডারেশন্' তাদের কাছে পাব না।"

মায়া হঠাৎ লাল হইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

দেবকুমার বলিল, "আমরা, আমরা বলেই। দেখবার জিনিষ যদি লোকে আগ্রহ করে দেখে, তাকে দোষ দিতে পারি না।"

মায়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "আপনার আর যে দোষই থাক, বিনয়ের আতিশয্য নেই, তা পরম শত্রুতেও স্বীকার করবে।"

দেবকুমার বলিল, "কি আশ্চর্য্য! বিনয় মানুষ নিজের হয়েই করে থাকে, আমি অন্যের জন্যে করতে যাব কেন? বিশেষ করে যে-ক্ষেত্রে সেটা এমনই অনর্থক হবে, যে, তাকে অভদ্রতাও বলা চলবে।"

মায়া বলিল, "বাপ্‌রে বাপ, এতও বাজে বকতে পারেন আপনি! আপনার সঙ্গে কথায় কেউ কখনও

কিছু করবার না থাকে, ততক্ষণ ম্যাগাজিন পড়ুন গিয়ে।"

দেবকুমার বলিল, "অগত্যা। কিন্তু খুব বেশী দেরী করবেন না।"

সে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই যেন চলিয়া গেল। উল্টো দিকের কেবিনের খোলা দরজার ফাঁকে একটি গুজরাটি মেয়ে অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে এই দুটি গল্প-নিরত মানুষকে দেখিতেছিল। দেবকুমার চলিয়া যাইতেই সেও সরিয়া গেল। ব্যাপারটা মায়ার চোখ এড়ায় নাই। এতক্ষণ গল্প করিয়া তাহার মনের কালিমা কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই কাটিয়া গিয়াছিল, আবার সেটা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

এই তিন দিনের মধ্যে মায়া নিজের মনের একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিল। জীবনে এত আনন্দ ও এতখানি বেদনা একসঙ্গে সে কখনও অনুভব করে নাই। অথচ কিই বা ঘটিয়াছে? একটি মানুষের সহিত তাহার নূতন পরিচয় ঘটিয়াছে, এই ত ব্যাপার। সে মানুষটি দেখিতে সুন্দর, তাহার কথা কানে শুনিতে সুন্দর, তাহার চিন্তাও মনে আনন্দ আনিয়া দেয়। কিন্তু ইহাতেই কি শুধু মায়ার মনে এমন সুখের হিল্লোল জাগিয়া উঠিয়াছে? সুন্দর মানুষ কি আর জগতে নাই? সুন্দর করিয়া আর কেহ কি কথা বলিতে পারে না? দেবকুমারের বিশেষত্ব কোন্‌খানে?

মায়া বুঝিতে পারে না। ভাল করিয়া বোঝে না বলিয়াই তাহার চিন্তা বাড়িয়া ওঠে। কেন সে এমন করিয়া এই যুবকের ইন্দ্রজালে ধরা দিতেছে? তিনচার দিনের মাত্র পরিচয়। ইহারই মধ্যে তাহার পদধ্বনি মায়ার বুকে পুলকের শিহরণ আনয়ন করে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনায় দিনের আলো উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে, জগতের শোভা-সৌন্দর্য্য সহস্র গুণ বাড়িয়া উঠে। সকাল হইবামাত্র সে কান পাতিয়া থাকে, কখন দ্বারের কাছে তাহার পদধ্বনি শোনা যাইবে, রাত্রি হইলে সারাদিনের মধ্যে কতবার দেবকুমারের

তাহার কোন্ কথার লুকান কি অর্থ আছে, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে মায়া ঘুমাইয়া পড়ে।

প্রেমের সিংহদ্বারে এই তাহার প্রথম আগমন, ভয় এবং আনন্দ মিশিয়া এক আশ্চর্য্য অনুভূতিতে তাহার বুক দুর দুর করিয়া কাঁপিতে থাকে। এতদিন সে কেবল ইহার নামই শুনিয়াছে উপন্যাসে, কাব্যে; বন্ধুবান্ধবকে ইহা লইয়া ঠাট্টা করিয়াছে, চলচ্চিত্রে ইহার বিকাশ দেখিয়া হাসিয়াছে বা গোপনে চোখ মুছিয়াছে। কিন্তু নিজের জীবনে প্রেমের ছোঁয়াচ তাহার কখনও লাগে নাই। মাতা বাঁচিয়া থাকিতে এসব কথা চিন্তা করাই ত তাহার পাপ বলিয়া মনে হইত। যদিই-বা কৈশোরের নিয়মে কখনও প্রভাস সম্বন্ধে তাহার কল্পলোকে কোনো রঙ্গীন চিত্র সে আঁকিতে বসিত, অল্পক্ষণের মধ্যে নিজের কাছেই নিজে অপরাধী হইয়া থামিয়া যাইত। ছি ছি, হিন্দুর মেয়ের এ সকল কথা ভাবিতেও নাই।

রেঙ্গুনে আসার পর তাহার অবশ্য মতের পরিবর্ত্তন অনেক দিক দিয়াই ঘটিতেছিল। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে ভালবাসা উচিত, কি অনুচিত, সে বিষয়ে মায়া এখনও কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে পারে নাই। রেঙ্গুনে আসিবার সময় মনে মনে অনেক সঙ্কল্প লইয়াই সে আসিয়াছিল। পিতা তাহাকে যতই পাশ্চাত্য শিক্ষা দিন, সে নিজে যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছে, তাহা কখনও ভুলিবে না। সে নিরঞ্জনের মেয়ে যেমন, সাবিত্রীর তেমনই। একের খাতিরে অন্য জনের সকল শিক্ষাদীক্ষা কখনই বিসর্জ্জন দিবে না, বিশেষ করিয়া মাতার শিক্ষাকেই যখন সে সত্য বলিয়া মনে করে।

আহার সম্বন্ধে এতদিন পর্য্যন্ত সে খুব আচারবিচার রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। পূজাপার্ব্বণ প্রভৃতিতেও শ্রদ্ধাসহকারে যোগ দিয়াছে, যদিও অন্য সকল দিকে সাহেবীআনার অন্ত তাহার ছিল না। পূজা ইত্যাদিতে সে সত্যই বিশ্বাস করে কিনা, তাহা কখনও ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখে নাই, ভাবিতে গেলে বিপদ হইতে পারে জানিয়াই যেন জোর করিয়া ভাবে নাই। কিন্তু নিরঞ্জন তাহাকে বিলাত পাঠাইতে চান, তাহা সে জানিত, নিজেরও তাহার এখন কিছু অমত ইহাতে ছিল না। তাহার টাকার অভাব হইবে না, ইচ্ছামত বন্দোবস্ত করিয়াই সে বিলাতে থাকিতে পারিবে। আগে আগে অনেক ভারতীয় মেয়েই ত এইভাবে আচার বাঁচাইয়া বিদেশবাস করিয়া আসিয়াছেন, সে কেন পারিবে না? মোটের উপর অন্যেরা তাহাকে যতই মেমসাহেব বলিয়া ঠাট্টা করুক, সে জানিত সে হিন্দুর মেয়েই- আছে। সাবিত্রী যদি আজ পরপার হইতে ফিরিয়াও আসেন, তবু কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইতে তাঁহার কোনখানে বাধিবে না।

কিন্তু সংগ্রাম সুরু হইল এইবার। বিবাহ-সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারিতাকে সাবিত্রী অত্যন্তই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, এবং এ-বিষয়ে তাঁহার মতামত এমনই স্পষ্ট ছিল যে, ভুল করিবার সম্ভাবনামাত্রও সেখানে ছিল না। তাঁহার কন্যা হইয়া মায়া কি শেষে তাহাই করিবে? শুধু তাহাও ত নহে! দেবকুমার কায়স্থ, সে ব্রাহ্মণ-কন্যা। হিন্দুশাস্ত্রমতে তাহাদের বিবাহ হইতেই পারে না। দেবকুমারকে বিবাহ করিতে হইলে চিরদিনের মত তাহাকে সনাতন ধর্ম্মের গণ্ডী ছাড়িয়া যাইতে হইবে। ইহা ত শুধু ধর্ম্মত্যাগ নহে, পরলোকবাসিনী জননীর সঙ্গে তাহার জন্মজন্মান্তরের বিচ্ছেদ।

সাধারণত মাতা এবং কন্যার ভিতর যে সম্বন্ধটা থাকে, মায়া এবং তাহার জননীর সম্বন্ধটা তাহা হইতে কিছু অন্য ধরণের ছিল। সাবিত্রী সম্বন্ধে নিরঞ্জন ন্যায়বিচার করেন নাই, এ ধারণা এখনও মায়ার মন হইতে যায় নাই। সাবিত্রীর জীবন শেষ হইয়াছিল, অনাদর অবহেলার মধ্যে। নিজের জীবনে নিরঞ্জনের কৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিতে মায়া সঙ্কল্প করিয়াছিল। সত্য বটে সাবিত্রী এখন পরলোকে, স্বামীর অবহেলা বা কন্যার প্রায়শ্চিত্ত কিছুতেই তাঁহার কিছু আসিয়া যায় না, তবু মায়ার একান্ত ইচ্ছা ছিল, এই ব্রত হইতে কখনও ভ্রষ্ট হইবে না। কিন্তু প্রলোভনের প্রথম সাক্ষাতেই কি তাহার পরাজয় ঘটিল?

যতক্ষণ দেবকুমারের সহিত কথা বলিত, ততক্ষণ এ সকল ভয়, ভাবনা সংশয় তাহার মনের কোথাও

ছায়াপাত করিত না, কিন্তু তাহা ভিন্ন আর সমস্ত সময়ই তাহার দুশ্চিন্তার সীমা থাকিত না। কি করিবে সে, কোন্ পথে যাইবে? সম্মুখে কর্ত্তব্যের পথে দারুণ অন্ধকার, নিরাশা এবং বেদনা, মায়ার প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত। অন্য পথে আশা ও আনন্দের রঙীন আলোতে উদ্ভাসিত কল্পলোক, ইহার দুর্দ্দমনীয়-আকর্ষণ হইতে কখনও কি সে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে? ক্রমেই নিজের সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ বাড়িয়া চলিয়াছিল। এই তিন দিনের ভিতরেই সে এক রকম স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছিল, ইহা ক্ষণিক মোহমাত্র নয়, এই আশ্চর্য্য অনুভূতি তাহার জীবনকে একেবারে স্পর্শমণির ছোঁয়ার মত আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছে। সপ্তাহমাত্র আগে যে মায়া ছিল, তাহার সম্পূর্ণ মৃত্যু ঘটিয়াছে, আর তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার কোনোউপায় নাই।

এ-সকল ভাবনা ত তাহাকে সারাক্ষণ পীড়িত করিত, কিন্তু ইহা ছাড়াও তাহার অন্য ভাবনা ছিল। সম্প্রতি সেইগুলিই তাহার যথেষ্ট বেশী বেদনার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের মন বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই, ভাল করিয়াই সে বুঝিয়াছিল। দেবকুমারের দিক হইতে মনকে ফিরাইবার আর তাহার উপায় নাই। নিজে সে নিঃশেষেই চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে। তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখদুঃখ আর তাহার নিজের নিয়ন্ত্রিত করিবার সাধ্য নাই, সে ক্ষমতা এখন অন্যের হাতে চলিয়া গিয়াছে। এত শীঘ্র এমন ঘটনা যে ঘটিতে পারে তাহা এতদিন সে কবি ও ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিতে ভিন্ন বাস্তব-জগতে সম্ভব বলিয়াই মনে করিত না। কবির ভাষাতেই তাহার ক্রমাগত মনে হইতেছিল, "দৈবে যাহারে সহসা বুঝায় সে ছাড়া সে কেহ বোঝে না কভু।"

কিন্তু দেবকুমারের মনের কথা বুঝিবার তাহার কোনো উপায় ছিল না। সেও কি মায়ার প্রতি কিছুমাত্র আকৃষ্ট হইয়াছে, না, ইহা ক্ষণিকের খেলামাত্র? সে পুরুষ, সবেমাত্র বিদেশ হইতে ফিরিয়াছে; সেখানে এরকম অভিনয় সদাসর্ব্বদাই চলিতেছে। ইহা যে খেলামাত্র, কেহই কিছু মনে করে না। 'ফ্লার্টিং'-ব্যাপারটাকে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ একটা ব্যাপার বলিয়াই সে-দেশে সকলে জানে। দেবকুমার যদি তাহাই মনে করিয়া থাকে? মায়া শিক্ষিতা, বিদেশের হালচাল সবই জানে, দেবকুমার যদি আশা করিয়া থাকে মায়া জিনিষটাকে তাহারই মত হাল্‌কাভাবে গ্রহণ করিবে? জাহাজে সময় কাটে না, সেই সময়টুকুর জন্যই কি দেবকুমার মায়াকে এতটা বন্ধুত্ব দেখাইতেছে। ইহার ভিতর আর কিছুই কি নাই? যাতনায় যেন মায়ার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, সে প্রাণপণে এই অসহনীয় চিন্তাকে মন হইতে দূর করিয়া দিল। এই ভাবনাই এখন তাহার মনে সকলের চেয়ে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, অথচ ইহার কোনো সমাধান তাহার হাতে ছিল না। দেবকুমার নিজে ধরা না দিলে মায়ার কোনো কিছুই জানিবার উপায় নাই।

কিন্তু বর্ত্তমানের এই অমূল্য ক্ষণগুলিকে হেলায় বহিয়া যাইতে দিতে সে পারে না; মায়া কাজ সারিয়া উঠিয়া পড়িল, রঙীন সজ্জায় নিজের লাবণ্যকে উজ্জ্বলতর করিয়া ভাবনা-চিন্তাকে সবলেই যেন মন হইতে দূর করিয়া দিল। তাহার পর কেবিনের দরজায় তালা বন্ধ করিয়া ডেকের সিঁড়ির দিকে চলিল।

মাঝপথেই দেবকুমারের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। সে এরই মধ্যে পূরা সাহেব সাজিয়া ফিটফাট হইয়া আসিয়াছে। মায়ার মনে হইল এত সুন্দর মানুষ ইতিপূর্ব্বে সে কখনও দেখে নাই। নিজের রূপের গর্ব্ব তাহার যথেষ্টই ছিল, কখনও সহজে সে কোনো মানুষকে সুন্দর বলিয়া স্বীকার করিত না। দেবকুমারই প্রথম তাহাকে হার মানাইল। মায়া ভাবিল, দেবকুমার তাহার চেয়ে আরও কত সুন্দর, ইহার কাছে তাহার নিজের রূপ-লাবণ্যের আকর্ষণ কতটুকুই বা হইবে? মনটা তাহার ভার হইয়া আসিল। নিজের অজ্ঞাতেই মুখের ভাবটাও একটু বিষণ্ণ হইয়া আসিল।

দেবকুমারের চোখে সবটাই ধরা পড়িল, যদিও সে তাহার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আমার সাহেবী পোষাক দেখে বিরক্ত

আছে জান্‌লে এগুলো পরতামই না। আচ্ছা, এরকম ভুল আর হবে না।"

মায়া চম্‌কাইয়া গেল। তাহার মতামতের মূল্য কিছুও কি দেবকুমারের কাছে আছে? না, ইহাও খেলারই অংশমাত্র? কি করিয়া বুঝিবে সে? ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, তা কেন? ও সব বিষয়ে আমার কাটাছাঁটা কোনো মতামত নেই। যার যাতে সুবিধে হয়।"

দুইজনে ডেকের উপর গিয়া বসিল। দেবকুমার চেয়ার দুখানার উপর রাজ্যের মাসিক ও দৈনিক কাগজ বোঝাই করিয়া রাখিয়াছিল, যাহাতে তাহার অনুপস্থিতিতে আর কেহ আসিয়া সেগুলি দখল না করিয়া বসে। এখন ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া সেগুলা পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া সে বলিল, "এগুলো শুধু শুধু নিয়ে এসেছিলাম. একখানাও খুলে দেখিনি।"

মায়া ভালমানুষের মত বলিল, "কেন?"

দেবকুমার বলিল, "চোখ ছিল সিঁড়ির দিকে এবং মন ছিল অন্য কোথাও। ও দুটোর একটাও 'স্পেয়ার' করতে না পারলে বই খুলে রেখে লাভ কি?"

মায়া হাসিয়া বলিল, "ইংরিজিতে এ ধরণের কথাগুলো চলে যায়, বাংলায় কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি মনে হয়, না?"

দেবকুমারও একটুখানি হাসিয়া বলিল, "তা কোনো মানুষের মনোভাবে যদি বাড়াবাড়ি থাকে, ভাষায় সেটা খানিকটা প্রকাশ পেতে বাধ্য।"

মায়া বলিল, "মনোভাবে যদি সেটা থাকে, তাহ'লে ত প্রকাশ পাবেই। তবে বিলাত থেকে এলে কোন্‌টা মুখের কথা, আর কোন্‌টা মনের কথা, তা বুঝবার কোনো উপায় থাকে না।" কথাটা বলিয়াই সে লজ্জিত হইয়া পড়িল; মনে হইল, এত খোলাখুলিভাবে না বলিলেও চলিত।

দেবকুমার একটু যেন গম্ভীর হইয়া গেল। মিনিট-খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি যে কেবল মুখের কথাই বলি না সেগুলো 'মিন্‌'ও করি, তা আশা করি একদিন আপনাকে বিশ্বাস করাতে পারব।"

মায়ার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। এও কি মুখের কথা? তাহাই যদি হয়, জীবনে আর কোনো মানুষের কথাকে, মুখের ভাবকে, ব্যবহারকে সে বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু এ ভাবে কথা চালাইতে তাহার আর সাহস হইল না। অন্তত আরও কয়েকটা দিন কাটিয়া যাক্‌। তিন চারটা দিনের মধ্যে চিরজীবনের ব্যবস্থা না হয় নাই হইল?

যাত্রীদের ব্যস্ততা ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছিল। মায়া সেইদিকে চাহিয়া বলিল, "আমরা ত এসে পড়লাম ব'লে। বাবা, মানুষের যে কেন 'সি ভয়েজ' পছন্দ হয় জানি না, আমি ত কেবল দিন গুণি কখন ডাঙায় নামতে পারব।"

দেবকুমার বলিল, "আমি কিন্তু এই 'সি ভয়েজ'টা শেষ হওয়ায় একটুও খুসী হইনি।"

মায়া ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া লইবার জন্য হাসিয়া বলিল, বি-আই-এস্‌-এন্‌ কোম্পানীকে এতবড় কম্‌প্লিমেণ্ট কেউ কখনও দেয়নি।"

দেবকুমার বলিল, "কম্‌প্লিমেণ্ট-ও নয়, এবং 'বি-আই-এস্‌-এন্‌'কেও নয়। কিন্তু আপনি আবার ভাববেন আমি বাজে কথা বক্‌ছি, কাজেই আর কিছু ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করব না।"

কথাটা অন্যদিকে চলিয়া গেল। দেবকুমারের বাবা আসিয়া পড়িয়া পুত্রকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন, যে, তাঁহাদের জিনিষপত্র ঠিকভাবে একটাও বাঁধাছাঁদা হয় নাই। দেবকুমারকে অগত্যা উঠিয়া যাইতে হইল। মায়া ভদ্রতার খাতিরে উঠিতে পারিল না। বসিয়া শিবচরণবাবুর সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল।

(৩২)

শনিবারের বিকালবেলা। মায়ার কলেজ সকাল সকাল ছুটি হওয়ায় সে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। নিরঞ্জন এখনও ফেরেন নাই, তবে শনিবারে মাঝে মাঝে তিনিও বেলা থাকিতে থাকিতে বাড়ী চলিয়া আসেন।

প্রায় এক সপ্তাহ হইল মায়া রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার অনুপস্থিতিতে সংসারে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহা গুছাইয়া লইতে তাহার

অনেক সময় গিয়াছে, তাহার উপর কলেজও খোলা। দেবকুমারের সহিত তাহার একদিনের বেশী দেখা হয় নাই, তবে চিঠি ইহারই মধ্যে দুই তিনখানা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বাড়ী খুঁজিতে, জিনিষপত্র কিনিতে, বারে ভর্ত্তি হইতে সে এখন মহাব্যস্ত। আসিয়া রোজ দেখা করিতে পারে না বলিয়া অনেক করিয়া ক্ষমা চাহিয়াছে, এবং শনিবারে নিজেই যাচিয়া চায়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছে।

এই দিনগুলি মায়ার মোটেই ভাল কাটে নাই। জাহাজে দেবকুমারের নিকটে যখন ছিল, তাহার চেয়ে এখন তাহার মন আরও অধীর আরও উতলা হইয়া উঠিয়াছে। কি যেন এক অদৃশ্য ডোরে তাহার জীবন ঐ মানুষটির সহিত গ্রথিত হইয়া গিয়াছে, মায়া যত দূরে যাইতেছে ততই উহাতে টান পড়িতেছে এবং বেদনায় তাহার হৃদয় হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছে। নিজের অবস্থায় এক একবার তাহার হাসি পাইত। একি হইল? প্রেমকে উপহাস করা তাহার স্বভাব ছিল, ইহা কি প্রেমের দেবতার প্রতিশোধ? ভালবাসায় পড়িতে সে অনেক মানুষকেই দেখিয়াছে, কিন্তু এতখানি কষ্ট পাইতে কাহাকেও দেখে নাই। অন্যেরা ত দিব্য খায়-দায়, ঘুমায়, নানা রকম প্ল্যান্ করে, সেইমত কাজও করে। দেখিয়া মনে হয় না, ভালবাসাটা তাহাদের জীবনে বিশেষ কোনো বিশৃঙ্খলা আনিয়াছে। যেমন দিন চলিতেছিল, তেমনি চলে, উপরন্তু ফুর্ত্তি করিবার, আমোদ করিবার নূতন কতগুলি সুযোগ, সুবিধা ঘটিয়া যায়।

কিন্তু তাহার বেলা কি ঘটিল সকলই অন্য রকম? আমোদ ফুর্ত্তি ত দূরে থাক, তাহার বাঁচিয়া থাকাই যেন দায় হইয়া উঠিয়াছে। জীবনটা এমনই উলোট্‌পালট্ হইয়া গিয়াছে যে, সে যে ইহার পর কেমন ভাবে, কি করিয়া এটাকে কাটাইবে, তাহা ভাবিয়াই স্থির করিতে পারে না। চিরদিনের অভ্যস্ত পথে আর সে চলিতে পারিবে না, ইহা ধ্রুব সত্য, তাহার জীবনে দারুণ একটা সন্ধিক্ষণ যে দ্রুতবেগে ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নেই।

জাহাজে থাকিতে এক একবার তাহার মনে হইত নিজের অভ্যস্ত জীবনধারার মধ্যে আবার গিয়া পড়িতে পারিলে হয়ত এই নূতন মোহের ঘোর তাহার কাটিয়া যাইবে। কিন্তু এখন দেখে বৃথা সে আশা। কর্ত্তব্য বলিয়া এতকাল যাহা সে বুঝিত, তাহা হইতে যদি ভ্রষ্ট হইতে না হয়, তাহা হইলে দেবকুমারের চিন্তাও মন হইতে তাহাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে জীবনে আর তাহার থাকিবে কি? সে কি আর মাথা সোজা করিয়া চলিতে পারিবে? দুর্ব্বিসহ বেদনার ভারে একেবারে ভাঙিয়া পড়িবে না? ক্রমাগত নিজের মনের সহিত সংগ্রাম করিয়া মায়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আর সে পারে না, ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে যাহা ঘটিবার ঘটুক মনে করিয়া সে যেন হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল।

রোদ পড়িয়া আসিতেছিল। নিরঞ্জন চায়ের সময় আসিয়া জুটিতে পারিবেন কি না স্থিরতা নাই। অজয় আসিবে বলিয়া গিয়াছে, তবে সেটা তাহার দুষ্টামি, না, সত্য কথা, মায়া তাহা ঠিক জানে না। মনে মনে সে স্বীকার না করিয়া পারিতেছিল না যে, একজন আসিলেই তাহার আনন্দ পরিপূর্ণ হইবে, বাড়ীর লোকগুলি আসুক বা নাই আসুক, তাহাতে বিশেষ আসিয়া যায় না।

সম্প্রতি সে চায়ের জোগাড় করিতেই ব্যস্ত ছিল। দেবকুমার যেন মনে না করে যে, এ গৃহের গৃহিণী নাই বলিয়া অতিথির কোনো আদরযত্নই হয় না। চা-টা কোথায় দেওয়া হইবে, তাহা সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। তাহাদের বাগানটায় চারটা সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত অত্যন্তই রোদ থাকে, কিন্তু ঐ জায়গাটার সম্বন্ধে মায়ার মনে খুব একটা পক্ষপাত আছে। বাড়ীতে অবশ্য বহুমূল্য আসবাবে সাজান ড্রয়িংরুম বা ডাইনিং-রুমের অভাব নাই, কিন্তু বিকাল বেলাটা ঘরের কোণে বসিতে মায়ার ইচ্ছা করে না। তাহা ছাড়া চারিদিকে চাকরবাকরের ভিড়। ভারতীয় চাকরবাকরের চোখে ধূলা দেওয়া বড়ই শক্ত ব্যাপার। দেবকুমার এবং মায়ার মনের সম্বন্ধটা তাহাদের বুঝিতে বিশেষ দেরি হইবে না, এবং তাহা লইয়া ঝি-চাকর-মহলে যে রসাল আলোচনার সূত্রপাত হইবে, তাহা ভাবিতেই মায়া শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু দেবকুমার সদ্য

বিলাত্ প্রত্যাগত, চা খাইতে সে চারটার মধ্যেই আসিবে, সন্ধ্যার পর আসিবে না, কাজেই ঘরে চা দেওয়ারই বোধ হয় ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশী,বিলাতি, সকল রকমের খাদ্যই প্রচুর পরিমাণে ফরমাস দিয়া, এবং একটি দামী চায়ের সেট্ বাহির করিয়া দিয়া মায়া উপরে চুল বাঁধিতে এবং কাপড় বদ্লাইতে চলিয়া গেল। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজের মুখের বিবর্ণ প্রতিকৃতি দেখিয়া সে যেন চমকিত হইয়া উঠিল। যে মানুষ নিজে সুন্দর, সে সৌন্দর্য্যকে সমাদর করে, এবং সৌন্দর্য্যের অভাবের প্রতি অবজ্ঞা থাকাও তাহার মনে খানিকটা স্বাভাবিক। মায়ার এমন বিবর্ণ শ্রীহীন মুখ দেখিল দেবকুমার মনে করিবে কি? সে যথাসাধ্য যত্নে প্রসাধন করিয়া, নিজের রূপকে দীপ্ত উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। নিজের বাড়ীতে এত সাজসজ্জা কখনও সে করে না, অজয় যদিও হঠাৎ আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে মায়াকে যে সে ঠাট্টা করিয়া অস্থির করিয়া তুলিবে, তাহাও মায়া জানিত, তবুও লোভ সাম্লাইতে পারিল না। দেবকুমার যদি তাহাকে দেখিয়া একটু মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, তাহা হইলে আর সে কিছুকে ভয় করে না।

মাঝপথে তাহার বুড়ী আয়া আসিয়া চেঁচামেচি জুড়িয়া দিল, "থোড়া সুন্নাউন্না নিকালকে ডালো না, ওসব ক্যা খালি পেটিমে রখ্‌নেকো ওয়াস্তে বনায়া?" মায়ার শরীরে অলঙ্কারের অপ্রাচুর্য্যটা তাহার ভাল লাগিল না।

মায়া বলিল, "ঘরে বসে আবার ক'ঝুড়ি গয়না পরতে হবে? যা পালা এখান থেকে। দেখ্‌গে যা, আমার ব্লু চায়ের সেট্‌টা ছোক্‌রা এখনি ভেঙে রাখবে।" অন্য চাকরবাকরকে গাল দিবার সুযোগ বুড়ী কখনও উপেক্ষা করিত না, সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

মায়া ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, চারটা বাজিতে আর কয়েক মিনিট মাত্র দেরী আছে। নীচে আগেই নামিবে, না, দেবকুমারের আসার খবর পাইলে পর যাইবে, তাহাই ভাবিতেছে, এমন সময় বেয়ারা আসিয়া খবর দিল, "সাহেবের গাড়ী এসেছে।"

মায়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল। কিন্তু গিয়া দেখিল নিরঞ্জন আসেন নাই, শুধু গাড়ীই আসিয়াছে। ড্রাইভারের হাতে নিরঞ্জন চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "আজ এত কাজের চাপ পড়েছে যে, কিছুতেই যেতে পারলাম না। দেবকুমারকে বোলো, সে যেন কিছু মনে না করে।"

চিঠি পড়িয়া মায়া ড্রাইভারকে বিদায় করিয়া দিল। তারপর আবার উপরে উঠিবে কি না ভাবিতেছে, এমন সময় ট্যাক্সি হাঁকাইয়া দেবকুমার স্বয়ং আসিয়া পড়িয়া সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিল।

দেবকুমার আজ ফিটবাবু সাজিয়া আসিয়াছে। শান্তিপুরে ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী, এবং পায়ে কালো মখমলের নাগরা জুতা। বিলাতী সাজের মধ্যে হাতের মণিবন্ধে একটা 'রিষ্ট' ওয়াচ, আর বিদেশী-আনার কোনো চিহ্ন নাই।

মায়া অগ্রসর হইয়া আসিতেই দেবকুমার হাস্যমুখে তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "দেখুন, আজ আপনার 'অনারে' পুরো বাঙালী বাবু সেজে এসেছি।"

মায়াও হাসিয়া বলিল, "যা নিজের থেকেই করা উচিত, তা অন্যের খাতিরে করলে তার কি খুব বেশী মান বাড়ে?"

দেবকুমার বলিল, "নিশ্চয়ই। একজন পথভ্রষ্টকে 'রিক্লেম' করার মাহাত্ম্য কি কম?"

মায়া বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা এখন বসবেন চলুন, তারপর বক্তৃতা করবেন।"

দুজনে বসিবার ঘরে আসিয়া বসিল। দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাবা বুঝি এখনও এসে পৌছন নি?"

মায়া বলিল, তাঁর "আজ আসতে দেরিই হবে, বলে পাঠিয়েছেন।"

দেবকুমার আর সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করিয়া বলিল, "এ ক'দিন এমন ভয়ানক ব্যস্ত ছিলাম, যে, কিছুতেই আসতে পারিনি। আপনি আমাকে নিশ্চয়ই ভয়ানক রকম অসভ্য ভেবেছেন।"

মায়া বলিল, "ওমা, তা মনে করতে যাব কেন? মানুষের কাজ আগে, না বেড়ান আগে?"

দেবকুমার বলিল, "ও ত নিতান্ত নীতিশাস্ত্রের কথা

হ'ল। মানবশাস্ত্রে, একটা বিশেষ কালে, অন্ততঃ স্থান-বিশেষে, বেড়ানটাই ঢের আগে। যখন নেহাৎ আর কিছু করবার থাকে না, তখনই মানুষ কাজ করে।"

মায়া বলিল, "আপনার মতানুসারে চল্‌লে পৃথিবী এতদিনে থেমে দাঁড়িয়ে যেত।"

দেবকুমার বলিল, "মোটেই না। বরং আপনি যা বল্‌ছেন সেইভাবে চল্‌লেই বিপদ হত বেশী। জগতের অধিকাংশ মানুষই কর্ত্তব্য বলে কাজ করে না, হয় করে দায়ে পড়ে, নয় কাজের মধ্যেও 'প্লেজার' পায় বলে।"

মায়া বলিল, "থাক, আপনার সঙ্গে তর্কে পারবার কোনোই সম্ভাবনা যখন আমার নেই, তখন তর্ক নাই করলাম। বাড়ীটাড়ি পছন্দমত পেলেন কিছু?"

দেবকুমার বলিল, "এখানে বাড়ী থাকলে ত বাড়ী পাব? বাড়ী মানে ত খাঁচার মত কতগুলি 'ফ্ল্যাট'? দেখলেই আমার হাড় জ্বলে যায়। যাও বা দু-একটা ভাল আছে একটু, সেগুলোর ভাড়া এত বেশী যে বাবা সে শুন্‌লেই লাফিয়ে উঠেন। কি যে করি ভেবেই পাচ্ছি না। বেশীদিন এ ভাবে ভেসে বেড়ালে আমার মোটেই চল্‌বে না, আমি শীগগির করে গুছিয়ে বস্‌তে চাই।"

মায়া বলিল, "সত্যি এখানে বাড়ীর ভয়ানক অসুবিধে। ভাগ্যে বাবা এই বাড়ীটা করেছিলেন, নইলে আমাকেও কোন এক খাঁচায় গিয়ে উঠতে হ'ত তার ঠিকানা নেই। আমার আর সব দিকের অভাব সহ্য হয়, কিন্তু থাকবার জায়গাটা বেশ বড় না হ'লে ভারি কষ্ট হয়।"

দেবকুমার হাসিয়া উঠিল, বলিল, "খাবার পরবার অভাব যে কি জিনিষ, তা যদি সত্যি জান্‌তেন, তাহ'লে আর একথা বল্‌তেন না।"

মায়াও হাসিল, বলিল, "তা এক্কেবারে একটুও যে জানি না তা নয়। চিরদিনই ত আমার এ রকম করে কাটেনি? গ্রামে যখন থাকতাম তখন কিছু কিছু প্রাইভেশন্ সয়েছি বই কি?"

দেবকুমার বলিল, "সত্যি, আপনার জীবনের এই অংশটার হিষ্ট্রি আমার ভারি অদ্ভুত লাগে। বাঙালীর মেয়ে 'রিলিজাস্ কন্‌ভিকশন্'-এর খাতিরে স্বামীও ছেড়ে দেয় এ আর আগে কখনও শুনিনি।"

মায়া একটু গর্ব্বের সহিতই বলিল, "তাঁর ভিতর যে জিনিষ ছিল, সব বাঙালীর মেয়ের মধ্যে তা কোথায় পাবেন?"

দেবকুমার একটু দীর্ঘক্ষণ মায়ার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "তিনি যা করেছিলেন, তাই কি আপনার ঠিক মনে হয়? ধর্ম্মমত কি মেয়েদের কাছে স্নেহ, প্রেম, সব কিছুর চেয়ে বড় হওয়া উচিত?"

মায়া কিছু না ভাবিয়াই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই। মতের জন্যে যে ত্যাগস্বীকার করতে না পারে, তার মত থাকা-না-থাকা সমান।"

দেবকুমার গম্ভীর হইয়া গেল। খানিকক্ষণ পরে বলিল, "আমার কিন্তু তা মনে হয় না। ভালবাসার চেয়ে মতের দাম স্ত্রীলোকের কাছে বেশী হওয়া উচিত নয়। তাহ'লে সংসার টিকতে পারে না।"

মায়া যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার অন্তরও এই কথাই বলে, কিন্তু তাহার বুদ্ধি এখনও ইহা স্বীকার করিতে চায় না। দেবকুমার এ কথা পাড়িতেই বা গেল কেন? সেও কি এই ভাবনায় পড়িয়াছে? কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই কি সে আজ এই আলোচনা উত্থাপন করিয়াছে? মায়ার মন সভয়ে পিছাইয়া গেল। না, না, এখনই এ মীমাংসার প্রয়োজন নাই। আরও কয়েকটা দিন অন্ততঃ অনিশ্চিতের আশ্রয়েই থাকিয়া দেখা যাক। সে কথা ঘুরাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল, "তর্ক করে ত গলা শুকিয়ে ফেল্‌লেন, এইবার চা আন্‌তে বলি?"

দেবকুমার হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু গলাটা একবার ভিজিয়ে নিয়ে আবার যদি দ্বিগুণ উৎসাহে তর্ক করি, তখন আমায় দোষ দেবেন না। মায়া ইলেট্রিক বেল বাজাইয়া চাকরকে ডাকিয়া চা আনিতে বলিয়া দিল। দেবকুমার ঘরের চারিদিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া লইয়া বলিল, "আপনি সব জিনিষেই দেশী ভাব বজায় রাখবার খুব পক্ষপাতী, না?"

মায়া বলিল, "ছবি আর 'ফারনিচার' দেখে বল্‌ছেন? এগুলো আমারই আমদানী বটে, বাবা আগে সব কিছু

পুরো বিলাতি ষ্টাইলেই সাজিয়েছিলেন। আমি এখন অল্পে অল্পে বদল করছি।"

দেবকুমার বলিল, "আপনি দেখছি রিফর্ম্মার হয়েই জন্মেছেন।"

মায়া বলিল, "আমি ঠিক তার উল্টো। আমাকে এখানের সকলে ভয়ানক গোঁড়া বলেই গাল দেয়। বাবাকে বিরক্ত করতে চাই না ব'লে বেশী বাড়াবাড়িগুলো করি না, কিন্তু আসলে আমার মত আগেরই মত অর্থোডক্শ্ আছে।"

দেবকুমার বলিল, "আমার কিন্তু তা মোটেই মনে হয়নি।"

মায়া হাসিয়া বলিল, "আপনি আমাকে কতটুকুই বা জানেন? দুদিন জাহাজে দেখেছেন বই ত নয়?"

দেবকুমার বলিল, "মানুষকে বুঝবার জন্যে কি আর একজন্ম ব'সে দেখতে হয়? তার সত্যিকার পরিচয় অল্পক্ষণের দেখাতেই পাওয়া যায়।"

এই সময় চা-টা আসিয়া পড়িল। দেবকুমার বলিল, "আপনি করেছেন কি? একটা মানুষে কি এত খায়?"

মায়া বলিল, "একটা কেন? আমিও রয়েছি।"

দেবকুমার বলিল, "যা দেখছি, এর ভিতর বেশী জিনিষই আপনি খাবেন না। আমার জন্যে কেন আনালেন?"

মায়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "ওমা, আমি খাব না ত কি হবে? যে বাড়ীর কর্ত্তা নিরামিষ খায়, সে কি মাছ খেতে কাউকে ডাকেও না?"

দেবকুমার বলিল, "আমি বুঝি শুধু খেতেই এসেছি? না, এ গুলো নিয়ে যেতে বলুন, আপনি নিজে যা খেতে পারেন, সেইগুলোই শুধু থাক।"

মায়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, অততে দরকার নেই। আপনি খান ত, এখনি অজয় আস্‌বে, বাবাও আসতে পারেন, আপনাকে সঙ্গ দেবার লোকের অভাব হবে না।"

দেবকুমার একটা সন্দেশ তুলিয়া লইয়া বলিল, "এই হ'লেই আমার হবে, চা-টা অবশ্য খাব।"

মায়া বলিল, "আপনি ছোট জিনিষকে বড় বেশী বাড়ান। আচ্ছা, আচ্ছা, আমিও না হয় খাচ্ছি, আপনার অত রাগ করবার দরকার নেই।"

কথাটা বলিয়াই কিন্তু তাহার মন দমিয়া গেল। দেবকুমারের কথাই ত তাহা হইলে ঠিক বলিয়া প্রমাণ হইল। মেয়েদের মতের কোনই মূল্য সত্যই কি নাই?

দেবকুমার কিন্তু সে কথা আর তুলিল না। এমন ঘটা করিয়া খাইতে লাগিল, যেন মায়া তাহাকে খাইতে সুযোগ দিয়া একেবারে বাঁচাইয়া দিয়াছে।

খানিক পরে অজয় আসিয়া জুটিল। চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি, কিছু বাকি আছে?"

দেবকুমার হাসিয়া বলিল, "বিশেষ কিছু নয়।"

ক্রমশঃ

মাতৃভূমির সেবা

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১

ওপারে নগরীর হাজারো ঘরে,
কত না কোলাহল কত না আলো!
এপারে জনহীন জলার চরে
নিশুতি নিশা নামে নিবিড় কালো।
প্রবল বায়ু-বেগে সমুখে পিছে—
—সঘনে তালবীথি মর্ম্মরিছে,
আঁধারে উদ্ভাসি জ্বলিছে জলরাশি,
তারার ছায়া তাহে শোভিছে ভালো।
জনতা হ'তে দূরে বিজনপুরে
নীরব ম্লানালোক কুটিরখানি;
কঠিন ব্রত লয়ে মিলেছি আলয়ে
—আমরা জন-কত অবোধ প্রাণী।

২

আশায় উদ্বেগে অধীর হিয়া—
এসেছি গৃহ ছাড়ি পথের 'পরে ;
যাহারা বন্ধনে আরামে আছে
—মোদের সুখ নাই তাদের তরে ;
সমাজ সংসার মমতা স্নেহ—
বাঁধিতে পারে নাই আজকে কেহ,
দারুণ দেবতার ডাক যে পেল তার
আগুন লাগিয়াছে সুখের ঘরে।
আদেশ আসিয়াছে,—"ঘুচাতে হবে—
যে পাপ যুগে যুগে হয়েছে জমা ;
যাহারা অপমানে 'নিয়তি' বলি মানে—
নিয়তি তাহাদের করে না ক্ষমা।"

৩

যাহারা জীবনেরে বেসেছে ভালো,
মরণ আজকে যে তাদেরি যাচে ;
বাঁচার মত যারা বাঁচিতে জানে
মরার অধিকার তাদেরি আছে।
এ রণ আজকার কঠিন বড়,
আজি এ অভিযান নূতনতর,
অরিরে ভালবেসে মরিতে শিখাবে সে—
মাথা না করি নত ভয়ের কাছে।
বিদেশী লোকদের ভোগের লাগি—
মানুষ ছিল পোষা পশুর মত,
মানুষ দেবতা যে জেগেছে তারি মাঝে—
পশুরে করিবারে সমুন্নত।

৪

রচিত যে কারার প্রাচীররাজি
তোমার ভয়ে আর তোমার পাপে,
তোমরা মাথা তুলে দাঁড়ালে আজি,
সে কারা যাবে ধসি বিধির শাপে।
যে জাতি এসেছিল আঁধার রাতে,
মাণিক দেছ তারে আপন হাতে ;
সে যদি আজি তায় ছাড়িতে নাহি চায়
কি হবে গালি দিয়া মনস্তাপে ?
সে যদি ভুলে থাকে আপন পদ,
শিখাতে হ'বে তারে নূতন করি।
চাহ যে প্রতিকার, উপায় কর তার—
গেয়ো না পুরাকথা ধূলায় পড়ি।

৫

অনেক ঘুমায়েছি জাগিতে হবে,
অনেক সহিয়াছি, আর না সহে,
যে পাপে যে গরলে জ্বলিছে দেশ
তাহার শেষ আজ না হ'লে নহে।
আজিকে সব ভুলে অকুতোভয়ে
মরণে যেতে হবে অথবা জয়ে,
বসিয়া ভাবিবার সময় নাহি আর
যুগ যে কেটে গেল,—বেলা যে বহে।
রুধিতে হবে আজ পাপের পথ
আপন বুক দিয়া জীবন দিয়া।
শুধিতে হবে ধার ক্ষুধিত দেবতার
অযুত নরমেধ অনুষ্ঠিয়া।

৬

আঁধারে দেখা দেছে নূতন জ্যোতি-
পাথারে দেখা গেছে কূলের রেখা,
তরণী চল বেয়ে ত্বরিত গতি—
আজিকে ফিরে যাবে ললাট-রেখা,
সাগর আলোড়িত তুফান বেগে
আকাশে ঢেকে আসে প্রলয় মেঘে,
মাথার 'পরে থাকি অশনি উঠে ডাকি,
তড়িতালোকে সুখে চল রে একা।
যে তারা জ্বলিতেছে নিশায় আজি,
সে যদি ডুবে যায় আঁধার তলে,
নূতন ঊষা আসি তমসা দিবে নাশি
ধরণী যাবে ভাসি আলোর জলে।

৭

যে ঊষা আসিতেছে তাহারি আভা
জেগেছে বহুদূর দেউল জুড়ে,
মানুষ উঠিয়াছে মরণ জয়ী—
হাজার বছরের কবর ফুঁড়ে।
আজিকে ভাঙা চাই সকল বাধা,
অরি রে প্রেমডোরে চাই রে বাঁধা ;
চোখের ঠুলি খোলো, শেখানো বুলি ভোলো,
আশা জাগায়ে তোলো নিখিল জুড়ে।
আজি এ শুভদিনে সবাই এস,
জ্বলেছে হোমানল, ডাকিছে হোতা,
"মায়ের তরে প্রাণ কে দিবে বলিদান,
পূজার ফুল কই, আহুতি কোথা ?"

৮

সবারি বুকে আছে পূজার ফুল—
সবারি দেহে হয় হোমের হবি ;
দিবে কি নাহি দিবে দৈব কাজে—
তোমার আপনার ইচ্ছা সবি।
সে হবি নিজ ভোগে গরল হবে,
তোমার তিলে তিলে জীবন লবে,
লুকায়ে রাখো লয়ে—সে ফুল কাঁটা হয়ে
বিঁধিবে নিতি নব জনম লভি।
নিজেরে না ভুলিলে নাহিক ত্রাণ,
উজল হতে চল অনলস্নানে
নিখিল নরলোক আজিকে সুখী হোক
মোদের ক্'জনার জীবনদানে।

৯

অভাগা কোটি কোটি তোমার ভাই—
ক্ষুধায় রোগে শোকে জর্জ্জরিত
দুবেলা ঘরে বসি কলহ করে,
নেশায় ডুবে ভোলে প্রাণের ক্ষত।
তারা যে পড়িয়াছে বিধির রোষে—
সে শুধু তব পাপে তোমার দোষে,
তাদের সে নরকে বাঁচাতে কি কর কে ?
তাদের সাথে তব প্রভেদ কত ?
মাটির দীপে তার করেছ হেলা,
বিদেশী বাতি জ্বালি অশুভক্ষণে ;
উঠিবে দিবা যবে সে আলো কি বা হবে,
হারাবে মাঝে হতে আপন জনে।

১০

ক্ষুধিত লাঞ্ছিত ভাগ্যহত
বাঁচিয়া আছে মরি যাহারা সবে,
আজিকে পথে পথে তাদের লাগি
ফিরিতে হবে ডাকি মাভৈঃ রবে।
তোমার শুভবোধ তোমার স্নেহে,
চেতনা দাও শত অবশ দেহে।
তাদের ভাল যাহা তোমারে আজি তাহা
যতনে নতশিরে শিখিতে হবে।
ব্যথিত ভগবান, ব্যথিত ধরা,
পাপের পরিণাম হয়েছে সুরু।
মোদের সেনাপতি, আজি অখিল-পতি,
মোদের গুরু আজ জগদ্গুরু।

১১

যদি না ফিরি আর নাইক ক্ষোভ
যদি না দেখে যাই কাজের শেষ ;
কিছুরই 'পরে মোর রবে না লোভ
কাহারো 'পরে মোর রবে না দ্বেষ।
আঘাত যদি হয় কঠিন বড়,
মোদের হ'তে হবে কোমলতর,
মরিতে হবে যায়—তার কি আসে যায়—
কে তারে দিল গালি কে দিল ক্লেশ।
মেটেনি যত আশা মিটিবে না ক—
বাকী যা আছে কাজ রাখো তা তুলে;
রহি বা নাহি রহি—সকল ব্যথা সহি
আঘাত দিয়ে যাব পাপের মূলে।

১২

নিজের শত ক্ষত, হাজার ক্ষতি
ভুলিতে হবে আজ সবারে স্মরি;
সকল সুখসাধ যশের মোহ—
চলিতে হবে নিজে দলিত করি।
দেউলে দিবালোকে যে পূজা হবে;
জগৎ জুটিবে সে মহোৎসবে।
শেফালি তারি লাগি আঁধারে রবে জাগি—
উষার তরুমূলে পড়িবে ঝরি।
কেহ-বা পাবে ঠাঁই সোনার থালে
প্রভাতে দেবতার পূজার ক্ষণে
কেহ-বা ধুলি সাথে মিশায়ে যাবে প্রাতে
তাহারে কারো আর রবে না মনে।

মহিমবাথান
২০ বৈশাখ, ১৩২৭

মহিলা-সংবাদ

ভারতীয় নারীরা এইবারের রাজনৈতিক আন্দোলনে যে-ভাবে যোগ দিয়াছেন ও দিতেছেন, তাহা শক্র, মিত্র ও নিরপেক্ষ, সকলেরই বিস্ময়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে,

নারী সত্যাগ্রহ সমিতির নেত্রীগণ
বাম দিকের সব শেষে শ্রীমতী শান্তি দাস, এম্‌-এ

বিশেষতঃ বাংলা দেশে যেখানে অবরোধপ্রথা এখনও বর্ত্তমান। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমতী ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা, শ্রীমতী বিমলপ্রতিভা দেবী, শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দেবী, শ্রীমতী মোহিনী দেবী ও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর কারারুদ্ধ হওয়ার সংবাদ আমরা ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত করিয়াছি।

ইঁহাদের পর নিম্নলিখিত মহিলারা কারারুদ্ধ হইয়াছেন ঃ—

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

১। শ্রীমতী যোগেশ্বরী দেবী—চার মাসের কারাদণ্ড
২। শ্রীমতী সরস্বতী দেবী—চার মাসের কারাদণ্ড
৩। শ্রীমতী ভক্কুয়ার দেবী—চার মাসের কারাদণ্ড
৪। শ্রীমতী দেবী—চার মাসের কারাদণ্ড
৫। শ্রীমতী বাচুলী পাটেল—চার মাসের কারাদণ্ড
৬। শ্রীমতী চামেলী দেবী—ছয় মাসের কারাদণ্ড
৭। শ্রীমতী শান্তিদাস, এম-এ—চার মাসের কারাদণ্ড
৮। শ্রীমতী শোভনা রায়
৯। শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্র
১০। শ্রীমতী সীতা দেবী
১১। শ্রীযুক্তা অশোকলতা দাস
১২। শ্রীযুক্তা গিরিবালা রায়

ইঁহাদের পর আরও কয়েকজন মহিলা কারারুদ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীমতী বিমলপ্রতিভা দেবী

শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী

শ্রীমতী ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা

শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী

অন্তরে বাহিরে

শ্রীআশীষ গুপ্ত

বাহিরে—

সাইন্‌বোর্ড-ওয়ালাটাকে সাইনবোর্ডটা লিখিতে দেওয়ার সময়ে অনেক চিন্তা করিয়াছি। লোকটা অক্ষর-পিছু চার চারটা পয়সা করিয়া চার্জ্জ করিয়াছে। নিজের নামটা তাই অনেক ইতস্তত করিয়া বাদ দিয়াছি। কম পয়সায় নাম লিখান যাইবে এমন নামও পিতামাতা রাখেন নাই,—কুলকুণ্ডলিনীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার উপরে বাংলায় স্বত্বাধিকারী না লিখিয়া ইংরেজী কেতায় 'প্রোঃ' লিখিলে মোটমাট দাঁড়ায় ষোলোটা অক্ষর, তাহার সহিত যদি যোগ করি M. A. তবে হয় আঠারোটা, যদি করি এম্‌-এ, তবে হয় উনিশটা। সর্ব্বশেষে, যদি নিজেকে 'শ্রী'মণ্ডিত করি, তাহা হইলে গিয়া দাঁড়ায় কুড়িটাতে। এই সকলই বাদ দিয়াছি, পাঁচসিকা আন্দাজ পয়সা বাঁচিয়াছে। মোহনলাল সাহা লেন, আর বিষ্টু বসু ষ্ট্রীট এই দুইটি আট হাত চওড়া গলির মোড়ে, যে-কোনও চক্ষুষ্মান্‌ ব্যক্তিই 'দি গ্রেট্‌ ডিফারেনসিয়াল অন্নপূর্ণা ষ্টোর্স'-এর সাইন্‌বোর্ড দেখিতে পাইবেন। চাল, ডাল, তেল, ঘি হইতে আরম্ভ করিয়া কাগজ, কলম, দোয়াত, পেন্সিল, হেজ্‌লিন, পোমেড্‌, পাঁউরুটি, বিস্কুট, লেমনেড, বিড়ি, সিগারেট—সকলই পাওয়া যায়। যদি কিছু না মেলে, তবে পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ দিলে যত্নের সহিত মাল সরবরাহ করিয়া থাকি, ভেজাল দিই না একটুও। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

খোলার ঘর, মাসে ছয় টাকা করিয়া ভাড়া। সামনে খোলা নর্দ্দমা। কাদার উপর দিয়া ভাতের ফ্যান্‌, আঁস্তাকুড়ের আবর্জ্জনা গড়াইয়া চলে। একখানা পুরু তক্তা নর্দ্দমার এধার হইতে ওধার অবধি ফেলা আছে। কিছু দূরে একটা জলের কল, সকাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত সেখানে অবিশ্রান্ত ভিড়। কোলাহল এবং গালাগালির বিরাম নাই। চারিদিকে খোলার বস্তি।

সকালবেলা, সবেমাত্র ঘুম হইতে উঠিয়া, 'অন্নপূর্ণা ষ্টোর্স'-এর ঝাঁপ খুলিয়া গঙ্গাজলের ছিটা দিয়াছি, এমন সময় সহদেব আসিয়া হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে হাসিমুখে কহিল, 'প্রাতোপেন্নাম দা'ঠাকুর, শরীর গতিক ভাল ত?'

উপরের তাকে-রাখা একটা থামে সাদা রং করা গণেশ মূর্ত্তিকে নমস্কার করিতে করিতে জানিলাম যে, আজ যদি সহদেবকে ধারে পাঁচ সের চাল না দিই, তাহা হইলে সে ওই নর্দ্দমার উপর পড়িয়া গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা হইবে, এবং সে সকলের দরুণ যাহা কিছু পাপ সকলই নাকি আমাকে স্পর্শ করিবে।

সহদেব ছিল কণ্ডাক্টার, মাসে উনিশ টাকা মাহিনা পাইত, চোখ দুইটা দেখিলে ভয় হইত, যেন ভিতরকার সমস্ত বন্ধন ছাড়াইয়া তাহারা বাহির হইয়া আসিবে। সামনের গুটিতিনেক দাঁত নীচের পুরু ঠোঁটটা ছাড়াইয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। গাঢ় হলুদ সেইগুলার রং, সমস্ত মিলিয়া মনে হইত, যেন একটা হিংস্র রক্তলোলুপ জীব, যে-কোন মুহূর্ত্তেই ঘাড় মট্‌কাইতে পারে।

সহদেব হাসিতে লাগিল, বলিল, "মাইরি দা'ঠাকুর, শালার আপিসে গেল মাসে পাঁচ পাঁচটা টাকা ফাইন করে দিলে, তাইতেই ত ধার চাইছি, নইলে,—আচ্ছা, তুমিই বল না, পিসে, সহদেব কি কোনদিন কারও ঠেঁয়ে এক পয়সা ধার করেছে, না, কারও একমুঠো খেয়েছে। হাজার হোক একটা পিরিন্‌সিপুল আছে ত।"

সহদেব বলিত, সে কায়েতের ছেলে, কুলীন কায়স্থের সন্তান সে,—থার্ড ক্লাস অবধি পড়িয়াছে।

বস্তির সরকারী পিসে কালীচরণ, ঘরামী এবং মহাশয় ব্যক্তি, সমস্ত শাস্ত্র সে জানে, ব্যাখ্যা করিতে

পারে। রামায়ণ এবং মহাভারত ত তাহার জিহ্বাগ্রে। একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আচ্ছা দা'ঠাকুর, তুমি ত লেখাপড়া জান, শুবোত্রার অগ্নি-পরীক্ষের পর রামায়ণে কি হ'ল বল দিকিনি।"

আমি জবাব দিতে পারি নাই, সেই হইতেই আমার বিদ্যাবুদ্ধির সত্যতা সম্বন্ধে কালীচরণের একটা সন্দেহ জন্মিয়া গেছে।

কালীচরণ কহিল, "তা সেকথা সত্যি দা'ঠাকুর, সদার আমাদের সে গুণটো আছে। দিয়ে দাও, দা'ঠাকুর, পাঁচ সের চাল, ছোঁড়া বেঁচে থাকলে তোমার পয়সা মারা যাবে না।"

সহদেবের কাছে, আমার হিসাব মতন, আঠারো টাকা সাড়ে পাঁচ আনা পাওনা হইয়াছিল। খুচরা পয়সা কয়টা ছাড়িয়া দিয়া, তাহার নামে আঠারো টাকার জন্য নালিশ করিব স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। কহিলাম, "'শালার আপিসে' ত প্রত্যেক মাসেই তোমার পাঁচ পাঁচটা টাকা ফাইন্ করে সহদেব,—তুমি তাহ'লে নগদ দাম দিয়ে চাল কিনবে কবে? পাঁচ সের চাল তোমায় এখন ধারে দিতে পারব না, বড়-জোর আধ সের পর্য্যন্ত পারি, যদি রাজী হও ত নিয়ে যাও। তবে পয়সাটা দয়া করে একটু শীগগির দিও।"

সহদেবের বহির্গমনোদ্যত চোখ দুইটা আর কোটরের ভিতর থাকিতে চাহিল না। স্বাভাবিক তিনটার স্থানে দুইপাটির বত্রিশটা হলুদ রংয়ের দাঁতই কালো মোটা ঠোঁট দুইটা অতিক্রম করিয়া যেন আমাকে আক্রমণ করিতে আসিল। সে কহিল, "ওঃ কি মস্ত বড় বাবু রে! একটা ভদ্দোর সন্তানকে পাঁচ সের চাল দিয়ে বিশ্বেস করতে পারেন না, উনি আবার অন্নপূন্নো!—আচ্ছা, দাও দাও, আধ সেরই দাও, আমিও দেখে নেব তোমার দোকান এখানে কদ্দিন থাকে,– হ্যাঁ বাবাঃ, সহদেব সে ছেলেই নয়—"

সহদেব আমায় প্রায়ই ভয় দেখাইত, সে দেখিয়া লইবে আমি কেমন করিয়া এ পাড়ায় থাকি। তাহার এবং আরও অনেকের আস্ফালন-সত্ত্বেও এখানে টিঁকিয়া আছি আজ পাঁচ বৎসর।

চাল ওজন করিয়া দিয়া বলিলাম, "আধ সের চালের দাম আট পয়সা, সহদেব। দশ টাকা হিসাবে মণ দিতে হবে, দাম বেড়ে গিয়েছে।" "আচ্ছা, দাও দাও,—এ মাসের মাইনে পেলে কোন্ শালা আর তোমার পয়সা ফেলে রাখে!" বলিয়া সে চলিয়া গেল। এই চালই সে অন্যত্র ছয় টাকায় পাইতে পারিত। আমি ধরিলাম চার টাকা বেশী, এক টাকা তাহার রক্তচক্ষুর খেসারত, এক টাকা তাহার ধারের সুদ, দুই টাকা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মূল্য। এই রেটেই সকলের কাছ হইতে লইয়া থাকি; যদিও অপরের বেলায় রক্তচক্ষুটা বাদ যায়। এম্-এ পাশের খরচ উঠিয়া গেলে সকল জিনিষের দর সুবিধা করিয়া দিব, নগদ পয়সায় লইলে আরও কিছু সস্তায় পাইবে।

বেলা বাড়িতে লাগিল। রাজমিস্ত্রী, ছুতোর মিস্ত্রী, গাড়োয়ান, মোটরগাড়ীর ড্রাইভার, ঘরামী, ডাকের কুলী, মজুর, মেছুনী, ঝি, ভিখারী প্রত্যেকেই আপন আপন কাজে বাহির হইয়া গেল। কিছু দূরের ডাক্তারবাড়ীর মহীনবাবুর ছেলে কুমার আসিয়া বলিল, "প্রসাদবাবু, বাবা বল্লেন যে, আমাদের একটা চাকর কাল পালিয়ে গিয়েছে কি না, একটা ঠিকে ঝি যদি আপনি জোগাড় করে দিতে পারেন, তাহ'লে খুব ভাল হয়।" জবাব দিলাম, "আচ্ছা—"

এলোকেশীকে ঝির সর্দ্দারণী বলিয়াই জানি। সকালবেলা কল্‌তলায় স্নান করিতে আসিয়া একবার দোকানের ঝাঁপটার কাছে দাঁড়ায়, চট্ করিয়া নারিকেল তেলের কলসীর ভিতর হইতে পলাটা আচম্‌কা তুলিয়া লইয়া, বাঁ হাতের চেটোয় তেল ঢালিয়া লয়। মাথার মাঝখানটায় একটা প্রকাণ্ড টাক পড়িয়া গিয়াছে, ঠিক সেইখানে সমস্তটা তেল ঢালিয়া দিয়া, মাথাটা অদ্ভুতভাবে চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে বলে, "শরীলটা বড়ই কাহিল হ'য়ে পড়েছে, দা' ঠাকুর।"

আড়চোখে তাহার তেল লওয়ার বহর দেখি, চালের দাম ধরি, ছয় টাকার জায়গায় এগারো টাকা, সরিষার তেলের দাম ধরি সাড়ে ন' আনার জায়গায় বারো আনা।

দুই পয়সা দামের লাল, নীল, গোলাপী, সবুজ গায়ে মাখিবার সাবানের দাম ধরি চার পয়সা করিয়া—এই প্রকারেই বাঁচিয়া আছি।

সন্ধ্যাবেলায় 'অন্নপূর্ণা ষ্টোর্স'-এর পিছনের খোলার ঘরে কালীচরণের শাস্ত্রচর্চ্চার বৈঠক বসে, সঙ্গে সঙ্গে চলে সঙ্গীত। এলোকেশীকে সেখানে বসিয়া অত্যন্ত গম্ভীর মুখে মনু, পরাশরের শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে শুনি প্রায় প্রত্যহ। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, "এলোকেশী, আমাকে একটি ঠিকে ঝি জোগাড় করে দিতে পারবে, বাছা? মহীনবাবুদের দরকার, আমাকে বলেছেন।"

কথা শুনিয়া এলোকেশী চোখে কাপড় দিল, ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "যেমন বরাত করে' এইচি, দা-ঠাকুর—তোমাদের এই তুরুশ্চু কথাটিও যে রাখব, ভগবান কি সেই সুখটুকুনই আমার কপালে নিকেচেন? হারামজাদীরা কি আজকাল আর বাসন মাজতে চায় গো, দা'ঠাকুর। বললে, বলে কি জান? কালীঘাটে মা'র মন্দির আছে, সকালে বিকালে তারই দোরগোড়ায় যদি বসি, চোখ বুজে যদি বলি, দোহাই গো বাবু, দোহাই গো মা, এই গরীব, অন্ধ, অনাথাকে একটি পয়সা দিয়ে যাও গো দয়া করে, এক গুণ দিলে সহস্র গুণ হ'বে, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবে,—তাহ'লে দু বেলায় কিছু না হলেও একটা টাকা ভিক্ষে মেলে,—গতর খাটাতে যা'ব কোন্ দুঃখে!" বলিতে বলিতে এলোকেশী কাঁদিয়া ফেলিল আর কি।

অনেক কষ্টে তাহাকে থামাইলাম, বলিলাম, "তারা যদি না কাজ করে, তবে তুমি আর কি করবে বাছা! তোমার আর দোষ কি? তুমি নিজের কাজে যাও এলোকেশী, আমি মহীনবাবুদের বলব'খন যে, ঝি পাওয়া গেল না।" কিন্তু, আমার এই তুরুশ্চু কথাটা পর্য্যন্ত না রাখিতে পারিয়া, সে আবার চোখে আঁচল দিয়া, অতীত কালের সমস্ত ঝি এবং বর্ত্তমান কালের ভিখারিণীদের উদ্দেশে অযথা বহু কটুকাটব্য করিয়া অতিশয় ধীর পাদবিক্ষেপে প্রস্থান করিল।

যথেষ্ট চেষ্টা করিলাম কয়েক দিন ধরিয়া তিন

বেশ মোটা মাহিনা কবুল করিয়াও একটা ঝি জুটাইতে পারিলাম না।

দোকানের সম্মুখের নর্দ্দমাটার বিষাক্ত দূষিত বাতাস সমস্ত পল্লীটাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। নিঃশ্বাস টানিতে ভয় হয়, মনে হয় যেন কখন কি অঘটন ঘটিয়া বসিবে। ইহারই মধ্যে দুইটা পয়সা সঞ্চয় করিবার আশায় চোখ কান বুজিয়া অগ্রসর হইয়াছি।

সন্ধ্যাবেলা, ধুনা দেওয়া হইয়া গিয়াছে। একটা কেরোসিনের আলো মাচার সহিত ঝুলাইয়া দিয়াছি। তাহারই নীচে একটা পাঁচসিকা দামের চৌকির উপরে বসিয়া স্পেনসারের "ফেয়ারি কুইন" খুলিয়া বসিয়া মনে মনে হাসিতেছি।

সহদেব আসিয়া ঘরে ঢুকিল। গায়ে তাহার ছেঁড়া জামা, চোখ দুইটা আরও ভয়ানক বলিয়া মনে হইতেছিল, ঠোঁটের কোণ দুইটা দিয়া পানের কস্ গড়াইয়া পড়িতেছিল, হল্‌দে রংয়ের দাঁতগুলাতে লালের ছোপ লাগিয়া একটা অসহ্য কদর্য্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সমস্ত মুখখানার দিকে যেন তাকাইতে পারা গেল না। মাথার চুলগুলা উস্কখুস্ক, জুতাটার পিছনের চাম্‌ড়াটা হিল হইতে একেবারে আল্‌গা হইয়া গিয়াছিল, পা-টাকে ছেঁচ্‌ড়াইয়া ছেঁচড়াইয়া সেটাকে বহন করিতে হয়।

সহদেব আমার অত্যন্ত কাছ ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিল। ভারি আত্মীয়ের মতন কানের গোড়ায় মুখ আনিয়া বলিল, "বড় মজা দা'ঠাকুর—তুমি যদি দেখতে—মাইরি বল্‌ছি, এমন খাসা লাগ্‌ল,—কচি গলা, গাড়ীটাতে টেরও পেলুম্‌নি কোনও কিছুর ওপর দিয়ে যাচ্ছি, বেশ হয়েছে, শালার ছোঁড়ারা যেমন বদ্‌মাস। রোজ বারণ করি, বলি, 'বাচাধন যে দিন ধরতে পারব, সে দিন মজাটা টের পাইয়ে দেব।' এখন - লাও ঠ্যালা।"

অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া নহে, তাহার কথা শুনিয়া বিস্ময় লাগিল।

একটা অতিশয় কালো রুমাল পকেট হইতে বাহির করিয়া

"এক শালার বাবু ধরে ফেলেছিল আর একটুকুন হ'লে দা'ঠাকুর, আরে কলকেতায় আছি আজ বিশ বচ্ছর—সহদেব কি তেম্‌নি কাঁচা ছেলে!" বলিয়া সে হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

রুমালটা পকেটে রাখিয়া দিয়া আবার বলিল, "পাঁচ সাত শালা তেড়ে এস, দিলে হারামজাদা ব্যাটারা জামাটা ছিঁড়ে, এই দেখ না দা'ঠাকুর—" বলিয়া, জামার ছিন্ন স্থানগুলি সে অত্যন্ত কাতর মুখ করিয়া দেখাইল।

"তার পর এ-গলি, সে-গলি,—লে শালারা এখন কি কর্‌বি কর।" সহদেব অত্যন্ত হাসিতে আরম্ভ করিল, সে হাসি আর থামিতে চায় না।

থক্ করিয়া এক ড্যালা থুথু ঠোঁট ডিঙ্গাইয়া চিবুকের উপর গড়াইয়া আসিল,—ডান হাতের জামার আস্তিনটা দিয়া সেটা মুছিয়া ফেলিয়া সহদেব বলিল, "দাও দিকিনি, দা'ঠাকুর, নারকোল দড়িটে এগিয়ে, একবার বিড়িটে ধরাই।"

তাহার কথা কিছু বুঝি নাই;—এতক্ষণ পরে প্রথম জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু সহদেব, ব্যাপারখানা কি বল দিকিনি পরিষ্কার করে?"

একটা প্রচণ্ড টানে বিড়ির মাথার আগুনটাকে তলায় নামাইয়া আনিয়া, কণ্ঠস্বর করুণ করিয়া সহদেব বলিল, "আর থাকব না এ শালার দেশে, দা'ঠাকুর,—এখানে ভাল মানুষের কদর নেই,—সন্ন্যাসী হ'ব। সাইরি বল্‌ছি, দা'ঠাকুর, আজই রাত্তির বেলা এখান থেকে চলে যাব, বিবাগী হ'ব। ওই যে গো তোমার অহীনবাবু না ফহীন্‌বাবু, তারই এগারো বারো বচ্ছরের ছেলেটা, রোজ ফাঁকি দিয়ে গাড়ী চড়ে ইস্কুলে যায় আসে। দল আছে আবার ওদের। যখন টিকিট্ কাট্‌তে যাই, অম্‌নি কোত্থেকে এসে উঠে পড়ে, টিকিট কাটা রেখে তেড়ে এলেই ঝুপ করে নেমে যায়। রোজ বলি, 'যেদিন ধর্‌তে পারবো, সেদিন ফাঁদ দেখিয়ে ছাড়ব।' তা ব্যাটাদের ধর্‌তে গেলে চট্‌পট্ সরে পড়ে। কিন্তু কতদিন আর ফাঁকি দেবে? আজ ধরলুম ওই তোমার অহীনবাবুর ছেলেকে, বাকী সব ক'টা পালাল। বল্‌লুম, 'বাছাধন, এবার কি হয়?' ছোঁড়াটা চোখ রাঙিয়ে বল্‌ল, 'ভালো চাও ত ছেড়ে দাও বল্‌ছি।' আরে, মুনিবের নিমক খাই, রোজ রোজ চালাকী! কিন্তু এত করি শালা মুনিবের জন্যে, তবু বলে, তোমাকে দিয়ে কাজ হ'বে না, দূর করে দেব একদিন। আর ছোঁড়াটা কি বদ্‌মাইস্ দেখ দা'-ঠাকুর! একফোঁটা বিষ নেই, কুলোপানা চক্কর! গাড়ী ছাড়্‌ল ফুল ইস্পিডে, শালার ছেলেকে বল্‌লুম, 'এইবার ঠ্যালাখানা বোঝ্'—আস্তে আস্তে ধরে মারলুম জোর করে এক ধাক্কা,—পড়ল চাকার তলায়। রাস্তা গেল লালে লাল হয়ে—হুররে—রে—। দাও দিকিনি, দা'ঠাকুর, একটা কাঁচি সিগ্‌রেট, একটু মুখ বদ্‌লাই।"

বাহিরের আকাশ বৈশাখের শুক্‌না মেঘে কালোয় কাল হইয়া গেছে। ঝড়ের সম্মুখের পাতাগুলা উড়িয়া আসে হা হা করিয়া, ধূলার কণাগুলা চোখে মুখে আসিয়া লাগে, যেন কাহাকেও ক্ষমা করিবে না।

সহদেব সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল। বলিল, "আজই যাচ্ছি, দা'ঠাকুর, ছিচরণে কত অপরাধ করে গেনু, কিছু যেন মনে কোরোনি।" সেই ছেলেটির কথা মনে পড়িল, অহরহ কত ছুটাছুটি করিতে দেখিয়াছি কাছাকাছি রাস্তা দিয়া, সারাদিনের মধ্যে কত অসংখ্যবারই না তার উল্লাসচঞ্চল খেলাধূলা চোখে পড়িয়াছে, উজ্জ্বল, সঙ্কোচহীন, বুদ্ধিদৃপ্ত দৃষ্টি,—সপ্রতিভ হাস্যমুখর বাক্য।

ছাতাটা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া অহীনবাবুর বাড়ী গেলাম, থানায় গেলাম। ঘণ্টাখানেকের পরে দারোগা আসিল, কনেষ্টবল আসিল।

আস্তিন গুটাইয়া সহদেব বলিল, "ওই বজ্জাত বামুন শালাকে খুন করে ফাঁসী যাব।"

আকাশে আকাশে মেঘের খেলা, বিদ্যুতের খেলা, স্রেফ্ খেলা, শুধু খেলা, দুই একটা বাজ পড়ে না, ডাকেও না, আকাশ যায় পরিষ্কার হইয়া!

অন্নপূর্ণা ষ্টোর্স-এর পিছনে কালীচরণের শাস্ত্রব্যাখ্যা চলে।

বিচারের দিন, আদালতে গেলাম। বিচারকের পাশে একখানি কেদারায় বসিয়া ছিলেন সবিতা দেবী,—অহীনবাবুর স্ত্রী। বছর ত্রিশ বত্রিশ বয়স হইবে মেয়েটির। বহু চিন্তা করিয়া তাহার চোখ দুইটি কোন্ এক শিল্পী গড়িয়াছিলেন,—দুই চোখের দৃষ্টি দিয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে যেন তিনি গ্রহণ করিয়া লইতে পারেন। গভীর কালো তাঁহার দৃষ্টি, তাহার ভাবের কূল যেন পাই-পাই করিয়াও পাওয়া যায় না। সরু তুলির নিপুণ হাতের দুই টানে তাঁহার ভ্রূ দুইটি আঁকিয়া তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা বোধ হয় নিজেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু, এখন সে চোখের পানে চাহিলে ভয় হয়,—দুইটা চোখের স্থির পলকহীন দৃষ্টি সহদেবের মুখের উপরে নিবদ্ধ ছিল। সহদেবের বুকে লাগিল ভয়, লাগিল শঙ্কা। মনে হইতেছিল ইহার কাছ হইতে লেশমাত্র দয়াও মিলিবে না, ইহার নিকটে ক্ষমার প্রস্তাব বাতুলেও করিতে পারে কিনা সন্দেহ, সহদেব মাথা নীচু করিল।

সবিতা দেবীর চোখের দিকে চাহিয়া আমার বিস্ময় লাগে। সমস্ত হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা তাহাদের পারে আসিয়া থমকাইয়া আছে, সামান্য একটু নাড়া পাইলেই ঝরিয়া পড়িবে। সুখের কথার নানারকম ভাষা চলে, সুবিধামতন অর্থ করিয়া লইয়া প্রয়োজন হইলে মনকে চোখ ঠারাও যে না যায় এমনও নয়। কিন্তু সবিতা দেবীর সে দৃষ্টিকে ভুল বুঝিবার উপায় ছিল না। সুখের ভাষার অপেক্ষা ঢের বেশী জোরালো ভাষায় সবিতা সহদেবকে বলিতেছিলেন, "তোমাকে নখে করিয়া সহস্র সহস্র টুকরা করিয়া যদি ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিতাম, তাহার প্রতি টুকরাটিকে যদি অনন্ত নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে হয়ত শান্তি পাইতাম। কিন্তু তাহাও কতটুকু ?—"

রায় বাহির হইল, পৃথিবীর বিচারক তাঁহার আইন-কানুন ঘাঁটিয়া এক্ষেত্রে যাহা চরম করিতে পারেন, তাহাই করিলেন,—সহদেব যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তর গেল।

অহীনবাবু সবিতা দেবীকে লইয়া আদালতের বাহিরে আসিলেন, আমার পায়ের উপরে মাথা লুটাইয়া সবিতা পড়িয়া রহিল।

অন্তরে—

সবিতা তাহার ছেলের জামা, কাপড়, শার্ট, প্যাণ্টালুন জুতা, মোজা ইত্যাদি জড় করিয়া লইল। বই, খাতা, পেনসিল, দোয়াত, কলম সব এক জায়গায় গুছাইয়া রাখিল, কুমারের ছোট্ট লাইব্রেরীর সমস্ত বইগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিল, আলমারীগুলার ধূলা সাফ্ করিয়া, কাচ পরিষ্কার করিয়া ঝক্‌ঝকে করিয়া তুলিল। ছেলের জামা কাপড়, ছেলের বই খাতা প্রভৃতি লইয়া মাথায়, মুখে, বুকে, হাতে স্পর্শ করাইয়া সবিতা ধীরে ধীরে ডাকে, "কুমার, কুমার,—খোকা, বাবা আমার মাণিক আমার, সোনা আমার—"

কুমারের খেলার জিনিষগুলা একত্র করিয়া তুলিয়া রাখিয়া সে আস্তে আস্তে বলে, "খোকা দুষ্টু, ইস্কুলের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে, লাট্টু খেলা এখন থাক—"

সবিতা নিষ্পলকনেত্রে চাহিয়া থাকে, তাহার বিশাল চোখ দুইটি শুক্‌না খটখটে হইয়া আছে, আনাচে-কানাচে কোথাও এক ফোঁটা জলের সন্ধান নাই —কুমার কোন্ ফাঁক দিয়া কেমন করিয়া পালাইবে তাহাই দেখিবার জন্য যেন সে অতিশয় ব্যস্ত। তাহার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ইলা কাঁদিয়া বলে, "কাকিমা—"। ইলার মাথার উপর নিজের ডান্ হাতখানি রাখিয়া সবিতা দিন কাটায়। একদিন আমাকে আসিয়া বলিল, "দাদা, পূজোর ছুটির সময় আমরা সবাই মধুপুর গিয়েছিলাম,—কুমার কিছুতেই গেল না, বল্‌লে সবাই ওকে বলে যে, ও নাকি মাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে না। সেইজন্যই ও এবার আমার সঙ্গে না গিয়ে, কল্‌কাতায় থেকে সকলকে দেখিয়ে দেবে যে, সে কথা সত্যি নয়। আমি কত বোঝালাম, উনি কত বললেন, কিন্তু দুষ্টু ছেলে কিছুতেই যেতে চাইলে না। শেষে ওকে মিহিরের জিম্মায় রেখে, মিহিরকে ভাল করে বলে-ক'য়ে উনি, আমি আর ইলা

ঠাকুর, চাকর, সঙ্গে নিয়ে চলে গেলাম। কিন্তু মোটে চারদিন, তার ভিতরেই আমি উঠলাম অস্থির হয়ে, খোকাও তার চিঠিতে লিখল, 'মা, তুমি কি শীগগির আসবে না?'—আমি ফিরে এলাম, খোকাও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারল্ না, আমিও না।"

সবিতা ম্লান হাসিল, সে যেন হাসি নয়, ঠোঁটের কোণে দাঁড়াইয়া, "আচ্ছা তাহ'লে চল্‌লাম" বলিবার জন্য যেন প্রস্তুত হইয়াই থাকে।

সবিতা বলিল, "খোকা আমায় চিঠি লিখেছিল, তোমায় পড়ে' শোনাব, দাদা?"

বলিলাম, "পড়—"

ব্লাউজের ভিতর হইতে সবিতা একখানা চিঠি বাহির করিয়া বলিল, "আমার কুমার, কত তার বুদ্ধি, লেখা-পড়ায় কত তার আগ্রহ, একটু দুষ্টু, একটু দুরন্ত, কিন্তু সকলের জন্যে কত তার ভালবাসা, মার জন্যে কত তার টান—"

চিঠিটা খুলিয়া ঠিক করিয়া লইয়া, সবিতা বলিল, "দাদা, তুমি পড় আমি শুনি—"

পড়িতে লাগিলাম,—শিশু হাতের গোটা গোটা অক্ষর, কিন্তু কোথাও একটা ভুল নাই। পত্রখানির ভিতর দিয়া একটি তীক্ষ্ণধী শিশুর হাস্যসমুজ্জ্বল মূর্ত্তিটি বার বার মনে পড়িয়া গেল, চারিদিক হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া সে যেন চোখের সম্মুখে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি চিঠিখানা পড়িয়া চলিলাম—

"শ্রীচরণেষু,

মা, তোমাদের পৌঁছা খবর এইমাত্র পেলাম। তুমি আমায় বলে গিয়েছিলে ত যে আমি যেন তোমার চিঠি পাওয়ামাত্রই উত্তর দিই,—সেইজন্যেই এক্ষুনি তোমার চিঠির উত্তর দিচ্ছি। নইলে খেয়ে দেয়ে তারপরে দিতাম। তুমি আরও বলেছিলে ত আমি যেন সমস্তদিনের সব কথা লিখি, একটুও যেন বাদ না দিই। তাই লিখ্‌ব। তুমি দেখো। তোমরা ত চলে' গেলে সাড়ে আটটার সময়, তারপর মিহির-দা একটি পরামাণিক ডেকে নিয়ে এসে চুল কাট্‌তে বস্‌লেন, সাড়ে ন' টার সময় চুল ছাটা শেষ হ'ল, এবার স্নানের পালা। আমি বিষ্টুদের বাড়ী গেলাম ক্যারম্ খেল্‌তে। প্রায় সাড়ে দশটার সময় ফিরে এসে দেখি মিহির-দা বৈঠকখানা ঘরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন, আর ঝি এসে রান্নাঘর ধোয়া আর উনুনের ছাই তোলা আরম্ভ করে দিয়েছে। বুঝলাম, মিহির-দা'র খাওয়া হয়ে গিয়েছে। ঝির ঘর ধোয়া শেষ হ'লে আমি হাঁড়িটা দেখতে গেলাম তার ভিতরে কি আছে। একটা থালাতে ভাত, ডাল, ডিম-ভাতে, আর আলুভাতে নিয়ে আমি খেতে বসলাম। লছমি সিং তোমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে ফিরে এল। আমি বল্‌লাম, 'লছমী সিং, তোমহারা আজ ছুট্টি, যাও—তব সাঁজকা বখৎ ফিরকে আও, হাম্ ভাসান দেখতে যায়েগা।'

লছমী বল্‌ল, 'বহুৎ আচ্ছা, খোঁকাবাবু'- বলে' চলে গেল।

আচ্ছা মা, ঠিক করে বোলো ত আমি যে হিন্দীতে লছমীর সঙ্গে কথা কইলাম, সে হিন্দীটুকু ঠিক হ'য়েছে কি না। মা তুমি যেন এ হিন্দীর কথা কাউকে বোলো না, বিশেষ করে দিদিমণির কানে যেন না যায়। সে-বার ত ও-ই শুধু শুধু আমার হিন্দী নিয়ে ঠাট্টা করেছিল, বলেছিল না, 'খোকা, তুই একটা হিন্দীতে বই লেখ্, ভাই, আমি কাকাকে বলে সেটা ছাপিয়ে দেব?'—সেইদিন থেকেই ত আমি লছমী সিং ওদের সঙ্গে পর্য্যন্ত বাংলায় কথা কই। কিন্তু সেদিন আমি কি বলেছিলাম জান, মা? লছমী সিং এসে আমায় বল্‌ল যে, বাবা ওকে শ্যামবাজার পাঠাচ্ছেন, কিন্তু ও জানে না যে, কোথায় গিয়ে ট্রামে চড়বে। দিদিমণি আর আমি তখন অঙ্ক কষ্‌ছিলাম। আমি লছমীকে বললাম, 'দ্যাখো লছমী সিং, বড় রাস্তাকা মোড়পর গিয়ে' - বলেই দেখি যে দিদিমণি আমার দিকে খুব ভালমানুষের মত তাকিয়ে যেন হাস্‌বার জন্য একেবারে রেডি হয়ে রয়েছে। আমি ঘাবড়ে গেলাম, তারপরে যা থাকে কপালে ভেবে, খুব জোরের সঙ্গেই বলে উঠলাম, 'শ্যাম-বাজারকা গাড়ী পর উঠে পড়।' অমনি দিদিমণি যেন হাসির চোটে ফেটে পড়ল, আর তারপরে যা হ'য়েছে তা ত তুমি জানই মা! দিদিমণির ক্লাশের মেয়েরা আমার হিন্দীর কথা শুনেছে, বাবার

বন্ধুরা সবাই শুনেছেন, তোমার বন্ধুরা শুনেছেন। দিদিমণি যত লোককে চেনে, সকলকে বলেছে। ভয়ানক মেয়ে মা ও! ওকে যেন তুমি কোনমতেই এবারকার হিন্দীর কথা বোলো না, তাহ'লে কল্‌কাতায় ফিরে ও আর আমায় আস্ত রাখবে না। আমি আর হিন্দী কোনদিন বল্‌তামও না ওর ভয়ে,—কিন্তু তখন দেখলাম কি, কেউ কোথাও নেই, তাই ভাব্‌লাম এই ফাঁকে যদি একটু হিন্দী শিখে ফেল্‌তে পারি তাহ'লে তোমরা ফির্‌লে পরে দিদিটাকে আচ্ছা জব্দ করা যাবে। —আচ্ছা, তুমি বল ত মা, ওই হিন্দীটুকুর ভিতর কি কোনও ভুল হ'য়েছে, বোধ হয় হয়নি, না?

কিন্তু আমার খাওয়ার কথা বল্‌তে বল্‌তে থেমে গেল্‌াম—বেশ মজা, না? আমার খাওয়া শেষ হ'ল। গয়লা দুধ নিয়ে এল, আমি কড়াটা দিলাম, গয়লা দুধ দিয়ে গেল। কিন্তু দুধ গরম কর্‌ব কি করে? উনুন ত ঝি বেশ পরিষ্কার করে রেখেছে। আমি বিষ্টুদের বাড়ী গেল্‌াম, লীলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম যে, ওদের বাড়ীর উনুনে আগুন আছে কি না। লীলা বল্‌লে যে আছে, কিন্তু এখনও রান্না শেষ হয়নি—যখন শেষ হ'বে তখন দুধ নিয়ে যাব গরম করবার জন্যে। আমি রান্নাঘরে দুধটা ঢাকা দিয়ে রেখে ঝির বাসন-মাজা শেষ হয়েছে দেখে বল্‌লাম, 'পচার মা, বাসনগুলো ওপরে দিয়ে যাও, আর রান্নাঘরের কোণে কালকের রাত্তিরের লুচি আছে নিয়ে যাও। ঝি বাসন রেখে গেল, লুচি নিয়ে গেল। মিহিরদা'র ঘুম তখনও ভাঙেনি। আমি লাইব্রেরী-ঘরে অঙ্ক কষ্‌তে বস্‌লাম। বেলা তখন বোধ হয় একটা, নীচে বৈঠকখানা-ঘর থেকে চেয়ার সরানোর যে-রকম সাড়াশব্দ উঠতে লাগল, তাতে আমার মনে হ'ল যে, মিহির-দা নিশ্চয়ই উঠেছেন। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে লীলা বল্‌লে, 'মিহিরদা, খোকা বল্‌ছিল দুধ গরম কর্‌বার কথা। আমাদের উনুন এতক্ষণে খালি হ'ল, দুধটা এনে দিন। আশ্চর্য্য হ'য়ে মিহির-দা বল্‌লেন, 'দুধ? এঁ্যা, দুধ? দুধ কি দিয়ে গিয়েছে নাকি?'

লীলা বল্‌ল, 'হ্যাঁ দিয়ে গিয়েছে ত, আপনি এনে দিন।'

মিহির-দা খুব সম্ভব রান্নাঘরে গিয়ে দুধটা এনে দিলেন। খানিক বাদে লীলা এসে আবার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে, 'মিহির-দা দুধ কেটে গেল, তা মা জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লেন, একটুখানি মিষ্টি দিয়ে এই দুধটুকু কি জ্বাল দিয়ে ঘন করে দেবেন?' উত্তর না দিয়ে মিহির-দা ডাক্‌লেন, 'খোকা, খোকা'—লাইব্রেরী থেকেই চেঁচিয়ে বললাম, 'কি?'

'শুনে যাও—'

বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হ'তেই মিহির-দা বল্‌লেন, 'ভাঁড়ার ঘরের কোথায় চিনি থাকে জান ত?'

আমি বল্‌লাম, 'আমি ঠিক জানি না ত'—তারপরে লীলাকে বল্‌লাম, 'লীলা ভাই, সইমাকে ওটা চিনি দিয়ে জ্বাল দিয়ে দিতে বলো গে'—

লীলা লাফাতে লাফাতে চলে গেল, আমিও ফিরে এসে লাইব্রেরী ঘরে বস্‌লাম।

তুমি জান মা, মিহিরদাকে আমার একটুও ভালো লাগে না। এই যে কিছু দিন আগে, দেশের থেকে বাবা গড়খালি যাচ্ছিলেন' প্রজাদের সঙ্গে কি একটা মারামারি না কি হ'য়েছে শুনে' তখন ত আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম, না? সেখানে যেতে সবাই বাবাকে বল্‌ল যে, মিহিরদা না কি শুধু শুধু সব লোকেদের ঘরদোর জ্বালিয়ে দিয়েছে, দরোয়ানদের দিয়ে তাদের ঘরদোর লুঠ করিয়েছে. তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করেও না কি মিছি-মিছি সব বলেছে যে, তারা টাকা দেয়নি। বাবা সব শুন্‌লেন, নায়েব-মশাইকে ডেকে সব জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লেন, গড়খালির মোড়ল-মশাইকে ডেকে পাঠালেন, শেষে মিহিরদা'কে খুব বকে দিলেন। কিন্তু এসব ত তুমি শুনেছই, মা। এবার তুমি যে কথা জান না, সে কথা বল্‌ব। যেদিন বাবা মিহিরদাকে বক্‌লেন, সেইদিন বিকেল বেলা বাবা গিয়েছিলেন চরণপুর, আমি ছাদের ওপর বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ ঘাটের কাছে একটা ছেলের চীৎকার শুন্‌তে পেলাম, 'ওগো বাবু গো, আর কর্‌ব না গো, মরে গেলুম গো—' আর একটা লোক বল্‌ছে, 'এবার ছেড়ে দিন বাবু, আর করবে না বাবু—।' কি হয়েছে দেখবার জন্যে আমি দৌড়তে দৌড়তে নীচে

নাম্‌লাম, তারপর তিন লাফে ঘাটের কাছে গিয়ে হাজির হ'লাম। গিয়ে দেখলাম যে, মিহির-দা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর পায়ের কাছে প'ড়ে একটা বুড়ো মুসলমান খুব কাঁদছে, আর কাশিম খাঁ খুব জোরে জোরে একটা ছেলের পিঠে জলবিছুটি লাগাচ্ছে। আমায় দেখে কাশিম একটু থাম্‌ল। আমি অবাক হ'য়ে মিহিরদাকে জিজ্ঞেস কর্‌লাম, 'কি হ'য়েছে মিহিরদা ?'

মিহির-দা কিছু বল্‌বার আগেই সেই বুড়ো মুসলমানটা একেবারে হাঁউমাউ করে উঠল, আর আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে একসঙ্গে অনেক কথা বলে ফেল্‌ল। ক্রমে ক্রমে আমি বুঝলাম যে, তার নাম আহম্মদ শেখ, তার ছেলে ঘাটের পাশের গোলাপ গাছ থেকে আজ দুপুরে দুটো গোলাপ ফুল ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছিল, সেই কথা জান্‌তে পেরে ম্যানেজার বাবু রহমান্‌কে ধরে এনে জল বিছুটি লাগাচ্ছেন। খুব রেগে গিয়ে আমি মিহিরদার দিকে তাকিয়ে বল্‌লাম, 'বেশ করেছে গোলাপ ফুল নিয়েছে, আরও নেবে, রোজ নেবে, আপনি তাতে জলবিছুটি লাগাবার কে ?' তারপরে কাশিম খাঁর হাত থেকে জলবিছুটিটা কেড়ে নিয়ে বল্‌লাম, 'ফের যদি আপনি কারও গায়ে জলবিছুটি লাগান, তাহ'লে আমি বাবাকে বলে এইটে দিয়ে পিট্‌তে পিট্‌তে আপনাকে থানায় দিয়ে আস্‌ব।' চেয়ে দেখি কাশিম আর সেই ছেলেটা, দুজনেই কখন সরে পড়েছে। মিহিরদাও কিছু না বলে চলে গেলেন,—আমার ওপর খুব রেগেছিলেন, বোধ হয়। বুড়ো কেবল তখনও ছিল আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্যে। সে যা আনন্দের চোটে করতে লাগল, মা, আমায় সমস্ত পৃথিবীটা দিতে বল্‌তে লাগল তার খোদাতালাকে, আর এমন করে বল্‌তে লাগল যে, আমি ভাবলাম লোকটা বুঝি-বা ক্ষেপেই গেল। আমি শুধু বল্‌লাম, 'আচ্ছা, হ'য়েছে—তুমি রহমান্‌কে বলো সে যেন রোজ ফুল নিয়ে যায়, ভয় খায় না যেন—'

তবু কি সে যেতে চায়। কত করে' তবে তার হাত থেকে ছাড়া পেয়েছিলাম। তুমি আমায় প্রায়ই বল না, মা,—'খোকা, দুঃখীর দুঃখ দূর করিস্, বাবা, নিজের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রেখে, যখন ব্যথিতের চোখের এক ফোঁটা জল মুছিয়ে দিবি, তখন ভগবানের দরবারে তোর নামে এমন একটা জিনিষ জমা হ'য়ে থাক্‌বে যার তুলনা এ পৃথিবীতে কোথাও মিল্‌বে না ?' তোমার মুখে কোন কথা একবার শুন্‌লেই ত সেটা আমার মুখস্থ হ'য়ে যায়। তোমার কোন কথা আমি ভুলি না ত, আর একথা ত তোমার কাছ থেকে কতবার শুনেছি। কিন্তু কিচ্ছুই বুঝিনি—ভগবানের 'দরবার' কি ? 'স্বার্থ' কাকে বলে ? কি জমা হ'বে ? কিচ্ছু বুঝি না। কিন্তু তোমার মুখে শুন্‌তে এত ভাল লাগে! আচ্ছা মা, বল ত, সেদিন কি ভগবান সুখী হয়েছিলেন ? আর ভগবান সুখী হয়েছিলেন কি না, তা আমি জান্‌তেও চাইনে,—তুমি সেদিনকার কথা শুনে খুসী হচ্ছ কি না বল ত মা-মণি !—"

সবিতা কহিল "আমি খুসী হয়েছি খোকা,—ভগবানও হয়েছেন,—সোনা আমার, মার সব কথা তোর মনে থাকে ?"

আমি চুপ্ করিয়া রহিলাম।

সবিতা বলিল, "থাম্‌লে কেন, দাদা ? পড়ো—"

আমি আবার পড়িতে লাগিলাম,—"কিন্তু আমি আবার আমার চিঠির মাঝখানে থেমে গিয়েছি,—ভারি অদ্ভুত, না ? তোমাকে এতদিন এ কথা বলিনি কেন জান ? আমার রোজ ইচ্ছে করত, তোমাকে বলি, কিন্তু ভারি লজ্জা করত, সেইজন্যই বলিনি, আজকে ত বল্‌লাম, আগে বলিনি বলে তুমি যেন দুঃখ কোরো না লক্ষ্মীটি মা,—একথা ছাড়া আর সব দিন ত সবকথা তোমাকে বলেছি। তুমি যেন রাগ কোরো না, মা-মণি।

"আমি লাইব্রেরী-ঘরে গিয়ে অঙ্ক কষতে বস্‌লাম। বেলা তখন দুটো। বিষ্টুদের বাড়ী বিষ্টুকে ডাক্‌তে গেলাম, বাইরের ঘরে দেখলাম মিহির-দা ঘুমোচ্ছেন। বেলা তখন বোধ হয় সাড়ে তিনটে। আমি বিষ্টুদের বাড়ী থেকে ফিরে এলাম, মিহির-দা তখনও ঘুমোচ্ছেন। রামায়ণের কুম্ভকর্ণ ত ছ'মাস ঘুমোত, সে ত আর এখন বেঁচে নেই, কিন্তু যদি

সে এখন থাকৃত আর তার সঙ্গে মিহিরদার ঘুমের কম্পিটিশন হত, তাহ'লে কে জিত্‌ত বল ত! আমি বল্‌ব?—মিহির-দা। আমি আবার অঙ্ক কষতে বস্‌লাম। চারটে বাজে, আমার খিদে পেয়েছে। ঝি ত আসেনি। খাবার আনবে কে? ভাবতে ভাবতেই ঝি এল। ও অনেকদিন বাঁচবে, না মা? আমি টাকা দিলাম, ও খাবার নিয়ে এল। কিছু ভেবো না, মা, মুখুয্যেদের দোকান থেকেই এনেছে। আমার খাওয়া শেষ হ'ল। জলের গ্লাস নিয়ে এসে ঝি জিজ্ঞেস্ করলে, 'খোকাবাবু, দুধ ত ছানা হয়ে রয়েছে, কিন্তু ওটাকে চিনি দিয়ে ঘন করলে কে?'

আমি বল্‌লাম, 'সইমা।'

বুঝলাম যে লীলা ওটা একসময় দিয়ে গিয়েছে। বিষ্টুকে জিজ্ঞেস করতে গেলাম যে, ওরা কখন ভাসান দেখতে যাবে। মিহির-দা ঘুমোচ্ছেন। বেলা সাড়ে পাঁচটা,বাড়ী ফিরে এলাম, মিহির-দা খবরের কাগজ পড়ছেন। লছমী সিং এখনও ফেরেনি। সন্ধ্যে ছ'টা, মিহির-দা ভাসান দেখতে বার হলেন। একটু পরেই বিষ্টু, লীলা, খুকু, বিশু, রুচি ওরা সব হুড়্মুড়্ করে লাইব্রেরী-ঘরে এসে ঢুক্‌ল, সব কটাতেই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল, 'খোকা, শীগ্‌গির কর, বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমরা ভাসান দেখতে যাব।'

আমি দেখলাম, লছমী সিংয়ের জন্যে বসে থাকলে চল্‌বে না। চট্‌পট্ করে কাপড়, জামা, জুতো পরে বিষ্টুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরোলাম, গেটে তিনটে তালা দিয়ে। বেরোবার আগে একবার বৈঠকখানা-ঘরটার ভিতরে ঢুকতেই দেখতে পেলাম, একটা কাচের গ্লাসে আধ গ্লাস জল, সেটা মেঝেতে পড়ে রয়েছে,—মিহির-দা জল খেয়ে রেখে গিয়েছেন বোধ হয়। তক্তপোষগুলোর ওপর আর মেঝের উপর কতকগুলো বাংলা খবরের কাগজ ছড়ান। ঘরের কোণে সেই যে মান্ধাতার আমলের টেবিলটা আছে, তার ওপরে পাতা খবরের কাগজগুলোতে অনেক পান আর চূনের দাগ। বাংলা খবরের কাগজগুলো 'হোয়াট-নট'টার নীচের তাকটা থেকে 'পড়ি-পড়ি' করছে। কতকগুলো জুতোর পাটি ঘরময় ছড়ান। মিহিরদা'র বড্ড দামী ভাঙা আয়নাটার খোঁজ নেই, বোধ হয় তক্তপোষের তলায় পড়ে গিয়েছিল। কৌচটার ওপর কতকগুলো মোজা গেঞ্জির খালি বাক্স ছড়ান। মিহির-দা কিন্তু একটু অপরিষ্কার আছেন, না মা? আমরা ভাসান্ দেখতে গেলাম। যখন বাড়ী ফিরে এলাম, তখন সাড়ে আটটা হ'বে। দরজার তালা সবেমাত্র খুলেছি, এমন সময় মিহিরদা' এসে বল্‌লেন, 'খোকা, তুমি এই আসছ? আমি অনেকক্ষণ এসেছি, দরজায় তালা দিয়ে গিয়েছিলে, তাই ধীরেশবাবুদের বৈঠকখানায় ব'সে গল্প কর্‌ছিলাম।' কাপড় জামা ছেড়েই তাড়াতাড়ি সইমাকে বিজয়ার প্রণাম করতে ছুটলাম। খানিকক্ষণ ছুটোপাটি কর্‌লাম। বাড়ী ফিরে এসে শুন্‌লাম যে, পিসিমা খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন। আবার একটু খাবার খেলাম। তারপরে এই ভেবে রান্নাঘরে ঢুকলাম যে, জাল দেওয়া দুধটুকু খাব। কিন্তু দেখলাম যে কড়াইটা বেশ পরিষ্কার, আর তার ভিতর জল ঢালা রয়েছে। মিহিরদা' খেয়ে গেছেন নিশ্চয়! আমার বেশ হাসি পেল। মিহির-দা কিন্তু বেশ লোভী আছেন, না? 'লছ্‌মী সিং বাইরে থেকে ডাক দিল, 'খোঁকাবাবু—'

আমি বারান্দায় বেরিয়ে হিন্দীতে বল্‌লাম,'লছ্‌মী সিং, তোমায় না আমি সন্ধ্যের আগে ফিরতে বলেছিলাম।' লছ্‌মী সিং অনেক কাকুতি মিনতি করে বল্‌তে লাগ্‌ল যে অনেকদিন পরে তার কোন্ এক 'দেশকা আদ্‌মী'র সঙ্গে না কি দেখা, সে কিছুতেই ছাড়তে চায় না, তাই দেরী হ'য়ে গিয়েছে। তার অন্যায় হয়েছে, এমন আর কোন দিন হবে না, এইবারটা খোকাবাবু তাকে মাফ করুন। লছমী সিং চলে গেল। আমি হাত পা ধুয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বিজয়ার দিন সকালবেলা ত তোমরা গিয়েছ, এই ত সেদিনকার সমস্ত খবর। তুমি আমায় বলেছিলে ত সমস্ত দিনের সব কথা লিখতে। ঠিক তাই লিখেছি। কিচ্ছুটি যে বাদ দিয়েছি সে কথা আর কাউকে বল্‌তে হয় না। কিন্তু চিঠিটা কত বড় হ'য়েছে দেখেছ, মা? —তোমরা কেমন আছ? আমি ভাল আছি। তুমি

আনমনা

শ্রীকিরণময় ধর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আমার বিজয়ার প্রণাম, ভালবাসা, ভক্তি সব নিও। বাবাকে আমার বিজয়ার প্রণাম দিও। দিদিমণিটাকে দেবে? আচ্ছা দিও। দিদিমণির কাছে যে চিঠিটা লিখলাম, সেটা ওকে দিও। ঠাকুর, ঝড়ুয়া, কেষ্টা, ওদের সবাইকে বলো যে, খোকাবাবু বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়েছে। চিঠি পাওয়ামাত্র উত্তর দিও।

মা, আমার বড্ড মধুপুর দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমি ত দু'তিনবার মধুপুর গিয়েছি, কিন্তু তবুও আমার এবারও যেতে ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার জন্যে মন কেমন কর্‌ছে বলে যেতে চাইছি না, আমি এখানে থাকতে পারি, তোমার জন্যে কষ্ট হচ্ছে, তবু আমি থাকতে পারি। তুমি যদি মধুপুরে যেতে বল তবে আমি যাব মিহিরদার সঙ্গে। একথা কিন্তু আর কাউকে বোলো না যেন।

—তোমার খোকা

পুঃ—আচ্ছা মা, তোমরা যদি এখন ফিরে আস, তাহ'লে ত এর পরে বড়দিনের ছুটির সময় আমরা সবাই মধুপুর যেতে পারি,—আমিও সুদ্ধ। বড়দিনের সময় যদি আবার যাওয়া হয় তা'হলে মিছিমিছি ওখানে এখন বেশীদিন থেকে আর কি হবে? তোমরা কালই চলে আসতে পার্‌বে না?—তোমার খোকা।

পুঃ—মা তুমি শীগগির আসবে না? খোকা"

পত্র পড়া শেষ করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, আমার কিছু বলিবার ছিল না। কোন কথা না বলিয়া সবিতা আমার হাত হইতে চিঠিখানা গ্রহণ করিয়া সযত্নে ভাঁজ করিতে করিতে উঠিয়া গেল।

আমার মনে হয়, কুমার যেন অকস্মাৎ সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিবে, লঘুচরণে আসিয়া সবিতাকে বলিবে, "মা, তোমায় ছেড়ে আমি থাক্‌তে পারি,—বড় হয়েছি কি না, সেইজন্যে—তোমার জন্যে মন কেমন করে, তবু আমি থাক্‌তে পারি। আমি এসেছি, তোমার জন্যে বড্ড কষ্ট হয়, কিন্তু সেজন্যে আসিনি,—এই এলুম, এম্‌নি…"

কুমার চলিয়া গেল,—সহদেবের দ্বীপান্তরবাসের সঙ্গে সঙ্গেই সবিতার বাহিরের দুঃখও যেন আর তিল মাত্র অবশিষ্ট রহিল না। তাহার অন্তরের মন্দিরে আজ শিশুদেবতার পূজা চলে। উপকরণ সব কুমার নিজেই রাখিয়া গিয়াছে,—তাহার জুতা, মোজা, তাহার খাতা, বই, দোয়াত কলম, তাহার চিঠি, তাহার মাতৃস্নেহ লোভাতুর মন, তাহার সব-ভুলান "মা" ডাক। আয়োজনের ত্রুটি নাই, নিষ্ঠারও অভাব হয় না। কিন্তু সবিতার চোখে রাস্তার পাশে পাশে কুমারের রক্ত দেখা যায়। বোন আমার শান্তি পায় না।

সেই আগেকার মতন দিন কাটিয়া যায়, পুরাপুরি চব্বিশ ঘণ্টাই লাগে, না কম, না বেশী। কিন্তু আমি সবিতার দাদার স্থান জুড়িয়া থাকি।

আমার কাঠখোট্টা চোখে জল আসে। ছোট ছেলেটি, হাসিমুখে আসিত, বলিত, "পাঁচ পোয়া আলু চাই।" দাম ধরিতাম, আমার কেনা দামের অপেক্ষাও কম। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীর দাম, আমার লোকসানের দাম তাহার হাসির মূল্যে শোধ পাইয়াছি।

লবণ-রহস্য

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সাহা, এম্-এস্-সি

দীনতম ভিখারীর পর্ণকুটীর হইতে অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই যেমন লবণের সমান ব্যবহার ও সমান আদর, তেমনি এই বিরাট বিশ্বের রন্ধ্র অনুরন্ধ্র প্রায় সকল স্থানেই লবণের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যাবতীয় পাহাড়, পর্ব্বত, নদ, নদী, হ্রদ ও ঝরণা, সাগর ও মহাসাগর সর্ব্বত্রই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে ন্যূনাধিক পরিমাণে লবণ বিরাজিত। অতি প্রাচীনকালেও লোকে লবণাম্বুরাশি সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিয়া লবণ সংগ্রহ করিত। অধিক লবণাক্ত বলিয়া নদনদীর জলের তুলনায় সমুদ্র-জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) অধিক। এইজন্য মালপূর্ণ জাহাজ সমুদ্র হইতে নদীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে উহার ভার লাঘব করা হয়, নতুবা ডুবিয়া যাইবার বিশেষ ভয় থাকে।

কিন্তু লবণ কোথা হইতে কি প্রকারে আসিল? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে পৃথিবীর শৈশব-ইতিহাসের আলোচনা করা আবশ্যক। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, আমাদের এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পৃথিবী সৃষ্টির প্রারম্ভে রক্ত-তপ্ত গলিত গোলাকার বিরাট বস্তু-পিণ্ড মাত্র ছিল। সপ্তসমুদ্রের যত জল সেদিনে পুঞ্জীভূত তপ্ত ঘন বাষ্পাকারে এই পিণ্ডকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ছিল।

ধরা ক্রমেই শীতল হইতে লাগিল এবং উহার বুকে ঐ মেঘ হইতে পতিত জলের সঞ্চার আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য, এই জল বিশুদ্ধ ও পরিস্রুত ছিল। বস্তুতঃ, অনেক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুমান করেন যে, সেই সুপ্রাচীন যুগের সাগর-সলিল নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ ছিল এবং ক্রমশঃ লবণ-দুষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন যে, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই পৃথিবীর স্তরে স্তরে লবণ রহিয়াছে। বৃষ্টির জলে তাহা ধৌত হইয়া ক্রমশঃ সাগরে আসিয়া সঞ্চিত পরিণত হইয়া আকাশে উঠিয়া মেঘের আকার ধারণ করিতেছে। এই মেঘ বায়ু-ভরে পাহাড়-পর্ব্বতে গিয়া তথাকার শীতল বায়ুসংস্পর্শে আসিয়া পৃথিবীতে বারিপাত করিতেছে। এই জল পুনরায় লবণাক্ত হইয়া নদনদীপথে সাগরে গিয়া মিশিতেছে। এই চক্রবৎ পরিবর্ত্তন সৃষ্টির আদি হইতে অবিরাম চলিয়া আসিতেছে ও অনাগত অনন্ত ভাবী কালেও চলিবে। অথচ প্রতিবারেই লবণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে এবং প্রতি জলধারাই সাগরের বুকে কিছু-না-কিছু লবণ বহিয়া আনে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রতি কয়েক হাজার বৎসরে সপ্তসমুদ্রের সমস্ত সলিল একবার বাষ্পাকারে উড়িয়া বৃষ্টি হইয়া পুনরায় সাগরে ফিরিয়া আসে।

যুগযুগান্তব্যাপী এই অপচয় সত্ত্বেও পাহাড় পর্ব্বত খনি গহ্বর প্রভৃতিতে এখনও এত লবণ আছে যে, আরও কোটি বৎসরেও তাহা নিঃশেষ হইবে না। কিন্তু এখনও সাগর-সলিল 'পূর্ণ লবণাক্ত' (saturated with salt) হয় নাই। কিন্তু অবশেষে এমন একদিন আসিবে যখন মহাসাগরের লবণ-তৃষ্ণার বিরাম হইবে—সামান্য পরিমাণ লবণও আর সে জলে দ্রবীভূত হইবে না। ফলে এই হইবে যে, সাগরের তলদেশে ও তীরভূমিতে স্তরে স্তরে দানাদার লবণ সঞ্চিত হইতে থাকিবে। জল এত গাঢ় হইবে যে, তাহাতে মৎস্য, কূর্ম্ম, কচ্ছপ, তিমি প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণীর পক্ষে নিমজ্জিত হইয়া বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। তাহারা জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইবে ও অকাতরে মানুষের হাতে প্রাণবিসর্জ্জন করিবে। ঝড় বৃষ্টিতে জাহাজ ডুবিলেও সে জলে মানুষ ডুবিয়া মরিবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য হইবে এই যে, তখন হইতে ক্রমে নদনদী, খালবিল প্রভৃতির জলও লবণাক্ত হইতে থাকিবে ও আজিকার সাগরজলের ন্যায় তাহাও মানুষের পক্ষে

অনেকেই হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, সমুদ্রের লবণ দ্বারা পৃথিবীর বয়স নির্দ্ধারণ করা যায়। অধ্যাপক যলী (Joly) অতি সহজ উপায়ে তাহা সম্পাদন করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাগরের জন্মের সময় উহার জল বিশুদ্ধ ছিল এবং বৃষ্টির জলে পাহাড় পর্ব্বতের লবণ ধৌত হইয়া নদীপথে সাগরে গিয়া পড়িয়া উহার জল ক্রমশঃ লবণাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। অধ্যাপক জলী প্রথমতঃ রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত মহাসাগরের জলে কি পরিমাণ লবণ এখন আছে এবং বৎসরে প্রধান প্রধান নদনদীর জলের সঙ্গে কি পরিমাণ লবণ সাগরে গিয়া সঞ্চিত হয় তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার গণনা মতে পৃথিবীর বয়স ১০কোটি হইতে ২০কোটি বৎসর বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সাগরের জলে লবণের পরিমাণ শতকরা তিন ভাগের চেয়ে কিছু কম। যদি এই জল পূর্ণভাবে লবণাক্ত হইত তাহা হইলে উহাতে শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ লবণ থাকিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এখনও পৃথিবীর শৈশবকাল। পূর্ণভাবে লবণাক্ত হইতে পৃথিবীর এখনও ন্যূনাধিক দুই তিনশত কোটি বৎসর লাগিবে।

একশত ভাগ সাগরজলে প্রায় তিন ভাগ লবণ আছে। পৃথিবীর প্রায় চারিভাগের তিনভাগ সমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্রের বিস্তৃতি মোটামুটি প্রায় ১৪½ কোটি বর্গমাইল। গড়ে সমুদ্রের গভীরতা প্রায় পৌনে তিন মাইল। সুতরাং সাগরপৃষ্ঠের প্রতি বর্গমাইল জলের নীচে প্রায় তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টন লবণ গলিত অবস্থায় আছে। এই হিসাবে সমগ্র সমুদ্রজলে লবণের পরিমাণ হয় ৪৫,৪০০,০০০,০০০,০০০,০০০ অর্থাৎ চারিশত চুয়ান্ন কোটি কোটি টন। সমস্ত ইউরোপের উপর এই পরিমাণ লবণ সমভাবে স্তূপীকৃত করিলে সেই স্তূপের উচ্চতা হইবে চারি পাঁচ মাইল। ইহা কি কম বিস্ময়ের কথা!

অবশ্য সকল সমুদ্রের জলই সমান লবণাক্ত নহে। মরু-সাগরের (Dead Sea) জলে শতকরা সাড়ে পঁচিশ ভাগ লবণ। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ইউটার (Utah) লবণ-হ্রদও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই হ্রদটি দৈর্ঘ্যে ৭৫ মাইল ও প্রস্থে ৫০ মাইল। সুতরাং ইহাকে সাগর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই হ্রদে মানুষ ডুবে না বরং অতি স্বচ্ছন্দে জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে পারে। এই শ্রেণীর হ্রদ সূর্য্যতাপের প্রভাবে শুষ্ক হইয়া গেলে প্রভূত পরিমাণে লবণ তলদেশে পড়িয়া থাকে। কালের প্রভাবে এই লবণস্তরের উপর মাটি চাপা পড়িয়া খনির সৃষ্টি হয়। আজকাল যে-সকল লবণের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের উৎপত্তিও বোধ হয় এই রূপেই হইয়াছে।

পৃথিবীর কোন্ কোন অংশে যে-সকল বিরাট সৈন্ধব বা সিন্ধু লবণের জমাট খনি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অতীব বিস্ময়কর। জার্ম্মেনীর ষ্টাস্‌ফুর্ট নামক স্থানে লবণের যে স্তর আছে, তাহা কোন কোন স্থানে অর্দ্ধ হইতে এক মাইল পুরু। অষ্ট্রিয়ার ভিলিৎস্কাতে যে লবণ স্তর আছে তাহা দৈর্ঘ্যে ৫০০ মাইল, প্রস্থে ২০ মাইল এবং গভীরতায় গড়ে ১,২০০ ফুট হইলেও, অনেক স্থলে তাহা ৪,৬০০ ফুটেরও অধিক। এখানকার লবণের খনিগুলি সম্ভবত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক। এখানে জমাট লবণ কাটিয়া সুরঙ্গ করিয়া সেই পথে ভিতরে যাতায়াতের সুবিধা করা হইয়াছে। খনির অভ্যন্তরে শুভ্র ঝলমলে চক্‌চকে লবণ-স্তর খুদিয়া অসংখ্য গহ্বরের সৃষ্টি করা হইয়াছে। মাঝে মাঝে বহু উজ্জ্বল উন্নত স্তম্ভরাজি সেই সকল গহ্বরের ছাদে সংযুক্ত হইয়া যে অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। এই খনিগর্ভে প্রায় ৩০ মাইল পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া এইরূপ শতাধিক কক্ষ এক বিরাট গোলকধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছে। পাতালের এই লবণপুরী ৫ হইতে ৭ তালা বিশিষ্ট। প্রত্যেক তালাতেই অসংখ্য খিলানযুক্ত প্রকোষ্ঠ আছে। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ও একতালা হইতে অন্য তালায় যাইবার জন্য লবণের সিঁড়ি রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে। সেই পাতালপুরীতে লবণ খুদিয়া একটি বিশাল খৃষ্টীয় ভজনালয় প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই গির্জ্জার বেদী, আসন, আসবাব, দরজা, মহাপুরুষেদের মূর্ত্তি প্রভৃতি যাবতীয় জিনিষ লবণেই প্রস্তুত। ইহার নাম সেণ্ট এণ্টনীর গির্জ্জা। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়।

এই লবণপুরীর নৃত্যশালাটি আরও আশ্চর্য্যজনক। নৃত্যকালে স্ফটিকের দেওয়াল হইতে আলো এরূপ ভাবে প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হয় যে, সহসা মনে হয় বুঝি এই নাট্যমন্দিরের সর্ব্ব অঙ্গ লক্ষ লক্ষ হীরা-মুক্তা মণিমাণিক্যে গঠিত। বুঝি বা ধরণীর সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী অধীশ্বরেরও এমন উজ্জল নৃত্যশালা নাই ক্ষণিকের তরে উর্ব্বশীর চারুচরণের নূপুরনিক্কণ-মুখরিত দেবরাজ ইন্দ্রের সভার কল্পনা মনকে মুগ্ধ অভিভূত করে।

কোন কোন প্রকোষ্ঠে লবণস্তর কাটিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্ফটিক ঝাড় প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইয়াছে। একটি প্রকোষ্ঠে ৩৫ ফুট লম্বা ও ৬০ ফুট ব্যাসের একটি ঝাড় আছে। এই সকল ঝাড় যখন উজ্জল আলোকে উদ্ভাসিত হয় তখন তাহার সৌন্দর্য্য-মহিমা বর্ণনাতীত।

এই লবণপুরীতে হ্রদ সরোবর প্রভৃতিও খনন করা হইয়াছে এবং সেই সলিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণীও ভাসিয়া বেড়ায়। কোন কোন হ্রদ শত শত ফুট লম্বা খালে অন্য হ্রদের সহিত সংযুক্ত। ইহাদের জল কোন কোন স্থলে প্রায় ২০ ফুট অবধি গভীর। কিন্তু ভূমধ্যসলিল এই সকল হ্রদ সরোবরের বুকে কখনও ধরণীর স্নিগ্ধ আলোবাতাসের ক্ষীণ স্পর্শটুকুও লাগে না; এই জলে কোন প্রকারের প্রাণী বা মৎস্যাদি খেলিয়া বেড়ায় না, বা কুমুদ পদ্ম ইত্যাদি কোনও পুষ্প ফোটে না।

এই লবণপুরীর বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক, কাজে কাজেই এখানে জৈব বা উদ্ভিজ্জপদার্থ কোনোরূপ বিকারপ্রাপ্ত হয় না। অশ্ব প্রভৃতি পশুর মৃতদেহ এখানে কোথাও ফেলিয়া দিয়া কয়েক বৎসর পরেও দেখা গিয়াছে তাহা বেশ অবিকৃত অবস্থায় আছে।

ভিলিৎস্কা ব্যতীত আরও বহু লবণের খনি আছে। ঈশ্‌ল্‌-এ একটি প্রকাণ্ড খনির অংশাবশেষ আছে। মাঝে মাঝে খনির গহ্বরগুলিতে পরিষ্কার বিশুদ্ধ জল ভরিয়া দেওয়া হয়। কিছু কাল অপেক্ষা করিবার পর এই লবণাক্ত জল পাম্প সাহায্যে উপরে তুলিয়া রবিতাপে শুষ্ক করিয়া লবণ উদ্ধার করা হয়।

পূর্ব্ব-টাইরোলের এক লবণের খনির অভ্যন্তরপ্রদেশে প্রকাণ্ড একটি হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার জল পূর্ণ লবণাক্ত এবং তাহা উপরে তুলিয়া লবণ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য এবং ইংলণ্ডের চেশায়ার অঞ্চলে কয়েকটি বৃহৎ লবণের খনি আছে। ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে কৃত্রিম অগভীর উপহ্রদের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে রবিতাপে সমুদ্রের নোনা জল শুষ্ক করিয়া লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাকে সৌর-লবণ (solar salt) কহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যদি সমুদ্রের গভীরতা গড়ে তিন মাইল ধরিয়া লওয়া যায় তবে তাহা শুষ্ক হইয়া গেলে প্রায় ২০০ গজ গভীর লবণস্তরের সৃষ্টি হইবে। কিন্তু স্থানে স্থানে প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত গভীর স্তর বিশিষ্ট লবণখনি দেখিতে পাওয়া যায়—কিরূপ বিরাট গভীর সাগর হইতে তাহাদের সৃষ্টি ইহা একটি সমস্যার বিষয়। পূর্ব্বোক্ত গণনা মতে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভিলিৎস্কা ও ষ্ট্রাসফুর্ট-এর লবণখনিগুলি ন্যূনাধিক ১৫।২০ মাইল গভীর সাগর শুষ্ক হইয়া সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিতগণ বলেন যে, এরূপ সিদ্ধান্ত ভুল। সুদূর অতীতে যে উপায়ে এই সব গভীর খনির সৃষ্টি হইয়াছে আজিও পৃথিবীর নানা স্থানে প্রতিনিয়ত তাহা সংঘটিত হইতেছে। কাস্পিয়ান হ্রদের পূর্ব্বতীরে কারা বাঘার নামে একটি উপহ্রদ আছে—উহার পরিধি প্রায় ২,০০০ বর্গ মাইল। ৩ হইতে ৫ ফুট গভীর ও ১৫০ গজ দীর্ঘ একটি সরু খালে এই উপহ্রদ কাস্পিয়ান হ্রদের সহিত সংযুক্ত। এই পথে কাস্পিয়ান হ্রদের লবণাক্ত জল সর্ব্বদা উপহ্রদে আসিয়া রবিতাপে শুষ্ক হইতেছে ও লবণ নীচে তলাইয়া জমা হইতেছে। এই হ্রদের জলে প্রায় এক ভাগ মাত্র লবণ—তবুও পণ্ডিতগণ গণনাদ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর প্রায় ১২ কোটি ৮০ লক্ষ টন লবণ এই হ্রদের তলদেশে জমা হইতেছে। পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ষ্ট্রাসফুর্ট প্রভৃতি অঞ্চলের গভীর খনিগুলির সৃষ্টিও উপরোক্তরূপে হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এক এক বৎসরে যে লবণস্তর জমা হইয়াছে তাহার একটা

বিশেষ চিহ্ন আছে। এইরূপ বাৎসরিক চিহ্ন দ্বারা হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ষ্টাসফুর্টের খনির সৃষ্টি হইতে প্রায় ১৫ হাজার বৎসর লাগিয়াছে।

আফ্রিকাতে সাহারা মরুভূমির পূর্ব্বাঞ্চলে বিস্তীর্ণ লবণখনি রহিয়াছে। আসা ডারওয়া প্রদেশের নিকটস্থ আবিসিনিয়ার সমতলভূমিতে একটি খনি আছে। এই বিস্তীর্ণ লবণভূমি অতিক্রম করিতে প্রায় চারি দিন সময় লাগে।

প্রাণীর ও উদ্ভিদের জীবনধারণের নিমিত্ত কিয়ৎ-পরিমাণ লবণ একান্ত আবশ্যক। লবণ উর্ব্বরা ভূমির একটি প্রধান উপাদান, কিন্তু পরিমাণের মাত্রা অধিক হইলে ইহা পচননিবারকের ন্যায় কার্য্য করে এবং জীবনীশক্তিকে ধ্বংস করে। সুতরাং অত্যধিক লবণসমন্বিত ভূমি অচিরেই মরুভূমিতে পরিণত হয়। আমেরিকা, পারস্য প্রভৃতি পৃথিবীর নানা স্থানে এইরূপ বিস্তীর্ণ লবণমরু দেখিতে পাওয়া যায়।

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে এক পাউণ্ডেরও কিছু বেশী লবণ আছে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার্থ বৎসরে তাহাকে ন্যূনকল্পে ১৫ হইতে ১৮ পাউণ্ড পর্য্যন্ত লবণ খাদ্য-দ্রব্যের সহিত গ্রহণ করিতে হয়। এই লবণ হইতে বঞ্চিত হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কথিত আছে, চীনা ও ওলন্দাজরা এক সময় তাহাদের দেশের ঘোরতর অপরাধীদিগকে লবণবিহীন খাদ্য আহার করাইয়া তিলে তিলে হত্যা করিত। মানুষের পাকস্থলীর পাচকরসের (gastric juice) মধ্যে শত করা পাঁচভাগের এক ভাগ হাইড্রোক্লোরিক এসিড আছে। নিঃসন্দেহ ভক্ষিত লবণ হইতেই প্রকারান্তরে ইহার উদ্ভব হয় এবং এতদ্ব্যতীত পরিপাকক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না।

শরীররক্ষার জন্য লবণ এত অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া যে-সকল দেশে লবণ অপ্রতুল, সেখানে পর্য্যাপ্ত লবণ সংগ্রহ করা দুষ্কর ব্যাপার এবং উহা একটি বিলাস-দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত। আফ্রিকার অন্তঃপ্রদেশের কোন কোন স্থানের অবস্থা এইরূপ। এমনও স্থান সেখানে আছে যেখানে লবণ একেবারেই অপরিচিত অথবা স্বর্ণের চেয়েও মহার্ঘ। সুবিখ্যাত পরিব্রাজক মাঙ্গো পার্ক বলেন, আফ্রিকার অন্তঃপ্রদেশে লবণের চেয়ে অধিক মূল্যবান বিলাসসামগ্রী আর নাই।

অতীত যুগে এই লবণ-তৃষ্ণার জন্য দারুণ অনর্থ ঘটিয়াছে। জার্ম্মেনীতে লবণ-প্রস্রবণের অধিকার লইয়া আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে কত যে রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দেশের রাজাও সময় এবং সুযোগ বুঝিয়া একদা লবণের উপর কর বসাইলেন। অতীত কাল হইতেই দেখা গিয়াছে, যখনই আয়বৃদ্ধির আবশ্যক হয় তখনই দেশের শাসনকর্ত্তারা মানুষের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্যরূপে আবশ্যক দ্রব্যাদির উপর কর বসাইয়া থাকেন।

মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর জীবনধারণের জন্যও লবণের একান্ত আবশ্যক। অরণ্যে এমন অনেক লবণ-নির্ঝর আছে যেখানে শত শত মাইল দূর হইতেও পিপাসু বন্য জন্তু তাহাদের লবণ-তৃষ্ণা দূর করিতে আসিয়া মানুষের হাতে প্রাণ দিয়াছে। কেণ্টকি প্রদেশের বুন জেলায় বিগ বোন লেক নামক লবণ-প্রস্রবণ এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। কত শত শতাব্দী ধরিয়া কত সহস্র সহস্র বন্য জন্তু যে এই নির্ঝরে তাহাদের লবণ-পিপাসার নিবৃত্তি করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাদের কেহ কেহ এখানে সমাধিও লাভ করিয়াছে। হয়ত তাহারা লবণ-তৃষ্ণা নিবারণে অতিমাত্র ব্যগ্রতাহেতু ভিড়ের গোলমালে পরস্পরের সহিত ধাক্কা লাগিয়া অধিক জলে গিয়া পড়িয়াছে কিংবা কাদায় বসিয়া গিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। এই স্থানের উপরিভাগের লবণস্তরের মধ্যে বহু আধুনিক জীবজন্তুর দেহাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গভীর স্তর হইতে এমন সকল প্রাণীর প্রস্তরীভূত কঙ্কাল বাহির হইয়াছে যাহারা বহুদিন হইল ধরাতল হইতে লোপ পাইয়াছে। তন্মধ্যে অতিকায় হস্তী, কস্তূরীবৃষ প্রভৃতি যে-সকল প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহারা হয়ত সেই তুষার যুগে পৃথিবীর বুকের উপর বিচরণ করিত।

এক্ষণে লবণের আভ্যন্তরিক গঠনতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। লবণ সোডিয়াম নামক ধাতু ও ক্লোরিণ নামক গ্যাস, এই উভয় পদার্থের সমবায়ে গঠিত।

উচ্চ তাপসহনশীল পাত্রে লবণ তাপ প্রভাবে গলিত করিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করিলে উহা উপরোক্ত মৌলিক পদার্থ দুইটিতে বিশ্লিষ্ট হয়। অন্যপক্ষে ক্লোরিণ গ্যাসপূর্ণ কাচপাত্রে সোডিয়াম ধাতু নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ উহা প্রজ্জলিত হইয়া শুভ্র লবণে পরিণত হয়।

সোডিয়াম অতি অদ্ভুত ধাতু। ইহা রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র এবং মাখন, সাবান প্রভৃতির ন্যায় কোমল; এই জন্য ছুরি দিয়া ইহাকে অনায়াসে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে পারা যায়। ইহা অত্যন্ত বিকারপ্রবণ বা ক্রিয়াশীল ধাতু।

মুক্তস্থানে রাখিয়া দিলে উহা বায়ুর অম্লজানের সংস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে। এইজন্য ইহা পেট্রোলিয়াম তৈলে নিমজ্জিত করিয়া রাখা হয়। জলে নিক্ষেপ করিলে ইহা এদিক ওদিক ভাসিয়া ঘুরিতে থাকে এবং উদজান্ উত্থিত হইয়া মুহূর্ত্তেই জ্বলিয়া উঠে ও অনেক সময় বিস্ফোরণ পর্য্যন্ত হয় এবং সোডিয়াম্ সোডাতে পরিণত হয়।

অধুনাগলিত সোডার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করিয়া সোডিয়াম ধাতু বহুলপরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহা সোডামাইড্ সোডিয়াম পেরক্সাইড্ সোডিয়াম স্যায়েনাইড্ প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য ও অন্যান্য বহুবিধ শিল্প ও রসকর্ম্মে ব্যবহৃত হয়

অত্যধিক ক্রিয়াশীলতার দরুণ সোডিয়াম ধাতু কিরূপ বিপজ্জনক নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে তাহা অনুমিত হইবে।

১৯১১ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে ট্রিপোর্ট নামক বন্দর হইতে একটি সমুদ্রগামী জাহাজ অন্যান্য দ্রব্যের সহিত দুই টন ওজনের সোডিয়াম পূর্ণ বিশটি বাক্স লইয়া দেশান্তরে যাইবার কালে ঝড় আরম্ভ হয়। ঝড়ের তাড়নায় সমুদ্রবক্ষ স্ফীত হইয়া পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ জাহাজের বুকের উপর দিয়া সবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। অচিরেই সোডিয়ামের বাক্সের ভিতর জল প্রবেশ করাতে উহা প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল ও মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ আরম্ভ হইল। জাহাজের কাপ্তেন ইহার রহস্য কিছুই জানিতেন না। তাঁহার আদেশমত খালাসীরা হোজ পাইপ লইয়া প্রবল জল ধারা নিক্ষেপ করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে আরম্ভ করিল। ফলে, অধিকতর জলের সংস্পর্শে যেন ঘৃতাহুতি পাইয়া অগ্নিশিখা ও বিস্ফোরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কাপ্তেন তখন অনন্যোপায় হইয়া বাক্সগুলিকে সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। সমুদ্রে পড়িবামাত্র বাক্সগুলি তীব্রতরভাবে জ্বলিতে ও বিদারিত হইতে লাগিল ও অগ্নির বিরাট লেলিহান শিখা ষ্টীমারের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। উপরন্তু কতকগুলি বাক্স বিদারণের বেগে লাফাইয়া পুনরায় ষ্টীমারের উপর পড়িল এবং গলিত সোডিয়াম ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত হওয়ায় জাহাজের নানা স্থানে, এমন কি ইঞ্জিন-কক্ষেও, আগুন ধরিয়া গেল। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই ষ্টীমারে প্রচুর পরিমাণে চর্ব্বিও বোঝাই ছিল। অগ্নির উত্তাপে তাহা গলিয়া চতুর্দ্দিক পিচ্ছল হওয়াতে খালাসীদের পদস্খলন হইয়া অনেকেই ন্যূনাধিক পরিমাণে দগ্ধ হইতে লাগিল। অবশেষে অবস্থা সঙ্গীন দেখিয়া সকলেই জীবন-তরণীতে অবতরণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিল, কিন্তু ষ্টীমারখানা অচিরেই দগ্ধ হইয়া সলিলসমাধি লাভ করিল।

ক্লোরিন গ্যাসও অত্যন্ত ক্রিয়াশীল পদার্থ। ইহা জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। ক্লোরিন মিশ্রিত জলের উপর সূর্য্যালোক পতিত হইলে উহা হইতে অম্লজান গ্যাস উত্থিত হয় এবং জলের উদজান্ ভাগের সহিত রাসায়নিক সংযোগের ফলে ক্লোরিন্ হাইড্রোক্লোরিক এসিডে পরিণত হয়। ক্লোরিনের আরও একটি অদ্ভুত ধর্ম্ম আছে। যে-কোন প্রকারের আর্দ্র রঙীন্ বস্ত্রখণ্ড, পুষ্প কিংবা অপর কোনও দ্রব্য ক্লোরিন বাষ্পের সংস্পর্শে বিবর্ণ হয় বা শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। এই নিমিত্ত ধোলাইকার্য্যে ইহা অত্যন্ত ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ ক্লোরিনের এই ধর্ম্মের উপর একটি বিরাট শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা ও হাজার হাজার লোক নিয়োজিত হইয়াছে। কাগজের মণ্ড, বস্ত্রাদি প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য ধৌত ও শ্বেত করিবার জন্য উহা ব্যবহৃত হয়। কলিচূনের দ্বারা ক্লোরিন বাষ্প শোষণ করিয়া অতি উৎকৃষ্ট ও সুলভ বিরঞ্জন চূর্ণ প্রস্তুত

হয়। ইহার সহিত জল মিশ্রিত করিলে ক্লোরিন গ্যাস পুনরুত্থিত হইয়া আর্দ্র রঙীন্ দ্রব্যাদিকে শুষ্ক করে।

উদ্‌জানের প্রতিও ক্লোরিনের রাসায়নিক আসক্তি অত্যন্ত প্রবল। অন্ধকারপূর্ণ স্থানে ক্লোরিন বাষ্পের সহিত উদ্‌জান গ্যাস মিশ্রিত করিলে উহাদের মধ্যে সহজে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে না বটে, কিন্তু উহাদের উপর সূর্য্যালোক পতিত হইবামাত্র উদ্‌জান তীব্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে ও বিস্ফোরণ হয়। এই ক্রিয়াতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড বাষ্প উৎপন্ন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কেবলমাত্র উদ্‌জান-সমন্বিত যৌগিক পদার্থই যথেষ্ট। তার্পিন তৈল উদ্‌জান ও অঙ্গারক যুক্ত পদার্থ। ক্লোরিন গ্যাস পূর্ণ পাত্রে কিয়ৎ পরিমাণ তার্পিন তৈল নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ উহা জ্বলিয়া উঠে। তৈলের উদ্‌জান ভাগ ক্লোরিনের সহিত মিলিত হইয়া হাইড্রোক্লোরিক এসিড বাষ্প উৎপন্ন হয় এবং কালো অঙ্গারক ভাগ পাত্রের গায়ে সঞ্চিত হয়। গলিত গন্ধক, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি ধাতু নির্ম্মিত তার তপ্ত করিয়া ক্লোরিন গ্যাসে নিমজ্জিত করিলে উহারা উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতে থাকে। ক্লোরিন বিষাক্ত বাষ্প এবং সহজেই তরলীভূত হয়। গত মহাযুদ্ধে প্রচুর পরিমাণ তরল ক্লোরিন ব্যবহৃত হইয়াছিল।

মেঘলা সকাল

শ্রীঅশোকবিজয় রাহা

একলা ঘরে বসে আছি
　সকালে,
আকাশে আজ মেঘ করেছে
　অকালে।

ঝরণা ধারার জলের 'পরে
নাম্‌ল ছায়া কালো করে,
পাহাড়তলীর বনগুলাতে
　নেই আলো,
আমি ভাবি, এমন দিনে
　এই ভালো।

পথের ধারে আম্‌লকীর ঐ
　তলেতে
ভিজেছে ঘাস ঝরা পাতার
　জলেতে।

সে পথ দিয়ে থেকে থেকে
বাদ্‌লাখানি হাওয়ায় মেখে
লাগে আমার বাতায়নের
　লতাতে;—
কচি পাতা কাঁপে কত
　কথা তে!

মেঘের ছায়ায় আজ কেতকী
　গোপনে
জানি না তো কি দেখে তার
　স্বপনে!

শিশু শিরীষ ঐখানেতে
হাওয়ায় দিল হৃদয় পেতে,
শিরায় পুলক নাচে কিসের
　আবেশে!
এমন দিনে, কি যেন আজ
　পাবে সে।

ঝরণা তলায় বন-ডালিমের
　আড়ালে,—
মেঘ্‌লা চোখে কে যেন ঐ
　দাঁড়ালে!

জানি না সে হোথায় নামি
ভরবে কি তার কলসখানি;
হয়তো তাহার কাঁখের কলস
　জল ভরা;
আন্‌মনা তার মনখানি কোন্
　ছল ভরা!

একলা ঘরে বসে আছি
　সকালে,
ভোর থেকেই মেঘ করেছে
　অকালে।

বসে বসে আপন মনে
দেখ্‌ছি স্বপন খনে খনে,
বাতাসে জল; আকাশেতে
　নেই আলো।
এমন দিনে আজ্‌কে আমার
　এই ভালো।

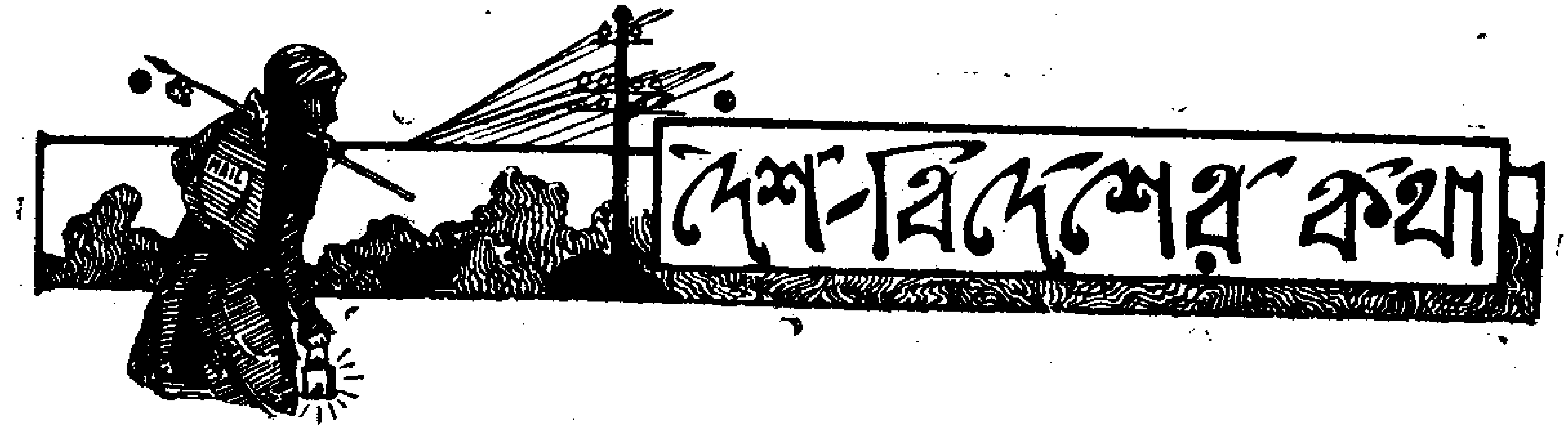

বিদেশ

বিলাতে বেকার—

বিলাতে সংবাদপত্রে বেকার জনগণের মোটামুটি হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। এই হিসাবে বিগত ৬ই জুন পর্য্যন্ত, কোথায় কত লোক বেকার বসিয়া আছে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। রিপোর্টে প্রকাশ, পশ্চিমোত্তর ডিবিসনে অর্থাৎ লাঙ্কাশায়ার, চেশায়ার, ও কাম্বারল্যাণ্ডে ১৬ই জুন পর্য্যন্ত ৫,৪১,৪১৩ লোক কর্ম্মহীন হইয়াছে। তুলা ও বস্ত্রের কারখানায় প্রায় অর্দ্ধেক লোক বেকার হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টার ও সালফোর্ডে ৩৭,১৮৩ পুরুষ এবং ২২,০৮৫ স্ত্রীলোক, লিবারপুল জেলায় ৬৫,৭৯৬ পুরুষ ও ১১,৭৭৭ স্ত্রীলোক বেকার রহিয়াছে। ল্যাঙ্কাশায়ারে এক কার্পাস ব্যবসায়েই বেকার সংখ্যা ২রা জুন তারিখে পুরুষ, ৮৭,৮০৬, ১৫ই জুন ১০১,৩৯৩ হইয়াছে। ঐ দুই তারিখে বেকার স্ত্রীলোকের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৬,৯৩২ এবং ৯১,০৪৭ হইয়াছে। ভারতে বিলাতী বস্ত্র বয়কট করিবার ফলেই যে ল্যাঙ্কাশায়ারে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা স্পষ্টই অনুমিত হয়।

—

ভারতবর্ষ

ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্বে ঘাটতি—

ভারত গভর্ণমেণ্টের রেভিনিউ বিভাগে এপ্রিল ও মে মাসে নিম্নলিখিতরূপে আয় কমিয়া গিয়াছে।

১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০	
৫৪১২৭০০০	৫৬৭৬৫০০০	৫৩৭৫২০০০	লেণ্ড রেভেনিউ
১৩৮৫০০০	১৩৪৭৪০০	১১৭৮৬০০০	লবণ—
২২৮৩৩০০০	২৯০৩৭০০০	২২৪০৬০০০	ষ্টাম্প—
২৯৫৪১০০০	৩০২২৫০০০	২৭৩০৫০০০	আবগারী—
৭৬০৭৯০০০	৮৭১৪১০০০	৪৬৫৫৯০০০	কাষ্টম—
৩৭৮৩০০০	৭০১৯০০	৪৭৯৩০০০	ইন্‌কাম টেক্স-
৪০১৯০০০	৪৪০১০০০	৩৬৯৪০০০	বনবিভাগ
১৫৯১০০০	১৯৭০০০০	৪৮৭৪০০০	আফিং

বাংলা গেজেট

—

বাংলা

কিশোরগঞ্জের দাঙ্গাহাঙ্গামা —

কিশোরগঞ্জ দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্বন্ধে সরকারী ইস্তাহারে যে কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া ময়মনসিংহের সুপরিচিত সংবাদপত্র চারুমিহির বলিতেছেন।-

প্রথমতঃ দুর্ব্বৃত্তগণ যে সকলেই মুসলমান এবং মহাজনগণ সকলেই হিন্দু এই রিপোর্টে তাহার কোন উল্লেখ নাই। কিশোরগঞ্জের এই উপদ্রুত স্থানে বহু মুসলমান মহাজন আছেন। কিশোরগঞ্জের হাঙ্গামার অনেক সংবাদ এখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। তাহাতে জানা যায়, যে দুই-তিন জন মুসলমান মহাজন হিন্দুগণকে আশ্রয় দিয়াছিলেন অথবা হিন্দুগণের দলিল গৃহে রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেই দুই-তিন জনের গৃহমাত্র আক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের গৃহ হইতে কোন জিনিষ লুট হইয়াছে এমন সংবাদ এখনও আমরা পাই নাই। দুর্ব্বৃত্তগণের অত্যাচার কেবল হিন্দু মহাজনগণের উপরই নিবদ্ধ ছিল না। ঐ অত্যাচারিত স্থানে ধনী-নির্ধন নির্ব্বিশেষে হিন্দুগণের প্রতি অত্যাচার হইয়াছে। এই সকল অত্যাচারের বিবরণ যথাসম্ভব চারুমিহিরে প্রকাশিত হইতেছে। এই অত্যাচার যে ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে হিন্দুগণকে সর্ব্বপ্রকারে হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া নিশ্চিহ্ন করাই আক্রমণকারীদের মুখ্য উদ্দেশ্য। জৈত্রা ও বিশুংটার নমঃশূদ্র, নাবারটীয়ার মালো সম্প্রদায় অত্যন্ত দরিদ্র। তাহাদের কোন প্রকার লগ্নী কারবার নাই। ইহাদেরও যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত ও ধ্বংস করা হইয়াছে। এমন কি ইহাদের গৃহে দুর্ব্বৃত্তগণ এক মুষ্টি চাউলও রাখিয়া যায় নাই। প্রত্যেক বাড়ীর বিছানাপত্র, তুলসীমন্দির ও দেবমন্দিরগুলিও ধ্বংস ও অপবিত্র করা হইয়াছে। হিন্দু ডাক্তার কবিরাজের ঔষধালয় ধ্বংস করা হইয়াছে। তাহাদের অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদিও ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা পায় নাই। দুর্ব্বৃত্তগণ অত্যাচারিত স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা অপহরণ করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই। হিন্দুর উপর নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়নের যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তবে আমরা এই কথা বলিতে পারি মুসলমানের এই অত্যাচার কেবল হিন্দু মহাজনের উপর আবদ্ধ ছিল না। যাহারা অত্যাচার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেরই আর্থিক অবস্থা অত্যাচারিত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক উন্নত।

এই সরকারী রিপোর্টের অন্য স্থানে লিখিত হইয়াছে মহাজন ব্যতীত অপর কাহারও উপর অত্যাচার হইয়াছে বলিয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট শোনেন নাই। হিন্দু বলিয়া কাহাকেও আক্রমণ করা হয় নাই।

তদন্ত করিয়া যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের এইরূপ ধারণাই হয় তাহা হইলে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কারণ, ঘটনা সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হইতেছে। তাহা দ্বারা ম্যাজিষ্ট্রেটের এই অভিমত কিছুতেই সমর্থিত হয় না। আমরা যতই ঘটনা পর্য্যালোচনা করিতেছি ততই আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে হিন্দুকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া বিতাড়িত করাই এই অত্যাচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য। যদি হিন্দু মাত্রই মহাজন ও মুসলমান মাত্রই খাতক হয়, তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের অভিমত আংশিক ভাবে সত্য হইলেও হইতে পারে। ঐ রিপোর্টের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে গত জুলাই মাসের প্রথমভাগে কিশোরগঞ্জের প্রজাসাধারণের মধ্যে অর্থনৈতিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং কিশোরগঞ্জের ও হোসেনপুরে রায়তদের সভায় মহাজনগণের সুদ গ্রহণ কার্য্যের নিন্দা করা হয়। এই কথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। এই অত্যাচারিত স্থানে বহু মুসলমানের সভায় প্রকাশ্যভাবে হিন্দু মহাজনের কবল হইতে মুসলমানকে রক্ষা পাইতে হইবে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলা হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কোন্ হিন্দু কোন্ মুসলমানের উপর ব্যক্তিগতভাবে কি অত্যাচার করিয়াছিল তাহা সংগ্রহ করিয়া সেই উত্তেজক তালিকা সভায় পাঠ করা হইয়াছিল। ইউনিয়ন বোর্ড, লোকেল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ইলেকশানে হিন্দু বিদ্বেষের মাত্রা চরম সীমায় উপস্থিত হয়। গবর্ণমেণ্টের বিবৃতিতেও প্রকাশ ভাওয়াল ও ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বহু সংখ্যক মৌলবী আসিয়া নিরক্ষর চাষীদের নিকট প্রচার করিয়াছিল যে সরকার তাহাদের পক্ষে রহিয়াছে, সুতরাং মহাজনদের নিকট হইতে যদি দলিলপত্রাদি বলপূর্ব্বকও তাহারা ছিনাইয়া নেয়, তাহা হইলে সরকার তাহাদিগকে কিছু বলিবে না।

দুই বৎসর পূর্ব্বে কিশোরগঞ্জে ইয়ং কমরেড্ লিগ নামক এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে তাহার প্রচারকার্য্যও চলিয়াছিল। ইহাদের প্রচারের ফলে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের মনে ধনী ও শ্রমিকের পার্থক্য বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। হিন্দুস্থান ফেনাটিকেল পার্টি নামে বলশেভিক নীতিবাদের এক দল আছে। ভারতের বহির্ভূত স্থানে ইহারা বলশেভিক নীতিবাদে দীক্ষিত হয় বলিয়া প্রকাশ। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশই মুসলমান। আমরা শুনিয়াছি নোয়াখালী, কোটচাঁদপুর এবং ঢাকা অঞ্চলের অনেক মৌলবী নাকি এই সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহারাও যে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে তাহাদের মতবাদ প্রচার করিয়াছে, পুলিশও সম্ভবতঃ তাহার সংবাদ রাখিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের মতবাদ হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে ধনীসম্প্রদায়ের প্রতি প্রযুক্ত ছিল। যখন কিশোরগঞ্জ এই মতবাদে পরিপ্লাবিত হইতেছিল, তখন সাম্প্রদায়িক ভাবদুষ্ট মৌলবী ও মুসলমান শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অভাবগ্রস্ত গ্রাম্য কৃষকগণের নিকট উপস্থিত হইয়া কেবল হিন্দুর বিরুদ্ধেই এই প্রচার কার্য্য চালাইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। এই আপাতঃমধুর বাক্যে নিরক্ষর মুসলমানগণের মধ্যে বলশেভিক প্রচার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল এবং ইহার ফলেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের দানবীয় মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে।

ব্যঙ্গচিত্র

ডাক্তার—আপনার অসুখ হল কুড়েমি
রোগী—তা জানি ডাক্তার, কিন্তু ওর কি ডাক্তারী নাম নেই কোনো? আমার স্ত্রীকে যে বল্‌তে হবে গিয়ে!

—*Bulletin*, Sydney.

—কিন্তু ডাঃ স্কট, আপনি নিজে নিজের চিকিৎসা না করে ডাঃ ববস্‌কে ডেকে আনেন কেন?
—কি করব, আমার কি এত টাকা আছে? আমার ফি হল গিয়ে বত্রিশ টাকা, আর ববসের মোটে আট টাকা।

Aussie, Sydney.

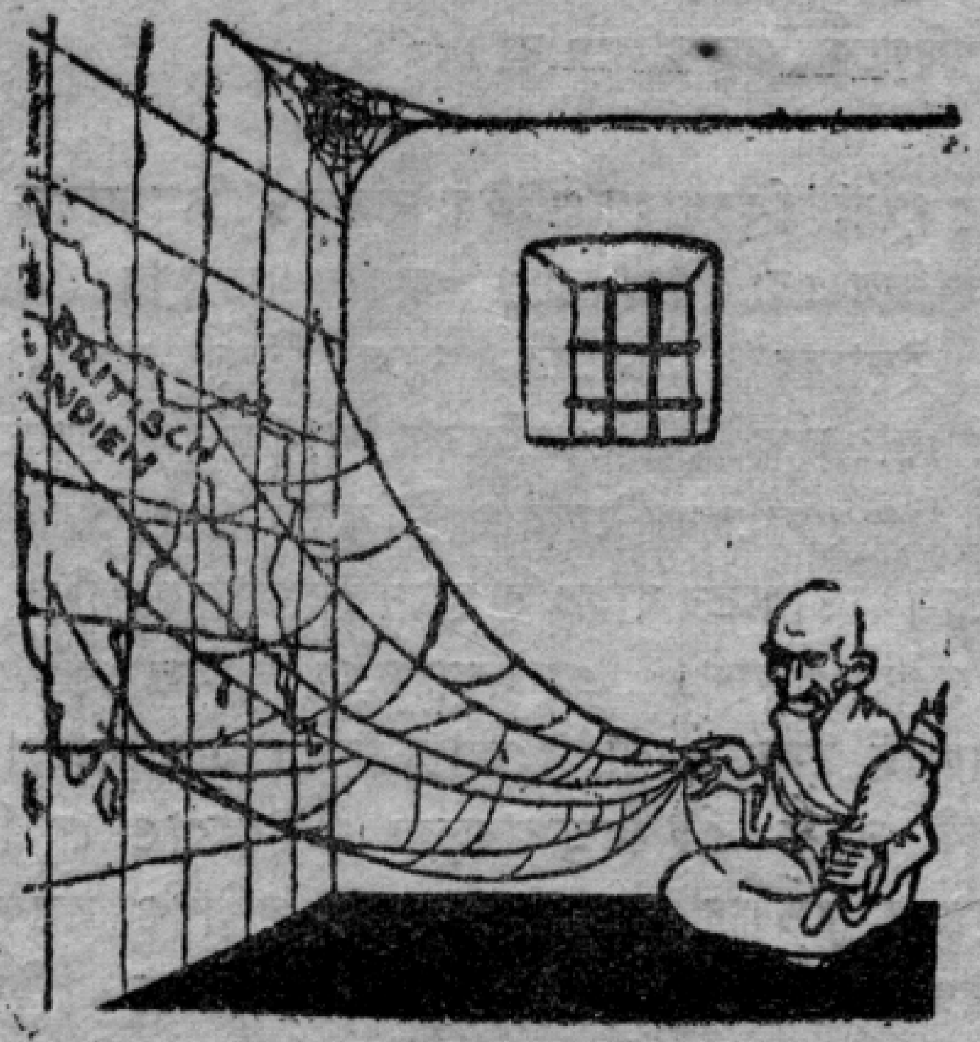

Mr. Gandhi in prison is passing the time spinning.

(মহাত্মা গান্ধী কারাগারে সুতা কাটিতেছেন)

Gotz, Vienna.

—তুমি কি সর্ব্বদাই তোমার স্ত্রীর ফটোগ্রাফ সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াও ?

—হ্যাঁ, যখনই তার কাছে আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় তখনি ওটা বার করে দেখি।

Smiths' Weekly, Sydney.

—আমার গাড়ীটা সারাতে কত লাগল ?

—দুই পাউণ্ড।

—কি হয়েছিল ওটার ?

—পেট্রোল ফুরিয়ে গিয়েছিল।

Bulletin, Sydney.

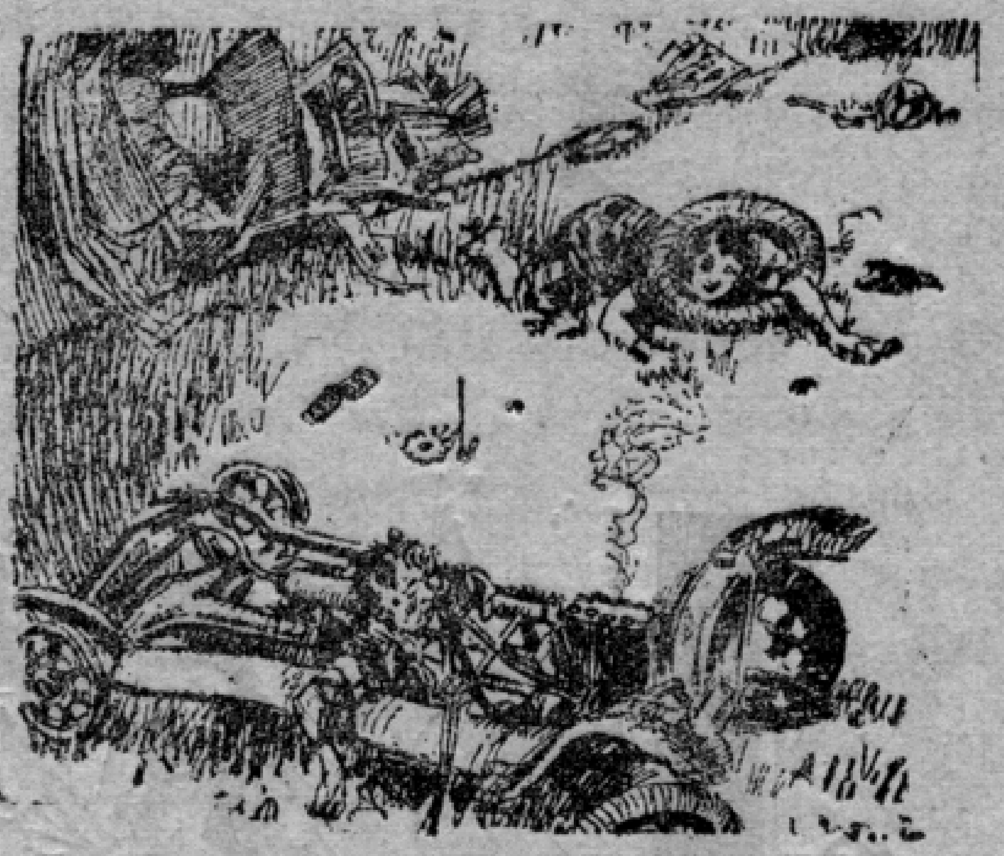

স্ত্রী—এ গাড়ীটা গেছে গেছে। পরের গাড়ীটার জন্য অনেক কলকব্জা হবে।

Smith's Weekly, Sydney.

দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৮) বলিদ্বীপ—বেসাকিক্‌-এর মন্দির-দর্শন

বেসাকিক্‌-এর মন্দিরগুলি সুখারোহ পাশা-পাশি একাধিক ঢালু পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। গ্রামের কাছে এসে মাঝে নাতিনিম্ন উপত্যকা, তার ওপারে পাহাড়ের উপর মন্দিরগুলির panorama বা সাকল্য দৃশ্য বেশ চমৎকার লাগ্‌ল। আমরা গ্রামের প্রান্তে এসে প'ড়লুম। গ্রামের বাইরে একটা উঁচু জায়গায় একটী সরকারী আপিস-বাড়ী দেখে সেদিকে অগ্রসর হ'লুম। ইটের পোতায় দরমার বেড়া, আর খড়ের চালের বাড়ী। সেখানে পঁউছে দেখি, সেটী বলিদ্বীপের সরকারী আরণ্য-বিভাগের একটী আপিস, এখানে একজন যবদ্বীপীয় ফরেস্‌ট্‌ অফিসার সস্ত্রীক থাকেন। ইনি আমাদের দেখে স্বাগত ক'রলেন। তাঁর আপিসে খানিকক্ষণ ব'সে আমরা শ্রান্তি দূর ক'রলুম। আর অতি বিনয়ী ফরেস্‌ট্‌ অফিসারটী কি ক'রে তিন জন ডচ ভদ্র ব্যক্তির আর আমাদের সমাদর ক'রবেন তা যেন ঠিক ক'রে উঠতে পারলেন না। আমাদের জন্য তাঁর স্ত্রী চা ক'রে দিলেন, টিনের দুধ মিশান পাতলা চা—আমরা ধন্যবাদের সঙ্গে সাদরে পান ক'রলুম। এখানে পাসাঙ্‌গ্রাহান ছিল না, তাই বেলা একটা হ'য়ে গেলেও আর জঠরাগ্নির দহন বিশেষ রকম অনুভূত হ'লেও বাধ্য হ'য়ে লঙ্ঘন দিতে হ'ল। আপিস বাড়ীটীর বারান্দায় ব'সে ব'সে উত্তরে পাহাড়ের গায়ে বেসাকিক্‌ গ্রামটী আর গ্রামের উপরে পাহাড়ের মাথায় মন্দিরগুলি খানিকক্ষণ ধ'রে আমরা দেখলুম। সমস্তটায় মিলে অতি মনোহর দৃশ্যপটের সৃষ্টি ক'রেছিল। একটী সরু পাহাড়ে' পথ উপত্যকায় নেমে গিয়েছে, তার পরে গ্রামে গিয়ে পৌঁছেচে। গ্রামে থাক থাক ঘর বাড়ী, গাছ-পালার আড়ালে আড়ালে দেখা যাচ্ছে। একটী তামাকের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আর আশপাশ দিয়ে রাজ্ঞীর মত মনোহর গতিশালিনী উজ্জ্বল রঙের 'কাইন্‌' বা কটিবস্ত্র প'রে কতকগুলি তন্বী তরুণীকে চলাফেরা ক'রতে দেখলুম। দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ ক'রছে, তার দরুন একটা আবছা আবছা ভাব যেন দূরের গাছপালা বাড়ীঘর পাহাড়পর্ব্বত আর বায়ুমণ্ডলকে ভ'রে রেখেছে।

আমরা পাহাড়ে' রাস্তা ধ'রে গ্রামে এসে পৌঁছুতে পৌঁছুতে একজন দুজন ক'রে অনেকগুলি স্থানীয় লোক আমাদের সঙ্গ নিলে। বলিদ্বীপীয়েরা বেশ স্বাধীনচেতা, ইউরোপীয় দেখে এরা ভয় পায় না। অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে এরা আমাদের পাছু পাছু চ'লল। দু এক জন সাহসী হ'য়ে মালাইয়ে দ্রেউএসকে জিজ্ঞাসা ক'রলে যে আমরা কে, কোথা থেকে আস্‌ছি। দ্রেউএস্‌ তাদের ব'ল্‌লেন যে তাঁরা ডচ্‌ সরকারী লোক, আর আমাদের দুজনকে দেখিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লেন যে এঁরা হ'চ্ছেন ভারতবর্ষ থেকে আগত, একজন ব্রাহ্মণ, আর একজন ক্ষত্রিয়। ভারতবর্ষ কি-আর কোথায়, আর সেখানে

বেসাকিক্‌-এ আরণ্য-বিভাগের আপিস
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত)

লোকে বলিদ্বীপের ধর্ম্ম মানে, এই কথা শুনে লোকেদের ভারী আশ্চর্য্য লাগ্‌ল। বেশ ভব্য চেহারার শ্যামবর্ণ লোক একজন এসে পরিচয় দিলে, সে বেসাক্কিক্‌-মন্দিরের একজন Pamangkoe 'পামাঙ্ক' বা নিম্নশ্রেণীর পুরোহিত। আমরা মন্দির দেখতে আসছি শুনে সে ব'ল্‌লে আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে, তবে মন্দিরের অন্যতম প্রধান পুরোহিত একজন পদণ্ডর বাড়ী থেকে মন্দিরের চাবী নিয়ে আস্‌তে হবে। মন্দির চল্‌তি পথে বাঁ দিকে একটী রাস্তার ভিতরে খানিকটা গিয়ে পদণ্ড-মহাশয়ের বাড়ী, পামাঙ্কুটি আমাদের সেখানে নিয়ে গেল; সঙ্গে চ'ল্‌ল এই কৌতূহলী মেয়ে পুরুষের দল। পদণ্ড মহাশয় তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁর বাড়ীর মেয়েরা বেরিয়ে এল', তারা পামাঙ্কুর হাতে চাবির গোছা দিয়ে দিলে। এই পামাঙ্কুরা জাতে শূদ্র হয়। দ্রেউএস-এর কাছে শুন্‌লে যে আমি ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ—বেদ অধ্যয়ন ক'রেছি এমন পদণ্ড, অনেক মন্ত্র জানি—এরা বিস্ময় আর সম্ভ্রমের সঙ্গে ধুতি-পরা আমাদের চেহারার প্রতি নেত্রপাত ক'রতে লাগল। সকলে আবার মালাই জানে না; যারা জানে, তারা আর সকলকে বুঝিয়ে দিতে দিতে চ'ল্‌ল। পামাঙ্কুটির সঙ্গে আমার ভাঙা ভাঙা মালাইয়ে আমিও যথা সম্ভব আলাপ জুড়ে দিলুম। এই রূপে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পথে ছোটো ছোটো দু' চারটে মন্দির পেরিয়ে শেষে বড়ো মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হ'লুম। বাকে কামেরা বা'র ক'রে ছবি নিতে লাগ্‌লেন। মন্দিরের তোরণ দ্বারের কাছেই বাইরে ছোটো ছোটো কতকগুলি মন্দির আছে। অনেকগুলি সিঁড়ি ব'য়ে প্রথম তোরণ পার হ'য়ে একটা চাতাল, তারপরে আবার সিঁড়ি ব'য়ে তার উপরে চাতাল। দ্বিতীয় চাতালটি পাহাড়ের মাথায়। এটী বেশ চটান, প্রশস্ত জায়গা নিয়ে—চার দিকে পাথরের দেয়ালে ঘেরা, ভিতরে পাথর ইট আর কাঠের অনেকগুলি মন্দির আর প্রকোষ্ঠ আর অন্য ইমারত। যে মন্দিরের মধ্যে দেবতার বিগ্রহ রেখে পূজা হয় তাকে 'মেরু' বলে—নেপালী মন্দিরের মতন থাকে থাকে মেরুর ছাত ওঠে। মন্দির চত্বরের ভিতরে কতকগুলি মেরু আছে, আর কতকগুলি অন্য ঘর আর আটচালা আছে। দেবতাদের ভোগ সাজিয়ে রাখবার জন্য খুব খোদাই কাজ করা পাথরের তিনটি উঁচু বড়ো বড়ো বেদি—সিঁড়ি লাগিয়ে উঠে তবে

বেসাক্কিক্‌—মন্দিরে উঠিবার সিঁড়ি
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্তৃক গৃহীত)

ভোগ আর নৈবেদ্য তুলে রাখ্‌তে পারা যায়। বেদি তিনটী একটী ব্রহ্মার, একটী বিষ্ণুর, আর একটী শিবের। বেদিগুলির আকার কতকটা যেন সিংহাসনের মতো। বেসাক্কিক্‌-এর মন্দির একটা পীঠ-স্থানের মতন জায়গা শুনেছিলুম; ভেবেছিলুম, কত না ভীড় দেখ্‌বো, আমাদের দেশের তীর্থস্থানে যেমন তীর্থ-যাত্রী পুরোহিত দোকানী পসারী দেখা যায়, নানা রকম স্থানীয় হাতের কাজ পাওয়া যায়, এখানে সেই রকমটা কিছু দেখা যাবে। কিন্তু সে সব কিছুই নেই, সব খালি। কেবল আমাদের সঙ্গে যে কতকগুলি লোক এসেছিল, তাদেরই ভীড়; আর মন্দিরের ভিতর দু চার জন ব'সেছিল। এদেশের রীতি তখন বুঝ্‌লুম—বিশেষ পর্ব্ব দিন ভিন্ন মন্দির একরকম পরিত্যক্তই হ'য়ে থাকে, দৈনন্দিন পূজা অর্চ্চনা ও হয় না।

আমরা, বিপুলায়তন মন্দির-চত্বরের 'বালে আগ্‌তঙ' বা বস্‌বার জন্য কাঠের তৈয়ারী মাচা-যুক্ত আটচালার, আর মেরুগুলির পাশে পাশে ঘুরে বেড়ালুম। একটু দূরে

বেদাক্কিক্—নৈবেদ্য-বেদি
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত)

পূব দিকে আর একটা ঢালু-গা পাহাড়ের উপরে আর কতকগুলি মন্দির দেখতে পেলুম।

সঙ্গের পামাঙ্কুটীকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম, 'রূপা ডেওআ' অর্থাৎ দেব-রূপ বা দেবমূর্ত্তি কোথায়? মন্দির চত্বরের এক কোণের দিকে একটা কাঠের ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল; ঘরটার ভিতরে আর বাইরে কতকগুলি পাথরে কাটা মূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় র'য়েছে, কতকগুলি একেবারে টুকরো টুকরো হ'য়ে র'য়েছে, টুকরোগুলি ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত; আর কতকগুলি অনেকটা ভালো অবস্থায় bas-relief বা শিলা-ফলকে বা শিলা-খণ্ডে খোদিত মূর্ত্তি, পূরো কুঁদে বা কেটে বা'র করা নয়—ঘরের ভিতরে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড় করানো। অযত্নে রাখার দরুন, স্বাভাবিক কারণে ক্ষ'য়ে গিয়ে আর প'ড়ে গিয়ে ভেঙে যাওয়ায় মূর্ত্তিগুলির এই দশা। মূর্ত্তিগুলি উড়িষ্যার মন্দিরের গায়ে যেমন দেড় হাত দু হাত সব মূর্ত্তি থাকে, সেই ভাবের। কতকগুলি পুং দেবতার, কতকগুলি দেবীর; প্রাচীন যবদ্বীপীয় ধরণের কাজ ব'লে মনে হ'ল। শিব, বিষ্ণু আছেন আর দুর্গা আছেন ব'লে মনে হ'ল। এ মূর্ত্তিগুলির পূজা হয় না, প্রাচীনকালে হয় তো এখানে কেউ এনে রেখে থাকবে, তাই এমনি অযত্নে প'ড়ে আছে; বলিদ্বীপের মন্দির-গঠন প্রণালী প্রাচীন যবদ্বীপের প্রণালী বা ভারতবর্ষের প্রণালী থেকে আলাদা, পাথরের বিরাট মন্দির যবদ্বীপ আর ভারতে যেমন পাওয়া যায়, তেমন বলিদ্বীপে অজ্ঞাত; তাই মূর্ত্তিগুলি কোথাও লাগিয়েও রাখা হ'তে পারে নি।

আমরা দেব-মন্দিরের বিগ্রহ দেখতে চাইলুম। শুনলুম, কতকগুলি পিতলের মূর্ত্তি আছে, সে-সব মূর্ত্তি উৎসব বা পর্ব্ব-দিবস উপলক্ষ্যে বা'র করা হয়। কিন্তু সেগুলি অতি পবিত্র জিনিস, স্বয়ং পদণ্ড-ঠাকুর ছাড়া আর কেউ সে মূর্ত্তি স্পর্শ করবার অধিকারী নন। এত দূরে এসেছি, মূর্ত্তিগুলি না দেখে যাওয়া ঠিক নয়, বিশেষ আমি ভারত-বর্ষ থেকে আগত ব্রাহ্মণ, আমার সম্বন্ধে আপত্তি খাটতে পারে না। দ্রেউএস আর বাকেদের এই সুযোগে মূর্ত্তি দেখতে আপত্তি নেই। দ্রেউএস তখন পামাঙ্কুকে ব'ললেন, কুছ পরোয়া নেই, খাস ভারতবর্ষের পদণ্ড উপস্থিত, ইনি দেবার্চ্চনায় অধিকারী, এঁকে দেখতে দাও। পামাঙ্কুটী কতকটা ইচ্ছায় কতকটা অনিচ্ছায় আঙিনার মধ্যে একটী মেরুর কাছে আমাদের নিয়ে গিয়ে ব'ললে, এই মেরুর ভিতরে মূর্ত্তি আছে। ব'লে চাবির গোছা থেকে একটী চাবি আলাদা ক'রে দেখিয়ে ব'ললে যে এই চাবি দিয়ে মেরুর দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢুকতে হবে। মেরুটী আর কিছুই নয়, উঁচু ইটের দাওয়ার উপরে কাঠের ছোট্ট একটী ঘর, দু তিনটী ধাপযুক্ত কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ঘরের মেঝেয় উঠতে হয়; ঘরের চারদিকে বারান্দা, ঐ পাদপীঠরূপ দাওয়াকে অবলম্বন ক'রে; ঘরের কাঠের তৈরী ছাত, তার উপরে খড়ের চাল,—নেপালী মন্দিরের মতন, স্তরে স্তরে বাইরে খড়-ছাওয়া কয় স্তর ছাজ বেরিয়ে এসেছে। পামাঙ্কু

শূদ্র ব'লে নিজে ঢুকবে না, চাবি আমার হাতে দিলে; নীচে জুতো রেখে আমি মন্দিরের দাওয়ায় উঠ্‌লুম, ধীরেন বাবুও উঠ্‌লেন; দ্রেউএস, আর বাকে-দম্পতী, আর পামাঙ্কু, আর আমাদের সঙ্গের বলিদ্বীপীয় লোকেরা সকলে মেরুর সামনে নীচে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল'। তলার চৌকাঠের সঙ্গে শিকল দিয়ে দরজা তালা-বন্ধ ছিল; চাবি খুলে ঘরে ঢুক্‌লুম। ছোট্ট ঘরটা, কাঠের মেঝে, দুধারে তক্তপোষের মত উঁচু কাঠের মাচা; খালি দরজার সামনেটা ফাঁক। একটু অন্ধকার লাগ্‌ল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ছাতা-ধরা ভাপসা গন্ধ নাকে এল'। কাঠের মাচাগুলি বহুদিনের সঞ্চিত ধূলোয় ভরা। মূর্ত্তি কিন্তু নজরে পড়্‌ল না, তবে মাচা দুটীর উপরে বেতের তালপাতার আর তাল আর না'রকেল বাল্‌দোর কতকগুলি চুবড়ী দেখ্‌লুম। বাইরে থেকে দ্রেউএস পামাঙ্কুর কথা মতন আমায় ব'ল্‌লেন যে চুবড়ীগুলিতে মূর্ত্তি আছে। একটী, দুটী চুবড়ী খুলে দেখি, তার ভিতর সাদা আর লাল রঙের পুরোহিতদের পূজার কাপড় সব র'য়েছে—একটু ছাতাপড়া দাগ লেগেছে কতকগুলি কাপড়ে; আর র'য়েছে স্ফটিক কাঠ আর বীজের মালা, আর চওড়া সাদা জরীর গাত্র-বন্ধ—ফিতার মতন গায়ে যা জড়িয়ে পুরোহিতেরা পূজায় বসেন। এগুলি নাড়াচাড়া ক'রতে ক'রতে ধূলোয় হাত পা সব ভ'রে গেল। শেষে তালের বাল্‌দোর একটী চুবড়ীর ঢাকনী খুল্‌তে পাওয়া গেল, ভাঙা ম'রচে-ধরা পিতল আর তাঁবার টুক্‌রো এক রাশি—পুরাতন পূজার বাসন, ঘণ্টা প্রভৃতির ভগ্নাংশ এগুলি; আর তার মধ্য থেকে বা'র করা গেল গুটী চারেক পিতলের মূর্ত্তি। মূর্ত্তি কয়টী বিঘত-খানেক আকারের হবে; বেশ পরিষ্কার মাজা ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ব'লে লাগ্‌ল। দণ্ডায়মান রাজবেশী কোনও দেবতার মূর্ত্তি, দেবী মূর্ত্তি ছিল না; বলিদ্বীপের প্রাচীন পিতলের কাজের চমৎকার নিদর্শন। পিতলের মূর্ত্তিগুলির দুই ভুরুর মধ্যে একটী ক'রে রূপোর ফোঁটা কাটা। আর ত্রিনয়ন দেখে এক মূর্ত্তি শিবের ব'লে বোঝা গেল। (পরে আমি এই রকম দুটী মূর্ত্তি,—তবে এত ভালো কাজ নয়,—সংগ্রহ ক'রতে পেরেছিলুম—একটী praboe 'প্রাবু' অর্থাৎ প্রভু বা রাজার, আর অন্যটী dewi 'ডেউঈ' অর্থাৎ দেবী বা রাণীর)। মূর্ত্তিগুলি নিয়ে তাদের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা ক'রে ধীরেন বাবুকে দেখাচ্ছি—ধীরেন বাবু দাওয়ার উপরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে—বাইরে থেকে দ্রেউএস আর বাকে ইংরিজিতে ব'ল্‌লেন, মূর্ত্তি বার ক'রে আনুন, আমরাও দেখি। দুটী মূর্ত্তি ধীরেন বাবু, আর দুটী আমি হাতে ক'রে নিয়ে এসে দাওয়ার ধারে পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে দিলুম।

যেমনি মূর্ত্তি দেখা, অমনি লোকজন যারা জড়ো হ'য়েছিল তারা মাটিতে উবু হ'য়ে ব'সে প'ড়ে দুহাতে মূর্ত্তিগুলিকে প্রণাম ক'রতে লাগ্‌ল। যুগপৎ এতগুলো লোকের মূর্ত্তিদর্শনমাত্র এইভাবে ভক্তি দেখিয়ে প্রণাম শুরু করাতে আমাদের একটু থম্‌কে যেতে হ'ল। পামাঙ্কু থেকে আরম্ভ ক'রে সকলেই উবু হ'য়ে ব'সে প্রণাম ক'রছে, ধীরেনবাবু আর আমি দাওয়ায়, আর ডচ্‌ বন্ধুরা মূর্ত্তির কাছে এসে দেখ্‌ছে; এমন সময়ে আমাদের পথপ্রদর্শক, মুন্‌চাঙ্‌ থেকে সেথো হ'য়ে এসেছিল যে ছোকরা—সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তারস্বরে বলিদ্বীপের ভাষায় আর মালাইয়ে উত্তেজিত ভাবে কি ব'ল্‌তে লাগল। তাতে দেখ্‌লুম যে সমাগত লোকেরা একটু যেন বিচলিত হ'য়ে প'ড়ল, একটু ভীত আর উদ্বিগ্নভাবে উঠে দাঁড়াল, আর আমার প্রতি আর মূর্ত্তিগুলির প্রতি তাকাতে লাগ্‌ল। দ্রেউএস ও একটু যেন ভ'ড়কে গিয়ে মালাইয়ে ছোকরার সঙ্গে তর্ক ক'রতে লাগলেন। ব্যাপারটা বুঝলুম এই - ছোকরা ব'লছে যে, আমরা এসে এই যে পবিত্র দেব-মূর্ত্তিতে হাত দিয়েছি, এতে আমাদের মহাপাতক হয়েছে—খালি পদণ্ডরা শুভদিন দেখে যে মূর্ত্তিকে স্পর্শ করেন, আমরা কোথাকার কে এসে সে মূর্ত্তিতে হাত দিলুম এতে দেবতারা রুষ্ট হবেন, আমার তো অশুভ হ'বেই, দেশেরও মহা অশুভ হবে। সব দেশই ধর্ম্মবিষয়ে ভীতু লোক আছে, একথা শুনে সমাগত লোকেদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য আরম্ভ হ'ল—অনেকে তখন রাগতো ভাবে, পামাঙ্কু আমায় মূর্ত্তি বা'র করতে দিয়ে কাজটা ভাল করেনি, একথা ব'লতে লাগল। ছোকরারও ধর্ম্মভাব বেড়ে উঠল, সে আরও জোর গলায় তার আপত্তির কথা

ব'লতে লাগ্‌ল, দ্রেউএস এদের মালাইয়ে 'সম্‌ঝাতে' চেষ্টা ক'রলেন,—কিছু খারাপ বা অন্যায় হয় নি, খাস ভারতবর্ষের এত বড় একজন ব্রাহ্মণ আর পদণ্ড এসেছেন, তিনি মন্দিরে যদি দেবমূর্ত্তি না দেখেন তো দেখবে কে—দেবতারা কখনও রুষ্ট হবেন না, ইত্যাদি। কিন্তু গোলমাল থাম্‌তে চায় না। দেশটী নোতুন ডচেদের শাসনে এসেছে, দেশের লোকেদের প্রকৃতি জানা নেই, খামকা কি জানি কি ঝঞ্ঝাট বেধে যায়। স্পৃশ্যাস্পৃশ্য দোষ এদেশে অজ্ঞাত, তবুও কে জানে, কি ভাবে নানা সংস্কার এদের মধ্যে কাজ করে। ডচ্‌ বন্ধুরা একটু উদ্বিগ্ন ভাবে এই কথা গুলি আমায় ব'ল্‌লেন, আর মূর্ত্তিগুলি যথা স্থানে রেখে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে তালা দিয়ে দিতে ব'লুলেন। আমিও একটু চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লুম। বলিদ্বীপের ধর্ম্ম আমারই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র; আর দুদিন ধ'রে পদণ্ডদের সঙ্গে মিশে যে হৃদ্যতার পরিচয় পেয়েছি, তাতে ক'রে, হিন্দু ব'লে ব্রাহ্মণ ব'লে এখানেও একটা সহজ অধিকার আমার আছে, এই রকম একটা বোধ মনে এসে গিয়েছে—আমার সে অধিকারের দাবী আমি এই ছোকরার চীৎকারেই ছাড়বো কেন? রণে ভঙ্গ দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। দ্রেউএসকে ব'ললুম—আপনি বলুন যে ইনি ব্রাহ্মণ, মন্ত্র জানেন, ইনি ব'ল্‌ছেন কোনও অমঙ্গল হবে না; আর তোমাদের বিশ্বাসের জন্য ইনি দেবতারা যাতে অপরাধ না নেন এইজন্য কতকগুলি মন্ত্র আর স্তোত্র পাঠ ক'রবেন তাতে সমস্ত অমঙ্গলের ভয় কেটে যাবে। দ্রেউএস এই কথা ব'ল্‌তে- যার উপর দোষ প'ড়ছিল, সেই পামাঙ্কু বেচারা আর মাতব্বর আর মুরুব্বি গোছের দুচার জন লোক ব'ল্‌লে, এ বেশ কথা; উনি তাই করুন। অদ্ভুত পোষাক পরা ভারতবর্ষের এই ব্রাহ্মণ কিভাবে মন্ত্র প'ড়বেন সে বিষয়ে হয় তো কারু কারু মনে একটু কৌতূহলও হ'য়েছিল। আমি তখন ধীরে ধীরে মূর্ত্তিগুলিকে উঠিয়ে ঘরের মধ্যে যথাস্থানে রেখে দিলুম, তারপরে দরজা বন্ধ ক'রে তালা দিয়ে দাওয়া থেকে ভূঁয়ে নেমে চাবি পামাঙ্কুর হাতে দিলুম। আমার মন্ত্র শুনবে ব'লে সমাগত লোকেরা উৎসুক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি মন্দিরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে জোড় হাতে 'ওঙ্‌ নমঃ শিবায়' 'ওঙ্‌ নমো বিষ্ণবে' এই মন্ত্র বার কতক উচ্চারণ ক'রে শিবের আর নারায়ণের ধ্যান, আর এ ছাড়া স্তোত্র যা-কিছু মনে ছিল, মায় জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র পর্য্যন্ত—উচ্চৈঃস্বরে একটু সুর ক'রে প'ড়ে গেলুম। আমার কথামত দ্রেউএস এদের ব'ললেন যে 'দেবতাস্তোত্র' পড়া হ'য়েছে, আর কোনও ভয় নেই। তারপরে আবার বেদপাঠ ব'লে গায়ত্রী মন্ত্র আর সন্ধ্যা-আহ্নিকের সূক্ত কতকগুলি প'ড়লুম। এদের ভয় গেল, সকলে আবার নিঃসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা আরম্ভ ক'রলে। খালি সঙ্গের পথপ্রদর্শক ছোকরাটী গোমড়া মুখে রইল।

মন্দিরে যা দ্রষ্টব্য তা তো ঘুরে ঘুরে দেখা হ'ল; মাঝে এই ব্যাপারটা হ'য়ে গেল। এইবার ফেরা যাবে স্থির ক'রে আমরা সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে লাগলুম। পামাঙ্কুর কিন্তু ভয় কাটে নি। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আবার কিছু মন্ত্র স্তোত্র পড়বার জন্য দ্রেউএসের মারফৎ আমায় অনুরোধ ক'রলে। আমি স্বীকার ক'রলুম—উপরের মন্দিরের চত্বর থেকে নামবার বড় সিঁড়ির নীচে মন্দির-মুখো হ'য়ে দাঁড়িয়ে আবার মন্ত্র পাঠ ক'রতে হ'ল। উপরে মন্দিরে যে সব লোক ছিল, তাদের সরিয়ে দিলে, মন্দিরের চত্বরে আর কেউ রইল না। এদের কাছে যা তা প'ড়ে দিলেই হ'ত; মেঘদূতের শ্লোক আওড়ালেও চ'ল্‌ত, বাঙ্গলা কবিতা বা গদ্য আউড়ে গেলেও ক্ষতি ছিল না; কিন্তু আমি জুয়াচুরী করিনি! জনসাধারণ সব জায়গায় যেমন হ'য়ে থাকে, এরাও তেমনি দৈব-ভয়ে ভীত এদের সবচেয়ে পবিত্র দেববিগ্রহ অজ্ঞাত-কুলশীল লোকেদের এমনি ক'রে বিনা পরিচয়ে হাত দিয়ে নাড়ানাড়ি ক'রতে দেওয়া, এদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী লোক তাদের মতে অন্যায় কার্য্য হবে বৈকি; আর তাতে যে দেব-রোষ আস্‌তে পারে, এরকম ধারণা হওয়া তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমায় মন্ত্র-টন্ত্র প'ড়ে আমার অধিকার প্রমাণ ক'রতে হ'ল; - কিছু বুঝলে না, তবে খুশী হ'ল যে একটা কিছু দাবী আমার আছে, আর বিশেষতঃ ডচ্‌ ভদ্রলোকেরা যখন আমায় ব্রাহ্মণ ব'লে এদের কাছে পরিচয় দিচ্ছেন। মন্দির থেকে চ'লে আসছি, দ্রেউএস

ব'ল্লেন, যখন এদের মধ্যে মিছিমিছি এই গোলযোগের সৃষ্টি হ'য়েছে তখন পদণ্ড-ঠাকুরের সঙ্গে দেখা না ক'রে আমাদের ফেরাটা উচিত হবে না। আমরা যাচ্ছি, পামাঙ্কুটী আমাদের সঙ্গে র'য়েছে, পিছনে লোকেরা র'য়েছে,—এমন সময়ে পামাঙ্কু দু হাত জোড় ক'রে একটু কাতর ভাবে আমায় বলিদ্বীপীয় ভাষায় আর মালাইয়ে কি ব'ল্‌তে লাগ্‌ল। ভাবটা এই, যে সত্যি সত্যি যেন আমাদের ঠাকুর দেখানোতে কারো কোন অনিষ্ট না হয়। পদণ্ডের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি

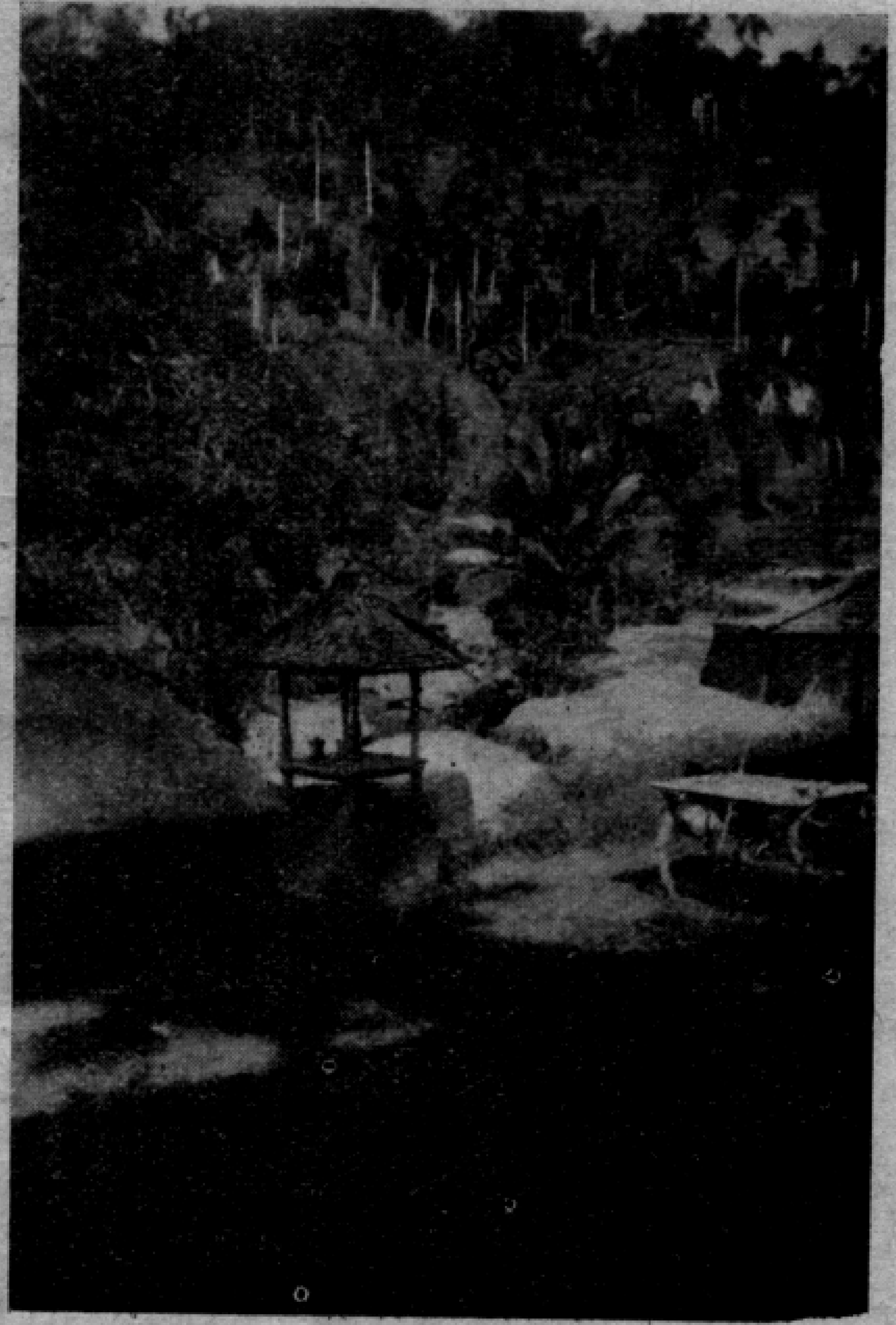

বেসাকিক্‌-এর পথের দৃশ্য
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত)

তখন ফিরেছেন। দু দণ্ড আলাপ হ'ল। আমার সঙ্গে কথা-বার্ত্তায় আমার শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতা আর মন্ত্র আর স্তোত্রে আমার অসাধারণ দখল সম্বন্ধে সহজেই তাঁর সুদৃঢ় ধারণা হ'য়ে গেল! তিনি 'ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ', এই টুকু বুঝেই প্রথমটায় অভিভূত হ'য়ে প'ড়লেন। সমাগত জনতাকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, আমি একজন খাঁটী লোক্—ভেল নই। তাতে এদের মনে আর খট্‌কা বা বিরূপ ভাব কিছু রইল না। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা যবদ্বীপীয় জঙ্গল বিভাগের কর্ম্মচারীটীর আপিসে এলুম, সেখানে তাঁকে বিদায়-সম্ভাষণ ক'রে বেলা আড়াইটের দিকে আমরা ফিরতী পথ ধ'রলুম।

আবার সেই দীর্ঘ পথ—সেই চড়াই-উতরাই, আর দু এক জায়গায় উতরাইয়ের কঠিনতা। অবশেষে পাহাড়ে' পথ ঘুরে নোতুন একটা গাঁয়ের পাশদিয়ে মুন্‌চাঙ-এ পৌছানো গেল। সারাদিন প্রায় কিছুই খাওয়া হয় নি। মুন্‌চাঙে এক যবদ্বীপীয় মণিহারের দোকানে বিয়ার পাওয়া গেল, ডচ বন্ধুরা সানন্দে তাই পান ক'রলেন। বলিদ্বীপে দেখেছি, সোডা লেমনেডের মতন বিয়ারের চলন খুব হ'য়েছে। বিয়ার অবশ্য ঠিক মদ নয়, নেসার জন্য লোকে খায় না। আমাদের পথপ্রদর্শক ছোকরাটী ফেরবার সময়ে সারা পথ অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে এসেছিল। তাকে দু গিলডার বক্‌শিশ দেওয়া গেল। সাড়ে চারটেয় মোটরে ক'রে মুন্‌চাঙ থেকে আমাদের কারাঙ-আসেম যাত্রা হ'ল। পড়ন্ত রোদ্দুরে চমৎকার দৃশ্য। বিকালে স্নান সেরে মেয়েরা চ'লেছে, এদের সদ্যঃস্নানের শুচিতাকে মাথার চুলে পরা ফুলে চমৎকার শ্রীমণ্ডিত ক'রে দিয়েছে।

পথে Bebandam বেবান্দাম্‌ ব'লে একটী গ্রামের মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে দেখি, মন্দিরে পর্ব্বোৎসব লেগে গিয়েছে। মিষ্টি গামেলান বাদ্যের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হ'য়ে মোটর থামিয়ে আমরা নামলুম। মন্দিরটী একটী টিলার উপরে। উজ্জ্বলবেশে নরনারী আর ছেলেমেয়েদের ভীড়। গাঁয়ের 'পুরা' বা মন্দির; শুন্‌লুম ভূদেবীর বিশেষ অর্চ্চনা উপলক্ষ্যে এই উৎসব। মন্দিরটীকে সাফ-সুথরা ক'রে চমৎকারভাবে সংস্কার করা হ'য়েছে। মন্দির-তোরণের দুপাশে বাইরে দুটী খুব উঁচু বাঁশ পোতা হ'য়েছে, বাঁশ দুটীর মাথা কাটা হয়নি, স্বাভাবিক সরুই রাখা হ'য়েছে, মাথা বেঁকে সরু কঞ্চিতে পরিণত হ'য়েছে, তা থেকে খুব লম্বা নোতুন-কাটা হাতীর-দাঁতের মত সাদা কচি তালপাতার নানা রকম কাজ করা একটা লম্বা ঝালর উড়ছে, নানা রকমের ঝুরি দিয়ে এই তালপাতার ঝালর অলঙ্কৃত। আমাদের দেশে উৎসব নিকেতনের দু পাশে যেমন ফলন্ত কলাগাছ দেয়,এখানে দেখছি পূরা বংশদণ্ড পুতে অলঙ্কৃত ক'রে দেওয়া হয়। ভিতরে নৈবেদ্য সাজানো হ'চ্ছে; পদণ্ড-ঘরের

মেয়েরা এসেছেন, এঁরা এক শ্রেণীর দেয়াসিনী বা দেবসেবিকার কাজ করেন; এঁরাই সব সাজাচ্ছেন;

দ্বার-পার্শ্বে পদণ্ড-ঘরের মেয়ে—মাতা ও কন্যা

রঙীন 'কাইন' বা বস্ত্র প'রে চুলে ফুল গুঁজে সদ্য-স্নাতা অন্য মেয়েরা সাহায্য ক'রছে, বা হাঁটু গেড়ে ব'সে আছে। একটা আটচালায় গামেলান-বাজিয়েরা ব'সে তাদের ওই চমৎকার বাজনা বাজাচ্ছে। লোকজন এত, কিন্তু হৈ চৈ কলরব নেই ব'ল্‌লেই হয়। এটা ভারী আশ্চর্য্য লাগ্‌ল। উঁচু উঁচু কাঠের নৈবেদ্য-বেদির উপরে ফলের স্তূপ, আমাদের বিবাহের চালের গুঁড়োর তৈরী শ্রীর আকারে ভাতের স্তূপ, এই সব সাজাচ্ছে। পূজার উপচার দ্রব্য দেখলুম,—মেয়েরা সব সাজিয়ে সাজিয়ে তৈরী ক'রে রাখছে;—ফুলের মতন কাজ করা তালপাতার মূর্ত্তি; তালপাতার দোনায় নব পল্লব, কলা, আর তালপাতার মোড়কে কি একটা বস্তু র'য়েছে দেখলুম; আর বেলপাতার মতন একটা ক'রে পাতা কাঠি দিয়ে লাগিয়ে এই দোনায় রেখেছে; আর খুঁটিনাটি নানান্ জিনিস, এই সব পাতায় ফুলে ফলে তৈরী, একটার নাম শুন্‌লুম 'সাম্‌পিয়াং', একটার 'পুসা', একটার 'রুরা';—এই পূজোপচারের অর্থ বা উদ্দেশ্য কে বুঝিয়ে দেবে? সন্ধ্যে তখনও হয় নি; বিকালের সূর্য্যাস্তের মধ্যে মন্দির প্রাঙ্গনে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম, সমস্ত জিনিসটা বাঙলির উৎসবের মতনই মনোহর লাগ্‌ল।

তার পরে সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌তে পুনরায় যাত্রা ক'রলুম, ভরা সন্ধ্যায় পাসাঙ্গ্রাহানে বাসায় ফেরা গেল। মোটর গাড়ী সারাদিনের ভাড়া নিলে সাড়ে সতেরো গিলডার। সকলেই শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত্ত। স্নান-টান সেরে সায়মাশ চুকিয়ে নিয়ে বারান্দায় চেয়ারে গা ঢেলে আড্ডার জন্য বসা গেল।

কবি তাম্পাক্-সেরিঙ্-এ আছেন, ভালোই আছেন,—টেলিফোন যোগে এ খবর তখন আমাদের কাছে এল'।

(৯) বলিদ্বীপ—ক্লুঙ্-কুঙ্

৩০শে আগষ্ট ১৯২৭, মঙ্গলবার।—

আজ সকাল বেলাটা কারাঙ-আসেমেই কাট্‌ল। সকালে একবার রাজবাড়ীতে গেলুম, তার পরে প্রাচীন 'পুরী' আর একবার ঘুরে ফিরে দেখে এলুম। রাজার কাছ থেকে বিদায় নিলুম। তিনি তাঁর ছবি আমায় দিলেন, বলিদ্বীপীয় ধরণে আঁকা ছবিও একখানি দিলেন—বিষয়, 'স্মর-রতি'। শ্রীযুক্ত লোক্‌মলের দান ডচ ভাষায় অনূদিত গীতা একখানি, আর সঙ্গে ছিল কিছু মৈসূরের ধূপ, এই দুটী সামান্য জিনিস তাঁকে উপহার দিলুম।

সাড়ে দশটায় আমরা দুখানা মোটরে ক'রে কারাঙ-আসেমের পাসাঙ্গ্রাহান থেকে ক্লুঙ-কুঙ্ যাত্রা ক'রলুম। একখানা মোটরে সব মালপত্র উঠ্‌ল। ক্লুঙ-কুঙ অবধি দুখানা গাড়ীর ভাড়া নিলে সতেরো গিলডার। সেই

চমৎকার দেশের মধ্যে দিয়ে আবার যাত্রা। এবার সমতল দেশের মধ্য দিয়ে পথ। তুপুরের মধ্যে ক্লুঙ্-কুঙ্-এ পৌছে সেখানকার পাসাঙ্গ্রাহানে ওঠা গেল।

ক্লুঙ-কুঙ-এর বিচারালয়

এটীও একটী ছোটো শহর বা গণ্ডগ্রাম। আপিস আদালত আছে, ইস্কুল আছে, ডাকঘর আছে। টেলিফোন-আপিস আছে, কাছে পিঠে প্রাচীন মন্দির আছে, আবার রাজপুরীও আছে। একটী বড়ো রাস্তা, তার দক্ষিণ ধারে পাসাঙ্গ্রাহান। পাসাঙ্গ্রাহানের পাশেই Kretak Goose বা স্থানীয় বিচারালয়—বিচারালয়টী আর কিছুই নয়, একটী বলিদ্বীপীয় pavilion বা ছতরী মাত্র, উঁচু চাতালের উপর ছাতে ঢাকা একটি বড়ো ঘর, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়; এইখানেই বিচারক চেয়ারে ব'সে বিচার করেন। ঘরটীর চারিদিকে ছাতের নীচেটায় নানা ছবি আছে, রঙীন ছবি, বলিদ্বীপীয় ঢঙে আঁকা, নরকে পাপের বিচারের ছবি। এই ছোট্ট ইমারতটী বেশ চমৎকার। সিঁড়ির মাথায় তুধারে পাথরের তৈরী তুটী সুন্দর উপবিষ্ট মূর্ত্তি, একটী পুরুষের, একটী মেয়ের।

বিশ্রাম করে আহার টাহার সেরে গ্রামটি একটু বেড়াতে বেরুলুম। দোকান পাট আছে। চীনা, আরব রোম্বাইয়ে খোজা—এরা দোকানী। এখানেও রাস্তার মধ্যে বলিদ্বীপীয় মেয়েরা তাদের সুন্দর গতিলীলার সেঙ্গে চলাফেরা ক'রছে, মাথায় ক'রে জলের কলসী জিনিসপত্র সব নিয়ে চ'লেছে। কাল হলাণ্ডের মহারাণীর জন্মদিন। তদুপলক্ষে স্থানীয় ইস্কুল, ডাকঘর টেলিফোন-আপিস সব রঙীন কাপড় আর কাগজ আর বিশেষ করে না'রকেল পাতা দিয়ে সাজানো হ'য়েছে, লাল নীল সাদা তেরঙা ডচ্ নিশান উড়্ছে—যে নিশানকে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের রঙের নিশান ব'লে ব্যাখ্যা ক'রে বলিদ্বীপীয়েরা যেন নিজেদেরই দেবতার ধর্ম্মের নিশান বলে মেনে নিয়েছে। কাল ইস্কুলের সামনে মাঠে সভা হবে, আর বলিদ্বীপীয় নাচ হবে—বাদুঙ বা দেন-পাসার নগর থেকে একটী নাচুনী মেয়েকে আনা হ'য়েছে, পেশাদার নাচিয়ে, সে নাকি খুব ভাল নাচতে পারে।

প্রাচীন একটী প্রাসাদের দরজার তুপাশে রাক্ষস দ্বারপালের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে প্রাসাদ-নির্ম্মেতা ডচেদের বিদ্রূপ

তোরণ-দ্বারে রাক্ষস দ্বারপাল মূর্ত্তি
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত)

করে তুটী ডচ পুরুষের মূর্ত্তি পাথরে খুদিয়ে রেখেছিলেন। তখন এই দ্বীপ ডচেদের হাতে আসে নি। সমগ্র দ্বীপময় ভারতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ক'রে ইউরোপীয় ডচেরাই এদেশর লোকেদের কাছে যেন রাক্ষসের প্রতীক হ'য়ে পড়েছিল ;—এদের চিত্রিত করা হ'য়েছে, একজনের হাতে মদের বোতল, আর এক জনের হাতে টাকার থলি ; তুজনেরই মাথায় টুপি, গম্ভীর ভাবে তোরণ-দ্বারের তু পাশে তুটী মূর্ত্তি ব'সে। এই ব্যঙ্গ-চিত্র ডচেরা বেশ প্রসন্নভাবে রসজ্ঞের মতই নিয়েছে,—ডচ ভদ্রলোকেরা গিয়ে এই তুটী মূর্ত্তি দেখে আসেন, আর তাদের ফোটোগ্রাফও নেন। আমরা যথারীতি গিয়ে দেখে এলুম, আর বাকে এই তোরণদ্বারের ছবিও নিলেন।

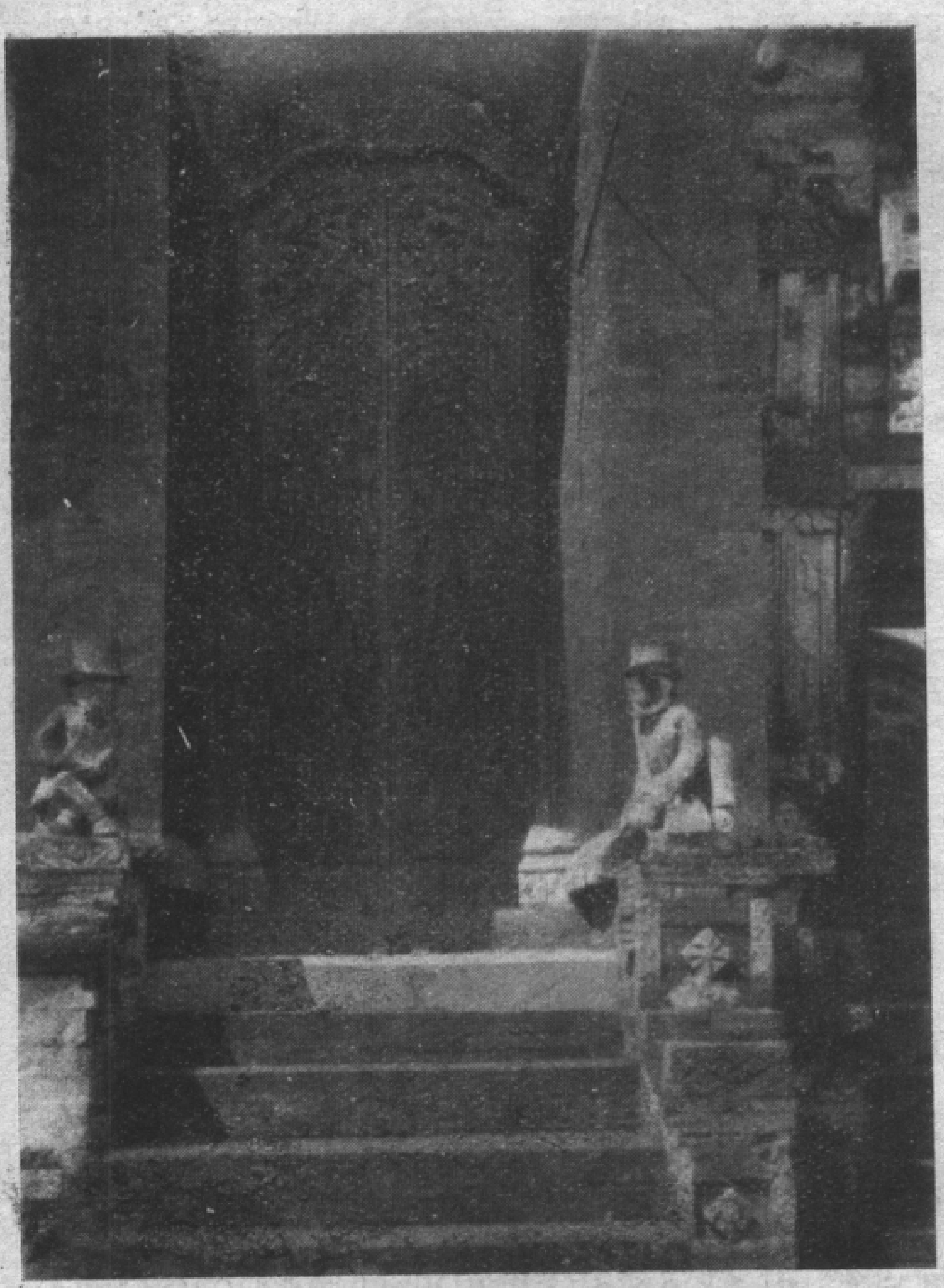

ক্লুঙ্কুঙ্-এর প্রাসাদে দ্বারপাল মূর্ত্তিতে ডচ প্রতিকৃতি
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত)

এদিকে আমাদের পাসাঙ্গহানের হাতার মধ্যে প্রাচীন আর আধুনিক বলিদ্বীপীয় শিল্পদ্রব্যের একটা হাট ব'সে গেল। তিন চার জন স্ত্রীলোক আর তু একটী পুরুষ নানা রকমের মনোহর শিল্পজাতের পসার দিয়ে ব'স্‌ল। বলিদ্বীপের আর যবদ্বীপের 'বাতিক' বা ছাপা কাপড় ; কাপড়ের উপর আর কাগজের উপরে নানা রঙে আঁকা বলিদ্বীপীয় পৌরাণিক চিত্র ; কাঠের ছোট ছোট দেবতা মূর্ত্তি, আর অন্য মূর্ত্তি ; চামড়ার wayang ওয়াইয়াঙ্ বা ছায়ানাট্যে ব্যবহৃত মূর্ত্তি ; পিতলের তৈরী পূজার তৈজস ; ছোট্টো ছোট্টো ক্রীস বা ছোরা ; জরীর কাপড়—বেনারসী কাপড়ের মতন ; সুরাতের রঙীন রেশমে বোনা 'পাটোলা' কাপড়ের মত কাপড় ; এই রকম নোতুন পুরাতন নানা জিনিস, আমরা কয়জন ভ্রমণকারী বা যাত্রী পাসাঙ্গ্রাহানে উঠেছি দেখে এনে হাজির ক'রলে। আমরা সকলেই কিছু কিছু কিনলুম। বিশ্বভারতীর কলাভবনের জন্য কিছু জিনিস ধীরেন বাবু সংগ্রহ ক'রলেন। কাপড়ে আঁকা রঙীন পট কতকগুলি, আর তু একটী মূর্ত্তি, এই যা আমি নিলুম। বিদেশী যাত্রীদের কাছে বলিদ্বীপীয়েরা যেভাবে তাদের দেশের প্রাচীন শিল্পজাত উজাড় ক'রে বিক্রী ক'রে দিচ্ছে, তাতে মনে হয় বছর কতক পরে প্রাচীন জিনিস একটিও দেশে আর থাকবে না, সব আমেরিকান আর ইউরোপীয় টুরিসটদের সঙ্গে সাগর পারে চ'লে যাবে। একজন বলিদ্বীপীয় ছোকরা, মাটিতে পসরা পেতে এইসব জিনিস পত্রের বেচাকেনা দেখছিল। ভাঙাভাঙা ইংরিজিতে সে আমার সঙ্গে কথা কইলে। 'মহাগুরু' কোথায়, তাও জিজ্ঞাসা ক'রলে। ছোকরা এতটা খবর রাখে দেখে ভারী খুশী হ'লুম। একটু গর্ব্বের সঙ্গে নিজেকে হিন্দু ব'লে সে পরিচয় দিলে। ব'ল্‌লে, তার ও পুরাতন আর নোতুন শিল্পদ্রব্যের দোকান আছে—পাসাঙ্গ্রাহানের পাশেই তার দোকান। আমরা যদি তার দোকানে গিয়ে জিনিসপত্র দেখি, তাহ'লে সে ভারী অনুগৃহীত হয়। তার দোকানে গিয়ে যেন ছোটো খাটো একটী বলিদ্বীপীয় চিত্রশালা দেখ্‌লুম, নানা সুন্দর জিনিসের সমাবেশ। এখানেও তু একটী মূর্ত্তি নিলুম—আমার পিতলের মূর্ত্তি তুটী যার কথা একটু আগেই বেসাক্কিকের মন্দিরে মূর্ত্তি-দর্শন প্রসঙ্গে ব'লেছি

সেতুটী এরই কাছ থেকে কিনলুম। পিতলের একটী বেশ বড়ো গরুড়-বাহন বিষ্ণু মূর্ত্তি দেখে নেবার বড়ই লোভ হ'ল, কিন্তু আমাদের ঘোরাঘুরি ক'রতে হবে ঢের, সেটীকে আর কেনবার সাহস হ'ল না। ছোকরাটী বেশ বুদ্ধিমান। আমার খাতায় নাম লিখে দিলে ; এর নাম Wajan Pageh (ওয়াইয়ান পাগেঃ)।

এই সবে, দুপুর আর বিকাল বেলাটা বেশ কাট্‌ল। বিকালে তাম্পাক্ সেরিঙ থেকে শ্রীযুক্ত কোপ্যার্‌ব্যার্গ এলেন, কবির সন্দেশ নিয়ে। কবি ঐ সুন্দর ঠাণ্ডা পাহাড়ে' জায়গাটিতে ভালোই আছেন। কাল সকালে কোপ্যার্‌ব্যার্গ আমাদের সঙ্গে ক'রে সেখানে নিয়ে যাবেন ব'লে এসেছেন। কোপ্যার্‌ব্যার্গ এদেশের সকলকে জানেন, খবর-টবর খুবই রাখেন। তিনি সংবাদ পেলেন, কাছেই বলিদ্বীপীয়দের পল্লীতে রাত্রে নাচ দেখানো হবে, কালকের ব্যাপারের জন্য বাতুঙ থেকে যে নাচের দল এসেছে তারা এমনি তাদের বাসায় নাচ দেখাবে। কাজেই, রাত সাড়ে আট্‌টায় উৎসাহ ক'রে আমরা চ'ললুম। কোপ্যার্‌ব্যার্গ আঁচ ক'রে ক'রে পথ চিনে চিনে চ'ল্‌লেন। বড়ো সড়কের পূব মুখে খানিকটা গিয়ে ডান দিকের একটা রাস্তায় আমাদের ঢুক্‌তে হ'ল। এইবার হ'ল মুস্কিল। বড়ো রাস্তার মতন এখানে আলো নেই। আর রাস্তাটা বড্ড এবড়ো-খেবড়ো ; পাথরের চাবড়া যথেষ্ট আছে, জায়গায় জায়গায় আবার ধাপও আছে। অন্ধকারে একটু বিপদে প'ড়লুম। তবে একটু এগিয়েই দেখা গেল, একটা দোকান-ঘর, সেখানে আলো জ্ব'ল্‌ছে, লোকজন অনেকগুলি র'য়েছে। দোকানটি একটা চিনির মেঠাইয়ের। মদুরা দ্বীপ যবদ্বীপের উত্তর-পূর্ব্বে, ছোট্ট দ্বীপটি ; এই মদুরা দ্বীপ থেকে এই মিষ্টিওয়ালারা এসে এখানে দোকান খুলেছে। আমাদের অপটু চোখে বলি-দ্বীপীয়দের মধ্যে থেকে এদের পৃথক ক'রে ধরা কঠিন। কোপ্যার্‌ব্যার্গ এদের সঙ্গের মালাইয়ে কথা কইলেন, এদের সম্বন্ধে ওয়াকিব-হাল হ'লেন। কালকে হলাণ্ডের রাণীর জন্ম-দিন' উপলক্ষ্যে যে উৎসব হবে, মেলা ব'সবে, তার জন্যেই এরা অনেক রাত অবধি এই সব মিষ্টি তৈরী একটা আলো দিলে। এইবার আমরা বেশ চ'ললুম। অস্ফুট নক্ষত্রালোকের তলা দিয়ে, রাস্তার দুধারে কেবল গাছপালা নজরে এলো, আর মাঝে মাঝে দু একখানা বাড়ী। লোকজনের চলাফেরা নেই, রাস্তা নির্জ্জন। পথে-শোয়া কুকুর মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গের আলোতে আর এতগুলি লোকের পায়ের আর গলার আওয়াজে বিরক্ত হ'য়ে ঘেউ ঘেউ ক'রতে ক'রতে উঠে পালাল। এই রকমে আমরা যে বাড়ীতে যেতে হবে সেখানে গিয়ে পৌঁছুলুম। আঙিনার পর আঙিনা পেরিয়ে যেতে হ'ল। ঘুমন্ত শূওর ছিল উঠানের ধারে, জেগে উঠে ঘোঁত ঘোঁত ক'রতে লাগল। একটা মহলে এসে প'ড়লুম, একটা ঘরের বারান্দায় আমাদের স্বাগত ক'রে ব'স্‌তে দিলে, খান কতক চেয়ার এনে দিলে ব'স্‌তে। গোটা পাঁচেক হারিকেন লণ্ঠন জ্ব'ল্‌ছে, এতেই যা আলো হ'য়েছে ; উপরে আকাশে একটা তারা জ্বল্‌জ্বল্ ক'রে জ্ব'লছে, আর পরিষ্কার আকাশে ছায়াপথ বেশ দেখা যাচ্ছে। ছোটখাটো উঠোন, আশে পাশে ৩।৪ খানি ঘর ; এক পাশে কলাগাছ কতকগুলি আছে, সেগুলি স্তূপাকারে পিণ্ডীভূত অন্ধকারের মতন র'য়েছে, হাওয়ায় তাদের চওড়া পাতা কাপড়ের মতন ন'ড়ছে। উঠোনের একধারে গামেলান বাজনার দল ব'সেছে। আমরা যখন পঁউছুলুম, তখন ঢাকে কাঠি পড়ে'ছ—অর্থাৎ বাজনা আরম্ভ হ'য়েছে। আমরা ব'স্‌তেই নাচ শুরু হ'ল। যে মেয়েটী নাচবে, তার বয়স তেরো কি চোদ্দ হবে ; সে আর তার চেয়ে ছোটো একটী মেয়ে, মেয়েটীর বাপ (বাপই তাকে নাচ শিখিয়েছে, আধা-বয়সী লোক এটী), আর অন্য একটী ছোকরা ; নাচে এই কয় জন যোগ দিলে। সাধারণ 'কাইন' বা সারঙ পরা মেয়েটী, উত্তরীয় খানি বুকে বাঁধা ; বাপের পরিধানে ধুতির মতন খাটো সারঙ একটী, খালি গা, মাথায় একখানা রঙীন রুমালের পাগড়ী। প্রথম মেয়েটী একা নাচতে লাগ্‌ল, মাঝে মাঝে তার বাপও এসে সঙ্গে যোগ দিতে লাগ্‌ল, মাঝে মাঝে অন্য পুরুষটী। ছোটো মেয়েটীও সঙ্গে একটু আধটু নাচলে। বাজনার তালে অত্যন্ত চমৎকার লাগ্‌ল এই নাচ। তন্বু দেহের

খুব দ্রুত তালে ঘুরে ফিরে নাচ চ'ল্ল। মলয়-উপদ্বীপে 'রোঙেঙ্' নাচ দেখেছিলুম, এ কতকটা তারই মতন লাগ্ল, তবে তার চেয়ে একটু বেশী কঠিন বেশী মার্জ্জিত ব'লে বোধ হ'ল; কিন্তু দুচার জায়গায় কখন ও কখন ও একটু suggestive, একটু যেন অভব্যতার আমেজ আমার চোখে লাগ্‌ছিল। ঘণ্টাখানেক নাচ দেখে, মেয়েদের মেঠাই খাবার জন্য দুটী টাকা বক্‌শিশ ক'রে আমরা বাড়ী ফির্‌লুম।—নাচ চ'ল্ছে, ও দিকে বাড়ীর মেয়েদের দৈনন্দিন কাজেরও বিরাম নেই। একখানা আটচালা ঘরে উখলী দিয়ে বাড়ীর কম-বয়সী দুটী মেয়ে চাল কাঁড়ছে দেখ্‌লুম—এ ও যেন এক ধরণের নৃত্য। আমরা ছাড়া বাইরের লোক দর্শনার্থী হ'য়ে বেশী আসে নি।

পাসাঙ্গ্ হানের বারান্দায় ব'সে রাস্তার জনবিরল স্তব্ধতার দিকে চেয়ে গল্পগুজব ক'রছি এমন সময়ে দেখা গেল, একদল ছোকরা হল্লা ক'রতে ক'রতে যাচ্ছে। কোপ্যার্‌ব্যার্গ তাদের ডাকলেন। তাঁদের দিয়ে কোপ্যার্‌ব্যার্গ গানের নামে খানিকটা চেঁচামেচি করালেন। তাঁর কাছে উৎসাহ পেয়ে, গান ধ'রলে একটা ছেলে;—আস্তে আস্তে সুর আরম্ভ করে, আর বাকী কজন ব'সে ব'সে গা দোলায়; গানের একটা কলি যাই শেষ হয়, অমনি সমস্বরে কতকগুলি উৎকট চীৎকার করে;—যেন এটা গানের ধুয়া—চীৎকার না বলে একটা হাঁক বলা যায়—সেটা কতকটা এই ধরণের শব্দ নিয়ে—"এঃ এঃ এঃ, টিডা, টিডা, টিডা"। গান বা ছড়া বলির ভাষায়; আশয়টা কি, তা জানা গেল না। খানিকক্ষণ ধ'রে এদের এই রঙ্গ দেখা গেল।

(ক্রমশঃ)

তিস্তা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

[প্রাচীন আসামী হইতে অনুবাদ]

তোমারে হেরিয়াছিনু বাংলার মাঠে
অয়ি তিস্তা! বিতরিয়া প্রতি ঘাটে ঘাটে
হিমানীর সম্ভাষণ শুক্তিস্বচ্ছ জলে
অবশেষে মিলাইতে উদাস-কুন্তলে
দিগন্তরে মেঘম্লান! হেরিতেছি পুন,
এ গিরি-শিখরে নিত্য নর্ত্তন-নিপুণ
তন্বী মেনকার মত অজস্র প্রলাপে
উচ্চকি' পাইন বন নামো ধাপে, ধাপে॥

তোমারে হেরিয়াছিনু বঙ্গের প্রান্তরে
কম্পিত মল্লিকাদাম শঙ্কিত-চরণা!
আজি তুমি এ কি রূপে এ-হিমাদ্রি 'পরে
খররবি করে ক্ষীণ একটি ঝরণা!
হেরিতেছি আজি সখি তোমার অন্তরে
কি আকুতি অবিশ্রাম করে আনাগোনা॥

আধুনিক গৃহসজ্জা—

এক বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রেই আমরা আধুনিকের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করি না—আর্ট সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া নয়। প্রাচীন যুগের শিল্পের সঙ্গে আধুনিক শিল্পের তুলনা চলে না। এমন কি আমাদের রসবোধও দিন দিন কমিয়া যাইতেছে বলিয়া আমাদের ধারণা। বাস্তবিকপক্ষে আধুনিক শিল্পে আমাদের প্রয়োজনীয়তাই একমাত্র চরিতার্থ হইতেছে, রসবোধ নয়। ইউরোপে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া গৃহসজ্জায় একটা 'আধুনিকতা'র আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকেরা এখন আর আধুনিক অর্থে কুৎসিৎ, একথা স্বীকার করেন না। আধুনিকই সুন্দর, তবে আমরা আধুনিক বলিতে যে কুৎসিৎ বুঝি তাহার জন্য দায়ী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিভলিউশ্যন-এর প্রথম বিভীষিকা এবং কলের নিষ্ফল অনুকরণের চেষ্টা। গত শতাব্দীতে কারখানা খুব রম্য স্থান ছিল না। মজুরদের দুর্দ্দশা কিংবা অপরিণত বালকদের দিনে ১৩ ঘণ্টা করিয়া খাটার কথা কেহ ড্রয়িং রুমে বসিয়া মনে আনিতে চাহিত না। তাই সে যুগের গৃহকর্ত্রীরা এলিজাবেথীয় শয্যা হইতে উঠিয়া চিপেনডেল চেয়ারে বসিতেন। তাঁর পায়ের নীচে থাকিত সাভোন্‌রি কার্পেট। বটিচেলী কিম্বা র‍্যাফেল ছাড়া অন্য কাহার চিত্র তাঁহার চোখে পড়িত না। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল-এর প্রথম বিভীষিকা কাটিয়া গিয়াছে, সুতরাং এখন আর আধুনিক অর্থে অসুন্দর বুঝিবার কোন কারণ নাই।

হাতের কাজের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য যে যন্ত্রের দ্বারা অনুকরণ করা সম্ভব নয়, একথা আধুনিকেরাও স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন শিল্পে যন্ত্রের প্রথম প্রয়োগে এই খানেই সবচেয়ে বড় ভুল হইয়াছিল। অতিরিক্ত কারুকার্য্য রচনায় অক্ষম হইলেও কোন প্রকার সৌন্দর্য্যসৃষ্টি যন্ত্রের পক্ষে সম্ভব নয় ধরিয়া নেওয়া ভুল। বিজ্ঞানের প্রয়োগ চলিতে পারে আর্টের সেই স্বরূপটিই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, আধুনিক গৃহসজ্জায় তাঁহারা সেই সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন।

এতটা চরম মত অবশ্য সকলেই পোষণ করেন না। কেহ কেহ স্বীকার করেন যে, কলের পক্ষে হাতের মত প্রত্যেকটি বস্তুকে বিশিষ্টতা দেওয়া সম্ভব নয় এবং শিল্পীর নিজস্ব রসবোধের ও কলের আর্টে কোন

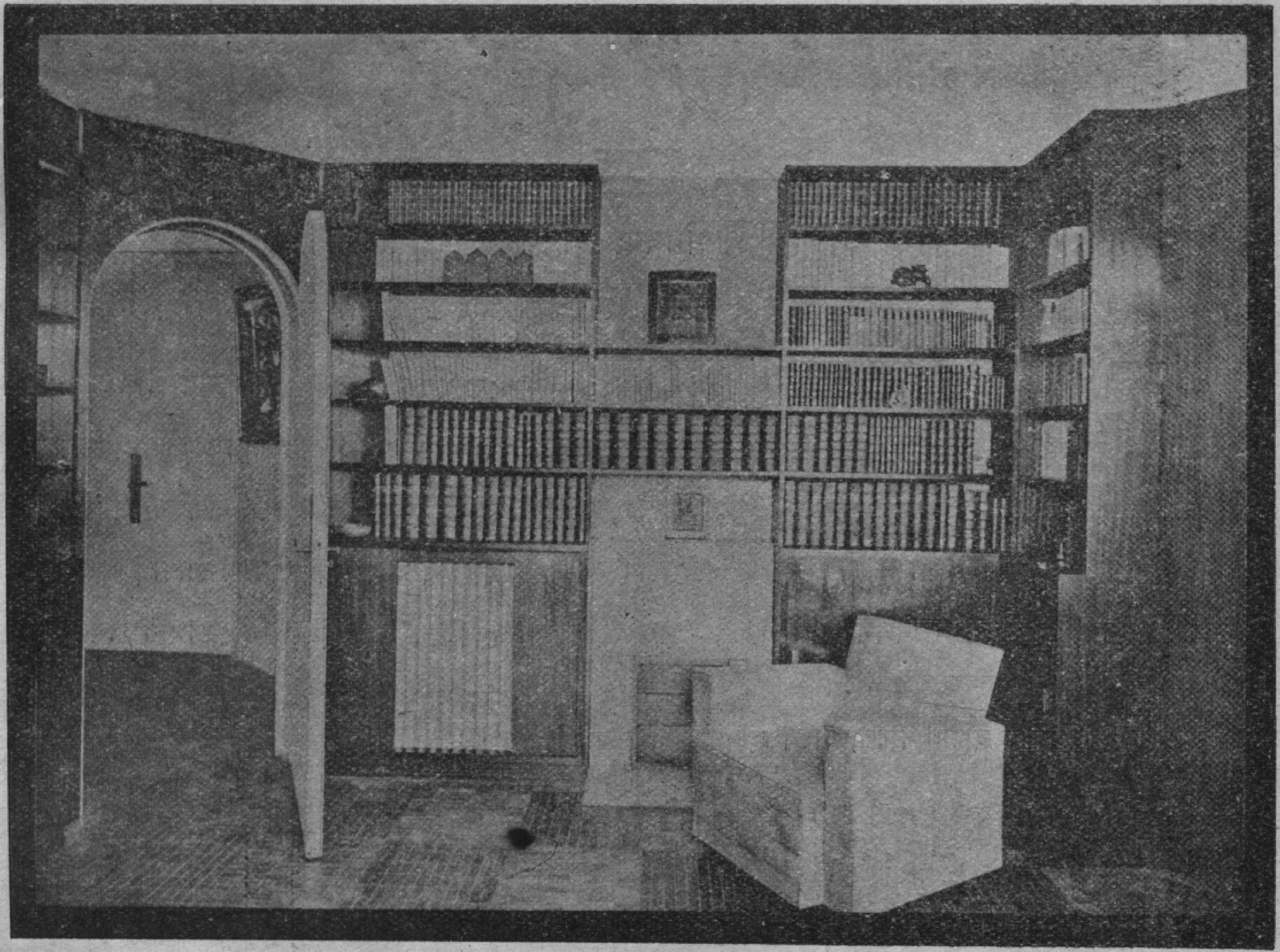

প্যারিসের জো-বুর্জ্জোয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিকল্পিত ও নির্ম্মিত একটি পড়িবার ঘর

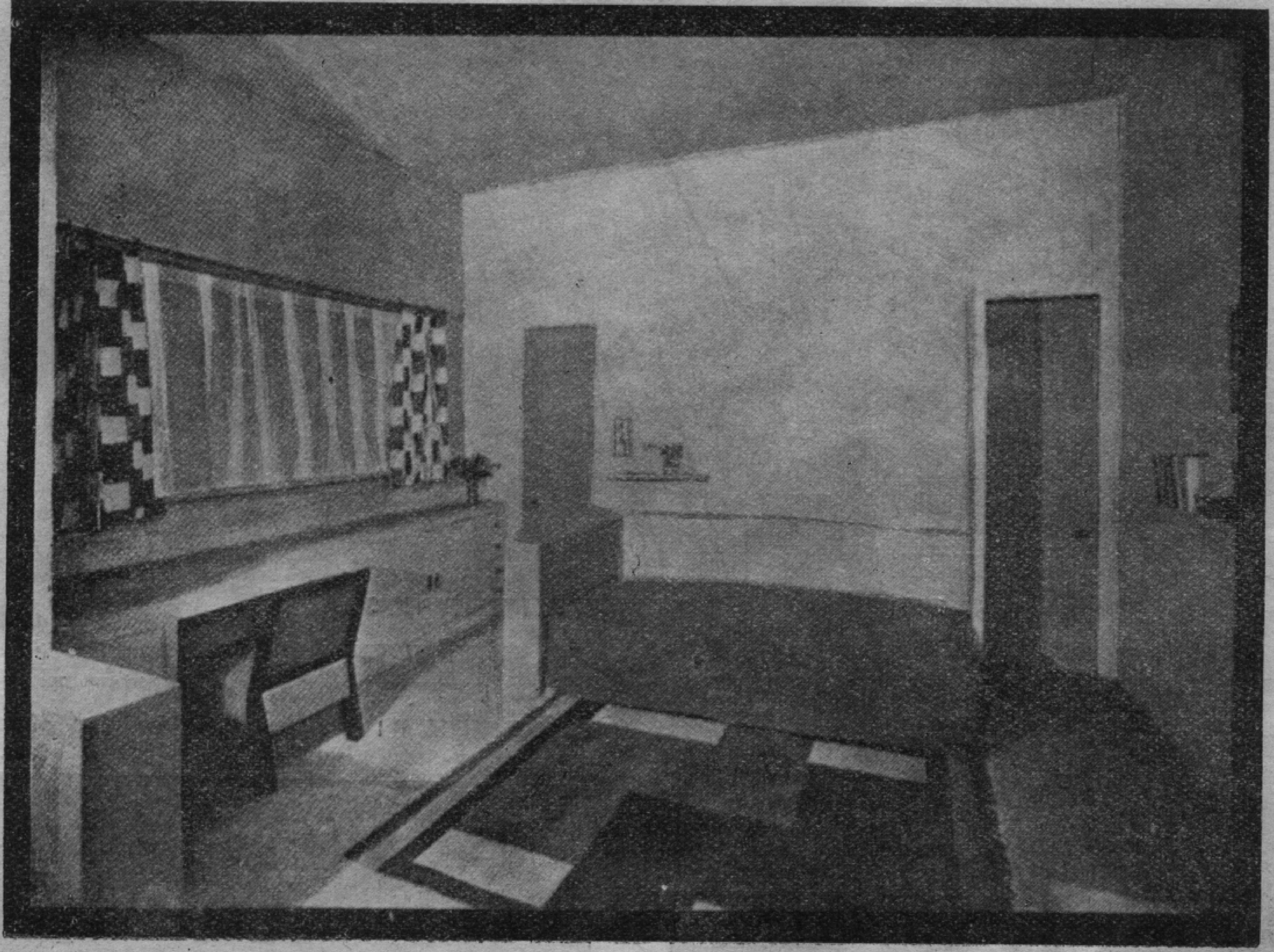

ঐ কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি শয়নকক্ষ—এই ঘরটিতে উপকরণবাহুল্যের অভাব লক্ষ্য করিবার বিষয়

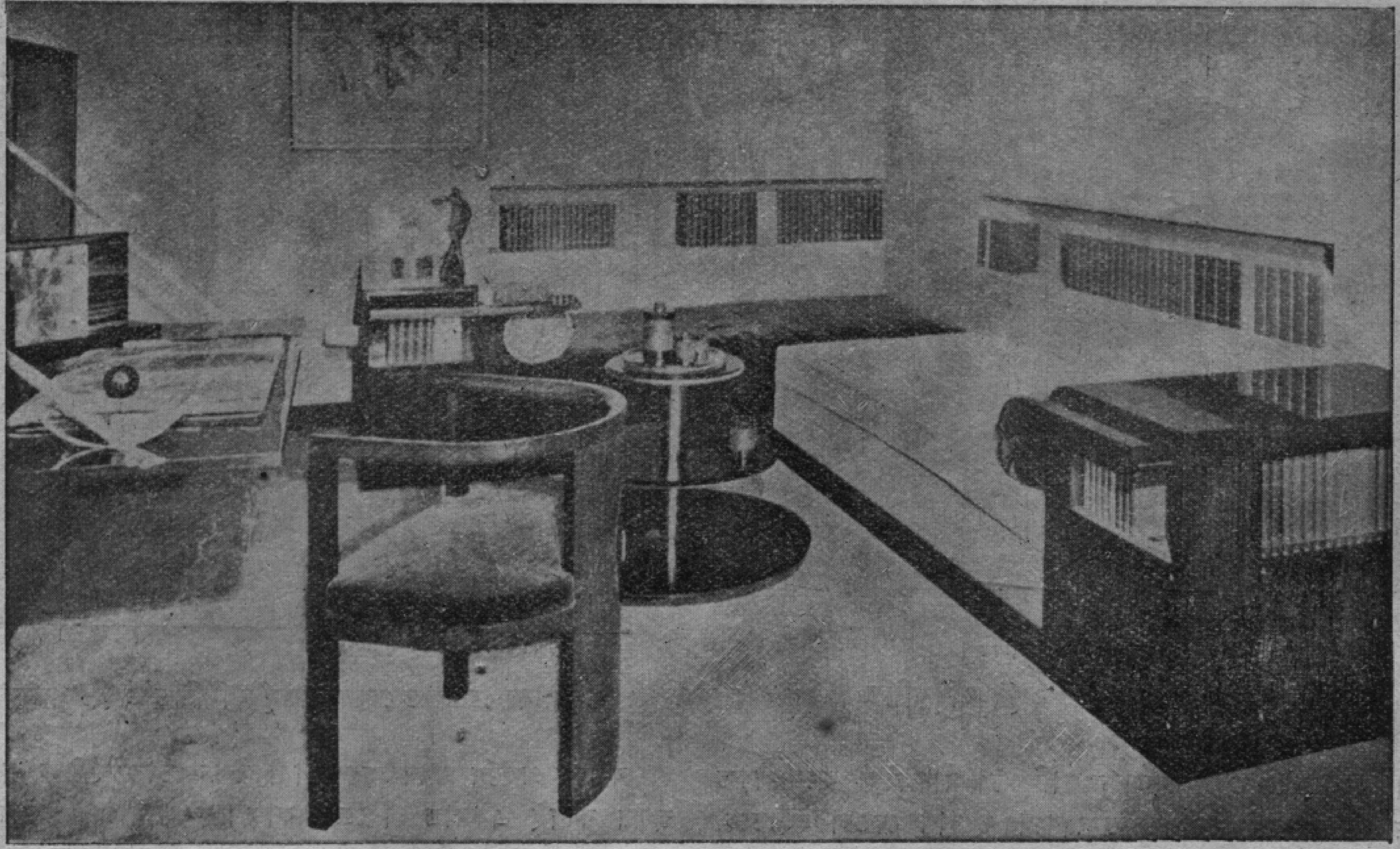

প্যারিসের 'সাদিয়ে এ ফিজ' কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি পড়িবার ঘর

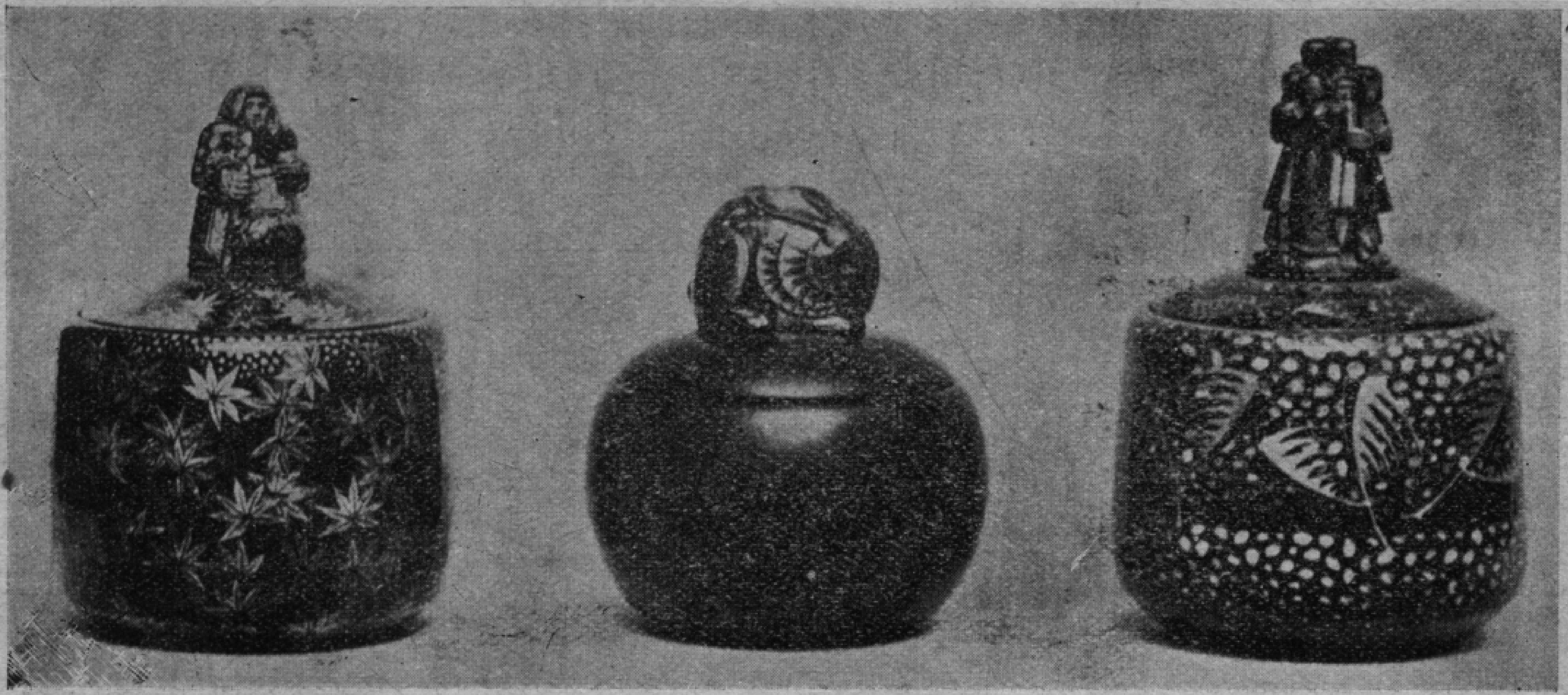

রেকো কেপি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত আবলুসের উপর ল্যাকার করা কৌটা

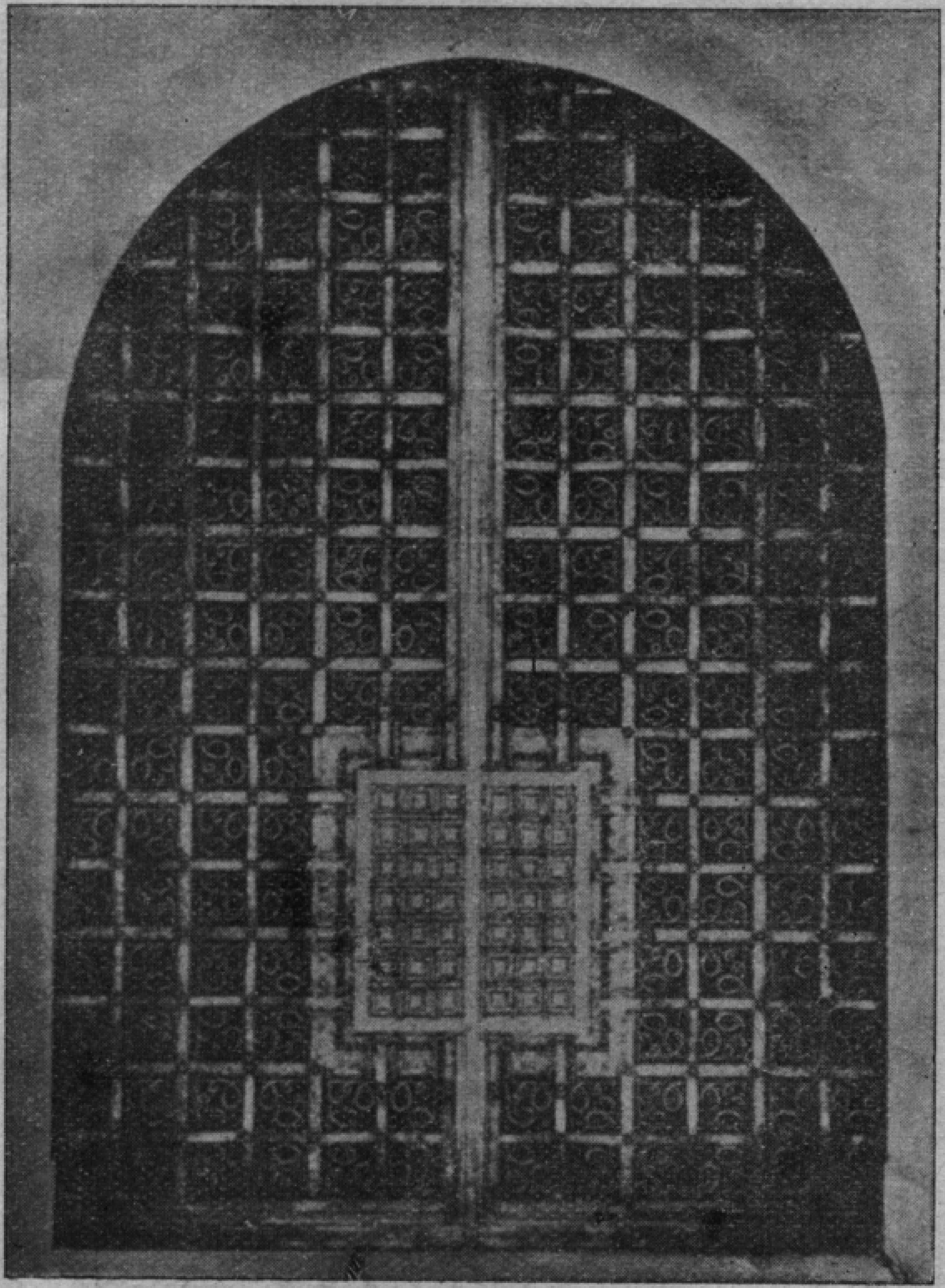

লৌহ নির্ম্মিত একটি দরজা
প্যারিসের রেমোঁ সুবেজ কর্ত্তৃক পরিকল্পিত

কেন ? প্রাচীন শিল্পী যতই নিপুণ হোক, তার শিল্পসৃষ্টি যতই উৎকৃষ্ট হোক ম্যাস্-প্রোডাক্শন্-এর সঙ্গে তার শিল্পসাধনা কখনই পাল্লা দিয়া চলিতে পারিবে না।

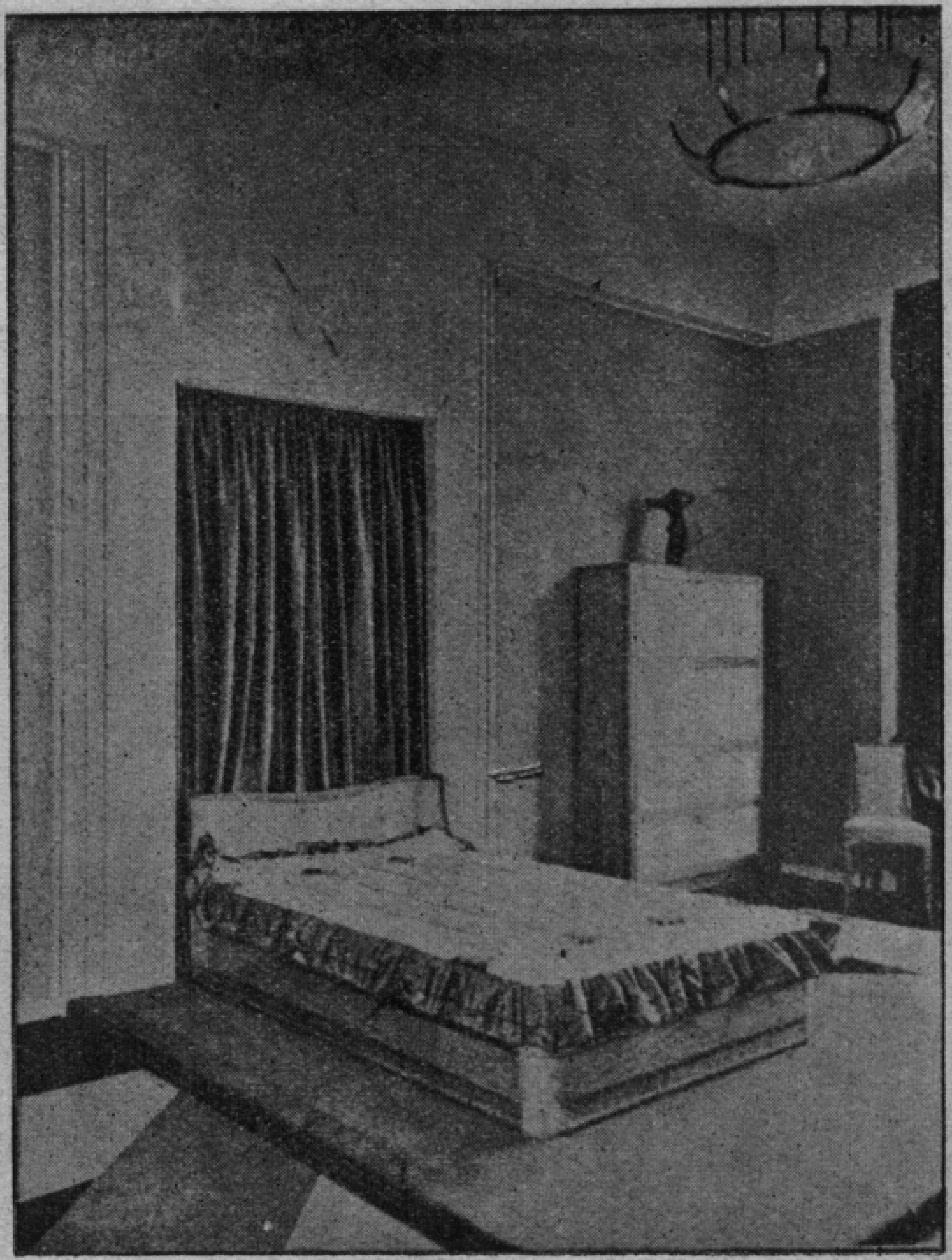

প্যারিসের ফ্রেশে ও ভেরোট-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি শয়নকক্ষ

স্থান নাই। বৈচিত্র এবং সৌন্দর্য্য খানিকটা বাদ দিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে অনেক বেশী লোককে রসভোগের সুযোগ দেওয়া হইতেছে, ইহাও কম লাভ নয়। ডেমোক্রেসীর যুগে অবশ্য ইহা অপেক্ষা বড় যুক্তি সম্ভব নয়। এর অর্থতাত্ত্বিক দিকটাই বা ভুলিলে চলিবে

কলের প্রবর্ত্তন যখন অবশ্যম্ভাবী তখন তার সৃষ্টিকে যথা সম্ভব সুন্দর করাই একমাত্র বিজ্ঞের কাজ। আমাদের রসবোধ এবং কলের ক্ষমতা এ দুই-এর সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য আধুনিকেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আবার অনেক সময় আমাদের নূতন

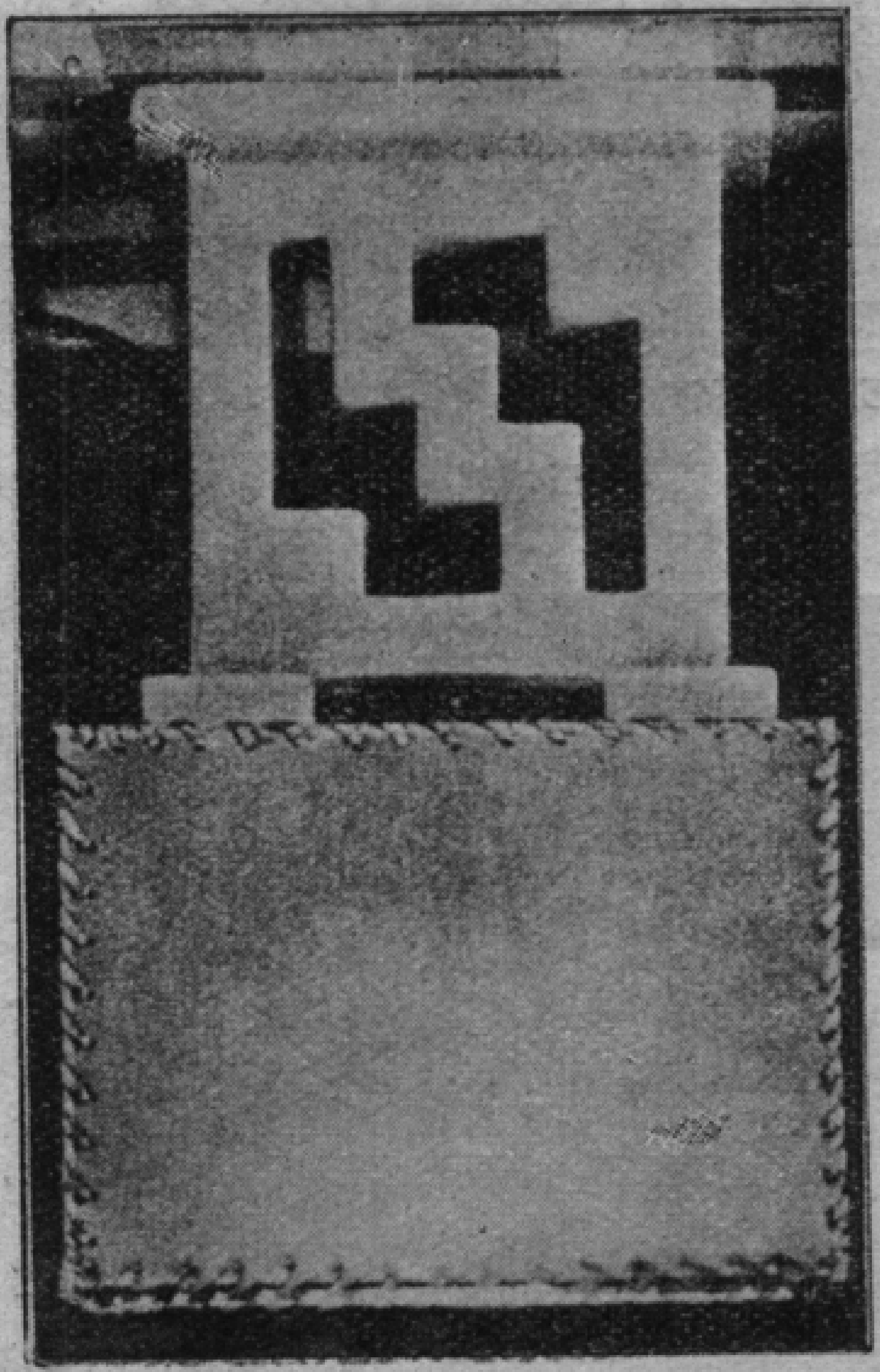

পোর্সেলেনে নির্ম্মিত তিনটি বাতি—মাঝেরটি ছাদ হইতে ঝুলাইবার ল্যাম্প, অপর দুইটি টেবিল ল্যাম্প

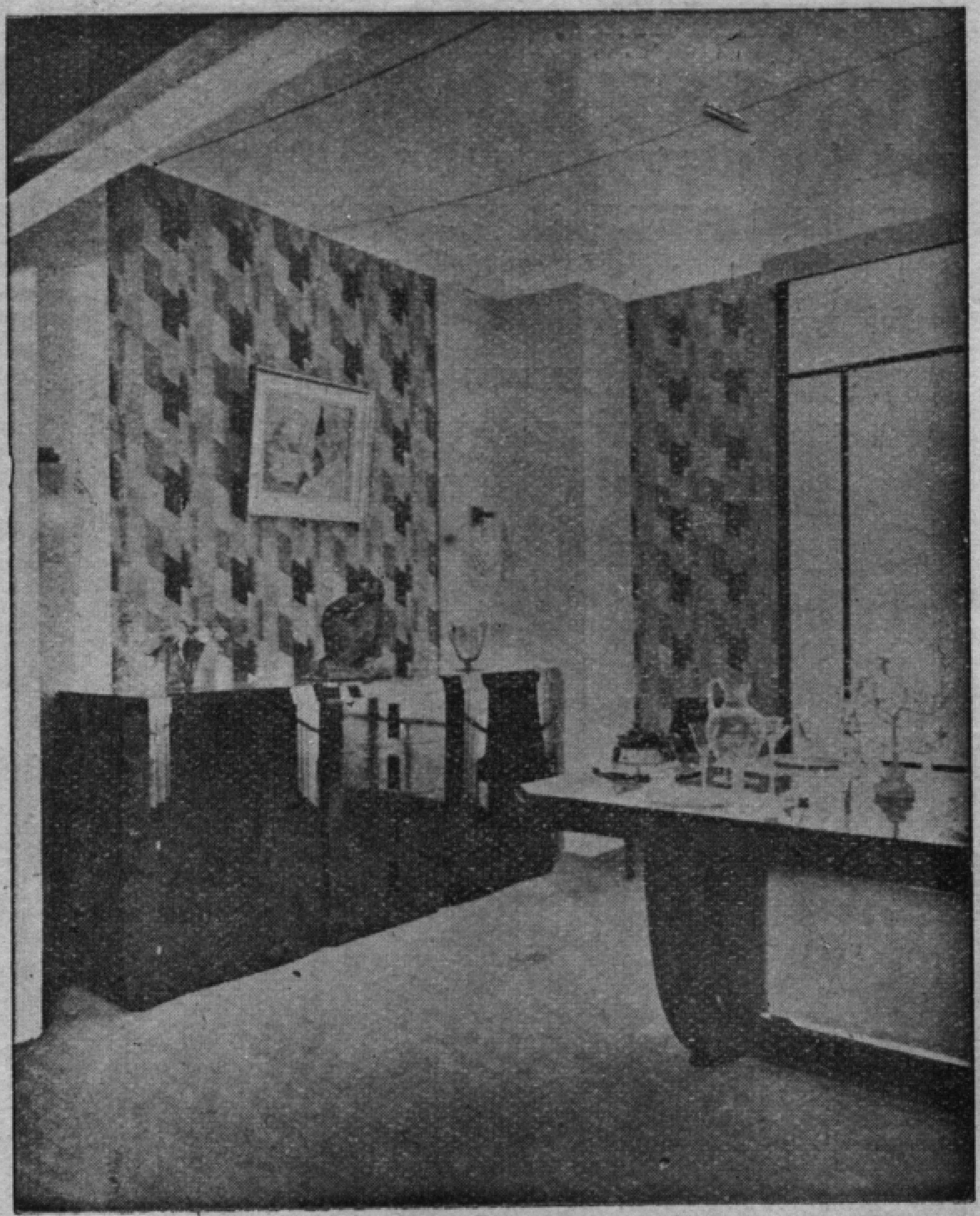

প্যারিসের 'দ্রিম' কর্ত্তৃক পরিকল্পিত একটি ডাইনিং রুম

একটি কক্ষাভ্যন্তর—এই ঘরের দেয়াল ও ঝাড়টি স্ফটিকে নির্ম্মিত

প্রয়োজনের দাবী মিটাইতে যাইয়া তাঁহাদিগকে বহু নূতন পন্থা আবিষ্কারে মন দিতে হইয়াছে।

এই নূতন শিল্পপদ্ধতির মূল কথা হইল, প্রয়োজনীয়তা ও অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য। কলের সৃষ্টি নিখুঁত, অনাবিল এবং বৈচিত্রহীন। জ্যামিতির রেখার মত সহজ, সরল এবং সম্পূর্ণ। তাই আধুনিকেরা তাঁহাদের গৃহসজ্জা রচনায় জ্যামিতির সাহায্য নিয়াছেন। কারুকার্য্যই

একমাত্র চারুশিল্প নয়, জ্যামিতির রেখার মধ্যেও আর্ট আছে; এ কথাটাই তাঁহারা তাঁহাদের গৃহসজ্জার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। অনাবশ্যককে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাদ দিতে পারিয়াছেন। আধুনিক গৃহের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে হয়ত কেহ ভিন্নমত হইতে পারেন, কিন্তু তার আড়ম্বরশূন্যতাকে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

হাতে বোনা গালিচা—টমাস বেণ্টন কর্তৃক পরিকল্পিত

আজকাল সব বড় সহরেই অত্যন্ত স্থানাভাব হইয়াছে। অধিকাংশ লোককেই অতি কম জায়গায় নিজের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইতেছে, সুতরাং এখন তাহারা আর আগের দিনের মত অনাবশ্যক আসবাবপত্রে ঘর ভর্ত্তি করিতে পারেন না, সাদাসিধার আশ্রয় তাহাদের বাধ্য হইয়া লইতে হইতেছে। আধুনিক ঘরে কয়েকখানি চেয়ার ভিন্ন বিশেষ কিছু থাকে না। আলমারী, ওয়ার্ডরোব, বুক-শেলফ, কাবোর্ড প্রভৃতি সবই দেওয়ালের মধ্যে তৈরী করা হয়। বিলাতি ঘরে ফায়ার প্লেস আগে একটা খুব জাঁকজমকের বস্তু ছিল, কিন্তু এখন ইহাকে যথাসম্ভব সাদাসিদে করা হইয়াছে। শোবার ঘর হইতে ওয়াশ-ষ্ট্যাণ্ড দূরীভূত হইয়াছে; ড্রয়িং-রুম-এর সার্থকতা ছিল উৎসব উপলক্ষে; গৃহোৎসবের অভাবে ড্রয়িংরুম লিভিং রুম-এ পরিণত হইয়াছে; ডাইনিং রুম-এর জন্য যথাসম্ভব অল্প স্থান দেওয়া হইয়াছে। ঘরের সাজসজ্জাও অতি সাধারণ

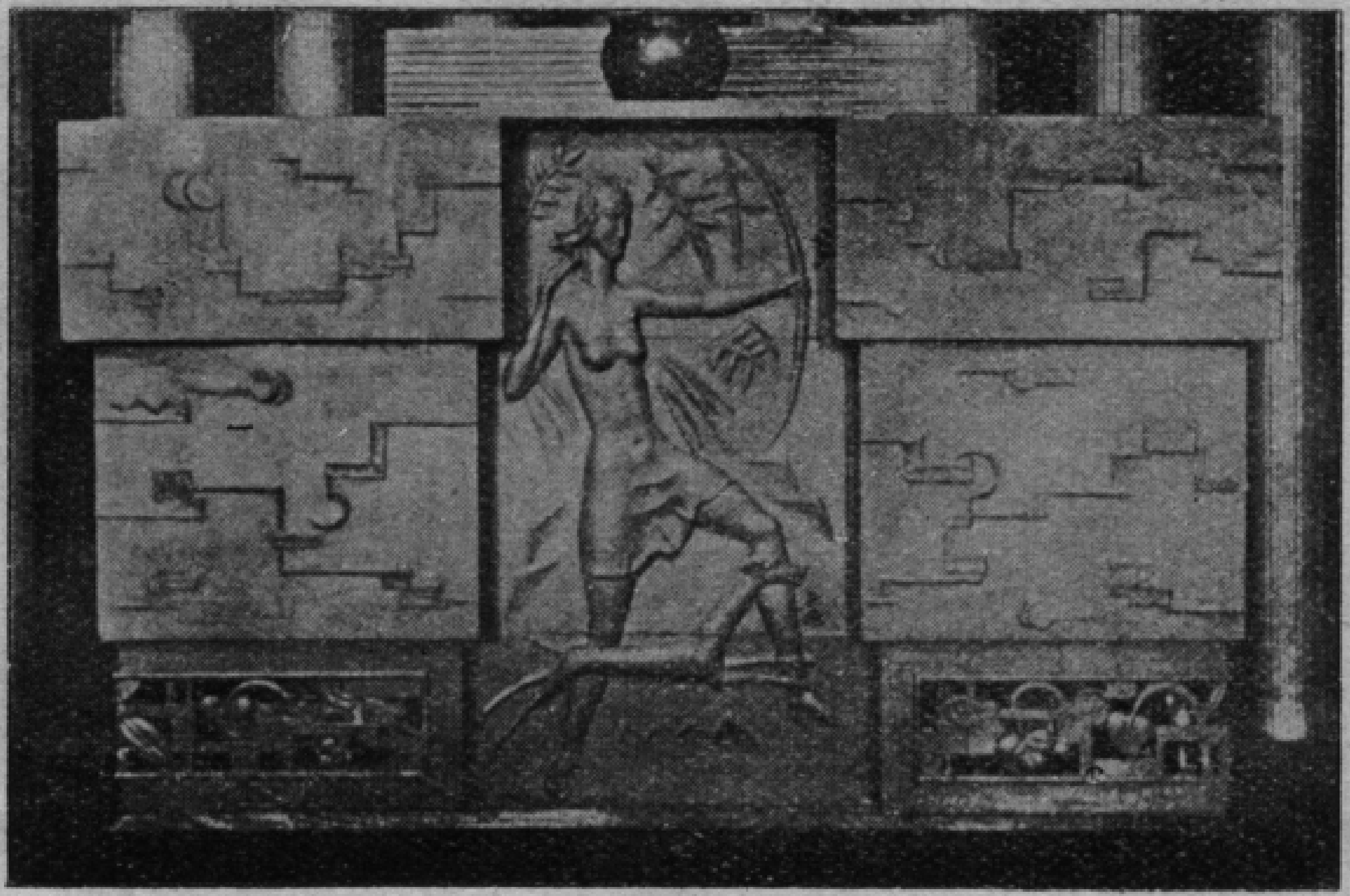

নক্সা কাটা ইটের তৈরী ফায়ার প্লেস
অষ্ট্রিয়ার ভাকবের্গেয়ার ও শাডলেয়ার কর্তৃক নির্ম্মিত

ফরাসী শিল্পীগণ সাদা দেয়ালেরই পক্ষপাতী, তবে এখনও ক্রীম প্রভৃতি পাতলা রং ব্যবহৃত হইতেছে, মেঝের কার্পেট সাধারণতঃ প্যাটার্ণ বিহীন। কিম্বা প্যাটার্ণ থাকিলেও সেগুলি সম্পূর্ণ জ্যামিতিক।

আধুনিকতার দিক হইতে ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণীই অগ্রণী। ইংলণ্ড তাহার স্বাভাবিক রক্ষণশীলতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া পুরাতন এবং আধুনিকের সমাবেশের চেষ্টায় আছে।

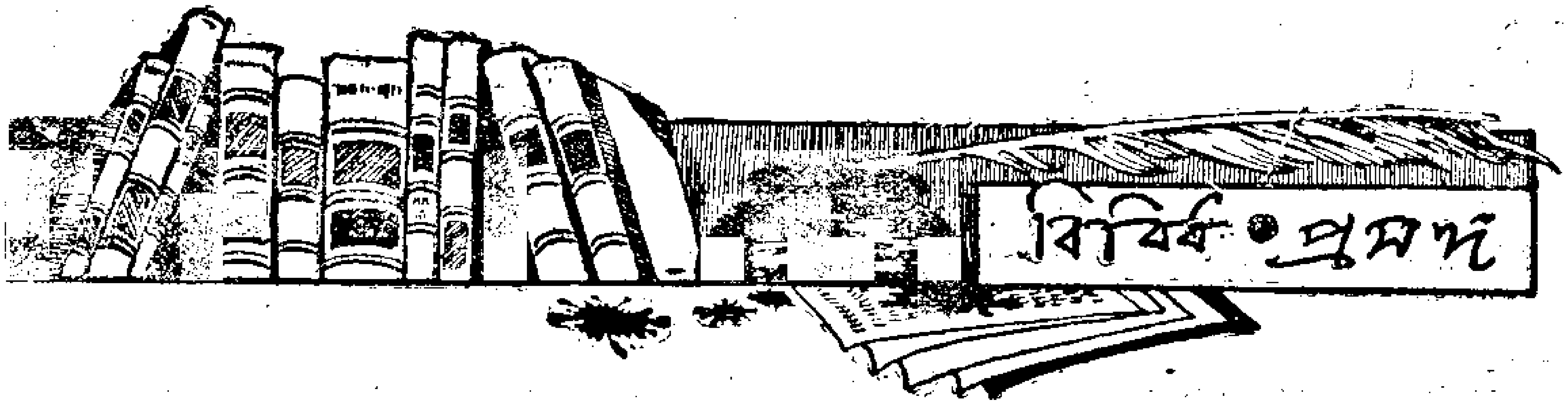

শাড়ি ও চুড়ি

ময়মনসিংহ জেলার পরলোকগত অন্যতম ভূস্বামিনী শ্রীযুক্তা জাহ্নবী চৌধুরাণী সম্বন্ধে একটা গল্প শুনিয়াছিলাম, যে, তিনি একবার তাঁহার এক প্রধান কর্ম্মচারীকে কোনও বিপৎসঙ্কুল দুঃসাহসের কাজ করিতে আদেশ করেন। কর্ম্মচারী সেই আজ্ঞা পালন করিতে ইতস্ততঃ করায় তিনি তাঁহাকে একখানা শাড়ি পাঠাইয়া দিতে আদেশ করেন এবং বলেন যে, কর্ম্মচারী মহাশয় যেন অতঃপর শাড়ি পরিয়া ঘোমটা দিয়া অন্তঃপুরে বাস করেন। কর্ম্মচারীটিকে লজ্জা দেওয়া এই আদেশের উদ্দেশ্য ছিল।

বর্ত্তমান সময়ে যে স্বরাজ লাভ প্রচেষ্টা চলিতেছে, তদুপলক্ষ্যে কোথাও কোথাও নারী-সত্যাগ্রহীরা কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে বা বেসরকারী অন্য লোকদিগকে চুড়ি উপহার পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই বেসরকারী লোকদিগের মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার মান্দ্রাজী সভ্য শ্রীযুক্ত এম্-কে আচার্য্য (তাঁহার দেশী নামটা কাগজে বাহির হয় না) এইরূপ পরিহাসের বা উপহাসের পাত্র হইয়াছিলেন। ব্যবস্থাপক সভাভবনে তাঁহাকে একদিন একটি লোক একটা মোটা সরকারী খাম দিল। তাহার উপর তাঁহার নাম লেখা ছিল। তিনি স্বরাজ্য দলের লোক, কিন্তু সভ্যপদে ইস্তফা দেন নাই। লোকে বলে, লণ্ডনের গোল টেবিলের বৈঠকে নিমন্ত্রিত হইবার আশা তিনি পোষণ করেন। মোটা সরকারী খামটা দেখিয়া হয় ত বা তিনি ভাবিয়াছিলেন, উহার ভিতর সেই নিমন্ত্রণপত্র আছে। তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখেন, তাহার ভিতর সরকারী কিছু নাই, বেসরকারী কোন ব্যক্তি তাঁহাকে চুড়ি উপহার পাঠাইয়াছে। চুড়ি পাঠাইয়া তাঁহাকে লজ্জা দেওয়া বোধ হয় কোন মহিলার বা পুরুষের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু বাস্তবিকই কি এই লোকটি বা অন্য কোনও পুরুষ নানা প্রদেশের চুড়িপরিহিতা রাজবন্দিনী বা রাজঅতিথি মহিলাদের মত আচরণ করিলে তাহা পুরুষের পক্ষে অপমানকর হইত? তাহার বিপরীত হইত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

মহিলারা এখন কোনও পুরুষজাতীয় ব্যক্তিকে লজ্জা দিবার জন্য আর শাড়ি ও চুড়ি পাঠাইবেন না;—শাড়ি ও চুড়ি পরিলেই এখন তাহা "অবলার" লক্ষণ বলিয়া নিঃসংশয়ে গৃহীত হইতে পারে না। কোনও পুরুষকে লজ্জা দিবার প্রয়োজন হইলে মহিলারা যেন অতঃপর অন্য উপায় উদ্ভাবন করেন।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার রেভারেণ্ড ডাক্তার আর্কার্টের কার্য্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল সুহ্রাওয়ার্দী ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। মুসলমানদিগের মধ্য হইতে ইনিই প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইলেন।

কোন কর্ম্মে কেহ নিযুক্ত হইয়া কিছুকাল সেই কার্য্য করিলে দেখা যায়, যে, নিতান্ত তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিরা ব্যতীত অন্যেরা তাঁহার সকল কাজের ও কথার সমর্থন করিতে পারেন না। যোগ্য অযোগ্য সকল কর্ম্মী সম্বন্ধেই ইহা প্রযোজ্য। কিন্তু কাহারও প্রত্যেকটি কাজ ও কথার সমর্থন করিতে না পারিলেই যে তাঁহার প্রশংসা করা যায় না, এমন নয়। ডাক্তার আর্কার্টের সব কথা ও কাজে আমরা সায় দিতে পারি নাই। কিন্তু ইহা বলা নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য, যে, তিনি বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত ভাইস-চ্যান্সেলারের কাজ করিয়াছেন।

তিনি গবর্ন্মেণ্টকে বা দলবিশেষকে খুশি করিবার চেষ্টা করেন নাই। অন্য দিকে, কোন পক্ষকে কড়া কথাও তিনি বলেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেসওয়ালা কোন কোন নেতা ও অনেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উপস্থিতির এবং স্কুল কলেজে ছাত্রদের উপস্থিতির বিরোধী হওয়ায় এবং পিকেটিং চলায় বাংলা দেশে প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং অন্যান্য কোন কোন প্রদেশের কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুলিশের আবির্ভাব বশতঃ মারপিট কারাদণ্ড প্রভৃতি হইয়াছে। এরূপ সঙ্কট সময়ে আর্কার্ট সাহেব ভাইস্-চ্যান্সেলার রূপে এবং নিজের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রূপে নিজের পদের মর্য্যাদা এবং বিরোধী ছাত্রদের সম্মান রক্ষা করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি ভাইস্-চ্যান্সেলার হইবার আগে হইতে এ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাভাব চলিয়া আসিতেছে। ইহার কারণ একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিবেচনা, কোন কোন ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাতিত্ব, এবং অমিতব্যয়িতা ও অপচয়; অন্যদিকে গবর্ন্মেণ্টের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যথেষ্ট অর্থ দিতে অনিচ্ছা ও অসামর্থ্য। আর্কার্ট সাহেবের আমলে যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যয়-সংক্ষেপ এবং অধ্যাপকদিগের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার হয়, তাহার চেষ্টা হইয়াছে; আবার গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতেও যথেষ্ট টাকা পাওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে ঠিক ঠিক খবর যথাসময়ে পাওয়া কঠিন। আমরা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সময়ে প্রকাশ্যভাবে মূল্য দিয়া বা না-দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন কমিটি আদির কার্য্যের রিপোর্ট পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু পাই নাই। এখনও পাই না। আর্কার্ট সাহেব সম্বন্ধে যাহা লিখিতেছি, তাহা সব কথা জানিয়া লিখিতেছি, বলিতে পারি না; যতটুকু আমাদের গোচর হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া লিখিতেছি। যাহা জানিয়াছি, তাহাতে উক্ত উভয়বিধ চেষ্টার প্রত্যেক অংশের অনুমোদন আমরা করিতে না পারিলেও এরূপ চেষ্টা হওয়াটাই প্রশংসনীয় মনে করি।

ও মিতব্যয়িতা এবং অধ্যাপকদিগের প্রতি ন্যায্য ব্যবহারের চেষ্টা, এবং অন্য দিকে গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে যথেষ্ট টাকা আদায়ের চেষ্টা যতটুকু হইয়াছে, তাহা এখনও সফল বা বিফল হয় নাই। এ অবস্থায় গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাকে আরও দুই বৎসরের জন্য ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত করিলে ভাল হইত। এরূপ পুনর্নিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নূতন হইত না। কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট অনেক সময় শিক্ষার উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভাইস্-চ্যান্সেলার নিয়োগ করেন না; কখন কখন রাজনৈতিক কারণে, কখন বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ বশতঃ নিয়োগ বা অনিয়োগ করেন। আর্কার্ট সাহেব গবর্ন্মেণ্টের অনুগ্রহভাজন হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টাকে ছাঁটিয়া খুব ছোট করিবার, ব্যয়সংক্ষেপের জন্যই উহার ব্যয়সংক্ষেপ করিবার, গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে টাকা না-চাহিবার বা খুব কম টাকা চাহিবার, এবং ছাত্রদের মনোভাব সম্বন্ধে অবুঝ হইবার ও তাহাদের প্রতি কড়া জবরদস্ত ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তির পরিচয় দেন নাই।

যে-কোন সময়েই যোগ্য কোন মুসলমানকে ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করা অনুচিত হইত না। এখন আর্কার্ট সাহেবকে পুনর্ব্বার নিযুক্ত না করিয়া একজন মুসলমানকে নিযুক্ত করিবার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এখন মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করা গবর্ন্মেণ্ট বিশেষ আবশ্যক বলিয়া অনুভব করিতেছেন। এবং বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রী মুসলমান বলিয়া তিনিও একজন মুসলমান ভাইস-চ্যান্সেলার চাহিয়া থাকিবেন। হিন্দুদের বা বিদেশী খৃষ্টিয়ানদের মধ্য হইতে এপর্য্যন্ত যাঁহারা ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই সেই সময়ে ঐ কাজের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন না। সুতরাং, এখন ডাক্তার সুহ্রাওয়ার্দী যোগ্যতম কি না, বিচার করা উচিত হইবে না। তিনি যোগ্য কি না ইহাই বিচার্য্য। এ কাজের জন্য তাঁহার সাধারণ রকমের যোগ্যতা নিশ্চয়ই আছে। তদপেক্ষা বেশী যোগ্যতা তাঁহার আছে কি না, জানি না; তাঁহার কাজ হইতে

তাঁহার নিয়োগের পর তাঁহার যে উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, তিনি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের দিকে বিশেষ করিয়া মন দিবেন। তাহার প্রয়োজন আছে। যে-সব মুসলমান নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কথা আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে গোড়াতেই ধরিয়া লয়েন যে, গবন্মেণ্ট বা হিন্দুসমাজ শিক্ষাবিষয়ে মুসলমানদের প্রতি অবিচার করিয়াছে। কোন মুসলমান ছাত্র বা শিক্ষক অধ্যাপকপদ-প্রার্থীর প্রতি কখনও অবিচার হয় নাই, বলিতে পারি না—সম্ভবতঃ অবিচার কোন কোন স্থলে হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর মুসলমান সমাজে শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার না হইবার জন্য তাঁহারাই দায়ী। বাংলা দেশে সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দুস্কুল ছাড়া আর সমুদয় সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যেমন হিন্দু-খৃষ্টিয়ান প্রভৃতির জন্য তেমনি মুসলমানের জন্যও খোলা রহিয়াছে। বেসরকারী কলেজগুলির মধ্যে বোধ হয় একমাত্র বিদ্যাসাগর কলেজে মুসলমান ছাত্র লওয়া হয় না। আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। বঙ্গের অধিকাংশ বেসরকারী স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হিন্দুরা। মুসলমান সমাজ যদি শিক্ষার বিস্তার চান, তাহা হইলে কেবল অন্যের সৃষ্ট ও প্রদত্ত সুবিধা ভোগ করিবার জন্য আগ্রহ দেখাইলে চলিবে না, আপনাদিগকে ঐরূপ সুবিধার সৃষ্টি করিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেসরকারী যত টাকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তই হিন্দু এবং কিছু খৃষ্টিয়ানের দেওয়া। তাহার মোট পরিমাণ অনেক লক্ষ টাকা; মুসলমানদের দানের পরিমাণ সামান্য কয়েক হাজার টাকা মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জড় বিত্ত ও মানসিক বিত্ত পাইবার ইচ্ছা করা মুসলমানদের পক্ষে স্বাভাবিক। উহাকে কিছু দিবার প্রবৃত্তিও স্বাভাবিক হওয়া উচিত। কারণ মুসলমানেরা সবাই দরিদ্র ও মূর্খ নহেন।

ডাঃ সুহ্রাওয়ার্দী যখন স্বসাম্প্রদায়িক হিতসাধনের চেষ্টা করিবেন, তখন মুসলমানদিগকে এই-সকল কথা স্মরণ করাইয়া দিলে তাঁহাদের উপকার হইতে পারে।

—

জাপানীদের উদ্যোগিতা

আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জের নিকটস্থ সমুদ্রে এক রকমের শামুক বা ঝিনুক পাওয়া যায়। সিঙ্গাপুর হইতে প্রতিবৎসর ছোট ছোট জাহাজে করিয়া অনেক জাপানী ডুবুরী আসিয়া এই সব ঝিনুক তুলিয়া বহু লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া আসিতেছে। ঝিনুক হইতে বোতাম হয়, কাঠের বাক্সের উপর নক্সা, কাল পাথরের উপর নক্সা প্রভৃতি শিল্পকার্য্য হয়। ভারতবর্ষেও এই সব কাজ হয়। আণ্ডামান জাপান অপেক্ষা বঙ্গের, ভারতবর্ষের, অনেক নিকটে। কিন্তু অর্থাগমের এই পথটি জাপানীরা আবিষ্কার করিয়াছে, বাঙালী বা অন্য ভারতীয়েরা করে নাই। এত দিন ভারত-গবন্মেণ্ট জাপানী ডুবুরীদের নিকট হইতে ট্যাক্স লইতেন না; অতঃপর লইবেন।

—

বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী

কোন যুগে কোন দেশের প্রত্যেক নারী "অবলা" ছিলেন না। ভারতবর্ষেরও প্রত্যেক নারী কোন যুগে "অবলা" ছিলেন না। বর্ত্তমান সময়ে সকল প্রদেশের অনেক মহিলা সাহস ও শক্তির পরিচয় দিতেছেন। অধিকাংশ স্থলে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য তাঁহাদের সাহস ও শক্তি প্রযুক্ত হইতেছে। বাংলা দেশে নারীদের সাহস ও শক্তির এইরূপ ব্যবহার ছাড়া অন্যরূপ ব্যবহারেরও প্রয়োজন আছে, দুঃখ ও লজ্জার সহিত ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। বঙ্গে যত জায়গায় যত দুর্বৃত্ত নারীদের উপর অত্যাচার করিতে চেষ্টা করে এবং অনেক স্থলে সফলকাম হয়, তাহার সবগুলার বৃত্তান্ত প্রকাশ পায় না; কিন্তু খবরের কাগজে যতগুলার খবর বাহির হয়, তাহার সংখ্যাও ভয়াবহ ও লজ্জাকর। পুরুষ ও নারী সকলে মিলিয়া দুর্বৃত্তদের এই পৈশাচিক কার্য্যে বাধা দেওয়া উচিত। নারীরা আত্মরক্ষার্থ দুষ্টলোকদের প্রাণবধ পর্য্যন্ত করিলেও তাহা অধর্ম্ম ত নহেই, বে-আইনী কাজও নহে; বরং ধর্ম্মরক্ষার জন্য উহা আবশ্যক।

—

চব্বিশ পরগণা জেলার মহেশপুকুর গ্রামের শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দাসীর স্বামীর অনুপস্থিতিকালে এক দুর্ব্বৃত্ত তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে চেষ্টা করে। তিনি আত্মরক্ষার্থ তাহাকে দা'য়ের দ্বারা আঘাত করেন। তাহাতে লোকটা মারা যায়। আলিপুরে মাতঙ্গিনীর বিচার হয়। বিচারক তাঁহাকে খালাস দেন এবং তাঁহার সাহস ও সতীত্বের প্রশংসা করেন।

রংপুরের শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বর্ম্মা ঐ জেলার যে-সব ক্ষত্রিয় রমণী এইরূপে আত্মরক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের ছবি ও বীরত্বকাহিনী সংগ্রহ ও কিছু কিছু মুদ্রিত করিয়াছেন। সকল জেলায় এইরূপ বীরত্বের ইতিহাস সংগৃহীত হওয়া উচিত।

—

ঢাকায় অজিতনাথ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু

ঢাকায় অজিতনাথ ভট্টাচার্য্য নামক একটি ছাত্রের শোকাবহ মৃত্যুর যেরূপ সংবাদ এসোসিয়েটেড্ প্রেস দৈনিক কাগজে প্রেরণ করেন, অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে তাহা নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সামান্য দু' একটি ভুল সংশোধন করিয়া দিয়াছি।

(Associated Press of India.)
Dacca, July 22.

While a number of volunteers, including ladies, was picketing at the Dacca Intermediate College yesterday, the Superintendent of Police, with a posse of men, charged them, as a result of which some of the volunteers, including a passer-by, sustained serious injuries.

It is reported that the volunteers picketed yesterday morning and prevented the students from entering the college building. Mr. S. N. Maitra, the Principal, it is understood, tried his best to induce the volunteers to leave the gate, but was unsuccessful. The Superintendent of Police, with a number of men, appeared and charged the young volunteers and the crowd of students who had gathered round them. At this the students began to run away in all directions, but the police, it is alleged, chased them and assaulted some of them in the compound of the Dacca University which they entered. A man who happened to pass by the road at the time on a bicycle was also attacked and assaulted, with the result that he fell unconscious, and his bicycle was taken away by the police.

It is understood that a young student who passed the I. A. examination this year from the Jagannath Intermediate College [and stood 14th in order of merit and 1st in Logic], went to the Dacca University yesterday for admission, died last night as a result of assault alleged to have been committed upon him during the disturbance.

এই ঘটনার আরও অধিক বিস্তারিত এবং নির্ভুল বৃত্তান্ত আমরা পাইয়াছি। কাগজে দেখিয়াছি, মৃত ছাত্রটির ভ্রাতা পুলিসের নামে মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন, এবং পুলিস স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নামে মোকদ্দমা করিবার জন্য গবর্ন্মেণ্টের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাহা হইলে হয়ত এত দিনে ব্যাপারটি বিচারাধীন হইয়াছে। এই জন্য আমাদের প্রাপ্ত বৃত্তান্তের অধিকাংশ এখন ছাপা চলে না।

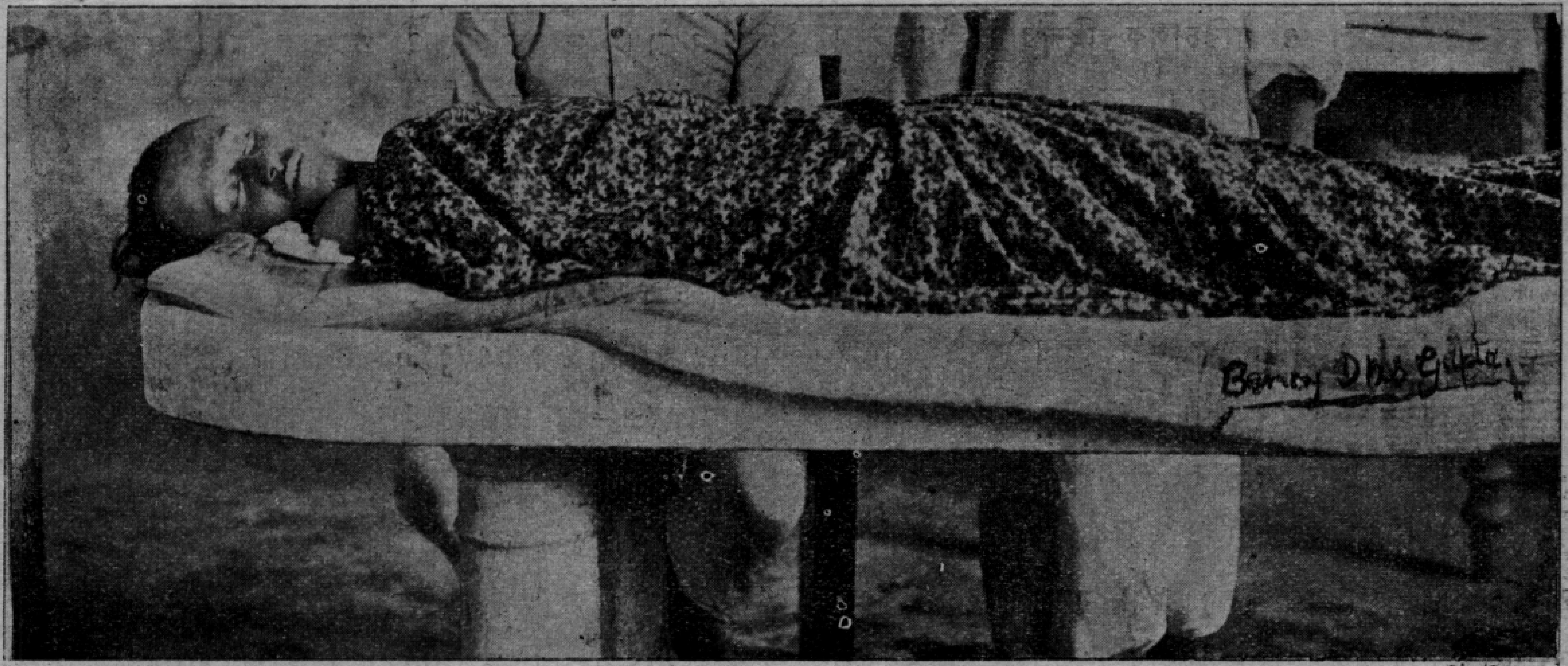

অজিতনাথ ভট্টাচার্য্য

ম্যাজিষ্ট্রেট যে তদন্ত করিতেছেন, তাহার ফলও এখনও বাহির হয় নাই।

আমরা যে বৃত্তান্ত পাইয়াছি, তাহার কোন কোন অংশ প্রকাশে বোধ করি কোন বাধা নাই।

"গত সোমবার, ২১শে জুলাই ইউনিভার্সিটিতে ও ঢাকা ইণ্টারমীডিয়েট কলেজের সামনে ছাত্রদের পিকেটিং হচ্ছিল। সেই সময় ঢাকার পূর্ত্তবিভাগের স্থপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার নাকি পুলিসে খবর দেন, যে, ছেলেরা গাছপালা ভেঙে ফরেস্ট ল' (অরণ্য-সম্পর্কীয় আইন) ভঙ্গ করছে। পুলিস স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইউরোপীয়ান সার্জ্জেণ্ট এবং হিন্দুস্থানী ও পাঠান কন্‌ষ্টেবল নিয়ে উপস্থিত হন। তারা এলে, পুলিস পিকেটারদের কি করে দেখবার জন্য ইউনিভার্সিটির বহু ছাত্র ইউনিভার্সিটির হাতায় জড় হয়। তাতে পুলিস্ সাহেব ক্রাউড্ ডিস্পার্স্ (জনতাকে বিতাড়িত কর্‌বার হুকুম দেয়…… ..।"

আমাদের পত্রলেখক ঘটনাটির উৎপত্তি যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে যদি কোন ভ্রম না থাকে, তাহা হইলে লোকের সহজেই মনে হইতে পারে, ঢাকা শহর, বিশেষ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অরণ্য সমাকীর্ণ। একদিন এই ঘটনাটি সম্বন্ধে ঢাকার স্থানবিশেষে আলোচনা চলিতেছিল। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঢাকায় অরণ্য কোথায়?" তাহার উত্তরে আলোচনা স্থলে উপস্থিত একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলিলেন, "দেশভরাই তো অরণ্য, আর আমরা অরণ্যে রোদন কর্‌ছি!"

যাহা হউক, শুনা যাইতেছে, যে, পুলিসও না কি এখন আবিষ্কার করিয়াছে, যে, ঢাকায় অরণ্য-আইন খাটে না। সম্যক্ গবেষণা করিলে সম্ভবতঃ কালক্রমে ইহাও আবিষ্কৃত হইতে পারিবে, যে, ঢাকা শহরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অরণ্য নাই।

অজিতনাথের মৃত্যু ও দাহ কি প্রকারে হইল, তাহার বৃত্তান্ত আমাদের প্রাপ্ত পত্রে এইরূপ আছে :—

প্রহারের চোটে "তার সংজ্ঞা লুপ্ত হয়, রক্তবমন হয়," কয়েকজন ডাক্তার তার চিকিৎসা করেন। "সিবিল-সার্জ্জন তাকে হাঁসপাতালে পাঠাতে বলেন, তার ইত্যাদি— মাথায় অপারেশ্যন করা দরকার। বেলা ১॥ টার সময় সে মার খায়; রাত্রি ১০টার সময় হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতে পথে তার মৃত্যু হয়। গত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় তাদের গ্রামের বাড়ী পুড়ে গেছে, দ্রব্যাদি লুট হয়েছে। এখন ছেলেটি মারা গেল। ঢাকার হিন্দু-মুসলমান সমস্ত ছাত্র এই নির্দ্দোষী বলি বালককে দাহ কর্‌তে শ্মশানঘাটে যাবে ব'লে প্রস্তত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট শব নিয়ে প্রোসেশ্যন করতে দেন নি। তখন ছেলেটির মা ভাই বোন বলেন, ছেলেটির জন্য এত লোক যখন শোক কর্‌ছে, তখন তার তর্পণ ও সৎকার হ'য়ে গেছে; তাঁরা নিহত বালকের সৎকার পুলিসের সাহায্যে করবেন না। তাঁরা হাসপাতালে শব রেখে গ্রামে চ'লে গেছেন। পুলিস ব্রাহ্মণ কন্‌ষ্টেবল দিয়ে শব দাহ করিয়েছে।"

"এই ছাত্রের অপঘাত মৃত্যুর জন্য ইউনিভার্সিটি এক দিন বন্ধ করা হয়। গবন্মেণ্ট স্কুল কলেজ ছাড়া আর সব স্কুল কলেজের ছাত্রেরা হড়তাল করে। ইউনিভার্সিটির হিন্দু মুসলমান ছাত্ররা একমত হ'য়ে সাত দিন ক্লাসে গিয়ে পড়াশুনা করা স্থগিত রাখ্‌বে স্থির করেছে।"

"নিহত ছেলেটির মৃত্যুর পর শবপরীক্ষায় না কি দেখা গেছে, যে, লাঠির চোটে মাথার খুলি ফেটে খুলে গিয়েছিল যদিও বাহিরের চামড়া ফাটে নি; চামড়া কাটবামাত্র খুলিটা খুলে পড়ে; মস্তিষ্কে পেটে রক্তপাত হয়েছিল। ইউনিভার্সিটির ছাত্রেরা এই অপরিচিত ছাত্রটির যে সেবাশুশ্রূষা করেছে, তা চমৎকার। সকলে নিজের ভাইয়ের মতন তো তার মাথায় আইস্-ব্যাগ দিয়েইছে এবং বরফ কিনে এনেছে, অধিকন্তু বমি হাতে ক'রে ধ'রে পরিষ্কার করেছে এবং মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত তার সঙ্গে থেকেছে।"

এই মর্ম্মান্তিক শোকাবহ ঘটনাটির বৃত্তান্তের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের ঐকমত্য হইতে মনে কিছু সান্ত্বনা পাওয়া যায়। [২৩শে শ্রাবণ লিখিত।]

বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনে পল্লীসেবক-শিক্ষণের ব্যবস্থা

আগামী পূজাবকাশের মধ্যে ৯ই অক্টোবর হইতে ৪ঠা নভেম্বর পর্য্যন্ত (২২শে আশ্বিন হইতে ১৮ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত) বিশ্বভারতীর পল্লী সেবা বিভাগের তত্ত্বাবধানে পল্লীসেবকদিগের শিক্ষার জন্য শ্রীনিকেতনে একটি 'শিক্ষা-শিবির' পরিচালনা করা হইবে। শিক্ষার্থীদিগকে বিশেষ অভিজ্ঞদিগের দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। (১) পল্লীসমস্যা ও পল্লী-সংগঠন, (২) কুটীর-শিল্প, (বয়ন ও রংয়ের কাজ), (৩) ব্রতী সংগঠন, (৪) পল্লী-স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা, (৫) প্রাথমিক কৃষি।

গত ছয় বৎসর হইতে নিয়মিতরূপে 'শিক্ষা শিবিরের' কার্য্য পরিচালনা করা হইতেছে। শিক্ষা শিবিরে এ-যাবৎ মোট ১২২ জন কর্ম্মী শিক্ষা লাভ করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে পল্লী-সংগঠন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। শিক্ষা-কালে শিক্ষার্থীদিগকে নিম্নলিখিত ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। প্রবেশিকা ফি = ১৲; আহার্য্য বাবদ ১৫৲ ও কুটির-শিল্প বাবদ = ৩৲ ; মোট = ১৯৲

যাঁহারা এই 'শিক্ষা শিবিরে' শিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে ১লা অক্টোবরের পূর্ব্বে প্রবেশিকা ফি সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে :—সম্পাদক, পল্লীসেবা-বিভাগ, শ্রীনিকেতন, পোঃ—সুরুল, জেলা বীরভূম।

—

বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিল

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বঙ্গের গ্রাম সমূহে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য দুটি বিল প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু কোনটিই আইনে পরিণত হয় নাই। এবার শিক্ষা-মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের আমলে তৃতীয় বিল প্রস্তুত হইয়াছে। আগের দুটি বিলের আলোচনা উপলক্ষ্যে আমরা বার বার বঙ্গে আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। বর্ত্তমান বিলটির আলোচনা উপলক্ষ্যে তাহার প্রধান কয়েকটি কথার পুনরুল্লেখ করিতেছি।

ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির মধ্যে বঙ্গের লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী, এবং বাংলা দেশ হইতে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা পাইয়া থাকেন। কোন্ ট্যাক্সের টাকা ভারত-গবর্ন্মেণ্ট লইবেন, এবং কোন্‌টির টাকা প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট লইবেন, সে বিষয়ে কোন প্রাকৃতিক নিয়ম নাই। এবিষয়ের সব নিয়ম কৃত্রিম। ভারতবর্ষে যে নিয়ম চালান হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল এবং সর্ব্বাধিক রাজস্বদাতা বঙ্গদেশ বড় বড় প্রদেশগুলির মধ্যে সব চেয়ে কম টাকা নিজের সরকারী খরচের জন্য পায়। যদি বাংলা দেশ অন্যান্য বড় প্রদেশের তুলনায় নিজের লোকসংখ্যা ও আদায়ী রাজস্বের অনুপাতে সরকারী খরচের টাকা পাইত, তাহা হইলে শিক্ষার জন্য নূতন ট্যাক্স বসাইবার কথা উঠিতে পারিত না। পাট বঙ্গের একচেটিয়া ফসল। যদি অন্ততঃ পাট শুল্ক হইতে প্রাপ্ত বার্ষিক চারি কোটি টাকা বঙ্গদেশ পাইত, তাহা হইলে তাহা হইতেই আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারিত। কিন্তু তাহাও ভারত-গবর্ন্মেণ্ট লইয়া থাকেন, বাংলা দেশকে দেন না। বাংলার টাকার অধিকাংশ ভারত-গবর্ন্মেণ্ট লওয়ায় বাংলা-সরকার দরিদ্র। সুতরাং এই কৃত্রিম দারিদ্র্য বশতঃ শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নূতন ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যেক বিলে করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবে আমরা সম্মত নহি। ইহা আমরা অন্যায় মনে করি।

বাংলা-সরকার যে কম টাকা পান তাহার উত্তরে বলা হইয়া থাকে, বঙ্গে জমীর খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় গবর্ন্মেণ্ট অন্য অনেক প্রদেশ হইতে জমীর খাজনা যত পান, বাংলা দেশ হইতে তত পান না ; সুতরাং জমীর খাজনা প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের প্রাপ্য একটি ট্যাক্স বলিয়া, বাংলা-সরকার উহা হইতে কম টাকা পান ও তজ্জন্য বঙ্গের মোট সরকারী আয় কম হয়। কিন্তু এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলা দেশের লোকেরা করে নাই, ভারত-গবর্ন্মেণ্ট এক সময়ে বঙ্গে জমীর

খাজনা আদায় দুঃসাধ্য দেখিয়া নিজের গরজে কতকগুলি লোককে জমীদার করিয়া তাহাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। এই জমীদারেরা এই বন্দোবস্তে লাভবান্ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সাধারণতঃ দেশের স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিক্ষার উন্নতির জন্য সেই লাভ বা তাহার কতক অংশ ব্যয় করেন না, সামান্য এক আধ জন করেন। সুতরাং তাঁহারা লাভবান্ হওয়ায় বঙ্গের স্বাস্থ্যরক্ষা, কৃষির উন্নতি ও শিক্ষাবিস্তারের সমস্যার সমাধান হয় নাই। এতএব, জমীর খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে বলিয়া বাংলা দেশকে এত কাল সার্ব্বজনিক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিয়া এখন তাহার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত নূতন ট্যাক্স বসাইতে চাওয়া অন্যায় ও অযৌক্তিক।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য বঙ্গে জমীর খাজনা আদায় কম হইলেও অন্যান্য অনেক বাবতে খুব রাজস্ব আদায় হয়। তাহাও সমস্ত বা তাহারও খুব বেশী অংশ ভারত-সরকার আত্মসাৎ করেন; যেমন পাটের শুল্ক, ইন্‌কাম্-ট্যাক্স ইত্যাদি। তাহা না করিলে নূতন ট্যাক্স না বসাইয়াও বঙ্গে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইত।

এই সব কারণে আমরা নূতন ট্যাক্সের প্রতিবাদ করিতেছি।

দ্বিতীয় আপত্তি এই, যে, লোকেরা নূতন ট্যাক্স দিতে বাধ্য হইবে, কিন্তু কর্ত্তৃত্ব করিবেন আমলাতন্ত্র। তদ্দ্বারা তাঁহারা বালক-বালিকাদিগকে শৈশব হইতে এরূপ শিক্ষা দেওয়াইতে পারিবেন যাহাতে তাহাদের মন ব্রিটিশ-প্রভুত্বের ও ভারতীয় অধীনতার অনুকূল হয়। এরূপ শিক্ষা অনিষ্টকর ও অবাঞ্ছনীয়।

এখন দেখা যাক্ কতগুলি বালক-বালিকার শিক্ষার জন্য এই বিলে ব্যবস্থা করা হইতেছে।

ব্রিটিশ-শাসিত বঙ্গের লোকসংখ্যা ৪,৬৬,৯৫,৫৩৬। বাংলা দেশ গ্রামপ্রধান। পাঁচ হাজারের কম অধিবাসী-বিশিষ্ট ১৮টি স্থানকেও শহর বলিয়া গণনা করিয়াও বঙ্গের শহরগুলিতে মোট ৩২,১১,৩০৪ জন লোক বাস করে। শিক্ষার ব্যবস্থা এই বিলটির দ্বারা করিতে হইবে, ধরিয়া লইলে হিসাবে বিশেষ কিছু ভুল হইবে না।

শিক্ষামন্ত্রী রোটারী ক্লাবে তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, এই বিল ২৭ লক্ষ বালকের এবং ১০ লক্ষ বালিকার, মোট ৩৭ লক্ষ বালক-বালিকার, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রণীত হইয়াছে। এখন বালক অপেক্ষা খুব কম সংখ্যক বালিকা শিক্ষা পায় বটে; কিন্তু নূতন ট্যাক্স বসাইয়া শিক্ষাবিস্তারের বেলাতেও সব বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা না-করা অন্যায়। প্রথম প্রথম সব বালিকা আসিবে না, সত্য, কিন্তু ব্যবস্থা করিবার সময় এমন ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়, যাহাতে সব বালিকা পাঠশালায় আসিলেও স্থান সঙ্কুলান হয়।

শিক্ষামন্ত্রী রোটারী ক্লাবের বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

"If the Bengal Primary Education Bill is enacted into law, within seven years every boy in Bengal between the ages of six and eleven will be attending a primary school."

"যদি বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিল আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে সাত বৎসরের মধ্যে ছয় হইতে এগার বৎসর বয়স্ক বঙ্গের প্রত্যেক বালক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইবে।"

ইহাদের সংখ্যা তিনি ২৭ লক্ষ ধরিয়াছেন, এবং বালিকাদের সংখ্যা ১০ লক্ষ; মোট ৩৭ লক্ষ। এই সংখ্যাগুলি কম ধরা হইয়াছে।

৬ হইতে ১১ বৎসর বয়সের কত ছেলেমেয়ে বঙ্গে আছে সেন্সস্ রিপোর্টে তাহা আলাদা করিয়া লেখা নাই, ৫ হইতে ১০ বৎসরের ছেলেমেয়ের সংখ্যা দেওয়া আছে। শেষোক্তদের সংখ্যা ও প্রথমোক্তদের সংখ্যায় বেশী তফাৎ হইবার কথা নয়। ১৯২১ সালের সেন্সস্ অনুসারে ৫ হইতে ১০ বৎসরের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ৭৪,৮৮,২১৮; ছেলে ৩৮,০১,৫৪২, এবং মেয়ে ৩৬,৮৬,৬৭৬। অতএব শিক্ষামন্ত্রী প্রায় ৭৫ লক্ষ বালক-বালিকার মধ্যে কেবল ৩৭ লক্ষের অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেকের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছেন। শুধু বালকদিগকে ধরিলেও তিনি ৩৮ লক্ষের মধ্যে কেবল ২৭ লক্ষের জন্য বন্দোবস্ত করিতেছেন। প্রায় ৩৭ লক্ষ বালিকার মধ্যে কেবল ১০ লক্ষের জন্য ব্যবস্থা

প্রত্যেক বালক স্কুলে যাইতে পারিবে, বলাটা ঠিক হয় নাই।

আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা এইরূপ :—শিক্ষামন্ত্রী বলিতেছেন মোট ব্যয় ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা হইবে। নূতন ট্যাক্স হইতে ১ কোটি ১০ লক্ষ উঠিবে, এবং বর্ত্তমানে বাংলা-সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে ২২ লক্ষ টাকা দেন তাহা দিতে থাকিবেন। ইহা প্রভূত দয়া! তাহার উপর এই দয়াও সরকার করিবেন, যে, স্কুল পরিদর্শন এবং শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যয়ও এখনকার মত প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে নির্ব্বাহিত হইবে।

—

ইঙ্গভারতীয় কন্‌ফারেন্সের বিলাতী সভ্য

শ্রাবণের প্রবাসীতে আমরা গোল টেবিল বৈঠকের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছি, যে, লণ্ডনের ইঙ্গভারতীয় কন্‌ফারেন্সটিকে গোল টেবিল বৈঠক বলা যাইতে পারে না। ঐ কন্‌ফারেন্সের বিলাতী সভ্য বর্ত্তমান বিলাতী গবর্ন্মেণ্ট নামধেয় ব্যক্তিদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন, বড়লাট তাঁহার ৩১শে অক্টোবর—১লা নবেম্বরের ঘোষণায় এইরূপ বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জুলাই মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার দুই শাখার সম্মিলিত অধিবেশনে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে গোল টেবিল বৈঠকটিকে "a joint assembly of the representatives of both countries" ("ব্রিটেন ও ভারতবর্ষ উভয় দেশের প্রতিনিধিদের মিলিত সভা") বলিয়াছেন। তাঁহার দুই সময়ের দুই উক্তিতে গরমিল দেখা যাইতেছে। এরূপ কেন হইল?

বড়লাটের শেষোক্ত বক্তৃতার পর বিলাতের রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের নেতারা দাবী করেন, যে, বৈঠকে তাঁহাদের দুই দলের প্রতিনিধিদিগকেও যোগ দিবার অধিকার দিতে হইবে। বর্ত্তমান শ্রমিক গবর্ন্মেণ্টের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ইহাতে সম্মত হইয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, বড়লাট যখন জুলাই মাসে ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতায় পূর্ব্বোক্ত কথা বলিয়াছিলেন, তখন কি তিনি জানিতেন, যে, রক্ষণশীল ও উদারনৈতিকরা পূর্ব্বোক্ত দাবী করিবে এবং মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাহাতে রাজী হইবেন? জানিতেন না, মনে হয় না। কারণ বড়লাট গুরুতর সব বিষয়ে যাহা কিছু বলেন করেন, ভারতসচিব ও প্রধান-মন্ত্রীর সম্মতিক্রমেই করিয়া থাকেন। তাহা হইলে বলিতে হয়, যে, উদারনৈতিক ও রক্ষণশীলদের দাবী, এবং কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, প্রধানমন্ত্রীর তাহাতে সম্মতিদান—এসমস্তই আগে হইতে বন্দোবস্ত করা অভিনয়। এবং ইহাও বলিতে হয়, যে, সরলতার সুখ্যাতিমান্ বড়লাট এ বিষয়ে যাহা জানিতেন তাহা খুলিয়া বলিবার ইচ্ছা না থাকাতেই "উভয় দেশের প্রতিনিধিদের" ("representatives of both countries") কথাগুলির অর্থ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন নাই।

বৈঠকে সব ব্রিটিশদলের প্রতিনিধি না থাকিয়া কেবল শ্রমিকদলের প্রতিনিধি থাকিলেই যে আমরা স্বরাজ পাইতাম, এরূপ অনুমান করিতেছি না। কিন্তু রক্ষণশীল ও উদারনৈতিকদের প্রতিনিধিরা থাকায় আমাদের অসুবিধা নিশ্চয়ই হইবে বলিতে পারা যায়। কারণ ঐ দুই দলের নেতারা, যাহাতে সাইমন রিপোর্টের ব্যতিক্রম না হয়, তাহার চেষ্টা খুব করিতেছেন; এবং ঐ রিপোর্ট যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় গতি উন্নতির পথে না চালাইয়া পশ্চাৎদিকে চালাইবার প্রস্তাব করিয়াছে, তাহা সুবিদিত। ঐ দুই দলের লোক বৈঠকে থাকায় শ্রমিক গবর্ন্মেণ্টেরও সুবিধা হইতে পারে। তাঁহারা যে বাস্তবিক ভারতবর্ষকে আত্মশাসন অধিকার দিতে চান, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তাঁহারা বাস্তবিক যদি স্বরাজ দিতে অনিচ্ছুক, তাহা হইলে না-দেওয়ার দোষটা এখন রক্ষণশীল ও উদারনৈতিকদের ঘাড়ে চাপাইতে পারিবেন;—বলিবেন, "তাহাদের মত হইল না, আমরা একা কি করিব?"

বর্ত্তমান শ্রমিক গবর্ন্মেণ্ট ব্রিটেন সম্বন্ধে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে যে-সব গুরুতর বিষয়ে নিজেদের কর্ত্তব্য করিতেছেন, তাহার জন্য রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সহিত কোন পরামর্শ করেন নাই। অন্যান্য দলের গবর্ন্মেণ্টও নিজেদের দায়িত্বে সব কাজ করিয়া থাকেন। অতীতে যখন কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা ও আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বশাসন অধিকার দেওয়া হয়, তাহার পূর্ব্বেও সেই সেই সময়কার ব্রিটিশ কোন দলের

গবর্ন্মেণ্ট অন্য দলগুলির সহিত কন্‌ফারেন্স করেন নাই,—যাহা করিয়াছেন নিজ নিজ দায়িত্বে করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বেলায় এই সব রীতির ব্যতিক্রম করা হইতেছে। ইহার অর্থ বুঝিবার এবং কারণ অনুমান করিবার সামর্থ্য ভারতবাসীদের আছে।

বিলাতের ডেলী মেল একটা প্রধান ভারতশত্রু কাগজ। তাহাতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, যে, কানাডা প্রভৃতি ডোমিনিয়নগুলির প্রতিনিধিসমূহকেও ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, পঞ্চকোণ, ষট্‌কোণ, বা সপ্তকোণ,······টেবিল বৈঠকে যোগ দিবার নিমিত্ত আহ্বান করা হউক। কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি ডোমিনিয়নগুলা ভারতীয়দের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে এবং ভারতীয়দের সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা কিরূপ নীচ, তাহা জানা কথা। তাহাদের প্রতিনিধিদিগকে বৈঠকে স্থান দিবার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য, যত বেশী সম্ভব ভারতশত্রু বৈঠকে একত্র করা। প্রস্তাবের মধ্যে এই অপমানকর ধারণাও উহ্য আছে, যে, অশ্বেত ভারতীয়েরা শুধু ব্রিটেনের নহে, শ্বেত ডোমীনিয়নগুলারও দাস এবং সেইজন্য ভারতের ভাগ্যনির্ণয় করিতে হইলে ডোমীনিয়নগুলার সহিতও পরামর্শ করা দরকার।

সাইমনের আমেরিকা-যাত্রা

ভারতীয়দের নানা প্রকার নিন্দা প্রচার, ভারতবর্ষের স্বশাসক হইবার অযোগ্যতা প্রচার অনেক ইংরেজ আমেরিকা ও অন্যত্র করিয়া থাকে। কোন একটা উপলক্ষ্য করিয়া অনেক ইংরেজ আমেরিকা গিয়া ইহা করে। যেমন বাঁকুড়া কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মিঃ টমসন মেয়েদের ভাসার কলেজে (Vassar College) সাময়িক অধ্যাপকতা করিতে গিয়া ভারতের বিরুদ্ধে বিষ উদ্‌গীরণ করিতেছেন। অনেকে পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে টাকা পায়। ভারত-গবর্ন্মেণ্টের কোন কোন ভৃত্য ছুটি লইয়া বা পেন্সান পাইবার পর এইরূপ কাজ করিয়া থাকে। আমেরিকায় বেশী নাই। তথাকার ভারতীয় ছাত্রেরা এবং দুচার জন অন্য শিক্ষিত ভারতীয় শত্রুপক্ষের মিথ্যা কথার প্রতিবাদ করেন এবং ভারতবর্ষের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যের প্রচার করেন।* ইহাতেই ব্রিটিশ ও ইঙ্গ-ভারতীয় অনেক কাগজ চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে, যে, আমেরিকায় মহাত্মা গান্ধী ও অন্য ভারতীয়েরা ভয়ানক ব্রিটিশ-বিরোধী প্রপ্যাগ্যাণ্ডা চালাইতেছে!

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্য কথা আমেরিকায় জানাইবার ইচ্ছা অনেক ভারতীয়ের থাকিলেও তাহা করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। তাহাদের লোকবল ও অর্থবল কম। আমেরিকায় কেহ যাইতে চাহিলে তাহার পাসপোর্ট (জাহাজের ছাড়পত্র) পাওয়া কঠিন। আমেরিকায় পাঠাইবার জন্য টেলিগ্রাম দিলে তাহা না পাঠাইবার অধিকার টেলিগ্রাফ আফিসের আছে। চিঠি, রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রভৃতি আমেরিকায় যথাস্থানে পৌঁছান কঠিন। কারণ, ডাকে যাহা পাঠান হয়, তাহা আটক করিবার কিংবা বহু বিলম্বে পাঠাইবার ব্যবস্থা এদেশে আছে। ইংরেজ পক্ষের এ রকম কোন বাধাই নাই। তা ছাড়া ইংরেজরা অন্য উপলক্ষ্যে আমেরিকায় গেলেও আসল উদ্দেশ্যটা প্রপ্যাগ্যাণ্ডা করাই হইতে পারে। যেমন সাইমন প্রভৃতি ১৮০ জন ব্রিটিশ জাতীয় ব্যক্তি অন্যব্যপদেশে কানাডা ও আমেরিকা যাইতেছেন এবং আমেরিকাতেও বক্তৃতা করিবেন। যথা—

Montreal, Aug. 5.

The McGill University will confer an honorary degree on Sir John Simon when he attends the annual meeting of the Canadian Bar Association at Toronto during his forthcoming visit to Canada and America with a party of British lawyers who are returning the visit made by the American Bar to London.

The party of 180 including Sir John and Lady Simon, Lord Tomlin and Mr. Justice Macnaughten, left London to-day.

Sir John Simon, who is taking his first prolonged holiday since he undertook the Chairmanship of the Simon Commission, has accepted invitations to speak at a number of places, and said in an interview that he thought that he would be expected to say something about India. The party will be the guests of Lord and Lady Willingdon at Ottawa. —*Reuter*.

উপরের সংবাদ পড়িয়া ইহাও মনে হয়, যে, স্যার

---

* এক আধ জন ভারতীয় আমেরিকায় কখন কখন

জন্ সাইমনের ইচ্ছা এবং নির্ব্বন্ধ থাকিলেও মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাঁহাকে 'গোল' টেবিল বৈঠকে লইলেন না, এবং স্যার জন্ ত্যাগী ও সংযমী হইয়া বৈঠকে যাইবার অভিলাষ ত্যাগ করিলেন,—ইহার মধ্যে যোগ-সাজস অভিনয় থাকিতে পারে।

—

সিন্ধুদেশের দুর্দ্দিন

সিন্ধুনদের বন্যায় সিন্ধুদেশের অনেক গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে, অনেক গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে এবং কোন কোন শহর জলমগ্ন হইয়াছে। অনেক অধিবাসী মূল্যবান্ অস্থাবর সম্পত্তি গৃহে ফেলিয়া রাখিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইয়াছে। বহুসংখ্যক ডাকাত ইহাকে সুযোগ মনে করিয়া নৌকাযোগে গ্রামে ও নগরে গিয়া পলাতক লোকদের সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছে। মানুষের হিংস্রতা ও দুর্ব্বৃত্ততা কত রকমেরই হয়! ইহার উপর আবার সক্কর শহরে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদে অনেক লোক হত ও আহত হইয়াছে। পুলিস ও সৈনিকের পাহারা চলিতেছে। ঢাকার দুরবস্থার কারণ যাহা, সক্করেরও সম্ভবতঃ তাহাই। প্রভেদ এই, যে, ঢাকায় পুলিসের রক্ষকবেশে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে যত বিলম্ব হইয়াছিল, সক্করে তাহা হয় নাই।

এই সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে ভারতবর্ষের স্বরাজ্য-লাভের অযোগ্যতার প্রমাণ বলিয়া উপস্থিত করা হয়। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান এই উপদ্রবগুলো কি ব্রিটিশ-শাসনের উৎকর্ষের পরিচায়ক?

সক্করের ন্যায় আগ্রা অযোধ্যা প্রদেশের বালিয়াতে এবং পঞ্জাবের কোথাও কোথাও হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হইয়াছে, দেশের জন্য স্বরাজলাভের নিমিত্ত একদিকে ভারতহিতৈষী লোকেরা হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টা বাড়াইতেছেন, অন্যদিকে দুর্ব্বৃত্ত ও দুর্বুদ্ধি লোকেরা তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধাইতেছে।

—

পাটিয়ালার মহারাজার সম্বন্ধে তদন্ত

ভারতীয় দেশী রাজ্যসকলের অধিবাসীদের কন্‌ফারেন্সের পক্ষ হইতে পাটিয়ালার মহারাজার নামে নানা গুরুতর অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার নিমিত্ত এক কমিটি নিযুক্ত হয়। ঐ কমিটি অনুসন্ধান করিয়া একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। তাহাতে মহারাজার বিরুদ্ধে অভি-যোগের সমর্থক অনেক সাক্ষ্য ও অন্য প্রমাণ মুদ্রিত আছে। তাহার পর দেশী প্রায় সব খবরের কাগজ ঐ রিপোর্টে লিখিত সমুদয় অভিযোগের সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য গবর্ন্মেণ্টকে একটি কমিশন নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করে। রাজ্যশাসক মহারাজাদের নামে গুরুতর অভিযোগ হইলে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে ঐরূপ কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। গভর্ন্মেণ্ট কমিশন নিয়োগ করেন নাই। কিছু কাল গত হইলে পর পাটিয়ালার মহারাজা ভারত-সরকারকে জানান, যে, পঞ্জাবে দেশী রাজ্যসকলের পলিটিক্যাল এজেণ্টকে তদন্তের ভার দিলে তিনি তাহাতে সম্মত আছেন। গবর্ন্মেণ্টও ঐ ব্যক্তিকে তদন্তের ভার দেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির মনোনীত ব্যক্তিকে তদন্তের ভার দেওয়া দেশী রাজ্যসকলের অধিবাসীদের কন্‌ফারেন্সের পক্ষ হইতে ইহা অসন্তোষকর ব্যবস্থা বলা হয়, এবং প্রায় সমস্ত দেশী কাগজেও সেইরূপ মত প্রকাশ করা হয়। সন্তোষজনক তদন্ত করিতে হইলে আরও কোন কোন ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। যেমন, পাটিয়ালার প্রজারা সাক্ষ্য দিলে সাক্ষ্যের জন্য তাহাদিগকে কোন নির্যাতন সহ্য করিতে হইবে না, এইরূপ অভয় দিতে বলা হইয়াছিল, কিন্তু সেরূপ অভয় দেওয়া হয় নাই।

পলিটিক্যাল এজেণ্ট ফিজপ্যাট্রিক সাহেব তদন্ত শেষ করিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন, এবং ভারত-গবর্ন্মেণ্ট তাহা গ্রহণ করিয়া, মহারাজা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়াছেন। তাহা বলিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই। বলিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ কতকগুলি লোকের ও সভার চক্রান্তের ফল।

যে-প্রকারে ও যে-ব্যক্তির দ্বারা তদন্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন নিরপেক্ষ লোক গবর্ন্মেণ্টের এই সিদ্ধান্ত ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না। দেশী রাজ্য-সকলের প্রজাদের কন্‌ফারেন্স চক্রান্ত করিয়াছিলেন

এবং অমৃতলাল ঠক্করের (Thakkar) মত কমিটির সভ্য সেই চক্রান্তের মধ্যে ছিলেন, ইহাও কোন নিরপেক্ষ লোক বিশ্বাস করিবে না।

—

"আইনের বাধ্য ও শান্তিপ্রিয়" লোকদের সংখ্যা

বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক ছোট ছোট রাজকর্ম্মচারী বলিয়া থাকেন ভারতবর্ষে নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘক বা তাহাদের সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন লোকদের সংখ্যা কম, অধিকাংশ লোক ব্রিটিশ-শাসনের অনুরাগী, আইনের বাধ্য এবং শান্তিপ্রিয়।

বিলাতের দৈনিক ডেলী হেরাল্ড তথাকার শ্রমিক দলের মুখপত্র, শ্রমিক গবর্ন্মেণ্টের কতকটা মুখপত্র। এই কাগজ মিঃ স্লোকুম্ব (Slocombe) নামক একজন প্রতিনিধি পাঠাইয়া ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ পাঠাইতে বলেন। তিনি জেলে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি কি কি সর্ত্তে সত্যাগ্রহ বন্ধ করিতে রাজী তাহা প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও অনেক বৃত্তান্ত ডেলী হেরাল্ড কাগজে প্রকাশ করেন। তাহার মধ্যে ঐ কাগজের ৭ই জুলাইয়ের সংখ্যায় আছে :—

When one sees the enormous crowds that flock to meetings or march in processions under the Congress flag, and hears the same opinion, sympathetic to Congress and hostile to the Government, from Sikh or Mohammedan, Hindu or Parsee, high-caste Brahmin or sweeper of depressed classes, one wonders where that "Vast majority of law-abiding and peace-loving citizens," so often referred to in Government declarations, may be found.

—

মান্দ্রাজের মহিলাগণ ও বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন

রায় সাহেব হরবিলাস শারদা মহাশয়ের চেষ্টায় যে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন পাশ হইয়াছে, সেই কল্যাণকর আইন রদ করিবার জন্য, অন্ততঃপক্ষে মুসলমান সমাজের জন্য রদ করিবার জন্য, বড়লাটকে অনুরোধ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি মুসলমানের এক দল প্রতিনিধি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি তাহাদিগকে পুনর্বিবেচনার কতকটা আশা দেন। সম্প্রতি বাবু স্বরপৎসিং নামক কৌন্সিল অব্ ষ্টেটের এক সভ্য একটি বিলের খসড়া ঐ সভায় পেশ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, বিশেষ কারণ দেখাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইয়া চৌদ্দ বৎসর বয়সের আগে কোন কোন বালিকার বিবাহ দিতে অভিভাবক-দিগকে সমর্থ করা।

মান্দ্রাজের মহিলারা সভা করিয়া বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন পণ্ড করিবার এই সব চেষ্টার নিন্দা ও প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং গবর্ন্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন যেন তাঁহারা এই সব চেষ্টায় কর্ণপাত না করেন। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন, যে, অনেক শিক্ষিতা মুসলমান মহিলা বাল্যবিবাহের বিরোধী। তাঁহাদের মত অগ্রাহ্য করিয়া কতকগুলি গোঁড়া মুসলমানের কথা শুনা কখনই গবর্ন্মেণ্টের পক্ষে উচিত হইবে না।

বস্তুতঃ গবর্ন্মেণ্ট যদি হিন্দু মুসলমান কোন ধর্ম্মের কতকগুলি লোকের কথা শুনিয়া শারদা আইন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পণ্ড করেন, তাহা হইলে লোকে ইহাই বুঝিবে, যে, গবর্ন্মেণ্ট এই সঙ্কট সময়ে কতকগুলি লোকের সমর্থন পাইবার জন্য ইহা করিতেছেন।

—

চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত কতকগুলি ছবি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে প্রদর্শিত হয়। তথাকার বিখ্যাত চিত্রসমালোচকেরা সেগুলির খুব প্রশংসা করেন। তাহার পর ছবিগুলি ইংলণ্ডের বার্ম্মিংহাম শহরে প্রদর্শিত হয়। সেখানেও সেগুলি প্রশংসিত হয়। অতঃপর চিত্রগুলি জার্ম্মানীর রাজধানী বার্লিনে প্রদর্শিত হইতেছে। সেখানেও প্রশংসা হইবে, সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের মত বহুমুখী প্রতিভা সকল দেশে সকল সময়েই বিরল। বৃদ্ধ বয়সে ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়া এরূপ প্রশংসালাভ কয়জনের ভাগ্যে পৃথিবীতে ঘটিয়াছে?

—

শান্তিনিকেতনে "বর্ষামঙ্গল"

রবীন্দ্রনাথ এই বর্ষায় বিদেশে থাকিলেও শান্তি-নিকেতনে বর্ষামঙ্গলের উৎসব হইয়াছিল। তিনি থাকিলে নূতন গান রচনা করিতেন, নূতন গল্প লিখিতেন। তাহা হইতে এবং তাঁহার উপস্থিতি হইতে অধ্যাপক ও ছাত্রেরা আনন্দ ও প্রেরণা পাইত। এবার তাঁহার পূর্ব্বরচিত গান শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় গীত হয়।

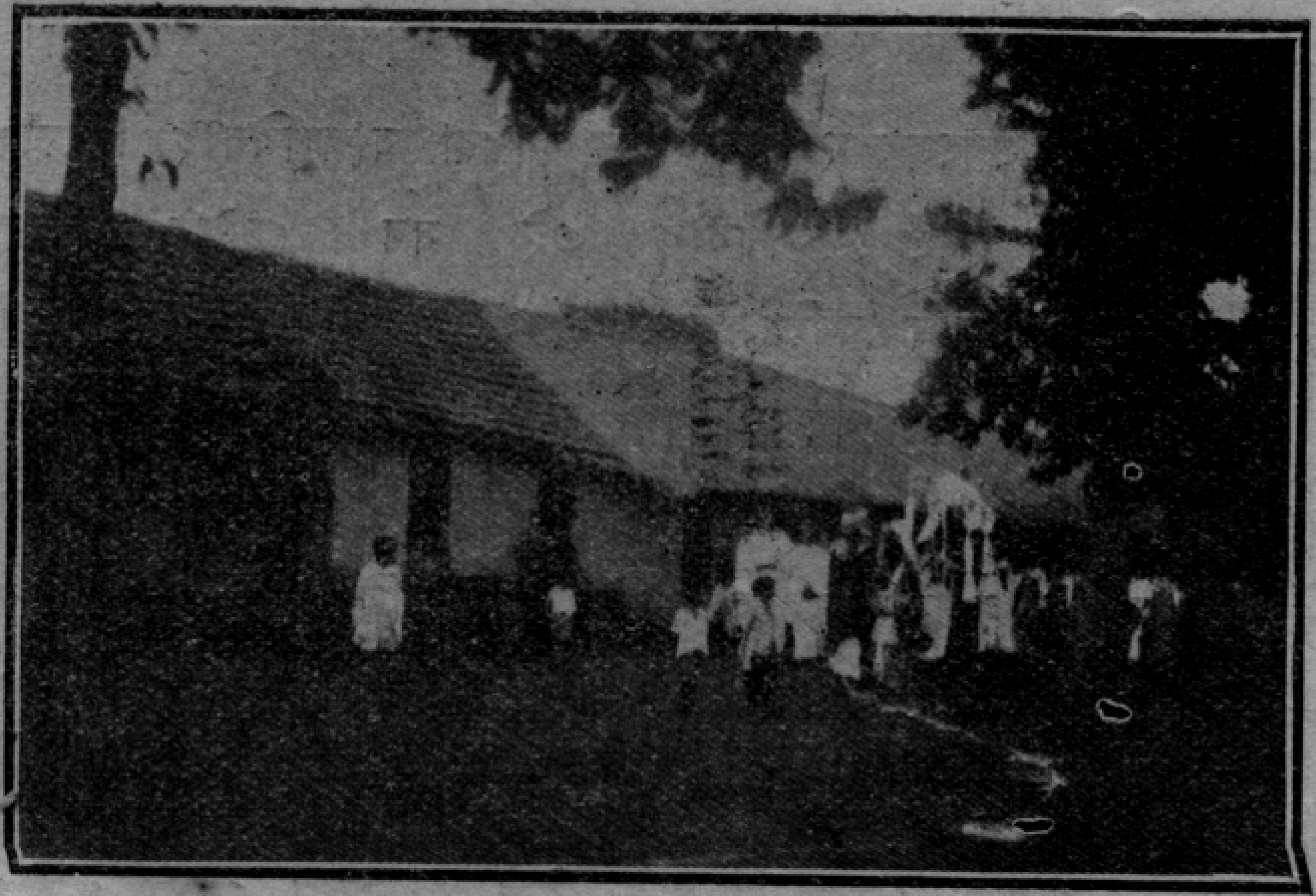

বৃক্ষরোপণের শোভাযাত্রা আরম্ভ
শ্রীদ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ

বৃক্ষরোপণ বর্ষামঙ্গলের অন্তর্গত একটি অনুষ্ঠান। কলেজের ছাত্রনিবাস হইতে সঙ্গীত সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া একটি আমলকির চারা পুষ্প-পত্রে সজ্জিত ডুলিতে করিয়া তাহার মাথায় ছাতা ধরিয়া ছাত্রীদের আবাস শ্রীভবনের সম্মুখে আনা হয়। সেখানে সেটি রোপিত হয়। তাহার পূর্ব্বে ছাত্র ও ছাত্রীরা গান করে, পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী অনুষ্ঠানের উপযোগী সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বৃক্ষরোপণে সাহায্য করেন।

সন্ধ্যার পর কবির বাসগৃহ উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণে আবৃত্তি, কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত হয়, এবং দুটি ছোট বালিকা সঙ্গীতানুসারী অঙ্গভঙ্গী সহকারে একটি গান করে।

উদ্ভিদসমূহ নানা প্রকারে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে। মানুষ অরণ্যানী ও উদ্যান হইতে নির্ম্মল আনন্দলাভ করে। মানুষের অনেক আগে পৃথিবীতে উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়। উদ্ভিদ্‌কে মানুষের অগ্রজ বলিলে কোন ভ্রম বা অত্যুক্তি হয় না। উদ্ভিদের সহিত মানুষের হৃদয়ের যোগ আছে বলিলে তাহা অনেকের কাছে কবিকল্পনা বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। কিন্তু কবিকল্পনামাত্রই অলীক নহে। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলে যেখানে শকুন্তলার প্রিয় লতিকাটির নিকট হইতে বিদায় লইবার বর্ণনা আছে, তখন হইতে এ-পর্য্যন্ত কত কবিই না নানা উদ্ভিদের সাহচর্য্যে শান্তি ও সান্ত্বনা পাইয়াছেন! উদ্ভিদ্‌রাজ্য হইতে আহার্য্য, পরিধেয়, বাসগৃহ, যানবাহন ও ঔষধের উপাদান সংগ্রহ ত করা যায়ই—অরূপ এমন কিছুও পাওয়া যায়, যাহার মূল্য আরও অধিক।

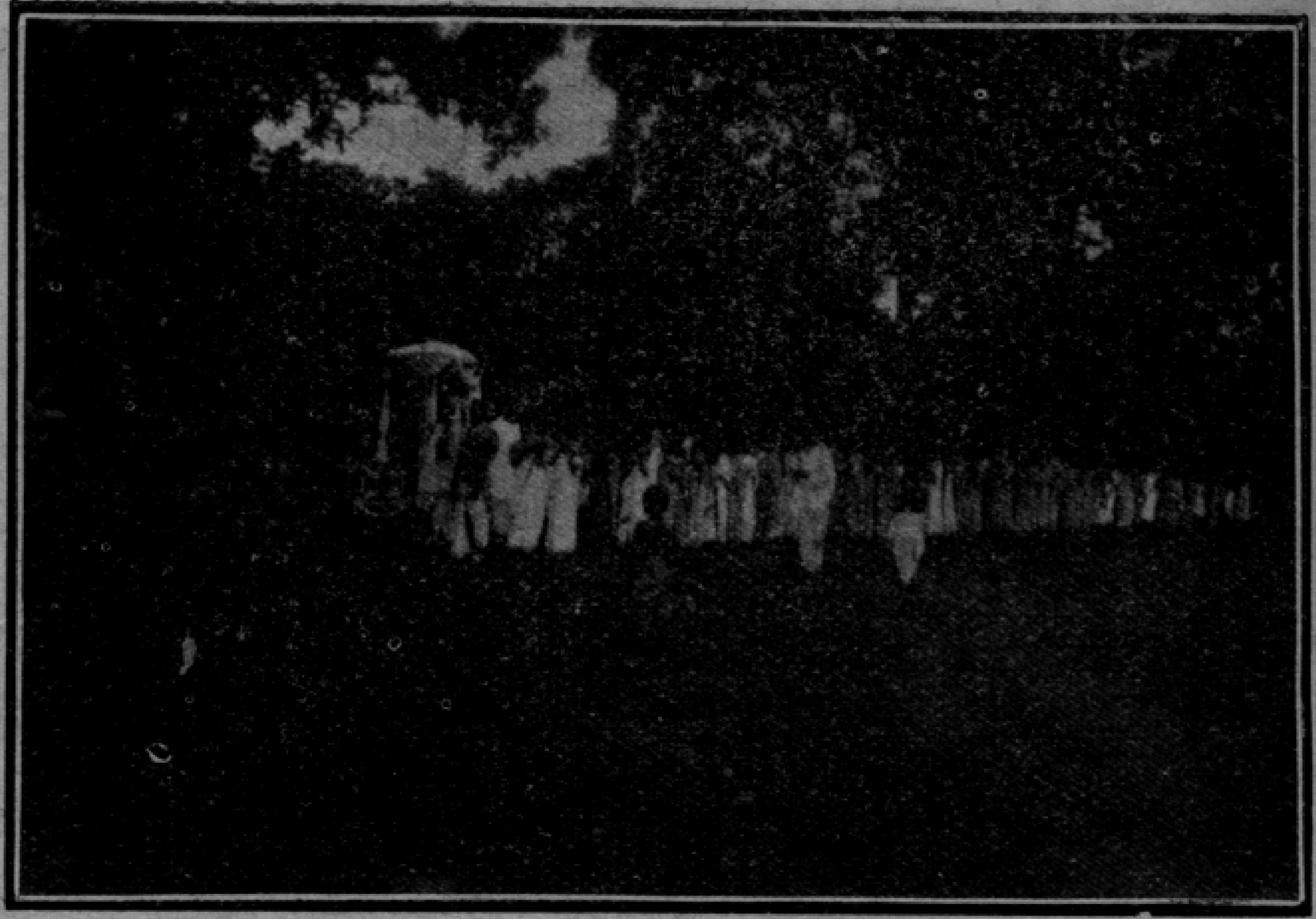

শাল-বীথিকায় বৃক্ষরোপণ শোভাযাত্রা
শ্রীদ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ

কলিকাতার শোচনীয় ও লজ্জাকর দলাদলি

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত পাঁচবার কলিকাতার মেয়র হইয়াছেন। সত্যাগ্রহ করায় তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তজ্জন্য যথাসময়ে শপথ গ্রহণ করিতে না

পারায় তাঁহার কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির অল্‌ডার্‌ম্যানের পদ বাতিল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ পদে তিনি পুনর্নিযুক্ত হইতে পারেন। বঙ্গের কংগ্রেসদলের নেতৃত্বের জন্য তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। আবার মেয়র হইবার আকাঙ্ক্ষাও সুভাষবাবুর আছে। আগে অল্‌ডারম্যান না হইলে মেয়র হওয়া যায় না। সেইজন্য যে অল্‌ডারম্যান পদটি খালি হইয়াছে তাহাতে উভয় নেতার দলের লোকেরাই নিজ নিজ নেতাকে নির্ব্বাচিত দেখিতে চান। এই নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ইমারতে অতিশয় শোচনীয় ও লজ্জাকর গুণ্ডামি হইয়াছে। এই প্রকার দলাদলিতে সমুদয় বাঙালী জাতির গালে চূনকালী পড়িতেছে। দেশের প্রভূত অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে।

এই ব্যাপারে একমাত্র কিঞ্চিৎ পরিমাণে সন্তোষকর সংবাদ এই, যে, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত জেলে তাঁহার স্ত্রীর প্রমুখাৎ গুণ্ডামির সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, যে, তিনি অল্‌ডারম্যান নির্ব্বাচিত হইতে চান না। ইহা তাঁহার উপযুক্ত কাজ হইয়াছে।

শোভাযাত্রা গ্রন্থাগারের সম্মুখে
শ্রীদ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ

গুণ্ডামি কোন এক পক্ষ করিয়াছে বা উভয় পক্ষ করিয়াছে, কিংবা কোন পক্ষ কম, কোন পক্ষ বেশী করিয়াছে, তাহার আলোচনা করিবার চেষ্টা অনাবশ্যক।

বৃক্ষরোপণের শোভাযাত্রা গ্রন্থাগারের নিকটস্থ
শ্রীদ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ

গুণ্ডামি যে বা যাহারা করুক, উহা বাঙালীর কলঙ্ক।

—

বিলাতে বেকার

বিলাতে বেকার লোকের সংখ্যা ২০,১১,০০০ হইয়াছে। ইহা কতকটা পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যিক অবসাদজাত, এবং কতকটা ভারতবর্ষে বিলাতী জিনিষ বর্জ্জনের ফল। এক খানা ইঙ্গ-ভারতীয় কাগজ এই বলিয়া সান্ত্বনালাভ করিয়াছে, যে, আমেরিকাতে বেকার লোকের সংখ্যা এখন ৬০ লক্ষ এবং জার্ম্মেনীতে ৩০ লক্ষ।

—

ভারতে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন

বিলাতে বেকার লোকের সংখ্যা বাড়িলেই, তাহা আমরা সন্তোষের বিষয় মনে করিতে পারি না। পরের দুঃখে সুখী হওয়া উচিত নয়। যাহারা আমাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তাহাদের দুঃখও সন্তোষের

বিষয় নহে। আমরা যদি আমাদের প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান সব জিনিষ নিজেরা উৎপাদন করিয়া ব্যবহার করিতে পারি, তাহা সন্তোষকর মনে করি। তাহার ফলে

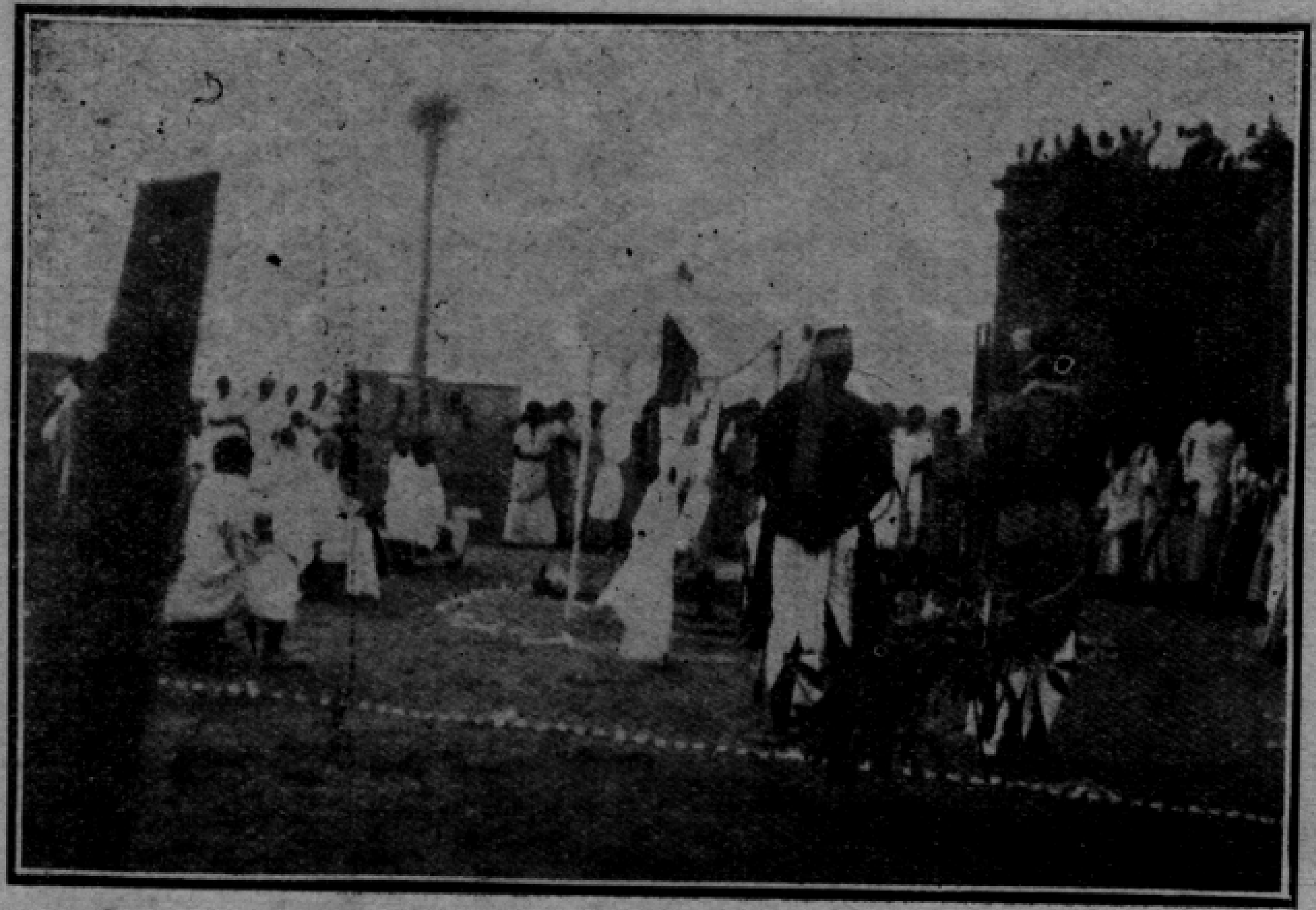

শ্রীভবনের সম্মুখে বৃক্ষরোপণ
শ্রীদ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ

বিদেশী জিনিষের কাট্‌তি কমিলে যদি বিদেশে বেকার লোকের সংখ্যা বাড়ে, তাহার জন্য আমরা দায়ী নহি।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিদেশী জিনিষের ব্যবহার পরিত্যাগ অবৈধ নহে। কিন্তু দেশী জিনিষ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন ও উচিত মূল্যে প্রাপ্তব্য না হইলে বিদেশীবর্জ্জন নীতি বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে না।

—

রাজনৈতিক বন্দীদের দশা

রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত বা কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের আহার ও বাসগৃহাদি মনুষ্যোচিত যাহাতে হয়, যাহাতে দেশী বন্দী এবং ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী বন্দীদের মধ্যে এই সব বিষয়ে অন্যায় পার্থক্য না থাকে, সেই উদ্দেশ্যে প্রায়োপবেশন করিয়া শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ দাস স্বেচ্ছামৃত হইয়াছেন। গবর্ন্মেণ্ট অনেকটা তাহার ফলে বন্দীদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্য খাদ্যাদির ব্যবস্থা কাগজে কলমে ভিন্ন ভিন্ন রকম করিয়াছেন। এস্থলে এই শ্রেণীবিভাগের আলোচনা করিব না। কিন্তু যেরূপ শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে সকল স্থলে তদনুসারে কাজ হইতেছে না। শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, আরামে থাকিতে অভ্যস্ত ধনী লোকেরাও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে বিচারক কোন কোন স্থলে তাঁহাদিগকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করিতেছেন না। অথচ ভবঘুরো রকমের বদমায়েস ভিক্ষুক ফিরিঙ্গী বা ইউরোপীয় জেলে গেলে প্রথম শ্রেণীর খাদ্যাদি পাইয়া থাকে।

এবম্বিধ কারণে আজকাল অনেক প্রদেশে জেলে রাজনৈতিক কয়েদীরা প্রায়োপবেশন করিতেছেন। তাঁহারা জানেন, জেল প্রমোদভবন নহে। কিন্তু সরকারী নিয়ম অনুসারে, স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য যাহা যতটুকু তাঁহাদের প্রাপ্য, তাহা তাঁহারা কেন পাইবেন না, ইহাই জিজ্ঞাস্য।

—

সাধারণ কয়েদী খালাস

সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টার ফলে পুলিসের লোকদের লাঠির ব্যবহার খুব বাড়িলেও, শুধু তাহার দ্বারা ঐ প্রচেষ্টার প্রতিরোধ হইতেছে না;—কতকগুলি লোককে জেলে পাঠাইতে হইতেছে। রাজনৈতিক অপরাধে কারারুদ্ধ এই সকল লোকের সংখ্যা এত বেশী, যে, সাধারণ জেলসকলে তাহাদের স্থান হইতেছে না। কোথাও কোথাও দু'একটা নূতন জেলের ব্যবস্থা করিয়াও কার্য্য-সিদ্ধি হইতেছে না; কারণ নূতন জেল নির্ম্মাণ করিতে টাকার দরকার, এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনে একদিকে সরকারের আয় কমিতেছে, অন্যদিকে খরচ বাড়িতেছে।

রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে জেলে স্থান দিবার জন্য ভারতবর্ষের সব প্রদেশে সাধারণ অনেক কয়েদীকে তাহাদের মিয়াদ শেষ হইবার আগেই খালাস দেওয়া হইতেছে। তাহাতে এক কৌতুকাবহ অবস্থা ঘটিতেছে। চুরি ডাকাতী জাল জুয়াচুরি প্রতারণা প্রভৃতি অপরাধ নৈতিক দোষ হইতে উৎপন্ন। সকল সভ্য সমাজে চিরকাল এই সব কাজ দণ্ডনীয় হইয়া আসিতেছে, কিন্তু রাজনৈতিক অনেক "অপরাধ" এ জাতীয় নহে। সেগুলা কোন দেশে বে-আইনী, কোন দেশে নহে; আবার একই দেশে এক সময়ে যাহা বে-আইনী ছিল না, তাহ

পরে বে-আইনী হইয়াছে ;—যেমন পিকেটিং, সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে কর্ম্মত্যাগ করিতে বলা, ইত্যাদি। কৌতুকাবহ ব্যাপার এই, যে, দুর্বৃত্ততার জন্য যাহারা দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারা অকালে খালাস পাইতেছে, এবং জেলে তাহাদের কক্ষগুলাতে, দুর্নীতিপরায়ণ নহেন বরং বস্তুতঃ অতি উচ্চ চরিত্রের লোক, এরূপ অনেকে আবদ্ধ হইতেছেন। এরূপ অনেক লোকের নাম সকলেরই মনে পড়িবে, উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

যাহা হউক, যীশুখ্রীষ্টকে যখন চোরদের সঙ্গে ক্রুশ-বিদ্ধ করা হইয়াছিল, এবং মুক্তির পাত্র কে হইবে, জিজ্ঞাসা করায় জনতা যখন চোরেরই নাম করিয়াছিল, তখন বর্ত্তমান সময়ের কয়েদী খালাস বিস্ময়কর বা অভূতপূর্ব্ব নহে। আমাদের কেবল এই আশঙ্কা হয়, যে, অনেক চোর বদমায়েসকে খালাস দেওয়ায় দেশে অপরাধের সংখ্যা বাড়িবে, এবং তাহার দোষ সত্যাগ্রহীদের স্কন্ধে আরোপিত হইবে ;—যেমন বোম্বাইয়ের গবর্ণরের দ্বারা হইয়াছে এবং যেমন কিশোরগঞ্জের হত্যাকাণ্ড, গৃহদাহ ও লুট ভারত-গবর্ন্মেণ্টের এক সাপ্তাহিক বিবরণীতে নিরুপদ্রব আইন অমান্য প্রচেষ্টার ঘাড়ে চাপান হইয়াছে। বোম্বাইয়ের গবর্ণর বোম্বাই কৌন্সিলে বলিয়াছিলেন, যে, গুজরাটের খেড়া জেলার ডাকাইতীগুলা কংগ্রেস প্রচেষ্টার ফল।

—

কিশোরগঞ্জের উপদ্রব

কিশোরগঞ্জের উপদ্রব সম্বন্ধে ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, যে, ঢাকা জেলা হইতে আগত কতকগুলা মৌলবীর প্ররোচনায় উহা ঘটিয়াছে। বঙ্গের গবর্ণর বলেন, উহা আর্থিক কারণে ঘটিয়াছে। দেনদার রায়তরা মহাজনদের ঘরবাড়ী লুট ও দাহ করিয়াছে এবং কোথাও কোথাও তাহাদের প্রাণবধ করিয়াছে। আমাদের মতে দেনা-পাওনার ব্যাপারটা একটা ছল মাত্র। অনেক গ্রামের সমুদয় হিন্দু দোকান এবং কেবল মাত্র হিন্দু দোকানই লুট হইয়াছে। পালেরঘাটের একটি হিন্দু দোকানে ২৫ বস্তা ধান ছিল। যখন মুসলমান লুণ্ঠকরা জানিতে পারিল উহা মুসলমানের, তখন তাহারা উহা স্পর্শ করিল না, কিন্তু দোকানের আর সব জিনিষ লুট করিল। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত কিশোরগঞ্জ মহকুমার ষাটের অধিক গ্রাম লুণ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত এরূপ খবর পাওয়া যায় নাই, যে, কোন মুসলমানের এক পয়সার জিনিষও লুট হইয়াছে। হিন্দুদের যে-সব বাড়ী লুট হইয়াছে, তাহাদের মালিকরা সবাই কুসীদজীবী মহাজন নহে। মহাজনী কাজ কেবল যে হিন্দুরাই করে তাহা নহে, অনেক মুসলমানও করে; অথচ তাহাদের বাড়ী লুট হয় নাই। দেনদারেরা সবাই মুসলমান নহে, ঋণগ্রস্ত হিন্দুও অনেক আছে। কিন্তু ঋণগ্রস্ত হিন্দুরা হিন্দু বা মুসলমান মহাজনদের বাড়ী লুট বা দাহ করে নাই, বা তাহাদের প্রাণবধ করে নাই।

এই সব কারণে মনে হয়, কিশোরগঞ্জের উপদ্রব সাম্প্রদায়িক প্ররোচনার ফল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, টিক্‌টিকি পুলিস কোন্ অলিগলির মধ্যে আঁধার কোণে বোমা আদি লুক্কায়িত আছে তাহা আবিষ্কার করিতে পারে, কোথায় গোপনে চিঠিপত্র দ্বারা বা মৌখিক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হইতেছে তাহা ধরিতে পারে; কিন্তু ঢাকা জেলায় ও ময়মনসিংহ জেলায় মৌলবীরা লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়া যে এরূপ ভীষণ উপদ্রব ঘটাইল তাহার পূর্ব্বাহ্নে কিছুই জানিতে পারিল না। অথবা ভারতে আশ্চর্য্য কিছুই নহে।

যাহা হউক, বঙ্গের লাট ও ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বঙ্গীয় সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ কিশোরগঞ্জের উপদ্রবের যে-যে কারণই অনুমান বা সাব্যস্ত করুন, তাঁহারা সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টাকে ইহার জন্য দায়ী করেন নাই। কিন্তু ইংরেজীতে একটা কথা আছে, ক্রীড়কদের চেয়ে দর্শকরা বেশী দেখে। সেইজন্য বঙ্গের সরকারী ও বেসরকারী লোকেরা যাহা দেখিতে পায় নাই, সিমলাশৈলে অধিষ্ঠিত ভারত-সরকারের সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে সাপ্তাহিক মন্তব্যের লেখকের অন্তশ্চক্ষুর তাহা গোচর হইয়াছে। তাঁহার মতে কিশোরগঞ্জের লুণ্ঠক ও ঘাতকেরা সত্যাগ্রহের

দ্বারা উৎসাহিত হইয়াছিল। তাঁহার ঠিক্ কথাগুলি এই ঃ—

"More evidence has been received of the effect of the Civil Disobedience movement in encouraging lawlessness in directions not connected with the movement. In Bengal there were disturbances involving many villages, caused by attacks upon money-lenders by debtors."

—

বোম্বাইয়ে নেতাদের শাস্তি

লোকমান্য বাল গঙ্গাধর টিলক মহোদয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ দিবস উপলক্ষ্যে বোম্বাইয়ের কংগ্রেস কমিটির কর্ত্তৃপক্ষ একটি মিছিলের ব্যবস্থা করেন। তথাকার পুলিস কমিশনার তাহা নিষেধ করেন, এবং যে যে রাস্তা দিয়া বহুবার বৃহত্তর মিছিল কিছুদিন আগেও গিয়াছে, সেই ক্রুকশ্যাঙ্ক রোড ও হর্ণবি রোডের

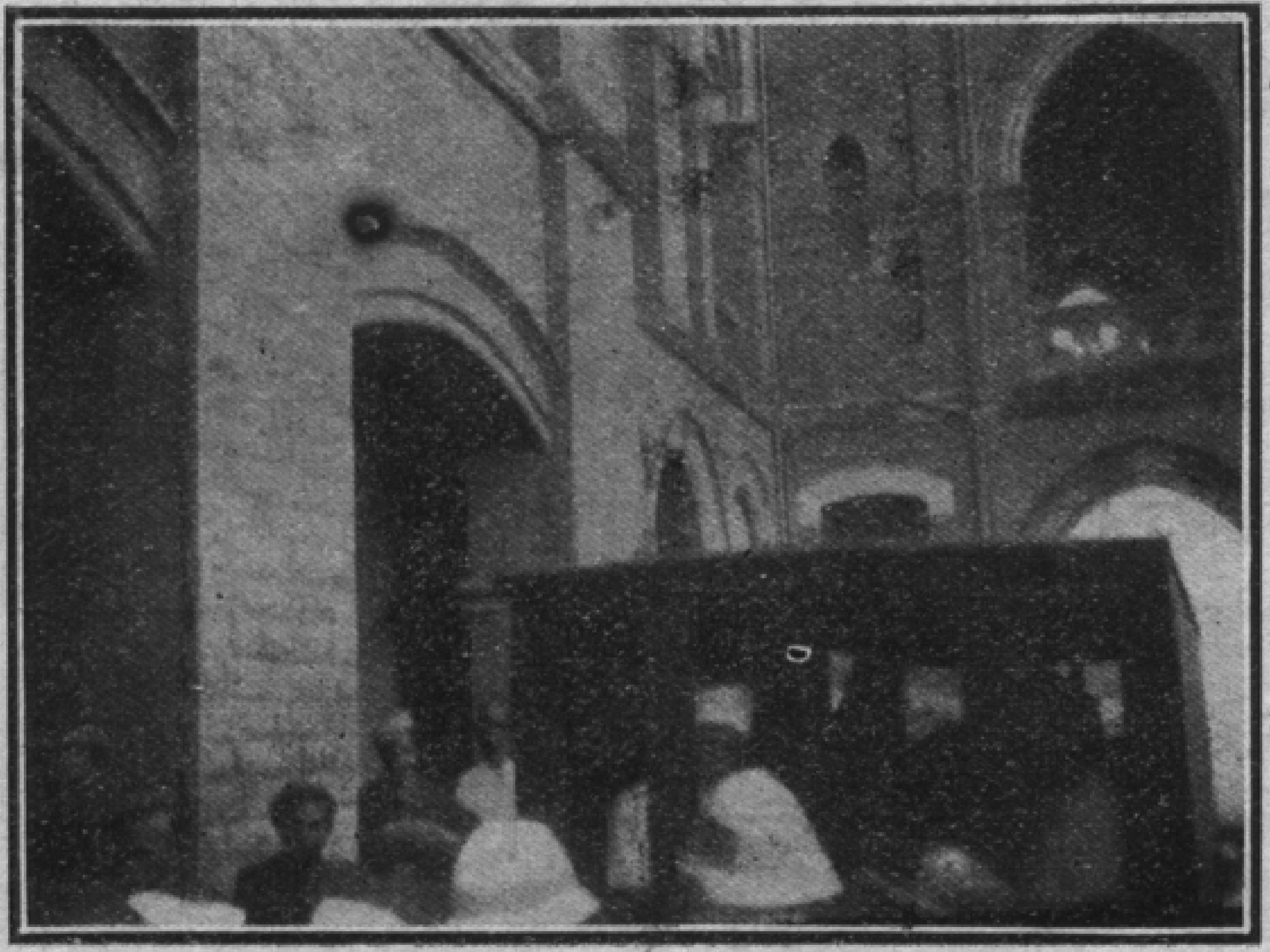

এসপ্লানেড হাজত হইতে কয়েদীগাড়ী নেতৃগণকে বাইকুল্লা জেলে লইয়া চলিয়াছে

সন্ধিস্থলে লাইনবন্দী পুলিসের দ্বারা তাহার গতিরোধ করেন। তাহাতে নেতৃবর্গ ও জনতা রাস্তায় বৃষ্টির মধ্যে বসিয়া থাকেন। তাঁহারা সন্ধ্যার আগে হইতে পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ১৪ ঘণ্টা এই অবস্থায় থাকেন। তখন নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং জনতার অনেকে চলিয়া যান। বাকী কয়েক শত লোক ভিজা রাস্তায় বসিয়াই থাকেন। পুলিস লাঠি চালাইয়া তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। কয়েক শত লোক জখম হয়, ও অনেককে হাঁসপাতালে যাইতে হইয়াছে।

যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে

নেতৃগণকে কয়েদীগাড়ী হইতে নামান হইতেছে

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পটেল প্রভৃতি দেশমান্য নেতারাও ছিলেন। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বিশিষ্ট কোন লোক মনে করিবেন না যে, এরূপ লোকদের মিছিলের উদ্দেশ্য ছিল শান্তিভঙ্গ করা। তাঁহারা রাস্তার একপাশ দিয়া ৪ জন বা ২ জনের লাইন বাঁধিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। পুলিস তাহাতেও রাজী হয় নাই। বোম্বাইয়ের প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার হয়। সচরাচর এরূপ বিচারে সত্যাগ্রহী অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আত্মপক্ষ সমর্থন করেন না, সরকারপক্ষের সাক্ষীদিগকে প্রশ্ন করেন না, নিজেরা দোষী কি নির্দোষ কিছুই বলেন না, মোকদ্দমার সহিত কোন সংস্রব রাখেন না। সুতরাং সত্যাগ্রহী অভিযুক্তদিগকে দণ্ড দেওয়া খুব অল্প সময়সাপেক্ষ ও সহজ হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ছাড়া আর সকলেই মোকদ্দমার সহিত কোন সংস্রব রাখেন নাই। তিনি সরকারী সাক্ষীদিগকে জেরা করেন, এবং আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ বক্তৃতা করেন। অবশ্য, তাহাতেও মোকদ্দমার ফল যাহা হইবার তাহা হইয়াছে—সকলেই দণ্ডিত হইয়াছেন। কিন্তু অন্যবিধ একটা ভাল ফল হইয়াছে। সংবাদপত্রের পাঠকেরা

বুঝিতে পারিয়াছেন, যথেষ্ট এবং ন্যায্য কারণ ব্যতিরেকে পুলিসের যে-কোন মিছিল ও সভা নিষেধ করিবার ন্যায্য অধিকার নাই। আমাদের বিবেচনায় বোম্বাইয়ের পুলিস কমিশনার বোম্বাই কংগ্রেস কমিটির নেত্রী শ্রীমতী হংসা মেহতাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা আইনানুযায়ী হুকুম নহে, স্থতরাং তাহাতে যে নিষেধ ছিল তাহা লঙ্ঘন করায় আইন অমান্য করা হয় নাই। কিন্তু ঐ চিঠিকে আইনানুযায়ী হুকুম মনে করিলেও মালবীয়জী দেখাইয়াছেন, যে, উহা অযৌক্তিক ও অনাবশ্যক হুকুম, স্থতরাং তাহা মানিতে কেহ বাধ্য নহে। কেন-না মিছিলটির দ্বারা শান্তিভঙ্গের কোনই সম্ভাবনা ছিল না, এবং উহার দ্বারা গভীর রাত্রে এবং ভোরেও লোক ও যানবাহনের চলাচল বন্ধ হইত, কখনই বলা যায় না।

ম্যাজিষ্ট্রেট মালবীয়জীকে কোন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে দেন নাই। দিলে আরও অনেক কথা বাহির হইত। মালবীয়জী বোম্বাই গবর্ন্মেণ্টের হোম মেম্বর

বাইকুল্লা জেলের দ্বারদেশে

কয়েদীগাড়ী হইতে নামিয়াছেন—পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল, শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলৎরাম, ডাক্তার এন, এস্, হর্দ্দিকর, শ্রীযুক্ত আয়ার। মৌঃ শেরওয়ানী সাহেব পুলিশ সার্জ্জেণ্টের আড়ালে পড়ায় তাঁহাকে দেখা যাইতেছেনা।

হটসন সাহেবকে সরকারী সাক্ষীরূপে হাজির করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। করিলে আরও কিছু তথ্য জানা যাইত। কারণ হটসন সাহেব মিছিল উপলক্ষ্যে তাড়াতাড়ি পুনা হইতে বোম্বাই আসিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত অন্য সরকারী লোকদের এ বিষয়ে পরামর্শ

কারাদ্বারে

১। শ্রীযুক্ত শেরওয়ানী, ২। শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীয় ৩। শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলৎরাম।

হইয়াছিল, এবং তিনি ঘটনাস্থলের নিকটবর্ত্তী একটি বাড়ী হইতে পুলিস কর্ত্তৃক প্রহারদ্বারা সত্যাগ্রহী বিতাড়ন প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন এবং আরও কয়েকজনের এক শত টাকা করিয়া জরিমানা এবং তাহা না দিলে ১৫ দিনের অশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হয়। পণ্ডিতজী জরিমানা দিতে রাজী হন নাই। কিন্তু তাঁহার অসম্মতি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও একজন তাঁহার জরিমানা দিয়া দেওয়ায় তাঁহাকে খালাস দেওয়া হইয়াছে। কে টাকা দিয়াছেন, পণ্ডিতজী তাহা জানেন না। জেলে, তাঁহার জরিমানা দেওয়ার সংবাদ তাঁহাকে জানান হইলে তিনি প্রথমে জেল ছাড়িয়া আসিতে চান নাই। পরে সঙ্গীদের অনুরোধে বাহির হইয়া আসেন, এবং এক প্রকাশ্য সভায় বলেন, "যিনি টাকা দিয়াছেন তিনি দেশের ক্ষতি করিয়াছেন এবং আমার প্রতি অমিত্রজনোচিত কাজ করিয়াছেন; পুলিস কমিশনারের হুকুম স্বেচ্ছাচারমূলক ছিল। আমি পুনর্ব্বার সেরূপ হুকুম অগ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত।" শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পটেল পণ্ডিতজীর সহিত ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

এই মোকদ্দমার সময় আদালতে শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পটেল এই বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে শীঘ্র শীঘ্র মোকদ্দমা শেষ করিতে বলেন, যে, তাঁহাদিগকে যে হাজতে রাখা হইয়াছে তাহা দুর্গন্ধ ও নোংরা গোরুর খোঁয়াড়ের মত এবং মহিলাদিগকেও তাহাতেই আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মত সম্ভ্রান্ত লোকদিগের কথা দূরে থাক্ কোন শ্রেণীর কোন অবস্থার কোন আসামীকেই এমন ঘরে রাখা উচিত নহে। ঘোরতর অপরাধী আসামীও মানুষ। তাহার সহিত মানুষের মতই আচরণ করা কর্ত্তব্য। অপরাধীদিগকে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাহাদের চারিত্রিক সংশোধন, কিন্তু তাহারা কোন প্রকারে অত্যাচরিত, উৎপীড়িত, নিগৃহীত বা লাঞ্ছিত হইলে তাহাদের কোন উন্নতি হইতে পারে না। অধিকন্তু যাহারা অত্যাচার, উৎপীড়ন নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা করে, তাহাদেরও অবনতি হয়। আমরা এসব কথা লিখিতেছি এই জন্য, যে, সরকারী লোকেরা বলিতে পারেন, হাজতগুলা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল প্রভৃতির মত ব্যক্তিদের জন্য নির্ম্মিত হয় নাই। তাহারই উত্তরে আমরা সংক্ষেপে দেখাইয়াছি, যে, কোন রকম আসামীর জন্যই ওরকম ঘর নির্ম্মাণ করিয়া অত্যন্ত অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখা উচিত নয়।

একই ঘরে অভিযুক্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে রাখা বর্ব্বরোচিত ব্যবস্থা।

সাপ্রু-জয়াকর মধ্যস্থতা

শ্রীযুক্ত তেজ বাহাদুর সাপ্রু ও মুকুন্দরাম জয়াকর প্রথমে গান্ধীজী ও পরে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও জবাহরলাল নেহরুর সহিত কথা কহিয়া এবং তদনন্তর মহাত্মাজীর নিকট নেহরু পিতাপুত্রের বক্তব্য পৌছাইয়া দিয়া বড়লাটকে এই অনুরোধ করেন, যে, এই তিনজন নেতাকে একত্র পরামর্শ করিবার সুযোগ দেওয়া হউক। লর্ড আরুইন তাহাতে মত দিয়াছেন। বড়লাটের বিবেচনা অনুমোদনীয়। সাপ্রু ও জয়াকর যদি তিনজন কারারুদ্ধ নেতার সহিত কারাগারের বাহিরের প্রধান একজন নেতার সাক্ষাৎকারের অনুমতি চাহিতেন ও পাইতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। এখন সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাকে অপর তিনজন নেতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিলে তাঁহারা সম্মিলিতভাবে যাহা বলিবেন তাহার মূল্য বাড়িবে।

ভারত-গবর্ন্মেণ্ট বলিতে শুধু বড়লাটকে বুঝায় না। তাঁহাকে ও তাঁহার শাসনপরিষদের সভ্যদিগকে লইয়া ভারত-গবর্ন্মেণ্ট। এই সভ্যেরা সকলেই সত্যাগ্রহীদের সহিত রফা করিতে চাহিতেছেন, বোধ হয় না। সমুদয় প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টকেও রফার পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে বোম্বাইয়ে টিলক তর্পণের মিছিলের সংস্রবে নেতাদের শাস্তি এবং অন্য কয়েক শত লোকের উপর বেদম লাঠি প্রয়োগ হইত না।

বঙ্গের মিউনিসিপালিটী সমূহের আর্থিক অবস্থা

সরকারী লোকাল অডিট (স্থানীয় হিসাব পরীক্ষা) বিভাগের ১৯২৮-২৯ সালের রিপোর্ট হইতে জানা যায়, যে, বঙ্গের অনেক মিউসিপালিটীর আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। সংক্ষেপে তাহার কয়েকটি প্রধান কারণ উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—আগামী বৎসরে কিরূপ ব্যয় হইবে তৎসম্বন্ধে অবিবেচনাপ্রসূত বজেট ধার্য্য করা, ট্যাক্স আদায় সম্বন্ধে যথোচিত তত্ত্বাবধানের অভাব, যাহারা যথাসময়ে ট্যাক্স দেয় নাই তাহাদিগকে উহা দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আইনানুমোদিত উপায় অবলম্বন না করা, মিউনিসিপালিটী শহরবাসীদের যে-যে প্রকার সেবা করেন তাহার সবগুলির জন্য যথেষ্ট বা কিছুমাত্র ট্যাক্স না লওয়া, এবং আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করা। দুএকটি মিউসিপালিটীতে তহবিল তছরুপ ও প্রতারণাও হইয়াছে। প্রত্যেক মিউনিসিপালিটীর এই সব বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

দেশী কাপড়ের কল

বিদেশী কাপড় বর্জ্জনের জন্য আন্দোলন হওয়ায় দেশী কাপড়ের কাটতি খুব বাড়িয়া যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না হইয়া বোম্বাইয়ের অনেক কাপড়ের কলে মাল অনেক জমিয়া গিয়াছে এবং কয়েকটি মিল বন্ধ হইয়াছে; আরও মিল বন্ধ হইতে পারে। ইহার কারণ কি? সরকারী লোকেরা অবশ্য সমস্ত দোষটা সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টার ঘাড়ে চাপাইবেন। দেশব্যাপী এরূপ কোন আন্দোলন হইলে অবশ্য সব বিষয়ে দেশব্যাপী একটা অনিশ্চয়ের ভাবও আসে। তাহাতে সব ব্যবসায়ের বাজারে মন্দা পড়ে ও লোকের হাতে টাকা কম আসে। সুতরাং কাপড় কিনিতেও লোকের অসুবিধা হয়। অতএব সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সহিত কোন জিনিষেরই বাজার খারাপ হওয়ার বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নাই বলিলে ঠিক বলা হইবে না। কিন্তু বাজার মন্দা হওয়ার ইহা প্রধান কারণ নহে। এখন ব্যবসা বাণিজ্য পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মন্দা। এইজন্য ভারতের কাঁচা মালের চাহিদা বিদেশে কমিয়াছে ও তজ্জন্য চাষীদের হাতে নগদ টাকা কম আসিতেছে। আর একটা কারণ, বিলাতী মুদ্রা ও ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়ের হার। আগে বিনিময়ের হার ছিল মোটামুটি ১ টাকা = ১৬ পেনী, এখন হইয়াছে ১ টাকা = ১৮ পেনী। আপাততঃ মনে হইতে পারে ইহাতে আমাদের সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হয় নাই। ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের আয় কমান হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের বাণিজ্যের ক্ষতি করা হইয়াছে। বিলাতী বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এই নূতন বিনিময়ের হার নির্দ্ধারিত হয়। আগে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে কোন জিনিষ বিক্রী করিয়া এক পাউণ্ড পাইলে, সেই পাউণ্ডের মূল্য ছিল ১৫ টাকা; এখন এক পাউণ্ড পাইলে তাহার মূল্য হয় ১৩।/৪ পাই।

এই সব কারণে লোকের হাতে টাকা কম আসিতেছে এবং প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিবার ক্ষমতাও তাহাদের কমিয়াছে।

—

'য়্যাড্‌ভান্স' ও 'লিবার্টি' সম্পাদকদের দণ্ড

'য়্যাডভান্স' ও 'লিবার্টি'র সম্পাদকদ্বয় ছাত্রদের প্রতি শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর পিকেটিং সম্পর্কে একটি উৎসাহ-বাণী ও অনুরোধ প্রকাশ করায় দণ্ডিত হইয়াছেন। আইনের মর্ম্ম ও মহিমা আমরা সব সময়ে বুঝিতে পারিবার দাবী করি না। বঙ্গের বাহিরের কয়েকটি দৈনিক কাগজ আমরা দেখি। তাহাতে কখন কখন কোন কোন কংগ্রেসনেতার বক্তৃতা আগাগোড়া ছাপা দেখিতে পাই। অনেক বক্তৃতায় সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টার অন্তর্গত সব কাজ খুব জোরে চালাইবার অনুরোধ থাকে। এগুলি ছাপিয়া বঙ্গের বাহিরের কোন সম্পাদক এপর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়াছেন বলিয়া অবগত নহি। প্রেসের বিরুদ্ধে সাধারণ আইনের ও বিশেষ অর্ডিন্যান্সের সব প্রদেশে একপ্রকার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ হইতেছে না। সব প্রদেশে উহার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ খুব বেশী কড়া করিয়া সাম্য স্থাপন করিতে বলিতেছি না। আমরা চাই, অন্যান্য প্রদেশে খবরের কাগজওয়ালারা কার্য্যতঃ যতটা স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন, বঙ্গের সাংবাদিকরাও ততটা স্বাধীনতা ভোগ করুন।

—

পিকেটিং ও বিরক্তিকরণ

আহমদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট একটা মোকদ্দমায় তাঁহার রায়ে বলেন, যে, শান্তিপূর্ণ পিকেটিং, অর্থাৎ কোন বল প্রয়োগ না করিয়াও কাহাকেও উত্যক্ত না করিয়া পিকেটিং করিলে তাহা অপরাধ নহে। বঙ্গে আইনের এই ব্যাখ্যা গৃহীত হয় নাই। অর্ডিন্যান্সটি পড়িলে কিন্তু মনে হয়, পিকেটিং হেতু লোকে ত্যক্ত বিরক্ত হয় বলিয়াই এবং হইলেই উহা অপরাধ।

যাহা হউক, আইনের কূটতর্ক করিবার যোগ্যতা ও অধিকার আমাদের নাই। আমরা খবরের কাগজে দেখিয়াছি, কলিকাতার বড়বাজারে মহিলা পিকেটার-দিগকে পুলিস গ্রেপ্তার করায় কয়েকবারই বিদেশী কাপড়ের দেশী দোকানওয়ালারা হরতাল করিয়া দোকান বন্ধ করিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায়, এই পিকেটারদের

কাজে তাঁহারা উত্ত্যক্ত হন নাই। উত্ত্যক্ত হইলে তাঁহারা হরতাল না করিয়া মহিলা পিকেটারদের গ্রেপ্তারে উল্লাস প্রকাশ করিতেন এবং হরির লুট দিতেন। এইজন্য অনুমান হয়, পিকেটিঙে দেশী দোকানদারদের চেয়ে ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের আপত্তি বেশী, অবশ্য বিলাতী মিলওয়ালাদেরও আপত্তি আছে। ভারতবর্ষের গবন্মেণ্ট ও ভারতবর্ষের জনগণ বলিলে দুটি যেরূপ বিভিন্ন মানবসমষ্টি বুঝায়, ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট বলিলে তদ্রূপ আলাদা আলাদা জিনিষ বুঝায় না।

—

বিশ্বভারতীর ছাত্রী ও ছাত্রদের দ্বারা পল্লীসেবা

আমরা বিশ্বভারতীর ১৯২৯ সালের রিপোর্ট পড়িয়া শ্রাবণের প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম, যে, আগে যেমন শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরা নিকবর্ত্তী কোন কোন গ্রামের বালক-বালিকাদিগকে পড়াইত, এখন তাহা হয় না। রিপোর্টে এরূপ কোন ব্যবস্থার উল্লেখ না থাকায় এইরূপ লিখিয়াছিলাম। বর্ত্তমান বৎসরে দেখিতেছি শান্তি-নিকেতনের ছাত্রী ও ছাত্রেরা কেহ কেহ পল্লীসেবা করিতেছেন।

ছাত্রীসংঘ হইতে ভুবনডাঙ্গা ও সাঁওতাল গ্রামে প্রত্যহ অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত ঐ দুই গ্রামের ছাত্রীদিগকে পড়া, লেখা, স্বাস্থ্যরক্ষা, সেলাই, চরকায় সুতাকাটা, সেবা, এবং লাঠি ও ছোরা খেলা শিক্ষা দেওয়া হয়। গড়ে ৩০টি ছাত্রীকে শিক্ষা দেওয়া হয়। গড়ে প্রত্যহ শান্তিনিকেতনের চারিজন ছাত্রী এই সকল বিষয় শিখাইবার জন্য গিয়া থাকেন।

কলেজ বিভাগের ছাত্রদের মধ্য হইতে প্রত্যহ গড়ে দুই জন নিকটস্থ গ্রামে শিক্ষা দিতে এবং অন্যবিধ সেবার কর্ম্ম করিতে যাইয়া থাকেন। কাজের সময় সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮টা। তাঁহারা গ্রামস্থ ১৮ জন ছাত্রকে শিক্ষা দেন। শিক্ষার বিষয় পড়া, লেখা, বাগানের কাজ প্রভৃতি। কথকতা ও লণ্ঠনসহযোগে বক্তৃতার দ্বারা তাঁহারা সামাজিক অনেক বিষয়েও শিক্ষা দেন। ইহা ছাড়া প্রত্যেক বুধবার এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় ছুটি থাকায় গ্রামগুলিতে ডোবা-বুজান, পথ-সংস্কার এবং নর্দ্দমা-কাটার কাজ তাঁহারা ঐ-ঐ দিনে করেন।

এই সকল কাজের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য আশ্রমের অতিথিবর্গের নিকট হইতে কিছু কিছু দান চাওয়া হয়। তদ্ভিন্ন সম্প্রতি একদিন আনন্দবাজার খোলা হয়। তাহাতে মোট নব্বই টাকা আট আনা আয় হইয়াছে।

—

মাননীয় শ্রীযুক্ত এস্ এন্ ঘোষ

মাননীয় শ্রীযুক্ত এস্ এন্ ঘোষ আফ্রিকার টাঙ্গান্যীকা দেশের প্রধান শহর দার-এস্-সালামে ব্যারিষ্টারী করিতেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ১৯২৪ সালে ঐ দেশে ব্যারিষ্টারী করিতে যান, এবং প্রথম হইতেই তাঁহার পসার জমিতে থাকে। তিনি সাতিশয় সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং সমুদয় লোক-হিতকর কাজে সহায়তা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি নেতা হইতে অভিলাষী ছিলেন না। কিন্তু সামাজিক বা রাজনৈতিক এমন কাজ খুব কমই ছিল, যাহাতে লোকে তাঁহার নেতৃত্ব চাহিত না। তিনি টাঙ্গান্যীকার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় সেণ্ট্রাল স্কুলে অনেক সাহায্য করেন এবং উহার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেন। ভারতীয় লাইব্রেরী স্থাপন ও পরিচালনের জন্যও তিনি অনেক পরিশ্রম করেন। তিনি সম্প্রতি হৃদরোগ প্রভৃতিতে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, যে, সুচিকিৎসার জন্য ইউরোপ কিংবা ভারতবর্ষে আসিতে পারেন নাই। তাঁহার দৈহিক অবস্থা যখন অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে, তখন তাঁহাকে স্থানীয় ইউরোপীয় হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। দুঃখের বিষয় সেখানে তাঁহাকে ইউরোপীয়দের জন্য অভিপ্রেত ভাল কোন কক্ষে রাখিয়া ভালরূপ চিকিৎসা করা হয় নাই, ভৃত্যদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখা হইয়াছিল। টাঙ্গান্যীকার গবর্ণর ও চীফ্ জষ্টিস্ তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে তাঁহাদের বন্ধু বলিয়া উল্লেখ করেন, এবং তিনি অনেক বার তাঁহাদের সহিত ভোজও খাইয়াছিলেন। কিন্তু, "... ...শ্মশানে চ য তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।" শ্মশানের আগে তাঁহার প্রতি

ইউরোপীয়েরা বন্ধুত্ব দেখান নাই। এইরূপ ব্যবহার যে-সাম্রাজ্যে হয়, সাম্য লাভ করিয়া তাহার অন্তর্গত থাকিবার আশা কতটুকু?

—

জেলে বালকদের প্রাথমিক শিক্ষা

বঙ্গে কয়েকটি জেলে বালক কয়েদীদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বাংলার সর্ব্বত্রই এইরূপ বন্দোবস্ত হওয়া উচিত, এবং প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক নিরক্ষর কয়েদীকে লেখাপড়া শিখান কর্ত্তব্য।

—

বিদ্যাসাপেক্ষ উপার্জ্জনে অধিকার

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম জয়াকর একটি আইন করিয়াছেন, যাহার বলে একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াও কোন হিন্দু নিজের বিদ্যার দ্বারা উপার্জ্জিত ধনে সম্পূর্ণ অধিকারী থাকিতে পারিবেন, সেরূপ ধন এজমালী সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে না। অবশ্য এরূপ উপার্জ্জক নিজের উপার্জ্জন একাই ভোগ না করিতেও পারিবেন। ইহা ন্যায্য আইন, এবং একান্নবর্ত্তী পরিবারে কতকগুলি লোকের আলস্য অতঃপর প্রশ্রয় পাইবে না।

—

কংগ্রেস ও ব্যবস্থাপক সভা

কংগ্রেস নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সুতরাং আইনপ্রণয়ন যাঁহাদের কাজ ব্যবস্থাপক-সভা নামক সেই সব সভার সভ্য হইতে না চাওয়া তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এতটুকু পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের লোকদের মতভেদ না থাকিবারই কথা। কিন্তু কংগ্রেসের কার্য্যসাধক কমিটি স্থির করিয়াছেন, যে, অন্যেরাও ব্যবস্থাপক-সভাসমূহের সভ্য হইতে চাহিলে তাঁহারা তাঁহারও বিরোধিতা করিবেন ও করাইবেন, ভোটারদিগকে ভোট দিতে নিষেধ করিবেন ও নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। এ বিষয়ে মতভেদ হইবে। কংগ্রেসওয়ালারা বলিতে সেরূপ আইন প্রণীত হইতেও দিব না।" কিন্তু সব আইন খারাপ নয়, এবং তাঁহারা যদি ব্যবস্থাপক-সভা গঠিত হইতে না দেন (তাঁহাদের সেরূপ চেষ্টা ব্যর্থ হইবারই সম্ভাবনা), তাহা হইলে বড়লাট আরও অর্ডিন্যান্স জারী করিবেন। তাহাতেও অবশ্য প্রকারান্তরে কংগ্রেসের জয় হইবে বটে। আর একটা কথা বঙ্গের লোকদের মনে উদিত হইবে, যে, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর মত সভ্য ব্যবস্থাপক-সভায় থাকিলে অত্যাচারের প্রতিকার না হউক, অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হইতে পারিবে।

কংগ্রেসকে ইহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে, যে, তাঁহাদের লোকবল, অর্থবল এবং কর্ম্মশক্তি অসীম নহে। তাঁহারা প্রধান কাজ ব্যতীত খবরের কাগজের আফিসে পিকেটিং, ইস্কুল কলেজে পিকেটিং এবং ভোটারদিগকে নির্ব্বাচন কার্য্য হইতে নিবৃত্তকরণ প্রভৃতি কার্য্যেও শক্তি ব্যয় করিলে, প্রধান কাজ করিবার জন্য যথেষ্ট লোক, অর্থ ও শক্তি নিযুক্ত ও প্রযুক্ত হইতে পারিবে কি? তাঁহারা গবর্ন্মেণ্টের সহিত শক্তিপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অধিকন্তু অবিরোধী কোন কোন শ্রেণীর দেশের লোকদের সহিতও শক্তি পরীক্ষায় যুগপৎ প্রবৃত্ত হওয়া কি সমীচীন? আমরা কংগ্রেসওয়ালাদের মত আইন অমান্য করিতেছি না। সুতরাং তাঁহাদের ঐ কাজ কি উপায়ে সফল হইতে পারে, সে বিষয়ে আমরা কোন পরামর্শ দিতে অনিচ্ছুক, অসমর্থ ও অনধিকারী। কিন্তু একথা বলিবার অধিকার আমাদের আছে, যে, স্বদেশী সুতা ও কাপড় উৎপাদন কংগ্রেসের একটি গঠনমূলক কার্য্য; নানা অপ্রধান কাজে তাঁহাদের যে শক্তির অপচয় হইতেছে, তাহা এই গঠনমূলক কার্য্যে প্রযুক্ত হইলে দেশের কল্যাণ হইবে এবং স্বরাজলাভরূপ তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য পরোক্ষ উপায়ে সিদ্ধ হইবে।

—

ছাত্রদের কর্ত্তব্য

শিক্ষালয়সকলে পিকেটিং প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য মোটামুটি শ্রাবণের প্রবাসীতে বলিয়াছি। এখন

ছাত্রদের প্রধান কর্ত্তব্য। অন্যবিধ কর্ত্তব্যের কথাই বলিতেছি। পূজার ছুটি নিকট হইয়া আসিতেছে। শীঘ্রই নিতান্ত অসমর্থ লোক ব্যতীত হিন্দু বাঙালী মাত্রেই কিছু নূতন কাপড় কিনিবেন। এই সময় সকলেই যাহাতে দেশী কাপড় ক্রয় করেন, এই অনুরোধ ছাত্রেরা ছুটির আগে ও ছুটি আরম্ভ হইলে বাড়ী বাড়ী গিয়া সকলকে নম্রতাসহকারে জানাইতে পারেন। দেশী কাপড় কোথায় কি প্রকারে কি দরে পাওয়া যায়, তাহাও আবশ্যক মত জানাইতে পারিলে ভাল হয়। দেশীবস্ত্র উৎপাদনে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে ছাত্রেরা যদি সাহায্য করিতে পারেন, তাহা হইলে ত আরও ভাল।

—

"মিথ্যা বানাইবার কারখানা"?

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার কোন কোন গ্রামে সরকারী দমননীতি কি ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের একটি বেসরকারী কমিটি আলবার্ট হলের এক সভায় নিযুক্ত হয়। তাঁহারা কেহই কংগ্রেসদলের লোক নহেন। তদন্তের পর তাঁহারা যে রিপোর্ট প্রস্তুত করেন, তাহার অনেক অংশ যখন শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভায় পাঠ করিতেছিলেন, তখন অস্থায়ী হোম মেম্বার হেগ সাহেব রিপোর্টের অংশ-বিশেষ সম্বন্ধে বলেন, বাংলা গবর্ন্মেণ্টের কম্যুনিকে (বিজ্ঞাপনী) অনুসারে উহা অমূলক। তখন ক্ষিতীশবাবু বলেন, সরকারী কম্যুনিকের ঐ কথা একটি "লাই" অর্থাৎ মিথ্যা কথা। যে সরকারী আফিস হইতে ঐরূপ কম্যুনিকে বাহির হয়, তাহাকে তিনি "ফ্যাক্টরী অব্ লাইজ" অর্থাৎ মিথ্যা কথা বানাইবার কারখানা বলেন। বাংলা গবর্ন্মেণ্ট তাঁহার এই গুরুতর উক্তির একটি প্রমাণপূর্ণ উত্তর দিলে ভাল হয়।

—

সরকারী প্রপ্যাগ্যাণ্ডা

সরকারী সার্কেল অফিসাররা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টদের মারফৎ কতকগুলা ছোট ছোট হ্যাণ্ডবিলের মত কাগজ বিলি করাইতেছেন। তাহার কয়েকটা আমাদের হাতে আসিয়াছে। তাহাতে মিথ্যা ও অর্দ্ধ-সত্যের সাহায্যে দেশের লোকদিগকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই কাগজগুলার বিস্তারিত জবাব দিবার প্রয়োজন নাই, তাহা করিবার স্থান এবং সময়ও আমাদের নাই। আর একটা বাধার কথাও বলা দরকার। সরকার এমন আইন ও অর্ডিন্যান্স সকল করিয়াছেন, যে, সরকারপক্ষের সব কথার জবাব থাকিলেও তাহা প্রমাণসহ ভাল করিয়া দিতে গেলে জবাবদাতাকে বিপন্ন হইতে হইবে। সুতরাং এখন গবর্ন্মেণ্টের ধামাধরা লোকদের অবাধে যা তা বলিবার খুব সুবিধা হইয়াছে।

আমাদের হাতে যে কাগজগুলা আসিয়াছে তাহার এক একটাতে নীচের তালিকার এক একটা বিষয়ে তথাকথিত যুক্তিতর্ক আছে:—

আমাদের আসন্ন বিপদ, স্বরাজ, পরিধেয় বস্ত্র, পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা, আবগারী, স্বাধীনতার ভিত্তি শিক্ষায়। প্রথমটাতে বুঝান হইতেছে, পুলিস থাকার কি রকম দরকার। সে প্রয়োজন ত কেহ অস্বীকার করে না, কংগ্রেসওয়ালারাও করে না। পুলিসের কাজ লোকের ধন প্রাণ মান রক্ষা করা। তাহারা যদি তাহা করে, এবং অন্যায় কাজ না করে, তাহা হইলে কেহ তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ করিতে পারে না। কাগজটাতে লেখা হইয়াছে, যে, পুলিস না থাকিলে "দেশ এমন বিশৃঙ্খল ও অরাজক হবে যে, আমাদের গৃহসম্পত্তি গুণ্ডা ও দস্যুদের হস্তগত হবে। আমাদের সমস্ত সম্পত্তি নির্ব্বিরোধে লুঠ্ করবার এমন সুযোগ আর তারা পাবে না। আমাদের জীবন এবং নারীর সতীত্ব রক্ষা করা অসম্ভব হবে।" পুলিস না থাকিলে এই সব বিপদ ঘটিবে বলা হইয়াছে। কিন্তু পুলিস থাকাতেও ঢাকা শহরে ও জেলায়, কিশোরগঞ্জ মহকুমার বহু সংখ্যক গ্রামে, ও অন্যত্র এইরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা দিনের পর দিন ঘটিয়াছে। এই কাগজটাতে স্বীকার করা হইয়াছে, যে, "পুলিস দু'-একটা অন্যায় কাজ করে বটে!"

আর একটাতে বিদেশী কাপড় কেনার ও পরার কত সুবিধা এবং দেশী কাপড় ক্রয়ে দেশের কিরূপ ভীষণ ক্ষতি, তাহাই বুঝান হইয়াছে। বড়লাট ও অন্য লাটেরা—অর্থাৎ সাধারণতঃ গবর্মেণ্ট—বলিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বদেশীর খুব পক্ষপাতী। তাহা হইলে এই রকম ইস্তাহার কেন ছড়ান হইতেছে যাহাতে দেশী কাপড়ের অনুকূলে একটা কথাও লেখা হয় নাই ?

অন্য একটা কাগজে বলা হইতেছে, ইউনিয়ন বোর্ড দ্বারা স্বরাজের ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে। সরকারী লোকদের তাঁবেদারী করিয়া স্বরাজ লাভ হয়, ইহা নূতন কথা বটে। আলোচ্য কাগজগুলা একটা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সার্কেল অফিসারের হুকুমে বিলি করিতেছেন। ইহাই কি স্বরাজের নমুনা ?

"পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা" শীর্ষক চমৎকার পত্রীটিতে বলা হইতেছে, "একা মেদিনীপুর জেলার কাঁথি অঞ্চলে গত তিন মাসে দশটি ডাকাতি হয়েছে। এই হুজুগের পূর্ব্বে সারা বৎসরে একটি জেলাতে এত-গুলি ডাকাতি হ'ত কিনা সন্দেহ।" অর্থাৎ কিনা, সত্যাগ্রহীরা ডাকাত, কিংবা তাহারা পরোক্ষভাবে ডাকাতির প্রশ্রয় দেয়, কিংবা সত্যাগ্রহের জন্য অন্য কোন ভাবে ডাকাতি বাড়িতেছে। চমৎকার সিদ্ধান্ত !

আমরা অনেক বৎসর ধরিয়া খবরের কাগজ পড়িয়া আসিতেছি। সত্যাগ্রহের বহু পূর্ব্বে অনেক সময়ে এক এক মাসে, কখন কখন এক এক সপ্তাহে, এক একটা জেলায় পাঁচ সাত দশটা ডাকাতির খবর পড়িয়াছি। সেগুলা কেন হইত ? এখন যদি কোথাও সত্যসত্যই ডাকাতি বাড়িয়া থাকে, তাহার একটা কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, পুলিস অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় ডাকাতরা সুযোগ বুঝিয়াছে। অন্নাভাব এবং অর্থাভাবও আর একটা কারণ হইতে পারে।

"আবগারী"তে লেখা হইয়াছে, যে, আবগারী "ট্যাক্স ধার্য্য এবং তাহার ক্রমবৃদ্ধির প্রধান উদ্দেশ্য আবগারী জিনিষের ব্যবহার ক্রমশঃ কমাইয়া দেওয়া।" ভাল কথা। তাহা হইলে, মদ গাঁজা প্রভৃতির ক্রেতা যত কমিবে, যত লোকে নেশা ছাড়িবে গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্য তত বেশী পরিমাণে সিদ্ধ হইবে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে পিকেটিঙের প্রভাবে অনেক গাঁজাখোর গাঁজা ছাড়িয়াছে, কিন্তু পিকেটিং বে-আইনী কাজ। অতএব "আবগারী" শীর্ষক লেখাটার সব কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহাতে বর্ণিত সরকারী আবগারী নীতির সহিত পিকেটিং অর্ডিন্যান্সের সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে না।

শেষ যে কাগজটার কথা বলিব, তাহার মাথায় বড় অক্ষরে লেখা আছে, "স্বাধীনতার ভিত্তি শিক্ষায়"। সত্য কথা। কিন্তু সব রকম শিক্ষা স্বাধীনতার ভিত্তি নহে। "সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে"। এরূপ বিদ্যাই, এরূপ শিক্ষাই, স্বাধীনতার ভিত্তি হইতে পারে যাহা বাহ্য এবং আন্তরিক মুক্তির জন্য দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে সেই রকম শিক্ষা কোন্ কোন্ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া হয় ? আমরা কিছু দোষ ত্রুটি বিশিষ্ট সব স্কুল কলেজাদি বন্ধ করিয়া দিবার পক্ষপাতী নহি; তাহা-দিগকে রক্ষা করিয়া তাহাদের সংস্কারের, শিক্ষা-প্রণালী সংস্কারের, ইতিহাসাদি পাঠ্যপুস্তকের সংস্কারের পক্ষ-পাতী। কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা স্বাধীনতার ভিত্তি, ইহা স্বীকার করি না।

এই কাগজটাতে লেখা হইয়াছে, "স্বয়ং গান্ধী বলেছেন যে, এই স্বাধীনতালিপ্সা ভারতবাসীদের চিত্তে এনেছে একমাত্র ইংরাজী শিক্ষা।" গান্ধী কোথায় কখন কোন্ বক্তৃতায় একথা বলিয়াছেন, কোন্ কাগজে বা বহিতে লিখিয়াছেন ? একমাত্র ইংরেজী শিক্ষা আমাদের স্বাধীনতালিপ্সা জন্মাইয়াছে, মহাত্মা গান্ধী এমন কথা বলিতেই পারেন না।

তারপর গুপ্তনামা লেখক বলিতেছেন :—"বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই সেদিনও বলেছেন, যে, ভারতের এই স্বাধীনতালাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা শুধু ইংরাজ কবিদিগকেই গৌরবময় করে তুলছে। এ সংগ্রাম শুধু তাঁদেরই পদে পুষ্পাঞ্জলি।" রবীন্দ্রনাথের কোন উক্তিকে বিকৃত না করিলে তাহার চেহারা এরূপ দাঁড়ায় না। তিনি এরূপ কথা বলেন নাই। যদি রবীন্দ্রনাথ এইরূপ কথা বলিয়াছেন ধরিয়া লওয়া যায়,

তাহা হইলে ইংরেজ জাতির গৌরববর্দ্ধক এই সত্যাগ্রহ-সংগ্রামকে পিষিয়া ফেলিবার জন্য প্রায় সব ইংরেজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কেন হইয়াছে ?

গুপ্তনামা লেখকের মুখে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের দোহাই ভূতের মুখে রাম নামের মত।

—

রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু

গত ১৭ই শ্রাবণ, শনিবার, রায় বাহাদুর চুণীলাল বসুর মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন কৃতী সন্তান হারাইল। জীবদ্দশায় বসু মহাশয় এদেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের সহিতই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বাঙালীর খাদ্য সম্বন্ধে গবেষণা তাঁহার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি।

ইংরেজী ১৮৬১ সনে বসু মহাশয়ের জন্ম হয়, এবং ১৮৮৬ সনে মেডিক্যাল কলেজ হইতে পাঠ সমাপন করিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছুদিন অ্যাসিষ্টাণ্ট-সার্জ্জনরূপে কাজ করিবার পর তিনি বাংলা গবর্ণমেণ্টের রাসায়নিক পরীক্ষক পদে নিযুক্ত হন এবং কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করা পর্য্যন্ত এই কার্য্যেই নিযুক্ত থাকেন। ১৮৯৪ সনে বসু মহাশয় প্রথম ভারতীয় চিকিৎসা কংগ্রেসের চিকিৎসা ও আইন বিভাগের সহকারী সভাপতি হন ও বিষ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহার ফলে "বিষ আইন" (Poison Act) পাশ হয়। ১৯২১ সনে তিনি কলিকাতার শেরিফ নিযুক্ত হন।

বসু মহাশয় তিন বৎসর ধরিয়া "ক্যালকাটা মেডিক্যাল জার্নেল" সম্পাদন করেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদেরও অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন। রাসায়নিক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠানের সহিতও তাঁহার যোগ ছিল। তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিকেল ওয়ার্কস্ এর বোর্ড অফ ডিরেক্টরের সভাপতি ছিলেন এবং কলিকাতা কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ ও কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের ডিরেক্টর ছিলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণায় বসু মহাশয় কুষ্ঠরোগের কারণ নির্ণয়ে স্যর লিওনার্ড রোজার্সকে অনেক সাহায্য করেন। তাঁহার সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

—

শ্রীযুক্তা গিরিবালা রায়
সত্যাগ্রহের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত

আশ্বিন ও কার্ত্তিকের প্রবাসী

আশ্বিন ও কার্ত্তিকের প্রবাসী পূজার পূর্ব্বেই বাহির করিতে হইবে বলিয়া ভাদ্রের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গ অদ্য ২৫শে শ্রাবণ শেষ করিলাম।

ভ্রম-সংশোধন

গত শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীর ৬১৭ পৃষ্ঠার ২ পাটির—১৯ পংক্তিতে "স্কুলের ছাত্রদের বেশী স্বাধীনতা থাকা উচিত" স্থলে "স্কুলের ছাত্রদের চেয়ে কলেজের ছাত্রদের বেশী স্বাধীনতা থাকা উচিত" হইবে।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

যবদ্বীপের আমন্ত্রণ
শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩০শ ভাগ, ১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৩৭ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভারতে মুসলমান

স্যর যদুনাথ সরকার, সি. আই. ই

বর্ত্তমানের মধ্যে অতীতের প্রভাব

আমরা সচরাচর ভারতবর্ষের যে-সব ইতিহাস পড়ি, তাহার ভিতর এই জাতির প্রাণের সাড়া পাই না। এই-সব স্কুলপাঠ্য পুস্তকে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান ও ইংরাজ অধিকার, এই চারিটি যুগ একেবারে ভিন্ন ভিন্ন কোঠায় আবদ্ধ করিয়া দেখান হয়,—যেন একটিকে সংহার করিয়া, তাহার সমস্ত চিহ্ন লোপ করিয়া তবে তৎপরবর্ত্তী যুগ বা জাতি ভারতবর্ষ দখল করিয়াছে, পূর্ব্ব ও পরের মধ্যে কোনই সম্বন্ধ নাই; আগেকার যুগের প্রভাব, আগেকার যুগের দান, যেন পরের যুগে চলিয়া আসে নাই, যেন এই ভারতীয় জাতি প্রত্যেক যুগের শেষে মরিয়া গিয়া আবার নূতন শিশু হইয়া জন্মিয়াছে।

কিন্তু এইরূপ মনে করা ভুল। ইতিহাসের প্রকৃত শিক্ষা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যুগে যুগে ভারতের সেই একই প্রাণ, সেই একই জাতীয় বিশেষত্ব রাজা-রাজড়ার, ধর্ম্ম ও ভাষার অসীম পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সজীব থাকিয়া অগ্রসর হইয়াছে; বাহ্যবেশ বদলাইয়াছে বটে, কিন্তু মরে নাই, নিজ আত্মাকে হারায় নাই। সহস্র সহস্র বৎসরের শত শত রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ভারতীয় জনসঙ্ঘের (nationalityর) প্রাণ ও ব্যক্তিত্ব কিরূপে জীবন্ত থাকিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, প্রত্যেক যুগ হইতে, প্রত্যেক রাজার জাতি হইতে ভারতীয় জাতি কিরূপে দেহ ও চিত্তের পুষ্টিলাভ করিয়াছে, ভারতবর্ষ কিরূপে সেই যুগের দানগুলি নিজস্ব করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের দানগুলির সহিত তাহার সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছে, এবং ইহার ফলে যে ভারতীয় জাতি আমরা আজ চোখের সম্মুখে দেখিতেছি, তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় কেমনে উপনীত হইয়াছে, এই জনসঙ্ঘের চরিত্রের বিশেষত্ব ও গুণ, সভ্যতা ও চিন্তার সেই ক্রমবিকাশ পদে পদে দেখানই ইতিহাসের প্রকৃত কাজ।

প্রত্যেক মানুষের যেমন বাল্যকাল, যৌবন ও বার্দ্ধক্য ব্যাপিয়া একই দেহ, একই মন, একই আত্মা চলিয়া আসিয়াছে, সে যে যে বয়সে যাহা খাইয়াছে, করিয়াছে, ভাবিয়াছে তাহার সমষ্টি, যে যে দেশে বাস করিয়াছে তাহার জলবায়ুর ফলাফল তাহার দেহে এখন প্রকাশ পাইতেছে,—তেমনি হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও ব্রিটিশ যুগে ভারতে যাহা ঘটিয়াছিল, যে চিন্তা, যে সভ্যতা

প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা একেবারে লোপ পায় নাই, তাহার শ্রেষ্ঠ অংশগুলির সমবেত ফল বর্ত্তমান ভারতের জাতীয় চরিত্রে ও চিন্তায় রহিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ কোন একজন মানুষ যেমন জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই একই ব্যক্তিবিশেষ থাকে, সেইরূপ ভারতবাসী লোক-সমষ্টিরও একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে; প্রাচীনতম জ্ঞাত আর্য্যযুগ হইতে তাহা ধারাবাহিকরূপে নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিয়াছে; এবং তাহার শেষ ফল এখনকার আমরা।

স্মরণাতীত যুগ হইতে সময়ের স্রোতে ভাসিয়া কত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করিয়াছে। তাহাদের আদিম যে-সব পার্থক্য ও বিশেষত্ব ছিল, ক্রমে ক্রমে ভারতের জলবায়ু রোদ বৃষ্টি ভাত রুটির প্রভাবে তাহা লোপ পাইয়া তাহারা সকলেই এক ভারতীয় ছাপ লইয়াছে। আর্য্য হিন্দুই বলুন, আরব সৈয়দই বলুন, আর খৃষ্টান পর্তুগীজই বলুন, যে-সব লোক ভারতে স্থায়ী বসতি করিয়াছে, মুষ্টিমেয় পারসী জাতি বাদে তাহারা সকলেই নিজ নিজ আদি দেশের রক্তের বিশুদ্ধতা হারাইয়াছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে মিশ্র ভারতীয় জাতি হইয়াছে। নানা দেশ, নানা জাতি হইতে ভারতে আগত এই জনসঙ্ঘের উপর এই দেশের প্রভাবে যে এক ভারতীয় ছাপ পড়িয়াছে, তাহারা যে কার্য্যতঃ এখানে থাকিয়া এক বিশেষ জাতি, এক বিশেষ সভ্যতার স্রষ্টা ও অংশীদার হইয়াছে—নিজ নিজ পূর্ব্বতন বিদেশীত্ব হারাইয়াছে—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে রীজ্‌লী সাহেব ভারতের রাষ্ট্রীয় একতা অসম্ভব মনে করিতেন, তিনিও বলিয়াছেন—"বিদেশী ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে আসিয়া নানা প্রদেশে নানা জাতির মধ্যে আকৃতিতে, সমাজনীতিতে, ভাষায়, ধর্ম্মে, আচার-ব্যবহারে বিবিধ পার্থক্য দেখেন বটে, কিন্তু তিনি লক্ষ্য না করিয়া থাকিতে পারেন না যে, 'হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া তলে তলে একটা অনির্ব্বচনীয় জীবনের একতা' (uniformity of life) আছে। প্রকৃতই একটা সর্ব্ব-তাহার অংশগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখান সম্ভব নহে।" এই "সাধারণ সর্ব্ব-ভারতীয় বিশেষত্ব" আবহমানকাল হইতে গঠিত হইয়া আসিয়াছে, যুগে যুগে অল্পবিস্তর বাহ্যবেশ বদলাইয়াছে, আজও বদলাইতেছে, কিন্তু কখনও একেবারে নষ্ট হয় নাই।

চারি যুগে চারি জাতির দান

আজিকার ভারতবাসীদের এই সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব প্রধানতঃ চারিটি জাতির দান লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহারাই প্রকৃত যুগ-কর্ত্তা, ভারত-ভাগ্যবিধাতা; তাঁহাদেরই প্রভাব ঔষধের মধ্যেকার ধাতুপদার্থের মত আজ পর্য্যন্ত আমাদের রক্তে প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহারা (১) বৈদিক আর্য্যগণ, (২) বৌদ্ধগণ, (৩) মুসলমান ও (৪) ইংরাজ। ইঁহাদের প্রত্যেকেই এই দেশে একটি নূতন জিনিষ একটি নূতন ধরণের শক্তি প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন, তাহা পুরাতনের সহিত মিশ্রিত হইয়া পুরাতন ভারতকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে এবং নিজেও পরবর্ত্তী যুগে পরিবর্ত্তিত আকারে রহিয়া গিয়াছে। কোন যুগের কোন জাতির কোন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ দানই ভারত হারায় নাই,—এগুলি আজিকার ভারতের সার্ব্বজনীন সম্পত্তি।

আর্য্য ও বৌদ্ধযুগের ভারত সম্বন্ধে সুধীগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন; সে সম্বন্ধে আমি কিছু না বলিয়া, মুসলমান যুগে ভারত নূতন কি পাইয়াছিল, এবং তাহার কতটা এপর্য্যন্ত রাখিতে পারিয়াছে, তাহাই এখানে বিচার করিব। মুসলমান অধিকার আজ দেড় শত বৎসর হইল ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু ব্রিটিশ যুগের এই সব সহস্র সহস্র প্রবল পরিবর্ত্তনের মধ্যেও মুসলমান যুগের দান কত বেশী রহিয়া গিয়াছে, ব্রিটিশ-শাসকেরা তাহার কত বেশী অংশ নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

ভারতে মুসলমান বসতির বিশেষত্ব ও প্রকৃত স্বরূপ

মুসলমানদের পূর্ব্বে অনেক বিদেশী ও বিধর্ম্মী জাতি

(শক), পার্থীয়, মোঙ্গোলীয়। কিন্তু তাহাদের বংশ দুই তিন পুরুষ পরেই হিন্দুসমাজে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায়, হিন্দু নাম, হিন্দু ভাষা, বেশভূষা, ধর্ম্ম ও চিন্তা অবলম্বন করে; আর এদিকে হিন্দু ধর্ম্ম এবং সমাজও এই সব জাতির বিদেশ হইতে আনীত প্রাচীন প্রথা ও পূজার সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া, তাহার কিছু কিছু নিজস্ব করিয়া লইয়া, সবটার উপর ভারতীয় ছাপ লাগাইয়া দেয়। অর্থাৎ হিন্দুসমাজ একটা সার্ব্বজনীন মিলনের ও একত্রীকরণের প্রকাণ্ড যন্ত্র। এই যেমন,—খৃষ্টের প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে, গ্রীক দিয়নের পুত্র হেলিওডোরস্, যবন-রাজ আণ্টালকিদসের দূত হইয়া ভারতীয় রাজা ভাগভদ্রের সভায় আসেন; তিনি পথে মালব প্রদেশে বেসনগর নামক শহরে বিষ্ণুর পূজা করিয়া একটি গরুড়স্তম্ভ স্থাপিত করেন, এবং তাহার ফলকে নিজকে "ভাগবত" অর্থাৎ বৈষ্ণব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ গ্রীক যবন (যবন = Ionian) অনায়াসে হিন্দু হইয়াছিল।

কিন্তু মুসলমান বিজয়ের পর এইরূপ মিলন ও একত্রীকরণ বন্ধ হইল। হিন্দুধর্ম্ম ইসলামকে নিজস্ব করিয়া, মুসলমান জাতিগুলিকে হজম করিয়া ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত করিতে পারিল না। কারণ, ইস্‌লামের মূলমন্ত্র একেশ্বরবাদ। ইহুদীধর্ম্ম হইতে ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্ম্মের জন্ম; এই তিন ধর্ম্মেই ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ম্, তিনি "জাগ্রত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিহীন",—অর্থাৎ আল্লার (বা জিহোবার) সঙ্গে সঙ্গে আর কোন দেবদেবীকে উপাসনা করিলে তিনি ভীষণ রাগ করিবেন। হিন্দুদের কথাই আলাদা, তাহারা তেত্রিশ কোটী দেবদেবীকে পূজা করে, উহার সঙ্গে আল্লা, মহম্মদ বা যিশু নামে আর দু-তিনটা দেবতা যোগ করিয়া দিলে এই যৎসামান্য "বোঝার উপর শাকের আটি" হিন্দু উপাসক সমাজ অতি সহজে সহ্য করিতে পারিত;—এই যেমন অনার্য্যদের ও বৌদ্ধদের কত দেবতা অপদেবতা আমরা পূর্ব্বে লইয়াছি। কিন্তু ইস্‌লামী (এবং ব্রিটিশ যুগে খৃষ্টান) সম্প্রদায় কিছুতেই বহু-ঈশ্বর মানিতে সম্মত হইল না। হিন্দুরা অনেক চেষ্টা করিল, তাহারা "আল্লোপনিষৎ" লিখিল, বাদশাহ আকবরকে যুগ-ত্রাতা অবতার বলিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিল, এবং দরকার হইলে আরবীয় দেবদূতকে রামানুজ শঙ্কর প্রভৃতির ভাই বলিয়া মানিয়া লইত। কিন্তু মুসলমানেরা কোনমতে ইস্‌লামের মূলমন্ত্র ছাড়িয়া হিন্দুধর্ম্মের সহিত আপোষ করিলেন না। কোরাণে আছে—"অপবিত্র কেহই কাবাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। বহু-দেব-উপাসকগণ অপবিত্র।" এইজন্য হিন্দুসমাজ ইস্‌লামকে গ্রাস করিতে পারিল না।

অতএব হিন্দু ও মুসলমান (পরে হিন্দু ও খৃষ্টান) একই দেশে শত শত বর্ষ বাস করিয়াও সমাজে জীবনে এক হইতে পারে নাই। ভারতীয় মুসলমানদের হৃদয়ের দ্বার ভারতের দিকে বন্ধ,ভারতের বাহিরের দিকে খোলা। এখনও তাঁহারা প্রার্থনার সময় মক্কার একটি গৃহের দিকে মুখ ফিরান; তাঁহাদের চিন্তার, আইন-কানুনের, শাসন-পদ্ধতির, প্রিয় সাহিত্যের আদর্শ ভারতের বাহির হইতে আসে, তাঁহাদের নিজস্ব সভ্যতার উৎস আরবে, সিরিয়ায়, পারস্যে ও মিশর দেশে,—ভারতে ছিল না। হিন্দুদের সব দৃষ্টি, সব আদর্শ, সব কেন্দ্রই ভারতবর্ষের মধ্যে আবদ্ধ; ইসলামীয়দের ধর্ম্মের ভাষা, শকাব্দ, সাহিত্য, শিক্ষক, সাধুপুরুষ এবং তীর্থ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া এক, এসব ভারতের বাহিরের বস্তু।

মুসলমান যুগের দান

মুসলমান যুগে ভারতবর্ষের দশটি লাভ হয়, যথা—

(১) বাহিরের জগতের সঙ্গে আবার সংস্রব স্থাপন, আবার ভারতীয় নৌবল গঠন ও সমুদ্র পার হইয়া বাণিজ্য।

(২) একচ্ছত্র রাজত্বের ফলে ভারতের বহু প্রদেশ ব্যাপিয়া শান্তি, বিশেষরূপে আর্য্যাবর্ত্ত বা বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরের দেশগুলিতে।

(৩) সমস্ত দেশময় একই শাসন-প্রণালী এবং একই প্রভুর অধিকারের ফলে, লোকের মধ্যে কাজকর্ম্মে ব্যবসা-বাণিজ্যে, বাহ্যজীবনে এবং কিছু পরিমাণে চিন্তায়ও একতা স্থাপন।

(৪) হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে উচ্চ এবং চাকুরে

সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক আচার ব্যবহারে, পরিচ্ছদে ও ভব্যতায় এক প্রণালী অনুসরণ।

(৫) মুঘল চিত্রকলার উদ্ভব। ইহাতে প্রাচীন হিন্দু (অর্থাৎ অজন্তার) চিত্রপ্রণালী এবং নব আনীত চীনা প্রণালী একত্র মিলিত হইয়া তাহাদের সমাবেশ ও পরস্পর পরিবর্ত্তনের ফলে এক নবীন রমণীয় প্রণালীর উদ্ভব হয়। হিন্দু বিষয় লইয়া মুঘল চিত্রপ্রণালীতে যে-সব দৃষ্টান্ত অঙ্কিত হইয়াছে তাহাদের "রাজপুত-প্রণালী"র চিত্র বলা হয়।

গৃহনির্ম্মাণে মুসলমান যুগের কীর্ত্তি অমর হইয়া রহিয়াছে। হিন্দু রাজারাও ইহার অনুকরণ করিতেন।

কতকগুলি নবীন শিল্প,—যথা শাল, কিংখাব, মস্‌লীন্, গালিচা বুনান, পাথর বসান, বা অন্তধাতুর ফলকে সোনা রুপার কাজকরা (কোফ্‌ৎগরী) প্রভৃতি।

(৬) সাধারণের জন্য একটা বিষয়কর্ম্মের উপযোগী চলিত ভাষা, উর্দ্দু—অর্থাৎ সেনানিবাসের ভাষা, যে ভাষায়, তুর্কী ও পাঠান সৈন্যগণ ভারতীয় দোকানদার চাকর বা দূতদিগের সহিত কথাবার্ত্তা বলিত। ফারসীতে ইহার নাম "হিন্দবী" অর্থাৎ "ভারতীয়" ভাষা, বর্ত্তমান নাম হিন্দুস্থানী, দাক্ষিণাত্যে নাম "রেখ্‌তা" (অর্থাৎ পতিত, অপভ্রংশ)। কিন্তু এই কথিত ভাষায় উত্তর-ভারতে অনেক শতাব্দী পর্য্যন্ত সাহিত্য রচিত হয় নাই, সরকারী চিঠি, হিসাব এবং আদালতের রায় লিখিত হয় নাই। এই দুইটি কাজের জন্য ফারসী ভাষা ব্যবহৃত হইত। হিন্দু মুসলমান সব কর্ম্মচারী, এমন কি অনেক করদ হিন্দুরাজার দরবারও এই ফারসী ভাষা ব্যবহার করিতেন; ইহাই সেযুগে ভারতে একমাত্র রাজকার্য্যের ভাষা (official language) ছিল। ইহাও জাতীয় একতাবন্ধনের একটি কারণ হয়।

(৭) অপর দিকে, সংস্কৃতের ব্যবহার প্রায় লোপ পাওয়ায় মুসলমান যুগের দেওয়া শান্তি ও ঐশ্বর্য্যের ফলে হিন্দী বাংলা মারাঠী প্রভৃতি নব্য ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি আরম্ভ হইল।

(৮) হিন্দুসমাজের ভিতর একেশ্বরবাদী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব। বৈদান্তিক সুফী ধর্ম্মের প্রসার।

(৯) ইতিহাস-রচনা।

(১০) যুদ্ধবিদ্যায় এবং সভ্যতার সর্ব্বপ্রকার বিভাগে উন্নতি।

আমরা এখন কিছু বিস্তৃতভাবে এগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ভারত বাহিরের জগতকে আবার চিনিল

বৌদ্ধযুগের শেষ পর্য্যন্ত ভারতের সহিত দক্ষিণ ও পূর্ব্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, লোকের যাতায়াত, বাণিজ্যদ্রব্য ও গ্রন্থ বিনিময়, এমন কি বিদেশে উপনিবেশ-স্থাপন পর্য্যন্ত অবাধে চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু হূণদের শেষ পরাভবের পর অষ্টম শতাব্দীতে নবজাগরিত হিন্দু ধর্ম্ম নিজের ঘর গুছাইয়া তুলিল, হিন্দুসমাজকে নূতন করিয়া সাজাইয়া অতি কঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া রাখা হইল, বিদেশীবর্জ্জন সম্পূর্ণ হইল, সমাজের অঙ্গে নূতনের যোগ বা পরিবর্ত্তন মাত্রই পাপ ও আচারভ্রষ্টতা বলিয়া গণ্য হইল। তখন হিন্দুসমাজ প্রকৃতই "অচলায়তন" হইল, দেশের ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে চোখ বুজিয়া নিজকে বন্দী করিয়া রাখিল যেন, এদেশের বাহিরে কোন জনমানব নাই।

কিন্তু মুসলমানদের ভারত জয় করিবার ফলে ভারতবর্ষ আর একঘরে কোণঠেসা হইয়া রহিল না, আবার অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের সম্বন্ধ ও আদান-প্রদান আরম্ভ হইল। কিন্তু বৌদ্ধযুগে যেমন অগণিত ভারতীয় লোক—পণ্ডিত শ্রমণ বণিক ও উপনিবেশ-স্থাপনকর্ত্তা—বিদেশে চলিয়া গিয়াছিল, এই মুসলমান যুগে ভারতীয় হিন্দু কেহই বাহিরে গেল না, গেল কতকগুলি ভারতীয় মুসলমান, আর আসিল অসংখ্য বিদেশী মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি; ভারতের সহিত বাহিরের বাণিজ্য আরব ও বোহোরা, ডচ্ ও ইংরাজদের হাতে রহিল। বুখারা ও সমরকন্দ, বল্‌খ ও খুরাসান, খারিজম্ (খিভা) ও পারস্য হইতে জনস্রোত এবং পণ্যদ্রব্য আফঘান গিরিসঙ্কট দিয়া স্থিরভাবে নির্ব্বিবাদে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল, কারণ তখন আফঘানিস্থান দিল্লী-

সাম্রাজ্যের প্রদেশ মাত্র ছিল। (১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ইহা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হয়)। বোলান্ পাস দিয়া প্রতিবৎসর চৌদ্দ হাজার ভারবাহী উট ভারতীয় পণ্য-দ্রব্য কান্দাহার ও পারস্যে লইয়া যাইত (১৭ শতাব্দীর প্রথমাংশে)। বঙ্গে উপকূলের বন্দরগুলি বাহিরের সমুদ্র-তীরবর্ত্তী দেশগুলির পক্ষে ভারতে ঢুকিবার জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক দ্বার হইল। আর, আমাদের পূর্ব্ব উপকূলে মছলিপটন বন্দর হইতে অসংখ্য জাহাজ যাইত সিংহল, সুমাত্রা, জাভা, শ্যাম, চীনদেশে, এমন কি জান্জিবরেও!

এক শাসন-যন্ত্রের ফলে জাতীয় একতা

মুঘল সম্রাটদের দুইশত বৎসর ধরিয়া সতেজ অধিকারের ফলে, সমস্ত উত্তর-ভারত—এবং দাক্ষিণাত্যের অনেক অংশও—এক সরকারী ভাষা, শাসন-প্রণালী, মুদ্রা, এবং কথ্য সাধারণ ভাষা লাভ করিল। জাতীয় একতা সাধন করিবার পক্ষে এই উপাদানগুলি অমূল্য। মুঘল বাদশাহদের নিজেদের শাসিত প্রদেশের বাহিরেও অনেক হিন্দুরাজা তাঁহাদের শাসন-পদ্ধতি, কর্ম্মচারী বিভাগ ও উপাধি, সভার আদব-কায়দা, মুদ্রা প্রভৃতি অনুকরণ করিয়া সমস্ত ভারতের বাহ্যএকতা আরও বাড়াইয়া দিলেন।

দিল্লী-সাম্রাজ্যের বিশটি ভারতীয় সুবায়—অর্থাৎ পেশাওয়ার হইতে চাটগাঁ, এবং কাশ্মীর হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত—ঠিক এক ছাঁচে ঢালা শাসন-পদ্ধতি, কর্ম্মচারিবৃন্দ, আইন-কানুন এবং দরবার ও আদালতের ভাষা এবং কার্য্য-প্রণালী চলিত। সমস্ত সরকারী চিঠিপত্র ও হিসাবে এক ভাষা (ফারসী) ব্যবহৃত হইত। রাজকর্ম্মচারী ও সৈন্যগণ এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে ঘনঘন বদলি হইত। এইরূপে, কোন প্রদেশের অধিবাসী অপর প্রদেশে গিয়া বিদেশে আসিলাম বলিয়া মনে করিবার কারণ পাইত না; বণিক ও পথিকেরা এক সুবা হইতে অন্য সুবায় অতি সহজে যাতায়াত করিত। সকলেই বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের ছায়ার তলে ভারতকে এক দেশ এক জন্মভূমি বলিয়া বুঝিতে লাগিল। জাতীয়তার কল্পনা

মুঘল চিত্রবিদ্যার ক্রমবিকাশ

শিল্পকলায় মুসলমানদের দান ভারতবর্ষ এখনও হারায় নাই, এগুলি আমাদের অমূল্য সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। আগে চিত্রবিদ্যার বিকাশ দেখা যাউক। মুসলমান যুগের প্রথম প্রথম যে-সব চিত্র ভারতে পৌঁছিয়াছিল সেগুলি খুরাসান ও বুখারা (অর্থাৎ মধ্যএশিয়া)তে চিত্রিত হয়, তাহাদের শিল্পীরা চীনা চিত্রকর অথবা চীনাদের ছাত্র; এই সব "বিশুদ্ধ মধ্যএশিয়া বিদ্যালয়ের" ছবিগুলিতে চীনদেশীয় চিত্রপদ্ধতি ছত্রে ছত্রে দেখা যায়,—মুখচোখ,পর্ব্বত, জলাশয়, আগুন, এবং রাক্ষস সব অবিকল চীনা ধরণের, ইহা দেখিবামাত্র বুঝা যায়। আকবরের রাজসভায় এই চীনা চিত্রপদ্ধতি এবং প্রাচীন হিন্দু অর্থাৎ অজন্তার শিল্পরীতি একত্র জুটিল; প্রত্যেকেই নিজের প্রখর বিশেষত্বগুলি অল্পে অল্পে ছাড়িতে লাগিল, অপর পক্ষের রীতিনীতি লইতে লাগিল। চীন হইতে আনীত মধ্য-এশিয়ার চিত্রকলার কঠিনতা, একঘেয়ে ভাবগুলি লোপ পাইল, তাহার বাহ্য আকারে পরিবর্ত্তন হইল। আর, অজন্তা-এলোরার শিল্পীদের বংশধরগণও দেখিলেন যে শত শত বৎসর পূর্ব্বের পৈতৃক অচল প্রণালী ও নিয়ম এই নবীন যুগে চলে না, অন্যত্রও সৌন্দর্য্যবোধ আছে, অন্য দেশেও শিখিবার জিনিষ আছে, তাহার দিকে চোখ বুজিয়া থাকিলে নিজেই ঠকিতে হইবে। তাই চীনা ও হিন্দু চিত্র-কলার মিলনে ভারতে এক নবীন মিশ্র শিল্পরীতির জন্ম হইল, ইহাকে আজকাল "ইণ্ডিয়ান আর্ট," "ইণ্ডো-স্যারাসেন বা মুঘল চিত্র-বিদ্যালয়" বলা হয়। প্রথম প্রথম অর্থাৎ আকবরের উৎসাহে অঙ্কিত চিত্রে, দেখি যে চীনা চিত্রকলা যেন গলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, পর্ব্বত জলাশয় আগুন প্রভৃতি এক নূতন ধরণে আঁকা হইতেছে, সে ধরণটা চীনা প্রণালীর আভাস দেয় বটে কিন্তু অনেক পরিবর্ত্তিত আকারে, যেন কঠিন ধারাবাহিক বদ্ধমূল সংস্কার ছাড়িয়া দিয়া ঠিক প্রকৃতিকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সব চিত্রে মানুষ ও জীবজন্তুর মুখ এবং বাহ্য প্রাকৃতিক দৃশ্য সব পরিষ্কার ভারতীয়।

ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দু চিত্রকলার প্রভাব মুসলমান চিত্রকলাকে সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া নূতন কলেবর দান করিল। শাহ্‌জাহানের সময়ে (১৬৫০ খৃষ্টাব্দ) এই প্রণালীর পূর্ণ বিকাশ হইল, নব-ভারতীয় কলার সম্পূর্ণ জয় হইল, চীনা চিত্রবিদ্যার কোন চিহ্নই রহিল না, ভারতীয় প্রণালী সর্ব্বত্রই সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইতে লাগিল; মুখে চোখে এমন একটা কোমলতা, লাবণ্য ও বর্ণের সামঞ্জস্য, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশগুলি এমন যত্নে আঁকা, অলঙ্কার ও সজ্জা এত বিবিধ এবং মহিমাশালী, এবং চিত্রগুলি প্রকৃতির এত অনুরূপ—যে দেখিলেই মনে হয় ইহা ইউরোপীয় প্রভাবের পূর্ব্বকালীন ভারতের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ নিজস্ব উপহার। ইউরোপীয় চিত্রবিদ্যার দুটি সাধারণ নিয়ম, অর্থাৎ পার্‌স্পেক্‌টিভ (দূরের বস্তুকে ছোট করিয়া দেখান) এবং লাইট এণ্ড শেড (ছায়ার দ্বারা উঁচুনীচু বুঝান) মুঘল চিত্রে কখনও আসে নাই, কিন্তু অপর সকল গুণই ছিল। পণ্ডিতেরা প্রায়ই মুঘল চিত্রকে "রাফেলের পূর্ব্বের" ইটালীয় চিত্রকলার মত বলেন। অসংখ্য অকৃত্রিম আদি মুঘল চিত্র দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে শ্রেষ্ঠ মুঘলচিত্র (অর্থাৎ শাহজাহানের যুগে অঙ্কিত দৃষ্টান্ত)গুলি বটিচেলীর ছবিগুলির অনেক উপরে; এদুটির মধ্যে ঠিক তুলনা হয় না।

মুঘল চিত্রশিল্পের বিস্তার ও অবনতি

বাদশাহের দরবারে যে-সব বড় বড় চিত্রকরের ছাত্র শিক্ষা লাভ করিত পরে তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক'জন নিজ গুরুর পদ পাইত, অপর সব ছাত্র ওম্‌রা বা করদ রাজাদের দরবারে গিয়া অন্ন উপার্জ্জন করিত। ইহাদের চিত্রের বিষয় শাহনামা, জামী-নিজামীর কাব্য, তাইমুর-জীবনী, বা বাদশাহদের কীর্ত্তিকলাপ নহে—রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি হিন্দু সাহিত্য হইতে লওয়া। কিন্তু বিষয়গুলি হিন্দু হইলেও প্রণালী সম্পূর্ণ মুঘল রাজদরবারের অর্থাৎ ইণ্ডো-স্যারাসেন স্কুলের। সুতরাং ইহাকে এক স্বতন্ত্র "রাজপুত স্কুল" বলা ভুল। ক্রমে ক্রমে এই সব রাজার পালিত রাজস্থানের চিত্রকরগণ বাদশাহী সভার গুরুদের বিদ্যা অল্পে অল্পে ভুলিতে লাগিল, তাহাদের ছবিগুলিতে কোমলতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি লোপ পাইল, রঙের জাঁকজমক প্রখর হইয়া চোখে রূঢ় ঠেকিতে লাগিল; ছবিগুলি দেখিয়াই বোধ হইল যেন কাঁচা কারিকরদের দ্বারা তাড়াতাড়ি আঁকা কম খরচে প্রস্তুত দ্রব্য। (মোলারাম ও কাংগ্রা-প্রদেশীয় চিত্রকরগণ এই স্কুল হইতে বিভিন্ন)।

আওরংজীবের সময় হইতেই বাদশাহের অনাদরে, রাজকোষ শূন্য হওয়ায়, অবিরাম যুদ্ধে এবং তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণের নৈতিক অবনতির ফলে মুঘল চিত্রবিদ্যা ডুবিয়া গেল, কারণ এটির জন্ম ও বৃদ্ধি রাজসভায়, ইহার জীবন রাজা ও ওমরার অর্থব্যয়ের উপর নির্ভর করিত।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই মুঘল চিত্রবিদ্যার দ্রুত অবনতি; ওস্তাদ চিত্রকরগণ বৃদ্ধ বয়সে না খাইয়া মারা গেল, তাহাদের পুত্রগণ পৈতৃক ব্যবসার বৃথা আশা ছাড়িয়া দিয়া মুটে মজুর হইয়া মোটা ভাতকাপড় উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লক্ষ্ণৌয়ের নবাবদের অনুগ্রহে যে ভারতীয় চিত্রকলা জাগিয়া উঠে তাহা ইংরাজী ও মুঘল স্কুলের এক হাস্যাস্পদ খিচুড়ী, পিতামাতার কোন গুণই পায় নাই। ("আকবরের খৃষ্টান বেগম" এই মিথ্যা নামে পরিচিত চিত্রখানি এই স্কুলের একটি দৃষ্টান্ত)।

স্থপতি শিল্পে ভারতে মুসলমান কীর্ত্তি

আর, স্থপতিবিদ্যায় মুসলমান রাজা নবাবেরা ভারতকে যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহার অনেকগুলিই আমাদের চোখের সম্মুখে বিদ্যমান। ভারতে মুসলমান অট্টালিকা-নির্ম্মাণ-কলার যুগে যুগে ক্রমবিকাশ এখনও অতি সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিতে পারা যায়। আকবরের পূর্ব্বেকার রাজবাড়ীগুলি প্রায় ধ্বংস হইয়াছে বা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় চেনা যায় না, কিন্তু অনেক মসজিদ সমাধি এবং দুর্গ এখনও বর্ত্তমান আছে। দিল্লী এবং দিল্লীর বাহিরে দশ বারো মাইল স্থান যত্নের সহিত ঘুরিয়া দেখিলে এই যুগের অসংখ্য দৃষ্টান্ত চোখে পড়িবে। দাস-বংশের, খিলজীদের, তুঘলকদের, লোদীদের এবং শূর-বংশীয়দের সমাধি মসজিদ প্রভৃতি প্রত্যেকটি পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী যুগের দৃষ্টান্ত হইতে বেশ ভিন্ন, অথচ প্রত্যেক দৃষ্টান্তটি যে পূর্ব্ব হইতে

কোন্ কোন অংশ লইয়াছে এবং পরের যুগের স্থাপত্যকে কতকগুলি অঙ্গ দান করিয়াছে, ইহা পণ্ডিত না হইলেও দেখিবামাত্র বুঝা যায়।

তেমনি মুঘল যুগেও আকবর হইতে শাহজাহান (এবং আওরংজীবের প্রথম দশ বৎসর) পর্য্যন্ত যে-সব রাজকীয় প্রাসাদ ধর্ম্মমন্দির ও সমাধি নির্ম্মিত হয় তাহার মধ্যে একটা ক্রমবিকাশ আছে; এক কথায় বলা যাইতে পারে যে ক্রমে যেন শক্তি সরলতা ও কতকটা কর্কশতা সরিয়া গিয়া অলঙ্কার-বহুল স্নিগ্ধ কোমলতা বা দুর্ব্বলতাকে স্থান দিয়াছে। তাহার পর চিত্রের মত অট্টালিকা-নির্ম্মাণ-শিল্পেরও অবনতি রাজকোষের অর্থাভাবে ঘটিল। অবশেষে মাটীর বাড়ী বা সমাধি গড়িয়া তাহার বাহিরে একসার ইঁটের আবরণ অথবা সুর্কির আস্তর দিয়া ঢাকিয়া তাহার উপর রঙের বাহার ফলান হইলে লাগিল (মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দী)।

নব্য প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টি

কালক্রমে ভারতের অজস্র ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ সাহিত্যের ভাষা—সংস্কৃত এবং পালি, লোপ পাইল। সংস্কৃতের জ্ঞান ও চর্চ্চা চলিতে থাকিল বটে, কিন্তু তাহাতে আর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, শুধু Manual of Hindu Law, Astronomy made Easy, A short cut to Yoga এই ধরণের বহি, অর্থাৎ টীকার টীকা তস্য টীকা, লিখিত হইতে লাগিল। ইহা সাহিত্য নহে, ইহার ভিতর দিয়া জাতীয় প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না, লোকের হৃদয়ে পৌছান যায় না। এইরূপে দুঃখে অন্ধকারে কত শতাব্দী কাটিয়া গেল। তাহার পর মধ্যযুগের শেষাশেষি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জনসাধারণের ভাষা,—একটি একটি প্রাদেশিক "প্রাকৃত"—মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, নিজ অধিকার স্থাপিত করিল। আকবরের সময় হইতেই ইহার পূর্ণ প্রকাশ বলিতে হয়। সত্য বটে ষোড়শ শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বেও এই সব আধুনিক প্রাকৃত ভাষায় কিছু কিছু দোঁহা, ধর্ম্মকথা, গান ও মন্ত্র দেখা দেয়, কিন্তু তাহাকে সাহিত্য বলা যায় না, এবং তাহার অবয়বও অতি ক্ষীণ ছিল। প্রকৃত হিন্দী, বাংলা, মারাঠী, আসামী, ও পাঞ্জাবী সাহিত্যের প্রবহমান জীবনধারা ষোড়শ শতাব্দী হইতেই গণিতে হয়। মুঘল বাদশাহরা দেশকে শান্তি ও সুশাসন দান করিলেন, শান্তির ফলে লোকে নিশ্চিন্তমনে অর্থ উপার্জন করিতে লাগিল, দেশ ধনে ধান্যে পূর্ণ হইল; লোকে অবসর ও মনের শান্তি পাইল, সাহিত্যসৃষ্টির ইচ্ছা, সাহিত্য উপভোগের ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। ১৫০০ খৃষ্টাব্দের কিছু পর হইতেই আমরা নানা প্রদেশে নানা নব্য ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি দেখিতে পাই। বঙ্গে বৈষ্ণব লেখকগণ, ধর্ম্ম জীবনী সঙ্গীত তর্ক প্রভৃতি বিভাগে অগণিত বাংলা গ্রন্থ রচনা করিয়া মহাপ্রভুর মৃত্যু (১৫৩৩) হইতে আওরংজীবের অধিরোহণ (১৬৫৮) পর্য্যন্ত সওয়া শ' দেড় শ' বৎসরকাল উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। হিন্দীতে অতুলনীয় কাব্য "রামচরিতমানস" (তুলসীকৃত) ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়, কিন্তু এই পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের পূর্ব্বে কতকগুলি তারকা হিন্দী-আকাশে দেখা দিয়াছিল,—যেমন মালিক মুহম্মদ জয়সীর "পদুমাবৎ" ১৫৪০ সালে সম্পূর্ণ হয়, এবং তুলসীদাসের সমকালে বা অল্প পরে অখরাবৎ, স্বপনাবৎ, মধুমালতী প্রভৃতি কাব্য লিখিত হয়। মধ্য-ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে কবীর দাদূ ও নানক যে-সব ধর্ম্ম সঙ্গীত এবং বাণী রচনা করেন তাহা হিন্দী হইলেও ঠিক সাহিত্য নহে, ওগুলি যেন জীবনযাত্রার পক্ষে মন্ত্র, মুখস্থ করিয়া রাখিবার জন্য রচিত।

ভারতীয় বাদশাহদের দরবারে যে-সব পারসিক কাব্য এবং রামায়ণ মহাভারতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ রচিত হয় তাহা উল্লেখ করিব না, কারণ পারসিক সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার স্থান অতি হেয়,—ঠিক যেমন আমাদের লেখা ইংরাজী কাব্য; অথচ পারস্যে জন্ম এমন পারসিক লেখকও কয়েকজন ভারতে আসিয়া এইরূপ কাব্য লেখেন। ফলতঃ, রাজদরবারের সাহিত্য কখনও উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে পারে না, উহার প্রাণ নাই, বাহিরে বার্ণিশ আছে মাত্র। সে যুগের ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে দশ হাজারে একজনের বেশী আরবী ভাষা ব্যবহার করিতে পারিতেন না, (চোখ বুজিয়া কোরাণ মুখস্থ করা অন্য কথা), আর হয়ত পাঁচজন ফারসী ভাষায় লিখিতে বলিতে পারিতেন।

অবশিষ্ট সহস্র সহস্র মুসলমানের পক্ষে উর্দ্দুই কথ্যভাষা ছিল। অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় মুসলমানেরা উর্দ্দুতে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে, ইতিহাস রচনা করিতে, চিঠিপত্র ও আদালতের কার্য্যাবলী লিখিতে ঘৃণা করিতেন; বেতনভোগী কেরানী দ্বারা এসব কাজ ফারসী ভাষায় করা হইত। অর্থাৎ ভারতীয় মুসলমানদের নিজস্ব সাহিত্য ছিল না। আওরঙ্গাবাদ নগরবাসী ওয়ালী (১৭১০—৩০) প্রথম উর্দ্দু পদ্য ভদ্রসমাজে অধিক প্রচার করেন এবং পঞ্চাশ ষাঠ বৎসর পরে তাহাই সার্ব্বজনীন হইয়া উঠে। দাক্ষিণাত্যে ওয়ালীর অনেক পূর্ব্বে রাজা উজীর রেখ্‌তায় পদ্য লেখা অগৌরবের বিষয় মনে করিতেন না, কিন্তু এই রীতি উত্তর-ভারতে আসে নাই।

হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতের ফল

এই যে এত শত বৎসর ধরিয়া হিন্দু মুসলমান একই দেশে একই রাজার অধীনে বাস করিয়া আসিয়াছে, ইহার ফলে এই দুই ধর্ম্ম ও সমাজের মধ্যে পরস্পরের কি কি প্রভাব, কি কি আদান-প্রদান ঘটিয়াছে? প্রথমে ইহারা শত্রু ছিল, একের সহিত অপরের অস্তিত্বও যেন অসম্ভব, প্রকৃতির নিয়মের বিরোধী। কিন্তু আট শত বৎসরেও একে অপরটিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নাই, লোপ করিয়া দেয় নাই। দুইজনেই জীবিত আছে, কিন্তু অশেষ পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিয়া।

শিখ জাতির বিখ্যাত ঐতিহাসিক কানিংহাম্ মুসলমান-বিজয়ের নৈতিক ফল এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"এই নবাগত জাতি বীরত্বে ক্ষত্রিয়দের অপেক্ষা কম নহে, অথচ ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠতা মানে না, এবং একেশ্বরবাদ প্রচার ও মূর্ত্তিপূজার অবৈধতা ঘোষণা করে। ইহাদের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা ভারতীয় লোকদের মনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ঘাত-প্রতিঘাত করিতে লাগিল। * * * তাহার ফলে এদেশে নূতন নূতন কুসংস্কার গজাইয়া উঠিল, সেগুলি পুরাতন হিন্দু অন্ধবিশ্বাসের অনুরূপ; যেমন, পীর ও শহীদ, সাধু ও মৃত ধর্ম্মযোদ্ধা, কৃষ্ণ এবং ভৈরবের মতই অলৌকিক ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। ভারতে আসিয়া মুসলমানেরা ঈশ্বরের একত্ব ভুলিয়া তাঁহার শত শত পার্থিব সেবক ও প্রিয়পাত্রকেই পরিত্রাণলাভের উপায় বলিয়া জড়াইয়া ধরিল, [যেন বুদ্ধকে ছাড়িয়া বোধিসত্ত্বের আরাধনায় মন দিল।] * * অপর দিকে, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সংঘর্ষের প্রথম ফল হইল রামানন্দ কর্ত্তৃক ১৪ শতাব্দীর শেষভাগে এক মিলিত উপাসক সম্প্রদায় স্থাপন। * * * ঈশ্বরের চোখে সব লোকই যে-সমান, এই মতের উপর তিনি জোর দিলেন, সব খুঁটিনাটি আচার ও বিভাগের চিহ্ন ছাড়িয়া দিলেন, এবং সর্ব্ব জাতের লোককে শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা ভক্ত জোলা কবীর একদিকে হিন্দুর মূর্ত্তিপূজা ও ধর্ম্মশাস্ত্র, অপর দিকে কোরান এবং ধর্ম্মধ্বজিতার উপর আক্রমণ করিলেন, এবং প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের কঠিন ভাষা ছাড়িয়া নব্য চলিত ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন।"

একেশ্বরবাদের প্রচার

কিন্তু স্যর উইলিয়ম হাণ্টার ও অন্যান্য ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মত যে জাতিভেদ-বিরোধী এবং একেশ্বরবাদী যে-সব ধর্ম্ম মধ্যযুগের ভারতে জাগিয়া উঠে ইসলাম্ হইতে সেগুলির জন্ম—ইহা ইতিহাসের বিরোধী। আমরা জানি যে অতি প্রাচীন কাল হইতে যুগে যুগে হিন্দু সমাজে সকল ধর্ম্ম-সংস্কারক, উচ্চচেতা মনীষী এবং ভক্ত সাধক চেঁচাইয়া বলিয়াছেন যে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর উপরে একমাত্র পরমেশ্বর আছেন, তিনিই সর্ব্বোচ্চ উপাস্য; প্রকৃত ভক্ত সাধকগণ সকলেই সমান, সকলেই একজাতের, সরল বিশ্বাস ও পবিত্র জীবন যাপন জমকাল বিপুল কর্ম্মকাণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা সকলেই আরাধনা-পদ্ধতি ও মন্ত্রতন্ত্রকে সহজ এবং সাধারণের বোধগম্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই যেমন, তামিল কবি গাহিয়াছিলেন :—

How many various flowers
Did I, in bygone hours,
Cull for the gods, and in their honour strew;
In vain how many a prayer
I breathed into the air,
And made, with many forms, obeisance due.
Beating my breast aloud
How oft I called the crowd,
To drag the village car; how oft I stray'd
In manhood's prime, to lave
Sunwards the flowing wave,
And, circling Shiva fanes, my homage paid.
But they, the truly wise,
Who know and realize
Where dwells the Shepherd of the Worlds, will ne'er
To any visible shrine,
As if it were divine,
Deign to raise hands of worship or of prayer.

কেহ কেহ বলেন যে খৃষ্টীয় পাদ্রিদের প্রচ্ছন্ন প্রভাবে এই পদ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয়; কিন্তু পাঠকেরা খাঁটি হিন্দু-ভক্তি-সাহিত্য হইতে ইহার অনেক পূর্ব্বেকার একেশ্বরবাদী স্তোত্র দেখাইয়া দিতে পারিবেন।

সুতরাং, ইতিহাস পড়িয়া আমার মনে হয় যে মধ্যযুগে হিন্দুদের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে এইরূপ:—মুসলমান ধর্ম্ম ও সমাজের নিত্য প্রতিবেশী হইয়া থাকিয়া,তাহাদের কাজকর্ম্ম দেখিয়া দেখিয়া, হিন্দুদের মধ্যে অন্তর্নিহিত ধর্ম্মসংস্কারের বা সমাজসংস্কারের চেষ্টা এবং গড্ডলিকা প্রবাহের মত পুরাতন রীতিনীতি অনুসরণ না করিয়া নূতন স্বাধীন সম্প্রদায় স্থাপন করিবার আকাঙ্ক্ষা সতেজ এবং ফলবান হইয়া উঠিল, নবজীবন লাভ করিল। মুসলমানদের চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত এসিডের মত হিন্দুদের কুসংস্কার গলাইয়া দিতে লাগিল; হিন্দু সংস্কারকদিগের হৃদয়ে নূতন সাহস ও প্রেরণা আনিল।

এই যুগে অনেক নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় সৃষ্ট হইল, তাহাদের উদ্দেশ্য হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যে মিলন স্থাপন করা; এগুলির প্রতিষ্ঠাতারা ধর্ম্মের সব বিশেষ বিশেষ বাহ্য চিহ্ন, ক্রিয়াকাণ্ড, এবং বাঁধা মন্ত্রতন্ত্র ত্যাগ করিয়া, দুই দলেরই প্রকৃত ভক্ত ও সাত্ত্বিক লোকেরা যাহাতে আরামে একত্র মিশিতে পারে, এক উপাসনায় যোগ দিতে পারে, তাহার জন্য সহজ পথ খুলিয়া দিলেন। যাহারা তাঁহাদের নিকট দীক্ষা লইল তাহারা নিজের পূর্ব্বতন গোঁড়া ধর্ম্ম—ইসলাম বা হিন্দুত্ব—ছাড়িয়া দিয়া এই নূতন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাইয়ের মত সমান হইয়া মিশিয়া গেল। কবীর ও দাদু, চৈতন্য ও নানক, ঠিক এইরূপে হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে ভক্তদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ে স্থান দিলেন, এই সব শিষ্য এক নূতন একতার বন্ধনে আবদ্ধ হইল।

সুফী ধর্ম্মের বিস্তার

হিন্দু মুসলমান দুই সমাজেরই মূর্খ সাধারণ লোক, সংসার-বিরাগী সাধক, সন্ন্যাসী ফকির প্রভৃতির মধ্যে এই সব মহাপুরুষদের প্রভাব জয়লাভ করিল। আর, শিক্ষিত ভদ্রলোক, বিশেষতঃ কর্ম্মচারী-শ্রেণীর মধ্যে সুফীমতের বহুল বিস্তৃতি হইল। সুফী-মতকে একটা ধর্ম্মবিশেষ বলা ভুল; উহা চিন্তা করিবার, উপভোগ করিবার জিনিষ যতটা, জীবনের কর্ত্তব্যের পথনির্দ্দেশক নিয়মাবলী ততটা নহে। পণ্ডিত, দার্শনিক, লেখক, উদারচেতা সর্ব্বজীবে সমদর্শী বৈদান্তিক, ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা ভক্ত সাধক—এই শ্রেণীর লোকেরাই সুফী হইতে পারিতেন। ঈশ্বর সর্ব্ব জীবে সর্ব্ব দ্রব্যে,—গাছপাতায়, প্রস্তরে নদীতে, চন্দ্রের কিরণে, নির্ঝরের জলতরঙ্গে, ধাতুর দ্রব্যে, মৃত্তিকায়—"ঘটে পটে" পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছেন; তাঁহারই এক টুকরা আত্মার আকারে আমাদের দেহের মধ্যে আছে; মানুষের জীবাত্মা এই পরমাত্মার সহিত মিলিত হইলেই চরম শান্তি, পরম সুখ পায়, তাহার আর কোন উদ্বেগ আকাঙ্ক্ষা থাকে না, পুনর্জ্জন্ম হয় না; মানব প্রেমিক যেমন প্রেয়সীর সঙ্গে বিচ্ছেদহীন বাধাহীন চিরমিলনের লালসায় পাগল, তাহাকে কাছে পাইবার জন্য জগৎ ব্যাপিয়া ব্যর্থ চেষ্টায় ছুটিয়া বেড়ায়,হতাশ ক্রন্দন করে, নিজ অঙ্গে আঘাত করে, আবার দূরে ক্ষণমাত্র তাহার মূর্ত্তি দেখিলে আনন্দে নাচিতে থাকে,—সেইরূপ ভক্তের প্রাণও প্রিয়তমের সহিত ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে চিরকালের জন্য লয় পাইবার, অর্থাৎ পূর্ণ একাত্মভাব (তৌহিদ্) সাধনার দ্বারা লাভ করিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করে। তাই, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক মেঘমুক্ত রাত্রে পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ দেখিয়া ছাদের উপর আত্মহারা হইয়া নাচিয়াছিলেন। শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী, ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল, জলপ্রপাতের জীবন্ত প্রবাহ—এ সমস্তই সেই চিরসুন্দর চিরকাঙ্ক্ষিত

কিন্তু চির দূরবর্ত্তী প্রিয়তমের মূর্ত্তি দেখাইয়া দিয়া সুফীকে পাগল করে। অনেক সুফী-সাধক প্রেমের উন্মাদনায় নাচিতে নাচিতে মূর্চ্ছা যাইতেন (যেমন রাধা-নামের প্রথম অক্ষর শুনিবামাত্র চৈতন্যদেবের ভাব হইত)। তখন তাঁহাদের মুখ হইতে ভবিষ্যদ্বাণী ভগবৎবাক্য আপনা হইতে বাহির হইয়া আসিত। ইহার ফারসী ভাষায় নাম 'হাল্ কাল' (=দশা ও দৈববাণী) এবং এগুলি সিদ্ধ সুফীর চিহ্ন বলিয়া গণিত হইত। সজ্ঞান অবস্থায় ইঁহারা—এমন কি নিরক্ষর সুফী সিদ্ধপুরুষগণও—অজস্রধারার মুখে মুখে এই ঈশ্বর প্রেমের কবিতা রচনা করিতেন। ইহাই সে যুগে শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়, অধিক প্রচলিত সাহিত্য ছিল। অনেক হিন্দু কেরাণী (লালা কায়েথ এবং পঞ্জাবী ক্ষত্রী) এরূপ পদ্য লিখিয়া বই ভরাইয়াছেন।

সুফী-মতের দুইটি শাখা—পশ্চিম-এশিয়ার ও ভারতীয়। প্রথমটি গ্রীক দর্শনের, বিশেষতঃ আলেকজান্দ্রিয়া নগরের নব-প্লেতোনিষ্ট লেখকদের প্রভাবে গঠিত; দ্বিতীয়টি সংস্কৃত উপনিষদের নিকট ঋণী। বাদশাহ আকবর পারস্য হইতে আগত কয়েকজন বড় সুফী পণ্ডিত ও ভক্তকে আদর করিতেন, এবং নিজেও তাঁহাদের ধর্ম্মালোচনায় যোগ দিয়া আনন্দ পাইতেন। তাঁহারই আহ্বানে এবং অনুগ্রহে গোঁড়ামীশূন্য হিন্দু ও মুসলমান প্রকৃত ভক্তদের একত্র করিয়া এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের এবং এক সম্মিলিত উদারচেতা উপাসক-সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইল; দেশে সুফী-মতের বহুল প্রসার হইল। উভয় ধর্ম্মের মধ্যে একটি সেতু বাঁধিয়া দিবার এই যে চেষ্টা তিনি আরম্ভ করেন, তাহাতে তাঁহার প্রপৌত্র দারা শুকো প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। এলাহাবাদের সুবাদার থাকার সময় দারা কাশীর পণ্ডিতদের সাহায্যে পঞ্চাশখানা উপনিষদের ফারসী অনুবাদ রচনা করিলেন, তাহার নাম দিলেন "গূঢ়তম মন্ত্র", এবং বেদান্তে ব্যবহৃত দার্শনিক শব্দগুলির ফারসী ভাষায় প্রতিশব্দ দিয়া, এবং পারসিক সুফী-সাহিত্য হইতে অনুরূপ বচন উদ্ধৃত করিয়া, মুসলমান জগতের পক্ষে সহজে বেদান্ত বুঝিবার উপায় করিয়া দিলেন। এই গ্রন্থের নাম "মজ্মুয়া-উল-বহরাইন্" অর্থাৎ "দুই সমুদ্রের সঙ্গম" তাঁহার এই উদার মিলন-চেষ্টার প্রমাণ দিতেছে।

ইতিহাস-রচনা

ঐতিহাসিক সাহিত্য ভারতে যে মুসলমানদের দান তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, এবং এই দান যে কত মূল্যবান তাহা যাঁহারা এ বিষয় চর্চ্চা করিয়াছেন তাঁহারাই পূর্ণমাত্রায় বুঝিতে পারেন। হিন্দুদের পার্থিব ঘটনার ইতিহাস লিখিবার এবং সময়ের হিসাব রাখিবার অভ্যাস, এমন কি প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত, ছিল না। [ইউয়ান্ চুয়াং কথিত "নীলপীত" বৃত্তান্তের কোন প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাই।] আমরা অকালের ধ্যানে এত মগ্ন যে কালের গতির প্রতি দৃষ্টিই রাখি না। এই বৈদান্তিক জাতির নিকট মানুষের পার্থিব জীবন যেন একটা সরাই, অথবা যেমন

নানাপক্ষী এক বৃক্ষে
নিশীথে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে সবে
কে কোথায় উড়ে যায়!

অতএব এ সংসারে কি ঘটিল, কে কি করিল, তাহার বিবরণ রক্ষা করা, এমন কি তাহার দিকে মন দেওয়াও অমূল্য মানব জীবনের অপব্যয়মাত্র, নিজ চরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়া। এই মনোবৃত্তির ফলে মুসলমান আসিবার পূর্ব্বে হিন্দুরা ইতিহাস লেখে নাই; রাজার স্তুতির প্রশস্তি বা অতিরঞ্জিত কাব্য কিছু কিছু আছে, কিন্তু তাহা ইতিহাস নহে, তাহাতে তারিখ নাই বলিলে হয়; এবং শকাবলী (chronology) শ্রেণীর গ্রন্থ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু আরবেরা খুব হিসাবী লোক, বাস্তব জিনিষের প্রতি সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখে; এজন্য তাহারা ইসলামের আদি যুগ হইতে ঘটনার ইতিহাস, শকাবলী এবং জীবনী লিখিয়া গিয়াছে, এবং তাহাদের কাহিনীতে প্রচুর পরিমাণে তারিখ দেওয়া। প্রত্যেক দেশেই মুসলমানগণ বিপুল ঐতিহাসিক সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে, সেগুলি উচ্চ দার্শনিক চিন্তায় বা বিশ্লেষণে পূর্ণ না হইলেও, শ্রেণিবদ্ধ-ভাবে সুসজ্জিত, বাস্তব ঘটনার ভিত্তির উপর গঠিত, অনেক

স্থলে লেখকের নিজ অভিজ্ঞতা বা অনুসন্ধানের ফল, এবং প্রকৃত ইতিহাসের ভাষায় ও প্রণালীতে রচিত। অতীত যুগের ঘটনাপরম্পরা কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ ও দেশের দশা সত্যরূপে জানিবার পক্ষে এগুলি অমূল্য এবং একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য উপকরণ। এই-সব মুসলমান রচিত গ্রন্থ হইতে আমরা সে সময়কার হিন্দুজাতির এবং পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুরাজাদের পর্য্যন্ত সত্য কাহিনী জানিতে পারি। ক্রমে এই দৃষ্টান্ত হিন্দু লেখকগণ অনুকরণ করিতে শিখিলেন, মুঘল যুগে অনেক হিন্দু ফারসী ভাষায় ইতিহাস, জীবনী, ঐতিহাসিক পত্রাবলী লেখেন। এবং হিন্দুরাজগণও মুঘল বাদশাহদের অনুকরণে নিজ কীর্ত্তিকলাপ এবং বংশচরিত রচনা করাইলেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত এই কারণে আমাদের নিকট অতি বিশদভাবে পরিচিত হইয়া আছে, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন শতাব্দী ইহার সিকির সিকি পরিমাণ ঐতিহাসিক উপকরণও রাখিয়া যায় নাই। প্রত্যেক মুঘল বাদশাহ এবং তাঁহাদের পূর্ব্বের সুলতানগণের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ রাজত্বের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বেতনভোগী লেখক রাখিতেন এবং তাহাদের সব সরকারী কাগজপত্র দেখাইয়া ঐ ইতিহাসগুলিকে বাস্তব ভিত্তি দান করিতেন। এই সাহিত্য এদিকে হিন্দুদের চোখ ফুটাইয়া দিল।

সভ্যতার বৃদ্ধি ও প্রচার

শত শত বৎসর মুসলমান রাজত্বের ফলে ভারতীয় সভ্যতা নানা দিকে বিস্তৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। শিকার, বাজপক্ষী দিয়া অন্য পাখী মারা, নানা প্রকার খেলা এখনও তাহাদের মুসলমানী শব্দাবলী ও প্রণালী রক্ষা করিয়া এই বাহ্য প্রভাবের সাক্ষ্য দিতেছে। অসংখ্য ফারসী তুর্কী ও আরবী শব্দ চলিত হিন্দী, বাংলা ও মারাঠী ভাষায় ঢুকিয়া তাহাদের স্থায়ী অংশ হইয়া রহিয়াছে। মুসলমান যুগে রণনীতি খুব বেশী উন্নতি লাভ করে, কারণ ভারতীয় মুসলমানগণ বাহিরের গতিশীল ইস্লামীয় জগতের সঙ্গে সদা সংশ্রব রাখিত এবং তথাকার জ্ঞানের উন্নতির ভাগ পাইত। শেষে, স্বাধীন হিন্দুরাজারা মুঘল যুদ্ধ-পদ্ধতি ও অস্ত্রসজ্জা অনুকরণ করিতে লাগিলেন, মুসলমান সেনানী ভাড়া করিতে লাগিলেন। এই যুগে বারুদ ও কামানের ব্যবহার প্রথম আসিল, এবং তাহার অনিবার্য্য ফলে দুর্গ-রচনার প্রণালী সম্পূর্ণ বদলাইতে হইল। প্রাচীন হিন্দুযুগে যুদ্ধে গজের স্থান ছিল শ্রেষ্ঠ, এখন অশ্বারোহী সৈন্য প্রধান হইয়া উঠিল, আর হাতী শুধু সর্ব্বোচ্চ নেতার চড়িবার এবং শিবিরের বোঝা বহিবার বাহনে পরিণত হইল।

শুধু যুদ্ধের সরঞ্জাম ও প্রণালীতে, শাসনবিধি ও কর্ম্মচারিবৃন্দের বিভাগ এবং নামকরণে, রাজসভার আদব-কায়দাতে নহে,—বিলাসিতায়, অট্টালিকা-নির্ম্মাণে, উদ্যান-রচনায়, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের সর্ব্ববিধ বাহ্য জীবনে মুসলমান প্রভাব বিজয়ী হইয়া, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল; এই সেদিন মাত্র আমরা বৃটিশের অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছি; আর মুঘল-প্রভাবের অর্দ্ধশশী অস্তমিত হইয়াছে।

অনেক শিল্প, অনেক কলাবিদ্যা মুসলমান যুগের দান-স্বরূপ ভারতে স্থান পাইয়াছে; তাহার মধ্যে কাগজ-নির্ম্মাণ এবং কাগজের পুথির পাতায় ছবি আঁকার প্রতি বিশেষ করিয়া পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। আর-সব দৃষ্টান্ত সকলের সহজেই স্মরণ হইবে, সেগুলি আজও নানা দিকে আমাদের নিত্য ব্যবহারে আসিতেছে।

ছেলেধরা

পরশুরাম

শহরে আবার ছেলেধরার উপদ্রব সুরু হইয়াছে। অজ্ঞলোকে রটাইতেছে—বালি ব্রিজের বনিয়াদ পোক্ত করিবার জন্য দশ হাজার ছেলে পুঁতিবে। বিজ্ঞলোকে বলিতেছেন—ছেলেরা এখানকার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেছে। গরম দলের মুখপত্র দৈনিক ধূমকেতু ভ্রূকুটিকুটিল অক্ষরে প্রশ্ন করিয়াছে,—কোন্ দুরাত্মা স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশমাতৃকাকে সন্তানহারা করিতেছে? দেশদ্রোহী চুনকালি পত্রিকা ছোট্ট অক্ষরে জবাব দিয়াছে—তৎ ত্বমসি ধূমকেতো।

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় এই সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। তাঁর ছোট ছেলে ঘেণ্টু বলিল—'বাবা, ছেলেধরা বাবা ধরে? বল না বাবা।'

উকিল বিনোদবাবু বলিলেন—'তেমন-তেমন বাবা হ'লে ধরে বই কি। কিন্তু তুমি ভেবো না খোকা, আমরা রক্ষা ক'রব।'

বংশলোচনের শালা নগেন বলিল—'চাটুয্যে মশায়, আপনি সাবধানে চলা-ফেরা করবেন।'

বংশলোচন বলিলেন—'উনি ত প্রবীণ লোক, ওঁকে ধরবে কেন?'

নগেন বলিল—'মনেও ভাববেন না তা। হনুমানের আরক খাইয়ে তরুণ বানাবে, তারপর চালান দেবে।'

বংশলোচনের ভাগনে উদয় সভয়ে বলিল—'তরুণদেরই ধরচে বুঝি?'

কেদার চাটুয্যে হুঁকা রাখিয়া কহিলেন—'উদো, তুই কি রকম লেখাপড়া শিখেচিস দেখি। জোয়ান, যুবক আর তরুণ—এদের মধ্যে তফাৎ কি বল্ ত।'

উদয় বলিল—'জোয়ান হচ্চে যার গায়ে খুব জোর। যুবক মানে যুবা। তরুণ হ'ল গিয়ে মানে অর্থাৎ যাকে বলে—থামুন, অভিধান দেখে বল্চি—'

চাটুয্যে কহিলেন—'অভিধানে পাবি না, আজকাল মানে বদ্‌লে গেছে। আমি অনেক ভেবে-চিন্তে যা বুঝেচি বলি শোন্।—যাঁর দাড়ি গোঁপ দু-ই আছে তিনি হলেন জোয়ান, যেমন রবিঠাকুর, পি. সি. রায়। যাঁর দাড়ি নেই কিন্তু গোঁপ আছে তিনি যুবক, যেমন মহাত্মা গান্ধী, আশু মুখুয্যে। আর, যাঁর দাড়িও নেই গোঁপও নেই তিনি তরুণ, যথা—বঙ্কিম চাটুয্যে, শরৎ চাটুয্যে আর এই কেদার চাটুয্যে।'

উদয় বলিল 'আর আমি? নগেন মামা?'

চাটুয্যে কহিলেন—'তোরা হ'লি ওই তিনের বার, যাকে বলে অপোগণ্ড। ধরতে হয় তোদেরই ধরবে।'

উদয় চিন্তা করিয়া বলিল—'আমি দাড়ি রাখতুম, কিন্তু বউ বলে—'

নগেন ধমক দিল—'খবরদার উদো।'

চাটুয্যে মশায় বলিলেন—'এবার যে ছেলেধরার উপদ্রব হয়েচে সেটা কিছুই নয়। হয়েছিল বটে পাঁচ বছর আগে, যেবার আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের ছেলে নিরুদ্দেশ হয়।'

বিনোদবাবু বলিলেন—'কি হয়েছিল বলুন না চাটুয্যে মশায়!'

চাটুয্যে মশায় বলিতে লাগিলেন।

কার্ত্তিক ছেলেটি শিশুকাল থেকেই বেশ চৌকস। যখন দশ বছর বয়েস, তখন সে তার বান্ধবীদের ব'লত—মেয়েগুনো আবার মানুষ! মাথায় একগাদা চুল, আবার ফিতে-বাঁধা, আবার শুধু-শুধু দাঁত বার ক'রে হাসে! মারতে হয় এক ঘুঁষি। তারপর চোদ্দ বছর বয়সে সে তার পরম বন্ধুকে লিখলে—নারীর প্রেম? কখনই নয়। ভাই বাঁটলু, এ জগতে কারো থাকবার দরকার নেই, শুধু তুমি আর আমি। কিন্তু দু-বছর যেতে না-যেতে তার যৌবন-নিকুঞ্জের পাখী কা কা ক'রে

উঠল। কার্ত্তিক তার কবিতার খাতায় লিখলে—
নারী, বুঝিতে না পারি কভু, একান্ত আমারি তুমি হবে,
কত দিনে ওগো কত দিনে, পারচি নে আর পারচি নে।

ছেলের বয়েস হু হু ক'রে বেড়ে চল্ল, কিন্তু বাপের আক্কেল হ'ল না। চরণ ঘোষ অন্য বিষয়ে সেকেলে হলেও ছেলের বিয়ে দেবার বেলায় একেলে। ব'লত—ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখুক, রোজগার করুক, তারপর। কার্ত্তিক বেচারা কি আর করে, লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য উপন্যাস পড়ে, বন্ধুদের সঙ্গে প্রেমতত্ত্ব চর্চ্চা করে, থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখে। এমন সময় শহরে ছেলেধরার উপদ্রব সুরু হ'ল।

সে এক হুলস্থুল কাণ্ড। আজ পঞ্চাশটা ছেলে হারিয়েচে, কাল পঁচাত্তরটা; কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যারা নিরুদ্দেশ হচ্চে তাদের নাম-ধাম কেউ টের পায় না। এদিকে লোকে খেপে উঠেচে, মোটর গাড়ি পোড়াচ্চে, রাস্তার মানুষকে ধ'রে ধ'রে ঠেঙাচ্চে। কার্ত্তিকের কলেজ বন্ধ, চরণ ঘোষ তাকে দেশে এনে রেখেচে। একদিন কার্ত্তিক বল্লে—'হিষ্ট্রির খান-দুই বই বাঁটলোর কাছে রয়েচে, কলকাতায় গিয়ে নিয়ে আসি।' চরণ বল্লে—'যাবি আর আসবি, দুপুরের গাড়িতে ফিরে আসা চাই।'

বেলা শেষ হয়ে এল, কিন্তু কার্ত্তিকের দেখা নেই। তার মা কান্নাকাটি আরম্ভ করলেন, কারণ আগের দিন না-কি তেষট্টিটা ছেলে চুরি গেছে। অগত্যা কার্ত্তিকের খোঁজ ক'রতে চরণ ঘোষ আর আমি কলকাতায় চ'লে এলুম। বাঁটলোর ছোট ভাই সাঁটলো বল্লে, তার দাদা আর কার্ত্তিক ক'জন বন্ধুর সঙ্গে ওভারটুন হলে বক্তৃতা শুনতে গেছে। কিন্তু বাঁটলোর বোন তুবড়ি বল্লে—'শোনেন কেন, সব মিথ্যে কথা, বাবুরা অ্যাংলো-মোগলাই হোটেলে খেতে গেছেন, তারপর যাবেন বায়োস্কোপে, তারপর অনেক রাত্রে বাড়ি এসে দরজায় ধাক্কা লাগাবেন।' সারা পথ কার্ত্তিকের বাপান্ত ক'রতে ক'রতে চরণ ঘোষ আমার সঙ্গে হোটেলের খোঁজে চল্ল।

হোটেলটি বড়-রাস্তার ওপর, আলোয় গন্ধে কলরবে ভরপুর। ... কাকে বলে বাঙালীর হোটেলে গিয়ে দেখে এস। খোপে খোপে ছেলে-বুড়োর দল টেবিলে ব'সে পেটে মাংস ঠুসচে। বেচারাদের অপরাধ নেই, হাজার বছর ধ'রে শুনে এসেচে—এটা খেও না, ওটা খেও না। এখন যখন ভগবান সুবুদ্ধি আর সুবিধে দিয়েচেন তখন জন্ম-জন্মান্তরের অতৃপ্তি চট্‌পট্ মিটিয়ে নিতে হবে। মনে মনে আশীর্ব্বাদ করলুম—আহা এদের ভোজন সার্থক হোক। এই যে এরা বাঘের মতন গব্‌গব্ ক'রে খাচ্চে, সেই সঙ্গে যেন বাঘের সদ্‌গুণও কিছু পায়। এদের গায়ে গত্তি লাগুক, মনে সাহস হোক, খোঁচা দিলে এরা যেন খ্যাঁক্ ক'রে নির্ভয়ে তেড়ে যেতে পারে।

ঘরের শেষে একটা খাটো পরদার আড়ালে আমাদের শ্রীমানরা খাচ্চেন আর নানাপ্রকার তত্ত্বকথার আলোচনা করচেন। আমাদের দেখতে পান নি। চরণ ঘোষ তখন সবে গোঁসাই-মহারাজের কাছে মন্তর নিয়ে কণ্ঠি ধারণ করেচে, মাংসের গন্ধে কানে আঙুল দেয়। হোটেলের খোশবায় শুঁখে তার খুন চ'ড়ে গেল, ছেলেকে মারে আর কি। আমি তাকে জোর ক'রে থামিয়ে বল্লুম—'কর কি চরণ, নিজের ছেলেবেলার কীর্ত্তিকলাপ সব ভুলে গেলে? সেই যে কাবাবের ঠোঙা নিয়ে গাব গাছে চ'ড়ে খেতে আর কোকিল ডাকতে তা কি মনে নেই? ছেলের খাওয়া শেষ হোক, তারপর একটু আধটু ধমক দিও। আপাতত এদিকে চুপ্‌টি ক'রে বোসো, একটু ঘোলের সরবৎ খেয়ে ঠাণ্ডা হও, আর শ্রীমানরা কি আলোচনা করচেন তাই আড়ি পেতে শোনো। যদি কিছু অশ্রাব্য অলৌকিক কথা কর্ণগোচর হয়, তখন না-হয় গলা খাঁকার দিয়ে আত্মপ্রকাশ করা যাবে।'

ছেলেরা যে-ভাষায় আলাপ করছিল তার চার আনা বাংলা, আট আনা ইংরিজী, আর চার আনা বোধ হয় ফ্রেঞ্চ, কারণ চন্দ্রবিন্দুর রেশ প্রায়ই কানে আসছিল। আন্দাজে বুঝলুম, আলোচ্য বিষয়টি হচ্চে কার কি রকম প্রণয়িনী পছন্দ। শেষটায় কার্ত্তিক টেবিল চাপড়ে বল্লে—'থিওরি টিওরি আমার নেই; আমি চাই এমন

মতন সাহসী, জিগীষা দেবীর মতন লেখিকা, মেজদির ননদের মতন রসিকা, লোটি রায়ের মতন গাইয়ে, কাথ্‌তা খাঁর মতন নাচিয়ে।'

চরণ ঘোষের চোদ্দপুরুষ কখনো এমন তিলোত্তমা দেখে নি। চুপি চুপি বললুম—'চরণ, আর কথাটি নয়, বাবাজাকে এই আস্‌চে অঘ্রানেই ঝুলিয়ে দাও, নইলে বেচারা বাড়ি-বাড়ি হ্যাংলা-দিষ্টি দিয়ে বেড়াবে।' চরণ লাফিয়ে উঠে বল্‌লে—'দাঁড়াও, হ্যাংলাপনা ঘুচচ্চি।'

তারপর মশায় চরণ ঘোষ হাত-নেড়ে এমন চীৎকার আরম্ভ করলে যে, হোটেল-সুদ্ধ লোক হকচকিয়ে গেল। নিজের ছেলে, তার বন্ধুর দল, হোটেলওয়ালা, ইউনিভার্সিটি, আধুনিক সভ্যতা, কাকেও বাদ দিলে না। কাত্তিক ঘাড় হেঁট ক'রে গালাগাল হজম ক'রতে লাগ্‌ল, কিন্তু অন্য ছেলেরা রুখে উঠল, হোটেলের ম্যানেজারও আস্তিন গুটিয়ে লড়তে এল।

বাঁটলো ছেলেটি অতি মিষ্টভাষী আর বিনয়ী। সে খুব মোলায়েম ক'রে বল্‌লে—'দেখুন চরণবাবু, নিজের ছেলেকে আপনি যা খুশী বলতে পারেন, কিন্তু আমরা কি করি না-করি আপনার পিতার তাতে কি?'

ম্যানেজার বল্‌লে—'জানেন, আপনাকে পুলিসে দিতে পারি?'

চরণ মুখ ভেংচে বল্‌লে—'দাও না দেখি।'

ম্যানেজার বল্‌লে—'জানেন, এটা অ্যাংলো-মোগলাই কেফ?'

বাঁটলো বল্‌লে—'কেফ নয়, কাফে।'

ম্যানেজার বল্‌লে—'ওই হ'ল। জানেন, এটা একটা রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল রেষ্টাউর‍্যাণ্ট?'

বাঁটলো বল্‌লে—'রেস্তোরাঁ।'

ম্যানেজার বল্‌লে — 'এক-ই কথা। জানেন, এটা হচ্চে শিক্ষিত লোকের রেণ্ডেজভোঁস?'

বাঁটলো বল্‌লে—'রাঁদেভু।'

বার-বার বাধা পেয়ে ম্যানেজার বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে—'আরে থামো ডেঁপো ছোকরা। ডেভিল মামলেট দেরাই বেচে বুড়িয়ে গেলুম, এখন ইনি এলেন উরুশ্চারণ শেখাতে!'

বাঁটলো গর্জ্জন করে বল্‌লে—'খদ্দেরকে অপমান? টেক্‌ কেয়ার, তোমার হোটেল বয়কট ক'রব, কেবল কুকুরের ঠ্যাং আর সাপের চর্ব্বি চালাচ্চ!'

আমার পাশের টেবিলে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসেছিলেন। ইনি একজন নীরব-কর্ম্মী, ছ প্লেট কোর্মা চুপচাপ শেষ ক'রে রাইসরষে আর নেবুর রস দিয়ে কাঁচা টোমাটো খাচ্ছিলেন। ইনি চম্‌কে উঠে বল্‌লেন—'কী ভয়ানক! সেজন্যেই ত আমি ওসব খাওয়া ছেড়ে দিয়েচি, কেবল জোচ্চুরি, ভাইটামিনের নামগন্ধ নেই।'

আমি বল্‌লুম—'ভাইটামিন যদি চান, তবে কাঁটাল খান।'

বাল্যে দুগ্ধ, যৌবনে লুচি-পাটা, বার্দ্ধক্যে একটু নিমঝোল আর প্রচুর হরিনাম—এই হ'ল মানুষের স্বাভাবিক পথ্য। কিন্তু আজকাল বৃদ্ধরা শিখেচেন যে ভাইটামিনই হচ্চে ভবনদীতে ভাসবার ভেলা। হোটেলের সমস্ত প্রবীণ খদ্দের চোপ্‌ চোপ্‌ ক'রে ধমক দিয়ে বাঁটলো, ম্যানেজার আর চরণ ঘোষকে থামিয়ে দিলেন। তারপর আমার চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে উৎসুক হয়ে বল্‌লেন—'হাঁ, তারপর মশায়, কাঁটালের কথা কি বলছিলেন?'

আমি একটি ছোট্ট বক্তৃতা দিলুম।—ফলের শ্রেষ্ঠ হচ্চে কাঁটাল, আবার কাঁটালের রাজা হচ্চে ওতোর-পাড়ার বঞ্জুলবাবুদের গাছের রস-খাজা। এক-একটি কোয়া এক-এক পো, কাঁচা সোনার বর্ণ, ভাইটামিনে টইটম্বুর। গালে দিয়ে বার-পাঁচেক এদিক ওদিক চলাচল করুন, তারপর চক্ষু বুঁজে একটু চাপ দিন, অবলীলাক্রমে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবে। কোথায় লাগে সন্দেশ পানতুয়া রসগোল্লা।

টোমাটো-ভোজী বাবুটি বল্‌লেন—'কোন্‌ ক্লাসের ভাইটামিন মশায়—এ, বি, না সি?'

বল্‌লুম—এ-বি-সি-ডি, বি-এল-এ-ব্লে, স্লাই-ফক্স-মেট-এ-হেন, যা বলেন। হেন বস্তু নেই যা কাঁটালে পাবেন না। গুঁড়ি চিরুন, তক্তা হবে। পাতা পাকিয়ে নিন, তামাক খাবার উত্তম নল হবে। আর ফলের ত কথাই নেই। কাঁচার কালিয়া খান, যেন পাঁটা। বিচি

পুড়িয়ে খান, যেন কাবুলী মেওয়া। পাকা কোয়ার রস গ্রহণ ক'রে ছিবড়েটা চরকায় চড়িয়ে সুতো কাটুন, বেরুবে সিল্ক।'

ভদ্রলোক মুখ বেঁকিয়ে বল্লেন—'ননসেন্স।'

আমি বল্লুম—'বিশ্বাস হ'ল না? তবে মরুন কাঁচা টোমাটো খেয়ে। আমরা চল্লুম, নমস্কার।'

ম্যানেজার তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল—'ও মশায়, দুটো ঘোলের দাম দিলেন না?'

আরে মোলো, আবার দাম চায়! এত-বড় একটা কুরুক্ষেত্র থামিয়ে দিলুম সেটা কিছু নয়? আচ্ছা বাবা, নাও এই সিকি। দাম চুকিয়ে কাত্তিককে চুপিচুপি কিছু সদুপদেশ দিয়ে চরণকে বল্লুম—'তুমি এবার সেয়ালদ যেতে পার, ন'টার ট্রেন এখনো পাবে। আমি আর কাত্তিক আজ রাত্রে বাঁটলোদের বাড়িই থাকব। দুদিন পরে বাবাজীর রাগ পড়লে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাব এখন।'

চরণ ঘোষ চ'লে যাবার পর আমি, কাত্তিক, আর তার চার বন্ধু বাঁটলো কেলো গোপলা ঘনেন হোটেল থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে এলুম। পথে যেতে যেতে কেলো বল্লে—'এ অপমান কখনই সহ্য করা যায় না, আমরা বানের জলে ভেসে এসেচি না-কি? কাত্তিক, তোর বাপকে এক্ষুনি উকিলের চিঠি দে, পাঁচশো টাকা ড্যামেজ। মকদ্দমায় আমরা সাক্ষী হব।'

গোপলা বল্লে—'বাপের নামে নালিশ দেখায় খারাপ। বরং খবরের কাগজে ছাপিয়ে দে, সমস্ত ছেলের দল খেপে উঠবে।'

ঘনেন বল্লে—'উঁহু। তার চেয়ে জিগীষা দেবীর কাছে চল্, তাঁকে ব'লে ক'য়ে আমরা একটা আশ্রম খুলব। কাগজে ছাপাব—এস কে কোথায়, আছ বাংলার ছেলেরা—নির্য্যাতিত উৎপীড়িত অসহায় বুভুক্ষু—'

কেলো বল্লে—'ঐ সঙ্গে একটা মেয়েদের বিভাগও খোলা উচিত।'

কাত্তিকের এসব পরামর্শ পছন্দ হ'ল না। বল্লে—'বাঁটলো, হাইড্রোসায়ানিক এসিডের দাম কত রে?'

বাঁটলো বল্লে—'অনেক দাম। তার চেয়ে কেরোসিন তেল ঢের সস্তা। দশ পয়সায় কাজ সাবাড়।'

কাত্তিক বল্লে—'কিন্তু বড্ডো জ্বালা ক'রবে যে?'

বাঁটলো আশ্বাস দিলে—'সে কতক্ষণ? একবার মরতে পারলে মোটেই টের পাবি না।'

আমি বল্লুম—'ছি বাবা কাত্তিক, ওসব কোরো না। একে বাপ তায় বয়সে বড়, বল্লেই বা একটু কড়া কথা। বাপের সুপুত্তুর হ'লে সব দেবতা খুশী হন। এই দেখ, রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞায় বনে গিয়েছিলেন।'

ঘনেন বল্লে—'জব্দও হয়েছিলেন তেমনি। মাথায় জটা, গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো নেই, চোদ্দ বচ্ছর ভ্যাগাবণ্ড, বউ গেল চুরি। চল্ রে বাঁটলো, আমরা একবার জিগীষা দেবীর বাড়ি গিয়ে তাঁর বাণী নিয়ে আসি।'

ছেলেদের বল্লুম—'এত রাত্রে কেন আর তাঁকে বিরক্ত করা, এখন নিজের নিজের বাড়ি গিয়ে ঘুমও গে।' কিন্তু তারা বাণী না নিয়ে ফিরবে না, অগত্যা আমিও সঙ্গে সঙ্গে চল্লুম। বুড়োদের রাজত্ব শেষ হয়েচে, এখন ছোকরাদের পেছু-পেছু দৌড়নোই বুদ্ধিমানের কাজ।

করলাবাগান ফার্ষ্ট লেনে জিগীষা দেবীর বাসা। রাত প্রায় ন'টা, কিন্তু বাড়ির দরজা তখনো খোলা রয়েচে। ঘনেন দু-বার ব্যায়রা ব্যায়রা বলে চেঁচাতেই নাকে ঝুমকো পরা একটা নেপালী ঝি বেরিয়ে এল। বাঁটলো বললে—'চাটুয্যে মশায়, আপনিই আমাদের দলের সর্দ্দার, দিন আপনার কার্ড পাঠিয়ে।'

কার্ড-ফার্ড আমার কোনো কালে নেই। ঝিকে বল্লুম—'মাইজীকে গিয়ে খবর দাও কেদার চাটুয্যে আর পাঁচ ছোকরা মোলাকাৎ করনে মাংতা।'

ঘনেন বল্লে—'ছোকরা নয়, বলুন তরুণ।'

—'হাঁ হাঁ, বোলো পাঁচঠো তরুণ আর একঠো বুড্ঢা মাইজীর সাথ দেখা করেগা।'

ঝি চোখ কুঁচকে বললে—'মাইজী?'

বল্লুম—'হাঁ রে বাপু, জিঘাংসা দেবী।'

ঘনেন ধমকে উঠে বললে—'জিগীষা দেবী। ...

মশায়, আপনার ভীমরতি ধরেচে, ভদ্রমহিলার কাছে গিয়ে অসভ্যতা করবেন দেখচি।'

আমার বড় রাগ হ'ল। নাম বলতে একটু ভুল করেচি তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েচে? বল্‌লুম—'দেখ্ ঘনা, তুই আর আমার কাছে সভ্যতার বড়াই করিস না। ক'টা মহিলা দেখেচিস তুই? জানিস, আমার তিন খুড়শাশুড়ী, চার শালাজ, সাত শালী, আর গিন্নী ত আছেনই—এই চল্লিশ বৎসর তাঁদের সঙ্গে কারবার করে আসচি?'

ঝি ফিরে এসে আমাদের নিয়ে গেল দোতলার একটি ছোট ঘরে। জিগীষা দেবী টেবিলের কাছে ব'সে খান-কতক মোটা-মোটা হিসেবের খাতা উলটচ্চেন। বল্‌লেন—'আমাকে এখনি একটা কমিটি মিটিং-এ যেতে হবে, আপনারা একটু তাড়াতাড়ি বক্তব্য শেষ করলে বাধিত হব।'

জিগীষা দেবী বেশ দশাসই মহিলা, জবরদস্ত চেহারা, পরিপাটি সাজগোজ। পাউডারের স্তর ভেদ ক'রে সুগোল মুখের নিবিড় শ্যামকান্তি উঁকি মারচে, কালিদাস যদি দেখতেন ত লিখতেন—যেন খড়িপড়া ছাঁচিকুমড়ো। আমি একটু ঘবড়ে গিয়েছিলুম, কারণ এরকম ডেপুটেশনে আসা আমার অভ্যেস নেই। কিন্তু ছেলেরা যখন আমাকেই মুখপাত্র স্থির করেচে তখন কথা কইতেই হবে। বল্‌লুম—'মা লক্ষ্মী, এই যে দেখচেন পাঁচজন ছোকরা, এরা হচ্চে পাঁচটি তরুণ। এটির নাম কার্ত্তিক, চমৎকার ছেলে, কিন্তু এর বাপ চরণ ঘোষ একে বলেচে শুয়োর-কা-বাচ্চা, তাতে বাবাজীরা সকলেই বড় মর্ম্মাহত হয়েচেন। আমরা ছেলেবেলায় বাপ-জ্যাঠার গালাগাল বিস্তর খেয়েচি, সোনা-পারা মুখ ক'রে সমস্ত সয়েচি। কিন্তু সেদিন আর নেই মশায়। তখন এই কলকাতায় ঘোড়ার ট্রাম চ'লত, ছেলেরা গোঁপ রাখত, কোটের ওপর উড়ুনি ওড়াত, মেয়েরা নোলক প'রত আর নাইবার ঘরে লুকিয়ে গান গাইত, গভর্মেণ্টকে লোকে তখন ব'লত সদাশয় সরকার বাহাদুর।'

জিগীষা দেবী বাধা দিয়ে বল্‌লেন—'তরুণদের দলে আপনি কেন?'

শক্ত সমস্যা। কিন্তু কেদার চাটুয্যে ঠকবার ছেলে নয়, বল্‌লুম—'আজ্ঞে আমি একজন প্রবীণ তরুণ।'

বাঁটলো এক্সপ্লেন ক'রে দিলে—'ওঁর বয়েস হয়েচে বটে, কিন্তু মনটি একদম কাঁচা।'

জিগীষা দেবী কিন্তু খুশী হলেন না। আমি উপমা দিয়ে বুঝোবার চেষ্টা করলুম—'কি রকম জানেন? এই গুজরাটী ডাব আর কি, ওপরে ঝুনো ভেতরে নেয়াপাতি।'

ঘনেন তখন রেগে কাঁই হয়েচে। আমাকে ধম্‌কে বল্‌লে—'চুপ করুন চাটুয্যে মশায়, কেবল আবোল-তাবোল বকচেন। কেলো, তুই বল্।'

কেলো তখন হোটেলের সমস্ত কাণ্ড বর্ণনা ক'রে বল্‌লে—'দেখুন, আমরা বড়ই অপমানিত উৎপীড়িত নির্য্যাতিত হয়েচি। বাড়িতে অধীনতার আবেষ্টনে আর থাকতে চাই না, নিজেদের একটা স্বাধীন আশ্রম বানাতে চাই। পিঁজরে-ভাঙা চন্দনা চায় পাখ্‌না মেলে বাঁচতে রে, অরুণ-রাঙা মুক্তাকাশের তক্তাপোষে নাচতে রে। আপনি যদি একটু চেষ্টা করেন তবে অনায়াসে একটা আশ্রম গ'ড়ে উঠবে। এখন এ সম্বন্ধে একটি বাণী আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি।'

জিগীষা দেবী কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। তারপর শিস দিয়ে ডাকলেন—'সুষ্, সুষ্—'

একটি ছোট্ট প্রাণী গুট্‌গুট্ ক'রে ঘরে এল। কুত্তা নয়। ইনি সুষেণবাবু, জিগীষা দেবীর স্বামী। রোগা, বেঁটে, চোখে চশমা, মাথায় টাক, কিন্তু গোঁপজোড়াটি বেশ বড় আর মোম দিয়ে পাকানো। সতীসাধ্বী যেমন সর্ব্বহারা হয়েও এয়োতের লক্ষণ শাঁখাজোড়াটি শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করে, বেচারা সুষেণবাবুও তেম্‌নি সমস্ত অধিকার খুইয়ে পুরুষত্বের চিহ্নস্বরূপ এই গোঁপজোড়াটি সযত্নে বজায় রেখেচেন। ঘরে এসে ঘাড় নীচু ক'রে সবিনয়ে বল্‌লেন—'ডেকেচ?'

জিগীষা দেবী ছেলেদের দেখিয়ে বল্‌লেন—'এঁরা বাণী নিতে এসেচেন।'

সুষেণবাবু চোখ কপালে তুলে বল্‌লেন—'বানি? এই যে সেদিন ননী স্যাকরা বেয়াল্লিশ টাকা নিয়ে গেল?'

জিগীষা দেবী ভ্রূকুটি ক'রে বল্‌লেন—'ঈডিয়ট! স্যাকরার বানি নয়, আমার মুখের বাণী। যাও, সবুজ ফাউনটেন পেনটা আর এক শিট কাগজ নিয়ে এস।'

সুষেণবাবু কাগজ কলম আনলেন, জিগীষা দেবী খচ্‌খচ্‌ ক'রে দু-পাতা বাণী লিখলেন। ভাষাটা ঠিক মনে নেই, তবে তাতে অনেক উঁচুদরের কথা ছিল, যথা—প্রবীণের রক্ত, তরুণের খুন, ধনিকের রুধির, শ্রমিকের লেহু। শেষটা হচ্চে—আশ্রম গ'ড়ে তোলা অতি সহজ কাজ; হে ছেলেরা, তোমরা লাখ টাকা যোগাড় কর; আপাতত আমাকে হাজার-দশেক এনে দাও, তাতেই কাজ আরম্ভ হতে পারবে।

আমরা বাণী পেয়ে কৃতার্থ হয়ে নীচে নেমে এলুম। হঠাৎ সুষেণবাবু পিছন থেকে চুপি চুপি ডাকলেন—'ও মশায়, বলি শুনচেন? একবার আমার ঘরে আসুন।'

ইনিও একটা বাণী দিতে চান না-কি? গেলুম সঙ্গে সঙ্গে। সুষেণবাবুর খাস কামরাটি নীচের তলায়। ছোট্ট কুঠুরি, আসবাব বেশী নেই, দেওয়ালে কতকগুলো বাঘ-সিঙ্গির ছবি, ইংরিজী পত্রিকা থেকে কাটা। তক্তাপোষের ওপর ময়লা বিছানা পাতা, তার ওপর একটা জরাজীর্ণ বন্দুক, এক শিশি তেল, আর খানিকটা সুরকির গুঁড়ো। সুষেণবাবু বোধ হয় বন্দুকটার মরচে তুলছিলেন।

বল্‌লুম—'এটি আপনার বৈঠকখানা? বাঃ, খাসা বন্দুকটি ত। আপনি বুঝি রোজ ওতে তেল লাগান?'

সুষেণবাবু খুশী হ'য়ে বল্‌লেন—'লাগাতেই হবে, নইলে দরকারের সময় আট্‌কে যাবে যে। বলছিলুম কি—আপনারা কানাই ঘোষালকে চেনেন?—যে ছোকরা নাগাড় পঁচাত্তর ঘণ্টা লালদিঘিতে সাঁতার দিয়েছিল? সে আমার খুড়তুতো ভাই হয়।'

আমি বললুম—'বটে?'

সুষেণবাবু সগর্ব্বে বল্‌লেন—'হাঁ। বলাই বাঁড়ুয্যেকে চেনেন?—যে ছোকরা সেদিন গড়ের মাঠে তিনটে গোরাকে ছাতা-পেটা করেছিল? আমার আপন মাসতুতো ভাই।'

বল্‌লুম—'বলেন কি! আপনারা দেখচি বীরের বংশ। বড় সুখী হলুম। আপনার আর কিছু বাণী নেই ত? আচ্ছা, বসুন তা হ'লে, নমস্কার।'

সুষেণবাবু হঠাৎ মুখখানি করুণ-পানা ক'রে বল্‌লেন—'পাঁচটা টাকা হবে কি? মাসকাবার হ'লেই শোধ ক'রে দেব।'

বাঁটলো একটা আধুলি ফেলে দিলে। আমরা রাস্তায় বেরিয়ে এলুম।

ছেলেদের বল্‌লুম—'আর ভাবনা কি, কেল্লা মার দিয়া। এখন চট্‌পট্‌ লাখ টাকা তুলে ফেল, নিদেনে দশ হাজার।'

কেউ উত্তর দিলে না, চুপচাপ একে একে নিজের নিজের ঘরমুখো হ'ল। কাত্তিক আর আমি বাঁটলোর সঙ্গে তার বাড়ি এলুম। বাঁটলোর বাপ নেই, নিজেই কর্ত্তা, আর তার মা আমাকে খুব শ্রদ্ধা করেন। বাড়িতে অন্নছত্র লেগেই আছে, যতদিন খুশি থাকো, আদরযত্নের ত্রুটি হবে না।

বাঁটলোর পেটে কথা থাকে না, এসেই তার বোন তুবড়িকে সমস্ত ব্যাপার জানালে। মেয়েটা বিষম ফাজিল। তার ছোট খুবড়িও ফেলা যায় না, একটি খুদে পিঁপড়ে বিশেষ।

সকালবেলা তুবড়ি বললে—'চাটুয্যে মশায়, ছেলে-ধরারা আপনাদের ছেড়ে দিলে যে বড়?'

বল্‌লুম—'ছেড়ে আর দিয়েচে কই, বাড়ি না পৌঁছলে ভরসা পাচ্চি না।'

খুবড়ি কাত্তিকের সামনে হাত নেড়ে বল্‌লে—'চিনি দেবে থাবা থাবা, থলির ভেতর পুরবে বাবা—'

তুবড়ি বল্‌লে—'যা যা এখন বিরক্ত করিস না, বেচারা আগে তেল মেখে ঠাণ্ডা হোক। কাত্তিক-দা, তা হ'লে কেরাসিন আর দেশলাই এনে দি?'

কাত্তিক মুখখানা হাঁড়ি ক'রে ব'সে রইল।

তুবড়ি একটা পয়সা বার ক'রে বল্‌লে—'কাত্তিক-দা, এই লাখ টাকা ভরতি ক'রে দিলুম, জিগীষা দেবীকে আমার চাঁদাটা পাঠিও।'

থুবড়ি বল্‌লে—'ও কাত্তিক-দা, তোমার বাবা তোমায় কি বলেছিলেন বল না ?'

আমি বল্‌লুম—'কি আবার বলবেন, বলছিলেন খবরদার কাত্তিক, তুবড়ি থুবড়িকে বে করিস্ নি, তোর টুকটুকে বউ এনে দেব।'

তুবড়ি বল্‌লে—'লোটি রায়ের মতন গাইয়ে, ফাখ্‌তা খাঁর মতন নাচিয়ে। আচ্ছা কাত্তিক-দা, তুমি আমাদের ক্লাসের থাকোমণিকে বে করলেই ত পার, ঠিক যেমনটি চাও। ব'লব তাকে ?'

কাত্তিক তেড়ে উঠে বল্‌লে—'দেখ তুবড়ি আমায় রাগিও না বল্‌চি !'

তুবড়ি তিন হাত পেছিয়ে বল্‌লে—'বাস্ রে ! তরুণের খুন আগুন হয়েচে।'

এই রকম সারাদিন তুবড়ি আর থুবড়ির আক্রমণ চল্‌ল। বিকেলে কাত্তিক অতিষ্ঠ হয়ে বল্‌লে—'চাটুয্যে মশায়, এর চেয়ে বাবার গালাগাল ভাল, বাড়ি চলুন।'

যাবার সময় তুবড়ি বল্‌লে—'কাত্তিক-দা, রাগ করলে ?' কাত্তিক ভীষণ অবজ্ঞার ভঙ্গী ক'রে মুখ বাঁকালে। তুবড়ি একটু জিব বার ক'রে ভেংচালে।

চরণ ঘোষের মনে অনুতাপ হয়েছিল। আমায় বল্‌লে —'চাটুয্যে, কাত্তিককে জিজ্ঞেস কর ও কি চায়, দেড়শ টাকা অব্‌ধি খরচ করতে রাজী আছি। বাইসিকেল, সোনার হাতঘড়ি, এক সেট বই—যা ওর পছন্দ।'

কাত্তিককে জিজ্ঞাসা করলুম। একটু ভেবে বল্‌লে—'দেড়শ টাকায় মিটবে না চাটুয্যে মশায়।'

'বেশ ত, তোর কি জিনিষ পছন্দ বল্ না।'

'জিনিষ চাই না, মানুষ চাই।'

'কাকে চাস রে ?'

'তুবড়ি।'

'কিন্তু বল্লরী বাঁড়ুয্যে, লোটি রায়, ফাখ্‌তা খাঁ, এরা সব গেল কোথা ?'

কাত্তিক আমায় বুঝিয়ে দিলে যে তুবড়িই একমাত্র নারী। জিজ্ঞাসা করলুম—'কি দেখে ভুল্‌লি রে কাত্তিক ?'

'সেই যে, চ'লে আসবার সময় ভেংচেছিল, দেখেন নি ?'

চরণ ঘোষ বিচক্ষণ লোক, আপত্তি করলে না। অঘ্রান মাসেই কাত্তিকের বিয়ে হয়ে গেল। শুভকর্ম্ম চুকে গেলে রাত দশটার সময় থুবড়ি আমাকে আড়ালে ডেকে বল্‌লে—'চাটুয্যে মশায়, হি হি হি !'

'কি হয়েচে রে ?'

'এই—দিদি—হি হি হি !'

'আরে গেল যা, হেসেই অস্থির ! দিদির কি হয়েচে ?'

'এই—দিদি শুভদৃষ্টির সময় আবার জামাইবাবুকে—হি হি হি !'

'কি করেচে ?'

'ভেংচেচে।'

মহারাজ ছত্রসাল বুন্দেলা

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ

"ইক্ হাড়া বুন্দী ধনী, মরদ মহোবাপাল।
সালত ঔরঙ্গজেব উর, বে দোনো ছত্রসাল॥"

ইতিহাসে ছত্রসাল (সংস্কৃত শত্রু-শাল) নাম সার্থক করিয়াছেন দুইজন। একজন—হাড়াবংশী বুন্দীরাজ ছত্রসাল, অপর জন—বুন্দেলখণ্ড-কেশরী মহারাজ ছত্রসাল বুন্দেলা। ইঁহারা দুইজনই ঔরঙ্গজেবের বুকে শল্য-স্বরূপ ছিলেন। প্রথম ছত্রসাল দারার পক্ষে সামুগড়ের যুদ্ধে বীরত্ব ও স্বামিধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সবংশে নিহত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ছত্রসাল শিবাজীর মন্ত্রশিষ্য—সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দুজাগরণের অন্যতম নেতা এবং স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক। এই শেষোক্ত ছত্রসালের জীবন-চরিত সংক্ষেপে আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বংশ-পরিচয়

গহিরবার ক্ষত্রিয়গণ কাশী ও কনৌজে রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ ঘোরী সুলতান শিহাবুদ্দীন কর্ত্তৃক পৃথ্বিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী জয়চন্দ্রের পরাজয়ের পর গহিরবার বংশের এক শাখা বুন্দেলখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই সময়ে চন্দেল বংশীয়দের ক্ষমতা হ্রাস হওয়ায় নবাগত গহিরবারগণ তথায় সহজে আধিপত্য স্থাপন করেন। বুন্দেলা ও বুন্দেলখণ্ড নামের উৎপত্তি যাহা আমরা লাল কবির ছত্রপ্রকাশে পাই তাহা নিতান্তই বিশ্বাসের অযোগ্য। যাহা হউক পলাতক গহিরবারগণ রাজপুতানায় যেমন পরবর্ত্তীকালে রাঠোর নামে পরিচিত হইয়াছেন, সেরূপ ইঁহাদের অন্য শাখা নূতন উপনিবেশে বুন্দেলা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাদের নামানুসারে যমুনার দক্ষিণ, মালবের পূর্ব্ব, এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের শাখা কৈমুর পর্ব্বতশ্রেণীর দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টিত দুর্গম অরণ্যাকীর্ণ ভূমি বুন্দেলখণ্ড নামে পরিচিত হইল। লালকবির মতে বুন্দেলখণ্ডে বুন্দেলাদের আদি রাজধানী ছিল ধরমপুর। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে এই বংশীয় প্রতাপরুদ্র * বা রুদ্রপ্রতাপ দেব ঔরছা নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া প্রায় সমস্ত বুন্দেলখণ্ড আপন অধিকারে আনিয়াছিলেন। রুদ্রপ্রতাপের প্রথম পুত্র ভারতীচন্দ্র, এবং অপুত্রক ভারতীচন্দ্রের মৃত্যুর পর রুদ্রপ্রতাপের দ্বিতীয় পুত্র আকবরের সমকালিক মধুকর শাহ ঔরছায় রাজা হইয়াছিলেন। রুদ্রপ্রতাপের তৃতীয় পুত্র উদয়াজীৎ মহোবায় সামন্তরাজরূপে রাজত্ব করিতেন। এই উদয়াজীতের প্রপৌত্র চম্পৎ রায় মহারাজ ছত্রসালের পিতা। মধুকর শাহের পুত্র বীরসিংহ দেব ঐতিহাসিক আবুল-ফজলকে হত্যা করিয়া জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহে ঔরছার রাজত্ব পাইয়াছিলেন। বীরসিংহ দেবের পুত্র জুঝার সিংহ চৌরাগড় লুটের অংশ সম্রাট শাজাহানকে দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে দমন করিবার জন্য মোগল সৈন্য বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিল। এই বিদ্রোহদমন-ব্যাপারে বাদশাহের অন্তররুদ্ধ ধর্ম্মান্ধতার প্রথম গৈরিকস্রাব মোগল-সাম্রাজ্যের ভাবী অমঙ্গলের সূচনা করিল। ঔরছার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দেবমন্দির তাঁহার আদেশে মস্‌জিদে পরিণত হইল। জুঝার সিংহের স্ত্রী-কন্যারা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মোগল-অন্তঃপুরে চিরবন্দিনী হইলেন। জুঝার সিংহের এক পুত্র ও মন্ত্রী স্বধর্ম্ম ত্যাগে অস্বীকৃত হওয়ায় ঘাতকের খড়্গে প্রাণবলি দিল। জুঝার সিংহের সহিত চম্পৎ রায়ের সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি গৃহবিরোধ ভুলিয়া গেলেন। মোগল-সম্রাট বুন্দেলার বিভীষণ দেবীসিংহকে ঔরছার গদীতে বসাইয়াছিলেন (১৬৩৫ খৃঃ)। কিন্তু শত্রু দ্বারা রক্ষিত

* লালকবির বর্ণনানুসারে প্রতাপরুদ্রের একপুত্র ছিল কীর্ত্তি শাহ। ইনি নিশ্চয়ই আব্বাস সরবাণী কথিত কালিঞ্জর-রাজ কিরত (কিরাত নয়) সিংহ---যিনি শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

বিজেতার হাতের পুতুলকে আত্মসম্মানী কোনো বীরজাতি রাজা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না।

চম্পৎ রায় মোগল-বিরোধী বুন্দেলা জাতীয় দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, জুঝার সিংহের শিশুপুত্র পৃথ্বিনারায়ণকে ঔরছার রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিছুদিন পরে পৃথ্বিনারায়ণ ধৃত হইয়া গোয়ালিয়র-দুর্গে প্রেরিত হইল; কিন্তু চম্পৎ রায় মোগলের সিংহাসনতলে মাথা নোয়াইলেন না। শিবাজীর পিতা শাহজীর মত তিনিও রাজা এবং রাজ্যশূন্য দলের অধিনায়ক হইয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্ম বীরদর্পে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মোগল-ঐতিহাসিকের চক্ষে চম্পৎ রায় সাম্রাজ্য ও সমাজের শত্রু—বিদ্রোহী দস্যু। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডের ইতিহাসে তিনি নির্ভীক স্বদেশপ্রেমিক—দেশ ও জাতির ত্রাণকর্ত্তা। আধুনিক ঐতিহাসিক চম্পৎ রায়কে দেশভক্ত বা বিদ্রোহী যাহাই বলুন ক্ষতি নাই। উভয়ের মধ্যে তফাৎটাও বড় বেশী নয়, কৃতকার্য্যতার মাপকাটি দিয়া বিচার করিলে অবশ্যই চম্পৎ রায় বিদ্রোহী দস্যু। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডবাসী চিরদিন মনে রাখিবে—

> "প্রলয় পয়োধি উমণ্ড মে জ্যোঁ গোকুল যদু রায়।
> ত্যোঁ বুড়ত বুন্দেল কুল রাখ্যো চম্পৎ রায়॥"

অর্থাৎ, যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রলয় মেঘের অবিরাম বর্ষণ হইতে গাভীগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনই নিমজ্জমান বুন্দেলা-কুল চম্পৎ রায়কে আশ্রয় করিয়া রক্ষা পাইয়াছিল।

১৭০৬ বিক্রম সম্বতের (১৬৫০ খৃঃ) জ্যৈষ্ঠ শুক্লা তৃতীয়ায় চম্পৎ রায়ের চতুর্থ পুত্র ছত্রসাল জন্মগ্রহণ করেন। ছত্রসাল অল্পবয়সেই অস্ত্রচালনা ও লেখাপড়া বেশ শিখিয়াছিলেন। শিবাজী, আকবর, রণজিৎ সিংহ, হায়দর আলী ইত্যাদি মধ্যযুগের অধিকাংশ খ্যাতিমান পুরুষের মত ছত্রসাল নিরক্ষর ছিলেন না। মাতৃভাষায় তাঁহার বিশেষ দখল ছিল, তিনি পরিণত বয়সে "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন", "শ্রীরাম-যশ-চন্দ্রিকা", "হনুমদ্-বিনয়" ইত্যাদি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—এগুলি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছে। এই কবিতাগুলি উচ্চাঙ্গের না হইলেও ছত্রসালের জ্ঞানচর্চা এবং ধর্ম-জীবনের একটা দিক হিসাবে এগুলির মূল্য আছে।

ছত্রসালের পিতা চম্পৎ রায় নিরুপায় হইয়া কিছুকাল মোগল-সরকারে চাকরি করিয়াছিলেন। কিন্তু চাকরি করিতে হইলে ত্বকের স্থূলতা, চাটুবাদ, চুকলি ইত্যাদি যে-সব গুণ থাকা দরকার চম্পৎ রায়ের তাহা অর্জ্জন করিবার সুযোগ ঘটে নাই। এজন্য তাঁহার মুরব্বী শাহজাদা দারা শুকো তাঁহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। চম্পৎ রায় দারার সহিত ঝগড়া করিয়া মহোবায় ফিরিয়া আসিলেন। ছত্রসালের বয়স তখন পাঁচ ছয় বৎসর মাত্র। বিপদ, অভাব ও চাঞ্চল্যের মধ্যেই তিনি বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব দিল্লীর তক্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া চম্পৎ রায়কে দমন করিবার জন্ম সচেষ্ট হইলেন। বুন্দেলখণ্ডে আত্মরক্ষা অসম্ভব ভাবিয়া চম্পৎ রায় মুক্তপিঞ্জর ব্যাঘ্রের মত পঁচিশজন মাত্র অনুচর লইয়া দক্ষিণ দিকে ছুটিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মত দক্ষ শিকারীর হাত হইতে তিনি পলাইবেন কোথায়? ছত্রসালের মাতুল সাহেব রায় নিজ ভগ্নীপতিকে কয়েদ করিয়া বাদশাহের হাতে সঁপিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। চম্পৎ রায় ও রাণী কালীকুমারী বিশ্বাসঘাতক ধন্ধেরাদের হাতে পড়িবার ভয়ে আত্ম-হত্যা করিলেন।

মাতাপিতার শোচনীয় মৃত্যুর পর, মাতুলালয় ছত্রসালের পক্ষে জতুগৃহবাসের ন্যায় হইয়া উঠিল। একদিন সুযোগ পাইয়া তিনি বড়ভাই অঙ্গদ রায়ের নিকট দেবগড়ে পলাইয়া গেলেন। কপর্দ্দকশূন্য, আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দুই ভাই মায়ের কিছু অলঙ্কার (যাহা অঙ্গদ রায় দৈলবারায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল)—বিক্রয় করিয়া পাথেয় সংগ্রহপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে মির্জ্জারাজা জয়সিংহের অধীনে মোগল-সৈন্যে যোগ দিলেন (১৬৬৫ খৃঃ)। এই সময়ে ছত্রসালের বয়স মাত্র পনর বৎসর।

মোগল-সেনাপতি লোক চিনিতেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে পুরন্দর-দুর্গ অবরোধকালে ছত্রসাল ও অঙ্গদ রায় বিশেষ সাহস ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। জয়সিংহের সুপারিশে সম্রাট ঔরঙ্গজেব চম্পৎ রায়ের দুই পুত্রের

বুন্দেলা-কেশরী ছত্রসাল
একখানি প্রাচীন চিত্র হইতে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া পুরস্কার-স্বরূপ অঙ্গদ রায়কে এক হাজারী ও ছত্রসালকে তিনশত সদী মনসব্‌দারের পদ দিলেন। পুরন্দরের সন্ধির পর সম্মিলিত মোগল ও মারাঠা সৈন্য যখন বিজাপুর আক্রমণ করে, ছত্রসাল তাহাদের বিভিন্ন যুদ্ধনীতি বিশেষভাবে শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর (১৬৬৫—১৬৭০ খৃঃ) মোগল-সরকারে চাকরি করিবার পর ছত্রসাল শেষে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর কাছে পলাইয়া গেলেন।

মির্জ্জারাজা জয়সিংহ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন চাকরির আঁচ ছত্রসালের গায়ে লাগে নাই। ১৬৬৭, জুলাই মাসে তাঁহার মৃত্যুর পর ছত্রসাল সম্ভবতঃ পাঠান সেনাপতি দিলীর খাঁর অধীনে দেবগড় আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। এ যুদ্ধে ছত্রসাল আহত হন। কিন্তু পুরস্কারের বেলা তাঁহার ভাগ্যে কিছুই মিলিল না, অথচ সেনাপতির মনসব্‌ বাড়িয়া গেল। এই ব্যাপারে চাকরিতে তাঁহার ঘৃণা ও ধিক্কার জন্মিল। তাঁহার মুরব্বী জয়সিংহের প্রতি বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের ব্যবহার দেখিয়াও তাঁহার চোখ খুলিয়াছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের স্বধর্মপ্রীতি পরধর্মনির্যাতনের আকার ধারণ করিল। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সমস্ত সুবাদারগণের প্রতি আদেশ জারি হইল যেন তাঁহারা নিজ নিজ প্রদেশে অ-মুসলমানদের পাঠশালা এবং দেবমন্দির ধ্বংস করেন। ঔরঙ্গজেব এ বিষয়ে পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার পূর্ব্বে কোনো মুসলমান রাজার কোপদৃষ্টি হিন্দু গৃহস্থবাড়ীর বাঁশ-খড়ের ঠাকুরঘর পর্য্যন্ত পৌছায় নাই। বাদ্‌শা যে-হিন্দুসমাজকে মৃত মনে করিয়া কবরের ব্যবস্থা করিতেছিলেন তাহাই সহসা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল। হিন্দুর এই পুনরুত্থানকে সপ্তদশ শতাব্দীর এক বিরাট শূদ্র-জাগরণ বলা যাইতে পারে। শূদ্র শিবাজীই এই নব-বোধনের পুরোহিত। আগ্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কিছুকাল নীরব থাকিয়া শিবাজী এ সময়ে (১৬৭১ খৃঃ) আবার ঔরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। শিবাজীর এই শেষ যুদ্ধই প্রকৃত স্বাধীনতাসংগ্রাম—যাহার লেলিহান শিখা দক্ষিণী হাওয়ায় উত্তরাপথে বিস্তৃত হইয়া সম্রাট্‌ ও সাম্রাজ্য উভয়কেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। কুমার ছত্রসাল এই স্বাধীনতা-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিবার জন্য সহস্র বিপদ তুচ্ছ করিয়া শিবাজীর কাছে উপস্থিত হইলেন। সম্রাটের আশ্রয়, উন্নতির সুপ্রশস্ত পথ, আত্মীয়-স্বজন এবং জন্মভূমি বুন্দেলখণ্ডের মায়া কাটাইয়া ছত্রসাল যে মহান্‌ ভাবের অনুপ্রেরণায় স্বেচ্ছাসেবকরূপে শিবাজীর সহায় হইতে চাহিয়াছিলেন তাহার উপমা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিরল। দেশ ও জাতিনির্ব্বিশেষে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া স্বাধীনতাকামীদের জন্য যুদ্ধ করিবার যে প্রেরণা রুসোর মন্ত্রশিষ্য ফরাসী যুবকগণ পাইয়াছিলেন, যে অজ্ঞাত আহ্বানে তাঁহারা মার্কিনের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জর্জ্জ ওয়াশিংটনের পতাকাতলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, একশত বৎসর পূর্ব্বে সেই একই প্রেরণাবলে ভাবপ্রবণ যুবক ছত্রসাল মহারাষ্ট্র শিবিরে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। ছত্রসালের নির্ভীক নিঃস্বার্থ আত্মদানে শিবাজীর বুক আনন্দে ও আশায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, ছত্রসালকে নিজের কাছে রাখিলে তাঁহার সুযশটুকু মহারাষ্ট্রই আত্মসাৎ করিবে। ভারত-আকাশের প্রভাতী তারকা সহ্যাদ্রির নিবিড় অরণ্যানীর অন্তরালে ক্ষীণভাবে জ্বলিয়া অস্ত যাইবে। অপরিচিত দেশে অজ্ঞাত সমাজে ছত্রসালের প্রতিভার সহজ স্ফূর্ত্তি হইবে না—তাঁহার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র বুন্দেলখণ্ড। তাই তিনি কয়েক দিন পরে ছত্রসালকে সস্নেহে জন্মভূমি বুন্দেলখণ্ডে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন।

কেহ কেহ বলেন, শিবাজী ফাঁকা কথায় ছত্রসালকে বিদায় দিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রত্যাখ্যানে ছত্রসাল ভগ্নহৃদয়ে মারাঠা-দরবার হইতে প্রস্থান করেন। লালকবি কোথাও এরূপ আভাস দেন নাই—এই সঙ্কীর্ণতার ইঙ্গিত করিলে শিবাজীর প্রতি অবিচার করা হয়। ছত্রসালের শক্তি ও মহান্‌ ভাব শিবাজী নিজ স্বার্থে ব্যয় না করিয়া মধ্যভারতে স্বাধীনতা-যুদ্ধের আয়োজনে নিযুক্ত করেন।

ছত্রসাল দেশ ও ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধে নামিতে কৃতসঙ্কল্প, সুতরাং শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক হিন্দুকে এ কার্য্যে

ব্রতী করিবার চেষ্টা তাঁহার অবশ্যকর্ত্তব্য। তিনি নিজের সঙ্কীর্ণতা ও পূর্ব্ব শত্রুতা ভুলিয়া তাঁহার পিতার পরম শত্রু রাজা শুভকরণ বুন্দেলার সহিতই প্রথমে দেখা করিলেন। শুভকরণ কয়েকদিন বিশেষ স্নেহ করিয়া ছত্রসালকে নিজের কাছে রাখিলেন এবং যুবকের উৎকণ্ঠা এবং বিষণ্ণতায় দয়াপরবশ হইয়া বাদ্‌শাহের কাছে তাহার জন্য উচ্চ মনসব এবং মহোবার জাগীর প্রার্থনা করিয়া উকীল পাঠাইতে চাহিলেন। এক সময়ে ইহা অপেক্ষা অল্পেও হয়ত ছত্রসাল আজীবন সম্রাটের সেবা করিতেন। কিন্তু স্বাধীনতা ছাড়া আজ তাঁহার প্রেয় কিছুই নাই। তিনি বিনা দ্বিধায় বলিয়া ফেলিলেন—আমি চাকরি করিব না—বাদ্‌শার সহিত যুদ্ধ করিব। দিল্লীশ্বরের সহিত বিবাদ? এ যেন গলায় পাথর বাঁধিয়া সন্তরণের চেষ্টা। শুভকরণ ত অবাক! আন্তরিক রাজভক্তি না থাকিলেও শুভকরণ সে কালের 'মডারেট'—পাছে বিপদে পড়েন এই ভাবিয়া তিনি ছত্রসালকে তৎক্ষণাৎ বিদায় দিলেন। ধরাইয়া দিলে নিশ্চয়ই কিছু পুরস্কার মিলিত, কিন্তু বাদ্‌শা ঔরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষ হিন্দুগণকে এই নীচতার কিছু উর্দ্ধে টানিয়া তুলিয়াছিল। রাজদণ্ড কিংবা নেতৃত্বলাভের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা লইয়া ছত্রসাল এ কার্য্যে অবতীর্ণ হন নাই—যোগ্যতর ব্যক্তির পরিচালনায় তিনি কাজ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। সুতরাং শুভকরণ তাঁহাকে এ ভাবে বিদায় দেওয়ায় তাঁহার দুঃখ কিংবা চিত্তের অবসাদ ঘটিল না। তিনি অন্যান্য হিন্দুরাজাদের কাছে গেলেন, কিন্তু সর্ব্বত্রেই ব্যর্থমনোরথ হইলেন। দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনাতলাভের দুরাশা কাহারও মনে স্থান পাইল না। ঠিক এই সময়ে ঔরঙ্গজেব ফিদাই খাঁকে ওরছার মন্দিরগুলি ধ্বংস করিবার আদেশ দিলেন। শঙ্খধ্বনি কানে গেলে মুসলমানের নিস্তার নাই—এ কথা সম্রাট নূতন ভাবে ঘোষণা করিলেন—

"জৌ কহুঁ কান সংখ ধুনি আওবে।
মুসলমান তৌ ভিস্ত ন পাওবে॥
সিসৌ উটি কান জো নাওবে।
তৌ দোজখ তে খুদা বচাবে॥
তাতৈ ঢাহি দেবালৈ দীজৈ।
তিনকে ঠৌর মসীদে দীজে॥
মুলনা তহাঁ নিবাজ গুদারে।
বাঁগ দেহি নিত সাঁঝ সকারে॥
ন্যাউ চুকাবে কাজিল কাজী।
জাতে রহে গোসাই রাজী॥*

ফিদাই খাঁ গোয়ালিয়র হইতে একদল সৈন্য লইয়া বাদ্‌শাহের হুকুম তামিল করিতে ঔরছায় আসিল। ঔরছার রাজা সুজান সিংহ এ সময়ে বাদ্‌শাহের কাজে দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন। তিনি ঔরছায় উপস্থিত থাকিলে হয়ত তাঁহার পিতা (?) দেবীসিংহের মত মন্দিরধ্বংস-ব্যাপারে উদাসীন থাকিতেন, অন্তত বাধা দিতে সাহস করিতেন না। হিন্দু রাজা-মহারাজাদের মধ্যে যাঁহার মনসব যত উঁচু এবং রাজ্য যত বড়, তাঁহার মানসিক কাপুরুষতাও সে অনুপাতে বেশী ছিল। ভয়ভাবনা বা পাটোয়ারি বুদ্ধি জনসাধারণের স্বাভাবিক সাহস ও সৎকর্ম্মের প্রেরণাকে দমিত করে না। এজন্য ঔরছাবাসীরা রাজার অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া বক্‌শী ধর্ম্মাঙ্গদের সেনাপতিত্বে মোগল সৈন্যকে গোয়ালিয়রের সীমা পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিল। এ সংবাদ রাজা সুজান সিংহের কাছে পৌছিলে তিনি প্রমাদ গণিলেন। বাদ্‌শাহের সহিত শত্রুতায় পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। জুঝার সিংহের শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া তিনি অর্দ্ধমৃত হইলেন। এ অপরাধের জন্য ঔরঙ্গজেবের ক্ষমা লাভ করিতে হইলে, হয়ত মন্দিরগুলি নিজ খরচায় ভাঙিতে হইবে—যাহারা ধর্ম্মরক্ষার জন্য ফিদাই খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদিগকে সম্রাটের নির্দ্দেশমত শাস্তি দিতে হইবে। গোঁয়ার বুন্দেলাগণের এ হঠকারিতায় রাজার পশ্চাৎ অপসরণের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি দায়ে পড়িয়া বুন্দেলখণ্ডের গৌরব ও হিন্দুর মালা-তিলক রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলেন। সুজান সিংহ শুনিলেন, ছত্রসাল মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিবার

* কানে শঙ্খধ্বনি আসিলে মুসলমান ত বেহেস্তে যাইতে পারিবে না। এক্ষেত্রে যদি দুইটি কান ধরিয়া জমিতে মাথা ঠেকায় তবে খোদা তাহাকে দোজখ হইতে বাঁচাইতে পারেন। দেবালয়গুলি ধ্বংস করিয়া উহার উপর মসজিদ তৈয়ার করা হোক্, যেখানে মৌলানা নিত্য সকালসন্ধ্যায় আজান দিয়া নমাজ পড়িবে; বিদ্বান কাজী ন্যায় বিতরণ করিবে। এরূপ করিলে খোদাতালা রাজী থাকিবেন।

জন্য বুন্দেলখণ্ডে যাইতেছেন। চম্পৎ রায়ের পুত্র তাঁহার পরিবারের শত্রু। কিন্তু পরের সহিত বিবাদে জ্ঞাতিশত্রুতা ভুলিয়া যাওয়াই মহত্ত্বের পরিচায়ক। ছত্রসাল সুজান সিংহের কাছে কিছু ভরসা পাইয়া ঔরঙ্গাবাদে বলদেব নামক বুন্দেলা-সর্দ্দারের সহিত দেখা করিলেন। এখানে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি "ইসারা" বা দেবাদেশ গ্রহণ করিয়া উভয়ে একত্র বুন্দেলখণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলেন।

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে (১৭২৮ বিঃ সম্বৎ *) বাইশ বৎসর বয়সে ছত্রসাল অখণ্ডপ্রতাপ সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধে নামিলেন। অনেকদিন বেকার বসিয়া থাকায় তাঁহার হাতে কিছুই ছিল না। মাতা কালীকুমারীর অবশিষ্ট কয়েকখানি অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া মাতৃভূমির দাসত্ব-মোচনের মূলধন সংগৃহীত হইল। পাঁচজন অশ্বারোহী এবং পঁচিশজন মাত্র পদাতিক অনুচর লইয়া তিনি যুদ্ধার্থ বাহির হইলেন। ছত্রপুরের বাইশ মাইল দক্ষিণে বিজোর বা বিজোরী নামক স্থানে ছত্রসালের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রতন শাহ বাদ্‌শাহের প্রদত্ত জাগীর ভোগ করিতেছিলেন। ছত্রসাল তাঁহাকে আঠার দিন পর্য্যন্ত অনেক বুঝাইয়াও ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধাচরণে রাজী করাইতে পারিলেন না। কিন্তু এ সময়ে বাকী খাঁ বুন্দেলা নামক পাঠান দস্যুসর্দ্দার আসিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে ছত্রসালের দলে যোগ দিল। বাকী খাঁ দস্যু হইলেও মোগলের শত্রু এবং বুন্দেলখণ্ডের সন্তান। কোনো দেশে দেশভক্তের দলে সবই "কেটো", "ব্রুটাস্" হয় না। কার্য্যারম্ভের প্রথমে স্থির হইল, বুন্দেলখণ্ডের এই স্বদেশী দল লুটতরাজ করিয়া হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে মোগলপক্ষীয় জাগীরদারগণকে উত্যক্ত করিবে। তাহারা যদি দলে যোগ দেয় কিংবা "চৌথ" (রাজস্ব) দিতে স্বীকৃত হয় তবেই অব্যাহতি পাইবে। সমস্ত দেশে লুটতরাজ আরম্ভ করিলে শত্রুরা মানভয়ে পলাইয়া যাইবে এবং দেশ নিজেদের হাতে আসিবে ও লোকেরা তাহাদের দলভুক্ত হইবে। এই ডাকাত-জয়েণ্ট-ষ্টক্ কোম্পানির লাভের শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ ছত্রসাল এবং পঁয়তাল্লিশ ভাগ দেওয়ান বলদেব পাইবেন—ইহাও কথা-বার্ত্তায় স্থির হইল। এইভাবেই বুন্দেলখণ্ডের স্বাধীনতা-সমরের উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত হইল। বারান্তরে যুদ্ধপর্ব্ব আলোচিত হইবে।

* ছত্রপ্রকাশ, পৃঃ ৭৯।

নিরুপায়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

শ্রমিকের ফাট্‌ছে পিলে ধনিকের বুটের ঘায়ে,
বণিকের বংশ বাড়ে তেতলার প্রাসাদ-ছায়ে;
  কে খাটে কেই বা খাটায়,
  কেবা কাল খেলায় কাটায়,—
যে বোনে গায়ের কাপড়, সে মরে আদুল গায়ে!

বাহবা বিধির বিধান, বাজা ভাই বাজ্‌না বাজা,
ঢেকে দে ভাব্‌না যত,—দুনিয়ার এম্‌নি রাজা!
  চোরেরা বাড়ছে খাসা,
  সাধুরা কোণায় ঠাসা,
রেখে দে ধর্ম্ম কথা, নিয়ে আয় কাঁকুড়া ভাজা!

ওরে ভাই বড্ড ক্ষিদে, কি করি, বল্‌তো উপায়,
লাগা না ফন্দী ফিকির, যা' করে' ভাই মিলবে দুপাই!
  পশুরাও খাচ্ছে চরে',
  মানুষে ক্ষিদেয় মরে—
রাজাদের ঘর ভরে' যায় প্রজাদের শ্রমের কৃপায়!

কত আর সহ্য হবে, বেটারা মোটর চড়ে;
দুবেলা পোলাও খেয়ে বসে' বেশ আরাম করে!
  দেখা হয় পথের ধারে—
  গুমরে চিন্‌তে নারে,
দুটাকা চাইতে গেলেই মাথাতে টনক নড়ে!

চুরিটা মন্দ কিসে—যত সব ফক্কিকারী,
গরিবে রাখতে চেপে বড়দের খবরদারী !
এদিকে পেট জ্বলে' যায়,
কি হবে পুঁথির কথায় ?
পরকাল পচুক চুলায়—বাঁচাটাই কেলেঙ্কারী !

যদি বা ধরাই পড়ি, তাতে আর ভয় কি আছে !
ছেলেটা ধুঁক্‌ছে জ্বরে, রেখে যাই কা'র বা কাছে ?
সে মাগী গর্ব্বে ধরে',
বেঁচেছে পূর্ব্বে মরে',
একা তাই ভাবছি বসে', কি করে দুদিক্ বাঁচে !

জমীটার খাজনা দেবার এসেছে জোর তাগাদা,
মোটে যে হয়নি ফসল, রাজা তো বুঝবে না তা !
ভিটে মোর সাত পুরুষে
তবু নেয় পয়সা ঠুসে',—
কোথাকার কেমন বিধান, বুঝি না তাও তো দাদা !

মাটি তো সঙ্গে করে' আনেনি রাজার ছেলে,
সে বেটা জন্মে' শুধু কি করে' দখল পেলে ?
চিরদিন লাঙ্গল ধরে'
এসেছি আবাদ করে'—
তার আবার পাওনা কিসের, দিব যে চাইতে এলে !

মাটি তো মাটিই বেটি, মুখে তার রা না কাড়ে,
নইলে ছিদাম দুলে কারুকে এম্‌নি ছাড়ে !
থাক্ তোর আইন কানুন,
ঘরে যার জুটছে না নুন,
সে দেবে পয়সা গুণে', কে বা তা চাইতে পারে !

পেটে যে পায়না খেতে, সে দেবে মাশুল কড়ি—
কা'কে—যে সোনার খাটে শুয়ে রয় উদর ভরি',
অথচ কুপিয়ে মাটি
না খেয়ে মোরাই খাটি,—
টাকা তো সৃষ্টি মোদের, তারা পায় কেমন করি' ?

সাধে কি রাগছি রে ভাই—ছেলেটা কদিন ধরে'
দেখাব বদ্দি যে ভাই,
তারো যে পয়সাটি নাই,
খাওয়াব মিছরী সাবু—তাই বা পাই কি করে' ।

যাক্‌গে,—মোড়ল দাদা, ঠিলি কি খালিই নাকি ?
দ্যাখো না উপুড় করে', দুফোঁটা নাই কি বাকী ?
ভেবোনা ছিদাম দুলে
নেশাতে পড়বে ঢুলে'—
নসীবে ঘটবে না তা—তা'তে যে ভালোই থাকি !

মাগীটা ভালোই গেছে—কি বলো বলাই কাকা,
দুনিয়ায় মরাই ভালো, নাই যার পয়সা টাকা !
ছেলেটা ধুঁক্‌ছে জ্বরে—
দ্যাখোনা, মরছি ডরে,
সে মাগী ভাগ্যবতী, পড়েছে চিতায় ঢাকা !

ভগবান্ ! থাকিস্ যদি, একবার আয় তো কাছে,
আমি যে মুখ্যু মানুষ—শুনি কি বলার আছে !
কতদিন লুকিয়ে র'বি,
দুনিয়ায় পয়সা সবই—
কথাটা বল্‌তো মুখে—বুঝে' নিই কতক আঁচে !

মানুষের সাচ্চা—ঝুটার যদি-না কদর থাকে,
দেহে যার শক্তি আছে, বুঝানোর কাজ কি তাকে ?
ডাকাতী জুচ্চুরী ত,
কেহ নাই দণ্ড দিতে—
যদি হয় এমন ধারা, কে ফাঁকে ছাড়বে কা'কে !

কি বলিস্ মোড়ল দাদা, ভয়ে কি ভড়কে গেলি ?
মনে হয়, মাটির মতন দুনিয়ায় পাল্‌টে ফেলি ।
উঁচু সব ঢেলায় ধরে'
চষে দিই সমান করে',—
পয়সার কোথায় বাসা, দেখি তাই কোদাল ঠেলে' !

রাত, ভাই অনেক হ'লো, ছোঁড়াটা করছে বা কি !
ভাল না লাগছে কিছু, না-লাগার কসুরটা কি ?
সাবু আর মিছরী কেনা,—
কেউ তো ধার দেবে না,—

খুকীর কাণ্ড

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হরি মুখুয্যের মেয়ে উমা কিছু খায় না। না খাইয়া খাইয়া রোগা হইয়া পড়িয়াছে বড়।

উমার বয়স এই মোটে চার। কিন্তু অমন দুষ্ট মেয়ে পাড়া খুঁজিয়া আর একটি বাহির করো তো দেখি?··· তাহার মা সকালে দুধ খাওয়াইতে বসিয়া কত ভুলায়, কত গল্প করে, সব মিথ্যা হয়। দুধের বাটিকে সে বাঘের মত ভয় করে—মায়ের হাতে দুধের বাটি দেখিলেই সোজা একদিকে টান্ দিয়া দৌড়।

মা বলে—রও, দুষ্টু মেয়ে, তোমার দুষ্টুমি আমি—দুধ খাবেন না, সুজি খাবেন না, খাবেন যে কি দুনিয়ায় তাও তো জানি নে—চলে আয় ইদিকে—

খুকী নিরুপায় দেখিয়া কান্না সুরু করে। তাহার মা ধরিয়া ফেলিয়া জোর করিয়া কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক মুখে পুরিয়া দুধ খাওয়ায়। কিন্তু জোরজবর-দস্তিতে অর্দ্ধেকের ওপর দুধ ছড়াইয়া গড়াইয়া অপচয় হয়,—বাকী অর্দ্ধেকটুকু কায়ক্লেশে খুকীর পেটে যায় কি না যায়।

সময়ে সময়ে সে আবার মায়ের সঙ্গে লড়াই করে। চার বছর বয়স বটে, না খাইয়া খাইয়া কাটি কাটি হাত-পাও বটে, কিন্তু তাহাকে কায়দায় ফেলিতে তাহার মায়ের এক একদিন গলদ্‌ঘর্ম্ম। রাগ করিয়া মা বলে—থাকো আপদ বালাই কোথাকার—না খাও তো বয়ে গেল আমার—সারাদিন খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠবে, আবার ওই দস্যি মেয়ের সঙ্গে দিনে পাচবার কুস্তী করে দুধ খাওয়াবার শক্তি আমার নেই—মর শুকিয়ে।

খুকী বাঁচিয়া যায়, ছুটিয়া একদৌড়ে বাড়ীর সাম্‌নের আমতলায় দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া সমবয়সী সঙ্গিনীকে ডাকে—ও নেন্থ-উ-উ—

তাহার বাবা একদিন বাড়িতে বলিল—দ্যাখো খুকীটাকে আজ দিন-পনেরো ভালো করে দেখিনি---আস্‌বার সময় দেখি পথের ওপর খেলা কচ্চে, এমনি রোগা হয়ে গিয়েচে যেন চেনা যায় না, পিঠটা সরু, কণ্ঠার হাড় বেরিয়েচে, অসুখ-বিসুখ নেই, দিন দিন ওরকম রোগা হয়ে পড়্‌চে কেন বলো তো?

খুকীর মা বলে—পড়্‌বে না আর রোগা হয়ে? সারা দিন রাতে ক'ঝিনুক দুধ পেটে যায়? মরে মরুক্, আমি আর পারি নে লড়াই করতে···কে এখন অই দস্যি মেয়েকে রোজ রোজ যায় দুধ খাওয়াতে? যাই ওর কপালে থাকে তাই হোক্ গে—

তাই হয়। দস্যি মেয়ে শুকাইতে থাকে।

ভাদ্র মাস, হঠাৎ বর্ষা বন্ধ হইয়া রৌদ্র বড় চড়িয়া উঠিয়াছে, গ্রামের ডোবা পুকুরে সারা গাঁয়ের পাট-ক্ষেতের পাটের আঁটী ভিজানো। নদীর ধারে কাশের ফুল ফুটিয়াছে।

গ্রামের হীরু চক্রবর্ত্তীর আড়তে এই সময়ে কাজকর্ম্মের বড় ভীড়। নানাদেশের ধানের ও পাটের নৌকা সব গঙ্গার ঘাটে জড় হইয়াছে। হরিশ যুগী আড়তের কয়াল, কাঁটার ফের্ত্তায় এক মণ ধানে আরও সের-দশেক ঢুকাইয়া লওয়া তাহার কাছে ছেলে-খেলা মাত্র। হাঙ্গরের মুখ-খোদাই বড় একখানা মহাজনী নৌকা হইতে ধানের বস্তা নামিতেছে, পটুপটি গাছের ছায়ায় উঁচুকরা ধানের স্তূপ হইতে হরিশ সুর সংযোগে কাঠায় করিয়া ধান মাপিতেছে—রাম রাম, রাম-হে রাম, রাম-হে দুই, দুই-দুই, দুই-হে তিন, তিন-তিন—

গফুর মাঝি ডাবা হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে বলিতেছে—তা নেন্ গো কয়াল মশাই, একটু হাত চালিয়ে নেন্ দিকি মোরা একবার দেখি? ইদিকি নোনা গাঙের গোন্ নাম্‌লি কি আর নৌকো বাইতি দেবানে?···

হরি মুখুয্যে মশায়কে একটু ব্যস্তসমস্তভাবে

আসিতে দেখিয়া হীরু চক্রবর্ত্তী বলিলেন—আরে এসো হরি, কি মনে করে?…এসো তামাক খাও—

—না থাক্ তামাক—ইয়ে আমার মেয়েটাকে ইদিকে দেখেচো হীরু? না?…বড় মুস্কিলে ফেলেচে বাঁদর মেয়ে—বারোটা বাজে, সেই বাড়ী থেকে নাকি বেরিয়েচে সকাল ন'টার সময়—একটু দেখি ভাই খুঁজে—এত জ্বালাতনও করে তুলেচে মেয়েটা সে আর তোমাকে কি বোল্‌বো—

অনেক খোঁজাখুঁজির পরে রায়বাড়ীর পথে উমারাণীকে ধূলার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া কি-একটা হাতে লইয়া চুষিতে ও আপন মনে বকিতে দেখা গেল।

—ওরে দুষ্টু মেয়ে—

হরি মুখুয্যে গিয়া মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বাবার কোলে উঠিতে পাইয়া উমা খুব খুশি হইল—হাত পা নাড়িয়া বলিতে লাগিল—বাবা, ও বাবা—ওই ওদের নানু—ভারি দুত্তু—এই—এই—দুধ খায় না—আমি দুধ খাই—না বাবা?

—বেশ মেয়ে, দুধ খেতে হয়। ওটা কি খাচ্চিস, হাতে কি?

—নেবেঞ্চুস্—ওই—ওই পুঁটির মামা এসেচে, তাই দিয়েচে।

বাড়ীতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উমারাণীর শাস্তি সুরু হয়। বাটিভরা দুধ, ঝিনুক, টানাটানি ইত্যাদি। তাহার কান্না, কাকুতি-মিনতি পাষাণী মা শোনে না—জোর করিয়া ঝিনুক মুখে পুরিয়া দিয়া ঢোকে ঢোকে দুধ খাওয়ায়—শেষের দিকটায় সে পা ছুঁড়িতে গিয়া খানিকটা দুধসুদ্ধ বাটিটা উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল।

দুম্-দুম্ দুই নির্ঘাত কিল পিঠে। পিঠ প্রায় বাঁকিয়া যায়।

—হতভাগা দস্যি আপদ কোথাকার—ছ'সের করে দুধ টাকায়, ভাত জোটে না দুধের খরচ যোগাতে যোগাতে প্রাণ গেল—দস্যি মেয়ের ন্যাক্‌রা দেখো—আদ্ধেকটা দুধ কি না ঠ্যাং ছুঁড়ে মাটিতে দিলে ফেলে?…

খুকী দম্ সামলাইয়া লইবার পরে পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল—অনেকক্ষণ কাঁদিল।

বেলা পড়িয়া আসে। ওদের উঠানে পূর্ব্বপুরুষের আমলের বীজু আমগাছের ছায়ায় অপরাহ্নের রোদকে আটকাইয়া রাখে। উমারাণী বসিয়া বসিয়া ভাবে—অপরের বাড়ীতে ভাল খাবার খাইতে পাওয়া যায়—মিষ্টি—তাহাদের বাড়ীতে শুধু দুধ আর দুধ।

তাহার মা বলিল—টীপ্ পরবি ও দস্যি?

উমারাণী ঘাড় নাড়িয়া মায়ের কাছে সরিয়া আসিল।

—বলে নয়ন তারা টীপ্, দুটো করে এক পয়সায়,—বেশ টীপ্‌গুলো—সরে এসে বোস্ দিকি?

টীপ পরিয়া খুকী আবার পাড়া বেড়াইতে বাহির হয়, বাঁশবনের তলা দিয়া গুটিগুটি হাঁটে। পুনরায় সে লোভে লোভে রায়বাড়ী যায়, পরের বাড়ীতেই যত ভাল খাবার। বিস্কুট, লেবেঞ্চুস্, কত কি।

নানুদের উঠানে পেঁপেগাছের মাথার দিকে তাহার চোক পড়িতে সে প্রথমটা অবাক হইয়া গেল—সঙ্গিনীকে ডাকিয়া দেখাইয়া কহিল—ও নানু—ঐ পিঁপে!

পেঁপে তাহার মা কাটিয়া খাইতে দেয়, বেশ খাইতে লাগে, কিন্তু তাহা গাছের আগ্‌ডালে কি অমনভাবে দোলে!…চাহিয়া চাহিয়া সে কিছু ঠাহর করিতে পারিল না।

পূজার কিছু পূর্ব্বে উমারাণীর আপন মামা কলিকাতা হইতে আসিল। এত ধরণের খাবার কখনও সে চক্ষেও দেখে নাই। কিস্‌মিস্ দেওয়া মেঠাই, বড় বড় অমৃতি জিলিপি, গজা, কমলালেবু আরও কত কি।

পাশের গ্রামে মামার এক বন্ধুর বাড়ী। মামা পরদিন সকালে উঠিয়া তাহাকে সাজাইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল।

পথে কে একজন সাইকেলে চড়িয়া যাইতেছে, উমারাণী চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। মামাকে বলিল—ও কে গেল মামা?

—ও রাস্তা দিয়ে যাচ্চে একজন লোক—

উমারাণী বলিল—ফরসা মুখ, ফরসা জামা গায়, না মামা?…চমৎকার!…

তাহার মামা হাসিয়া বলিল—'চমৎকার' কথাটা তুই শিখলি কি করে?—আচ্ছা খুকু তুই ওকে বিয়ে করবি?

উমারাণী সপ্রতিভ মুখে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল তাহার কোন আপত্তি নাই।

ভাদ্রের শেষ, ম্যালেরিয়ার সময়, তবে এখনও খুব বেশী আরম্ভ হয় নাই, বাড়ী বাড়ী কাঁথামুড়ি দেওয়া সুরু হইতে এখনও দেরী আছে।

উমারাণীর হাঁটুনির বেগ নিস্তেজ হইয়া পড়িতে থাকে, ক্রমে সে মাঝে মাঝে পথের ধারে বসিতে লাগিল, মাঝে মাঝে হাই তুলিতে লাগিল। তাহার মামা বলিল—কি হয়েচে খুকু, রদ্দুর বড্ড বেশী, আর বেশী নেই চলো—

বন্ধুর বাড়ি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই উমারাণী বলিল—মামা আমার শীত লাগচে—

—শীত কি রে? ভাদ্রমাসে এই গরমে শীত? ও কিছু না, চলো—

খুকী আর কিছু না বলিয়া বেশ চলিল বটে, কিন্তু খানিকদূর গিয়া তাহার মনে হইল শীত একটু বেশী বেশীই করিতেছে। শুধু শীত নয়, তৃষ্ণাও পাইয়াছে। সে সাহসে ভর করিয়া বলিল—মামা, আমি জল খাবো—

—বড় বিপদ দেখ্‌চি, আচ্ছা আগে চলো গিয়ে পৌঁছুই—খেও এখন জল—

গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া উমারাণীর মামা তাহার কথা ভুলিয়াই গেল। অনেকদিন পরে পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, গল্পগুজব ও হাসিঠাট্টায় মসগুল হইয়া উমারাণীর সুখদুঃখের দিকে চাহিবার অবকাশ পাইল না। উমারাণী দু-একবার কি বলিল, আলাপের গোলমালে সে কথা কেহ কানে তুলিল না।

খানিকক্ষণ পরে তাহার মামা ফিরিয়া দেখিল সে গুটিসুটি হইয়া রৌদ্রে বসিয়া আছে, মামার প্রশ্নের উত্তরে বলিল—জল খাবো মামা, জল তেষ্টা পেয়েচে—

—দেখি? তাই তো রে, গা যে বড় গরম—উঃ, খুব জ্বর হয়েচে—যে ম্যালেরিয়ার জায়গা!···আয় চল্ ওদের ঘরে শুইয়ে রাখি গে—ওঠ্—

উমারাণীকে জল খাওয়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া মামা পুনরায় পাড়ার দিকে বাহির হইল। স্নানাহার বন্ধুদের বাড়িতেই সম্পন্ন হইল, ক্রমে দুপুর গড়াইয়া গেল, মুখুয্যে পাড়ার হাফ্-আখড়াই-এর ঘরে গ্রামের নিষ্কর্ম্মা ছোক্‌রার দল একে একে আসিয়া পৌঁছিল, প্রকাণ্ড কেট্‌লিতে চায়ের জল চড়িল, গল্পে গল্পে বেলা একেবারেই গেল পড়িয়া।

এতক্ষণে হঠাৎ খুকীর কথা মনে পড়িয়া গেল তাহার মামার। সে বলিল—ওই যাঃ, তোমরা বোসো ভাই, খুকীটার অসুখ হয়েচে ব'লে ভম্বলদের বাইরের ঘরে শুইয়ে রেখে এসেচি অনেকক্ষণ, দেখে আসি দাঁড়াও—

ভম্বলদের বাড়ির বাহিরের উঠানে গোয়ালের কাছে আসিতে ভম্বলের বড়ছেলে টোনা বলিল—খুকু কোথায় কাকা?

খুকীর মামা বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন, সে তোদের বাইরের ঘরে শুয়ে নেই?

—না কাকা, সে ত অনেকক্ষণ আপনার কাছে যাবে ব'লে বেরিয়েচে—তখন খুব রদ্দুর—উঠে কাঁদতে লাগলো, বল্‌লে মামার কাছে যাবো—শুন্‌লে না, তখুনি সেই রদ্দুরে আপনাকে খুঁজতে বেরুলো—

—সে কি রে! আমি কোথায় আছি তা সে জান্‌বে কেমন কোরে?···আর তোরা বা ছেলেমানুষকে ছেড়ে দিলি কি ব'লে?···বেশ লোক তো!···আর এ মেয়ে নিয়েও হয়েচে—মামা অত্যন্ত ব্যস্ত ও উদ্বিগ্নভাবে পুনরায় পাড়ার দিকে ফিরিল। পরিচিত স্থানগুলাতে খোঁজা শেষ হইল, কোথাও সে নাই, কোন্ পথ দিয়া কখন চলিয়া গিয়াছিল কাহারও চোখে পড়ে নাই, কেবল মতি মুখুয্যের ছেলে বলিল, অনেকক্ষণ আগে একটি অপরিচিত ছোট খুকীকে চড়্‌চড়ে রৌদ্রে টলিতে টলিতে ভম্বলদের বাড়ির উঠানের আগল পার হইয়া আসিতে দেখিয়াছিল বটে, খুকীকে সে চেনে না, ভাবিয়াছিল ভম্বলদের বাড়িতে কোনো কুটুম্ব হয়ত আসিয়া থাকিবে, তাহাদের মেয়ে।

অবশেষে তাহাকে পাওয়া গেল গ্রামের বাহিরের পথে। মামাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া পথ হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নিরুপায় অবস্থায় পথের উপর বসিয়া কাঁদিতেছিল, বৃদ্ধ হারাণ সরকার দেখিতে পাইয়া লইয়া আসেন।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, সে সারাদিন কিছুই খায় নাই,—খাইবার মধ্যে দুপুরবেলা ভম্বলদের বাড়ীর কোন্

ছেলে এক টুক্‌রা আমসত্ত্ব হাতে দিয়াছিল, জ্বরের ঘোরে সেটুকু শুধু চুষিয়াছে শুইয়া শুইয়া। তাহার মামাকে সকলে বকিতে লাগিল। সরকার মশায় বলিলেন—তোমারও বাপু আক্কেলটা কি—ছোট মেয়েটাকে নিয়ে দুপুর রোদে এককোশ হাঁটিয়ে আনলে, পথে এল তার জ্বর, দেখলেও না, শুন্‌লেও না, ওদের চণ্ডীমণ্ডপে কাৎ করে ফেলে রেখে তুমি বেরুলে আড্ডা দিতে—না একটু দুধ, না কিছু—ছিঃ—

তাহার মামা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—তা আমি কি আন্‌তে গেছলাম, আমি বেরুবার সময় ছাড়ে না কোনো রকমে, তোমার সঙ্গে যাবো মামা, তোমার সঙ্গে যাবো মামা—আমি কি করবো?

—বেশ, খুব আদর করেচো ভাগ্নীকে—এখন চলো আমার বাড়ি, ওকে একটু দুধ খাইয়ে দি—কচি মেয়েটাকে সারাদিন—ছিঃ—

খুকীর মামা একটু দমিয়া গিয়াছিল, বাড়ি ফিরিবার সময় খুকীকে বলিল—কিন্তু বাড়ি গিয়ে কিছু বোলো না যেন খুকু? মার কাছে যেন বোলো না যে জ্বর হয়েছিল, কি হারিয়ে গিয়েছিলে, কেমন তো? লক্ষ্মী মেয়ে, বল্‌লে আমি কল্‌কাতা যাবো পরশু সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো না—

—আমি কলকাতা যাবো মামা—

—যদি আজ কিছু না বলো, পরশু ঠিক নিয়ে যাবো—বল্‌বি নে তো?

কিন্তু বাড়ী পৌঁছিয়া খুকী বুদ্ধির দোষে সব গোলমাল করিয়া ফেলিল। তাহার শুষ্ক মুখ ও চেহারায় তাহার মা ঠাওরাইয়া লইল একটা কিছু যেন ঘটিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—কি খেলি রে খুকী সেখানে?

খাওয়ার কথা মামা কিছু শিখাইয়া দেয় নাই, সুতরাং খুকী বলিল—আমসত্ত্ব খুব ভালো—এতো বড় আমসত্ত্ব—

—আমসত্ত্ব? আর কিছু খাস নি সেখানে সারাদিনে? হ্যাঁরে ও যতীশ, খুকী সেখানে কিছু খায় নি?

—খেয়েচে বৈকি—খেয়েচে বৈকি—তা—হ্যাঁ—জানই তো ওকে কিছু খাওয়ানোই দায়—

হাসিমুখে মামার দিকে চাহিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—মাকে কিছু বলিনি মামা—কাল আমায় কল্‌কাতায় নিয়ে যাবে তো?

—ছাই যাবো, না-খাওয়ার কথা বল্‌লি কেন? বাঁদর মেয়ে কোথাকার—

মামার রাগের কারণ খুকী কিছু বুঝিতে পারিল না।

খাওয়ার কথা সম্বন্ধে মামা তো কিছু বলিয়া দেয় নাই, তবে সে কথা যদি বলিয়া থাকে, তাহার দোষ কি?

তাহার মামা একথা বুঝিল না। রাগিয়া বলিল—তোমার জন্যে যদি আর কখনো কিছু কিনে আনি খুকী—তবে দেখো—ব'লে দিলাম—কখ্‌খনো আন্‌বো না—কল্‌কাতাতেও নিয়ে যাবো না।

তাহার প্রতি এই অবিচারে খুকীর কান্না আসিল। বা রে, তাহাকে যে কথা বলিয়া দেয় নাই, তাহা বলাতেও দোষ?...সে কি করিয়া অতশত বুঝিবে?...

খুকী খুব অভিমানী, সে চীৎকার করিয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতে বসিল না, এককোণে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া নিঃশব্দে ঠোঁট ফুলাইয়া ফুলাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন সকালে তাহার মামা কলিকাতায় রওনা হইল—যাইবার সময় তাহার সহিত কথাটিও কহিল না।

আবার দিন কাটিতে লাগিল। বর্ষা শেষ হইয়া গেল, শরৎ পড়িল—ক্রমে শরৎও শেষ হয়-হয়। পূজা এবার দেরীতে, কার্ত্তিক মাসের প্রথমে। কিন্তু বাড়ী বাড়ী সবাই জ্বরে পড়িয়া, পূজায় এবার আনন্দ নাই। প্রবীণ লোকেও বলিতে লাগিলেন, এরকম দুর্ব্বৎসর তাঁহারা অনেক দিন দেখেন নাই।

উমারাণী সারা আশ্বিন ধরিয়া ভুগিয়া ভুগিয়া সারা হইয়াছে। একে কিছু না খাওয়ার দরুণ রোগা, তাহার উপর জ্বরে ভুগিয়া রোগা—তাহার শরীরে বিশেষ কিছু নাই। তবুও জ্বরটা একটু ছাড়িলেই কাঁথা ফেলিয়া উঠিয়া পড়ে—কারুর কথা শোনে না—তারপর গয়লা-পাড়া, সদ্‌গোপ-পাড়া, কোথার নবীন ধোবার

কিল পড়ে পিঠে। মা বলে দস্যি মেয়ে, মরেও না যে আপদ চুকে যায়, কবে যাবে ষষ্ঠীর মাঠে। কবে তোমায় রেখে এসে খুকী-খুকী বলে কাঁদতে কাঁদতে আস্‌বো—

ওঘর হইতে বড়-জা বলিয়া ওঠে—আচ্ছা ওসব কি কথা সকালবেলা ছোট বৌ ?···বলি মেয়েটার ষষ্ঠীর মাঠে যাবার আর তো দেরী নেই—ওর শরীরে আর আছে কি ?··· তার ওপর রোগা মেয়েটাকে—ওই রকম করে মার ? ছি ছি, একটা পেটে ধরেই এত ব্যাজার—তবুও যদি আর ডু-একটা হ'ত !···এসো উমা, আমার দাওয়ায় এসো তো মাণিক ? এসো এদিকে ?···

তাহার মা পাল্‌টা জবাব দিয়া বলে—বেশ করচি—আমি আমার মেয়েকে বল্‌বো তাতে পরের গা জ্বলে কেন ? যাস্‌নে ওখানে যেতে হবে না—সৌখীন কথা সকলে বল্‌তে পারে—যখন জ্বর হয়ে পড়ে থাকে, তখন যত্ন করতে তো কাউকে এগুতে দেখিনে—তখন তো রাত জাগতেও আমি—ডাক্তার ডাক্‌তেও আমি—ওষুধ খাওয়াতেও আমি—মুখের ভালোবাসা অমন সবাই বাসে—

দুই জায়ে তুমুল ঝগড়া বাধিবার কথা বটে এ অবস্থায়, কিন্তু বড়-জা হরমোহিনী বড় ভালমানুষ। সাতেপাঁচে থাকিতে ভালবাসে না, খুকীর ওপর একটা স্নেহও আছে, সে কিছু না বলিয়া নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যায়।

পূজার সময় খুকীর মামা আবার আসিল। তাহারও বয়স এই কুড়ি একুশের বেশী নয়, এই দিদিটি ছাড়া সংসারে তাহার আর কেহ নাই। এতদিন কলিকাতায় চাকুরির চেষ্টায় ছিল, পূজার কিছুদিন মাত্র পূর্ব্বে কোন্ ছাপাখানায় মাসিক আঠারো টাকা বেতনে লিনোটাইপের শিক্ষানবিসী করিতে ঢুকিয়াছে।

অনেক খাবারদাবার, খুকীর জন্যে ভাল ভাল দু-তিনটা রঙীন জামা, ছোট ডুরে শাড়ী ও জাপানী রবারের জুতা আনিয়াছে। তাহার দিদি বকে—এসব বাপু কেন আন্‌তে যাওয়া, সবে তো চাকরি হয়েচে—নিজের এখন কত খরচ রয়েচে, দু-পয়সা হাতে জমাও, ভাল খাও-দাও—শরীর তো এবার দেখচি বড্ডই খারাপ—অসুখ-বিসুখ হয় নাকি ?···

বড্ড খাটুনি, সকাল ন'টা থেকে সারাদিন বিকেল ছ'টা অবধি—এক একদিন আবার রাত আটটাও বাজে—এক একদিন আবার রবিবারেও বেরুতে হয়—তবে তাতে ওপর-টাইন পাওয়া যায় বারো আনা ক'রে—এবার গুড় উঠলে এক কলসী গুড় নিয়ে যাবোই এখান থেকে, ভিজে ছোলা আর গুড় সকালে উঠে বেশ জল খাবার হবে—

তারপর সে চীনামাটির খেল্‌না বাহির করিয়া খুকীকে ডাকে—ও উমা, দেখে যা কেমন কাঁচের ঘোড়া সেপাই—এদিকে আয়—

খুকী নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসিল, মামা আসাতে খুকীর খুব আহ্লাদ হইয়াছে, এসব ধরণের খাবার মামা না আসিলে তো পাওয়া যায় না ? পূজার কয়দিন খুকী মামার কাছেই সর্ব্বদা থাকিল। সকাল হইতে-না-হইতে খুকী চোখ মুছিয়া আসিয়া মামার কাছে বসে, মাঝে মাঝে বলে—এবার কল্‌কাতায় নিয়ে যাবে না মামা ?

পূজা ফুরাইয়া গেলে খুকীর মামা দিদির কাছে প্রস্তাবটা উঠায়। দিদি সহোদর বোন নয়, বৈমাত্রেয়, তবুও তাহাকে বেশ ভালবাসে, যত্ন করে। সেও ছুটি-ছাটা পাইলে এখানেই আসে। স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া দিন-দশেকের জন্য আপাততঃ খুকীকে কলিকাতায় ঘুরাইয়া আনিবার সম্মতি দিল।

খুকীর মামা খুশি হইয়া বলে—আমি ওকে লেখাপড়া শেখাবো---সেখানে গিয়ে মহাকালী পাঠশালায় ভর্ত্তি ক'রে দেবো—দেখতে পাই কেমন গাড়ী আসে, বাড়ি থেকে ছেলে-মেয়েদের তুলে নিয়ে যায়—গাড়ীর গায়ে নাম লেখা আছে 'মহাকালী পাঠশালা'।

ভগ্নীপতি হরিশ মুখুয্যে বলেন—পাগল আর কি ! অতটুকু মেয়ে ইস্কুলে ভর্ত্তি আবার কি হবে ?···হুজুগে পড়ে যেতে চাচ্চে—ছেলেমানুষ, ও কি আর গিয়ে টিক্‌তে পারে ? যাও নিয়ে দু-দিন—এখানে তো ম্যালেরিয়ায় ম্যালেরিয়ায় হাড় সার করে তুলেচে—যদি দু-দিন হাওয়া বদলাতে পারলে সেরে যায়—

খুশি। প্রথমটা তাহার ভয় হইয়াছিল, রেলগাড়ীর জানালার ধারে মামা বসাইয়া দিয়াছে, গাড়ীটা চলিতেই খুকীর মনে হইল তাহার পায়ের তলা হইতে মাটিটা সরিয়া যাইতেছে, ভয়ে তাহার চোখ বড় বড় হইল—আতঙ্কে মামাকে জড়াইয়া ধরিতে যাইতেই তাহার মামা হাসিয়া বলিল---ভয় কি, ভয় কি খুকু ? এ যে রেলের গাড়ী---দেখো আরও কত জোরে যাবে এখন---

রেলগাড়ী চড়িবার আনন্দকে যে-বয়সে বুদ্ধি দিয়া উপভোগ করা যায়, উমারাণীর সে বয়স হয় নাই। সে শুধু চুপ করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া বসিয়া থাকে। মাঝে মাঝে তাহার মামা উৎসাহের স্বরে বলে---কেমন রে খুকী---সব কেমন বল্ তো ? কেমন লাগচে রেলগাড়ী ? খুকী বলে, খুব ভালো—

কিন্তু খানিকক্ষণ পরে তাহার মামা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করে যে খুকী বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে, দেখিতে দেখিতে সে ঘুমাইয়া পড়ে।

গাড়ী কলিকাতায় পৌছিলে একখানা রিক্সা ভাড়া করিয়া তাহার মামা তাহাকে বাসায় আনিল। অখিল মিস্ত্রির লেনে একটা ছোট মেসে বাসা, আপিসের বাবুদের মেস, সকলেই বয়সে প্রবীণ, সেই কেবল অল্পবয়স্ক। খুকীর আকস্মিক আবির্ভাবে সকলেরই আনন্দ হইল। বাড়ীতে ছেলেমেয়ে সকলেরই আছে, কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা মাস-মাহিনার বেড়াজালে অষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া পড়িবার দরুণ মাসে একবার কি দুইবার ভিন্ন বাড়ি যাওয়া ঘটে না, ছেলেমেয়ের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। খুকীকে পাইয়া একটা অভাব দূর হইল। চার-পাচ বছরের ছোট ফুটফুটে মেয়ে, চাঁদের মত মুখখানি, কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুল, কালো চোখের তারা—আপিসের ছুটির পর তাহাকে লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। এ ডাকে উহার ঘরে, ও ডাকে তাহার ঘরে।

কিন্তু তাহার মামার বড় দুঃখ, খুকীর বেশভূষা একেবারে খাঁটি পাড়াগেঁয়ে। মাথায় বিনুনী, কপালে কাঁচপোকার টীপ, অতটুকু মেয়ের পায়ে আবার আল্‌তা, ছোট চুমুরী শাড়ী পরনে—ওসব সেকেলে কাণ্ড আজকাল শহর বাজারে কি আর চলে ? দিদি পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া থাকে, শহরের রীতিনীতি বেশভূষার কি ধার ধারিবে ? এখানকার ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের কেমন সুন্দর চুলের বিন্যাস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট সাজানো, দেখিতে যেন কাঁচের পুতুল। খুকীকে ঐ রকম সাজানো যায় না ?

ভাবিয়া ভাবিয়া সে খুকীকে সঙ্গে করিয়া ট্রামে ধর্ম্মতলার এক চুলছাঁটাই দোকানে লইয়া গেল। নাপিতকে বলিল—ঠিক সায়েবদের ছেলেমেয়েদের মত যদি চুল কাট্‌তে পারো, তবে কাঁচি ধরো, নইলে অমন ঘনকালো চুল নষ্ট কোরো না যেন।

মেস হইতে সে খুকীর মাথার বিনুনী খুলিয়া আনিয়াছিল।

চুল ছাঁটিতে উমারাণীর বেশ ভাল লাগিতেছিল। সাম্‌নে একখানা প্রকাণ্ড আয়না, চার-পাচটা বড় বড় আলো জ্বলিতেছে, নাপিত মাঝে মাঝে আবার ময়দার মত কি একটা গুঁড়া তাহার ঘাড়ের চুলে মাখাইতেছিল—এমন সুড়সুড়ি লাগে !...

তাহাকে সাজাইতে খুকীর মামা পাচ ছয় টাকা খরচ করিয়া ফেলিল। মেসের নিয়োগী মশায় একে একে কয়েকটি পুত্র কন্যাকে উপরি উপরি চার পাচ বৎসরের মধ্যে হারাইয়াছেন, উমারাণীকে পাইয়া আর ছাড়িতে চাহিতেন না। সন্ধ্যার পর রঙীন ফ্রক-পরা, বব্‌ড্ চুল, মুখে পাউডার, পায়ে রবার জুতা—আর এক উমারাণী যখন তাহার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে দেখিয়া তো নিয়োগী মশায় বিষম খাইবার উপক্রম করিলেন।

তাহার মামা হাসিয়া বলে—গেলই না হয় কিছু খরচ হয়ে, এমন সুন্দর মেয়ে, কি ক'রে ভূত সাজিয়ে রেখেছিল বলুন দিকি ?...ও কুণ্ডু-মশায়, চেয়ে দেখুন, পছন্দ হয় ?

কি করিয়া খুকীর শীর্ণতা দূর করা যাইতে পারে, এ সম্বন্ধে নানা পরামর্শ চলিল। গলির মোড়ের একজন ডাক্তার কড লিভার অয়েল ও কেপ্‌লারের মল্ট্ এক্সট্রাক্টের ব্যবস্থা দিলেন—তাহা ছাড়া বলিলেন,—খাওয়া চাই, না খেয়ে খেয়ে এমন হয়েচে—পুষ্টির অভাব, এ বয়সে এদের খুব পুষ্টিকর জিনিষ খাওয়ানো চাই কিনা ?- সকালে

কোয়েকার ওট্স্ খাওয়াবেন দিন-পনেরো, দেখুন কেমন থাকে।

কিন্তু চতুর্থ দিনে খুকীর কম্প দিয়া জ্বর আসিল। খুকীর মামার লিনোটাইপের কাজে যাওয়া হইল না, সারাদিনই খুকীর কাছে বসিয়া রহিল। অন্যদিন বৃদ্ধ নিয়োগী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ছাপাখানায় যাওয়া চলিত, আজ আর তাহা হইল না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে জ্বর ছাড়িয়া গেল, খুকী উঠিয়া বসিয়া একটুকরা মিছরী চুষিতে লাগিল। আপিস-ফেরতা ফণিবাবু একটা বেদানা ও গোটাকতক কমলালেবু খুকীর জন্য আনিয়াছেন, সতীশবাবু পোয়াটাক ছোট আঙুর ও পুনরায় গোটা-তিনেক কমলালেবু, আরও দু-তিনজনের প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু কিনিয়া আনিয়াছেন। সকলে চলিয়া গেলে খুকী মামার দিকে একবার চাহিল, পরে ঠোঁট ফুলাইয়া মাথা নীচু করিল—মামা বিস্মিত হইয়া বলিল—কি রে খুকী? কি হয়েছে?···

খুকী দুঃখের চাপা কান্নার মধ্যে বলিল—বাড়ি যাবো মামা—মার কাছে যাবো—

—আচ্ছা, কেঁদো না খুকু—জ্বর সারুক, নিয়ে যাবো এখন।

দু-তিন দিন গেল। জ্বর সারিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু রাত্রে মাঝে মাঝে সে ঘুমের ঘোরে মায়ের জন্য কাঁদিয়া ওঠে। ভুলাইবার জন্য তাহাকে একদিন হগ্‌ সাহেবের বাজারের খেলানার দোকানে লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে একটা খুব বড় মোমের খোকা পুতুল তাহার খুব পছন্দ হইল, কিন্তু দামটা বড় বেশী, সাড়ে চার টাকা—খুকীর মামার একমাসের মাহিনার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। মামা বলিল—অন্য একটা পুতুল পছন্দ কর খুকু, ওটা ভালো না কেমন ছোট ছোট এই-সব কুকুর, হাতী, কেমন না?

খুকী দ্বিরুক্তি না করিয়া ঘাড় নাড়িল বটে, কিন্তু পুতুলটা ফিরাইয়া দিবার সময় (সে পূর্ব্ব হইতেই পুতুলটাকে দখল করিয়া বসিয়াছিল) তাহার ডাগর চোখ দুটি ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল।

দোকানদার বলিল-বাবু, খুকীর মনে কষ্ট হয়েচে, আপনি বড় পুতুলটাই নিন্, কিছু কমিশন বাদ দিয়ে দিচ্চি—

তাহার মামা বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা খুকু, তুমি বড় খোকা-পুতুলটাই নেও—কুকুরে দরকার নেই—ধরো বেশ করে যেন ভাঙে না দেখো—

প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়াছে। সেদিন রবিবার, খুকীর মামা বিশেষ কারণে চেতলার হাটে এক বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছে। এখনি আসিবার কথা, কিছু টাকা পাওনা আছে, তাহারই আদায়ের চেষ্টায় যাওয়া, ততক্ষণ অন্যান্য দিনের মত নিয়োগী-মশায়ের তত্ত্বাবধানেই খুকীর থাকিবার কথা। খানিকক্ষণ খুকীর সহিত গল্পগুজব করিবার পরে বৃদ্ধ নিয়োগী-মশায়ের মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাকর্ষণ হইল। কথা বলিতে বলিতে খুকী দেখিল তিনি আর কথা বলিতেছেন না, অল্প পরেই তাঁহার নাসিকা গর্জ্জন সুরু হইল। মেসে কোনো ঘরে কেহ নাই, উমারাণীর ভয় ভয় করিতে লাগিল। একবার সে জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া চাহিয়া দেখিল, গলির মোড়ে দুজন কাবুলীওয়ালা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে, তাহাদের ঝোলাঝুলি, লম্বা চেহারায় ভয় পাইয়া সে জানালা হইতে মুখ সরাইয়া লইল।

মামা কোথায় গেল?··মামা আসে না কেন?

সে ভয় পাইয়া ডাকিল - ও জ্যাতাবাবু, জ্যাতাবাবু?··

তাহার মামা তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছে নিয়োগী মহাশয়কে জ্যাঠাবাবু বলিয়া ডাকিতে।

সাড়া না পাইয়া সে আর একবার ডাকিল—আমার মামা কোথায় ও জ্যাতাবাবু?··

নিয়োগী মহাশয় জড়িতস্বরে ঘুমের ঘোরে বলিলেন—হুঁ—আচ্ছা, আচ্ছা—

তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন দেশের বাটীতে রাত্রিতে শুইয়া আছেন, মালপাড়ার কেতু মাল চৌকীদার লাঠি ঘাড়ে রোঁদে বাহির হইয়া তাঁহার নাম ধরিয়া হাঁক দিতেছে।

খুকী এদিক-ওদিক চাহিয়া উঠিয়া পড়িল—সিঁড়ির দরজা খোলা ছিল, সে নীচে নামিয়া আসিল। ঝি চাকর রান্নাঘরে তালা বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে,

একটা কালো বিড়াল চৌবাচ্চার উপর বসিয়া মাছের কাঁটা চিবাইতেছে।

বাহির হইয়াই রাস্তা। খুকীর একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, এই রাস্তাটা পার হইলেই তাহার মামার কাছে পৌঁছানো যাইবে, এই পথের যেখানটাতে শেষ, সেখান হইতেই পরিচিত গণ্ডীর আরম্ভ।

ঘুরিতে ঘুরিতে সে পথ হারাইয়া ফেলিল, গলি পার হইয়া আর একটা বড় গলি, তাহার পর একটা লোহার বেঁড়া-ঘেরা মাঠ-মত, সেটার পাশ কাটাইয়া আর একটা গলি। ক্রমে খুকীর সব গোলমাল হইয়া গেল, এ পর্য্যন্ত সে একবারও পিছনের দিকে চাহে নাই, এবার পিছনের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল সেদিকটাও সে চেনে না। সাম্‌নের পিছনের দুই জগতই তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত, কোথাও একটা এমন জিনিষ নাই যাহা সে পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছে।

সে ভয় পাইয়া কাঁদিতে লাগিল, ঠিক দুপুর বেলা, পথে লোকজনও কম, বিশেষতঃ এই সব গলির মধ্যে। আরও খানিক দূর গিয়া একটা লালরঙের বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, তাহাদের বাড়ির মতি-ঝিয়ের মত দেখিতে একজন স্ত্রীলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েচে খুকী, কাঁদচ কেনে? তোমাদের কোন্ বাড়িটা, এইটে?···

খুকী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমি মামার কাছে যাবো—

—তোমাদের ঘর কোথা গো?

খুকী আঙুল তুলিয়া একটা দিক দেখাইয়া বলিল ওই দিকে—

—তোমার বাপের নাম কি?

বাপের নাম? কই তাহা তো সে জানে না! বাপের নাম 'বাবা', তা ছাড়া আবার কি? সে চোখ তুলিয়া ঝিয়ের মুখের দিকে চাহিল।

স্ত্রীলোকটি একবার গলির দুইদিকে চাহিয়া দেখিল, পরে বলিল—আচ্ছা, এসো, এসো খুকী, আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমার মামার কাছে নিয়ে যাচ্চি, এসো—

ছোট্ট খোলার বাড়ি। ঝি কাহাকে ডাকিয়া কি-একটা কথা নীচুস্বরে বলিল, তারপরে দুইজনেই খানিকক্ষণ কি বলাবলি করিল, নবাগতা স্ত্রীলোকটি হাত দিয়া কি-একটা দেখাইল, খুকী সে-সব বুঝিতে পারিল না। পরে তাহারা খুকীকে একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে লইয়া গেল—ছোট্ট ঘুলঘুলির কাছে একটা নীচু তক্তাপোষ, সাদা চাদর পাতা। কিন্তু ঘরের এককোণে একটা প্রকাণ্ড মাটির জালা, ও তাহার চারিপাশে একরাশ অন্ধকার। খুকীর কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল—যক্ষিবুড়ীর যে জালাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লুকাইয়া পুরিয়া রাখিবার গল্প শুনিয়াছে যেন সেই ধরণের জালা। সে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলিল—আমার মামা কোথায়?

নবাগতা স্ত্রীলোকটি বলিল—কেউ দেখেনি তো আনবার সময়ে? আমার বাপু ভয় করে। এই সেদিন সৈরভির বাড়ীতে পুলিশ এসে কি তম্বি, আমি থালা ফেরৎ দিতে গেনু তাই—

খুকীদের বাড়ির মতি-ঝিয়ের মত দেখিতে যে স্ত্রীলোকটি, সে বিদ্রূপ করিয়া বলিল—নেকু!···যাও, সাম্‌নের দরজাটা খুলে ঢাক করে রেখে এলে কেনে?··· নেকু, জানেন না যেন কিছু!···

সে খুকীকে চৌকীর উপর বসাইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদরের কথা বলিল, তাহাকে একটা রসগোল্লা খাইতে দিল। পরে খুকীর হাতের সোনার বালা দুগাছা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিল—এখন তুলে রেখে দি খুলে, কেমন তো খুকী?···বেশ লক্ষি মেয়ে—দেখি—

খুকী ভয়ে ভয়ে বলিল—বালা খুলো না—আমার মামাকে ডেকে দেও—

কিন্তু ততক্ষণ ঝি তাহার হাত হইতে বালা দুগাছা অনেকটা খুলিয়াছে, দেখিয়া খুকী কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—আমার বালা নিও না, মামাকে ব'লে দেবো—আমার বালা খুলো না—

মতি-ঝিয়ের ইঙ্গিতে নবাগতা স্ত্রীলোকটি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। কিন্তু একটা বিষয়ে দুজনেই বড় ভুল

লড়াই করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সাধারণের হয় তো সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু এ ধারণা যে কতদূর অসত্য, তাহা গতমাসে দুগ্ধপানের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের সময় উমারাণীর মা ভালরূপই জানিত। ইহারা সে-সব খবর জানিবে কোথা হইতে? বেচারীদের ভুল ভাঙিতে কিন্তু বেশী বিলম্ব হইল না, ধ্বস্তাধ্বস্তিতে বিছানা ওলটপালট হইয়া গেল, উমারাণীর আঁচড়-কামড়ে মতি-ঝি তো বিব্রত হইয়া উঠিল। গোলমালে একগাছা বালা হাত হইতে খুলিয়া কোথায় চৌকীর নীচের দিকে গড়াইয়া গেল। পিছন হইতে তাহার হাত মুখ চাপিয়া ধরিয়া অন্যগাছা নবাগতা স্ত্রীলোকটি ছিনাইয়া খুলিয়া লইল।

মতি-ঝি বলিল—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—হাঁপিয়ে মরে যাবে—দেখি ও আপদ্ রাস্তার ওপর রেখে আসি—বাপ্‌রে কি দস্যি!···

—এখন কোথায় রাখ্‌তে যাবি লো?·· খ্যান্তমণিকে একটা খবর দিবি নি।

—না বাপু, তাতে আর দরকার নেই, ওকে রেখে আসি—কেউ টের পাবে না, ত্থাখ না বসে বসে—

* * * *

তুমুল গোলমাল, খোঁজাখুঁজি, হৈ-চৈএর পরে সন্ধ্যার সময় উমারাণীকে পাওয়া গেল নেবুতলার সেণ্ট-জেম্‌স্ পার্কের কোণে। কেবিন-ছাঁটাই বব্‌ড চুল ছেঁড়াখোঁড়া, কপালে ও গালে আঁচড়ের দাগ, হাত শুধু, ফ্রকের কোমরবন্ধ ছিঁড়িয়া ঝুলিতেছে,—'মামা', 'মামা' বলিয়া কাঁদিতেছিল, অনেক লোক চারিধারে ঘিরিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে, একজন গিয়া একটা পাহারাওয়ালাও ডাকিয়া আনিয়াছে—ঠিক সেই সময় নিয়োগী-মশায়, কুণ্ডু-মশায়, সতীশবাবু, অখিলবাবু, খুকীর মামা সবাই গিয়া উপস্থিত হইলেন।

যথারীতি থানায় ডায়েরী ইত্যাদি হইল। কে তাহার বালা খুলিয়া লইয়াছে এ সম্বন্ধে খুকী বিশেষ কোনো খবর দিতে পারিল না। খুকীর মামাকে সকলে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল। খবরদারী করিবার যখন সময় নাই, তখন পরের মেয়ে আনা কেন, ইত্যাদি। সবাই বলিল—যাও ওকে কালই বাড়ি রেখে এসো, ছিঃ, ওই রকম ক'রে কি কখনো—। মেসের সকলে চাঁদা তুলিয়া খুকীকে দুগাছা পালিশ-করা বিলাতী সোনার বালা কিনিয়া দিল।

গাড়ীতে উঠিবার সময় তাহার মামা বলিল—খুকু, বাড়িতে গিয়ে যেন এসব কথা কিছু ব'লো না!···কেমন তো?···কক্ষনো ব'লো না যেন? হ্যাঁ, লক্ষ্মীমেয়ে—তা হ'লে আর কল্‌কাতায় নিয়ে আস্‌বো না—

খুকী ঘাড় নাড়িয়া রাজী হইল। বলিল—আমায় তখন একটা পুতুল কিনে দিও মামা—আর একটা মেম-পুতুল—

সাবিত্রী ব্রত

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

আমাদের সাক্ষাতে আজ মস্ত বড় সমস্যা দেখা দিয়াছে। এ সমস্যা বড় সহজ সমস্যা নয়, তাই তার সমাধানও সহজ হওয়া সম্ভব নহে। এ সমস্যা জীবন-মরণের, চির ভবিষ্যতের, সমস্ত বর্ত্তমানের ও উত্তরপুরুষের ভালমন্দের সমস্যা। এই বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের উপরেই আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন গঠন নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। আজ যদি আমরা এ সমস্যার পূর্ণ সমাধান করিতে সমাহিত না হই, আমাদের ভবিষ্যৎ চিরঅন্ধকারে সমাবৃত হইয়া যাইবে। কারণ মানুষের কাছে সুযোগ বারেবারেই দেখা দেয় না, সুসময় সকল সময়েই আসে না। অন্ধকারের অন্তরাল হইতে উদীচির যে আলোকচ্ছটা ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে, ঐ সমুজ্জ্বল

উষালোককে আমাদের মঙ্গল আরতি করিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে। দীর্ঘ রজনীর গভীর ও তন্দ্রামগ্নতায় নিমগ্ন থাকিয়া যে নিবিড় আলস্যে আমরা আমাদের অভিভূত করিয়া রাখিয়াছি, সেই সর্ব্বনাশী বিলাসশয্যা আজও যদি আমরা না ছাড়ি, তন্দ্রাসুখে এ সময়েও যদি বিহ্বল হইয়া থাকিয়া এত বড় সুযোগকেও আমাদের সম্মুখ হইতে প্রত্যাখ্যাত হইতে দিই, দুর্য্যোগ সম্পূর্ণরূপেই আমাদের আশা সূর্য্যকে গ্রাস করিবে, উদয়ের উদ্দীপ্ত ভাস্কর চিররাহুগ্রস্ত হইয়া যাইবে।

সকল দেশে, সকল যুগে, সকল সময়েই যে-কোন মহৎ কার্য্য মহৎ ত্যাগ ব্যতীত সম্পন্ন হয় নাই। উদ্দেশ্য যত বড় হয়, উদ্যোগ ততই বৃহৎ হওয়া আবশ্যক, ত্যাগ ততই কঠিন হওয়া প্রয়োজন। নর এবং নারী লইয়া সমগ্র সমাজ, সমস্ত জগৎ। এখানে নরের সহিত নারীশক্তি না মিলিলে সৃষ্টি হইতে পারে না। যেমন জীবসৃজনে তেমনি জাতি সৃষ্টিতে সর্ব্বত্রেই নারীশক্তির নরশক্তির সহিত সংমিশ্রণ একান্তরূপে প্রয়োজনীয়। ব্রহ্ম যখন এক অদ্বিতীয়, সৃষ্টি তখন লয়প্রাপ্ত। প্রকৃতির সহায়তা ব্যতীত পরমেশ্বরও শক্তিহীন, শিব শবে পরিণত। অসুরজয় কখন্ সম্ভব হইয়াছিল? যেদিনে সুররাজের কঠোর তপস্যায় প্রসন্না মহাশক্তি তাঁহার সহায়তায় স্বীকৃতা হইয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। সেই অসুরনাশিনী মহাশক্তি নারীশক্তি।

স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু।

জগতের সমস্ত নারীর মধ্যেই সেই সুরবর-বন্দিত মহাশক্তির অংশ নিহিত আছে। এই শক্তিসমষ্টি কেন্দ্রীভূত হইলে ইহা হইতে আজও অসাধ্য সাধন কেন না হইতে পারিবে?

"কোমল কুসুমে বিধি গড়েছে রমণী হৃদি,
তাতেও নিহিত আছে কঠোর পাষাণ,
সহে না সতীর প্রাণে পতি অপমান।"

আজ ঘরে ঘরে পতিপুত্রের অবমাননার সীমা পরিসীমা নাই, ধিক্কারে সমস্ত সভ্য জগৎ পরিপূর্ণ, এতেও কি আমাদের দেশের সতীচিত্ত বিচলিত হইবে না? নারীর আজ সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী, সহযাত্রিণী হইয়া পুরুষের অবমাননার প্রতিকার প্রচেষ্টাকে, সফলতায় পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে, তবেই তিনি যথার্থ সহধর্ম্মিণী নামের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিবেন, সতী বলিয়া সম্পূজিতা হইবেন। যেদিন ভারতীয় পুরুষের শৌর্য্যবীর্য্য জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, সেদিন ভারতীয়া নারী বীরনারী নামে পরিচিতা ছিলেন। অর্জ্জুনের পার্শ্বেই সুভদ্রার সম্ভব হইয়াছিল, পৃথ্বীরাজের সহিত সংযুক্তার সংযোগ ঘটিয়াছিল। আবার ভারতীয় পুরুষের কর্ম্মোদ্যম দেখা দিয়াছে, ভারতীয়া নারী আজ কায়মনোবাক্যে তাঁর পার্শ্বচারিণী না হইলে ভারত-সতীর মর্য্যাদাহানি হইবে।

আমাদের বিবাহমন্ত্রে আমরা যে তাঁদের সহিত একমন, একপ্রাণ, একচিত্ত হইতে চির অচপল ধ্রুবতারা সাক্ষ্যে কঠোর শপথ লইয়াছি। আজ সে প্রতিজ্ঞা ভুলিলে ত চলিবে না। ভারতনারীর এই একপ্রাণতা যুগে যুগেই রক্ষিত হইয়াছিল। তার দীর্ঘ অবনতির যুগেও এই নীতি প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে। আজ জীবন-যুদ্ধে তাঁরা যদি নেতৃত্ব করিতে আসিয়া থাকেন আমরাও কায়মনে তাঁদের পার্শ্বচারিণী না হইব কেন? "ছায়া যেমন সূর্য্যকে অনুসরণ করেন, তোমরাও তেমনই পতির অনুসারিণী হইবে," শাস্ত্রের এই উপদেশ। আর দুহিতা, ভগিনী, জননিগণ! আপনাদের কর্ত্তব্য আপনাদের পিতা ভ্রাতা সন্তানের কর্ত্তব্যের সহিত সংযুক্ত। একবার সেই জাপানী মায়ের কথা আপনারা স্মরণ করুন। অক্ষম বৃদ্ধা মাতার প্রতিপালক বলিয়া পুত্র স্বদেশরক্ষাকল্পে যোদ্ধা রূপে গৃহীত না হইলে যে, মা নিজে আত্মঘাতিনী হইয়া পুত্রকে সমরাঙ্গণে যাত্রার পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

তারপর আর এক কথা, এবং এই কথাই আজিকার প্রধান কথা, আমাদের এ যুদ্ধ হাতে হাতিয়ারে নয়। এই জীবন-মরণের প্রবল সংগ্রাম বিপুল। এই অভিযান নিরস্ত্র জাতির নিরস্ত্র সংগ্রাম। জগতের কোন দেশের কোন ইতিহাসেই এত বড় অসমসাহসিকতার যুদ্ধযাত্রা আর কখনও দেখা যায় নাই। এ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণই অভিনব, এবং অদ্ভুত। সমস্ত

জগৎ আজ উদ্‌গ্রীব হইয়া আমাদের এই অহিংস যুদ্ধের পরিণাম প্রতীক্ষা করিতেছে। এর ফলাফলের উপরেই আমাদের মানসম্ভ্রম, জীবনমরণ নির্ভর করিয়া আছে। আজ যদি এই মহাযজ্ঞকে আমরা স্বাভাবিক ঔদাসীন্য, দীর্ঘকালের অভ্যাস প্রযুক্ত আলস্য এবং বিলাসলালসার দ্বারায় ব্যর্থ হইতে দিই, সমস্ত সভ্য-জগতে আমাদের আর মুখ দেখাইবার কিছুমাত্র উপায় বাকি থাকিবে না। এই মহাযজ্ঞকে আমাদের পূর্ণ করিতে হইবে। যজ্ঞভ্রষ্ট হইলে সাধকের সর্ব্বনাশ! একচিত্ত একমন হইয়া কোটি কোটি ভারতনারী পুরুষকে এ যজ্ঞের নেতৃত্ব করিতে হইবে। যজ্ঞেশ্বর বিরাটপুরুষ কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিবেন না।

তাঁর নিজ বাক্যে তিনি আমাদের জানাইতেছেন—

"যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"

তাঁকে যেভাবে যে কামনা করে, তিনি সেইভাবেই তাহাকে আশ্রয় দেন। আজ আমরা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে আত্মীয়জনবিয়োগ দুঃখ ভীত অর্জ্জুনের সহিত সমাবস্থাপন্ন। আমরাও যদি তাঁর সেই বাণী, সেই মহাবাণী—"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্যোত্তিষ্ঠ পরন্তপ" এই অভয়মন্ত্র স্মরণপূর্ব্বক উত্থিত হইতে পারি,—উত্থিত ও জাগ্রত হইতে পারি, আমাদের পক্ষেও জয় অসম্ভব হইবে না। ভারতের অধিদেবতা "উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত" বলিয়া আজ ডাক দিয়াছেন যে! নতুবা জড়ে কি চেতনা সঞ্চার হইত?

আজ আমাদের চাই শুধু একতা, চাই শুধু এক-প্রাণতা, চাই একচিত্ততা জীবনে এক উদ্দেশ্য।

"সমানীবঃ আকুতি সমানাহৃদয়ানি বঃ। সমানবস্তু বো মনঃ"

দেশের স্বরাজ্যলাভই নারী পুরুষের, শিক্ষিত অশিক্ষিতের, ধনী দরিদ্রের একমাত্র লক্ষ্য কেন্দ্র। ক্ষুদ্র স্বার্থ, তুচ্ছ মোহ, হীন আলস্য, সমস্ত জড়তা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সমবেত শক্তিকে একপথে পরিচালিত করিতে হইবে। স্বদেশী গ্রহণ এ যুদ্ধের এই প্রধান দিব্যাস্ত্র! এ অস্ত্রের সন্ধানে যদি ভারত আজ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, বিশ্বের দরবারে তার আসন স্বতই শ্রদ্ধাসনে পরিগণিত হইয়া যাইবে। সম্মান-মুকুট তার আপনা হইতেই প্রাপ্য হইবে। আর যদি চিরদিনের মতই গৃহবিচ্ছেদের বিভীষণ এবারেও আমাদের মধ্যে তার সনাতন নীতির অনুসরণ করিতে সুযোগ পায়, যদি হিন্দুর সহিত হিন্দু, হিন্দুর সহিত মুসলমান নিজেদের প্রকৃত উন্নতির প্রকৃষ্ট পন্থা না চিনিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থ মোহে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সমচিত্ততা দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত না হইয়া বিযুক্ত হয়, পরস্পরে খাওয়াখাওয়ি করিয়া নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্তি এবারেও আমাদের ভাগ্যফল দাঁড়াইবে।

আজ আমাদের সযত্নে ও সাবধানে এই বিরোধের বিদ্বেষকে বিদূরিত এবং ইহার স্থলে নারীজাতির জাতীয়-স্বভাবানুমোদিত প্রেম ও মৈত্রীর সংস্থাপন করিতে হইবে। "সমানাহৃদয়ানি বঃ" এই দুরূহ ব্রতে এস আমরা দীক্ষা গ্রহণ করি। "সমানা বস্তু বো মনঃ" এই মন্ত্রের সাধনায় এস আমরা প্রাণপণ করিতে সচেষ্ট হই। চেষ্টা যত্নে কোন্ কার্য্য কবে কার না সিদ্ধ হইয়াছে? বাহিরে মতবিরোধ যার সঙ্গে যতই থাক, আজ ভারতের ভাগ্যবিধাতার কাছে আমরা একচিত্তে, সহানুভূতির সহিত একই কামনা ও একমাত্র লক্ষ্য লইয়া যেন দাঁড়াইতে পারি। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকুক স্বরাজ।

ভারত-মহাসাগরের পরিবেষ্টনীর মধ্যে সশস্ত্র প্রহরী ও চেড়ীদলের প্রহরায় স্থাপন করিয়াও অপহৃতা সীতা দেবীর স্বাধীনতাকে চির অপহৃত রাখা যায় নাই। পথ খুঁজিয়া দেখিলে চারিদিক দিয়াই পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তবে সেই-সব পথে চলার জন্য লোক চাই। সরবে কাজ করার লোক পাওয়া গেলেও পাওয়া যায়, নীরব কর্ম্মীর অভাবটাই সকল ক্ষেত্রে বেশী। কিন্তু শব্দভেদী বাণ যখন অপর পক্ষের ধনুকে চড়ান, তখন যতখানি সম্ভব নিঃশব্দেই নিজের নিজের কাজ কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে করিয়া যাইতে হইবে। আমাদের দেশের ধর্ম্মেও বাহ্যপূজার অপেক্ষা আন্তর পূজাকেই উচ্চাসন দেওয়া হইয়া থাকে।

মানুষকে পৃথিবীতে জন্মিয়া অনেকগুলি ঋণে ঋণী হইতে হয়। ঐ সকল ঋণের মধ্যে দেশঋণ একটি প্রধান ঋণ। অন্য সকল ঋণ নিজের এবং নিজ পরিবারের উন্নতিকল্পেই পর্য্যবসিত, কিন্তু দেশঋণেই একমাত্র নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম কর্ম্মের উপায় নিহিত আছে। দেশের প্রত্যেক লোকের উন্নতিলাভের সহায়তা করিয়াই এ ঋণ শোধ করিতে হয়, এইজন্যই আমাদের সকল ঋণের মধ্যেই এই দেশঋণই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতম ঋণ ও কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত। এঋণ যে পরিশোধ করিতে পারিয়াছে, ইহ-পরলোকে তার আর কোন কঠিন ব্রত পালনের আবশ্যকতা নাই।

এমন কঠোরব্রত আমার চিরকল্যাণী স্বদেশবাসিনীরা কায়মনে পালন করিবেন কি? এ ব্রত গ্রহণে ও পালনে দুঃখ আছে বই কি, নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু অমঙ্গল মঙ্গলের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। আমাদের মধ্যের আদর্শ সতী—সাবিত্রী। সেই সাবিত্রী শুধুই আমাদের কাছে সতীত্বেই আদর্শনারী নহেন, পরন্তু সকল বিষয়েই তাঁর আদর্শ আমাদের নিকট পূর্ণ। তিনি তাঁর পতি-গ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন তাঁহার সেই প্রিয়তম পতি অল্পজীবী। এই এত-বড় বিপদের নিশ্চিত বার্ত্তা পাইয়াও তিনি বিন্দুমাত্র ভীতা হন নাই। তিনি বিপদকে বরণ করিয়াই পতিবরণ করিলেন। এইখানেই সাধারণ নারীর সহিত তাঁহার একান্তভাবে প্রভেদ দেখা দিল। তারপর প্রতীক্ষিত কাল আসিল, ধৈর্য্যশীলা সতী তাঁর অটুট ধৈর্য্যসহকারে সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে লাগিলেন। কোথাও কোন ত্রুটিবিচ্যুতি নাই। পতির সহকারিণীরূপে দুর্গম অরণ্যপথে গমনকালেও একবার তাঁর মুখে আমরা পতিকার্য্যের ব্যাঘাতক উদ্বেগক দুর্ব্বলতা দেখিতে পাই না।

ইংরেজীতে একটী প্রবাদ আছে—'There are remedies for all things but death"—কিন্তু মহা-কালও এই অসমসাহসিকা মহাপ্রাণা মহীয়সী মহিলার অনতিক্রম্য পুণ্যপ্রভাবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। দৃঢ়ব্রতা অনন্যচিত্তা সাধিকার একান্ত সাধনায় কালচক্রের অভিভব হইয়া গেল, সাবিত্রী জয়যুক্তা হইলেন।

হে নবীন ভারতের সতী সাবিত্রীগণ! আপনারাও আজ আপনাদের অপরাজেয় পুণ্যবলযুক্ত দৃঢ়চিত্ততার বলে অন্ধ শ্বশুরকে চক্ষুষ্মান্ করিতে থাকুন, অপহৃত সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া লউন, কুপুত্রক অ-পুত্রক পিতৃগণকে সুপুত্র গঠনে পুত্রযুক্ত করিয়া তুলুন, মৃত-পতিকে জীবন্ত করুন। বিশুদ্ধচরিত্রতার দীপ্তিতে দীপ্তিমতী দেবী সাবিত্রী যখন কাল-সাক্ষাতেও নির্ভীক অটল থাকিয়া আপনার প্রত্যেক কর্ত্তব্যটি পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আপনারাই বা পারিবেন না কেন?

আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে সাবিত্রী ব্রতই সবচেয়ে প্রধান এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর ব্রত। আমাদের এ দিনের সাবিত্রীব্রতের বিধি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, আজ ঘরে বসিয়াই শুধু সাবিত্রী ব্রত পালন চলিবে না, সত্যবানের সহিত সাবিত্রীকে আজ পথে পথে, গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতে হইবে। তবেই আবার ভারতে অন্ধ দৃষ্টিলাভ করিবে, অপুত্রক পুত্র লাভে ধন্য হইবে, মৃত জড় পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়া ভ্রষ্ট রাজ্যের রাজদণ্ড ধারণ করিতে সমর্থ হইবে। শত শত সন্তানের উচ্চারিত "জয় মা!" রবে গগন পবন মুখরিত হইয়া উঠিবে।

ইহাই এ যুগের সাবিত্রী ব্রতের মূল তত্ত্ব। *

* কোন এক নারী-সমিতিতে পঠিত।

জৈনধর্ম্ম

আর্য্যপট্ট

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক দিন পূর্ব্বে ইংরেজ-রাজ্যের প্রারম্ভে যখন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষের সংস্কৃত, পালি বা প্রাকৃত সাহিত্য পড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন সর্ব্বপ্রথমে পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধসাহিত্য তাঁহাদের নজরে পড়িল। তাঁহারা প্রথমে যাহা শুনিলেন তাহাই ধ্রুবসত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন। সিংহলে ও শ্যামদেশে বৌদ্ধেরা তাঁহাদের শুনাইলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের মধ্যে প্রাচীন। গৌতম বুদ্ধ যখন জীবিত ছিলেন তখন নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র নামক একজন শিক্ষক জৈনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গৌতমের পূর্ব্বে আবার সাতজন বুদ্ধ ছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম জৈন ধর্ম্মাপেক্ষা অনেক পুরাতন। বৌদ্ধমূর্ত্তি এবং জৈনমূর্ত্তিতে এতটা মিল আছে যে, প্রথম প্রথম পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জৈনমূর্ত্তিকে বৌদ্ধমূর্ত্তির একটা শাখা বলিয়াই মানিয়া লইতে বাধ্য হইতেন। গত দেড়শত দুইশত বৎসরের মধ্যে জৈনধর্ম্মের প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশ পাইয়াছে। এখন আমরা জানিতে পারিতেছি, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের তুলনায় জৈনধর্ম্ম কত পুরাতন, অতি প্রাচীনকালে বৌদ্ধধর্ম্ম গড়িয়া উঠিবার সময় জৈনধর্ম্মের আকার কিরূপ ছিল, এবং গত আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া তাহা কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

জৈনধর্ম্ম তখন অতীব রক্ষণশীল। ইহাতে পরিবর্ত্তনের লক্ষণ অতি অল্প, সুতরাং বিদেশীয় জাতি অথবা নূতন জাতি ইহাতে অতি অল্পই আশ্রয় পাইয়া থাকে। তথাপি জৈনধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী। কেবল রক্ষণ-শীলতার জন্য ভারতবর্ষের ধর্ম্মের সংগ্রামে জৈনধর্ম্ম আড়াই হাজার বৎসর রক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। এই আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে পার্শী, গ্রীক্ বা যবন, শক, কুশান, হূণ, গুর্জ্জর, রাজপুত, আরব, তাজিক প্রভৃতি শত শত বিদেশীয় জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া এদেশে বসতি করিয়াছে, আপনাদের পুরাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু অথবা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং ভারতবর্ষের লোক হইয়া গিয়াছে। আজ তাহাদের মধ্যে খুঁজিয়া আদিম ভারতবাসী আর্য্য অথবা অনার্য্য স্থির করা বড়ই কঠিন। কিন্তু এ বিষয়ে স্থির মীমাংসা ক্রমশঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসের পক্ষে আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে। দুই-একজন পণ্ডিত ক্রমশঃ বুঝিতেছেন যে, ভারতবর্ষে যত ধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করিয়াছে, জৈনধর্ম্ম তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন না হইলেও ভারতের একটি অতি প্রাচীন ধর্ম্ম। আমাদের বৈদিক আর্য্যধর্ম্ম ইহার তুলনায় বয়সে অতি শিশু, ধর্ম্মভাবে অতি নবীন এবং বৈদিক ধর্ম্মের দর্শন নাই বলিলেই চলে। শঙ্কর প্রভৃতি আর্য্য-দর্শনবাদীরা জৈন দর্শনবাদীদের তুলনায় নবীন।

যীশুখৃষ্ট জন্মিবার প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে জৈনধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জৈন দার্শনিকেরা তখনই বুঝিয়াছিলেন যে, কোনও দুই জন মানুষই জগতে সমান হইয়া জন্মে নাই, মানসিক শক্তির বৈষম্যে মানুষ মানুষকে জয় করে এবং মানসিক শক্তির বৈষম্যেই মানুষ দেবত্বের অধিকারী হয়। বিবেক-শক্তির অতি-বৃদ্ধিলাভেই মানুষে মানুষে প্রভেদ জন্মায়। জৈনধর্ম্মের মূল গুরু চব্বিশ জন, তাঁহারা সকলেই মানুষ এবং কেহই ব্রাহ্মণ-বংশজাত নহেন। বেদকর্ত্তা ব্রাহ্মণ যে বংশজাত গুরুপদ এতদিন ভারতবর্ষে দাবী করিয়া আসিয়াছেন এইরূপে জৈনগুরুগণ সর্ব্বপ্রথমে তাহার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। দেববংশজাত উপাস্য দেবতা সৃষ্টির বিরুদ্ধে জৈনগুরুরাই প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী জৈনধর্ম্মে গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, যক্ষ, কিন্নর, রাক্ষস প্রভৃতি অর্দ্ধদেব ও কিম্পুরুষ জাতীয় সত্ত্বগণ প্রভূত পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু জৈনগণের প্রধান উপাস্য দেবতা মানুষ। চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর,

তাঁহারা মানুষ—ক্ষত্রিয়-বংশজাত, চিন্তাশক্তি বা তপস্যার বলে অপরিসীম মানসিক শক্তিধারী অথবা মহাপুরুষ। সুতরাং জৈনধর্ম্ম ভারতীয় ধর্ম্মসমূহের মধ্যে একমাত্র

আর্য্যপট্ট

মানবিক ধর্ম্ম (অবশ্য প্রথম প্রথম গৌতম বুদ্ধের সরল বৌদ্ধধর্ম্মও এই রকম সরল মানবিক ধর্ম্ম ছিল)।

জৈনধর্ম্ম গত আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে অনেক ক্ষতি সহ্য করিয়াছে। জৈনদের মধ্যে বিবাদে জৈন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচুর নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বিবাদ বাধিয়া অনেক ধর্ম্মমত পতিত শাখা হইয়া লোকের স্মৃতিপথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, অনেক শাখার লোক ভ্রান্তমত গ্রহণ করিয়া নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ত্তমানে জৈনধর্ম্মের তিনটি প্রধান বিভাগ—"শ্বেতাম্বর" "দিগম্বর" ও "তেরপন্থী"—ছাড়া ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও অনেক শাখার লক্ষণ এখনও ভারতের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ জৈনধর্ম্মের শাখা, তাহাদের দেবার্চ্চনা-পদ্ধতি, দেবপ্রতিমালক্ষণ ও দর্শনের মূলকথা হইতে ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্মমত কিঞ্চিৎ পরিমাণে বোধিগম্য হইতে পারে।

'দিগম্বর' ও 'শ্বেতাম্বর' ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মশাস্ত্র বহুবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং বহুবার পুনর্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং জৈনধর্ম্ম আদিমকালে কি ছিল, তাহা বুঝিবার উপায় ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। এখন হইতে ২২০০—২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে আদিম জৈনেরা কি পূজা করিতেন এবং কি ভাবে পূজা করিতেন তাহাই বিবেচনা করা উচিত। খৃষ্টের জন্মের দুই-তিনশত বৎসর পূর্ব্বে উত্তর-ভারতের জৈনেরা মূর্ত্তিপূজা করিতেন এবং মথুরা, কৌশাম্বী প্রভৃতি প্রাচীন নগরে এই জাতীয় প্রাচীন জৈনমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখনকার জৈনমূর্ত্তিতে যে-সমস্ত লক্ষণ থাকে প্রাচীন কালের জৈনমূর্ত্তিতে সেগুলি সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান যুগের জৈনমূর্ত্তিতে বৃক্ষ, শাসনদেবী, যক্ষ, লাঞ্ছন ইত্যাদি যে-সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের জৈন-মূর্ত্তিতে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অতি প্রাচীন কালের জৈনমূর্ত্তি একখানি পাথরের পট্ট, ইহার উপরে কতগুলি চিহ্ন আঁকা থাকে। এলাহাবাদের বাহাদুরগঞ্জের স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক ডাক্তার বামনদাস বসু মহাশয়ের সংগ্রহশালায় অনেক ভারতীয় পুরাকীর্ত্তি রক্ষিত আছে, তাহার মধ্যে একখানি অতি প্রাচীন পট্ট প্রাচীন কৌশাম্বী

শিবঘোষক পত্নী কর্ত্তৃক স্থাপিত আর্য্যপট্ট

হইতে আনীত হইয়াছিল। ষোলবৎসর পূর্ব্বে এই প্রাচীন জৈন পট্টটি দেখিতে পাইয়া আমি ইহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহার একপার্শ্বে লিখিত আছে—

নট ফগুযশের পত্নী শিবযশা কর্ত্তৃক স্থাপিত আর্য্যপট্ট

(১) সিদ্ধম রাজ্ঞো শিবমিত্রস্য সংবছরে ১০,২০০০০০০০০০০০০০ থ মাহকিয়...

(২) থবিরস বলদাসস নিবর্তন শ...শিবনন্দিস অন্তেবাসিস...

(৩) শিবপালিতান আয়পটো থাপয়তি অরহত পূজায়ে।

"সিদ্ধ, রাজা শিবমিত্রের রাজ্যের দ্বাদশ সংবৎসর, স্থবির বলদাসের অনুরোধে...শিবনন্দীর শিষ্যা...শিবপালিতের...এই আর্য্য অরহৎদিগের পূজার নিমিত্তে প্রতিস্থাপিত হইল।"

প্রাচীন মথুরা নগরের বাহিরে এই একটিমাত্র আর্য্যপট্ট বা আর্য্যাগ্রপট্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজা শিবমিত্র কে ছিলেন তাহা জানিতে পারা যায় না, তবে মথুরায় খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ একশত বা দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এরকম অনেকগুলি আর্য্যপট্ট বা আর্য্যাগ্রপট্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহা গত পঞ্চাশ বছর ধরিয়া মথুরার নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মথুরা ও লক্ষ্ণৌয়ের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

এই পট্টগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এখন হইতে আড়াই হাজার বা দুই হাজার দুইশত বৎসর পূর্ব্বে জৈনদের উপাসনার দ্রব্য অথবা মূর্ত্তি বেশ অনেক দিন ধরিয়া রীতি অনুসারে গড়িয়া উঠিয়াছিল। পট্টগুলির উপরে শিলালেখে 'আয়পট' অথবা 'আয়াগপট' লিখিত থাকে, সুতরাং ইহাই প্রাচীনকালের জৈনদের উপাস্য দেবতার নাম। এই আর্য্যপট্ট বা আর্য্যাগ্রপট্টগুলি একেবারে নূতন জৈনমূর্ত্তি নহে; বর্ত্তমান কালের জৈনমূর্ত্তি বা অন্য উপাস্য দ্রব্যের সহিত ইহার অনেক মিল দেখিতে পাওয়া যায়। পট্টগুলি বড় লম্বা ও চওড়া পাথরের পট্ট, অধিকাংশ পট্টের উপরে অনেকগুলি চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এই সমস্ত চিহ্ন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মে প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালে মঙ্গল-চিহ্ন বলিয়া পূজিত হইত। অনেক আর্য্যপট্টের উপরে চারিটি মৎস্যপুচ্ছ অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়, ঠিক পট্টটির

মধ্যে যেখানে চারিটি মৎস্যপুচ্ছ যুক্ত হইয়াছে, সেইখানে একটি চক্র দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন আর্য্যপট্টে এই চক্রটির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন অথবা মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। মেজর বামনদাস বসু মহাশয় কৌশাম্বী হইতে যে আর্য্যপট্টটি এলাহাবাদে আনিয়াছেন তাহার মধ্যস্থলের চক্রে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম আছে। মথুরায় যতগুলি 'আয়াগপট' পাওয়া গিয়াছে, তাহার অনেকগুলির মধ্যস্থলের চক্রে ভিন্ন ভিন্ন তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি আছে, দুই-একটিতে একটি রথচক্র অথবা অন্য দুই-

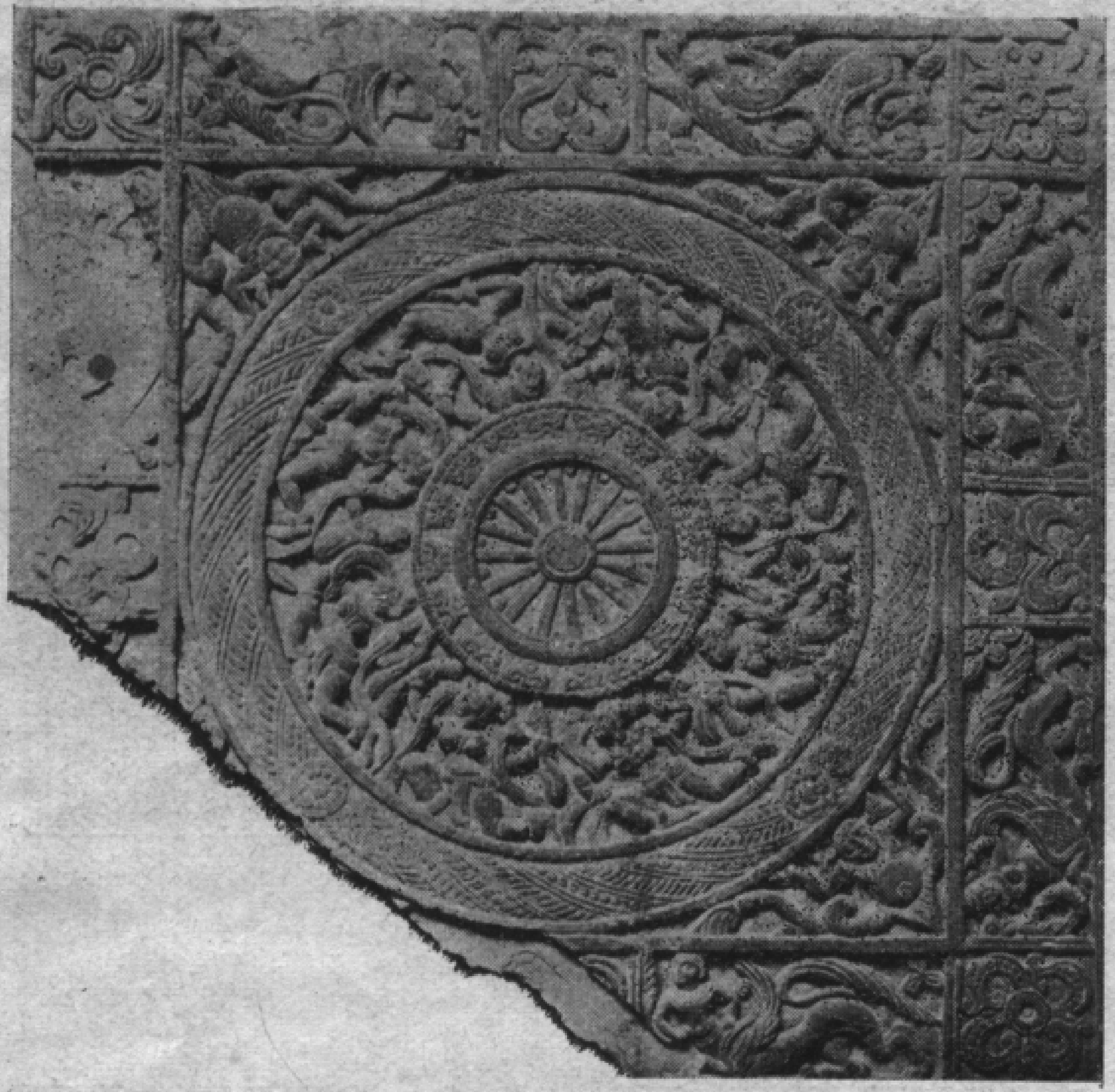

আর্য্যপট্ট—মথুরাবাসীদের দ্বারা উৎসর্গীকৃত

একটি চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায়। পট্টের মধ্যস্থলের এই চক্রের মধ্যে তীর্থঙ্কর বা জীনমূর্ত্তি অথবা চিহ্ন ব্যতীত আর্য্যপট্টের আরও অনেকগুলি মঙ্গলচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় যেমন, মৎস্যযুগল, মঙ্গলঘট, পদ্ম, শঙ্খ, রথচক্র, ইত্যাদি। এই সমস্ত চিহ্নাদি বর্ত্তমান সময়ের চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের 'লাঞ্ছন'। জৈনেরা পূজার সময়ে কুঙ্কুম-রঞ্জিত তণ্ডুল (জাফরাণের রং করা চাউল) পাত্রে লইয়া তাহাতে এই সমস্ত চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া থাকেন।

আর্য্যপট্ট বা আর্য্যাগ্রপট্টগুলি যে-সমস্ত স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলি ভারতবর্ষ বা আর্য্যাবর্ত্তের অতি প্রাচীন কেন্দ্র এবং আবিষ্কৃত শিলালেখ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খৃষ্টের জন্মের সমকাল পর্য্যন্ত জৈনদের প্রধান তীর্থ ও কেন্দ্র ছিল। ভাগলপুর বা চম্পা, পারাপুরী বা অপাপপুরী, সমেতশিখর বা পার্শ্বনাথ পর্ব্বত, প্রাচীন রাজগৃহ বা গিরিব্রজ অতি প্রাচীন জৈনতীর্থ, কিন্তু মধ্যদেশ বা যুক্তপ্রদেশের শৌরসেন রাজধানী মথুরা, প্রাচীন বৎসদেশের রাজধানী কৌশাম্বী বা কোসাম, প্রাচীন পঞ্চালের পুরাতন রাজধানী অহিচ্ছত্র বা বারেলীর নিকট রামনগর আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাসে সুবিখ্যাত। উপস্থিত এই তিনটি স্থানে আবিষ্কৃত জৈন পুরাকীর্ত্তি হইতে প্রাচীন জৈনধর্ম্মের অবস্থা আলোচনা করিব।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন মথুরায় প্রথম খনন আরম্ভ হইয়াছিল। এই বৎসরে অনেকগুলি প্রাচীন জৈন শিলালেখ মথুরার কঙ্কালীটিলা নামক স্থানে প্রাচীন জৈন ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আর্য্যপট্ট সংখ্যায় অতি অল্প। খনন কিছুদিন চলিবার পর কঙ্কালীটিলার নিম্নের স্তরে আর্য্যপট্ট আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হইল। মথুরার সর্ব্বপুরাতন আর্য্যপট্টটি আকারে বৃহৎ ও খণ্ডিত, ইহার শিলালেখও অসম্পূর্ণ। ইহাতে লিখিত আছে –

নমো অরহতো বধমানস্ত গোতিপুত্রস পোঠয় শককাল বালস কোশিকিয়ে শিমিত্রায়ে আয়াগপটো পতি (ঠাবিত)

—অর্হত বর্দ্ধমানকে নমস্কার। গৌপ্তীপুত্র…প্রোষ্ঠয় ও শকদিগের কালব্যাল (স্বরূপ)…শিমিত্রা…কর্ত্তৃক আর্য্যাগ্রপট্ট প্রতিষ্ঠাপিত।

এই সঙ্গে আরও দুই-একটি খণ্ডিত আর্য্যপট্ট আবিষ্কৃত হইয়াছিল ; তাহার মধ্যে একটি বারণগণের আর্য্যহাট্টিয় কুলের বজ্রনাগরিক শাখার এবং আর্য্যশ্রীক সম্ভোগের কোনও জৈনগুরুর আদেশে প্রদত্ত একটি আর্য্যপট্ট। তৃতীয় আর্য্যপট্টটি রসনন্দীর পুত্র নন্দীঘোষ নামক ত্রৈবর্ণিক কর্ত্তৃক প্রদত্ত। (১)

মথুরার খননকার্য্য চলিতে লাগিল। পরবর্ত্তী দুই বৎসরে আরও অনেক প্রাচীন জৈনমূর্ত্তি ও শিলালেখ আবিষ্কৃত হইল। এতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে বৌদ্ধধর্ম্মই পুরাতন বলিয়া আদরের বস্তু ছিল, কিন্তু জর্জ বিউলর, প্রমুখ জর্ম্মন পণ্ডিতেরা জৈনধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা অতি পুরাতন বলিয়া আসিতেছিলেন। এতদিনে

১ Epigraphia Indica, Vol. I. pp 396 -7

তাহার সমসাময়িক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইল। এতদিন কেবল জৈনদের কাছেই জৈনধর্ম্ম প্রাচীন ছিল, এইবার তাহা জগতের একটি অতি পূজ্য এবং অতি পুরাতন ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইল। আরও দেখিতে পাওয়া গেল যে, উপাস্য উপাসনা সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্ম যে-সমস্ত দেবার্চ্চনা-বিধি বা দেবতা এতদিন নিজস্ব বলিয়া দখল করিয়া আসিতেছিল, তাহা প্রাচীনকালে জৈনদেরও ছিল। যথা, "স্তূপ," 'সাধুদের ভস্মরক্ষা' ইত্যাদি। পরবর্ত্তী যুগে জৈনধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়া জৈনদের মধ্যে স্তূপ পূজা, সাধুদের ভস্ম পূজা উঠিয়া গিয়া কেবল বৌদ্ধদের মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে। জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি নূতন রীতি অনুসারে গঠিত হওয়ার ফলে একটা স্বতন্ত্র ধারা গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপে বর্ত্তমান জৈনধর্ম্মের ও উপাসনা-পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু আধুনিক জৈনরা তাহার আদিম পরিকল্পনা ও উৎপত্তির কারণের বিবরণ একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। পুরাতন জৈনস্তূপ বা আর্য্যপট্ট যখন গত শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন কোনও জৈন-মুনি স্বর্গগত ডক্টর জর্জ্জ বিউলর বা পীটকে আর্য্যপট্ট জিনিষটি বুঝাইয়া দিতে পারেন নাই। দুই তিন বৎসর ধরিয়া কিছু পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়া ভারতবর্ষে আর্য্যপট্ট বা আর্য্যাগ্রপট্ট আবিষ্কার হওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, আর্য্যপট্টগুলি একটি বিশেষ যুগের জিনিষ, সেই যুগের পূর্ব্বে ও পরে আর্য্যপট্ট-পূজার প্রচলন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। যুগটা মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরে এবং কুশান অর্থাৎ শক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে আসিয়াছিল। যে দুই-চারিজন রাজার নাম এই সময়ের আর্য্যপট্টে পাওয়া গিয়াছে, তাঁহারা প্রায় অজ্ঞাত। মথুরার রঞ্জুবুলো ও তাঁহার পুত্র শোভাস এবং কৌশাম্বীর শিবমিত্র এই সময়ের রাজা। শিলালেখ ও প্রাচীন মুদ্রা ব্যতীত এই সমস্ত রাজার নাম আর কোথাও পাওয়া যায় না। রঞ্জুবুলো এবং শোভাস শক-জাতীয় রাজা; তাঁহারা

আর্য্যপট্টের ভগ্ন অংশ গোতিপুত্রের পত্নী শিবমিত্রা কর্ত্তৃক স্থাপিত

প্রথমে শকরাজাদের কর্ম্মচারী ছিলেন, পরে স্বাধীন হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াও রাজ-কর্ম্মসূচক 'মহাক্ষত্রক' উপাধি মহারাজ উপাধির সঙ্গে ব্যবহার করিতেন। পুরাণে বা অন্য কোনও ইতিহাসে রঞ্জুবুলো অথবা তাঁহার পুত্র শোভাসের নাম পাওয়া যায় না। মথুরায় আবিষ্কৃত অনেক শিলালেখে শিবমিত্র নামক একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। মথুরার শিবমিত্র ও কৌশাম্বীর শিবমিত্র দুইজনকেই একই যুগের লোক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাঁহারা একব্যক্তি কিনা বলা যায় না। জৈন-ধর্ম্মের প্রাচীনতম মূর্ত্তির যুগ সম্ভবতঃ মৌর্য্য সাম্রাজ্যের লোপের যুগে আরব্ধ হইয়াছিল এবং মৌর্য্য সাম্রাজ্যের লোপের অব্যবহিত পরে দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইল। ইহা কুশান সম্রাটদের আমলের জৈনমূর্ত্তির যুগ। কুশান সম্রাটদের আমলে চব্বিশজন জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি একটা বাঁধাবাঁধি রীতি অনুসারে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু ঠিক ইহার পূর্ব্বের যুগে এতটা বাঁধা-বাঁধি ছিল না।

জৈনধর্ম্মের প্রাচীনতম যুগে জৈনদিগের উপাস্য দেবতা কি ছিল, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। অদ্যাবধি আবিষ্কৃত আয়পট বা আয়াগপট-গুলি লক্ষ্য করিয়া দেখা উচিত। মথুরায়,কৌশাম্বীতে অথবা অহিচ্ছত্রে কোনও জৈন স্ত্রী বা পুরুষ একটি 'আয়পট' প্রতিষ্ঠা করিলেন। 'আয়পট'টি একখানি বড় শিলাপট্ট, তাহার উপরে অনেক নক্সা আছে, প্রথমে একটি চারিকোণ নক্সা, এই নক্সার দুইদিকের অথবা চারিদিকের পাড়ে আট, বার, বা ষোলটি মঙ্গলচিহ্ন আছে। পট্টের মধ্যস্থলে এক বা ততোধিক বৃত্ত, তাহার ভিতরে চারিটি অথবা চারিজোড়া মৎস্যপুচ্ছ চারিদিকে সাজানো। এই মৎস্যপুচ্ছ একটি মঙ্গলচিহ্ন। সাধারণতঃ এই চারিটি মৎস্যপুচ্ছের কেন্দ্রস্থলে একটি গোলাকার স্থানের মধ্যে একটি উপবিষ্ট জিনমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যীশুখৃষ্টের জন্মের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে সিংহক বণিকের পুত্র এবং কৌশিকীগোত্রীয়া মাতার সন্তান সিংহনাদিক মথুরায় যে আয়াগপট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাতে এই রকম বহ্যবস্থা দেখা যায়। এ পট্টটির উপরে চারিপাশে চারিটি চারি-কোণা সরু পাড় আছে। উপরের দুইটিতে চারিটি করিয়া মঙ্গলচিহ্ন ও পাশের দুইটিতে কেবল দুইটি স্তম্ভ অঙ্কিত হইয়াছিল। পট্টের উপরে যে চারিকোণ জায়গাটুকু রহিল তাহার নীচের দিকে একটু পাড় কাটিয়া লইয়া দাতার পরিচয় লিখিবার জায়গা করা হইল এবং অবশিষ্ট চতুষ্কোণটুকুর মধ্যস্থলে একটি বৃত্ত ও তাহার চারিপার্শ্বে চারিটি যুগ্ম মৎস্যপুচ্ছ অঙ্কিত হইল। মধ্যস্থলের বৃত্তের মধ্যে পদ্মাসনের উপরে ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট ছত্রনিম্নে একটি নগ্ন জিন বা তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি।*

আর্য্যপট্ট—অর্হৎদিগের পূজার জন্য স্থাপিত

বিশেষ বিশেষ নমুনায় নক্সা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় আর্য্যপট্টের পাড়ে অর্দ্ধ-অশ্বীকিন্নরী, ভিতরের চারিকোণের প্রতিকোণে অর্দ্ধ-মৎস্যকিন্নর, বৃত্তের গোলে একশ্রেণী যুবতী ও কেন্দ্রে জিন অথবা তীর্থঙ্করের পরিবর্ত্তে অর্হত নেমিনাথের লাঞ্ছন একটি রথচক্র অঙ্কিত আছে। এই আর্য্যপট্টের উপরে শিলালেখ সম্পূর্ণরূপে পড়িতে পারা যায় না।† মথুরায় আবিষ্কৃত তৃতীয় আর্য্যপট্টটি অন্য রকমের। ইহার মধ্যস্থলে একটি বৃহত্তর বৃত্তের মধ্যে একটি ছোট কেন্দ্র বা বৃত্ত আছে এবং এই ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে

* V. A. Smith—*The Jaina Stupa and other Antiquities of Mathura*, page 15, pl. VII.

† *Ibid.* pl VIII.

পদ্মাসনের উপরে একটি জিনমূর্ত্তি ও বাহিরে চারি জোড়া মৎস্যপুচ্ছ অঙ্কিত। এই চারি জোড়া মৎস্য-পুচ্ছের বাহিরে প্রথমে বৃত্ত এবং তাহার বাহিরে চারিদিকে চারিটি লম্বা মৎস্যপুচ্ছ। চিংড়িমাছের লেজের মত এই চারিটি লম্বা মৎস্যপুচ্ছ বাঁকিয়া আছে এবং এই চারিটির গর্ভে চারিটি মঙ্গলচিহ্ন অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়—(১) স্বস্তিক, (২) মৎস্যযুগ্ম, (৩) ঘটিকা, (৪) ভদ্রাসন। এই চারিটি মৎস্যপুচ্ছের বাহিরে অপ্সরাদিগের স্কন্ধে বাহিত একটি মালা; কিন্তু এই মালার সমান্তরালে (১) জিনমূর্ত্তি, (২) আর্য্যবৃক্ষ, (৩) স্তূপ, (৪) মন্দির। এই মালার বৃত্তের বাহিরে চারিকোণে চারিটি নাগিনী এবং তাহাদের নীচে একটি লম্বা পাড়ের উপরে আটটি মঙ্গলচিহ্ন।* মোটের উপরে দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশ আর্য্যপট্ট বা আর্য্যাগ্রপট্টের কেন্দ্রস্থলে একটি বৃত্তের মধ্যে জিনের মূর্ত্তি; দুই একটি আর্য্যপট্টের উপরে এই বৃত্তের মধ্যে জিনমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে জিনের লাঞ্ছন বা চিহ্ন, যেমন—মথুরার আর্য্যপট্টের উপরে অর্হত নেমিনাথের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে তাহার চিহ্ন বা লাঞ্ছন—রথচক্র, কৌশাম্বীর আর্য্যপট্টের উপরে কৌশাম্বীতে জাত ষষ্ঠ তীর্থঙ্কর পদ্ম- প্রভের লাঞ্ছন - একটি ফুল্লাব্জ।

মথুরার নানাস্থানে আবিষ্কৃত আরও কতকগুলি আর্য্যপট্ট অন্য প্রকারের কোনটিতে জৈনমন্দির অথবা জৈনস্তূপ অঙ্কিত আছে। এই জাতীয় নিদর্শন হইতে সর্ব্বপ্রথম প্রমাণ হইয়াছিল যে, প্রাচীন জৈনধর্ম্মের আদিম অবস্থাতে বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় স্তূপের উপাসনাও বিশেষ-ভাবে প্রচলিত ছিল। পরে ১৮৯৮ সালের খননকালে মথুরাতে একটি জৈনস্তূপ আবিষ্কৃত হইলে প্রমাণ হইয়াছিল যে স্তূপ বা চৈত্য হিন্দু বৌদ্ধ অথবা জৈন, ভারতীয় কোনও সম্প্রদায়বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। পুরাতন স্তূপগুলি পুরাতন জিনমূর্ত্তির মত আর্য্যপট্টের উপরে অঙ্কিত হইয়া মন্দিরে অথবা বৃক্ষতলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিত। জিনমূর্ত্তিযুক্ত, জিনের লাঞ্ছনযুক্ত, অথবা স্তূপযুক্ত কোন আর্য্যপট্টেই কোনরূপ প্রভেদ লক্ষ্য করিবার উপায় নাই, সকলেরই শিলালেখে এক কথায় দেখিতে পাওয়া যায়, "নমো অরহতো নম ফগুয়শস নতকস ভয়ায়ে শিবযশায়ে আয়াগপটো কারিতো অরহত পূজায়ে।" ইহাতে জিনের মূর্ত্তি, জিনের চিহ্ন ইত্যাদি কিছুই নাই। রেলিং-এ বেষ্টিত একটি স্তূপ, তাহার সম্মুখে তোরণ এবং তোরণের সম্মুখে সিঁড়ি, তোরণের দুই পার্শ্বে দুইটি অর্দ্ধ-বিবস্ত্রা নারী, ইহাই অর্দ্ধভগ্ন আর্য্যপট্টের বিবরণ।

বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস হইতে ভারতীয় জৈনধর্ম্মের আদিম যুগ সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায় তাহা আর্য্যপট্ট বা আর্য্যাগ্রপট্ট লইয়াই আরব্ধ। বর্ত্তমান জৈনেরা স্তূপের উপাসনা বড় করেন না, করিলেও প্রচ্ছন্নভাবে করিয়া থাকেন। সুতরাং জৈনস্তূপের আলোচনা বাদ দিয়া মধ্যযুগের জৈনধর্ম্মের আলোচনা করিতে যাওয়া অসম্ভব।

* *Ibid.*, p. 16, pl ix; *Epigraphia Indica*, Vol. II, pp. 311-13.

রূপের ফাঁদ

শ্রীসীতা দেবী

রেঙ্গুনের—নং গলিতে হঠাৎ ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়িয়া গেল। ভূতুড়ে বাড়ী বলিয়া মাড়োয়ারী লছমন দাসের বাড়ীটা এতদিন খালিই পড়িয়াছিল। আজ দেখা গেল তাহার তিনতলাটার সব দরজা জানালা খোলা, একজন মান্দ্রাজী চাকর এবং একটি ব্রহ্মদেশীয়া ঝি মহা উৎসাহে ঝাড়পোঁছ করিতেছে। আস্‌বাব অনেকগুলাই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং তখনও আসিতেছে। যেগুলি তখনও উপরে উঠাইয়া ফেলা হয় নাই, নীচে ফুটপাথে জমা করা রহিয়াছে, সেইগুলি দেখিয়াই সকলের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, যাহারাই আসিয়া থাকুক, নিতান্ত গরীব নয়, বেশ উত্তম রকম দু'পয়সা তাহাদের আছে।

বাড়ীর আসল অধিবাসীদের দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিবার আশায় অনেকেই অনেকক্ষণ দরজা বা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঝি চাকর ভিন্ন আর কাহারও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। অবশেষে যখন হতাশ হইয়া যে যাহার কাজে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছে, তখন মস্ত বড় একটা মোটরকার আসিয়া বাড়ীটার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া গেল। দিব্য নূতন ঝক্‌ঝকে গাড়ী। দামী, কি খেলো, তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান গলির অধিবাসীদের মধ্যে বেশী লোকের ছিল না বটে, তবু চালকের ফিটফাট পোষাক, গাড়ীর ভিতরে নীল সাটিনের ঝালর এবং গদি ইত্যাদি দেখিয়া সকলেরই মনে একটা সম্ভ্রমের ভাব আসিয়া পড়িল। ছোট ছেলেমেয়ের দল আবার নূতন উৎসাহে ফুটপাথে ঘুরিতে আরম্ভ করিল এবং বড়র দল দরজা জানালার ধারে আসিয়া জুটিল।

এতক্ষণ পরে তাহাদের ধৈর্য্যের পুরস্কার মিলিল। দুটি মহিলা অতি যত্নে সাজসজ্জা করিয়া নামিয়া উঠিয়া বসিলেন। ব্রহ্মদেশীয় রূপের আদর্শে দুইজনেই সুন্দরী। গায়ের রং উজ্জ্বল, বিপুল কবরীর ভারে মাথা যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। বহুমূল্য রেশমের লুঙ্গি এবং হীরা ও চুণীর অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে তাঁহাদের স্বাভাবিক শ্রী আরো যেন দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। একজন তরুণী, আর একজনের যৌবনে ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ঝরিবার মুখে পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্পের যে শোভা, তাহা তখনও তাঁহার দেহে বিরাজ করিতেছে। দুজনেরই চালচলন আভিজাত্যব্যঞ্জক।

তাঁহারা গাড়ীতে উঠিয়া বসিবামাত্র গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মান্দ্রাজী ভৃত্যটি তাঁহাদের সঙ্গে ছোট একটি হাত-ব্যাগ বহন করিয়া নামিয়া আসিয়াছিল, গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া সে উপরে উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই, গলির প্রায় সব ক'জন অধিবাসী একজোটে তাহাকে গিয়া আক্রমণ করিল। মিনিট কয়েক সেখানে মিশ্রিত হিন্দী, বর্ম্মা এবং তামিল ভাষায় এমন একটা প্রশ্নের ঝড় উঠিল যে, বেচারা প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সকলেই জানিতে চায়, তাহার স্বামিনীদ্বয় কোথা হইতে আসিলেন, তাঁহারা কে, কতদিন এখানে থাকিবেন, এবং এত স্থান থাকিতে, এই ভূতুড়ে বাড়ীটাই তাঁহাদের পছন্দ হইল কেন? বাড়ীতে খালি এই দুটি স্ত্রীলোক, না পুরুষও কেহ আছেন, এ প্রশ্নও কেহ কেহ করিতে ত্রুটি করিল না।

মান্দ্রাজীটি খানিক পরে সামলাইয়া উঠিয়া প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার কথায় বোঝা গেল যে, ইঁহারা এক ধনী ব্রহ্মদেশীয় জমিদারের বিধবা পত্নী এবং কন্যা। বাড়ীতে পুরুষ কেহই নাই। মহিলাদ্বয় পল্লীগ্রামে বাস করিয়া করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাই বৎসরখানিক সহরে কাটাইয়া যাইবার

বিশেষ করিয়া তাঁহারা কেন আসিয়া জুটিলেন, তাহার কোনো কারণ ভৃত্যটি বলিতে পারিল না। দুই একটি যুবক জিজ্ঞাসা করিল, জমিদার-কন্যাটির বিবাহ হইয়াছে কি না। ভৃত্য বলিল, এখনও হয় নাই, সৎপাত্র দেখিয়া কন্যার বিবাহ দেওয়াও জমিদার-গৃহিণীর সহরে আগমনের একটা কারণ।

অতঃপর যে যাহার কাজে চলিয়া গেল। প্রতিবেশিনীর হাঁড়ির খবর জানিতে যতই সকলের ঔৎসুক্য থাক্, তাহার জন্য কাজ কামাই করা ত আর চলে না? অগত্যা স্নানাহারের জন্য পুরুষগুলি ঘরে ঢুকিল, এবং তাহাদের খাওয়া দাওয়ার জোগাড় করিতে মেয়েরাও যাইতে বাধ্য হইল। তিনতলার অধিবাসিনীরা কখন যে ঘরে ফিরিলেন তাহা দুই চারিজন বালকবালিকা ভিন্ন বড় কাহারও চোখে পড়িল না।

বিকালবেলা কাজকর্ম্ম বড় কাহারো থাকে না, তখন গলির মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। মহিলারা সকলেই চুল ফিট্‌ ফাট্‌ করিয়া বাঁধিয়াছেন, তরুণীর দল পুষ্পগুচ্ছে কবরীর শোভা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। যাহার বাক্সে যত উজ্জ্বল রংএর রেশমের লুঙ্গি ছিল সব বাহির হইয়াছে, সোনার চেন, চুণীর বোতাম; কানের ফুল, হাতের চুড়ি, যাহার যা ছিল, সবই গায়ে উঠিয়াছে। না হয়, তিনতলার নবাগতা অধিবাসিনীদের মত টাকা তাহাদের নাই, তাই বলিয়া কি দুইটা ভাল জিনিষ তাহারা পরিতে পারে না? না, পরিলেই লোকে তাহাদের দিকে ফিরিয়া চায় না?

মেয়েরাই যে শুধু যথাসাধ্য সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইল তাহা নয়, যুবকবৃন্দের উৎসাহও কিছু কম দেখা গেল না। সকলেই প্রায় কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্নান করিল, ভাল পোষাক পরিল, মাথায় রঙীন রেশমের রুমাল বাঁধিয়া বর্ম্মা চুরুট ধরাইয়া গলির ভিতর সান্ধ্য ভ্রমণ করিতে সুরু করিল। গৃহস্বামিনীর কন্যা বারান্দায় বাহির হন কিনা, কিম্বা জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়ান কি না, সেই দিকেই ছিল প্রায় সকলের লক্ষ্য। মহিলাদ্বয়ের সহরে আসার একটা উদ্দেশ্য অন্ততঃ ইচ্ছা ছিল। বিবাহ পর্য্যন্ত নাই গড়াক, একটু আলাপ সালাপ করিতে পাইলেই অনেকেই পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিত।

বিকালে আবার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। খানিক পরে আবার নূতন সাজে মা ও মেয়ে নামিয়া আসিলেন। এবার আর সকালের মত অবজ্ঞাপূর্ণ ভাব নয়। দুই জনেই চারি দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, তরুণীটির মুখে একটু যেন হাসির চিহ্নও দেখা গেল। তাঁহার জননী দু'একটি ছোট ছেলের পিঠ চাপড়াইয়া, তাহাদের মাতাদের আনন্দের সাগরে নিমজ্জিত করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

একজন প্রতিবেশিনী আর একজনকে ডাকিয়া বলিল, "যতটা নাকটান ভেবেছিলাম, ঠিক ততটা নয়।"

অন্য জন উত্তর করিল, "তাই ত দেখছি। ছেলেপিলে খুব ভালবাসে বোধ হয়। হাজার হোক্ মেয়েমানুষ ত! বড়মানুষ হলেই বা!"

সকলেরই মনে ধারণা হইয়া গেল, মানুষগুলি ভালই। ছেলেপিলের মায়েরা গৃহিণীটির সঙ্গে ভাব করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। যুবকরা ভাবিল কোনো গতিকে একটা কথা বলিবার সুযোগও যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে বাকি পথ তাহারা নিজের জোরেই করিয়া লইবে। বায়োস্কোপের বহুল প্রচারের ফলে এই সকল বিষয়ে অন্ততঃ তাহাদের বুদ্ধি খুব খুলিয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার পর, গিটার বাজাইয়া গান গাহিবার শব্দে গলিটা মুখর হইয়া উঠিল।

যাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য এত আয়োজন, তাঁহাদের কিন্তু কিছুমাত্রও বিচলিত হইতে দেখা গেল না। সন্ধ্যার পর তাঁহারা বেড়াইয়া ফিরিলেন। মা নিজের শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন, সঙ্গে গেল তাঁহার ঝি। মেয়েও নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। কাপড় চোপড় বদ্‌লাইয়া, হাত মুখ ধুইয়া দুজনে খাবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

মা মেয়েকে দেখিয়া বলিলেন, "কাল তুই একলাই যাস, কেমন?"

চিনে নিই, তারপর ত একলা যাব! এখন কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে উঠব তার ঠিকানা নেই। আরো দুচার জায়গায় ঘুরে ফিরে দেখ্‌তে হবে, দুচার দিন! তাড়াতাড়ি করে লাভ কি?"

মা ডুরিয়ান ফলের একটা কোয়া মুখে তুলিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "তা অবিশ্যি। তাড়াতাড়ি করতে আমিও তোকে বল্‌ছি না। তবে দুজনে একসঙ্গে ঘুরে বিশেষ কোনো লাভ নেই, সেই কথাই বল্‌ছিলাম। চেনাশোনা জায়গাগুলোয় অন্ততঃ তুই একলা যেতে ত পারিস্। না হয় ঝিটাকে নিয়ে যাস্।"

মেয়ে বলিল, "যা তোমার ঝির বুদ্ধি! ওকে নিয়ে কি পথে ঘাটে চলা যায়? কি বল্‌তে কি বলে তার ঠিক থাকে না, আমি শেষে অপ্রস্তত হয়ে মরি।"

খাওয়া দাওয়া শেষ হইল। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া মেয়ে বলিল, "পাড়ার ছেলেগুলো সুরু করেছে দেখ, ঠিক যেন সং। আমি ওদের গান বাজনা শুন্‌বার জন্যেই এখানে এসেছি আর কি! সব এই বাড়ীর নীচেই, ধর্‌না দিচ্ছে। ইচ্ছে করে, ওপর থেকে এক বাল্‌তি জল ঢেলে দিই।"

মা বলিলেন, "না, না, ওসব কর্‌তে যাস্ না। মানুষের সঙ্গে সদ্ভাব রাখ্‌তে হয়। ওরা গান করছে করুক না, তোর ত গায়ে ফোস্কা পড়ছে না? তুই নিজের কাজ কর গিয়ে। উপকার কর্‌তে না পারুক, অপকার করতে সব মানুষই পারে, যতই ছোট হোক্। সেই জন্যে শুধু শুধু কাউকে চটাতে নেই।"

মা নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন, বর্ম্মা ঝি তাঁহার হাত পা টিপিয়া দিতে লাগিল। মেয়ে ঘরে বসিয়া মাসিক পত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। সেগুলি বর্ম্মা ভাষায় প্রকাশিত, চলচ্চিত্র জগতেরই পত্রিকা। ব্রহ্মদেশে আজকাল এ সবের প্রচারও যেমন, আদরও তেমন।

—নং গলিটাতে সবই গরীব লোকের এবং মধ্যবিত্ত লোকের বাস। হঠাৎ কেহ কাহাকেও চমক্ লাগাইয়া দিতে পারে না। সুতরাং এই দুজন নবাগতাকে জগতের নিয়মে কোন বিষয়েই মানুষের উৎসাহ বেশী দিন স্থায়ী হয় না. কাজেই ইহাদের বিষয়েও সকলের ঔৎসুক্য ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। কেবল যুবক মঙ্জীর উৎসাহটা যেন বাড়িয়াই চলিল। সে একেবারেই হৃদয় হারাইয়া বসিয়াছিল। সে দরিদ্র কেরানী মাত্র, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা তাহার কিছুমাত্র কম নয়। বয়স প্রায় ত্রিশ হইতে চলিল, কিন্তু এত দিন পর্য্যন্ত বিবাহাদি কিছুই করে নাই। কাহাকেও তাহার মনেই ধরে না। সে যেমনটি চায়, তাহা এক বায়োস্কোপেই পাওয়া যায়, গৃহস্থ-ঘরে সে রকম জোটা অসম্ভব। মঙজীর মনে হইতেছিল, এতদিনে ভাগ্য বুঝি সুপ্রসন্ন হইল। তেতলার রূপসী তরুণীটি যে-কোনো বায়োস্কোপের অভিনেত্রীকে সৌন্দর্য্যে হার মানাইতে পারে। এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে-কোনো রকম রোম্যান্টিক অবস্থা কল্পনা করা যায়। টাকাকড়িও প্রচুর পরিমাণে মেয়েটির থাকা সম্ভব, জমিদারের মেয়ে যখন। কিন্তু সে সব ত গেল পরের কথা, আসল কথা যুবতীর রূপ মঙজীর হৃদয়ে এমন তুফান তুলিয়াছিল, যে, মনে মনে সে জীবন পণ করিয়া বসিয়াছিল, যেমন করিয়াই হউক্, উহাকে তাহার চাইই।

দিনের পর দিন কাটিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে ধনী গৃহিণী বা তাঁহার রূপসী কন্যার বিশেষ ভাবসাব হইল না। তাঁহারা জানালা বা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলে এপাশের ওপাশের বাড়ীর মেয়েরা মধ্যে মধ্যে সাহস করিয়া দু' একটা কথা বলিত। দু' এক কথায় উত্তর পাইত, কাজেই আলাপটা আর বেশী দূর অগ্রসর হইত না। তবে সেই দু' একটি কথার সহিত যে মিষ্টি হাসিটুকু মিশান থাকিত, সেই টুকুর খাতিরে কেহ রাগ করিতে পারিত না।

মঙজী অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনো সুবিধা করিতে পারিল না। সকাল বিকাল যুবতী যখন বেড়াইতে যায়, সে কাছাকাছি দাঁড়াইয়া থাকে, যদিই তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত হয়, যদিই তাহার সামান্য একটু কাজ করিয়া দিবার সুযোগ ঘটে। কিন্তু বিধাতা নিতান্তই

কাহাকেও রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল না, তরুণী কাদায় আছাড় খাইল না, বা গাড়ী চাপা পড়িবারও কোনো লক্ষণ দেখাইল না। মঞ্জীর দিকে মাঝে মাঝে তাকাইয়া দেখিত বটে, তবে সে দৃষ্টির ভিতর বিশেষ কোনো ভাব প্রকাশ পাইত না।

মঞ্জী কিন্তু দমিবার ছেলে নয়। তাহার মনে দৃঢ় ধারণা হইল, তরুণীর নিশ্চয়ই কোনো প্রেমাস্পদ আছে, না হইলে এই বয়সের মেয়ে দিনের পর দিন কাহারও দিকে তাকায় না, সোজা গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসে, ইহা কেমন যেন অস্বাভাবিক। নিজের কাল্পনিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। একবার খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে হয়, তাহাকে কি আর সে আস্ত রাখিবে? বর্ম্মা যুবকের পক্ষে ছোরা চালান কিছুই নূতন ব্যাপার নয়, প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাঁচিতে দেওয়াই যেন তাহাদের লজ্জার বিষয়।

তরুণীর প্রণয়ীটি যে কে, তাহা গলিতে বসিয়া বুঝিবার কোন উপায় ছিল না, কারণ বাড়ীতে কেহই আসিত না। মঞ্জী স্থির বুঝিল, তরুণী সকালে এবং বিকালে যখন মোটর চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হয়, তখনই দেখা সাক্ষাতের কাজটা সারিয়া আসে। আচ্ছা, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া এত সহজ ব্যাপার নয়, ট্যাক্সি চড়িয়া পিছন পিছন দুই দিন ঘুরিলেই সব সন্ধান জানা যাইবে। অবশ্য পয়সা খরচ হইবে, বেশ কিছু। তাহার মত দরিদ্রের পক্ষে এতখানি দেওয়া শক্ত, তবু না দিলে যখন নয়, তখন সে দিবেই। যুবতীকে পাইবার জন্য সে প্রাণও দিতে পারিত, টাকা ত তুচ্ছ জিনিষ।

মঞ্জী বিধবা মাতার সহিত দোতলা একটি ছোট ফ্ল্যাটে বাস করে। একটি মাত্র ঘর, পিছনে রান্নাঘর, স্নানের ঘর প্রভৃতি। সামনের ঘরখানি দিনের বেলা বসিবার ঘররূপে এবং রাত্রে শয়নকক্ষরূপে ব্যবহৃত হয়। মঞ্জীর মেজাজে সাহেবীআনাটা বড় বেশী, বন্ধুবান্ধব আসিয়া যে শুইবার খাট ভিন্ন আর বসিবার কোনো আসন পাইবে না, ইহা ভাবিতেই তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিত। কাজেই বৃদ্ধা মাতাকে বাধ্য হইয়া বাক্স প্যাঁটরা সব রান্নাঘরে এবং এখানে ওখানে লুকাইয়া রাখিতে হইত। আবার প্রতি রাত্রে চেয়ার টেবিল সরাইয়া, কোণে গাদা করিয়া রাখিয়া, বিছানা পাতিতে হইত।

এই বাড়ীটাতে বধূ লইয়া আসিবার কথা মনে হইলেই মঞ্জীর মন দমিয়া যাইত। এমন আবহাওয়ায় কি কখনো প্রেম স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে? তবে মনে এ সান্ত্বনাও ছিল যে, তাহার আকাঙ্ক্ষিতা বধূটিকে যদি সে ঘরে আনিতে পারে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটি ভারি রকম টাকার বস্তাও আসিয়া পড়িবে এবং তখন পছন্দমত বাড়ী জোগাড় করা কিছুমাত্র শক্ত হইবে না।

সকাল বেলা চা খাইয়া, ঘরের সামনের তিনহাত ছোট বারান্দাটিতে বসিয়া মঞ্জী নানা কথা ভাবিতেছিল। সেদিন কি একটা বর্ম্মা পর্ব্ব উপলক্ষ্যে ছুটি, আপিস যাইবার তাড়া নাই। খানিক পরে স্নানাহার করিয়া, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বাহির হইলেই চলিবে, এখন বসিয়া বসিয়া সে কল্পনাকে লাগাম ছাড়িয়া দিতেছিল।

হঠাৎ একটা ট্যাক্সি আসিয়া সামনের তেতলা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মঞ্জী চমকিত হইয়া উঠিল। আজ হঠাৎ ট্যাক্সি কেন? নিজেদের গাড়ী কি হইল? তাড়াতাড়ি চটিজোড়া পায়ে দিয়া সে রাস্তায় নামিয়া আসিল। এবাড়ীতে কে আসিল, কে কোথায় গেল, কোনো খবর সে পারতপক্ষে জানিতে ত্রুটি করিত না।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। যুবতী মা সান্ নয়নমনোহর পোষাকে রূপের দীপ্তি ছড়াইতে ছড়াইতে নামিয়া আসিয়া ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিল। গাড়ীটা ছাড়িবার জন্য ষ্টার্ট দিতেছে দেখিয়া মঞ্জীর একেবারে মাথা গরম হইয়া উঠিল। এইরূপ একাকী যাওয়া যখন হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোনো অভিসন্ধি আছে। অন্যদিন মায়ের সঙ্গে বাড়ীর গাড়ীতে যায়, আজ ট্যাক্সিতে একলা যাইবার মানে? অবশ্যই মাকে লুকাইয়া কোনো নিষিদ্ধ স্থানে যাইবার উদ্দেশ্য। মঞ্জী তৎক্ষণাৎ স্থির করিয়া ফেলিল, সে পিছু লইবে!

কপাল তাহার ভাল ছিল, গলির মোড়ে আর একটা

ট্যাক্সি দেখা দিল ; মঙজী সঙ্কেত করিয়া তাহাকে ডাকিয়া নিল এবং চালকের পাশে চড়িয়া বসিল। তাহাকে ফিশ ফিশ্ করিয়া বলিল, "সামনের ঐ গাড়ীটা যে দিকে যাবে, তুমিও সেইদিকে যাবে। দাঁড়ালে দাঁড়াবে, জোরে চললে জোরে চালাবে। দেখো, যেন কিছুতেই চোখের আড়াল না হয়।"

শিখ মোটর-ড্রাইভারের গোঁফের কোণে একটুখানি হাসির রেখা দেখা দিল। সে তৎক্ষণাৎ গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মঙ্জী তাহার পাশে বসিয়া দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া সামনের গাড়ীখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

রাস্তার পর রাস্তা পার হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু সামনের গাড়ীখানা থামিবার কোনোই লক্ষণ দেখায় না। রেঙ্গুন সহর শেষ হইয়া গাড়ী অবশেষে সহরতলির দিকে চলিল। মঙ্জীর বিস্ময় ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল, এ মেয়ে এমন ভাবে চলিয়াছে কোথায়? এ কি একেবারে পলায়নের ব্যবস্থা, শুধু গোপন সাক্ষাতের নয়? তাহা হইলে ত বিপদ, মঙ্জী কিছুই করিতে পারিবে না। সে একাকী এবং সঙ্গে তাহার কোনোই অস্ত্র নাই। তাহাকে শুধু চাহিয়া দেখিতে হইবে!

সামনের ট্যাক্সিখানা হঠাৎ থামিয়া গেল। মঙ্জীর গাড়ীও দাঁড়াইল। সামনে একখানা বড় বাড়ী। যুবক বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, বাড়ীখানা তাহার পরিচিতই, এখানে সহরের বিখ্যাত এক গুজরাটী বণিকের বাস। তাঁহার হীরা জহরতের বেশ বড় কারবার আছে। কিন্তু সে ব্যক্তি প্রৌঢ় এবং বিবাহিত, দেশে স্ত্রী-পুত্র সকলই আছে বলিয়া জানা যায়, তাঁহার সহিত এই ব্রহ্মদেশীয়া যুবতীর কি সম্পর্ক? সে কি অর্থের লোভে এতখানি নীচে নামিতে পারে? এমন যাহার রূপ, প্রতি পদক্ষেপ যাহার রাণীর মত দৃপ্ত, সে তুচ্ছ টাকার লোভে নিজেকে বিক্রয় করিবে? হইতে পারে জগতে সবই সম্ভব।

যুবতী নামিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। মঙ্জী ট্যাক্সি হইতে নামিয়া পড়িল। সন্ধান ত পাওয়াই গেল, এখন আর ট্যাক্সি দাঁড় করাইয়া রাখিয়া লাভ কি? বাড়ী ফিরিবার জন্য ট্রাম রহিয়াছে, রিক্স রহিয়াছে। সে ভাড়া চুকাইয়া ট্যাক্সিওয়ালাকে বিদায় করিয়া দিল। বাড়ীটার সামনের ফুটপাথে সে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, অবশ্য একটু সতর্কভাবে, যাতে সহজেই লোকের চোখে ধরা না পড়ে।

খুব বেশীক্ষণ তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল না। আধঘণ্টার মধ্যেই যুবতী আবার বাহির হইয়া আসিল, গৃহস্বামী তাহার সঙ্গে। তাঁহার মুখ একেবারে হাস্য-বিকশিত। মা সান-ও মৃদু মৃদু হাসিতেছে। মঙ্জীর একেবারে অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গেল। হাতে কিছু থাকিলে, গুজরাটী ভদ্রলোকের সেদিন একটা অপঘাত ঘটিয়া যাইত। ভাগ্যগুণে তিনি তখনকার মত বাঁচিয়া গেলেন।

মা সান্ চলিয়া যাইতেই, মঙ্জী তাড়াতাড়ি একটা রিক্স চড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ছুটির দিনটা তাহার একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল। কোথাও সে বাহির হইল না, সারাদিন ঘরে বসিয়া, প্রতিহিংসা গ্রহণের যত অদ্ভুত প্ল্যান্ করিতে লাগিল। বন্ধুরা আসিয়া ডাকাডাকি করিয়াও তাহাকে বাহির করিতে পারিল না। সামনের বাড়ীর দিকে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিল, যেন তাহার অজ্ঞাতে কেহ বাড়ী হইতে বাহির হইতে বা বাড়ীতে ঢুকিতে না পারে।

বিকালের দিকে বাড়ীর গৃহিণী নিজের গাড়ীতে বাহির হইয়া গেলেন। তিনিও একাকিনীই গেলেন, কন্যা বাড়ীতেই রহিল। মঙ্জী ভাবিল, ইহাদের হইল কি? এতকাল ত দুজনে সর্ব্বদাই এক সঙ্গে বাহির হইত, আজ এত একলা ঘোরার ঘটা কেন? মা-মেয়েতে কিছু লইয়া বিশেষ একটা মনোমালিন্য হইয়া থাকিবে। যা মেয়ের ব্যবহার, হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

গৃহিণীর গাড়ী যে দিকে চলিয়াছিল, তাহা জানিলে মঙ্জীর বিস্ময় আরো শতগুণ বাড়িয়া যাইত। সহরের নামজাদা চিকিৎসক ডাঃ মরফি তখন নিজের পড়িবার ঘরে বসিয়া ধূম পান করিতেছিলেন, পায়ের কাছে তাঁহার পোষা কুকুরটি কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়াছিল। ভদ্রলোক বিপত্নীক, দুইটি কন্যা আছে, দুইজনেই বিলাতে বোর্ডিং-এ থাকিয়া পড়াশোনা করিতেছে।

হঠাৎ বেয়ারা ভিতরে ঢুকিয়া সেলাম করিয়া জানাইল, একটি ব্রহ্মদেশীয়া ভদ্রমহিলা তাঁহার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনে

সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ডাঃ মর্‌ফি অবাক হইয়া উঠিয়া পড়িলেন, ভদ্রমহিলা অকস্মাৎ তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইলেন কেন? বিশেষ কোনো বিপদে পড়িয়া আসিয়া থাকিবেন, মনে করিয়া তিনি বাহিরের ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন, বেহারাকেও হুকুম দিলেন মহিলাটিকে উক্ত ঘরে লইয়া গিয়া বসাইতে।

ডাঃ মর্‌ফি ঘরে ঢুকিতেই আগন্তুক মহিলাটি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া চলনসই ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে বসাইয়া, নিজেও বসিলেন, এবং রূপসী ব্রহ্মবাসিনীকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। দেখিতে সুন্দরী বটে, এবং অলঙ্কারের ঘটা যে রকম, তাহাতে ধনশালিনী বলিয়াই মনে হয়।

যাহা হউক ভদ্রমহিলা তাঁহাকে নিজের রূপ দেখিবার খুব বেশী অবসর দিলেন না। তাঁহার কথার স্রোতে হাবুডুবু খাইতে খাইতে ডাক্তার আবিষ্কার করিলেন যে ভদ্রমহিলার স্বামীটি অসুস্থ, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ডাক্তারকে লইয়া যাইতেই শ্রীমতীর আগমন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অসুখ তাঁর?"

মহিলা উত্তর দিলেন, নানারকম অসুখেই এতকাল ভুগছিলেন, কিছু দিন থেকে মস্তিষ্কের গোলমাল সুরু হওয়াতে আমরা বড় বিপদে পড়েছি। বাড়ীতে কেবল দুটি মেয়ে মানুষ আমরা, আমি এবং আমার মেয়ে, কিছুতেই তাঁকে সামলাতে পারি না।"

ডাঃ মর্‌ফি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁকে এত দিন ডাক্তার দেখান হয়নি?"

মহিলা উত্তর করিলেন, "তা হয়েছে বৈ কি? কিন্তু এক একজন পাগল মানুষ কি রকম চালাক হয় জানেন ত? বাইরের লোক দেখলেই আমার স্বামী এমনভাবে কথাবার্ত্তা বল্‌তে সুরু করেন যে তাঁকে পাগল বলে কেউ বিশ্বাসই করে না। আমি তাঁকে বিকৃতমস্তিষ্ক প্রমাণ করে নিজের কোনো সুবিধা করতে চাই, এই সকলের ধারণা হয়।"

ডাক্তার বলিলেন, "হ্যাঁ, এরকম অনেক পাগলের কথা শোনা যায় বটে। তা আমাকে কি কর্‌তে বলেন?"

অভ্যাগতা বলিলেন, "আপনি যদি দয়া করে আমার বাড়ী কাল বিকালে যান, এবং তাঁকে পরীক্ষা করেন ত বড় ভাল হয়। আপনি বহুদর্শী অভিজ্ঞ ডাক্তার, আপনাকে তিনি ফাঁকি দিতে পার্‌বেন না। আমার সাধ্য নেই তাঁকে সাম্‌লাবার, কিন্তু পাগল বলে ডাক্তারে সার্টিফিকেট না দিলে, কোনো পাগলা গারদে তাঁকে দিতে পারব না। সঙ্গে যদি দু' একজন লোক নিয়ে যান ত আরো ভাল।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? তিনি কি খুব বেশী উৎপাত করেন?"

ভদ্র মহিলা বলিলেন, "সব সময় নয়। তবে বহুকাল আগে তাঁর কিছু জহরৎ চুরি যায়, সেইগুলোর কথা মনে হ'লেই ভয়ানক ক্ষেপে ওঠেন এবং 'আমার হীরে কই? সর্ব্বনাশ হয়ে গেল' ব'লে চেঁচামেচি কর্‌তে থাকেন, তখন তাঁকে ঠাণ্ডা করা দায় হয়। রাস্তায় ছুটে যেতে চান, মানুষকে মার্‌তে যেতে চান, এই সব কাণ্ড। আপনার যা ফিস্ তা আমি দেব, লোকগুলিকেও কিছু কিছু দেব। আশা করি, আপনি দয়া করে যাবেন।"

ডাক্তার বলিলেন, "অবশ্যই যাব। এর ভিতর আর দয়ার কথা কি? এই ত আমাদের কাজ।"

মহিলাটি উঠিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এখন তবে আসি। কাল বিকাল চারটায় তাহলে আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।"

ভদ্রমহিলার গাড়ীটা ছাড়িয়া দিল। ডাঃ মর্‌ফি একটা গানের সুর শিষ দিতে দিতে আবার পড়িবার ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন মঞ্জী সবেমাত্র আপিস হইতে ফিরিয়াছে, এমন সময় একটা ট্যাক্সি আসিয়া মা সানদের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। মঞ্জী তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ট্যাক্সি হইতে সেই গুজরাটী রত্নবণিককে নামিতে দেখিয়া সে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এ কি ব্যাপার! মা সানের মাও কি এমনি নীচ, যে, টাকার লোভে এই বৃদ্ধের কাছে কন্যাকে বলি দিতে যাইতেছেন। ইহার পর কোনো মানুষকে বিশ্বাস করাই অসম্ভব হইয়া উঠিবে দেখা যাইতেছে। কি

করিবে স্থির করিতে না পারিয়া সে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। বুকের ভিতরটা তাহার জ্বালা করিতে লাগিল।

গুজরাটী বণিক তেতলায় উঠিবামাত্র বর্ম্মা ঝিটি আসিয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে অভ্যর্থনা করিয়া বসিবার ঘরে লইয়া গেল। মিনিট দুই তাঁহাকে একলা বসিতে হইল। তিনি চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন, হ্যাঁ বড়মানুষের বাড়ী হওয়াই সম্ভব বটে। কিন্তু বাড়ীর সুন্দরী কর্ত্রীটি কোথায় গেলেন? তাঁহারই সহিত আর একবার সাক্ষাতের আশায় ভদ্রলোক নিজেই আসিয়াছিলেন, তাহা না হইলে একজন কর্ম্মচারীকে পাঠাইলেই কাজ চলিয়া যাইত।

মা সন্ শীঘ্রই আসিয়া পৌছিল। মধুর হাস্যে বণিককে মুগ্ধ করিয়া বলিল, "এই যে আপনি এসে বসে আছেন। সে জিনিষগুলি এনেছেন কি?"

রত্নবণিক নিজের লম্বা কোটের পকেট হইতে একটি চামড়ার কেস্ বাহির করিলেন, সেইটি যুবতীর দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, "এরই ভিতর কতকগুলো আছে, আপনার যদি না পছন্দ হয় তাহলে কাল আরো মাল নিয়ে আস্‌ব, আপনি পছন্দ করে নেবেন। সব চেয়ে ভাল হয় যদি আপনি একবার আমার দোকানে আস্‌তে পারেন। সেখানে যা চান সবই পাবেন, বেশী জিনিষ ত নিয়ে বেড়ান যায় না? পথে ঘাটে নানা বিপদ আছে।"

মা সান্ বলিল, "আমার একলার পছন্দে যদি কাজ হত, তা হলে কি আর আপনাকে এত কষ্ট দিতাম? আমার মা পছন্দ না করলে ত আমি কিছু কিন্‌তে পারি না। দুঃখের বিষয়, তিনি এমন পীড়িত, যে, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। কাজেই আপনাকে এতটা অসুবিধায় ফেলতে হল।"

গুজরাটী ভদ্রলোক অমায়িক হাসিতে সারামুখ ভরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "না, না, অসুবিধা আবার কি? আমাদের কাজই এই। আপনি যে অনুগ্রহ করে আমায় ডেকেছেন, সেইই যথেষ্ট।"

দেখিয়ে আসি? তিনি পাশের ঘরেই শুয়ে আছেন। আপনাকে একটু চা দিতে বলি?'

সুন্দর মুখের খাতিরে ভদ্রলোক অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাই বলিয়া গোঁড়া হিন্দুমানুষ, বর্ম্মার বাড়ীতে চা খাইয়া জাত দিতে রাজী ছিলেন না। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না, না, আমার চা খাওয়া মোটেই অভ্যাস নেই।"

মা সান্ আবার ভুবন-ভুলান হাসি হাসিয়া জহরতের কেস্‌টি লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। ভদ্রলোক বসিয়া বসিয়া একখানা খবরের কাগজ উল্টাইতে লাগিলেন। সিঁড়িতে খুব ভারি পায়ের শব্দ খানিক পরে শোনা গেল। রত্নবণিক যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে সিঁড়ি দেখা যায় না। ঝিটা তখনি ঘরের ভিতর দিয়া ছুটিয়া কোথায় যাইতেছিল তাঁহাকে বলিয়া গেল, "ডাক্তার এসেছেন, আপনার একটু দেরি হবে।"

দেরি হইলেই বা উপায় কি, ভাবিয়া ভদ্রলোক খবরের কাগজ উল্টাইয়াই চলিলেন। মা সান্ বোধ হয় ডাক্তারকে লইয়া ব্যস্ত তাই বলিয়া তাঁহাকে এতটা উপেক্ষা না করিলেও চলিত। তাঁহার অনেক কাজ ফেলিয়া আসিয়াছেন মনে করিয়া একটু অনুতাপ হইতে লাগিল।

ডাঃ মর্‌ফি ঠিক সময়েই আসিয়াছিলেন। উপরে উঠিবামাত্র মা-সান্ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে ছুটিয়া আসিল, বলিল "আসুন, আসুন, আমার মা এই ঘরে আছেন। তিনি আজ একটু অসুস্থ। কাল বাবাকে নিয়ে আমাদের বড় মুস্কিল গিয়েছে। সারারাত কেউ ঘুমতে পায়নি।"

ডাক্তার মা-সান্‌কে দেখিয়া খুসি হইলেন। মেয়েটি দেখা যাইতেছে মায়ের চেয়েও সুন্দরী এবং সুশিক্ষিতা, ইংরেজী বলে প্রায় ইংরেজের মতই। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গৃহিণীর ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। ঘরখানি ছোট, তবে বেশ ফিটফাট করিয়া সাজান।

ডাঃ মরফিকে দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "আসুন, আসুন, আপনার খুব অনুগ্রহ। কাল ওকে নিয়ে বড় কষ্ট পেয়েছি। এ রকম হলে আমরা আর বেশীদিন

মনে মনে হতভাগ্য পাগলটার প্রতি অত্যন্ত চটিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আমার যথাসাধ্য আমি করব। আশা করি মেন্ট্যাল হোমে তাঁকে ভর্ত্তি করা বেশী শক্ত হবে না। তিনি কোথায় ?"

মা-সান্ বলিল, "তিনি সাম্নের বড় ড্রয়িং রুমে বসে আছেন। আপনি যান। একলা গেলেই ভাল, আমাদের দেখ্‌লে বাবা বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সঙ্গে আরও লোক আছে ত ? তিনি ক্ষেপলে, একলা তাঁর সঙ্গে পেরে ওঠা শক্ত।"

ডাক্তার বলিলেন, "আপনি নীচে কাউকে পাঠিয়ে দিন, আমার মোটরে দুজন লোক বসে আছে, তাদের ডেকে নিয়ে আসুক। ওরা হাঁসপাতালের সহকারী, এসব কাজ করা অভ্যাস আছে। যদি বেশী বাড়াবাড়ি দেখি, এখান থেকে সোজা হাঁসপাতালে নিয়ে যাব।"

গৃহিণী এবং মা-সান্ প্রায় এক সঙ্গেই বলিলেন, "সেই ভাল।" তাঁহার ঝি নীচে ছুটিল, লোক দুইজনকে ডাকিয়া আনিতে।

গুজরাটি ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া কাহাকেও ডাকিবেন কি না ভাবিতেছেন, এমন সময় গট্‌গট্ করিয়া এক সাহেব সোজা ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিল। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আজ কেমন আছেন ?"

বণিক ধরমদাস বিস্মিতভাবে বলিলেন, "ভালই আছি। আপনি কাকে চান ?"

সাহেব বলিল, "সম্প্রতি আপনার কাছেই এসেছি। কাল আপনার শরীর বড় খারাপ গিয়েছে শুন্‌লাম ?"

ধরমদাস বলিলেন, "আপনি কে ? আমার সম্বন্ধে এসব কথা আপনি কার কাছে শুন্‌লেন ? আমার বোধ হচ্ছে আপনি আমাকে অন্য মানুষ ভাবছেন। আমি এ বাড়ীর কেউ নই।"

ডাক্তারের গোঁফের কোণে একটু হাসি দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, তা শুনেছি। তা আপনার ঘুমটুম বেশ হয় ? হজম কি রকম ?"

ধরমদাস বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন। আমার কোনো অসুখ হয়নি। এ বাড়ীর গৃহিণী এবং তাঁর মেয়ে কোথায় ? তাঁদের জিগগেষ করলেই আপনি নিজের ভুল বুঝতে পারবেন।"

ডাক্তার বলিলেন, "তাঁরা বেড়াতে চলে গেছেন। আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন না।"

ধরমদাস লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "বেড়াতে গিয়েছেন মানে ? এসব কি কাণ্ড! তা হলে আমার হীরেগুলো কি হল ? প্রায় এক লাখ টাকার হীরে।"

ডাক্তার তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাঁহার পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, "আপনি শান্ত হোন্, শান্ত হোন্, আপনার জিনিষ ঠিক আছে, কোনো ক্ষতি হয়নি।"

ধরমদাস অসহিষ্ণুভাবে ডাক্তারের হাত ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "শান্ত হব কি রকম ? আমি চোরের হাতে পড়েছি, ডাকাতের হাতে পড়েছি। আমার সর্ব্বনাশ হল! পুলিশ, পুলিশ!"

তিনি ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেই ডাক্তার অদ্ভুতভাবে শিষ দিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ইউনিফর্ম পরা দুইজন জোয়ান লোক ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিল, এবং নিমেষের মধ্যে ধরমদাসকে এমনভাবে চাপিয়া ধরিল যে, তাঁহার আর নড়িবার সাধ্য রহিল না।

ডাঃ মরফি তাহাদের হুকুম দিলেন, "নীচে আমার গাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বসাও।"

খুব খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি, চেঁচামেচি চলিল। তাহার পর ধরমদাসের মুখ বাঁধিয়া টানিতে টানিতে গাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া ফেলা হইল। গলির লোক একটু অবাক হইয়া তাকাইল বটে, তবে সাহেব ডাক্তারকে অনেকেই চেনে বলিয়া কেহ কোনো কথা বলিল না। হতভাগ্য বণিককে লইয়া ডাক্তারের গাড়ী বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মঞ্জী এতক্ষণ কি করিতেছিল, তাহা জানিতে পাঠকের ইচ্ছা হইতে পারে। গুজরাটী বণিক উপরে উঠিয়া যাইবার আধঘণ্টা পরেই ডাক্তারকে হাজির

হইতে দেখিয়া তাহার ক্রোধটা বেশীর ভাগই বিস্ময়ে পরিণত হইয়াছিল। এদের বাড়ী আজ হইতেছে কি? এতবড় ডাক্তার কি করিতে আসিল? কাহারও শক্ত অসুখ হইল না কি? মা-সানের কি? হায়, কাহার কাছে সে খবর লইবে? মান্দ্রাজী হতভাগারও ত কয়েক দিন হইল দেখা নাই।

অকস্মাৎ মা-সান্, তাহার মা, এবং তাহাদের ঝিকে এক সঙ্গে নামিতে দেখিয়া সে আরো হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এ যে চোখের সাম্‌নেই বায়োস্কোপ। ব্যাপারখানা কি? ইহাদের মুখের ভাবই বা এমন উত্তেজিত কেন? মঙজী ভাল করিয়া সব দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি উপর হইতে নামিয়া আসিল॥

সে নামিতে নামিতে মা-সান্‌দের মোটরও আসিয়া দাঁড়াইল, এবং পর মুহূর্ত্তেই সুন্দরীত্রয়কে লইয়া গলি ছাড়িয়া চলিল।

আর সময় নাই। মঙজী এধার ওধার চাহিয়া দেখিল। তাহার প্রতিবেশী এক যুবকের সাইকেলখানা দরজার পাশে ঠেসান রহিয়াছে দেখিতে পাইল। আর কোনো কিছু না ভাবিয়া সে উহাতে চড়িয়া বসিল। মোটর তখনও বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। সে প্রাণপণে তাড়া করিল।

সেদিন রাত্রে ছেলে বাড়ী না ফেরাতে মঙজীর বুড়ী-মা সারারাত ঘর-বাহির করিল। সকাল হইতেই তাহার ছেলের যত বন্ধু ছিল, সকলের ঘরে খোঁজ করিল। মঙজী কোথাও যায় নাই। বৃদ্ধা কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির হইয়া উঠিল।

পুলিশে খবর দিতে যাইতেছে এমন সময় তাহার হারান ছেলে ফিরিয়া আসিয়া হাজির হইল। তাহার মাথায় ব্যাণ্ডেজ, বেশভূষা কাদা এবং রক্তে মাখামাখি হইয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধা ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কাণ্ড! কোথায় ছিলি সারারাত?"

মঙজী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে আর শুনে কি করবে মা? যা হবার তা হয়ে গেছে। ওঃ, কতবড় শয়তানী।"

তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে?"

মঙজী বলিল, "ঐ তেতালার। যাক্ কারো কাছে এ সব বোলো না। মরতে মরতে বেঁচেছি, কিন্তু পরের ঠাট্টা সইতে পারব না।"

দিন চার পরে খবরের কাগজে এক তাজ্জব খবর দেখা গেল। বড় বড় হরফে উপরে ছাপা, "**অদ্ভুত ডাকাতি, মেয়ে জুয়াচোর।**"

নীচে গুজরাটী ধরমদাসের দুঃখকাহিনী। অনেক বলিয়া কহিয়া ব্যবসায়ের কার্ড দেখাইয়া ও সাক্ষীসাবুদ ডাকিয়া চার দিন পরে সে পাগলা গারদ হইতে ছাড়া পাইয়াছে। কিন্তু লক্ষটাকার হীরার শোকে সে মৃতপ্রায়।

মঙজী আজকাল আর বায়োস্কোপ দেখে না।

একটি আহার্য্য ছাতা

চিত্র—ঙ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

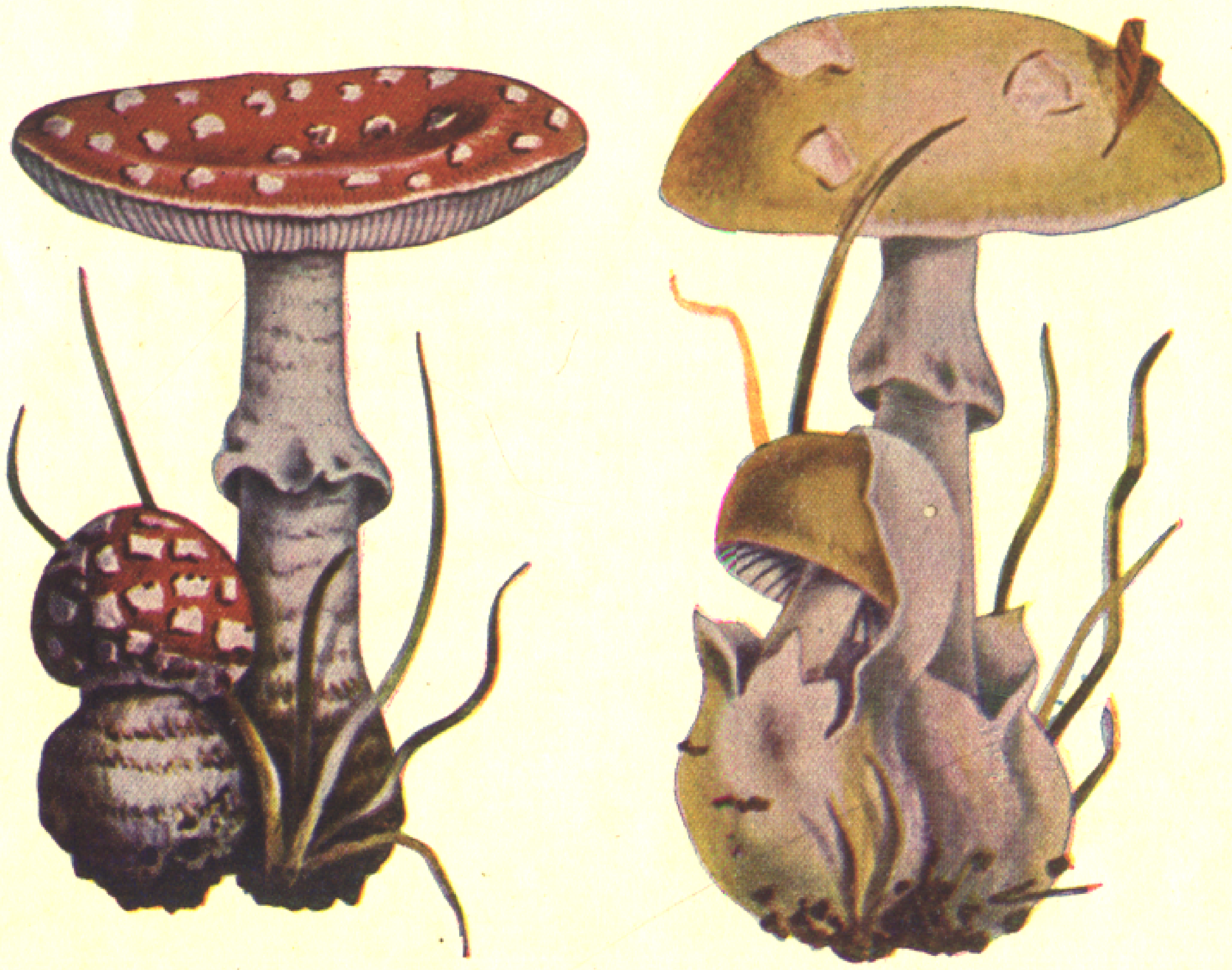

দুইটি বিষাক্ত ছাতা

চিত্র—(খ) ও (গ)

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আহার্য্য ও বিষাক্ত ছত্রাক

ডাঃ শ্রীসহায়রাম বসু

কি উপায়ে আহার্য্য ছাতা বিষাক্ত ছাতা হইতে প্রভেদ করিতে পারা যায় এই প্রবন্ধে তাহাই আগে বলিব।

সবচেয়ে বিষাক্ত ছাতাগুলি য়্যামানিটা (Amanita) শ্রেণীর অন্তর্গত, কাজেই মোটামুটি য়্যামানিটার বিশেষত্বগুলি ভাল করিয়া মনে রাখিলে ছাতা খাইয়া জীবন হারাইবার আশঙ্কা থাকিতে পারে না। য়্যামানিটাগুলির আহার্য্য ছাতা হইতে আকৃতিগত পার্থক্য এতই বেশী যে, অতি সহজেই প্রভেদ করিতে পারা যায়।

প্রথমতঃ, বিষাক্ত ছাতা খুব ছোট অবস্থায় ডিম্বাকৃতি থাকে এবং একটি আবরণে সম্পূর্ণভাবে আবৃত থাকে; যখন টুপির মত অগ্রভাগ বাড়িতে থাকে, তখন এই আবরণটি ছিঁড়িয়া গিয়া স্ফীত নিম্নভাগে এইরূপ বাটির ন্যায় কোনও অংশ বা চিহ্ন থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, য়্যামানিটা শ্রেণীর ছাতাগুলির ডাঁটার উপর টুপির কিছু নিম্নভাগে একটি করিয়া আংটির ন্যায় খাঁজ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক আহার্য্য ছাতার (*Entoloma microcarpum, Volvaria terastrius, etc.* চিত্র ক) ঐরূপ কোনও খাঁজ থাকে না।

তৃতীয়তঃ, বিষাক্ত য়্যামানিটাগুলির টুপির ঠিক নিম্নভাগে মাছের কান্‌কোর ন্যায় ধবধবে সাদা স্তরে স্তরে পাতলা গুচ্ছ—গিল (gills)—থাকে; এবং যদি ডাঁটাগুলি কাটিয়া ফেলিয়া উহাদের টুপিগুলি কাগজের উপর রাখা যায়, তাহা হইলে উহা হইতে

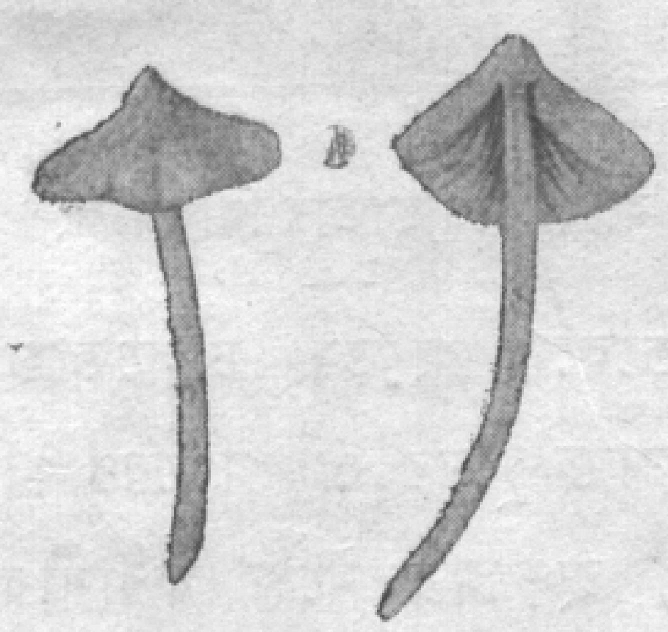

চিত্র—ক এণ্টোলোমা মাইক্রোকার্পাম্ নামক ছাতা

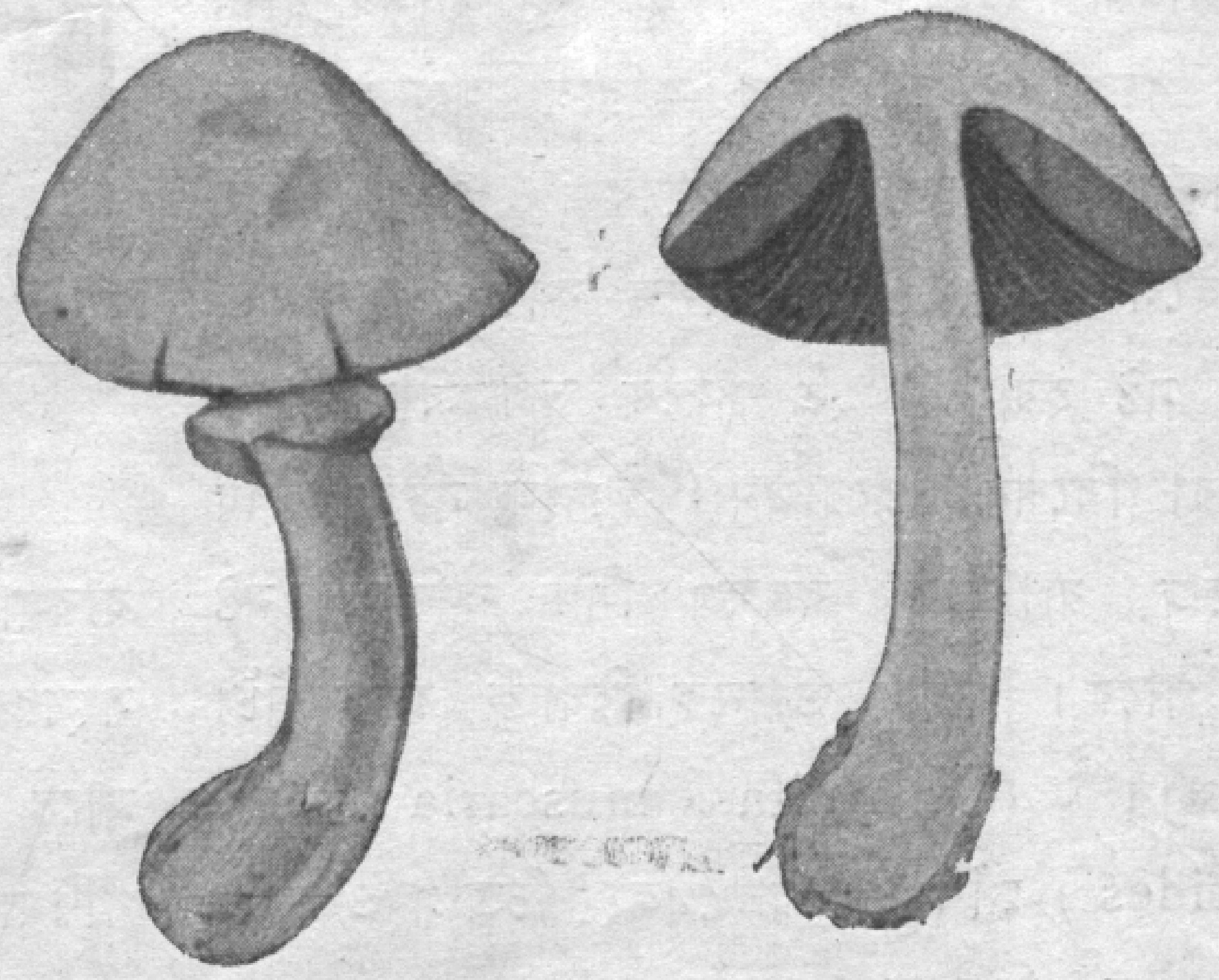

চিত্র—খ অ্যাগারিকাস্ ক্যাম্পেষ্ট্রিস্ নামক ছাতা

ডাঁটার নিম্নদেশে একটি বাটির ন্যায় ছড়াইয়া পড়ে এবং কখনও কখনও অতি সূক্ষ্ম ত্বকাবরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের ন্যায় বিভক্ত হইয়া যায়। এই অবয়বটির অস্তিত্ব নিরূপণের জন্য ছাতাগুলি খুব সাবধানে মাটি হইতে আমূল তুলিতে হইবে, কেন না, ঐ অংশটি মাটির নীচে সম্পূর্ণরূপে পড়িয়া থাকিতে পারে। আহার্য্য ছাতার বৃন্তের

যে সব বীজকোরক (spores) কাগজের উপর পতিত হয়, সেগুলি সম্পূর্ণ সাদা রঙের। কিন্তু আহার্য্য ছাতার (সাধারণ Agaricus campestris—চিত্র খ) গিলগুলি (gills) প্রথম অবস্থায় ঈষৎ লাল রঙের হয় এবং তাহারা য়্যামানিটার ন্যায় ডাঁটার সহিত একেবারে সংলগ্ন থাকে না, কিছু তফাতে থাকে এবং

এগরিকসের বীজকোরকগুলি (spores) কখনই সাদা রঙের হয় না, তাহারা ঈষৎ লাল ও কাল রঙে মিশ্রিত। উহাদের ডাঁটায় আংটির মত পরিবেষ্টন থাকে বটে, কিন্তু বোঁটার নিম্নভাগে বাটির ন্যায় কোন আবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই য়্যামানিটাগুলি কখনই পরগাছার ন্যায় গাছের উপর জন্মে না। তাহাদিগকে সব সময়ে বনের মধ্যে মাটির উপর দেখিতে পাওয়া যায়। আহার্য্য এগারিকস্‌গুলি সচরাচর খোলা মাঠে ঘাসের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা কখন ঘন বনে হয় না।

এ বিষয়ে অনভ্যস্তদিগের পক্ষে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম জানিয়া রাখা উচিত ঃ—যে ছাতাগুলি টাট্‌কা এবং শক্ত নয়, সেইগুলি কখনই খাদ্যরূপে আহার করিবে না। কিংবা যেগুলি পোকামাকড়ে পূর্ণ অথবা কোন তীব্র গন্ধ পরিপূর্ণ সেগুলি সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিবে। যেগুলি হইতে দুগ্ধের ন্যায় রস বহির্গত হয় সেগুলিও পরিত্যাগ করিবে। নানা বর্ণে বিশেষভাবে চিত্রিত বড় ছাতাগুলি সাধারণতঃ বিষাক্ত শ্রেণীভুক্ত, সুতরাং তাহাও পরিহার্য্য। আহার্য্য ছাতা সম্বন্ধে সকল সময়ে নিজের কিছু কিছু জানিয়া রাখা আবশ্যক। পরের প্রতি নির্ভর করিলে অনেক সময়ে বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। গরম জলে ফুটাইয়া লইলে বা লবণ দ্বারা সিদ্ধ করিলে বিষাক্ত ছাতার বিষ নষ্ট হয় না। এ সম্বন্ধে ভুল ধারণাগুলি দূরীভূত করা বিশেষ প্রয়োজন। য়্যামানিটার বিষ কেবল সতেজ য়্যাসিডে বহুক্ষণ সিদ্ধ করিলে নষ্ট করা যাইতে পারে। দুইটি ভয়ানক বিষাক্ত য়্যামানিটা জাতীয় ছাতার (Amanita muscaria এবং Am.phalloides) ছবি দেওয়া গেল (চিত্র গ ও ঘ)। এই দুই শ্রেণীর বিষাক্ত ছাতা খাইয়া আকস্মিক দুর্ঘটনার শতকরা নব্বুইটি মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আমাদের সাধারণ আহার্য্য ছাতাগুলির ছবিও দেওয়া হইল (চিত্র ক, খ, ঙ)। এই ছবিগুলির সাহায্যে সাধারণে উহাদের প্রভেদ সহজেই ধরিতে পারিবেন।

ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান, নিউজিলণ্ড প্রভৃতি দেশে ছাতা নিত্যব্যবহার্য্য তরিতরকারীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সুইজারলণ্ডের জুরিক্‌ সহরে আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি বাজারের এক অংশ ছাতা-বিক্রয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। আমাদের এখানে যেরূপ আলু স্তূপাকার করিয়া বিক্রয়ের জন্য সজ্জিত রাখে, সেইরূপ পাশাপাশি বহু দোকানে ছাতা সজ্জিত রহিয়াছে। ইহা হইতেই সহজে বুঝিতে পারা যায়, ওসব দেশে ছাতার কাটতি কেমন বিস্তৃত এবং ইহার

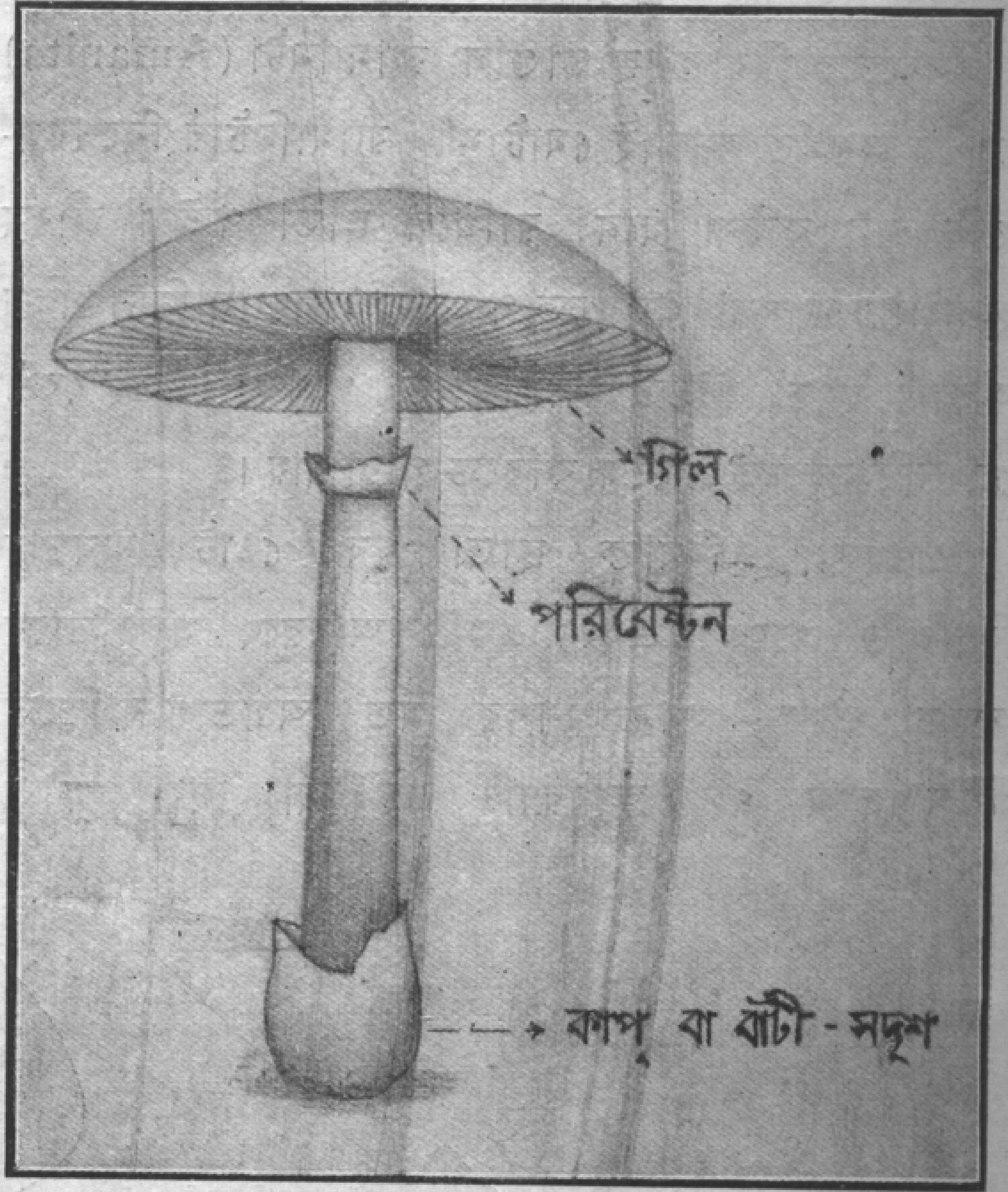

ছত্রাক বা ব্যাঙের ছাতার বিভিন্ন অংশ

ব্যবসা কেমন দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলিতেছে। প্যারিস সহরের কাছে পরিত্যক্ত চুনের ও পাথরের খনিতে মাটির নাচে খুব বিস্তৃত সুড়ঙ্গের মধ্যে ফরাসীরা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছাতার চাষ করিয়া আসিতেছে। এই সব সুড়ঙ্গের এক একটির দৈর্ঘ্য সাত আট মাইল হইবে। াবগত যুদ্ধের সময়ে শত্রুপক্ষের গুলিবর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ঐ সব সুড়ঙ্গে অনেকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯২৪ সালে প্যারিসে অবস্থানকালে আমি প্রায় তিন মাসকাল মধ্যে মধ্যে কয়েকটি সুড়ঙ্গের ছাতা চাষের পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম এবং দেখিয়াছিলাম ফরাসীরা কিরূপ যত্নসহকারে উহার চাষ আবাদ

করিতেছে এবং ফলন কিরূপ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বাড়াইয়াছে। ৯০১ সালে প্যারিস সহরের বাজারে ১২৫,০০০ মণ ছাতা বিক্রয় হইয়াছিল। একটি ছাতা

ছত্রাকার ছাতা বহুলপরিমাণে উৎপন্ন হয়। জাপানীরা উহাদিগকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করে এবং শুষ্ক অবস্থায় চীন দেশে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রপ্তানি করে। এমন কি

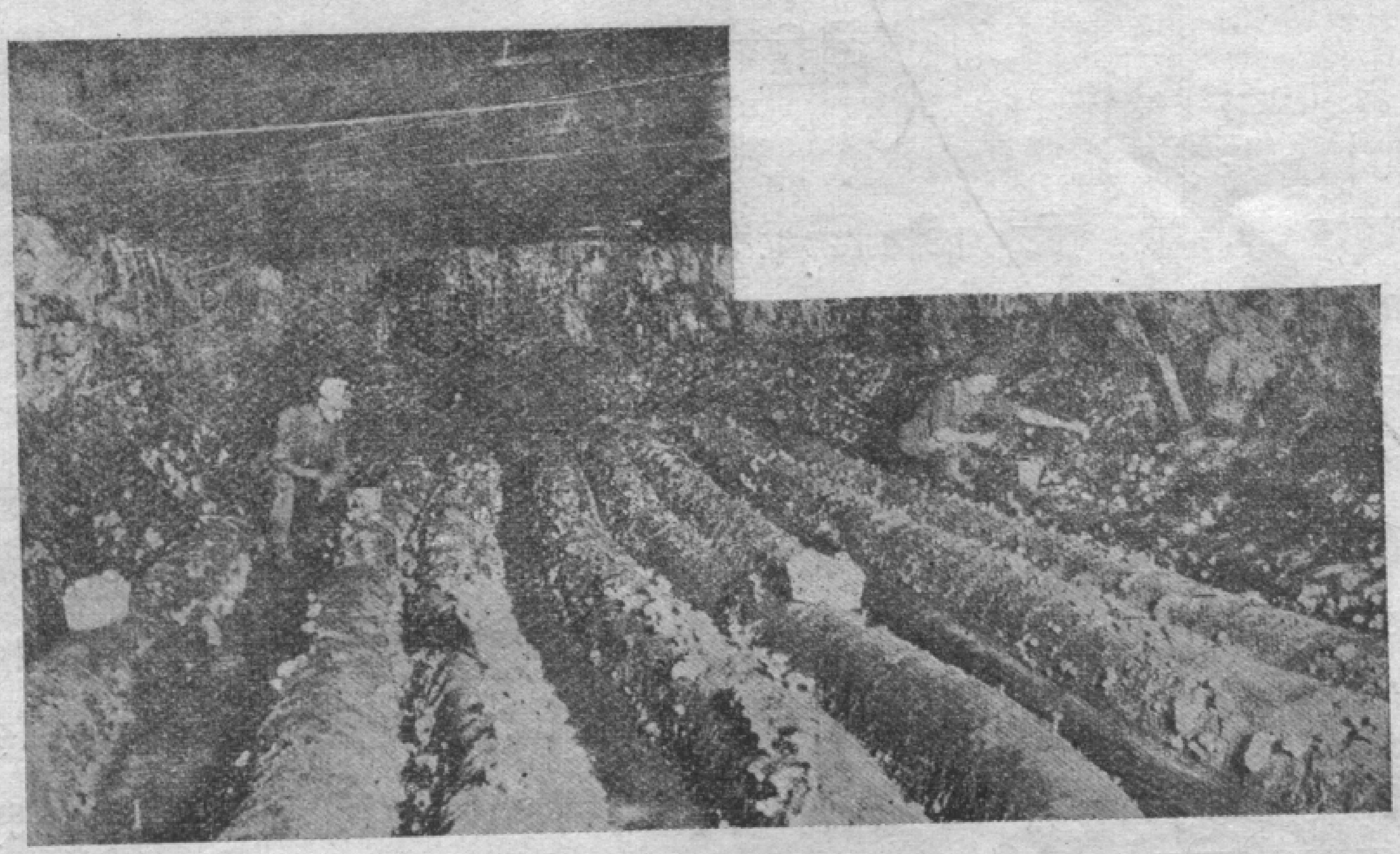

চিত্র---চ, ব্যাঙের ছাতা চাষ করিবার প্রণালী

চাষের ছবি দেওয়া হইল (চিত্র চ)। উহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে কেমন ক্ষেত হইতে ছাতা সংগ্রহ হইতেছে।

জাপানীরা এক অদ্ভুত উপায়ে বনের মধ্যে নানা

কলিকাতার চীনা হোটেলগুলিতে এই জাতীয় ছাতা (Cortinellus Shiitake) নিত্য আহার্য্যের পাকের নির্ঘণ্টে পাওয়া যায়। আমি কটকে বর্ষাকালে স্থানীয়

ছাতা চাষের জাপানী প্রণাল

প্রকার কাষ্ঠখণ্ডের উপর গর্ত্ত করিয়া একপ্রকার আহার্য্য ছাতার অনুসূত্র Mycelium) রোপণ করে (চিত্র ছ। এই ছাতার নাম Cortinellus Shiitake; দুই তিন

বৎসরের মধ্যে ঐসব অনুসূত্র (Mycelium) হইতে ভদ্রলোকদিগকে নিজ নিজ তরি তরকারীর সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে ছাতা প্রায় নিত্য ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি।

হরির লুট

শ্রীদিবাকর মিত্র

(১)

বিষ্টুমামা তাঁর জীবনে একটা অতি গভীর দুঃখকে আশৈশব নীরবে বহন করে এসেছিলেন এবং আমরণ বহন করতে হবে তাও জান্‌তেন,---সে তাঁর বাপমায়ের দেওয়া নামটা। যথাসাধ্য ইংরেজিয়ানা করে বিষ্ণুচরণ ঘোষকে Bestow Churn Gosse লিখে এবং বলেও তাঁর মনে কিছুমাত্র শান্তি ছিল না। তাঁর কোনো কথাতে এ দুঃখকে ধরবার উপায় ছিল না, কিন্তু যখনই কোনো কারণে তাঁকে নামটা ব্যবহার করতে হত, কোথাও কিছু নেই অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গিয়ে আচমকা "দুত্তোর" বলে তিনি এক-একটা হাঁক দিয়ে উঠতেন।

নামটা কেবল যে তাঁর সাহেবিয়ানার বাধ্‌ত তা নয়। হিন্দুদেবতার নাম বলে' বিষ্ণু কথাটাতে বেশী বাধত। কিন্তু মজা এই, বিষ্টুমামা খ্রীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, মুসলমান অথবা ব্রাহ্ম ছিলেন না, ঠিক হিন্দু বলতে যা বোঝায় তাও তিনি ছিলেন না, অথচ হিন্দু দেব-দেবীর অস্তিত্বে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দুও অনেক সময় তেত্রিশ কোটির মধ্যে দুচারজনকে বাদসাদ দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়, এমন দেখা গেছে। কিন্তু বিষ্টুমামা কাউকেই বাদ দিতেন না, বল্‌তেন, "তেত্রিশ কোটি কেন, সম্ভবতঃ তার চেয়ে ঢের বেশীই আছে। এই অসীম সৃষ্টির মধ্যে আমরা যা ভাবতে পারি না, এমন জিনিষও আছে। চারটে হাত বা তিনটে চোখ বা পাঁচটা মাথা কারো কারো থাকবে, এ আর আশ্চর্য্য কি? আমি কেবল বল্‌তে চাই, তাঁরা আর যাই হোন্ দেবতা নন্। ভালো করবার ক্ষমতা তাঁদের থাকতে পারে, মন্দ করবার ক্ষমতা যে আছে তা ত তোমরাই স্বীকার কর, কিন্তু সে ক্ষমতাগুলো মানুষেরও ত আছে? তার জন্যে তাঁদের দেবতা বলে মান্‌ব কেন? মানুষকে যতটা খাতির করি

কিন্তু হলে কি হয়, ভারতবর্ষের মানুষ ত? দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি না থাক্‌লেও, তাঁদের জায়গা আর কাউকে দিয়ে পূর্ণ না করে বিষ্টুমামার চল্‌ল না। ইংরেজ জাতি ছিল বিষ্টুমামার ব্রাহ্মণ, তারাই ছিল তাঁর দেবতা। তিনি বল্‌তেন, "তোমাদের দেবতারা ত হাঁস, ময়ূর, ইঁদুর, ষাঁড় এই-সব চড়ে বেড়ান, একটা আরবী ঘোড়ায় চড়া দেবতাও তোমাদের দেখলাম না। ইংরেজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁরা পারবেন? তারা চড়ে এরোপ্লেনে, ঘণ্টায় যা দুশো মাইল যায়। তোমাদের বিষ্ণুকে গোকুল থেকে কৈলাসে আসতে হয় শিবের কাছে কৈলাসের খবর জান্‌তে; ওরা লণ্ডন থেকে কথা কয়, নিউইয়র্কে বসে শোনে।"

আমরা বল্‌তাম, "হ্যাঁ, শিব খেতেন এক ভাঙ, ওরা খায় পাঁচ-মিশুলী punch, cocktail, cobbler।"

বিষ্টুমামা বল্‌তেন, "ঠাট্টা করতে চাও কর, কিন্তু সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে দেবতারা মানুষদের দেখা দিতে আসতেন, তা ত মানো?"

"সত্য ত্রেতা দ্বাপর মান্‌লে ওটাও মান্‌তেই হয়।"

"বেশ, কলিতে কেন আসেন না?"

"ঘোর কলি বলে'।"

বিষ্টুমামা বল্‌তেন, "দুত্তোর। আস্‌বার জো কি? ভয় আছে না? কলিতে যে ইংরেজ বলবান্। এলেই সব জারিজুরী ফাঁস হয়ে যাবে যে। ইংরেজের সঙ্গে চালাকী চল্‌বে না।"

কিন্তু এই কলিযুগেও, কেষ্ট না বিষ্টু না, একটি অতি সাধারণ দ্বিপদ সার্দ্ধতিনহস্তপরিমিত মনুষ্য ইংরেজের সঙ্গে 'অহিংস অসহযোগ' নামক এক অতি বিষম চালাকীর অভিনয় আরম্ভ করে দিলে। বিষ্টুমামা খবরের কাগজ না পড়ে জলগ্রহণ করতেন না, একদিন হঠাৎ বলে

মামী বল্লেন, "সে কি, গো ? চোখ খারাপ হচ্ছে বুঝি ?"

বিষ্টু মামা বল্লেন, "হতেও পারে। যা দেখছি তা যে সত্যিসত্যিই দেখছি, সব সময় তা ভাবতে ইচ্ছে করে না। ইংরেজের সঙ্গে ওরা বিনা-অস্ত্রে লড়বে! পাগল আর-কি!"

মামী বল্লেন, "তা অস্ত্র ছাড়া কি আর লড়াই হয় না,--তোমাকে নিয়ে আমার দশাটা কি হ'ত তাহলে ?"

বিষ্টু মামা বল্লেন, "গান্ধী ত আর ইংরেজের ধর্ম্ম-পত্নী নন্, যে, 'আড়ি' বলে' বেঁকে বস্লেই তাঁর পায়ে ধরে' তারা সাধাসাধি স্বরু কর্‌বে।"

মামী বল্লেন, "তুমি তাই বলে' আর আমার পায়ে ধরে' সাধনি কখনো। কিন্তু ধরো, ইংরেজ যদি সাধেই।"

বিষ্টু মামা বল্লেন, "ইংরেজ ? গান্ধীকে সাধবে ? .. ছুত্তোর !"

মামী বল্লেন, "শুধু কি গান্ধী ? দেশসুদ্ধ লোক আড়ি বলে' বেঁকে বস্লে না-সেধে তারা কি কর্‌বে ?"

বিষ্টু মামা বলতেন, "কিছুই কর্‌বে না, যেমন রাজ্য চালাচ্ছে তেমনি চালাবে।"

"কাদের দিয়ে চালাবে ? সব-কিছুতেই ত দেশের লোক দিয়ে তাদের চল্‌ছে।"

"তাদের যতটা চলা দর্‌কার তা তারা নিজেরাই চালাবে। আর দেশের লোকের কথা বল্‌ছ ? দুদশ হাজারকে গুলি করে' মার্‌লেই সব ঢিট্ হয়ে যাবে।"

"ঢিট্ যদি না হয় ?"

"গুলি চালাতে থাক্‌বে।"

"সে কি গো, দেশ উজোড় হ'য়ে যাবে যে।"

"তাতে তাদের কি, যাক্ না দেশ উজোড় হয়ে।"

"কাদের নিয়ে তাহলে রাজত্ব কর্‌বে ?"

"কেন, লোকের অভাব কি ? অন্য দেশ থেকে প্রজা এনে বসাবে। কত লোক কত জায়গায় না খেতে পেয়ে মর্‌ছে।"

মামীর তর্ক করা এইখানেই শেষ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে' ভেবে বল্লেন, "তা তারা কর্‌বে না। তাদের

বিষ্টু মামা বিজয়গর্ব্বে উল্লসিত হয়ে উঠে বল্লেন, "হ্যাঁ, পথে এসো এইবারে। শেষ অবধি যাদের দয়ামায়া আর ধর্ম্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই, তাদের সঙ্গে লাগতে যাওয়া কেন রে বাপু ? দেশকে যারা ঠগীর অত্যাচার, বর্গীর হাঙ্গামা থেকে বাঁচিয়েছে, সতীদাহ নিবারণ করেছে, গঙ্গাসাগরে শিশু-বিসর্জ্জন বন্ধ করেছে, খাল কেটেছে, রাস্তা বেঁধেছে, স্কুল কলেজ আপিস আদালত হাসপাতাল বসিয়েছে, রেল ষ্টীমার টেলিগ্রাফ সস্তায় ডাক টেলিফোন ট্রাম মোটর ইলেক্‌ট্রিক বাতি—এক কথায় সভ্যতার সমস্ত উপাদান দেশকে যারা জুগিয়েছে, নিতান্ত মাথা-খারাপ না হলে তাদের সঙ্গে কেউ লড়াই করে না।"

মামী বল্লেন, "হ্যাঁ গো, তুমি উকীল হলে না কেন, নিশ্চয় ওরা তোমায় এড্‌ভোকেট জেনেরাল করে' দিত।"

বিষ্টু মামা বল্লেন, "তা হয়ত দিত। ইংরেজ গুণের আদর জানে।"

কিন্তু বিষ্টু মামা তাঁর গুণের আদর কর্‌বার কোনো সুযোগ ইংরেজকে কোন্‌দিন দেননি। চাকরীর উমেদার হয়ে কোনোদিন ইংরেজের দরজায় তিনি দাঁড়ান নি। বাল্যে ও যৌবনে ইংরেজের বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন, তারপর থেকে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ কোনোরূপ সম্পর্কই তাঁর আর ছিল না। দেশে ছোটখাট একটি জমিদারী ছিল, তারই আয়ে তাঁর চল্‌ত; জমিদারীর খাজনাও সরকারকে সাক্ষাতে তিনি দিতেন না, বড় সরিকেরা সরকারী খাজনা কেটে রেখে জমিদারীতে তাঁর অংশের আয় কল্‌কাতায় তাঁকে পাঠিয়ে দিত। মামলা-মোকদ্দমা যা কর্‌বার তাও তারাই কর্‌ত, সুতরাং বাইরের দিক্ দিয়ে বিষ্টু মামার অসহযোগ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ অপেক্ষা কিছুমাত্র কম ছিল না। অহিংস ত তিনি ছিলেনই,—মাছ-মাংসটা খেতেন, কিন্তু সে নিতান্ত নিরামিষ মুখে রুচ্‌ত না বলে'। তা সত্ত্বেও জীবহত্যা না করে' আমিষ-আহার চল্‌তে পারে কি না এ-বিষয়ে একবার তিনি গবেষণা করেছিলেন। তার প্রমাণ-স্বরূপ

ভেড়াকে বাঁধা থাক্‌তে দেখা যেত। বহুকাল আগে বিষ্টুমামা বহুযত্নে ক্লোরোফর্ম্ম-প্রয়োগে তার একটি পা য়্যাম্পুটেট্ করে' তাই দিয়ে ষ্টু তৈরী করে' খেয়েছিলেন। কিন্তু প্রক্রিয়াটি কিঞ্চিৎ ব্যয়সাপেক্ষ বলে' এবং খোঁড়া ভেড়াগুলিকে নিয়ে তারপর কি করা যাবে স্থির কর্‌তে না পেরে বিষ্টুমামা এই অহিংস আমিষ-আহারের চেষ্টা দ্বিতীয়বার আর কখনো করেন নি।

কিন্তু বাইরের দিকে নিজের এই অনিচ্ছা-অবলম্বিত অসহযোগের কোনো প্রতিকার তাঁর হাতে ছিল না, থাক্‌লে প্রতিকার তিনি কর্‌তেন। কাজেই একমাত্র অহৈতুক ইংরেজ-প্রীতির দ্বারা অন্তরের দিকে তিনি তার যতটা শোধ তোলা সম্ভব তা তুল্‌তেন। বিষ্টমামাও বয়কটে বিশ্বাস কর্‌তেন, কিন্তু তিনি বয়কট করেছিলেন, বিলিতি পণ্যকে অবশ্যই নয়, জাপানী পণ্যকেও নয়, তাঁর বাড়ীতে পুঁইশাক, পটল, ঢেঁড়শ, ইত্যাদি ছাড়া স্বদেশী কোনো জিনিষ সহজে ঢুকতে পেত না। যে-সব জিনিষ এম্‌নিতেই স্বদেশী সকলে ব্যবহার করে, বিলিতি বড়-একটা এদেশে আসেই না, বিষ্টুমামার দর্‌কার হলে তাও সংসার তোলপাড় করে' তিনি বিলিতি খুঁজে বের কর্‌তেন। তাঁর বাঁশের লাঠিটি ছিল বিলেতে পালিশ করা, বিলেত থেকে পার্শেল হয়ে তাঁর জন্যে নস্য আস্‌ত, দেশী চিতল, কই, বাটা ইত্যাদির চাইতে বিলিতি স্যামন্, সার্ডিন্ ইত্যাদি তাঁর বেশী মুখরোচক ত ছিলই, আপেল, ষ্ট্রবেরি, আঙুর ইত্যাদি যে-সমস্ত ফল দেশেও জন্মায়, তাও বিলেত থেকে টিনে প্যাক না হয়ে এলে তাঁর খেয়ে তৃপ্তিবোধ হত না।

বিষ্টুমামা বাংলা বই পড়েন না, একথা সদর্পে প্রচার কর্‌তেন। রবিবাবুর ইংরেজি বইগুলি লাইব্রেরীতে রাখা যেতে পারে কি না, এবিষয়ে বহুদিন তাঁর মনে একটা খট্‌কা ছিল,—সেগুলি বাংলার হুবহু অনুবাদ নয় জান্‌তে পার্‌বার পর নিঃসংশয় হয়ে এক সেট বই তিনি ক্রয় করেছিলেন, কিন্তু সেগুলিও আলমারির নীচের তাকেই প্রায় পড়ে' থাক্‌ত। দেশী ছবিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা সম্ভব নয় বলে' তাঁর বাড়ীতে দেশী ছবির জায়গা ছিল না।

নব্‌নেটার অসাধ্য কাজ নেই; এহেন মানুষের বাড়ীতে গান্ধী-টুপী মাথায় দিয়ে সে গিয়ে উঠল পিকেট কর্‌তে। "আপনাকে বিলিতি ছাড়তে হবে।"

এক টিপ বিলিতি নস্য নিয়ে বিলিতি আদ্দির রুমালে নাক মুছতে মুছতে বিষ্টুমামা বল্‌লেন, "স্বদেশী জিনিষ আমি ছুঁই না, বিলিতিও যদি ছাড়ি, আমার কি করে' তাহলে চল্‌বে?"

"আপনাকে স্বদেশী কিন্‌তে হবে।"

বিষ্টুমামা কেবল বল্‌লেন, "পয়সা দিয়ে? ছুত্তোর।"

নব্‌নে বল্‌লে, "না-হয় দেশী জিনিষ তুলনায় একটু খারাপই, তবু দেশী ত?"

"দেশী জিনিষ খারাপ হলেও যে দেশী তা ত আমি অস্বীকার কর্‌ছি না।"

"দেশী বলে'ই ত কেনা উচিত।"

"আমি বিলিতি জিনিষকে বিলিতি বলে'ই কিনে থাকি, সুতরাং যুক্তির দিক্ দিয়ে তোমার সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই।"

"কিন্তু দেশের লোকরা খেতে পায় না যে।"

"সে তাদের দোষ, আমার নয়। সকলে মিলে বিলিতি কেনা ছেড়ে দিলে বিলেতের লোকেরাও অনেকে খেতে পাবে না,—তাদেরও ত খেতে পাওয়াটা দেশী লোকের সমানই প্রয়োজন।"

"তবু দেশের কথা আগে ভাব্‌তে হবে।"

"দেশের কথা ভাব্‌লে ত আরোই দেশী জিনিষ কেনা চলে না।"

"কেন?"

"বেশী পয়সায় তুলনায়-নীরেস দেশী জিনিষ কিন্‌লে ইনেফিশিয়েন্সীকে প্রশ্রয় দিয়ে তাদের মাথা খাওয়া হবে। কোনোদিনই তারা আর কিছু করে' উঠতে পার্‌বে না।"

"কিন্তু কিছুদিন তাদের মাথা খেয়েও যদি দেশটা স্বাধীন হয়?"

"দেশ স্বাধীন? ছুত্তোর!"

নব্‌নে বল্‌লে, "আপনি মামীমাকে কি-সব বলে' বুঝিয়েছেন, আমি শুনেছি, কিন্তু আমি যদি প্রমাণ কর্‌তে

পারি যে, বিলিতি বর্জ্জন করে' ইংরেজদের সঙ্গে সবরকমে অসহযোগ করে' দেশকে স্বাধীন করা সম্ভব ?"

বিষ্টুমামা বল্‌লেন, "তা যদি প্রমাণ কর্‌তে পার তবে দেশী জিনিষ ত আমি আরোই কিন্‌ব না সুতরাং সেটা তোমার দিক থেকে পণ্ডশ্রম হবে।"

"কেন ?"

'সবে ত কথা বল্‌তে শিখেছ, আরও কিছুদিন যাক্, ইংরেজের সঙ্গে থেকে তাদের দেখাদেখি একটু মানুষের মত হতে শেখ, তারপর স্বাধীন হবার কথা ভেবো। এখনো যে-ইংরেজকে গালাগাল দাও, তার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালে নিজে থেকে তোমাদের শিরদাঁড়া নুয়ে পড়ে, সে হেসে কথা কইলে মনে মনে বর্ত্তে' যাও, দেশে যখন লড়াই তখনও সদ্দারি নিয়ে তোমাদের ঝগড়ার শেষ নেই, হিন্দু মুসলমানের, মুসলমান হিন্দুর ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে তামাসা দেখ্‌ছ, তেরো বছরের শিশু-কন্যাকে স্বামীর অঙ্কশায়িনী কর্‌তে পার্‌ছ না বলে' দেশসুদ্ধ লোক ধর্ম্ম গেল বলে' চেঁচাচ্ছ, এখনো বিদেশে গেলে গোবর খেয়ে তোমাদের জাতে উঠ্‌তে হয়, তোমরা স্বাধীন হলে আমায় ত দেশ ছেড়ে চলে' যেতে হবে। দেশী জিনিষ কিনে তাতে আমি সাহায্য কর্‌ব ? দুত্তোর !"

নব্‌নে বিষ্টুমামাকে ঢিপ করে' একটা প্রণাম কর্‌লে, বল্‌লে, "বিষ্টুমামা, দেশের কাজ কর্‌তে নাম্‌বার যোগ্যতা যে এখনো লাভ করিনি, আপনি সেটা আমায় বুঝিয়ে দিলেন। আপনার সব-ক'টা কথারই জবাব আছে, বাড়ী গিয়ে সেগুলি ভাব্‌ব, এবং ফিরে এসে জবাব না দিতে পারা পর্য্যন্ত আর কাজে নাম্‌ব না। যারা গান্ধীর হুকুম বলে' পিকেটিং মান্‌তে তৈরী হয়েই আছে তাদের পিকেট্ করা ত সোজা কাজ; আপনাকে দিয়েই আমার শক্তির পরীক্ষা হবে।"

(২)

কিন্তু নব্‌নের হাত থেকে যত সহজে বিষ্টুমামা নিষ্কৃতি পেলেন, মামীমা তাঁকে ঠিক ততটা সহজে নিষ্কৃতি দিলেন না। মামার সঙ্গে তর্ক করে' জিত্‌বার কোনো অভিপ্রায় যে তাঁর আছে তাঁর কোনো ব্যবহার দেখে' তা মনে হলো না, কিন্তু গোপনে গোপনে তাঁর বাক্স প্যাট্‌রা খদ্দরের শাড়ী, দেশী সাবান, দেশী মাথার তেল ইত্যাদিতে ভরে' উঠ্‌তে লাগ্‌ল। বিষ্টুমামার বয়স হয়েছিল, সুতরাং গৃহিণীর সাজসজ্জা ও অঙ্গরাগের পরিবর্ত্তনটা প্রথম কিছুদিন তিনি বেশী লক্ষ্য কর্‌লেন না। মামীমাও প্রথম-প্রথম যথেষ্ট সাবধান হয়েই চল্‌তেন, এমন মিহি সুতোর খদ্দর কিন্‌তেন যাকে সহজে খদ্দর বলে' চেন্‌বার উপায় ছিল না, সাবান খুলে রেখে সাবানের বাক্স ফেলে' দিতেন, পুরনো হেয়ার লোশনের বোতলে গন্ধতেল ঢেলে রাখ্‌তেন। কিন্তু একদিন হঠাৎ মামীমার শোবার ঘরে অসময়ে হাজির হয়ে তাঁকে একটা দেড়হাত লম্বা খটখটে কাঠের চরকাতে সুতো কাট্‌তে দেখে' বিষ্টুমামা মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে' পড়্‌লেন। বল্‌লেন, "ও কি হচ্ছে ?"

মামীমা বল্‌লেন, "দেখতেই ত পাচ্ছ।"

মামা বল্‌লেন, "ওসব চল্‌বে না।"

মামীমা বল্‌লেন, "বেশ ত চল্‌ছে। গোড়ায় একটু অসুবিধা হয়, যতটা সুতো কাটা হয় তার চেয়ে বেশী সুতো ছেঁড়ে। দুদিনেই অভ্যাস হয়ে যায়। আজ ত্রিশ নম্বর কাটছি।"

মামা বল্‌লেন, "ছি ছি, তুমি শেষটা চর্‌কায় সুতো কাটছ ? কেন, তোমার কিসের অভাব ?"

মামী বল্‌লেন, "চর্‌কাটারই অভাব ছিল, সেটা মিটেছে।"

মামা বল্‌লেন, "তোমায় সুতো কাটতে দেব না আমি।"

মামী খেইটা জড়িয়ে রেখে ঘুরে বসে' বল্‌লেন, "তোমাকে কি ভীমরতিতে ধরেছে ? আমি চর্‌কা কাটছি, তাতে তোমার কি ?"

মামা বল্‌লেন, "আমার কি মানে ? তুমি যা-খুশি তাই কর্‌বে, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব ?"

"না দেখ্‌তে চাও দেখো না। আমার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়াও ত তোমার কাজের অভাব নেই।"

"তাকিয়ে থাকার কাজটাই এর পর বাড়্‌ল।

তোমাকে যথেষ্ট চোখে চোখে না রাখাতে ত এতদূর গড়িয়েছে, এর পর কোন্‌দিন স্বদেশী বক্তৃতা করে' জেলে যাবে, সে আমি হতে দিতে পার্‌ব না।"

মামীমা বল্‌লেন, "তোমার সঙ্গে তর্ক করব না আমি, কিন্তু চর্‌কায় সুতো কেটে আমি কিছুমাত্র অন্যায় কর্‌ছি তা তুমি আমায় বোঝাতে পার্‌বে না।"

মামা বল্‌লেন, "আমিও তোমাকে বোঝাবার কোনো চেষ্টা করব না,—কিন্তু এ চল্‌বে না।"

"যদি চলে ?"

"আমিও চল্‌ব, যেদিকে দু চোখ যায়।"

মামী বল্‌লেন, "তোমারই উচিত ছিল সকলের আগে সত্যাগ্রহী হওয়া, কিন্তু দেশের যেমন অদৃষ্ট! আচ্ছা, এই রইল চর্‌কা। তোমার কাছে হারই মান্‌লাম।"

কিন্তু হার মান্‌বার মেয়ে মামীমা ছিলেন না। দেখা গেল, কেবল যে চর্‌কাই রইল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক-কিছুই তাকে তোলা হয়ে থাক্‌ল। বিষ্টুমামার ভোরবেলার ওম্‌লেট্‌ ওভ্যাল্‌টিন্‌ মামীমা স্বহস্তে তৈরী করে' দিতেন, হঠাৎ সেকাজের ভার বাড়ীর চাকরদের উপর গিয়ে পড়্‌ল, ওম্‌লেট্‌ পুড়ে কালো হয়ে যেতে লাগ্‌ল, ওভ্যাল্‌টিন্‌ দুধের সঙ্গে ভালো করে' মিশ্‌ল না, চাপ বেঁধে বেঁধে রইল, কিন্তু মামীমা কিছুতেই টল্‌লেন না। রান্নার কাজে আগে মাঝে-মাঝে তিনি যেতেন, অন্ততঃ চাকরদের কাজ দেখিয়ে দিয়ে আস্‌তেন, সেটা বন্ধ হয়ে গেল। বিষ্টুমামার মুখে কেবল যে নিরামিষই রুচ্‌ত না তা নয়, একটু রান্না খারাপ হলে কিছুই প্রায় তিনি মুখে তুল্‌তে পার্‌তেন না; দিনকের দিন বেচারা কৃশ হতে লাগ্‌লেন। তাঁর অন্য নানা খুঁটিনাটি আরামের সহস্র উপাদানের জন্যে সারাক্ষণ মামীর উপর তাঁকে নির্ভর করে' থাক্‌তে হ'ত, তার সব-ক'টাতে ব্যাঘাত ঘট্‌তে লাগ্‌ল। স্নানের সময় গরম জল পাওয়া যায় না, স্নানের ঘরে গামছা নিয়ে যেতে ভুল হয় এবং স্নানের শেষে ভিজে গায়ে সেটা ধরা পড়ে। দুপুরে দারুণ গরমে পাখা চলে না, সময়ে বিল্‌ দেওয়া হয়নি বলে' ইলেক্‌ট্রিক্‌ কোম্পানী তার কেটে দিয়ে যায়। মাথা ধর্‌লে নিজের হাতে নিজের মাথা টিপ্‌তে হয়। বোতাম হারিয়ে যায়, জামা ইস্ত্রি হয় না, এমনি-ধারা সব অঘটন ক্রমশঃ বেশী করে' ঘট্‌তে লাগ্‌ল।

বিষ্টুমামা বল্‌লেন, "তুমি কি শেষটা আমার সঙ্গেই অসহযোগ সুরু কর্‌লে? মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা কি এই ?"

মামী বল্‌লেন, "স্ত্রীলোকের কাছে তাদের স্বামীরাই একমাত্র মহাত্মা। আমি তোমার কাছেই শিক্ষা পেয়েছি।"

বিষ্টুমামা বল্‌লেন, "আমি তোমাকে কি এই শিক্ষা দিয়েছি যে কায়মনোবাক্যে স্বামীকে বর্জ্জন করে' চল্‌বে ?"

মামী বল্‌লেন, "তা জানি না, স্ত্রীর হাতে-কাটা সুতোতে যার আপত্তি, স্ত্রীর হাতে তৈরী অন্য-সব জিনিষে তার সমানই আপত্তি হওয়া উচিত। তুমি স্বদেশী বর্জ্জন কর্‌তে চাও, আমি তাতে তোমায় বাধা দিতে চাইনে। আমি নিজে যা করব, তাই যে স্বদেশী হবে।"

বিষ্টুমামা বল্‌লেন, "না না, তোমার কথা আলাদা, এসো, কাছে এসো দেখি লক্ষ্মীটি!"

মামী বললেন, "উঁহু! আমিও যে এই দেশেরই মেয়ে এবং সে-হেতু স্বদেশী, সেটা ভুলে গেলে চল্‌বে না।"

মামা বল্‌লেন, "নাঃ, এবারে তোমার কাছেই আমায় হার মান্‌তে হলো দেখ্‌ছি। আচ্ছা, তুমি চর্‌কা কাট্‌তে পাবে, কিন্তু ঐ চর্‌কাটা না, আমি তোমায় ভালো চর্‌কা এনে দিচ্ছি। ওটাকে তুমি বিদেয় করো। এমন কুৎসিত দেখ্‌তে।"

মামী বল্‌লেন, "ভালো চর্‌কাতে আমার আপত্তি নেই।"

কিন্তু একমাস কেটে গেলেও ভালো, মন্দ, বা ভালোমন্দের মাঝামাঝি কোনোরকম চর্‌কাই যখন এল না, তখন আবার গোলযোগ সুরু হলো। বিষ্টু-মামার মুখে কেবল এক কথা, "আস্‌ছে, চর্‌কা আস্‌ছে, এত উতলা হ'লে চলে ? ভালো জিনিষের জন্যে একটু ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করতে হয়।"

মামী বলেন, "ওসব তোমার চালাকি, ফাঁকি দিয়ে আমার চর্‌কাটাকে বাড়ী থেকে সরালে।

তুমি কি ভেবেছিলে চিরকালটাই আমি তোমার ফাঁকিতে ভুল্ব, বা বাজারে আর চর্কা কিন্তে পাওয়া যাবে না?"

সুতরাং দ্বিতীয়বার চর্কা এল, এবং দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীর মতই তার যথাযোগ্য স্থানের ঢের উপরে সে আসন লাভ করলে। মামী এখন সারাক্ষণই প্রায় সুতো কাটেন, চর্কা কাট্তে না দেওয়াতে অভিমান করে' যে-কাজগুলি তিনি অবহেলা কর্ছিলেন, এর পর চর্কা কাটার উৎসাহেই সে-গুলিতে নিদারুণতর অবহেলা ঘট্তে লাগ্ল।

বিষ্টুমামা থেকে থেকে আচম্কা "দুত্তোর" বলে' হাঁক দিতে লাগ্লেন, বিলিতি নস্যের কৌটো তাড়াতাড়ি খালি হয়ে যেতে লাগ্ল, কিন্তু বাড়ীতে দিবারাত্র চর্কা চলা সত্ত্বেও নিজে যেদিকে দুচোখ যায় চলে' যাবার সঙ্কল্পটাকে কাজে পরিণত কর্বার কোনো লক্ষণ দেখালেন না।

ঘরে সেঁটে বসে' চর্কার বিরুদ্ধে ষ্টেট্স্‌ম্যানের চিঠিপত্রের স্তম্ভে দিনের পর দিন অত্যন্ত উগ্ররকম সব লেখা পাঠাতে লাগ্লেন। স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে তাঁর চিরকালের যুক্তিগুলি নিঃশেষ হয়ে যাবার পর স্বাদেশিকতার স্বপক্ষ থেকেই নানা অকাট্য যুক্তির তিনি অবতারণা করতে লাগ্লেন। দেশের কাপড়ের কলের যে শিশু-ব্যবসা নানা প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে' ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠ্ছিল, চর্কা তাকে গলা টিপে মার্ছে এবং তার ফলে দেশের ভিতরের চাহিদা চর্কা দ্বারা ত মিট্বেই না, কলের কারবার নষ্ট হওয়াতে দেশের বাইরে থেকে উপার্জ্জনের যে পথ ছিল সেটাও বন্ধ হবে। সচ্ছল পরিবারের শিক্ষিতা মহিলার পক্ষে চরকায় সুতো কাটা যে সময় এবং সামর্থ্যের কতবড় অপব্যয় ইকনমিক্সের দিক্ থেকে অঙ্কশাস্ত্রের সহায়তায় তিনি সেটা প্রমাণ কর্লেন। দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি তার কাল্চারের সঙ্গে, এবং কাল্চার জিনিষটা মানুষের সৌন্দর্য্য-বোধের সঙ্গে কি প্রকার ঘনিষ্ঠ বন্ধনে জড়িত, সেটা সাব্যস্ত করে', খদ্দর যে দেশের লোকের সৌন্দর্য্য-বোধকে নিঃশ্বাস চাপা দিয়ে মার্ছে তা বলে' তিনি তাঁর পাঠকদের মনে ভীতি-সঞ্চার কর্বার চেষ্টা কর্তে লাগ্লেন।

কিন্তু পাঠক তাঁর সত্যিই কেউ ছিল কি না জানা সহজ ছিল না। জান্বার প্রয়োজনও তাঁর বিশেষ ছিল না। কাজটা আগাগোড়াই ছদ্মনামে চল্ছিল, লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জনের স্পৃহাও কিছু-মাত্র তাঁর ছিল না। রোজকার কাগজটি স্ত্রীর হাত পর্য্যন্ত পৌছলেই তিনি তাঁর শ্রম সার্থক জ্ঞান কর্তেন, কিন্তু বহুদিন ধরে' বহু শ্রম করা সত্ত্বেও মামীমার মত কিছুমাত্র বদ্লাল না। চর্কা সমানই চল্তে লাগ্ল।

পৃথিবীতে সব জিনিষেরই সীমা আছে, বিষ্টুমামার ধৈর্য্যেরও সীমা ছিল। যেদিন বিকেলে বেড়িয়ে বাড়ী ফিরে এসে তিনি দেখ্লেন তাঁর বাড়ীর সবকটা ঘরের জানালা থেকে শ্বেতপদ্মের পাপড়ির মতো স্নিগ্ধ ধবল দ্যুতিমান্ পর্দ্দাগুলি সরিয়ে তাদের জায়গায় খদ্দরের শাড়ী কাটা পর্দ্দা ঝুলানো হয়েছে, বসবার ঘরের চেয়ারগুলির উপরে সাটিনের উপর জরীর ফুলকাটা কুশনগুলির জায়গায় তুলো-ভরা খদ্দরের পুঁটুলি বিরাজ করছে, খদ্দরের শাড়ী জুড়ে টেবিল-কভার তৈরি হয়েছে, বহুমূল্য চৈনিক ফুলদানির স্থানে কাঁসার ঘটি অধিষ্ঠিত হয়েছে, সেদিন তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারেই ভাঙ্ল। নিজের ওপর কোনো শাসনই সেদিন আর তাঁর রইল না। দুহাতে জান্লা-দরজায় ঝুলানো পর্দ্দাগুলি টেনে ছিঁড়ে, টেবিল-কভার উঠিয়ে, খদ্দরের কুশন্গুলি সমেত সব তিনি ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাড়ীর সাম্নের রাস্তায় ফেল্তে লাগ্লেন। তারপর নীচে নেমে সেগুলিকে এক জায়গায় জড়ো করে' কেরোসিন ঢেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। দেখ্তে দেখ্তে সেখানে দস্তুর-মত লোকের ভিড় জমে' উঠ্ল। সবাই দিব্য নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করে' নিল বিষ্টুমামা বিলিতি বস্ত্রের বন্‌ফায়ার্ করছেন। শতকণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠ্ল, "বল মহাত্মা গান্ধীকি জয়!" আশপাশের বাড়ীর জানলা থেকে পুরনো ছেঁড়া

বিলিতি কাপড়ের পুঁটুলি ঝুপ ঝুপ করে' সেই আগুনের ওপর পড়তে লাগল। বিষ্টুমামার উচ্চকণ্ঠের প্রতিবাদ সেই গোলমালে কারুর কানেই গেল না।

হঠাৎ দেখা গেল বিষ্টুমামার বাড়ীর চাকররা ধরাধরি করে' একটা বেশ বড় প্যাকিং কেস্ রাস্তায় নামিয়ে নিয়ে আস্‌ছে। সেটাকে অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে রেখে বেশ করে' কেরোসিন ঢেলে কাঠ-কুটো জড়ো করে' তারা নতুন করে' আবার আগুন ধরিয়ে দিল, আবার শত কণ্ঠের চীৎকারে গগন বিদীর্ণ হতে লাগ্‌ল, "বল মহাত্মা গান্ধীকি জয়!" বিষ্টুমামা সেই ভিড় ঠেলে চাকরদের একজনের কাছ থেকে আর-একজনের কাছে ছুটোছুটি করতে করতে উত্তেজিত স্বরে ক্রমাগত প্রশ্ন করতে লাগ্‌লেন, "ওটা কি রে, ওটা কি?"

সেটা যে কি তারা কেউ তা বল্‌তে পার্‌লে না। কেবল জানা গেল, মাইজী সেটাকে এনে আগুনে দিতে বলেছেন।

ত্রস্তে উপরে গিয়ে বিষ্টুমামা চীৎকার করে' জিজ্ঞেস কর্‌লেন, "কাঠের বাক্সে করে' কি পাঠিয়েছ আগুনে দেবার জন্যে?"

মামী বল্‌লেন, "আমার মুণ্ডু।"

মামা বল্‌লেন, "সেটা আগুনে দিয়েছ ত অনেকদিন আগেই, আজকেরটা কি?"

মামী বল্‌লেন, "আর-একটু দেরি কর্‌লেই দেখ্‌তে পেতে, কাঠের বাক্স পুড়ে যেতে বেশীক্ষণ লাগে না। ভালো জিনিষের জন্যে এইটুকু ধৈর্য্য-সহকারে অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না?"

বিষ্টুমামা গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে বল্‌লেন, "এ তোমার জন্যে বিলেত থেকে অর্ডার দিয়ে আনানো চর্‌কাটা নয়?"

মামী বল্‌লেন, "চর্‌কাই বটে, জিনিষটাও বেশ, পাছে ব্যবহার করতে লোভ হয় তাই পুড়িয়ে দিচ্ছি। লোহার জিনিষ, তবু আগুনে পুড়্‌লে খানিকটা নষ্ট হবেই, কাঠও জায়গায় জায়গায় আছে।"

মামা বসে' পড়ে' বল্‌লেন, "কী সর্ব্বনাশ! ওটার

মামী বল্‌লেন, "তাও জানি। ঐ যে টমাস কুকের কাগজপত্র সব ঐখানে পড়ে' আছে। ওগুলিতে তোমার কাজ থাক্‌তে পারে ভেবে আমি আর পোড়াইনি।"

বিকৃত কণ্ঠে মামা বল্‌লেন, "তোমার অনুগ্রহ!"

তারপর মামীমা গুনগুন করে গান কর্‌তে কর্‌তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে দরজায় খিল দিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসে' পড়ে' বল্‌লেন, "তুত্তোর!"

(৩)

এর পর বিষ্টুমামা মরীয়া হয়ে উঠ্‌লেন। এমন যে ষ্টেট্‌সম্যান্ সেও তাঁর লেখা আর ছাপ্‌তে চায় না দেখে' নিজে খরচ করে' পুস্তিকা ছাপাতে লাগ্‌লেন। স্বদেশীর বিরুদ্ধে ঘরের সংগ্রামে পরাজিত হয়ে, ঘরের বাইরে অকস্মাৎ অহীরাবণের মত অমিত-পরাক্রমে তিনি লড়্‌তে লাগ্‌লেন। ছদ্মনামটি নানা কারণে অবশ্য বাহাল রইল। কিন্তু একাজেও বাধা ঘট্‌তে লাগ্‌ল। দেশী ছাপাখানার মালিকেরা ছাপ্‌তে অস্বীকার কর্‌তে লাগ্‌ল, সাহেবদের ছাপাখানার শরণাপন্ন হয়ে সে-সমস্যা মিট্‌ল। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, পুস্তিকা ছাপা হয়ে পড়ে' থাকে, সেগুলি বিলি কর্‌বার লোক পাওয়া যায় না, মার খাওয়ার ভয়ে কেউ সেগুলি নিতে চায় না। নূতন লোক পাক্‌ড়াও করে' করে' কিছুদিন চল্‌ল, অবশেষে দেখা গেল বিলি কর্‌বার লোক পাওয়া সত্ত্বেও সেগুলি আর বিলি হয় না, বিনি-পয়সার জিনিষ হলেও কেউ সেগুলি নিতে চায় না।

এমনি অবস্থায় বিষ্টুমামাকে বাধ্য হয়ে গোলদীঘিতে তাঁর প্রথম বিদেশী বক্তৃতা দিতে যেতে হলো। ছদ্মনামের আড়ালটা আর রাখা চল্‌ল না।

বিষ্টুমামার চেহারাতে এমন-একটা কিছু ছিল যাতে তিনি যত বেশী গম্ভীর হতেন তাঁকে দেখে' লোকের তত বেশী হাসি পেত। দেখ্‌তে যে তিনি কুৎসিত ছিলেন তা নয়। পরিষ্কার গায়ের রঙ, পাঁচফুট সাড়ে-আট ইঞ্চি লম্বা, একহারা চেহারা, সবল মাংসপেশী, নাক মুখ চোখ মোটামুটি ভদ্র বাঙালীর যে-রকম হয়ে

পাটের আপিসের বড়-সাহেবদের মত সারাক্ষণ বদমেজাজী থেঁকী মুখ করে' থাকা দরকার, নয়ত তাদের এফিমিনেট দেখায়। তাঁর মুখের যে একটি স্বভাব-সুলভ কমনীয় শ্রী ছিল, বড়সাহেবী মুখভঙ্গিটা তার ওপর একেবারেই মানাত না বলে' তাঁকে দেখতে ভারি মজার লাগ্ত, কিন্তু বিষ্টুমামা সেটা বুঝ্তেন না এবং সেই কারণেই তাঁকে আরো বেশী মজার লাগ্ত। গোলদীঘির যে বেঞ্চিটার উপর তিনি বক্তৃতা দেবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন, দেখ্তে দেখ্তে তাঁর সাম্নে কৌতূহলী লোকের ভিড় জমে' গেল। স্বাদেশিকতার বিপদ্ সম্বন্ধে বিষ্টুমামা তাঁর প্রথম বক্তৃতা সুরু করলেন।

দেখা গেল শ্রোতারা অবহিত হয়ে শুন্ছে। বিষ্টু-মামার উৎসাহ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তাদেরও উৎসাহ বাড়্তে লাগ্ল, ঘন ঘন করতালি পড়্তে লাগ্ল। এতদিনকার সঞ্চিত সমস্ত চিত্তবেগকে বাগ্মিতার স্রোতে লঘু করে' নিয়ে ঘর্ম্মস্রোতে দেহ প্লাবিত করে' তিনি যখন বেঞ্চি থেকে নাম্লেন তখন করতালির শব্দ কিছুক্ষণ ধরে' থাম্তে চাইল না। শব্দ একটু কম্লে শ্রোতাদের মধ্যে বিষ্টুমামার পরিচিত এক ব্যক্তি বেঞ্চির উপরে বিষ্টুমামার পরিত্যক্ত জায়গাটাতে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর দুহাত তুলে সকলকে নিবৃত্ত হতে বলে', বল্লেন, "আপনাদের সকলের তরফ থেকে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণবাবুকে আমি তাঁর আজকের এই পরম উপভোগ্য বক্তৃতার জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিষ্ণুচরণবাবুর বাগ্মিতা অসাধারণ। আমাদের দেশের শাসকসম্প্রদায়ের মনের কথাটি আগাগোড়া ব্যঙ্গচ্ছলে তিনি এমন আশ্চর্য্য সুকৌশলে ব্যক্ত করেছেন, যে, মনস্তত্ত্বে অদ্ভুত পারদর্শিতা এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে কারও পক্ষে তা সম্ভবই নয়। যাদের সঙ্গে লড়্ব, সারাক্ষণ তাদের এক-তরফা গালাগালি না দিয়ে তাদের বুঝ্তে চেষ্টা করলে যে লড়াই জেতা সহজ হয় তা আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন। বিষ্ণুচরণবাবু ধন্য, যে, তিনি সেইটে বুঝে, সেইদিক্ থেকে দেশকে সেবা করবার জন্যে অগ্রসর হয়েছেন। আপনারা বলুন সকলে, মহাত্মা

সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত রণিত হতে লাগল, "মহাত্মা গান্ধীকি জয়, বল মহাত্মা গান্ধীকি জয়!" বক্তৃতামঞ্চের সাম্নের ভিড় ক্রমে আরও বাড়তে লাগল, কিন্তু বিষ্টু-মামাকে সে ভিড়ের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। এর পর পুলিশ এল, লাঠি charge হলো, যারা বক্তৃতা শুনতে এসেছিল, তারা কেউ ভাঙা হাত, কেউ ফাটা মাথা নিয়ে বাড়ী ফিরলে, বিষ্টুমামা তখন দরজায় খিল দিয়ে বসে' তাঁর পরবর্ত্তী বক্তৃতার জন্যে নোট লিখছেন। পাশের ঘরে চর্কার শব্দে তাঁর কাজের উৎসাহ বাড়ছেই।

রাশীকৃত অকাট্য যুক্তির নোট নেবার অবকাশে বিষ্টুমামা ঠিক করলেন, কাপড়ের দোকানে পিকেট করতে বেরুবেন। নিজের জন্যে বিলিতি কাপড়-চোপড় কিছু কিছু কেন্বার দরকার ছিল, কাছাকাছি একটা দোকানেও বিলিতি কাপড় পাওয়া যায় না; স্থির করলেন বাজার ঘুরে প্রয়োজনীয় কাপড় সংগ্রহ করবেন, সঙ্গে সঙ্গে বিলিতির জন্যে প্রপ্যাগ্যাণ্ডা করে' ফিরবেন। শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না, এবারে কাজের আসরে নাম্তে হবে। গিন্নীকে দেখাতে হবে যে, গৃহে যে-অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে তার মূলটা সত্যিই কত গভীরতার জায়গায়, তিনি যা অনুভব করেন তা সত্যিই কত নিবিড় করে' অনুভব করেন।

বিলিতি কাপড়ের সন্ধানে সমস্ত দিন বিষ্টুমামা দোকানে দোকানে ঘুরতে লাগ্লেন।

"বিলিতি কাপড় আছে?"

"না মশাই না, কতবার আর বল্ব? একমাস ধরে' ত বল্ছি।"

"কেন রাখেন না?"

"এও ত মুস্কিল কম নয়। শুধু না-রেখেই নিস্তার নেই, আবার কেন রাখি না তার কারণগুলোও এর পর আওড়াতে হবে। আমাদের এত কথা বল্বার সময় নেই, যান্।"

আর এক দোকানে ঢোকেন।

"বিলিতি কাপড় আছে?"

"কজন বেরিয়েছি মানে ?"

"পিকেট করতে ক'জন বেরিয়েছেন, তাই জানতে চাচ্ছি।"

"আমি একলাই। আপনি যা মনে করেছেন তা নয়, আমি স্বদেশীদলের কেউ নই। বিলিতি কাপড় কেন আপনাদের রাখা উচিত তাই আপনাদের বলতে বেরিয়েছি।"

"ও! চিনেছি মশায় এতক্ষণে। আপনি বিষ্টুচরণ-বাবু, না? সেদিন গোলদীঘিতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন? হাঃ হাঃ! এত ফিকিরও আপনার মাথায় আসে মশায়। পিকেটও করা হবে অথচ পুলিশও কিছু বলতে পারবে না, বেড়ে! পোষাকসুদ্ধ আগাগোড়া বিলিতি করে' এসেছেন, হাঃ হাঃ! বসুন, বসুন ভালো করে'। পান আনিয়ে দিচ্ছি। বলুন ত আপনার কথাগুলো, কেন বিলিতি কাপড় আমাদের রাখা উচিত? ওরে মনোরঞ্জন! ওরে ও হরিকিশোর! এদিকে আয় শীগগির! মজা আছে।"

রেগে মুখচোখ লাল করে' বেরিয়ে এসে তিনি অন্য দোকানে ঢোকেন। রাগটা ভালো করে' না পড়তেই জিজ্ঞেস করেন, "বিলিতি কাপড় আছে?" গলার স্বরে মেজাজের তাপটা ধরা পড়ে।

দোকানী বলে, "উঃ, তম্বি দেখ না। যদি বলি আছে, তাই কি?"

"আছে কি না জানতে চাই।"

"আপনি জানতে চাইবার কে?"

"আমার দরকার আছে।"

"না, দরকার নেই।"

"আমি বলছি আছে, আর আপনি বলছেন নেই?"

"হ্যাঁ, আমি বলছি নেই। একশোবার বলছি নেই।"

"ভালো জালা! আমি বিলিতি কাপড় কিনতে চাই মশাই, কোথায় আছে বিলিতি কাপড় বার করুন।"

"বার করছি; ওরে ভূতো, ডাক ত পুলিশ, মোড়ের কাছেই আছে দেখতে পাবি। চালাকিটা বার করছি। রোজ পাঁচবার আসবে জ্বালাতন করতে, আবার ঢং করে' বলছে, বিলিতি কাপড় কিনতে চাই মশাই! ডাক পুলিশ।"

"পুলিশ, পুলিশ!"

বিষ্টুমামা বাড়ী এসে আবার দরজায় খিল দেন। দ্বিতীয় বক্তৃতার নোট নেওয়া চলতে থাকে।

কিন্তু পাশের ঘর থেকে চরকার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আজ চুড়ির রুনুঝুনু কানে আসে এবং আজ তাতে কাজের ব্যাঘাত হয়। বহুকাল পরে সেই শব্দের আঘাতে বুকের রক্ত বায়ুস্পৃষ্ট দীপ-শিখার মত চঞ্চল হয়ে কাঁপে। দুটি হাস্যস্ফুরিত অধরোষ্ঠ এবং প্রীতিভারনমিত স্নিগ্ধ চোখ মনে করে' দেশী-বিদেশীর বিরোধ, প্রবন্ধ, বক্তৃতা, পিকেটিং, সমস্ত-কিছুকে তার পাশে অত্যন্ত অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন পাগলের প্রলাপ বলে' বোধ হতে থাকে। আর এই পৃথিবী, কি নিষ্ঠুর মমতাহীন এর বাইরেটা। কেবল ভিড়, কেবল ঠেলাঠেলি, একটা বিপুলাকার গুরুভার জগদ্দলপাথরের রোলার টেনে সকলে চলেছে, দাঁড়িয়ে কারও সঙ্গে ভালো করে' চোখ-চাওয়াচাওয়ি করবার উপায় নেই, অমনি চাপা পড়তে হয়। কেউ কারুকে কাছে ডাকে না, কেউ কারুকে বুঝতে চেষ্টা করে না, বলবার কথা শেষ হবার আগে করতালি দিতে থাকে, ভালো করতে গেলে মন্দ বোঝে। আজ একটু স্নেহসমবেদনার জন্যে তাঁর শুষ্ক চিত্ত থেকে থেকে হাহাকার করে' উঠতে লাগল।

কতকাল গৃহিণীকে কাছে পাননি, ভালো করে' তাঁর মুখের দিকে তাকান নি, হেসে দুটো কথা বলেন নি। তিনি নিঃসন্তান, সংসারে তাঁর মনের আর ত কোনো অবলম্বনই নেই।

রাত্রিতে আহারাদির পর সন্তর্পণে মামীমার শয়ন-মন্দিরে এসে ঢুকলেন। দেখলেন, মামীমা চরকার সুতো নাটাইয়ে জড়িয়ে রাখছেন। যেন কোথাও কিছু হয়নি এমনি গম্ভীরভাবে মামী বললেন, "দেখছ সুতো?"

মামা বললেন, "হুঁ, ঐ দিয়ে আমার জন্যে দড়ি তৈরি হবে, আমি গলায় দেব।"

সেকি কথা গো, দড়ি কি? এমন মস্‌লিনের মত মিহি সুতো—”

মামা বল্‌লেন, “দেখো গিন্নি, ঠাট্টা না, তুমি কি শেষ পর্য্যন্ত আমার একটা বিপদ না ঘটিয়ে ছাড়বে না?”

মামীমা সত্যই একটুখানি ভয় পেলেন বলে’ মনে হলো, বল্‌লেন, “কেন, আমি আবার কি করেছি?”

মামা বল্‌লেন, “কি করনি? দিনরাত চর্‌কা কাটছ, বাড়ীটাকে খদ্দরের গুদোম করে’ তুলেছ, আরও কি কর্‌তে বাকী আছে?”

মামী বল্‌লেন, “এর মধ্যে তোমার বিপদটা কোন্‌খানে?”

বিষ্টুমামার কানে তখনও বড়বাজারের দোকানীর সক্রোধ তর্জ্জন থেকে থেকে বাজ্‌ছিল, বল্‌লেন, “আমার বিপদটা যে কোন্‌খানে তা যদি তুমি বুঝ্‌তেই পার্‌বে তাহলে আর এদশা আমার হবে কেন?”

মামী বল্‌লেন, “কি হয়েছে শুনিই না?”

মামা বল্‌লেন, “কি আবার হবে, যেদিন হবে সেদিন আর আমায় কষ্ট করে’ এসে খবর দিতে হবে না। বাপ, আজ মার খেতে খেতে বেঁচে এসেছি।”

মামীমা একটু ভেবে বল্‌লেন, “ও, বুঝেছি। তা লোকে স্বদেশীর জন্যে দলে দলে এত মার খাচ্ছে, তুমি বিদেশীর জন্যে একটু খাও না? দেশকে যারা ঠগী বর্গীর অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছে, খাল কেটেছে, রাস্তা বেঁধেছে, তাদের পক্ষ হয়ে না-হয় দু’একঘা খেলেই, তাতে তাদের জন্যে তোমার ভালবাসাটা একটু প্রমাণ হবে। দেশ স্বাধীন হ’লে যে অঘটনগুলো ঘট্‌বে বলে’ বিশ্বাস কর, তার প্রতিবিধানের জন্যেও ত তোমার লড়া উচিত।”

“আমি ত লড়্‌ছিই।”

“একে কি আর লড়াই বলে? লড়্‌তে গেলে মার খাওয়াকে ভয় কর্‌লে চ’লে না।”

“আমি মার খাই, সেইটেই তুমি তাহলে ইচ্ছে কর?”

“আমার ইচ্ছা অনিচ্ছাতে কিছু যায় আসে না। আমি ইচ্ছা না করলেও মার দেবার লোকের হয়ত অভাব হবে না।”

পূর্ব্বেই বলেছি, বিষ্টুমামার ধৈর্য্যেরও সীমা ছিল। হঠাৎ তাঁর গায়ের রক্ত টগবগ করে’ ফুটতে লাগ্‌ল। কাঁপা গলায় বল্‌লেন, “আমায় মার্‌বে, আমায়?”

মামী নাটাইটাকে কাপড়ের আল্‌মারির উপর উঠিয়ে রাখ্‌তে রাখ্‌তে বল্‌লেন, “তা বেশী বাড়াবাড়ি কর্‌লে মার্‌তেও পারে।”

মামা বল্‌লেন, “মেরে দেখুক না।”

মামী বল্‌লেন, “তুমি তাদের যা দেখাবে তা মার খাবার পরে ত?”

মামা বল্‌লেন, “বটে! আচ্ছা, দেখি কার বাবার সাধ্যি আমায় মারে। মারা অম্‌নি কথার কথা কি-না? মার্‌লেই হলো! মার্‌বে, আমায় মার্‌বে, আচ্ছা দেখ্‌ব, কালই দেখ্‌ব।”

বীরপদভরে বাড়ী কাঁপিয়ে বিষ্টুমামা তখনই নিজের শোবার ঘরটায় এসে দরজায় খিল দিলেন। ‘তুক্তোর’ বলে’ হাঁক দিতে গিয়েও দুঃখে অপমানে লজ্জায় হাকটা গলার কাছে এসে বাধ্‌ল। বহু রাত অবধি চোখে ঘুম এল না, শূন্য শয্যায় এপাশ-ওপাশ কর্‌তে কর্‌তে কালকের অভিযানের জন্যে নানা ফন্দি আঁট্‌তে লাগ্‌লেন।

(৪)

পরদিন খুব ভোরে উঠেই বিষ্টুমামা তাড়াতাড়ি সাহেব-বাড়ীর ছাপাখানায় গিয়ে তাঁর দ্বিতীয় বিদেশী বক্তৃতার হ্যাণ্ডবিল্‌ ছাপিয়ে নিয়ে এলেন। বেলা দশটার মধ্যে সে হ্যাণ্ডবিল ২০,০০০ কল্‌কাতার পথে পথে বিলি হয়ে গেল।

বিদেশী পণ্যের স্বপক্ষে

বিস্ময়কর চিত্তবিভ্রান্তকারী বক্তৃতা

বক্তা

শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ

অদ্য সন্ধ্যা সাড়ে-পাঁচ-ঘটিকায় কলেজ স্কোয়ারে

—

ইহা হাস্যরসাত্মক নহে, হাস্যরসাত্মক নহে,

যুক্তিতর্ক ও সূক্ষ্মবিচারের সাহায্যে

সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সরল প্রয়াস

শহরে শহরতলীতে ঘরে বাইরে হাটে বাজারে দস্তরমত একটা সাড়া পড়ে’ গেল। পথের মোড়ে মোড়ে লোক জটলা করে’ সন্ধ্যার বক্তৃতা আলোচনা করতে লাগ্‌ল। ব্যাপারটা যারা বুঝ্‌তে পার্‌ল না, অন্যেরা তাদের বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌ল। সমস্ত দিন হ্যাণ্ড্‌বিল্‌গুলি লোকের হাতে হাতে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল!

বাড়ী এসে বিষ্টুমামা পুলিশ-কমিশনারকে চিঠি লিখ্‌লেন। তিনি যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কত-বড় হিতার্থী বন্ধু, সমস্ত জীবন তিনি যে বিলাতী ভিন্ন অন্য কোনো-জাতীয় দ্রব্য স্পর্শ করেন নি, ইংরেজ-রাজত্বকে তিনি যে এদেশের কল্যাণের পক্ষে অপরিহার্য্য বলে’ বিশ্বাস করেন, এসমস্ত কথা বিশদভাবে ব্যক্ত করে’ তিনি তাঁর সেদিনকার সন্ধ্যার বক্তৃতার উদ্দেশ্যের কথা সবিস্তারে লিখ্‌লেন। তারপর লিখ্‌লেন, ইংরেজ-সরকারের এতবড় বন্ধুর যাতে কোনো বিপদ্ না হয়,ইংরেজ-সরকারের তা দেখা উচিত, এবং তিনি আশা করেন, তাঁকে সভাস্থলে আততায়ীর আক্রমণ থেকে প্রয়োজন হলে রক্ষা করবার জন্যে উপযুক্তসংখ্যক অস্ত্রধারী পুলিশ দেহরক্ষী তাঁকে দেওয়া হবে।

বক্তৃতার সময়ের ঘণ্টা-দুই আগে পুলিশ-আপিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জান্‌লেন, তাঁর ভয়ের কোনো কারণ নেই, সভায় পুলিশ রাখ্‌বার ব্যবস্থা তাঁর চিঠি পৌছবার আগে থাক্‌তেই করা হয়েছে, অস্ত্রধারী পুলিশও সেখানে থাক্‌বে।

বাড়ী ফির্‌বার পথে গোলদীঘির ধার হয়ে এলেন। দেখ্‌লেন, তত আগে থাক্‌তেই কিছু কিছু করে’ লোক জমা হচ্ছে। বড় বড় তৈলপক্ক বাঁশের লাঠি হাতে তিন দল পুলিশ স্কোয়ারের তিন দিকের পথের পাশে ঘাঁটি করেছে। নিশ্চিন্ততায়, সাহসে, গর্ব্বে বিষ্টুমামার বুক তিন হাত উঁচু হয়ে উঠ্‌ল। মোটরে আয়েস করে’ গা এলিয়ে বসে’ তিনি এক পায়ের উপর আর-এক পা তুলে তাতে ঘনঘন হাত বুলাতে লাগ্‌লেন।

সাড়ে-পাঁচটায় বক্তৃতা সুরু হলো। গোলদীঘি

দেখাতে পার্‌লেন না! তা হোক; খবরের কাগজগুলিতে যাতে তাঁর বক্তৃতার রিপোর্ট ঠিক ঠিক বেরোয় রাত্রে সব-ক’টা কাগজের আপিসে ঘুরে তিনি তা দেখ্‌বেন। কোনো খুঁটিনাটি বাদ গেলে চল্‌বে না।

বক্তৃতার তোড়ের মুখে, ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সাহিত্য সভ্যতা, তার বহুসহস্রবর্ষব্যাপী ইতিহাস, তার রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, কংগ্রেস, গান্ধী, অসহযোগ, সমস্ত-কিছু প্লাবনের মুখে তৃণের মত অবলীলায় ভেসে যেতে লাগ্‌ল। এতদিন ধরে’ স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে যেখানে যতকিছু যুক্তি তিনি প্রয়োগ করেছেন আজ এক-এক করে’ সবগুলির পুনরুক্তি কর্‌লেন, কিন্তু এমন আশ্চর্য্য জোরের সঙ্গে, এমন মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় মণ্ডিত করে’ কর্‌লেন, যে, নিজের কৃতবিদ্যতায় নিজেরই তাঁর আশ্চর্য্য বোধ হতে লাগল। বল্‌তে লাগ্‌লেন আর তাঁর মনের মধ্যে ছাপার হরফে সেগুলি সাজানো হতে লাগল, আর তাঁর গিন্নি চর্‌কা ফেলে’ উদ্দীপনামণ্ডিত মুখে ঝুঁকে পড়ে’ তা পড়তে লাগলেন। জনসমুদ্রও কিসের উদ্দীপনায় থেকে থেকে চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল, কিন্তু তারপরই কানাকানি, চোখের ইসারা, হাতের ইঙ্গিত—আবার মন্ত্রবলেই যেন সে চাঞ্চল্যও প্রশমিত হয়ে যেতে লাগ্‌ল। বিষ্টুমামা নিঃসন্দেহে বুঝ্‌লেন, আজ আগে থাক্‌তে পুলিশ রাখার ব্যবস্থা করাতেই এরকম হচ্ছে। উৎসাহে তাঁর মনের বাঁধন মুখের বাঁধন আরোই আল্‌গা হয়ে যেতে লাগল।

দুইঘণ্টা ধরে’ আশ্চর্য্য বাগ্মিতার সাহায্যে বহু বিচিত্র ও সূক্ষ্ম তর্কের জাল বিস্তার করে’ বিষ্টুমামা এই বলে’ সে জাল গুটিয়ে তুল্‌লেন, যে, অন্য-সব কথা ছেড়ে দিলেও, ইংরেজ যে দেশশাসনরূপ অতি গুরুতর দায়িত্ব-পূর্ণ ও গুরুভার বোঝা বহন করার থেকে আমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন কেবল সেই কারণেই তাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ইংরেজ খেটে মর্‌ছে, আমরা আরামে তাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ কর্‌ছি; তারা লড়াই করে মর্‌ছে, আমরা নিরুপদ্রব শান্তিতে জীবনধারণ কর্‌ছি; তারা কাপড় বুনছে, আমরা সেই ফিনফিনে

মানুষ, বসে' থাক্‌লে তাদের গায়ের রক্ত জমে' যায়, তারা খাটুক, খাটুনীটা তাদের, আমীরিটা আমাদের, আমাদের জাত আমীরের জাত, আমাদের দুঃখ কিসের? আমীরি কর্‌তে পেলে খেটে মর্‌তে কে চায়? লাভ ত সবদিকে আমরাই কর্‌ছি। এ ব্যবস্থা উল্টে দেবার চেষ্টা করার চেয়ে মূর্খতা কি আর আছে?

বক্তৃতা শেষ হতেই আজ আবার অযুত কণ্ঠে মহাত্মা গান্ধীর জয়ধ্বনি উঠে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত কর্‌তে লাগল। বিষ্টুমামা বেঞ্চির থেকে মহাবিরক্তিপূর্ণ মুখে নীচে নেমে পড়্‌লেন, তাঁকে দেখবার জন্যে শ্রোতাদের মধ্যে বিষম ঠেলাঠেলি সুরু হলো। বিষ্টুমামা দু'হাতে সেই ভিড় ঠেলে বেরুতে চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হতে পার্‌লেন না। চারদিক্ থেকে সকলে তাঁকে এমন ভাবে চেপে রইল যে, তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার জো হলো। 'বেশ বক্তৃতা হয়েছে," "বড় আমোদ পেয়েছি," "আপনি সব কথাকে এত সুন্দর ঘুরিয়ে বলতে পারেন," "যাদের বুঝবার তারা সব ঠিকই বুঝবে," ইত্যাকার বাক্যে সকলে মহা উৎসাহে তাঁকে অভিনন্দিত কর্‌তে লাগল।

বিষ্টুমামার রক্ত আবার গরম হয়ে ওঠে, চেঁচিয়ে বলেন, "আপনারা ভুল কর্‌ছেন, এ হাসির কথা নয়। আমি হাস্যরস সৃষ্টি কর্‌বার জন্যে একটা কথাও বলিনি।"

শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজন উঠে বলে, "ভাই-সব, বিষ্টুচরণবাবু ঠিক কথাই বলছেন। তোমরা যেটাকে হাসির কথা মনে কর্‌ছ, তা হাসি সত্যিই নয়, তার সবটাই কান্না। বিষ্টুচরণবাবু দেশের দুঃখে হাসির ছল করে' আজ কেঁদেছেন। তাঁর দুঃখ যে কত বড় তা এই থেকেই তোমরা বুঝতে পার্‌বে, যে, সে-দুঃখে কাঁদ্‌বারও তাঁর অধিকার নেই—"

এমন সময় ভিড় ঠেলে একদল পুলিশ এগিয়ে এল এবং বক্তৃতামঞ্চে উঠে বক্তাকে গ্রেপ্তার কর্‌লে। জনতা উদ্দাম আবেগে চীৎকার কর্‌তে লাগল, 'মহাত্মা গান্ধী-কি জয়।"

বিষ্টুমামার মুখে এতক্ষণে একটু হাসি ফুটে উঠল। চাদরটাকে টেনে ভালো করে' গায়ে জড়িয়ে তিনি পুলিশকে দুই চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে সম্বর্দ্ধনা কর্‌লেন, তারপর জনতার মধ্যে একটা ফাঁক আবিষ্কার করে' সেদিক্ দিয়ে প্রস্থান কর্‌বেন ভাবছেন এমন সময় আর-একদল পুলিশ এসে তাঁকেও ঘেরাও করল। বিষ্টুমামা বিস্মিত আতঙ্কে মুখ ভরে' তুলে বললেন, "সে কি, আমায়?"

পুলিশের দারোগা বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনিই ত আজকের বড় আসামী।"

বিষ্টুমামা বললেন, "নিশ্চয়ই আপনারা একটা ভুল করেছেন, আমার নাম Bestow Churn Gosse।"

দারোগা পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে' দেখে' বললে, "হ্যাঁ, ঠিকই হয়েছে। বেষ্ট চার্‌ন্ গস্-ই বটে।"

বিষ্টুমামা একবার চারিদিকে তাকিয়ে তিনি জেগে আছেন, না ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখছেন, সেটা ধারণা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লেন। তারপর আচম্‌কা হাঁক দিয়ে উঠলেন, "দুত্তোর!"

লালবাজারের হাজতে বসে' শুন্‌তে লাগলেন, বাইরে জনতা ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে চীৎকার করছে, "বল মহাত্মা গান্ধীকি জয়," "বল বিষ্টুচরণ ঘোষ-কি জয়।" বহুতর লাঠির ফটাফট শব্দ শুনতে পাওয়া গেল মনে হলো, কিন্তু কিছুতেই তারা দম্‌ল না, দ্বিগুণতর জোরে শব্দ হ'তে লাগল, "বল বিষ্টুচরণ ঘোষ-কি জয়!"

* * *

পরদিন বিচারে বিষ্টুমামার ন'মাসের জেল হয়ে গেল।

সরকারপক্ষের উকীল তাঁর চার্জ্ শীট দাখিল করে, বললেন, "ধর্ম্মাবতার, এ ব্যক্তি পরিহাসচ্ছলে রাজদ্রোহ প্রচার করে। যা বলতে চায় ঠিক তার উল্টোটা বলে। তার ফলে তার বলবার কথাটা আরও বেশী জোরালো হয়।"

ধর্ম্মাবতার বললেন, "ও! তুমি ভেবেছিলে তোমার চালাকি কেউ ধর্‌তে পারবে না? তুমিই একমাত্র চালাক, আর পুলিশের লোকেরা সব মূর্খ?"

বিষ্টুমামা বল্‌লেন, "না ধর্ম্মাবতার, আমি বুঝতে পার্‌ছি আমিই একমাত্র মূর্খ।"

প্রশ্ন হলো, "তোমার কিছু বল্‌বার আছে?"

বিষ্টুমামা বললেন, "আছে, কিন্তু সেটা জেল থেকে বেরিয়ে বলব।"

* * *

আজ রাত্রে মামীমার বাড়ী আমাদের সকলের হরির লুটের নিমন্ত্রণ।

ক্ষ্যাপার গান

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনার থালা, গিনির মালা,
ভালবাসার ভাণ,
অভিনয়ের উৎপাতে হায়
বিষিয়ে গেছে প্রাণ।
শয়তানেরি জয়-তানেরি
কোরস্-স্বরে বাজিয়ে ভেরী,
দোস্ত-মুখের মুখোশ পরে'
শত্রু হানে বাণ।
মদন-পূজার পাত্র ভরি'
ফেনিল মহুয়ায়,
করছে দেখ' খুনোখুনি
রাঙিয়ে দুনিয়ায়;
রূপের রঙীন ম্যাকাল ফলে
মুনির মানস নেশায় টলে,—
কাব্যে তাহা মিথ্যা কথা
প্রেমের কল্পনায়।
আর্সিতে মুখ- দেখাদেখি,
বুদ্ধি পাটোয়ারি,
স্বার্থ শানায় গুপ্তি-ফলক,—
যাই গো বলিহারি!
বাইরে চিকণ, ভিতর ভুয়া,
আশার পাশায় খেল্‌ছে জুয়া,
বিনয়-ঢাকা অহংকারে
মত্ত নরনারী।
'ধর্ম্ম? সে তো দুর্ব্বলতা'—
হাঁকে নাদির শাহ—
'জোর-জুলুমে লও গো কাড়ি'
যে ধন তুমি চাহ।
চায় রমণী বীরের পাণি,
এইটুকু সার সত্য মানি,—
যৌবনেরি বারুদ-আগুন
করুক্ গৃহ-দাহ।

'বহুৎ আচ্ছা, সাবাস্ সাবাস্,
রটবে তোমার নাম,—
কোমলতায় খেদিয়ে দূরে
বাজাও আপন কাম।
ত্যাগের চেয়ে ভোগ সে ভালো,
জ্বালো মশাল প্রলয়-আলো,
চিতার পারে শান্তি আছে
নাই বা জানিলাম!
পুণ্য-পাপের শূন্য দাবি,
ফাঁকা আওয়াজ তার;
অরণ্যে হায় রোদন মিছে,
ব্যর্থ হাহাকার!
কতই দুখী আতুর জনা
ফেল্‌ছে চোখের জলের কণা,—
কি যায় আসে? কাঁদে—হাসে.
দুনিয়া চমৎকার!'

* * *

তোমরা শেষে বক্র হেসে'
করলে প্রবঞ্চনা!—
প্রতিদানে পেলাম শুধু
দুর্দ্দশা-লাঞ্ছনা।
ডরাইনেক সমাজকে আর,
পায় দলি তার সূক্ষ্ম বিচার,—
ফুঁস্‌ছে বুকে কেউটে সাপের
প্রতিশোধের ফণা।
ভেকের মত মুখ লুকাবে
ভণ্ড-ভীরুর দল,
চোরাবালির চরে তাদের
থামবে কোলাহল।
বাঁধা-বটের কোটর-বাসী
জরদ্গবের গলায় ফাঁসি

লাগিয়ে দিয়ে দাও টাঙিয়ে,—
বুঝেছ কি তার ফল!
বেরিয়েছে মন- কালাপাহাড়,
চালায় হাতিয়ার,
পণ করেছে জীর্ণ দারু
করবে সে চুরমার,—
ভাবছে যারা কপাল-দোষে
ক্ষয়-জ্বরে হায় হৃদয় শোষে,
বাসুকী আর বইতে নারেন
তাদের জরা-ভার।
মৃত্যু-দ্বারে সত্য-খবর
বেতার আসিয়াছে,
খুঁড়ে রাখো নিজের কবর,
রইবে না কেউ কাছে।
চোখ রাঙাবেন প্রাণেশ্বরী,
পুত্র রবেন দূরে সরি',
হিসাব নেবেন ব্যাঙ্কে তোমার
অঙ্ক কত আছে।
ঠকিয়ে যাবেন আত্মীয় জন
স্কন্ধে করি' ভর,
চামড়া চোখে নেইক তাঁদের
মজিয়ে যাবেন ঘর!
ওষ্ঠ-পুটের আহা-ধ্বনি
ক্ষেপিয়েছে প্রাণ,—বয় ধমনী
টগবগে খুন, তুবড়ী-আগুন
ঝরছে রে ঝর্ঝর।
যে দিক্ পানে চাই রে ফিরে
দুনিয়ার এই ভাও,
বোবায় বলে— 'লাগাও কোড়া,
তুড়ুম্ ঠুকে দাও।'

কাঁপবে সবাই তোমার ভয়ে,
ক্ষ্যাপার প্রলাপ মিথ্যা নহে,
খিটিমিটি ছাড়া হেথায়
নেই বনি-বনাও।

* * *

জীবন-ভরা বিড়ম্বনা,
ভূতের নাচন নাচা,
বিগড়ে গেছে মাথার মগজ
ভেঙেছি তাই খাঁচা।
দেঁতো হাসির পরতাপে,
গালিগালাজ অভিশাপে,
নফর-বেশে কপট হেসে
ছেড়েছি ভিক্-যাচা।
আর তো কভু কারো সহিত
করব না মিটমাট,—
সওদা ফেলে' এলাম চলে'
ছড়িয়ে দোকান-পাট।
গভীর খেদে মরীয়া হয়ে',
'বেদে'র মত তাঁবু ব'য়ে
বেড়াই ঘুরে— কত দূরে
খেয়া-পারের ঘাট?
(ওরে) আমার মত ফতুর যারা
দরদ্-জ্বালা পায়
শ্মশান-ঘরে ;— তারাই মোরে
সমঝাইবে হায় ;—
ডাক দিয়েছে কর্ম্মনাশা,
টুট্‌ল গুমর, উঠ্‌ল বাসা,—
মর্ত্ত্য-ভূমির কুম্ভ-মেলায়
সন্ন্যাসী গান গায়।

একরাত্রি

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

ঘটনাটির সূত্রপাত হয় মোকামাঘাটে।

ভিড় ছিল, তবে এমন নয় যে উঠিতেই পারিতাম না—একলা লোক—তায় লটবহর নাই। স্থান হইল না অন্য কারণে; আসলে মনটা কাব্যরসে সিক্ত হইয়া অত্যন্ত উদার হইয়া পড়িয়াছিল, কেমন যেন মনে হইতেছিল এপর্য্যন্ত পৃথিবীর যথেষ্ট উপকার করা হয় নাই। তাই নিজে সরিয়া দাঁড়াইয়া আর সকলকেই উঠিবার সুবিধা করিয়া দিতেছিলাম।

এমন সময় গাড়িটা ছাড়িয়া দিল। যে বাবুটিকে সবার শেষে সপরিবারে উঠিতে সাহায্য করি তিনি চলতি গাড়ির দুয়ার আগলাইয়া বলিলেন, "খবরদার মশায়, ঠেলে দিতেও পেছপা হব না, হাঁ, দেখচেন গাড়ির অবস্থা? এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছিলেন কি?……"

এক্সপ্রেস্‌টা মিস্ করিলাম, বলিলাম—'যাক্‌গে, প্যাসেঞ্জারে দিব্যি শুতে শুতে যাওয়া যাবে।' ষ্টিমারের জেটির উপর গিয়া আসন্নসন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে বইটা খুলিয়া আবার পড়িতে লাগিয়া গেলাম। রবিবাবুর গল্পগুচ্ছ। "একরাত্রি" গল্পটা চলিতেছিল,—যেখানটায় নূতন স্কুলমাষ্টারি লইয়া আবার সুরবালার বড় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি সেইখানটা। নিজেকেই নায়কের পদে বসাইয়া দিলাম বলিয়া কেহ যেন কিছু মনে না করেন—অবস্থাটা তখন প্রায় এমনই হইয়া পড়িয়াছে।

গাড়ি আসিলে বইয়ের পাতায় আঙুল গুঁজিয়া দিয়া অলস গতিতে গিয়া এক ইণ্টার ক্লাসে উঠিলাম। গুছাইয়া-সুছাইয়া বসিয়া এইবার বইটি খুলিব, এমন সময় সামনের দিকে নজর পড়ায় একটু সচকিত হইয়া উঠিলাম। গাড়ীর ও পাশটায় কোণে জড়সড় হইয়া একটি রমণী। ভাবেও, এবং বিদ্যুতের আলোয় সযত্নআচ্ছাদিত হস্তপদাদির যেটুকু দেখা গেল তাহা হইতেও বোঝা গেল রমণী যুবতী। পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বেশ ধারণা পাওয়া গেল না, তবে সমস্ত অঙ্গটি বেড়িয়া আল্‌গা ভাবে যে একখানা রেশমী চাদর জড়ান ছিল, তাহা হইতে বেশ বোঝা গেল সে কোন অবস্থাপন্ন ঘরেরই মহিলা;—ইণ্টার ক্লাসে বসার ব্যাপারটাও এ-অনুমানটুকুর পরিপোষণ করিল।

ভাবিলাম মরুক গিয়া, আমার এ কৌতূহলের অধিকার কি? মনের লাগাম কষিয়া পুস্তকের অক্ষর-পথে চালিত করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ক্রমেই বিষয়টার অপূর্ব্বত্ব আমায় নাছোড়বান্দা হইয়া যেন পাইয়া বসিল। তখন অধিকার লইয়া তর্কটুকুই অন্য আকারে আসিয়া দেখা দিল, মনে হইল এ-ক্ষেত্রে এমন উদাসীনভাবে বসিয়া থাকিবারই কি আমার কোন অধিকার আছে? এই ব্যাটাছেলেদের গাড়িতে আমি আর একটিমাত্র স্ত্রীলোক—সে অপরিচিতা। এই তো গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি উঠিয়া বসিয়াছি, কই কেহ তো নামিয়া যায় নাই। তবে এ অভিভাবকহীনা কে? যদিই বা অভিভাবক ছিল, দৈবযোগে সঙ্গচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে একবার প্রশ্ন করিয়া বিষয়টা জানা উচিত নয় কি আমার?

ইহাতেও একটু সন্দেহ হইল—এই কি বিপদে পড়ার ভাব? বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে? যাহোক্, ভাবিলাম গাড়িটা খুলিয়া যাক্ না, শেষ পর্য্যন্ত যদি কেহ না আসিয়া পৌছায় তো ব্যাপারটা তখন একদিকে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন, পরের ষ্টেশনেই তো থামিতেছে, এত তাড়াতাড়ি কিসের?

গাড়ি ছাড়িল, কেহ আসিল না। আমার রহস্যময়ী সঙ্গিনী একটু নড়িয়া-চড়িয়া বস্ত্রাবরণে একটা হিল্লোল তুলিয়া আবার সেইরূপ জড়বৎ বসিয়া রহিলেন। গাড়িটা শুধু গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মৃদু দোল দিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

ব্যবধানটা একটু বেশী ছিল বলিয়া গাড়ির আওয়াজটা বাড়িবার পূর্ব্বেই প্রশ্ন করিলাম—"আপনি কি একা....."

শেষ করিতে পারিলাম না, কারণ ছ্যাঁৎ করিয়া মনে হইল "একা" কথাটা ব্যবহার করা বড় ভুল এবং নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া গিয়াছে, বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসার আকারে।

আমি মনের ভাবটা গুছাইয়া বলিবার জন্য ভাষা খুঁজিতে লাগিলাম। তরুণী উত্তরস্বরূপ বাম হাতখানি বাহির করিয়া ঘোমটাটা একটু টানিয়া দিলেন। একখানি পেলব, নধর ভুজলতা—তুলিতেই একগাছি রুলী আর গুটিকয়েক রেশমী চুড়ী ঠুন্ ঠুন্ শব্দে মণিবন্ধ ছাড়িয়া হাতের মাঝখানে নামিয়া আসিল,—মনে হইল যেন আমার ভাবগতিক দেখিয়া তাহারা একে অন্যের গায়ে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

ব্যাপারটুকু সামান্যই এবং সত্যিই কিছু আমাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য চুড়ীমহলে মাথাব্যথা পড়িয়া যায় নাই। কিন্তু আমার একটু চমক ভাঙিল; হাসিয়া মনে মনে বলিলাম—"মিছে নয়, জড়ের মুখে হাসি ফুটাইবার মতই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে বটে।" তখন পৌরুষকে জাগ্রত করিয়া বেশ স্পষ্ট, সবল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি একলা এ অবস্থায় রয়েছেন,—কোন বিপদ আপদ ঘটেনি তো? কোন রকম সাহায্য করতে পারি কি? সব কথা খুলে বলুন, কোন দ্বিধা করবেন না।" এই অকুণ্ঠিত কথাগুলিতে মনে মনে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলাম, যেন এক মুহূর্ত্তে বিশ্বের নারীর দায়িত্ব লইয়া আমি, পুরুষ, সর্ব্ববিধ অলস লঘুত্বের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিলাম। বোঝা শক্ত হইয়া উঠিল যে,আমরা এই স্বল্পপ্রাণা জাতিটার কাছে হঠাৎ থাকিয়া থাকিয়া এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়ি কোথা হইতে যাহাতে এমন গোটাকতক সোজা কথা বলিলেও জিহ্বা জড়াইয়া আসে।

আমার স্বল্পপ্রাণা সঙ্গিনী কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না; তাহার পরিবর্ত্তে যাহা করিলেন, তাহাতে জটিল সমস্যাটি আরও নিবিড়ভাবে জটিল হইয়া উঠিল মাত্র। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে চাপা ক্রন্দনের আভাস পাওয়া যাইতে লাগিল—ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদা—মাঝে মাঝে সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া উঠিতেছে। যুবতী কখন-বা বস্ত্রাঞ্চলে, কখন-বা ঘোমটার অল্পপরিসর কাপড়টুকু দিয়াই অশ্রুমোচন করিতেছে। মনটা বড়ই ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিন্তু কি উপায় আমার? আমার ক্ষুব্ধ পৌরুষ লইয়া ওর নীরবতার গণ্ডীর বাহিরে বিফল উদ্বেগে বসিয়া থাকা ভিন্ন আর উপায় ছিল না। বসিয়া বসিয়া নানান রকম সম্ভব অসম্ভব কল্পনা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনটাকেই একটা সন্তোষজনক মীমাংসায় লইয়া যাইতে পারা গেল না।

এই অবস্থাতেই কয়েকটা ষ্টেশন পার হইয়া গেল—গাড়ির এক কোণে পৃথিবীর চিররহস্যময়ী নারী রহস্যের এ একটা নূতনতর আবরণে আর অন্য কোণে চিরমূঢ় পুরুষের প্রতিভূ আমি, এই এক নূতনবিধ ফাঁপরে পড়িয়া! গতিকটা মোটেই বলিবার বুঝাইবার যোগ্য নয়।

অবশেষে ঘটনাটা ক্রমশঃ একঘেয়ে এবং অল্পবিস্তর ভয়াবহ হইয়া পড়ার দরুণ তাহা হইতে কাব্যের অংশটুকু উবিয়া যাওয়ার জন্য হোক আর যাই হোক, মাথায় একটু বুদ্ধি আসিয়া জুটিল। একটা ষ্টেশনে গাড়ি আসিয়া থামিতে বলিলাম—"আপনি না-হয় স্ত্রীলোকের কামরায় চলুন না, সঙ্গে করে দিয়ে আসছি। সেখানে সব কথা খুলে বলতে পারবেন।"

আশ্চর্য্যের বিষয়, রমণী ইহাতে তীব্র আপত্তির সহিত সঘনে হাত নাড়িয়া উঠিল; অনামিকাতে একটি নীলার আংটি যেন কয়েকটি মিনতি অশ্রুকণা বর্ষাইয়া ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া উঠিল।

তখনও বুদ্ধিটার কিছু অবশিষ্ট ছিল বলিতে হইবে, বলিলাম—"বেশ, না-হয় কোন স্ত্রীলোককে ডেকেই

আন্‌চি, মেয়েগাড়িতে অনেক বয়স্থা স্ত্রীলোকও তো থাকেন…”

এবার ত্রস্ত, শঙ্কিতভাবে রমণীর মাথা পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিল এবং অস্ফুটস্বরে দুই তিনবার শোনা গেল—“না—না—না।”

তখন আমি কড়া হইয়া বলিলাম—“তাহ’লে আমাকেই বলতে হবে ব্যাপারটা কি। কেন কাঁদছিলেন বলুন তো ?”

আবার সেইরূপ জড়বৎ নিশ্চল, নীরব। প্রশ্ন করিলাম —“বাড়ী কোথায় আপনার ?”

উত্তর না পাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—“স্বামীর নাম ?”

মাথাটি “না”—এর ভঙ্গিতে নড়িয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—“বিবাহ হয়নি ?” মাথা নাড়িয়া জানাইলেন—“না।”

একটু থামিয়া কথাটা যথাসম্ভব গুছাইয়া বলিলাম—“কোন দুর্ব্বৃত্তের হাতে পড়েচেন কি ?”

আর কোন উত্তর পাওয়া গেল না—অস্ফুট স্বরের মধ্য দিয়াও নয়, কিংবা ঘোমটা-ঢাকা মাথার মৃদু সঞ্চালনেও নয়। এত কাছাকাছি, অথচ সমস্ত রাতের ভিতর কথার মধ্যে পাওয়া গেল ঐ তিনটি ত্রস্ত, চাপা—“না না—না” আর পরিচয় ঐ দুটি ইঙ্গিত থেকে যা চুনিয়া লওয়া যায়। এতে অন্তরের উদ্বেগ তো শীতল হইলই না, বরং কল্পনার উত্তাপ সৃষ্টি করিয়া মনটাকে ক্রমে একটা ব্যথা আশঙ্কার বাষ্পে ভরিয়া দিল।

গাড়ি নক্ষত্রবেগে ছুটিয়াছে। মুখ বাহির করিয়া নৈশ প্রকৃতির পানে চাহিলাম। শুব্ধ, অপরিস্ফুট জ্যোৎস্না প্রাণময় জগতকে আপনার মোহ-আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া যেন ঘুমাইয়া আছে। বিরল-নক্ষত্র আকাশ। চাঁদের উপর একখণ্ড মন্থরগতি মেঘের আবরণ পড়িয়াছে। একটি মাত্র তার চোখে পড়ে,—সে যেন তাহার সমস্ত দীপ্তি দিয়া ঐ মেঘাবগুণ্ঠনের ওপারে তাহার কৌতুকদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে চায়।

বলিতে কি, বেশ বুঝিতে পারিলাম আমি পরাভূত হইয়া আসিতেছি। একেই পড়িতেছিলাম “একরাত্রি”, আবার উপর একরাত্রিব্যাপী একখানি খণ্ডকাব্যের এই অতিবাস্তব আয়োজন—এক্ষেত্রে পরাভব হওয়া ছাড়া আর উপায়ান্তর ছিল না।…মনে হইল, কি-ই বা ক্ষতি এমন ? জীবনের এই নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে শুধু একটি রজনীর জন্য আমরা অপরিচিত দুটিতে যদি এত কাছাকাছি আসিয়াই পড়িয়া থাকি, তা এমন বিরসভাবে পাশ কাটাইয়া যাইবারই বা সার্থকতা কোথায় ? কি জানি আমার এ সাহচর্য্য ওর মনে কি ভাব তুলিয়াছে—কোনো ভাবই তুলিয়াছে কি না, তারই বা স্থিরতা কি ? কিন্তু তা ভাবিয়া আজিকার রাত্রে তীব্রগতির এই মাদকতা ও নিথর জ্যোৎস্নার মধুর অবসাদের মধ্যে উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যদি খানিকটা ভাবের পুঁজি সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি তো কাহার তাহাতে আসে যায় ? ওর দুটি বাণী, কি এতটুকু দৃষ্টি যদি আমার সে কল্পনাকে পুষ্ট করেই তো সেটা কি এতই আশঙ্কার বিষয় হইয়া পড়িবে ?

বিধাতার দয়াই হোক্, আর চক্রান্তই হোক্ সব দিক দিয়াই যেন কাব্যটুকু জমিয়া উঠিতে লাগিল।

লক্ষ্মীসরাই ষ্টেশনে একজন শুভ্র-শ্মশ্রু প্রাচীনপন্থী মুসলমান উঠিলেন। আদবকায়দার মত অভিবাদনাদি শেষ হইলে ও-কোণে নজর পড়িতে অতিমাত্র সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন,—“এঃ, আপনার বিবিসাহেবা এ গাড়িতে রয়েচেন না দেখে প্রবেশ করে বড়ই বেয়াদবি করে ফেলেচি, মাফ করবেন। আপনি বারণ করে দিলেই পারতেন। আমি নেমে অন্য গাড়িতে যাই বেয়াদবিটা মাফ করতে হবে…কুলি ?…”

আমি এক অদ্ভুত উত্তর দিয়া বসিলাম—“না, না, সে কি, যখন উঠে পড়েচেন, থাকুন। আপনি আমাদের পিতার বয়সী…”

“বিবিসাহেবার” প্রতিবাদ ত করা হইলই না, অধিকন্তু মুখ থেকে বেশ সরলভাবে বাহির হইয়া গেল—“আপনি আমাদের পিতার বয়সী।”

একবার সেই জড়মূর্ত্তির উপর আপনিই দৃষ্টিটা গিয়া পড়িল। না—অনুমোদনের সুস্পষ্ট আভাস না থাকিলেও, আপত্তিরও তো কোন ইঙ্গিত নাই।

রহস্য অতল !

২

কিউলে গাড়ী থামিলে হঠাৎ একটু বড়মানুষী করিয়া কেলনারের হোটেল হইতে 'খানা' সারিয়া আসিবার ইচ্ছাটা বলবতী হইয়া উঠিল। কেন, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে নিজেকে যেন আজ রাত্রে ইতরসাধারণের অপেক্ষা বিশিষ্ট বলিয়া মনে হইতে লাগিল। নীচেকার রাস্তা দিয়া ও-প্ল্যাটফরমে গিয়া উঠিলাম, সদর্পে হোটেলের সাম্নে পর্য্যন্তও গেলাম, তাহার পর ভিতরে ভোজনরত লালমুখের ভিড় দেখিয়া আস্তে আস্তে, শিস দিতে দিতে ফিরিয়া আসিলাম। প্ল্যাটফরমের ভেণ্ডরের নিকট একপেয়ালা চা পান করিয়া কেলনারের সখ মেটান গেল। তাহার পর ইতরসাধারণের মত কিঞ্চিৎ পুরি ও মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম। সব মিলিয়া একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল।

আসিয়া দেখি ব্যাপার গুরুতর! আমার, সঙ্গিনী গাড়ীর কোণে বস্ত্রের একটি পুঁটুলি বিশেষ হইয়া ক্রন্দনরতা। সাম্নে দুইজন পুরুষ এবং একটি স্ত্রীলোক টিকিট কালেক্টার। মেম বলিতেছে—"জলদি বোলো, নেহিতো উতার দেঙ্গি, আভি গাড়ী খুলতি হ্যায়; টিকিট অপানে পাস কেঁউ নহি রখি?"

একজন টিকিট কালেক্টার ফিরিঙ্গি। হাত ঘুরাইয়া রিষ্টওয়াচটা দেখিয়া ইংরাজিতে বলিল—"আচ্ছা ফেসাদে পড়া গেল তো,—সময় যে হয়ে এল··· "

অপরটি হিন্দুস্থানী, বলিল—"আপনি কি বাঙ্গালীন আছে? কোন ভাখায় কোথা বলতে পারেন? আমাদের তিনজোনারহি বোলি সোমঝাতে পারছেন না? "

আমায় উহারা কেহ দেখিতে পায় নাই, এদিকে পিছন ফিরিয়া ছিল। বুঝিলাম সঙ্গিনী টিকিট-হীনাও! যাহোক, ভাবিবার সময় ছিল না, যেন এইমাত্র ঢুকিয়াছি, এইভাবে বলিলাম—"একি! কি ব্যাপার মেমসাহেব?"

আমার দিকে চাহিয়া একসঙ্গে ফিরিঙ্গি ইংরাজিতে, মেমসাহেব হিন্দীতে ব্যাপারটা বুঝাইতে সুরু করিয়া দিল। বেহারীটি তাড়াতাড়ি বারণস্বরূপ হাতদুখানা তাহাদের মুখের কাছে ধরিয়া বলিল "সব বাঙ্গালী মাসা হিন্দী, ইংলিশ নেহি জানতা। I am understanding him in Bengali······এই আওরাৎ লোকটির সাথমে······"

আমি তাহার বাংলার স্রোতে বাধা দিয়া শুদ্ধ হিন্দিতে বলিলাম—"বুঝেছি; তা মেয়েছেলেদের টিকিট প্রায়ই তাঁদের অভিভাবকদের কাছে থাকে, এটা বুঝে আপনারা একটু অপেক্ষা করতে পারতেন। এই নিন্, তবে ব্যাপার এই যে আর একখানা, অর্থাৎ এক হিসেবে আমার টিকিটখানা আপনাদের দেখাতে পারলাম না। দুইতিন জায়গায় দাম চুকাইবার জন্ত ব্যাগ খুলিতে একখানা কোথায় পড়ে গেছে—সেই খোঁজেই এতটা দেরিও হয়ে গেল।······মোতিহারি থেকে বর্দ্ধমান—এই টিকিট দেখলেই বুঝতে পারবেন, —কত দিতে হবে?"

আমার নূতন ওয়ার্ডের পানে একবার চাহিলাম। ঘোমটাটানা মুখটা এদিকে ফিরান রহিয়াছে। ঘোমটার পাশের কাপড়টা ঘুরাইয়া মুখের নিম্নভাগটা চাপিয়া আছেন; ঠিক চক্ষু দুইটির পরিমাণে সামান্ত একটু অবকাশ। চক্ষু দেখা যায় না,—বোধ হয় কাল চোখের দীর্ঘ পল্লবে ঘোমটার ছায়াটা আরও নিবিড় করিয়া দিয়া থাকিবে। কিন্তু নাই দেখি, বেশ অনুভব করিতেছিলাম—দুটি ডাগর চোখের স্নিগ্ধদৃষ্টি আমার সমস্ত শরীরে প্রসন্নতা বর্ষণ করিতেছে। সারা দেহে রোমাঞ্চ দিয়া উঠিল। ভাবিলাম, কৃপণের মত এই অতিসংযত দান, কিন্তু এটুকুরই জন্ত কি-ই না দেওয়া যায়—কি-ই না করা যায়—এই প্রসাদ-কণিকার জন্ত নিজের সমস্ত দেওয়া-করাকে কতই না তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়··· ··

আমি শুদ্ধ হিন্দী বলিতে পারি, বোধ হয় সেই অপরাধে বেহারী টিকেট কালেক্টারটি জরিমানার জন্ত জিদ করিলেও, ফিরিঙ্গি মোতিহারি হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত নিছক ভাড়া লইয়াই ছাড়িয়া দিল। দলটা নামিয়া গেলে

একটু নিকটে গিয়া বলিলাম—"এই রাখুন টিকিটটা। আগে বলেন নি কেন? টিকিটের জন্য কত বিড়ম্বিত হলেন দেখুন তো।"—একটু অভিমানের সুরেই কথাগুলো বাহির হইল; আঘাতটা আমারই বেশী লাগিয়াছিল কি না।

ডান হাতের শুধু আঙুল ক'টি কাপড়ের রাশির মধ্য হইতে বাহির করিয়া প্রসারিত করিয়া ধরিলেন। রাঙা টিকিটখানি মাঝখানে আলগোছে রাখিয়া দিয়া কহিলাম, "কই আপনার তো কিছু খাবার কেনা দেখছি না?"

এই সময় গার্ড হুইস্‌ল দিল। দুয়ারের কাছে তাড়াতাড়ি আসিয়া "খাবারওয়ালা, খাবারওয়ালা" করিয়া চীৎকার করিলাম।

কেহ উত্তর দিল না। নিকটে একটা ছিল, ভ্রূ নাচাইয়া বলিল, "বড়া চালাক হায়, হুইসিল দিয়া আউর খাবারওয়ালা, খাবারওয়ালা!"

ডাকিলাম "পানিপাঁড়ে!"

সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ঘটি আছে?"

বেঞ্চের নীচের পানে তর্জ্জনীর সঙ্কেত হইল—একটি সুদৃশ্য জারমান সিল্‌ভারের ঘটী। বাহির করিয়া পানিপাঁড়ের নিকট জল লইলাম। তাড়াতাড়িতে খঞ্চেতে একটা আট আনি দিয়া চার দোনা অর্থাৎ এক আনার পান লইলাম। পয়সা ফেরৎ পাইলাম না। কারণ খঞ্চের মাঝখানে চোখের সামনে এককাঁড়ি পয়সা থাকিলেও পানওয়ালার হঠাৎ বিশ্রীরকম দৃষ্টিবিভ্রম আসিয়া পড়িল—সেই অবসরে গাড়ির বেগ বাড়িয়া আমরা প্লাটফর্ম্মের বাহিরে আসিয়া পড়িলাম।

সাত আনা পয়সা গেল, কিন্তু সাত আনা পয়সা অথবা পয়সা মাত্রই গ্রাহ্য করি, মনটা সে-সময় এরূপ বস্তুতান্ত্রিক ছিল না। সঙ্গিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, "এসব তো হ'ল, কিন্তু খাবার আপনার? ...তা হোক্ আমার দরকার হবে না—চা' টা খেয়েছি।" বলিয়া সমস্ত খাবার, জল, তিনদোনা পান সাম্‌নের বেঞ্চের উপর রাখিয়া দিলাম। একটু ক্ষুব্ধভাবে বলিলাম, —"অনেকক্ষণ খাননি নিশ্চয়। খাবার খুবই সামান্য হ'ল...এ পর্য্যন্ত মুখ ফুটে কিছু বললেন না তো—আমার আর দোষ কি বলুন?"

এখানে সুন্দরী আমায় একটু কৃতার্থ করিলেন; খাবারের ঠোঙাটি লইয়া আমার দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিলেন। ঘটী হইতে জল লইয়া মুখ ধুইয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দু'চার মিনিটের মধ্যেই ঠোঙাটি খালি করিয়া জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া ঘটীর প্রায় অর্দ্ধেক জল ঢক্ ঢক্ করিয়া পান করিয়া ফেলিলেন।

বলিতে কি, আমি ঠিক এরকমটি আশা করি নাই। আশা যা করিয়াছিলাম তা বরং এই যে, আহার্য্যের কিছু অংশ দরদভরে আমি শ্রীহস্ত হইতে লাভ করিব।... আমার কাব্যের অতিকোমল অঙ্গে একটি রূঢ় আঘাত লাগিল। কিন্তু সুখের বিষয়ই হোক্ আর যাই হোক্ ব্যথাটা স্থায়ী হইল না। সঙ্গিনীর গ্রহণ এবং ভোজনের মধ্যে যে একটা নগ্ন স্থূলতা ছিল, একটু চেষ্টা করিয়া ভাবিতেই সেইটেই আমার চক্ষে সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিল। মনকে বুঝাইলাম—প্রত্যেক মানুষটির মধ্যে একটি পশু বর্ত্তমান। আমরা তাহাকে চাপড়াইয়া-চুপড়াইয়া শিষ্ট এবং সংযত করিয়া রাখি—এবং লোকচক্ষুতে এই শিষ্টতাটি হয় সৌন্দর্য্য। এ এক ধরণের সৌন্দর্য্য বটে। কিন্তু ইহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের পূর্ণরূপটি তো পাওয়া যায় না। সে-রূপ পাওয়া যায়, যখন প্রকৃতির তাড়নায় সেই পশুটি সংযমের এবং আচারের সমস্ত শৃঙ্খল ঝন্‌ঝনাইয়া তাহার সমগ্র বীভৎসতায় বাহির হইয়া আসে। তখন মানুষের কোমলতা ও পশুর কঠোরতা মিলিয়া এক অপরূপ রূপের সৃষ্টি হয়, সেই পূর্ণ। ঝরণার শ্রী যেমন, শুধু স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ কালো জল হইলেই হয় না—তাহার সঙ্গে গর্জ্জন চাই আর চাই উপলবিক্ষুব্ধ ফেনার আবিলতা।

এই রহস্যময়ী কোমলাঙ্গিনীর ক্ষুধা-উগ্র আহারের মধ্যে আমি এই রকম গোছের একটা মাধুর্য্য দেখিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলাম।

দেখিলাম সুন্দরী পানের দোনা হইতে পান বাহির করিয়া হাতে ধরিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন। প্রশ্ন করিলাম—"জরদা খান?"

ঘোমটাটি সম্মতির ভঙ্গিতে দুলিল। মৌন হইলেও এ-উত্তরটুকু শব্দের এত কাছাকাছি যে আমি প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলাম। পকেটে বন্ধুর-দেওয়া বিদায়ের স্মৃতিচিহ্ন, খাঁটিরূপার একটা জরদার কৌটা ছিল—মিনার কাজ করা এবং মাঝখানে সোনার একটি পান বসান। একটু জরদা নিজের জন্য ঢালিয়া রাখিয়া কৌটাটা দিবার জন্য উঠিয়া গেলাম, বলিলাম—"রাখুন আপনার কাছে, পান খাওয়া হ'য়ে গেলে দিলেই হবে।"

আবার একবার পাঁচটি সোনার আঙুল প্রসারিত হইল। সামান্য একটা রাঙা রেলটিকিট পড়িয়া যেখানে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেখানে কারুমণ্ডিত সৌখীন সেই সোনা-রূপার পাত্রটি সে কী মোহ রচনা করিল কি করিয়া জানাই? দেখিলাম একটু। কিন্তু আশ মিটিবার পূর্ব্বেই আঙুল ক'টি চাদরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। আর, কতক্ষণে—কতদিনেই বা মানুষের এ আশ মিটে? কবেই বা মিটিয়াছে?...

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস আপনি বাহির হইয়া আসিল।

নিজের সীটে আসিয়া বসিলাম এবং বেদনাটাকে চাপা দিবার জন্য বইটা খুলিয়া বসিলাম। গল্প শেষ হইয়া আসিয়াছে,—পড়িয়া চলিয়াছি—"আর সমস্ত জলমগ্ন হইয়া গেছে কেবল হাত পাঁচ-ছয় দ্বীপের উপর আমরা দুইটি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম!...আজ সমস্ত বিশ্বসংসার ছাড়িয়া সুরবালা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমি ছাড়া সুরবালার আর কেহ নাই।...আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি। ...আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে এই একটি মাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা......"

—বই মুড়িলাম। ভাবিতে লাগিলাম, সেই মহাসঙ্কট, পৃথিবীর আর সত্যমিথ্যা সমস্ত বন্ধন মুছাইয়া দিয়া কবেকার একটা তুচ্ছ সম্বন্ধকে মৃত্যুর চিরান্ধকারের সম্মুখে মুহূর্ত্তের জন্য এমন উজ্জ্বলভাবে সত্যের আলোকে ফুটাইয়া তুলিল কেন? কোন্ রহস্যময়ের ইঙ্গিতে সুরবালা সান্নিধ্যের উপহার দিবার জন্য সেই ব্যর্থজীবন স্কুলশিক্ষকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল? সেই অদৃশ্য শক্তির নির্দ্দেশেই কি আজিকার রাত্রে এই মায়ারূপিণী আমার পথে আসিয়া পড়িয়াছে? কয়েক দণ্ড মাত্র লইয়া এই যে নীরব মিলন, ইহার মধ্যে কত যুগ, কত জন্মজন্মান্তরব্যাপী সাধনার সিদ্ধি কি পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে?—কে জানে?

আমার সুরবালা তখন একেবারে মাথা উল্টাইয়া চার আঙুলে মোটা রকম জর্দ্দা লইয়া একটু গদ্যময় ভঙ্গিমায় মুখবিবরে চালান দিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে আমার কাব্যের রসটুকুকে একটুও বিস্বাদ করিতে পারিল না। অত কথা কি, ক্ষিদেয় যে নাড়ী জোট পাকাইয়া যাইতেছিল সেইদিকেই বড় একটা ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

জামুই ষ্টেশনে নামিয়া একটু দূরে গিয়া তাড়াতাড়ি এক ঠোঙা ছোলার অখাদ্য ঘুঘনি চিবাইয়া লইলাম,তাহার পর গাড়ি ছাড়িলে সঙ্গিনীর নিকট জলের ঘটীটি ভিক্ষা করিয়া লইয়া তাঁহার পানের পর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সমস্ত দেহমন দিয়া সেটুকু পান করিয়া লইলাম। তিনি আলগোছে পান করিলেও জলটুকু একহিসাবে উচ্ছিষ্টই ছিল। মানি—ছিল; এবং সেইজন্যই তখন বোধ হইল যেন দুইটি প্রাণীর মধ্যে একটা সুস্পষ্টই যোগ স্থাপিত হইয়া গেল, আমাদের মধ্যে কোথায় যে একটা পার্থক্যের রেখা ছিল ঐ একঘটী জলে সেটা ধুইয়া, মিটাইয়া দিল।

নিজেকে এটুকু প্রশ্রয় দিবার ফল এই হইল যে, এই যোগটুকুকে আরও ঘনিষ্ঠ করিয়া লইবার জন্য মনটা উৎকট রকম চঞ্চল হইয়া উঠিল। জল পান করিয়াই যে ফিরিয়া আসা উচিত ছিল সেটা মনেই পড়িল না। পড়িবে কোথা হইতে? তখন সমস্ত মন জুড়িয়া এই একটা আকাঙ্ক্ষাই তোলপাড় করিতেছিল—হে সুন্দরি, আর কিছু নয়, দুটি কথা দাও—তা সে যেমনই হোক না—তা'তে আমার এ-কাব্য-রজনীর রঙীন স্বপ্ন এক নিমেষে চুরমার হইয়াই যাক্ - বা সে-স্বপ্নের মোহ আমায়

আসে না। সমস্তর উপরে আমি ঐ দুটী বাণী পাওয়াকেই আমার জীবনের পরম সত্য করিয়া রাখিব।

হঠাৎ চেতনা হইল। তাহাকে চেতনা বলি, কি ক্ষুব্ধ অভিমান বলি, কি নিরাশার আত্মগ্লানি বলি?··· নিজের জায়গায় আসিয়া বসিলাম। মনে মনে বলিলাম "না; এই ঠিক করিয়াছ। আমার একরাত্রির সমস্ত প্রগল্‌ভতা এই বজ্রশাসনেই তুমি খর্ব্ব করিয়া রাখ, হে সম্রাজ্ঞি,—আমার কি অধিকার তোমার বাণীতে? আর তোমার ধ্যানেই বা আমি তৃপ্তি খুঁজি সে কিসের জোরে? তোমার এই বিধানই উপযুক্ত। এই কঠিন নীরবতার বাঁধ দিয়া আমার এই তোমা-মুখী চিন্তা-স্রোতকে সারা রজনী এমনি করিয়াই নিরুদ্ধ করিয়া রাখ।"

নিজেকে ভাগ্যহীন তো মনে হইলই, সেই সঙ্গে এই অভিমানটা বুকের মধ্যে গুমরিয়া উঠিয়া নিজেকে প্রবল অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তবে শান্ত হইলাম। নিজেকে লইয়া এই দারুণ দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া এমনি শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম যে স্থির করিলাম পরের ষ্টেশনে নিজে হইতেই কোন সঙ্গী ডাকিয়া লইব; কিংবা এই কামরাটাই ত্যাগ করিয়া যাইব। এই গাড়ির মধ্যেকার অসহ্য গুমট আর যেন বরদাস্ত হয় না।

—হায় রে মানুষের এত দম্ভের আত্মজ্ঞান আর এত আড়ম্বড়ের আত্মবিশ্বাস!

পরের ষ্টেশনে একটি বাঙ্গালী যুবক বোধ হয় তাহার বৃদ্ধ পিতামাতা, স্ত্রী, একটি ছোট কন্যা ও দু' কুলি মালপত্র লইয়া খানিকদূর ছুটাছুটি করিয়া, শেষে আমার গাড়ির সামনে আসিয়া হন্তদন্ত হইয়া বলিল—'মশায়, আর বোধ হয় এক মিনিটও সময় নেই, থার্ড ক্লাসে তো উঠতে পারলাম না, একটু দয়া করে যদি······নাও বাবা, তুমি আগে ওঠো দিকিন্···"

আমি একটু ভাবিলাম,—কি যে মাথামুণ্ড ভাবিলাম জানি না। পকেট হইতে রেলের চাবিটা বাহির করিয়া আস্তে আস্তে কুলুপ ভরিয়া মোচড় দিতে দিতে নির্ব্বিকার-ভাবে বলিলাম—"আজ্ঞে না, এখানে ভিড় করলে চলবে না, এগিয়ে দেখুন।"

ঈশ্বর আমার অসহ্য অবস্থায় করুণা করিয়া সঙ্গী দিলেন অকার্পণ্যের সহিত; আর আমি এমনই করিয়া তাঁহার সেই মহা দান প্রত্যাখ্যান করিলাম। আজ ভাবি—কি ভূত যে মাথায় চাপিয়াছিল সেদিন!

সমস্ত রাত এই রকমে কাটিল—কখন আশার তীব্র উন্মাদনায়—সমস্ত শরীর মন জাগ্রত—এতটুক তন্দ্রার লেশ নাই যে কল্পনার মধ্যে অস্পষ্টতা আনিতে পারে; আবার কখনও বা হতাশার অবসাদে যাহাতে জাগরণ-টাকেও যেন নিদ্রার মতই শিথিল বলিয়া বোধ হয়।··· সঙ্গিনী খানিকটা দিব্য ঘুমাইয়া লইলেন। একটু হিংসা হইল। ভাবিলাম—"আচ্ছা ভাল তোমরা, যত মাথা-ব্যথা কি ভগবান আমাদেরই দিয়াছেন?"

৩

এই আমার একরাত্রির ইতিহাস। আমার অন্তরের বাসনা রাত্রির সামান্য ঘটনা-সমাবেশের গায়ে যেমন ভাবে রং ধরাইয়া আসিয়াছিল যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস করিয়াছি।

—শেষ পর্য্যন্ত একটা গভীর নিরাশার কাহিনী। এ শুনাইয়া কাহাকেও বিড়ম্বিত না করিলেই ভাল হইত। তবে, আমরা সবাই মায়াসঙ্কুল সংসার-পথের যাত্রী, আর যাত্রাটা অনেক সময় আবার রেলপথে সাধিত হয়—যেখানে মায়ারাক্ষসী সহস্ররূপে সদাই ওৎ পাতিয়া আছে, সেইজন্য যতটা পারিলাম সেই রাত্রের আমার দুর্ব্বল মনের ভাবটা লিখিয়া গেলাম। তখন ভাবিয়াছিলাম এ-কাহিনী কি এমনি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে? দিনের আলো একে কি একটা বিপুল সার্থকতার মধ্যে পূর্ণ করিয়া দিয়া যাইবে না?

—আর এখন ভাবি······যাক্, সেকথা তুলিতে আর প্রবৃত্তি নাই। সামান্য ভুলে সেদিন কি দুর্লভ সম্পদকে হারাইলাম,—কি তীব্র একটা অনুশোচনার দাগ যে সে আমার মনে মুদ্রিত করিয়া গিয়াছে—সে কথা ভাবিতে এখনও নিজের পৌরুষে ধিক্কার জন্মে।

তাই এই দুঃখের কাহিনীটা শেষ করিতেই চাহি—

খুব ভোর থাকিতে—তখনও অন্ধকারের পরদাটা একেবারে গুটাইয়া যায় নাই—ট্রেনটা আসিয়া পানাগড়

ষ্টেশনে দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্ত্তিটি। আপাদমস্তক বস্ত্রাবরণে ঢাকিয়া গাড়ির দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

ঘটনাটা লিখিতে সামান্য, কিন্তু তখন আমার কাছে সামান্য ছিল না। একবার মনে হইল সারা রাত্রের সমস্ত অসাড় তর্কবিতর্ক ছিন্নভিন্ন, লণ্ডভণ্ড করিয়া শেষবারের মত একবার নীনীর হাত দুখানি ধরিয়া নামাইয়া দিয়া এই জীবনের প্রথম এবং শেষ স্পর্শের একটা আভাস লই।...তাহা কিন্তু করা হইল না।

মূর্ত্তি নামিয়া, দুই পদ অগ্রসর হইয়া, আমি যেখানটায় বসিয়াছিলাম প্লাটফরমে ঠিক তাহার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। নতমুখী, বুঝিলাম কৃতজ্ঞতা জানাইতে চাহে—নারীহৃদয়ের অসীম কৃতজ্ঞতার দুটি কথায় বিদায়ের শঙ্কাসরমহীন লগ্নটুকু ভরিয়া যাইতে চায়।

তখনও বিনিদ্র রজনীর নেশা মাথার মধ্যে ঘূর্ণি দিতেছিল।...মনে মনে এই ব্রীড়ানতা কুণ্ঠিতা মূর্ত্তিকে ডাকিয়া বলিলাম—না, হে সুন্দরী, আর কৃতজ্ঞতার আবশ্যক নাই। একটি রাত্রির জন্য তুমি যে আমার দেহের এত কাছে এবং মনের এমন গভীর অন্তঃস্থলে প্রবাস করিয়া গেলে সেই আমার মহা পুরস্কার। হে মৌনে, আকাশের ঐ অস্তমান নক্ষত্রের মত তুমি রজনীর এক প্রান্ত হইতে উদয় হইয়া অন্য প্রান্তে বিলীন হইতে চলিয়াছ। তোমার আদি রহস্যে, তোমার অবসান রহস্যে, এই দুই সীমাহীন রহস্যের মাঝখানে একটি রাত্রের আধ বাস্তবতার মধ্যে তুমি আমার কাছে যে জাগিয়া উঠিয়াছিলে, সেই আমার মহাসম্পদ—সেজন্য তুমিই আমার সমস্ত মনপ্রাণের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর...

গার্ড হুইস্‌ল দিল, সঙ্গে সঙ্গে অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত হইল এবং ফিক্ করিয়া একটু হাসি!—

—ইয়া গোঁফ, একমুখ ছাঁটা দাড়ি, খুর দিয়া কামান মাথা, রগ-বসা গাল-তোবড়ান—দুষমন্ কাল এবং হাতে পায়ে সুকৌশলে ঈষৎ হলুদ রঙের সঙ্গে খড়ি মাখান...

—হাসিটা কান থেকে কান পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া বলিল—"সেলাম আলেকুম্ কর্ত্তা; গোস্তাকি লেবেন না—আওরাতের ওপর কর্ত্তার বেজায় নেক নজর দেখি—হি—হি—হি...সব খোদার মর্জ্জি—মাঝ হ'তে আমার একটু ফায়দা হয়ে গেল-হি—হি—হি..."

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। লোক ডাকিব কি, আমার বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল। চেন টানিবার কথাটা তো মনেই আসিল না। ভ্যাবাগঙ্গারাম হইয়া বসিয়া রহিলাম।

সেই উৎকট হাসি লইয়া গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দুইপা চলিতে চলিতে বলিল—"আবার সেলাম আলেকুম, চল্‌লাম,—জরদার কৌটটা আসনাইয়ের নেশানা ক'রে রাখলাম, কর্ত্তা—এই চাদর আর গিলভারের ঘটীর সাথে খুব মানাবে—হি—হি—হি...অধীনের নাম অছিমুদ্দিন—মেহেরবাণী ক'রে ইয়াদ রাখবেন......"

কষ্টি পাথর

পিতা নোঽসি

মানুষ যতক্ষণ বাইরের শক্তিকে বাইরের সামগ্রীকে বড় ক'রে দেখবে ততক্ষণ কোন ব্যবস্থায় কোনো বিধানে তার বিরোধ মিটবে না। জগৎ যতক্ষণ আমাদের কাছে শক্তির জগৎ দ্রব্যের জগৎ ততক্ষণ স্বভাবতই সে আমাদের স্বার্থের জগৎ; এই স্বার্থকে শুধুমাত্র শান্তির দোহাই দিয়ে কিম্বা শাসনের ভয় দেখিয়ে চিরদিন সংযত রাখা অসম্ভব। একদিকে তার বাঁধ বাঁধলে আর একদিকে তার ধারা বইবেই।...

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে শক্তির লোভ স্বার্থের টান আছে, তাতেই সে কাড়ে, মারে, ঠেলাঠেলি করে; কিন্তু মানুষের প্রকৃতির সব চেয়ে বড় সত্য হচ্চে প্রেম, তাতেই সে আপনাকে ত্যাগ করে, মৃত্যুর উপরে ক্ষতির উপরে জয়ী হয়। জগতে যতক্ষণ শক্তির রূপকেই স্বার্থের রূপকেই একান্ত ক'রে দেখি, তার চেয়ে বড় আর কিছুকে দেখতে পাইনে, ততক্ষণ আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সত্য যে প্রেম, বিশ্বনিয়মের মধ্যে তার কোনই আশ্রয় পাইনে; মানুষের মনের মধ্যে সে একটা খাপছাড়া জিনিষ হয়ে থাকে। তাই সে অবস্থায় আমাদের ব্যবহারে তার প্রভাব ক্ষীণ হয়।

জীববিজ্ঞান কিছুদিন আগে এই কথাই বলেছিল যে, শক্তিই হচ্চে জগতের মূল নীতি, স্বার্থের সংঘাতই হচ্চে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের পদ্ধতি। যার জোর আছে সে-ই জিৎবে সেই টিঁকবে। এই সত্যই বিশ্বের সত্য একথা মানুষ যেদিন স্থির করলে সেদিন থেকে আপনার প্রকৃতির পরম সত্য যে প্রেম তাকে ভিতরে ভিতরে অশ্রদ্ধা করতে লাগল। তখন থেকে য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতাপ নিষ্ঠুর হয়ে সমস্ত পৃথিবীকে পীড়িত করচে।

এই পীড়া যখন স্বয়ং য়ুরোপকে আজ স্পর্শ করেচে তখন সে আপনাকে প্রশ্ন করতে প্রবৃত্ত হয়েচে কি করলে এই পীড়া দূর হয়। প্রশ্নের উত্তরে নানা কৌশলের কথা তার মনে উদয় হচ্চে। একটা কথা এখনো সে সম্পূর্ণ বুঝচে না যে, সত্যের উপলব্ধি যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের অসম্পূর্ণ থাকে ততক্ষণ দুঃখ দেওয়া এবং দুঃখ পাওয়া থেকে কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না। যতক্ষণ বিশ্বপ্রকৃতির শক্তিকেই প্রধান ক'রে দেখব ততক্ষণ স্বার্থকেই আশ্রয় ব'লে আঁকড়ে ধরব। অবশেষে "স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে।"

মানব প্রকৃতির সব চেয়ে বড় সত্য যে প্রেম সে যদি একটা সৃষ্টিছাড়া পদার্থ না হয়, বিশ্ববিধানে সেও যদি সবচেয়ে বড় সত্য হয় তবে সেই প্রেমের আশ্রয় ও উৎস বিশ্বের মূলে কেউ আছেন। কেন না প্রেম-পদার্থ ব্যক্তিগত। ব্যক্তির সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ ছাড়া প্রেমের আর কোনো অর্থ থাকতে পারে না। শক্তির উর্দ্ধে সেই ব্যক্তিকে সেই পরমপুরুষকে যদি দেখতে পাই তাহলেই আমাদের প্রকৃতির পরম সত্য আপন চরম পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে। সেই পরিতৃপ্তি স্বার্থকে ত্যাগের দ্বারাই আপনাকে প্রকাশ করে। এই পরিতৃপ্তিতেই কল্যাণ।...

...ক্রিয়া ব'লে জানা। কেননা, তাতে ক'রে সমস্ত জগতের সঙ্গে মানুষের একেবারে গোড়ায় তফাৎ ঘটে। সেই ভয়ঙ্কর অসামঞ্জস্যে মনুষ্যত্বটা একটা মূলহীন পদার্থ হয়ে দেখা দেয়; কাজেই ধর্ম্মকে একটা বানানো জিনিষ মনে করায় তার দাম ক'মে যায়, ত্যাগমাত্রকে নিতান্ত ফাঁকি ব'লে মনে হয়। মানুষের একটি ব্যক্তিত্ব আছে অথচ যে জগতে তার জন্ম, যেখানে তার স্থিতি, সেখানে সর্ব্বত্র বস্তু অসীম, শক্তি অমর, তথাপি সেখানকার আদি অন্তে ব্যক্তিত্বের লেশ নেই, এই কথা যদি মনে করি,—অর্থাৎ যে আত্মাকে নিজের মধ্যে একান্ত উপলব্ধি করচি, যে আত্মা কেবল যে আপনাকে জানে তা নয় আপনার স্বরূপে স্বভাবে যার আনন্দ, এবং সেই আনন্দে যে আপনাকে নানা কর্ম্মে ও নানা সম্বন্ধে দান করে সেই আমার আত্মার সঙ্গে বিরাট বিশ্বে কোথাও আত্মিক সম্বন্ধের কোনো আশ্রয় নেই, এই কথাটা যদি স্বীকার করি তবে তার মত এমন ভয়ঙ্কর অকল্যাণ মানুষের পক্ষে আর কিছু হ'তে পারে না। আমাদের যা কিছু পাপ, পরস্পরের প্রতি যা কিছু অন্যায় সমস্তেরই মূল এইখানে। আধ্যাত্মিক সত্যকে জগতে জীবনে যে পরিমাণে কম উপলব্ধি করচি সেই পরিমাণেই বেশি ক'রে নিজের ও অপরের পক্ষে দুঃখের কারণ হয়ে উঠচি।

বিচিত্রা—শ্রাবণ, ১৩৩৭ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

বর্ত্তমান যুগের নারীসমস্যা

স্ত্রীপুরুষ লইয়া সংসার—উভয়ের সমবেত চেষ্টায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়। এ দুইয়ের শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি যদি একরূপ না হয়, তবে সংসার কতকটা অচল হয়, একপায় খুঁড়াইয়া খুঁড়াইয়া কোন-রকমে চলিতে পারা যায় বটে কিন্তু তা বেশীক্ষণ নয়।...

পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা টুলো-পণ্ডিতদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাঁহাদের মেয়েরাও অনেক সময়ে খুব উচ্চশিক্ষা পাইতেন। ফরিদপুরের বৈজয়ন্তী দেবী বিবিধ সংস্কৃত-গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছিলেন; লালা জয়নারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী, লালা রামগতির কন্যা আনন্দময়ী দেবী রাজবল্লভের অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের কুণ্ড কিরূপ হইবে, তাহা শাস্ত্র দেখিয়া স্বয়ং আঁকিয়া দিয়াছিলেন; ষোড়শ শতাব্দীতে বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাদেবী রামায়ণের যে সুললিত বঙ্গানুবাদ করেন তাহা মৈমনসিংহের মহিলারা বিবাহ-উৎসবে এখনও গান করিয়া থাকেন। এরূপ বিদুষী মহিলাদের অনেকের নাম আমরা জানি।

কিন্তু সাধারণ ভদ্রসমাজের মহিলারা উচ্চশিক্ষা না পাইলেও তাঁহাদের অনেকেই রামায়ণ, মহাভারত পড়িতে পারিতেন; পুরাণের উপাখ্যান সকলেই জানিতেন, গৃহস্থ ভদ্রলোকদের বিদ্যার দৌড়ও তাহা হইতে বড় বেশী ছিল না। স্ত্রী, পুরুষ উঁহাদের উভয়ের আদর্শ

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। পুরুষ কৃষি, জমিজমার কাজ, দরবারে দপ্তরে লেখাপড়া এবং রাষ্ট্রশাসনের কাজ করিতেন; মেয়েরা ঘরের সমস্ত কাজ অতি সুন্দররূপভাবে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহারা প্রিয়জনের জন্য রান্নাঘরে নূতন নূতন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় দিতেন; ক্ষেত্র হইতে ফসল আসিলে তাহা গোলায় তুলিতেন; ভাঁড়ার রাখিতেন; কন্থাসীবন ও আলিপনায় বিচিত্র কৌশল দেখাইতেন—তাঁহারা কথকতা, কীর্ত্তন, গীতার ব্যাখ্যা ও পুরাণপাঠ শুনিতেন। এখন চাকর ও বামুনেরা যাহা করে তাহার অনেক কাজই তাঁহারা প্রসন্নমনে করিতেন। ইহা তাঁহাদের দাসীবৃত্তি ছিল না, প্রিয়জনের জন্য এই সেবাবৃত্তি ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।...

এখন মহিলাদের জীবনের প্রয়োজনের অঙ্ক প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। সহরে যাহা দেখি তাহাতে ত মনে হয় তাঁহাদের কোন প্রয়োজনই নাই। পাড়াগাঁয়েও সহরের এই আবহাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে। মধ্যবিত্তগণের সংসারে স্ত্রীলোকের প্রয়োজন ক্রমে হ্রাস পাইয়া যাইতেছে। তিনি রান্নাঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছুক নহেন। শিশুপালনের ভারে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়েন। সেকালে মেয়েরা ঢেঁকি কুটিতেন, আধক্রোশ দূরের নদী হইতে কলসী করিয়া জল আনিতেন, জাঁতা চালাইতেন, চরকায় সুতা কাটিতেন, অম্লানবদনে গরুর সেবা, গোয়ালে ধোঁয়া দেওয়া ও গোময়ে ঘরের মেঝে ও উঠান মার্জ্জনা করিতেন—এই সকল কার্য্যে শরীর সবল ও পুষ্ট হইত—ইহা একরূপ ব্যায়াম ছিল। এখনকার মেয়েরা গোময় এবং ঢেঁকির কথা শুনিলে আতঙ্কিত হইবেন। বাসনকোশন ঝিয়েরা মার্জ্জনা করিয়া থাকে, লবণসমুদ্রের তীরবাসী উড়ে-বামুন ব্যঞ্জনাদি অতিরিক্ত লবণে অখাদ্য করিয়া গৃহস্বামীর পাতে দিয়া যায়,—অনেক সময়ে গৃহিণী উঁকি মারিয়াও রান্নাঘরের ব্যাপার দেখেন না।

এখন অনেক সময়ে গৃহিণী সংসারের পক্ষে শুধু অপ্রয়োজনীয় নহেন, তিনি গৃহস্থের কাঁধের একটা অতিরিক্ত বোঝা—অষ্টপ্রহর তাঁহার পীড়া লাগিয়াই আছে; শিশুসন্তানগুলি ঘর ভর্ত্তি করিয়া গৃহস্থের মাথা দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে বিব্রত করিয়া ফেলিতেছে। ইহা ছাড়া তাঁহার সিনেমা, নাটক, সার্কাস, প্রহসন প্রভৃতি দেখার সখ পুরুষটিকে মিটাইতে হয়। রিক্তহস্ত ভদ্রলোকের সংসার যে কতখানি দুঃসহ হইয়াছে তাহার চিত্র বাঙ্গালার ঘরে ঘরে মর্ম্মন্তুদ রেখায় অঙ্কিত রহিয়াছে।...

তারপর যে-কথা লইয়া সুরু করা গিয়াছিল, শিক্ষিত যুবককে প্রায়ই অশিক্ষিত স্ত্রীকে লইয়া সংসার চালাইতে হয়,—উভয়ে শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে দুই বিভিন্ন মেরুতে দাঁড়াইয়া আছেন।...স্বামী যে-সকল বিষয় চিন্তা করেন স্ত্রী তাহার কোন ধার ধারেন না। যৌন বা দাম্পত্যের যে সুখস্বপ্ন যৌবনের একটা বড় আনন্দ, এইরূপ অসম মিলনে তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হন।...

পূর্ব্বতন সমাজের রীতিনীতি এখন পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। দুঃখের বিষয় প্রাচীন সংস্কারের মৃতদেহটা মেয়েরাই অতিরিক্ত শ্রদ্ধায় আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন।

তথাকথিত হীন জাতির স্পর্শ ইঁহাদের নিকট বিষতুল্য। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—"চলিবার তরে কর উপদেশ পাথর চাপিয়া পিঠে"---আমরাই যাহাদিগকে হীন করিয়া গড়িয়াছি তাহাদের এতটা ঘৃণা করা কি আমাদের সাজে? আপনারা জানেন কি না জানি না. হাড়ি জাতি এককালে বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের পুরোহিতের কাজ করিতেন। গোবিন্দচন্দ্রের গুরু হাড়ি সিদ্ধার নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। দুর্গাপূজার প্রধান পুরোহিত এককালে হাড়িরা ছিলেন, এইজন্য দুর্গা হাড়ির মেয়ে বলিয়া উল্লিখিত। এখনও অনেক কালীমন্দিরের পুরোহিত হাড়ি। মেথর 'মহত্তর' শব্দের অপভ্রংশ;---ইঁহারা বৌদ্ধাধিকারে মহাতান্ত্রিক ছিলেন।...

এই হীন ও অনিষ্টকর জাতিভেদ-প্রথা স্ত্রীলোকেরা যেরূপ উৎকট-ভাবে পালন করিতেছেন তাহাতে হিন্দুসমাজ একেবারে সর্ব্বনাশের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সভাসমিতির সমস্ত প্রস্তাব, সংস্কারকের সমস্ত চেষ্টা উগ্রচণ্ডী পিসী বা বিধবা মাতুলানীর বিক্রমে একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে...

বিবাহের অতিরিক্ত ব্যয় ও পণপ্রথা মেয়েদের প্রশ্রয়ে বাড়িয়া চলিতেছে। স্বামী কন্যাদায়ে ঋণজালে আবদ্ধ, তথাপি সন্তানের বিবাহ উপলক্ষ্যে মেয়েরা তত্ত্ব ও উৎসবাদির জন্য সেই শুষ্কমুখ নিরাশাগ্রস্ত পুরুষটিকে এরূপ পীড়াপীড়ি করেন, যে, তাঁহাকে আরও ঋণে জড়াইয়া পড়িতে হয়।...

ভদ্রঘরের মেয়েরা পূর্ব্বকালে অর্জ্জন করিতেন; তাঁহারা চরকা কাটিয়া, কাপড়ে ফুল তুলিয়া, কাঁথাদি সীবন করিয়া এবং পৈতা তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করিতেন। বিধবারা নিতান্ত নিরাশ্রয় অবস্থাতেও নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন। তাঁহাদের আর একটি প্রধান স্বাবলম্বনের ভিত্তি ছিল কবিরাজী ব্যবসা। বৈদ্যের ঘরের মহিলারা অনেকে নানাপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিতেন ও মুষ্টিযোগ জানিতেন; অনেক সময়ে তাঁহাদের খ্যাতি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িত।...পুরুষ ও স্ত্রীলোক, ইঁহাদের এক শ্রেণী কাজ করিবেন, আর এক শ্রেণী পঙ্গু হইয়া শুইয়া-বসিয়া কবিতা ও গল্পের বই লইয়া সময়াতিপাত করিবেন এবং আলস্য ও কুঅভ্যাসজনিত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া দিবারাত্র পরিশ্রমে ক্লান্ত স্বামীকে হায়রাণ করিয়া তুলিবেন—এই বিসদৃশ দৃশ্য সেকালে দেখা যাইত না।...

যদি আমাদের মেয়েরা শিক্ষয়িত্রী হইয়া গ্রামের মেয়েদের শিক্ষাদান করেন, যদি ভিষকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঘরে বসিয়া মুষ্টিযোগ ও ঔষধ বিক্রয় করেন ও নিজগৃহেই স্ত্রীরোগীদের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন, নানারূপ জামা, রুমাল প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে পাঠান, যদি তাঁহারা খদ্দর তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করেন, তবে তাঁহাদের আর পুরুষের গলগ্রহ হইতে হয় না।

বঙ্গলক্ষ্মী, শ্রাবণ ১৩৩৭   শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

আসামের কুকি জাতি

ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে শ্রীলালতুদাই রায় মহাশয় "আসামের কুকিজাতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধে খ্রীষ্টিয়ান মিশনারীদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে—এই সম্বন্ধে আমার দুই একটি বক্তব্য লিখিতেছি।

লালতুদাই রায় মহাশয় 'অবাঙ্গালী' হইলেও লেখক-হিসাবে তিনি অপটু নন, এবং তাঁহার 'অনভ্যস্ত হস্তের' লেখাতেও তাঁহার মনোভাব যথাযথ প্রকাশ পাইয়াছে। রায় মহাশয় খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী কি-না জানি না, তবে তাঁহাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া মনে হয়—আর তিনি যে নিজে শিক্ষিত এজন্য তিনি নিশ্চয়ই দুঃখিতও নন।

খ্রীষ্টিয়ান মিশনারীগণ যে ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন সেটা বাস্তবিকই প্রেমের ধর্ম্ম। সকলক্ষেত্রে মিশনারীগণ যথার্থ প্রেমিক না হইতে পারেন, কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের অতুলনীয় প্রেমের প্রেরণাতেই তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এখনও করিতেছেন। প্রভু যীশুখ্রীষ্টের প্রেম হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, সভ্য অসভ্য সকল জাতির কাছেই প্রচারিত, প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং প্রভু যীশুখ্রীষ্টের এই আদেশ "তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর।"

রায় মহাশয় কোন্ প্রেমের কথা বলিতেছেন? মিশনারীদের প্রেমে হাবুডুবু খাইবার দরকার নাই।

রায় মহাশয় নিজে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ভূতের পূজা ঠিক নয়। তিনি ভূত, শয়তান এবং মারের যে তুলনা করিয়াছেন :সেটা মোটেই ঠিক হয় নাই। ভূতের পূজা হয় ভূতকে শান্ত রাখিবার জন্য, কারণ কুকিদের বিশ্বাস এই, ভূতের দ্বারাই জগতে রোগ, শোক, ঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি হইয়া থাকে। ব্যাধি এবং নৈসর্গিক বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই ভূতকে মুরগী, মদ ইত্যাদি দিয়া শান্ত রাখিবার চেষ্টা করা হয়।

বৌদ্ধগণ মারের এবং মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ানগণ শয়তানের পূজা করেন না, তাহাকে তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করেন না। যে বিরুদ্ধ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা পাপ করি, যে 'বিপক্ষ' আমাদিগকে বিবেকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে, সেই শয়তানের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই যীশুখ্রীষ্টের স্মরণ লইতে হয়।

"যীশু আমাকে কেমন সুন্দর জুতা দিয়াছেন, টুপি দিয়াছেন, কোট দিয়াছেন, সিগারেট দিয়াছেন" এই কথাগুলি শ্লীলতার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে—ইহা কটূক্তি। 'সিট্ রিজার্ভ' কথাটাও না লিখিলেই ভাল হইত।

রায় মহাশয় বাঁশের চার্চ্চ ও স্কুলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি চার্চ্চের উপর বিরূপ হইতে পারেন কিন্তু যে স্কুলে (মিশনারী স্কুল না হইতেও পারে) তিনি শিক্ষিত হইয়া আজ নিজের মনোভাব এই ভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেছেন, এবং নিশ্চয়ই একটা আত্মপ্রসাদও

উপযুক্ত শিক্ষক না থাকিতে পারে, রীতিমত তত্ত্বাবধান না হইতে পারে—ঐগুলির উন্নতির চেষ্টা করিতে হইলে অন্যভাবে করাই প্রীতিকর।

১। মিশনারীগণ হ্যাট, কোট, বুট পরিতেও বলেন না, সিগারেট পান প্রচলনের চেষ্টাও করেন না। শুধু শুধু ঐ সমস্ত অভ্যাস না করিলেই হয়। আমাদের সবই খারাপ আর পাশ্চাত্যের যা-কিছু সবই ভাল একথা এপর্য্যন্ত কোন মিশনারী বলেন নাই, আর আমাদের সবই ভাল পশ্চিমের সবই খারাপ এও হইতে পারে না। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম উদ্দাম বিলাসিতা শিখায় নাই। পোষাকের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় উহা আমাদের নিজেদের দোষ।

পৃথিবীতে এককালে অর্থের তত প্রয়োজন ছিল না, তখন মানুষ অদলবদল করিয়া সংসার চালাইত। এখন আর সেদিন নাই, মানুষ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, দেশ দেশান্তরে যাইতেছে—অর্থের প্রয়োজনও বাড়িয়াছে। নিজেদের অভাব নিজেরাই বাড়াইয়া তুলিতেছি, অন্যকে দোষী করি কেন?

যেরূপ আগুনে হাত দিলে বাঘে খায় না, কিন্তু হাত পোড়ে, তদ্রূপ চুরি করিলে ভূতে রাগ করিবে এ ধারণা না রাখিয়া 'পাপ হইবে এবং ঈশ্বর শাস্তি দিবেন' এই সত্য উপলব্ধি করাই শ্রেয়।

খ্রীষ্টধর্ম্মের কোথাও এমন শিক্ষা নাই যে, "যিনি খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, তিনি চুরি করুন, নানা অসৎ কাজ করুন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, তার জন্য যে খ্রীষ্টই দায়ী। তিনি ত তাঁর আসন স্বর্গে রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং যাহা প্রাণ চায় কর, কেবল খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করিলেই হইল।"

খ্রীষ্টকে যিনি বিশ্বাস করেন তিনি আর তাঁর ইচ্ছামত কাজ করিতে পারেন না, তিনি ত খ্রীষ্টের। খ্রীষ্টকে ঈশ্বর-প্রেরিত ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া প্রাণপণে তাঁহার আদেশসমূহ পালনের চেষ্টা করা দরকার।

যে খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে সে তাঁহার আদেশ পালনে যত্নবান হয়। কোন মিশনারী কি কুকিদিগকে মিথ্যাকথা বলিতে, অসরল হইতে শিক্ষা দিয়াছেন? আত্মীয় কুটুম্বদিগকে গৃহে স্থান দিতে নিষেধ করিয়াছেন? খ্রীষ্টধর্ম্মের কোথায়ও ত এই প্রকার শিক্ষা নাই।

২। মেষের মাথা কাটিয়া বলদের স্কন্ধে দেওয়ার অর্থ কি?

রায় মহাশয় যদি মনে করেন, কুকি জাতি পূর্ব্বে ধর্ম্মহীন ছিল না, ইহার বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্মদানটি বাহ্যিক নয়,—আন্তরিক। বহু পূর্ব্বকাল হইতেই পৃথিবীতে ধর্ম্মপ্রচার-পদ্ধতি বর্ত্তমান আছে।

৩। সাধারণতঃ ইংরেজ পাদ্রীগণ বাংলার চেয়ে তাহাদের দেশীয় ভাষাই বেশী জানেন। যদি তাঁহারা পূর্ব্বে বুঝিতে পারিতেন যে, কুকি জাতি বাংলা ভাষাকে নিজেদের ভাষা বলিয়া স্বীকার করিবে তবে হয়ত তাহারা কুকি জাতির জন্য বাংলা ভাষায় পুস্তক ছাপাইতে

হইয়াছেন তাঁহারা ত চেষ্টা করিলে নিজেদের জন্য একটা ভাষা সৃষ্টি করিতে পারেন, অথবা বাংলা ভাষায় জোর দিতে পারেন।

৪। ঔষধ দেওয়াটা যে কিসে দোষের হইল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। রোগ বৃদ্ধি এবং সুস্থ সবলকায় লোক কমিয়া যাওয়ার কারণ কি ঔষধ দেওয়া? গাছ-গাছড়া ব্যবহার করাটা অসভ্যতা নয়। টাকা খরচ করিয়া পেটেণ্ট ঔষধ না কিনিলেই হয়। ঔষধ দেওয়ার উদ্দেশ্য বাস্তবিকই দরিদ্র ও অসহায় লোকের সাহায্য করা। "ঔষধ গলাধঃকরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রভু যীশুকে একমাত্র পরিত্রাতা বলিয়া বিশ্বাস করা" কথাটি রায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া একটু ভাবিয়া দেখিবেন।

৫। মদ বন্ধ হইয়াছে ভালই, এখন সিগারেট বন্ধ করিবার চেষ্টা করা দরকার। যাঁহারা খ্রীষ্টিয়ান নন, কোনদিন মিশনারীদের সংস্পর্শে আসেন নাই এমন লক্ষ লক্ষ লোক আজ সিগারেট, চা ব্যবহার করিতেছেন।

"যীশুর ভাব পাইয়া ছেলেরা পিতামাতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, পিতামাতা ছেলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে।" নিউ টেষ্টামেণ্টের এই কথার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া যদি কোন প্রচারক প্রচার করেন তবে তিনি ভুল করিতেছেন। যতদূর মনে হয় সে ভাবের প্রচার হয় নাই।

ব্যর্থ এবং নিষ্প্রয়োজনীয় অনুকরণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ময়ূর কখনও কাককে ময়ূর সাজিতে ডাকে না, কাক যদি নিজে ইচ্ছা করিয়া ময়ূর হইতে চায় তবে তাহাতে ময়ূরের দোষ দেওয়া যায় না, কাককেই নির্যাতিত ও হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ সোমদ্দার

নক্ষত্র সমাজ*

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

শীতের তুষার রাতে আকাশের পশ্চিম কোণার
রঙীন তারাটি মোরে শুধাইল ডাকি,
"ঘুমাইলে নাকি?
কথা যে বলিতে চাই যতটুকু রাত আছে বাকী
মোর সুখ দুখ গাঁথা মনের কথা সে আপনার!
ভোরের নাহি ত দেরী, আর কেন ঘুমের প্রয়াস?
মিলিত এখন যদি মদিরা মধুর,
করি ভরপুর
পাত্রখানি তুলিয়া দিতাম হাতে হয়ে যেত দূর,
শ্রান্তি যত, ভুলে যেতে বেদনার শত হা-হুতাশ
তোমারো কি লাগে শীত, হে মঙ্গল, এই পৌষ রাতে?
সংগ্রাম অসুর তুমি, অমঙ্গল সাথী
কেন জাগো রাতি,
কিসের সে বিভীষিকা অনিদ্রায় ম্লান করে ভাতি
মুদিতে পার না আঁখি নিদ্রা লাগি নিশি না পোহাতে?
কৃত্তিকা, ভরণী, পুষা, মঘা আর দীপ্ত মৃগশিরা
অশ্লেষা অশুদ্ধযাত্রা, যমজ অশ্বিনী, অদৃষ্ট কাহিনী
বলাবলি করি কা'র, ভোর কর ত্রিযামা যামিনী?
শুক্লা রাতি ম্লান হেন, আসে যেন অমা সে তিমিরা
পুষা সে মুচকি হেসে বাঁকা চোখে, কয় চুপি চুপি,
শোন নাই বুঝি?
অরুন্ধতী কত ধন করিয়াছে পুঁজি
সপ্তর্ষি সাধিয়া, আর শনৈশ্চর অনিবার যুঝি,
রক্ত নীল বর্ম্মধারী মৃত্যু-সম নিত্য বহুরূপী!
শীতে হিম তারা ভরা এ নিশীথে ও কালপুরুষ
কি শিকার করে?
বৃষ মেষ সিংহ আর প্রহরে প্রহরে,
আকাশ অরণ্য দন্তে চরণে দলিয়া যারা চরে
শাসন মানে না কারো, নিষ্করুণ একান্ত পরুষ!
কুম্ভ কে ভরিছে রাতে, অন্ধমুনি পুত্র সিন্ধুসম?
শব্দভেদী বাণ
বক্ষে বিন্ধি হরিয়া যে লইবে পরাণ,
দশরথ ব্যাধসম, অন্ধকারে পাবে না সন্ধান
অকস্মাৎ ঘুচাইবে জীবনের তৃষ্ণা তীক্ষ্ণতম!
নীরবে হাসিছে শুকতারা,
শুচি-শুভ্র ধ্রুব নিরুদ্বেগ,
চারিদিক হতে উঠিছে কত না বাণী দূর স্বর্গপথে,
অবোধ্য নহে সে ভাষা, ভাবের উচ্ছ্বাস মনোরথে,

কিশোরগঞ্জ

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী

পাবনার পর ঢাকা, ঢাকার পর ময়মনসিংহ। বাংলা দেশের একশ্রেণীর মুসলমানদের তীব্র হিন্দুবিদ্বেষ কিশোরগঞ্জে লুণ্ঠন, পীড়ন, নির্ম্মম অত্যাচার এবং অমানুষিক বর্ব্বরতার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ময়মনসিংহের মহকুমাগুলির মধ্যে কিশোরগঞ্জ অন্যতম। ইহার লোকসংখ্যা ৮,৬৭,৪২৯; তাহার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ২৩২,০৭২, মুসলমানের সংখ্যা ৬৩৫,২২১। স্বাস্থ্য সমৃদ্ধিতে কিশোরগঞ্জের গ্রামগুলি বাংলা দেশের মধ্যে অতুলনীয় বলিলেও চলে।

কিশোরগঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া মঠখলা পর্য্যন্ত প্রায় পঁচিশ মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা গিয়াছে। এই রাস্তাকে কেন্দ্র ধরিয়া উভয় পার্শ্বে প্রায় দশ মাইল ব্যাসার্দ্ধের মধ্যের সমস্ত গ্রাম গত ১০ই জুলাই হইতে ১৬ই জুলাই পর্য্যন্ত মুসলমানদের অত্যাচারের লীলাভূমি হইয়াছিল। এই রাস্তায় অগ্রসর হইলে বাংলা দেশের চিরাভ্যস্ত পল্লীদৃশ্যগুলি চোখে পড়ে। উচ্চ, উর্ব্বর জমি, কোনও কোনও স্থানে রাস্তা এবং দুই পাশের জমির সমতা অভিন্ন। এই জমিতে আট দশ হাত উঁচু পাট এবং সুপুষ্ট আগ জন্মিয়াছে। কিছু দূর দূরই রাস্তার পাশে একটা বৃহৎ বট কি অশ্বত্থ গাছের তলায় ছোট কয়েকখানা কুটীর; এখানে সপ্তাহে এক কি দুই দিন করিয়া হাট বসে। আর একটু ব্যবধানে, হয়ত আট দশ মাইল দূরে দূরে এক একটি করিয়া বড় বাজার। এই সকল বাজারে বড় বড় মহাজনের গদী এবং দোকান-পাট। মহাজনেরা প্রায়ই হিন্দু, পুরুষানুক্রমে সঞ্চয় ও মিতব্যয়িতার ফলে বৃহৎ বৃহৎ ব্যবসা গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহারা আশে-পাশের গ্রামের সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্য, দূর দূরান্তরের মোকাম হইতে আনিয়া সরবরাহ করে, আবার গ্রামের কৃষকদের উৎপন্নদ্রব্য বাহিরে চালান দেয়। তাহাদের কলিকাতা, ডাণ্ডী, লণ্ডন ও সমস্ত বহির্জগতের যোগসূত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল বাজারকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে অজস্র ঘনসন্নিবিষ্ট গ্রাম। গ্রামের অধিবাসীরা হিন্দু ও মুসলমান, পুরুষানুক্রমে নানা সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া বাস করিয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে ভেদ, বিরোধ, ঈর্ষা, কলহ ছিল না, এমন নহে; কিন্তু তাহা ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়ের নহে। সম্প্রদায়ের এই দুই প্রতিবেশীর স্নেহপ্রীতি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের অজস্র আদানপ্রদানের অন্তরালে এমন সাম্প্রদায়িক আগ্নেয়গিরি উদ্যত হইয়াছিল, তাহা আগে কে ভাবিয়াছিল?

কি করিয়া হঠাৎ অতর্কিতভাবে এই সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তাহার কারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন ইহার কারণ শ্রেণীবিদ্বেষ, কেহ বলেন ইহা সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক, কেহ বা বলেন ইহার মূল কৃষকের আর্থিক দুরবস্থায় নিহিত আছে। কারণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও এক বিষয়ে সকলেই একমত। এই ব্যাপারের পিছনে অনেক দিনের প্রচার এবং আয়োজন চলিয়াছে এবং তাহার বিষময় ফলের এখনও শেষ হয় নাই; আরম্ভের সূচনা দেখা দিয়াছে মাত্র।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কিশোরগঞ্জ শহরে 'ইয়ং কমরেড লীগ' নামক একটি কম্যুনিষ্ট প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রচারকেরা ধনী মহাজন ও জমিদারের বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড এক প্রচারকার্য্যের সূচনা করিয়াছিল। বর্ত্তমান আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এই লীগের কার্য্যকারিতা খুব বাড়িয়া উঠে। গ্রামে গ্রামে মুসলমান কৃষকদের খুব বড় বড় সভা এই লীগের দ্বারা আহূত হয়। তাহাতে বক্তারা তীব্রভাষায় ধনী, জমিদার ও মহাজনের বিরুদ্ধে শ্রোতৃবর্গকে উত্তেজিত করেন। হিন্দুরা

করিয়া ইহার কোনও প্রতিবাদ করেন নাই। এইরূপে একশ্রেণীর হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের মন উত্তেজিত ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া আছে, এমন সময় ঢাকার হাঙ্গামা বাধিয়া উঠিল। ঢাকা হইতে দলে দলে মোল্লাপ্রচারকেরা আসিয়া এই বিদ্বেষাগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। ধনী, মহাজন ও জমিদারের বিরুদ্ধে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াই ছিল, ঢাকার মোল্লারা আসিয়া তাহার সঙ্গে হিন্দু কথাটা বসাইয়া দিল। গ্রামে গ্রামে, দিনে এবং রাত্রে, সম্পন্ন মুসলমানদের বাড়ীতে এবং মসজিদে মুসলমানদের গুপ্তসভা হইতে লাগিল। তাহাতে মোল্লারা সাম্প্রদায়িক বিষ উদ্গীরণ করিতে লাগিল। কিরূপে হিন্দু জমিদার, মহাজন ও ধনীদের উচ্ছেদ সাধন করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করা হইল। স্থির হইল জমিদারদের খাজনা বন্ধ করিতে হইবে, আর ধনীর ধন লুঠ করিয়া তাহার ধনাগমের পথ রোধ করিয়া তাহাকে দরিদ্রের সঙ্গে এক করিতে হইবে। তারপর আর এক সমস্যা। মুসলমানকে কি করিয়া ঋণমুক্ত করিয়া হিন্দু মহাজনের কবল হইতে মুক্ত করা যায়। তাহারও সোজা উপায় নির্দ্ধারিত হইল, 'পিকেটিং'; অর্থাৎ খাতকেরা সমবেত হইয়া মহাজনের বাড়ীতে গিয়া খতপত্র ফেরৎ চাহিবে। না দিলে সত্যাগ্রহ করা হইবে, অর্থাৎ কেহ সেখান হইতে নড়িবে না। তবে এ সত্যাগ্রহ অহিংস হইবার দরকার নাই। দরকার হইলে বলপ্রয়োগ করিতে হইবে। এই সকল কাজ দিবাভাগে করিতে হইবে, কারণ লুণ্ঠনাদি রাত্রে করিলেই 'গোনা' হয়, দিনে করিলে পাপ নাই। তাহার পর আসিল, কাফেরের ধন লুণ্ঠন করিলে পাপ নাই। হিন্দুদিগকে লুঠপাট করিয়া উত্যক্ত করিলে হয় তাহারা মুসলমান হইয়া যাইবে, নয় গ্রাম ছাড়িয়া পলাইবে, তাহাতেও দেশে 'সাম্য' স্থাপনের সুবিধা হইবে। এই সঙ্গে প্রচার করা হইল গবর্ণমেণ্ট কোনও নবাবের কাজে খুশী হইয়া তাহাকে তেরদিনের জন্য 'চার জেলার' লাট করিয়া দিয়াছেন। এই তেরদিন হিন্দুর উপর অত্যাচার করিলে কোনও দণ্ড হইবে না। ঢাকা হইতে আগত লোকের মুখে তথাকার বিবরণ শুনিয়া এ বিষয়ে লোকের আর সন্দেহ রহিল না। এইরূপে ধনসাম্যবাদ, সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য, ধর্ম্মের বিধান, শরিয়তের আদেশের সমন্বয় করিয়া মুসলমানদিগকে হিন্দুর বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তোলা হইল।

আগুন যখন জ্বলিয়া উঠিল, তখন তাহাতে শ্রেণী-বিদ্বেষের নামগন্ধ রহিল না, সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক আকারেই তাহা দেখা দিল। ধনী দরিদ্র, মহাজন খাতকের পার্থক্য রহিল না। ধনী হিন্দুর গৃহও লুণ্ঠিত হইল, দরিদ্র হিন্দুর পর্ণকুটীরও লুণ্ঠিত হইল; ধনী হিন্দুর গৃহ ভস্মীভূত, আসবাবপত্র চূর্ণবিচূর্ণ হইল; দরিদ্র হিন্দুর মৃৎপাত্র ও ছিন্ন কাঁথাটুকুও রেহাই পাইল না। সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমানেরা কেহ সম্মুখে আসিয়া, কেহ পশ্চাৎ হইতে মুসলমানদিগকে প্ররোচিত করিতে লাগিল; ধনীদরিদ্র নির্ব্বিশেষে সমস্ত হিন্দু পর্য্যুদস্ত বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

কিশোরগঞ্জ হইতে প্রায় মাইল-দশেক দূরে চণ্ডীপাশা গ্রামের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সম্পন্ন গৃহস্থ ও তালুকদার। ১০ই জুলাই সকাল বেলা তিনি সংবাদ পাইলেন যে, স্থানীয় গ্রামস্থ মুসলমানেরা তাঁহার বাড়ী লুঠ করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়াছে। তিনি সংবাদ পাইয়া ভীত হইয়া গ্রাম ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কয়েকজন মুসলমান মাতব্বর আসিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল যে, তাঁহার কোন ভয় নাই। তাঁহার উপর যাহাতে কোনও অত্যাচার না হয় তাহার ব্যবস্থা তাহারা করিবে। সুরেনবাবু নিরস্ত হইলেন, কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। সেদিন শুক্রবার; ক্রমে বেলা বাড়িয়া দ্বিপ্রহর হইল। মুসলমানরা সেদিন দলে দলে স্থানীয় মসজিদে সমবেত হইতে লাগিল। গ্রাম্য মসজিদে এত অধিকসংখ্যক লোক আর কখনও হয় নাই। নমাজ হইয়া যাইবার পর মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া সুরেনবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই সুরেনবাবুর প্রজা ও খাতক। সুরেনবাবু নির্ব্বিবাদে দলিলপত্র দিয়া দিলেন। সেখান হইতে তাহারা ঈশ্বরচন্দ্র শীলের বাড়ী গিয়া জোর করিয়া সমস্ত দলিলপত্র আদায় করিয়া লইল। ক্রমে সমস্ত হিন্দু মহাজনের বাড়ী গিয়া কোথাও জোর

করিয়া, কোথাও বা ভয় দেখাইয়া দলিলপত্র বাহির করিয়া লইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে লুটতরাজ চলিতে লাগিল।

এইরূপে সেদিন কাটিয়া গেল। সে রাত্রে আর সে-অঞ্চলের কাহারও চোখে ঘুম রহিল না। হিন্দুরা ভয়-সন্ত্রস্ত হইয়া জাগিয়া কাটাইল। মুসলমানরা গ্রামে গ্রামে দলে দলে একত্র হইয়া পর দিনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। রাত্রি শেষ হইতেই তাহাদের ঘন ঘন 'আল্লা হো আকবর' এবং কয়েকজন নামজাদা মুসলমানের জয়ধ্বনিতে গ্রামের আকাশ মুখরিত হইয়া উঠিল। আগের দিনের সাফল্যে তাহাদের উৎসাহ এবং নিষ্ঠুরতা বাড়িয়া গিয়াছে। সকাল হইতেই তাহারা দলে দলে হিন্দুদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। আজ তাহাদের মূর্ত্তি বদলাইয়া গিয়াছে। তাহাদের হাতে লাঠি, সড়কি, দা প্রভৃতি সাজ্ঘাতিক অস্ত্র, চোখে হিংস্র দৃষ্টি। ভোর হইতেই গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। হিন্দুরা কেহ সপরিবারে গৃহত্যাগ করিয়া বাড়ীর পার্শ্বে জঙ্গলে পলায়ন করিল, অতি অল্পসংখ্যক লোক কোনও কোনও মুসলমানের বাড়ী আশ্রয় লইল। ১১ই জুলাই বেলা ৭টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত, প্রায় ১০০ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া ১৮ খানি গ্রাম লুণ্ঠিত হইল।

১২ই জুলাইও আক্রমণ বাড়িয়া চলিল। যে-সকল গ্রাম লুণ্ঠিত হয় নাই তাহা লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। লুণ্ঠিত গ্রামে যে-সকল বাড়ী বাদ পড়িয়াছিল তাহা লুণ্ঠিত হইল। যে-সকল বাড়ী একবার লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহা আর একদল আসিয়া আবার লুণ্ঠন করিল। যেখানে কোনও লুণ্ঠনোপযোগী জিনিষপত্র আর অবশিষ্ট ছিল না, সেখানে গৃহের আসবাবপত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে লাগিল, কোথাও গৃহে আগুন ধরাইয়া দিল। এইরূপে তিন দিন ধরিয়া প্রায় ষাট খানি গ্রামের উপর প্রায় পাঁচশত বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া মুসলমান দুর্ব্বৃত্তদের তাণ্ডবলীলা চলিল; কেহ রোধ করিল না, কেহ বাধা দিল না; কেহ একটি অঙ্গুলি উত্তোলনও করিল না,—না গবর্ণমেণ্ট, না হিন্দুর সঙ্ঘবদ্ধশক্তি, না মুসলমানের লুপ্তাবশেষ ধর্ম্মবুদ্ধি।

এই বিয়োগান্ত নাটকের সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়াছে জাঙ্গালিয়া গ্রামে। এই গ্রাম কিশোরগঞ্জ হইতে প্রায় পনের মাইল দূরে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় এখানকার অবস্থাপন্ন তালুকদার ছিলেন। কৃষ্ণবাবু তাঁহার চরিত্রবল ও দৃঢ়চিত্ততায় স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং প্রেসিডেণ্ট হিসাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ১০ই জুলাই রাত্রেই কৃষ্ণবাবু চণ্ডীপাশার সংবাদ এবং তৎসঙ্গে পরদিন তাঁহাদের গ্রাম লুণ্ঠিত হইবার সম্ভাবনার কথা অবগত হইয়াছিলেন। পরিবারবর্গকে কিশোরগঞ্জ পাঠাইবার জন্য শেষরাত্রে হোসেনপুর হইতে একখানা মোটর আনাইয়াছিলেন। কিন্তু মোটরখানা আসিবার পর তাহার ইঞ্জিন খারাপ হইয়া যাওয়ায় মোটরখানা অচল হইয়া পড়িল।

পরদিন বেলা সাতটার সময় দলে দলে মুসলমান আসিয়া কৃষ্ণবাবুর বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। কৃষ্ণবাবুর বৃহৎ বাড়ীতে গ্রামের আরও বহু বাড়ীর স্ত্রীপুরুষ আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। বাড়ীতে দুইটি বন্দুক ছিল। কৃষ্ণবাবু একটি বন্দুক নিজে লইলেন, আর একটি তাঁহার অষ্টাদশবর্ষীয় একমাত্র পুত্র সুবোধ লইল। ইত্যবসরে জনতা আসিয়া বাড়ীর চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল।

কৃষ্ণবাবুর ইউনিয়ন বোর্ডে একজন মুসলমান কর্ম্মচারী ছিল। কৃষ্ণবাবু তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনি তাহার বহু উপকার করিয়াছিলেন এবং তিনিই তাহার চাকরি করিয়া দেন। বাড়ীতে বন্দুক থাকিলেও কার্টিজ ছিল মাত্র কুড়ি একুশটি। তাহার মধ্যে আবার বেশীর ভাগই ছর্‌রা, বুলেট খুব কমই ছিল। সেজন্য কৃষ্ণবাবু কি উপায়ে জনতাকে শান্ত করা যায় তাহা জানিবার জন্য তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সে ত আর ফিরিলই না, তাঁহার হাতে যে গুলিবারুদ বেশী নাই এই সংবাদটি জনতার কাছে গিয়া পৌঁছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জনতা তাঁহার বাড়ীতে ঢুকিয়া আক্রমণ করিল। কৃষ্ণবাবু ও সুবোধ প্রথমে কয়েকটি

বেণু
শ্রীঅযোধ্যা লাল

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ফাঁকা আওয়াজ করিয়া পরে গুলি ছাড়িতে লাগিলেন। কয়েকজন মুসলমান হতাহত হইল। দুর্ব্বৃত্তেরা তখন পিছু হটিয়া বাড়ীর পার্শ্বস্থ মাঠে সমবেত হইল। একটি মোল্লা সেখানে উপস্থিত ছিল। সে জনতাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। এবার যদি তোরা কৃষ্ণবাবুকে জীবিত রাখিয়া যাস, তবে আর ভবিষ্যতে এ গ্রামে টিকিতে পারিবি না; তোদের মধ্যে যে পলাইবে সে মুসলমান নয়, সে শূওরের 'লৌ' (রক্ত) খায়। অশিক্ষিত জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহারা আবার দলে দলে বাড়ীতে ঢুকিতে লাগিল। আবার গুলি চলিতে লাগিল। কয়েকজন মুসলমান আবার হতাহত হইল।

ক্রমে কৃষ্ণবাবুর গুলি কয়টি ফুরাইয়া গেল। একথা বুঝিতে জনতার বেশী দেরি লাগিল না। কিন্তু তাহারা হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে না ঢুকিয়া খড়ের গাদা হইতে খড় লইয়া একখানির পর আর একখানি ঘরে আগুন ধরাইয়া দিতে লাগিল। যে ঘরখানির মধ্যে কৃষ্ণবাবু সপরিবারে এবং গ্রামের অন্যান্য বহু স্ত্রীপুরুষ আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহার চারিদিকে আগুন ধরিয়া উঠিল। তখন ঘরের মধ্যেকার লোকেরা নিরুপায় হইয়া ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইতে লাগিল। এইবার বর্ব্বরেরা তাহাদের পাশবিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইল। কৃষ্ণবাবুর পরিবারের এক একজন লোক বাহির হইতে লাগিলেন আর মুসলমানেরা পৈশাচিক উল্লাসে চীৎকার করিতে করিতে তাঁহাকে শত শত লাঠির আঘাতে হত্যা করিয়া, কুঠারে তাহাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করিয়া মৃতদেহগুলি ইতস্ততঃ ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। একে একে কৃষ্ণবাবু, তাঁহার একমাত্র ছেলে সুবোধ, তাঁহার ভ্রাতা ও দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁহার শ্বশুর এবং বাড়ীর অন্যান্য কয়েকজন, সর্ব্বশুদ্ধ নয়জন নিহত হইলেন।

ঘটনার কয়েকদিন পরে আমরা কৃষ্ণবাবুর বাড়ী দেখিতে গিয়াছিলাম। সুবৃহৎ আঙ্গিনার মধ্যে বড় বড় পনেরখানা পাকা ভিটা পড়িয়া আছে। দগ্ধ টিনগুলি আশে-পাশে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কয়েকদিন আগে যে এখানে এক জনমুখরিত সুবৃহৎ পরিবারের আবাসস্থল ছিল, আজ তাহার চিহ্নমাত্র নাই। সমস্ত গৃহের সমস্ত জিনিষপত্র নিঃশেষে লুণ্ঠিত এবং ভস্মীভূত হইয়াছে। শুধু একখানা ঘরের মধ্যে অর্দ্ধদগ্ধ একখানা খাট পড়িয়া আছে। কৃষ্ণবাবু গত মাঘ মাসে তাঁহার ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন, উহা তাহারই যৌতুকের খাট। কোন্ অভাগিনী বালিকার বাসরশয্যার এই চরম চিহ্নটুকু তাহার পরম দুর্ভাগ্যের সাক্ষীস্বরূপে বিরাজ করিতেছে। আর আছে কয়েকটি গরু, আগন্তুক পুলিশকর্ম্মচারী ও রিলিফকর্ম্মীদের মুখের দিকে করুণ নেত্রে চাহিয়া থাকে, যেন জিজ্ঞাসা করে এখানে যাহারা ছিল, তাহারা কোথায় গেল? আর একটি প্রভুভক্ত মুসলমান চাকর সেই শ্মশানক্ষেত্রে প্রেতের ন্যায় বিচরণ করে।

এই লুণ্ঠন, পীড়ন, নৃশংস অত্যাচারের অন্তরালে কত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার ইয়ত্তা

পরলোকগত কৃষ্ণচন্দ্র রায়, তাঁহার পত্নী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবোধ

নাই। যখন দুর্ব্বৃত্তেরা কৃষ্ণবাবুকে পৈশাচিক উল্লাসে লাঠি মারিতেছিল; তখন তাঁহার সাধ্বী পত্নী তাঁহার

হতজ্ঞান মৃতপ্রায় দেহের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া স্বামীকে আততায়ীর হাত হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, 'ওরে, তোরা আমাকে মারিয়া ওঁর জীবন ভিক্ষা দে।' পশুরা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া লাঠি ও দা

কৃষ্ণবাবুর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ

চালাইতে লাগিল। সাংঘাতিক আহত হইয়াও যখন তিনি স্বামীকে ছাড়িলেন না। তখন দুর্ব্বৃত্তেরা জোর করিয়া কৃষ্ণবাবুর দেহ হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

কৃষ্ণবাবুরা ঘরে থাকিতেই, তাঁহার এক আত্মীয় মুসলমানদের বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়াছিলেন। যখন চারিদিক হইতে আগুন ধরিয়া উঠিল, তখন আর উপায় নাই দেখিয়া গৃহের সকলে দরজা খুলিয়া একে একে বাহির হইতে লাগিলেন। আহত ব্যক্তি তখন চলচ্ছক্তিবিহীন। কৃষ্ণবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শৈলেশ এই আহত ব্যক্তিকে কাঁধে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল। চারিদিক হইতে তাহার উপর অজস্র লাঠি পড়িতে লাগিল। তবুও সে বিচলিত হইল না, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই শত শত লোক আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। গুরুতর আহত হইয়া সে পড়িয়া গেল। তখন দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাকে হত্যা করিয়া, তাহার দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার আহত হতজ্ঞান আত্মীয়কে মৃত মনে করিয়া চলিয়া গেল।

এক গ্রামে এক নারী প্রসব-বেদনায় কাতর, এমন সময় দুর্ব্বৃত্তেরা বাড়ী আক্রমণ করিল। বাড়ীর সমস্ত গৃহ লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত করিয়া তাহারা যখন সূতিকাঘরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল তখন তাহাদিগকে সেই নারীর অবস্থার কথা বলা হইল। দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া সেই গৃহে ঢুকিয়া পড়িল। তখন সেই গৃহের একটি নারী সেই ক্ষিপ্ত জনতার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, 'ওরে তোরা একি কচ্ছিস, তোরা কি কেউ মায়ের পেটে জন্মাস্ নাই,' জনতার লুপ্ত মনুষ্যত্বের খানিকটা বুঝি ফিরিয়া আসিল। সেদিন আর তাহারা সেখানে লুঠ করিল না।

এই নিদারুণ মর্ম্মান্তিক বিয়োগান্ত নাটকের মাঝে মাঝেও হাস্যরসের ক্ষীণ রেখাপাত হইয়াছে। চার জিলার নব নিযুক্ত লাটের অনেক আমীর-ওমরাও দরকার হইবে ইহা অশিক্ষিত জনতার অবিদিত ছিল না। তাহারা সেজন্য নিজেদের মধ্যে কে আমীর-ওমরাও হইবে তাহা আগে হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। এক গ্রামের একটি যাত্রাদলের পোষাকগুলি লুণ্ঠিত হয়। জনতার নেতারা এই-সকল পোষাক, তাজ উষ্ণীষ পরিয়া লুণ্ঠনকারীদিগকে চালিত করিতেছিল এইরূপ পোষাক পরিহিত কয়েকজন আমীর ওমরাহ ও সেনাপতি পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে।

এক গ্রামের একজন ধনী জমিদারের চাকরের তাহার প্রভুর স্থান অধিকার করিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। ঘটনার পূর্ব্বদিন সে যথারীতি ধান মাড়াইয়া এবং গোয়ালঘরে গরু তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে। পরদিন সকালবেলায় সে জনতার সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। জমিদারের বৈঠকখানায় তাঁহার বসিবার চেয়ারে বসিয়া

প্রভুকে ডাকিয়া পাঠাইল। প্রভু আসিতেই তাহার উপর হুকুম হইল যে, তাঁহাকে এখনই দলিলপত্রগুলি বাহির করিয়া দিয়া 'মা-ঠাকরুণদের' লইয়া বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কারণ বাড়ী লুঠ করিবার হুকুম হইয়াছে। এইরূপে আবুহোসেনের মত তিন দিন প্রভুগৃহে রাজত্ব করিয়া সে ফেরার হইয়াছে।

এই ঘটনায় আর্থিক ক্ষতি কত হইয়াছে তাহা এখনও নিরূপণ করা কঠিন। সম্ভবতঃ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার কম হইবে না। কিন্তু এই ঘটনায় সবচেয়ে যে ক্ষতিটি বেশী হইয়াছে তাহা আর্থিক নয়,—নৈতিক। এই চারদিনের ঘটনাবলী হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার আদান-প্রদান ও সম্পর্কের ভিত্তি নাড়াইয়া দিয়া গিয়াছে। জমিদার ও প্রজা, মহাজন ও খাতক, উপকারী ও উপকৃত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধের বন্ধন শিথিল এবং স্থানে স্থানে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কারণ যে-রোগীকে চিকিৎসক হয়ত বিনাপয়সায় চিকিৎসা করিয়া বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন, আজ সে লাঠি লইয়া আসিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়াছে, তাঁহার ঔষধপত্র যন্ত্রপাতি চুরমার করিয়াছে। কাল যে খাতক মহাজনের দ্বারে ধর্ণা দিয়া টাকা কর্জ্জ লইয়া গিয়াছে, আজ সে আসিয়া মহাজনের মাথার উপর দা উঠাইয়াছে। কাল যে ভৃত্য ছিল, যে হয়ত পুরুষানুক্রমে এই বাড়ীর অন্নে, অর্থে প্রতিপালিত হইয়াছে, পুষ্ট হইয়াছে, আজ সে আসিয়া প্রভুর মাথায় লাঠি উদ্যত করিল। কাল যে বিশ্বাসভাজন প্রতিবেশী ছিল, যাহার সঙ্গে দাদা, মামা, ভাই প্রভৃতি অজস্র স্নেহসম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল, যে চিরকাল আপদে-বিপদে উৎসবে-ব্যসনে পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আজ সে যখন বাড়ী লুঠ করিতে আসিল, কোনও প্রকার নৃশংস অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইল না, তখন বহুদিনের গঠিত সৌধ যেন ভূমিকম্পের এক আঘাতে হঠাৎ ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

অপ্রশস্ত স্থানের যাহারা শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও চিন্তাশীল হিন্দু আছেন, সর্ব্বপ্রকার ক্ষতির চেয়ে এই আঘাতই তাঁহাদের বেশী বাজিয়াছে। কোনও গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত কংগ্রেসকর্ম্মীকে গ্রামের অন্যান্য সকলে এই ব্যাপারে কয়েকদিন পূর্ব্বে সাবধান হইতে বলেন। তিনি কংগ্রেসকর্ম্মী, প্যাক্ট-পন্থী, হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য হিন্দুর ত্যাগ স্বীকার নীতিতে বিশ্বাসবান। আজ যখন এই স্বরাজ-সংগ্রামের দিনে দেশের দিক হইতে মিলনের ডাক আসিতেছে, তখন এমন কিছু হইতে পারে তাহা তিনি বিশ্বাস করেন নাই। তারপর সত্যসত্যই যখন একদিন সকালে লুণ্ঠনকারীরা তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাঁহার চোখের সামনে তাঁহার বাড়ীঘর লুঠ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল, তখন তিনি অসহ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। কিন্তু আর্থিক ক্ষতি তাঁহার বুকে তেমন করিয়া বাজে নাই, যেমন বাজিয়াছে এই বিশ্বাসভঙ্গের আঘাত। এ যেন, যখন দুই ভাই এক অন্যের উপর পরম নির্ভরতার সহিত, এক বিপদসঙ্কুল পথে পাশাপাশি চলিতেছে, তখন একে অন্যের বুকে ছুরি বসাইয়া দিল। তাঁহার সুদীর্ঘ সাধনা, আজীবনের বিশ্বাস একমুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

কিশোরগঞ্জের সমস্যা স্থানীয় সমস্যা নহে। তাহা সমগ্র বাংলার এবং কোনও কোনও বিষয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্যা। যদি কোন সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক, সময়ে সময়ে, হয়ত কোনও কারণে, হয়ত বা অকারণে (যেমন কিশোরগঞ্জে হইয়াছে) এমন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতে পারে যে, তাহাদের মধ্যে দয়া, মায়া, স্নেহ, শিশুর প্রতি করুণা, নারীর প্রতি মর্য্যাদাবোধ, একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়; যে সকল নীতি এবং আইনের বন্ধন সভ্য জগতে বহুদিন ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং যাহার ফলে বহু মানুষের একত্র বাস করা সম্ভব হইয়াছে, তাহা যদি ভগ্ন হইয়া যায়,—তবে এই সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অত্যন্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ আর এক সম্প্রদায়ের বাস করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, ইহাই কিশোরগঞ্জের সমস্যা। এই সমস্যার আজ মাত্র উদ্ভব হইয়াছে, কবে ইহার শেষ বা সমাধান হইবে তাহা বলা যায় না, কিন্তু প্রত্যেক হিন্দুর এই সমস্যার কথা ধীর এবং গভীরভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে এবং প্রত্যেক মুসলমানেরও।

অভিধান

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ, সি-আই-ই

অভিধান বলিতে গেলে সংস্কৃতে তিনটি জিনিষ বুঝায়,—(১) পর্য্যায়, (২) নানার্থ, (৩) লিঙ্গ। একটি জিনিষের যতগুলি নাম থাকে সেগুলি একত্র করিলে পর্য্যায় হয়। একশব্দের নানারূপ অর্থ থাকিলে তাহার নাম নানার্থ হয়। সংস্কৃত সকল শব্দেরই একটা লিঙ্গ আছে, সেগুলি নির্ণয় করা বড় কঠিন। অভিধানের যে ভাগে শব্দের লিঙ্গ নির্ণয় করা থাকে তাহার নাম লিঙ্গ। (১) পর্য্যায়ের সকলের চেয়ে পুরাণ পুঁথির নাম নিঘণ্টু। ইহা বেদের অঙ্গ, মুখস্থ করিয়া রাখিতে হয় বলিয়া ইহারও নাম আম্নায় বা সমাম্নায়। বেদের পর ব্যাড়ির 'সংগ্রহে' বোধ হয় অনেক পর্য্যায়ের কথা ছিল। (২) নানার্থের অনেক প্রাচীন পুঁথি আছে, তাহার মধ্যে 'নানার্থ-শব্দরত্ন' নামে কালিদাসের এক পুঁথি আছে। (৩) লিঙ্গের পুঁথির আদি আচার্য্য বররুচি, কারণ এ-সম্বন্ধে সকল লোকই বররুচির দোহাই দেয় এবং তাঁহার নামেও পুঁথি চলে।

সংস্কৃত অভিধানের মধ্যে অমরকোষের খুব খাতির, কারণ উহাতে তিনই আছে। অল্পেই মুখস্থ করা চলে, আর মুখস্থ করিলে শব্দশাস্ত্রে পণ্ডিত হওয়া যায়। অনেক জায়গায় ব্রাহ্মণের ছেলেরা এখনও সাত আট বৎসর বয়সেই অমরকোষ মুখস্থ করিয়া ফেলে। অমরকোষ মুখস্থ না থাকিলে পণ্ডিতের ভিতর গণ্যই হয় না। সংস্কৃতে আরও অনেক অভিধান আছে। সংস্কৃত সব অভিধান একত্র করিলে ঘর ভরিয়া যায়। কিন্তু অমরকোষের আদর সকলের চেয়ে বেশী, উহার চল্লিশখানির অধিক টীকা আছে ও পরিশিষ্ট আছে। বাঙ্গালায় উহার দুইখানি টীকা খুব ভাল—একখানি সর্ব্বানন্দ বাঁড়ুয্যের, লেখা ১১৫৯ খৃষ্টাব্দে, উহার নাম 'টীকাসর্ব্বস্ব'। দশখানি টীকা দেখিয়া এই নূতন টীকাখানি লেখা। এই টীকায় প্রায় ২০০ শত সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালা প্রতিবাক্য দেওয়া আছে। আর একখানি টীকার নাম 'পদচন্দ্রিকা'। টীকাকারের নাম বৃহস্পতি মাহিন্তা বা মতিলাল। ইনি গৌড়ের হিন্দু সুলতানের নিকট 'রায়মুকুট' উপাধি পান। টীকাখানি ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে লেখা হয়। অমরকোষের একখানি পরিশিষ্ট আছে, উহার নাম 'ত্রিকাণ্ডশেষ'। অমরকোষে পর্য্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গ নামে তিনটি কাণ্ড হইয়াছে। পরিশিষ্টকার একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত—তিনি কত পুরাণ বলা যায় না, তবে সর্ব্বানন্দ ১১৫৯ সালে তাঁহার বই হইতে অনেক জিনিষ লইয়াছেন, সুতরাং তিনি সর্ব্বানন্দেরও আগেকার লোক, তাঁহার নাম পুরুষোত্তম দেব। অমরকোষ যেখানে এক পর্য্যায়ে সতেরটি শব্দ লিখিয়াছেন ইনি সেখানে সাঁইত্রিশটিও করিয়াছেন, সুতরাং তিনি অমরকোষের অনেক পরের লোক এবং অমরকোষের পর যত শব্দ চলিত হইয়াছিল তাহাদের একটা "চলন্তিকা" লিখিয়াছেন। ইনি একজন বড় শাব্দিক পণ্ডিত ছিলেন। ইনি পাণিনির বৈদিকসূত্র ছাড়িয়া দিয়া ভাষাসূত্রগুলির বৌদ্ধমতে এক বৃত্তি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম 'ভাষাবৃত্তি'। সম্প্রতি নেপাল হইতে পুঁথি আসিয়াছে। তিনি অনেকগুলি প্রাকৃতভাষার একখানি ব্যাকরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি আরও একখানি ছোট অভিধান লিখিয়া গিয়াছেন, সেখানির নাম "হারাবলি"। এই ছোট অভিধান লিখিবার জন্য তিনি ১২ বৎসর খাটিয়াছেন। অনেক বড় বড় পণ্ডিতের বাড়ী তিনি এইজন্য পড়িয়া থাকিতেন। বইখানি খুব সুন্দর হইয়াছে। যে-সকল শব্দ চলতি ছিল, অথচ উঠিয়া যাইতেছে তাহারই অর্থ করা এই অভিধানের উদ্দেশ্য, সুতরাং এখানিকে আমরা 'অচলন্তিকা' বলিতে পারি। কিন্তু পুরুষোত্তম আর একটি কাজ করিয়া গিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন দেশে পড়িয়া সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ ভেদ হইয়া গিয়াছিল—অনেকে উচ্চারণ ধরিয়া বানান করিত, আবার অনেকে পুরাণ সংস্কৃতের বানান ধরিয়া বানান করিত—অনেক গোলমাল হইত। সংস্কৃত শব্দ সংবৎ—ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে কিন্তু সম্বৎ বলিত, আবার অক্ষরভেদেও অনেক গোলমাল হইত—সেকালে বাঙ্গলায় খ, ক্ষ, ও ষ একই রকমে লেখা হইত—কোথাও ষ-কে খ লিখিত, কোথাও ষ-কে ক্ষ লিখিত, আবার খ-কে ষ লিখিত বা ক্ষ লিখিত, সুতরাং গোলযোগ বাড়িয়া যাইত। এই সকল গোলযোগের জন্য তিনি "বর্ণদেশনা" বলিয়া একখানি বানানের বই লেখেন। উহারই অংশ হয় ব-কারভেদ, য-কারভেদ, স-কারভেদ ও ন-কারভেদ। তিনি যে শব্দে

তাঁহার কথা মানিয়া চলেন, অপণ্ডিতেরা মানেন না, তাই দু'রকম বানান আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। অপণ্ডিতের বানানই বেশী পরিমাণে চলন্তিকা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি বলেন রাজার হুকুম যেমন দ্বিধা না করিয়া মানিয়া যাইতে হয় বর্ণযোজনার হুকুমও তেমনি মানিতে হইবে। কিন্তু রাজার হুকুম রাজভক্তরাই মানিয়া চলে, অভক্তেরা মানে না; তেমনি পণ্ডিতেরা পুরুষোত্তমের হুকুম মানিয়া চলেন, অপণ্ডিতেরা মানেন না। রাজশেখরবাবুর "চলন্তিকায়" বানান লইয়া যতগুলি গোলযোগের কথা আছে প্রায় ১০০০ বৎসর আগে সেই সকল কথারই আলোচনা পুরুষোত্তম করিয়া গিয়াছেন। তবে এখন গোলযোগটাই কিছু বেশী হইয়াছে, কারণ বাঙ্গলায় এমন কি সংস্কৃতেও আরবী, পারসী, ইংরেজি, পোর্ত্তুগীজ প্রভৃতি অনেক শব্দ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের ব-কারভেদ, য-কারভেদ, স-কারভেদ ও ন-কারভেদ লইয়া অনেক বেশী গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে।

সংস্কৃত অভিধান বলিলেই বুঝিতে হইত যে, অভিধান-খানি মুখস্থ করিতে হইবে, কিন্তু ইউরোপে এখন আর অভিধান মুখস্থ করিতে হয় না। শব্দগুলি বর্ণমালা অনুসারে সাজান থাকে, অভিধান খুলিয়া অনায়াসেই শব্দ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, মুখস্থ করার পরিশ্রমটা একেবারেই না করিলেও চলে। ইংরাজেরা বাঙ্গলায় আসার পর হইতেই এইরূপ বর্ণমালানুক্রমে অভিধান লিখিবার চেষ্টা হয়। কোলব্রুক সাহেব একবার অমরকোষ ছাপান এবং তাহার শেষে বর্ণমালা অনুসারে এক পরিশিষ্ট দেন, তাহাতে অমরকোষের সব শব্দ থাকে। এদেশীয় অভিধানে সেই বোধ হয় বর্ণমালানুক্রমের প্রথম ব্যবহার। তাহার পর লীডন্ সাহেব এক বাঙ্গলার অভিধান লেখেন—তাহাতে বাঙ্গলা শব্দগুলি বর্ণমালা অনুসারে সাজান থাকে। লীডন সাহেব বোধ হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্র, পণ্ডিত মহাশয়দের নিকটে বাঙ্গালা শেখেন তাই তাঁর বাঙ্গালা ভাষাটা পণ্ডিতী ভাষা—সংস্কৃত শব্দেরই অভিধান, কারণ পণ্ডিত মহাশয়রা মনে করিতেন চল্‌তি ভাষার আবার একটা অভিধান কি? চলন্তিকা ত সবাই জানে, তার জন্য আবার চলন্তিকার অভিধান কেন? কিন্তু সে সময়কার কলিকাতার ইংরাজি জানা প্রধান পণ্ডিত ৺রামকমল সেন মহাশয়, পণ্ডিত মহাশয়দের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তিনি চলন্তিকা, অচলন্তিকা দুই লইয়া এক প্রকাণ্ড অভিধান লেখেন, কিন্তু এই দু'খানি অভিধানই আর পাওয়া যায় না; দুইখানিই ১০০ বৎসর

তাহার পর বাঙ্গালায় অনেক অভিধান হইয়াছে। কতকগুলি সংস্কৃত অভিধান বাঙ্গলা অক্ষরে ছাপা হইয়াছে, যেমন গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের "শব্দসার"। অভিধানখানি বেশ ছোটখাটো, সর্ব্বদাই ব্যবহার করা চলে, কিন্তু শব্দগুলি সব সংস্কৃত—সংস্কৃত ছাত্রদের জন্যই লেখা। স্কুলবুক সোসাইটি একখানি ছোটখাটো বাঙ্গালা অভিধান লেখাইয়াছিলেন—সেখানি খুব কাজের বই হইয়াছিল, কিন্তু এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বটতলা হইতে "শব্দার্থ-প্রকাশিকা" নামে একখানি অভিধান বাহির হইয়াছিল, সেখানি আমরা ছেলেবেলায় খুব ব্যবহার করিয়াছি—এখন আর দেখিতে পাই না। বটতলা হইতে আরও দু-একখানি অভিধান বাহির হইয়াছিল তাহাও অচলন্তিকা হইয়া গিয়াছে। ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি অভিধান লিখিয়াছিলেন—'প' অক্ষর পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর তিনি অভিধান লেখা ছাড়িয়াই দিলেন।

এখন অনেকগুলি অভিধান বাঙ্গালায় চলিত আছে, যথা রামকমল বিদ্যালঙ্কারের প্রকৃতিবাদ অভিধান, সুবলচন্দ্র মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধান, যোগেশচন্দ্র রায়ের বাঙ্গালা শব্দকোষ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান। প্রথম দুইখানি প্রধানতঃ সংস্কৃত শব্দের অভিধান, তৃতীয়টি কেবল বাঙ্গালা শব্দের, চতুর্থটিতে সংস্কৃত অ-সংস্কৃত দুই রকম শব্দই আছে। এই অভিধানগুলি বেশ একটু বড়, সর্ব্বদা ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। সুবলচন্দ্রের ছোট একখানি অভিধান আছে বটে, কিন্তু তাহাতে অ-সংস্কৃত শব্দ নাই বলিলেই হয়। তাই একখানি ছোটখাটো প্রকৃত বাঙ্গালা অভিধানের বড়ই দরকার ছিল। শ্রীযুক্ত বাবু রাজশেখর বসু 'চলন্তিকা' লিখিয়া সে অভাব পূরণ করিয়াছেন। তাঁহার চলন্তিকায় লেখা আছে ২৬,০০০ কথার অভিধান—প্রথম আমার বিশ্বাস হয় নাই, তাহার পর দেখিলাম বইখানির অভিধান অংশে ৫৬০টি পাতা, প্রতি পাতায় দুইটি করিয়া কলম, দুই কলমে গড়পড়তা ৪৫টি করিয়া কথা—৫৬০ × ৪৫ = ২৫২০০, তাহারই নাম ২৬০০০। ছাপাটি অতি পরিষ্কার হইয়াছে, টাইপ সব নূতন, কিন্তু একই টাইপে ছাপা, ভিন্ন ভিন্ন টাইপ ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হইত। ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস গ্রিয়ারসন সাহেবের যে কাশ্মীরী রামায়ণ ছাপিয়াছে তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন টাইপ ব্যবহার করায় শব্দ খুঁজিয়া বাহির করিবার খুব সুবিধা হইয়াছে। "চলন্তিকায়" অনেক-শব্দের ব্যুৎপত্তি দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সে-সকল

চলিত শব্দ তফাৎ করিবার জন্য নানারূপ চিহ্ন দিয়াছেন, সে সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি বিশেষরূপে জানিয়া রাখিলে তবে অভিধান যে কতদূর উপকারী হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়।

বাঙ্গালা ভাষায় নানা ভাষা আসিয়া মিশিয়াছে। সেগুলিও চলন্তিকায় দেখাইয়া দেওয়ার বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সেজন্যও ভাষার আদি অক্ষর দিয়া ভাষা জানাইবার চেষ্টা হইয়াছে। বেশ সাবধান হইয়া সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে। অভিধানখানি যাহাতে লোকে ব্যবহার করিয়া ফল পায় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে, চেষ্টা সফল হইলে আমরা সকলে সুখী হইব। অভিধানের দাম ২৸০ করা হইয়াছে। ইহা একটু খাপছাড়া হইয়াছে—২॥০ বা ৩৲ টাকা করিলে খাপ খাইত। কিন্তু ইহার জন্য আমরা প্রকাশককে দোষী করিতে পারি না, কারণ ভাল কাগজ দেওয়া হইয়াছে, ভাল ছাপা হইয়াছে ও ভাল বাঁধা হইয়াছে; এ-সকলেরই দাম দশ বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ তিনগুণ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বইয়ের দাম ত নিশ্চয়ই বাড়িবে, কিন্তু যদি তেমন কাট্‌তি হয়, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার মত দু-এক লাখ ছাপা হয়, তাহা হইলে দাম অনেক কমিতে পারে এবং ভরসা আছে 'চলন্তিকা'র কাট্‌তি সেইরূপই হইবে।

"চলন্তিকা"র অভিধান অংশের কথা বলিলাম, কিন্তু উহার ভূমিকায় ও পরিশিষ্টে বাঙ্গালা ভাষার শব্দশাস্ত্রের অনেক নূতন কথা তোলা হইয়াছে। সে কথাগুলির আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন, নহিলে 'চলন্তিকা'র সমালোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

চলন্তিকার ভূমিকার ৵০ আনা পত্রে বাঙ্গলা বর্ণমালা হইতে দীর্ঘ 'ৠ' হ্রস্ব 'ঌ' দীর্ঘ 'ৡ' এবং অন্তস্থ 'ব' এই কয়টি অক্ষর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ বর্ণমালানুক্রমে এই কয়টি অক্ষর নাই। দীর্ঘ 'ৠ' হ্রস্ব 'ঌ' দীর্ঘ 'ৡ' এই তিনটি অক্ষর উঠিয়া যাওয়ায় ক্ষতি নাই, কারণ সংস্কৃতে দীর্ঘ 'ৡ' সকলে স্বীকার করেন না, পাণিনিও করেন না। সংস্কৃতে হ্রস্ব 'ঌ' ও দীর্ঘ 'ৠ'র ব্যবহার খুব কম। বাঙ্গালায় উঠিয়া যাইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু অন্ত্যস্থ ব তুলিলে চলিবে কি? সংস্কৃতে অন্ত্যস্থ ব বর্গীয় ব অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহার পর সংস্কৃতে এক শ্লোক আছে—

উদূর্টৌ যত্র বিদ্যোতে যো বঃ প্রত্যয়সন্ধিজঃ।
অন্ত্যস্থং তং বিজানীয়াৎ তদন্যো বর্গ উচ্যতে॥

ধাতুপাঠে অধিকাংশ ব-কারাদি ধাতুরই উৎও উট হয়,সুতরাং অন্ত্যস্থ 'ব' সেখানে খুব বেশী। বাঙ্গালায় ব-কারাদি শব্দ হইলেই প্রায় ব অর্থাৎ ইংরাজি 'বি'র মতন উচ্চারণ হয়। তাই বলিয়া অন্ত্যস্থ 'ব'কে তুলিয়া দেওয়া ঠিক হইয়াছে কি না বুঝিতে পারি না। বর্ণানুক্রম আদি বর্ণেরই অনুক্রম। মাঝের বর্ণের ত অনুক্রম চলে না, সুতরাং প্রত্যয়ের 'ব' আর সন্ধির 'ব' অন্ত্যস্থ 'ব' হইলেও বর্ণানুক্রমে তাহার উল্লেখ না থাকিলেও চলে। কিন্তু বেদ, বৈদ্য, বিবিধ এসকল জায়গায় আমরা বাঙ্গালীরা কি একেবারে ইংরাজি 'বি' এর মত উচ্চারণ করি? বর্গীয় 'ব' ওষ্ঠবর্ণ। দুটী ঠোঁট মিলিয়া গেলে তবে উহার উচ্চারণ হয়। কিন্তু আমরা বেদ প্রভৃতি শব্দ যতই বর্গীয় ভাবে উচ্চারণ করি, ঠোঁট দুটি একেবারে মেলে না - খানিকটা 'v'-এর মত উচ্চারণ হয়। সুতরাং বর্ণানুক্রম হইতে অন্ত্যস্থ 'ব'কে একেবারে বাদ দিলে চলিবে না। চলন্তিক ও দেন নাই। তিনি অন্ত্যস্থ 'ব'-এর বেলা * চিহ্ন দিয়া সারিয়াছেন।

চলন্তিকার ভূমিকায় 'ড়' ও 'ঢ়' দুটি নতুন বর্ণ বর্ণানুক্রমে যোগ করা হইয়াছে, কিন্তু আদি অক্ষর কোন জায়গায় 'ড' 'ড়' হয় না এবং 'ঢ' 'ঢ়' হয় না—সুতরাং বর্ণানুক্রমে ও দুটি অক্ষর যোগ করা ঠিক হয় নাই। চলন্তিকা অভিধানের ভিতরও কোন শব্দের আদ্যক্ষর 'ড়' 'ঢ়' নাই। সুতরাং ও দুটিকে স্বতন্ত্র অক্ষর না করিয়া শব্দের মধ্যস্থিত ড ও ঢ-কারের উচ্চারণ বলিয়া দিলেই হইত।

চলন্তিকার ভূমিকার ৵০ আনা পত্রে চলন্তিকা বলিতেছেন, "সংস্কৃত শব্দের বানান যেমন সুনির্দ্দিষ্ট, অ-সংস্কৃত শব্দের তেমন নয়।" সংস্কৃত শব্দের বানান কি খুব সুনির্দ্দিষ্ট? বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ, কোশল, কোসল হয়; শস্ত, সস্ত হয়; যুবতী, যুবতি, হয়; সুতরাং সংস্কৃত শব্দের বানান যে খুব সুনির্দ্দিষ্ট তা নয়। না হইলেও বাঙ্গালার মতন একেবারে অনির্দ্দিষ্ট নয়—বিশেষ পারসী, আরবি, পোর্ত্তুগীজ হইতে যে-সব শব্দ আসিয়াছে তাহাদের বানান নাই বলিলেই হয়; যেমন—জায়গা, যায়গা, জা'গা; আপিস, আপীশ, আপীষ; ইত্যাদি।

ভূমিকায় চলন্তিকা আর যে-সমস্ত কথা কহিয়াছেন তাহার বাদ-প্রতিবাদ চলে না। শব্দগুলি সাজাইবার জন্য, শব্দের অর্থগুলি পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য তিনি যে-সকল সঙ্কেত করিয়াছেন তাহাতে অন্যের কথা বলা ঠিক নয়। সে-সকল সঙ্কেতের জন্য তিনিই দায়ী। সঙ্কেতে যদি লোকের সুবিধা হয় সঙ্কেত চলিয়া যাইবে আর সুবিধা না হইলে অন্যরূপ সঙ্কেত করিতে হইবে—সেটা লোকের সুবিধা-অসুবিধার উপর নির্ভর করিবে। তবে একটা কথা বলিয়া রাখি। চলন্তিকার ভূমিকায় লেখা আছে, "পদ-নাম (parts of speech) প্রায়ই অর্থ হইতে বুঝিতে পারা যায়, সেজন্য সর্ব্বত্র নির্দেশ করা হয় নাই। যেখানে সন্দেহ হইতে পারে সেখানে নির্দ্দেশ-চিহ্ন আছে।" এইখানেই গোল। Parts of speech কাহাকে

বলে ? ইংরাজীতে আটটা parts of speech, কেহ কেহ নয়টাও বলিতেন। প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণে ও নিরুক্তে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত—এই চারিটী parts of speech আছে। কোন কোন অলঙ্কারের বইতে কর্ম্মপ্রবচনীয় বলিয়া আর একটি জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। পাণিনি এ সকল কিছুই মানেন না। তাঁহার মতে parts of speech দুটি—সুবন্ত ও তিঙন্ত। তিনি বলেন, বিভক্তিযুক্ত না হইলে সে শব্দ শাস্ত্রে প্রয়োগ হয় না, অর্থাৎ ভাষায় ব্যবহার হয় না—সুতরাং এমন শব্দ নাই যাহার উত্তর বিভক্তি বসে না। যদি শাস্ত্রে প্রয়োগ, ভাষায় ব্যবহার না কর, বিভক্তি না দিয়াও ব্যবহার করা চলে ; যেমন জপের সময় রাম রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, দুর্গা দুর্গা ; কিন্তু ভাষায় ব্যবহার করিতে হইলেই বিভক্তি দিতে হইবে। কিন্তু কই চ, বা, হা, হৈ, সায়ং, প্রাতঃ—এ সকলে ত বিভক্তি নাই। পাণিনি বলেন,বিভক্তি হইয়াছিল, লোপ হইয়াছে। Max Muller ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন, পাণিনি শব্দের শ্রেণীবিভাগ করিতে গিয়া লোপ নামে একটা fiction স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি শব্দগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করিতে নারাজ—নারাজ ত হইবারই কথা ; সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ভাগ দুই না করিয়া তিন করিতে গেলেই ভাগের গোড়া স্থির থাকে না—এভাগের জিনিষ ওভাগে গিয়া পড়ে (অর্থাৎ অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি হয়)। তাই পাণিনি শব্দরাশিকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন—এক ভাগের উত্তর সুপ্ বিভক্তি ও আর একভাগের উত্তর তিঙ বিভক্তি হয়। ধাতুর উত্তর যে-সব বিভক্তি হইয়া ক্রিয়া-পদ তৈয়ারি হয় তাহাকে তিঙ বিভক্তি বলে, আর নামের উত্তর যে বিভক্তি হইয়া পদ ভাষায় ব্যবহার হয় তাহাকে সুপ্ বিভক্তি কহে। কিন্তু অনেক শব্দের উত্তর বিভক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না—পাণিনি বলেন, বিভক্তি হইয়া লোপ হইয়াছে। তাহা হইলে ভাগ এইরূপ হইল—

শব্দরাশি
- সুবন্ত
  - বিভক্তির লোপ
  - বিভক্তির লোপ নয়
- তিঙন্ত

এখন দেখা যাইতেছে parts of speech শব্দের অর্থ হইতে বোঝা যায় না। ইংরাজি ব্যাকরণের মতে বোঝা যায় বলে, কিন্তু সেটাও ঠিক কথা নয়। পাণিনির মতে সে কথা উঠিতেই পারে না। মানের সঙ্গে parts of speech-এর কোন সম্বন্ধ নাই। ব্যবহার দেখিয়া ইংরাজিতে আট নয় ভাগে শব্দরাশিকে ভাগ করায় এক that কখনও conjunction হইতেছে, কখনও relative pronoun হইতেছে, আবার কখনও adjective-ও হইতেছে, কিন্তু পাণিনির মতে হইবার জো নাই। পদ হইলেই হয় সুবন্ত নয় তিঙন্ত হইতেই হইবে—কোন পদ দুই অন্ত হইতে পারে না।

যে-সকল শব্দের উত্তর বিভক্তির লোপ হয় তাহাদিগকে অব্যয় বলে। অব্যয় আবার দুই রকম। কতকগুলি ধাতুর সহিত জুড়িয়া যায়, সেগুলিকে উপসর্গ বলে। যখন সেগুলি ধাতুর সঙ্গে জুড়িয়া যায় না অথচ তাহাদের যোগে বিভক্তি হয়, তখন সেগুলিকে কর্ম্মপ্রবচনীয় বলে। বাকী অব্যয়ের নাম নিপাত।

ইংরাজিতে কারক ও বিভক্তি দুটি জিনিষ নয়। অন্ততঃ দুটি জিনিষ বলিয়া ধরে না। কিন্তু সংস্কৃতে এবং বাঙ্গলায় দুটি স্বতন্ত্র জিনিষ—কারক সম্বন্ধ বুঝায়। সম্বন্ধ বুঝাইলে সে ব্যাকরণের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। যে শাস্ত্রে গিয়া পড়ে তাহার নাম বাদার্থ, ন্যায়শাস্ত্র অথবা ন্যায়শাস্ত্রের শব্দখণ্ড। কিন্তু বিভক্তি খাঁটি ব্যাকরণের কথা, কারণ বিভক্তি না হইলে পদ শুদ্ধ হইল কিনা বুঝা যায় না।

এইস্থলে বলিয়া রাখি, আমাদের ব্যাকরণ ও ইংরাজি grammar এক জিনিষ নয়। Grammar is the art of speaking and writing a language correctly. সংস্কৃত ব্যাকরণের মানে কিন্তু আর কিছু। ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেন ব্যাকরণং—অর্থাৎ শব্দটি শুদ্ধ করা পর্য্যন্তই ব্যাকরণের সীমা। ইংরাজিতে গ্রামারের মধ্যে উচ্চারণ পড়ে। উচ্চারণের জন্য সংস্কৃতে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে—তাহার নাম শিক্ষা। গ্রামারে Etymology থাকে, ইহারই সংস্কৃত নাম ব্যাকরণ। ইংরাজিতে গ্রামারে syntax থাকে—সংস্কৃতে syntax-এর মোটা মোটা গোটা-কতক কথা যাহা নহিলে ব্যাকরণ চলে না,তাহাই ব্যাকরণে থাকে—বাকীটা বাদার্থশাস্ত্রে গিয়া পড়ে। ইংরাজি গ্রামারে ছন্দের উপর একটা অধ্যায় থাকে, সংস্কৃতে ছন্দশাস্ত্র স্বতন্ত্র। গ্রামারে figures of speech থাকে, সংস্কৃতে অলঙ্কার-শাস্ত্র স্বতন্ত্র। সুতরাং ইংরাজি গ্রামার ও সংস্কৃত ব্যাকরণ এক নহে। ইংরাজি গ্রামারকে শব্দশাস্ত্র বলা যাইতে পারে, সংস্কৃত ব্যাকরণ শুধু পদের আকার লইয়া। ব্যাকরণ ও গ্রামারে যখন এত তফাৎ তখন ব্যাকরণকে গ্রামার বলা কিছুতেই উচিত নহে। এক বলিয়া মনে করিলেই গোলযোগ হইবে।

এক জায়গায় খুব গোলোযোগ হইয়াছে। ব্যাকরণে ছয়টা বই কারক নাই, কিন্তু ইংরাজিতে আটটা

বলে না—ইংরাজিতে কিন্তু possessive একটা case, সম্বোধন ব্যাকরণে কারক নহে—ইংরাজিতে উহা vocative case. ব্যাকরণে কারক বলিতে বুঝায় ক্রিয়ান্বয়ি—গ্রামারে case বলিতে গেলে shows relation between words in a sentence, তা ক্রিয়া হউক আর নাই হউক। সেইজন্য ব্যাকরণে সম্বন্ধ কারক হইতে পারে না, কারণ উহার সহিত ক্রিয়ার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বয় হয় না। কিন্তু case অনায়াসেই হইতে পারে, কারণ বাক্যের মধ্যে উহার কোন-না-কোন শব্দের সহিত সম্বন্ধ আছে।

সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে শব্দের উত্তর বিভক্তি না হইলে পদ হয় না, পদ না হইলে ব্যবহারে চলে না। এখন এই বিভক্তি কোথায় হয়, কেমন করিয়া হয়, কেমন করিয়া পদকে শুদ্ধ করে, তাহার কিছু কিছু জানা দরকার। কারকে বিভক্তি হয়—যেমন, কর্ত্তায় প্রথমা ও তৃতীয়া, কর্ম্মে দ্বিতীয়া করণে তৃতীয়া, সম্প্রদানে চতুর্থী, অপাদানে পঞ্চমী ও অধিকরণে সপ্তমী। আমরা মোটা-মুটি বলিলাম, কারকে অনেক সময় বিভক্তির ব্যত্যয় হইয়া থাকে। সম্বন্ধ বুঝাইতে কারক হয় না বটে, কিন্তু বিভক্তি হয়; সম্বোধন কারক হয় না বটে, কিন্তু বিভক্তি হয়। কতকগুলি অব্যয় শব্দের যোগে বিভক্তি হয়—এই অব্যয়গুলিকে কর্ম্মপ্রবচনীয় কহে। নানা অর্থেও বিভক্তি হয়, যেমন সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়; সুতরাং কারক ও বিভক্তি দুই শাস্ত্রের দুই জিনিষ একত্র করিলেই গোলযোগ হইবে। ব্যাকরণে এইরূপ গোলযোগের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু গ্রামারে খুবই আছে।

বিশেষ যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ ইংরাজিতে তর্জ্জমা করিতে বসেন তাঁহাদের বড় বিপদে পড়িতে হয়। ইংরাজিতে ত বিভক্তি নাই, সুতরাং তাঁহাদের বলিতে হয় nominative sometimes becomes instrumental case অর্থাৎ কর্তৃকারক সময় সময় করণ কারক হইয়া যায়—এক কারক ত দুই হইতে পারে না, সুতরাং গোলযোগ হয়। ব্যাকরণে এই গোলযোগ হয় না, কারণ ব্যাকরণ বলে কর্ত্তায় তৃতীয়া হয়—করণ কারক বলে না, গোলযোগ হয় না। ভাবে সপ্তমী হয়, অর্থাৎ ভাব বুঝাইলে কর্ত্তায় সপ্তমী বিভক্তি হয়। ইংরাজিতে বলিতে গেলে বলিতে হইবে nominative case locative case হয় অর্থাৎ কর্ত্তা অধিকরণ হইয়া যান—তাহার মানেই গোলযোগ।

ব্যাকরণে বিভক্তি থাকার দরুণ অনেক গোলযোগ নিবারণ হয় এবং অনেক জিনিষ পরিষ্কার বুঝা যায়। যাঁহারা গ্রামার হইতে বাঙ্গালা ব্যাকরণ করেন তাঁহাদের অনেক সময়ে গোলযোগে পড়িতে হয়, কারণ তাঁহারা মাঝখানে বিভক্তির কথা বলেন না অথবা এমন করিয়া বলেন যে, বিভক্তির যে বিশেষ একটা দরকার আছে তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু চলন্তিকার বাঙ্গালা ব্যাকরণে বিভক্তি মানিয়া লওয়ায় অনেক কথা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় বিভক্তি বড় বেশী নাই—পাঁচ সাতটি মাত্র; কিন্তু সেইগুলিকে প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি করিয়া সাজাইয়া লইতে হয়। বাঙ্গালায় দ্বিবচন ত নাই, বহুবচনও নাই বলিলেই হয়। পুরাণ বাঙ্গালায় একেবারে ছিল না, গণ-বাচক শব্দ দিয়া বহুবচন করিতে হইত। এখন বহুবচনে একটা "রা" বিভক্তি হইয়াছে, সে শুধু প্রথমাতেই ব্যবহার হয়। সংস্কৃত হইতে ভাষা যতদূরে আসিতেছে, বিভক্তি ততই কমিয়া যাইতেছে। তৃতীয় শতকের বাঙ্গালা দেশের প্রাকৃতে যত বিভক্তি ছিল নবম শতকে তাহা অপেক্ষা অনেক কম। যত দিন যাইতেছে ততই কমিয়া আসিতেছে, কিন্তু বিভক্তি আছে এবং আছে স্বীকার করার দরুণ ব্যাকরণ বুঝিবার সময় অনেক সুবিধা হইয়াছে। অধিকাংশ শব্দরূপ, বিভক্তি কমিয়া যাওয়ায় অনেক সোজা হইয়া আসিয়াছে। কেবল এক জাতীয় শব্দে বিভক্তি একটু বেশী আছে—সে শব্দগুলিকে সর্ব্বনাম বলে। সর্ব্বনামের লক্ষণ ব্যাকরণে করে নাই, তবে সর্ব্বনামের রূপ দেখাইয়া দিয়াছে। চলন্তিকাও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

ব্যাকরণে ক্রিয়ার রূপ অত্যন্ত জটিল ছিল—গ্রামারে আরও জটিল। পাণিনি সে জটিলতা ভাঙ্গিয়া খানিকটা সোজা করিয়াছিলেন, কিন্তু বোপদেব একেবারে বীজগণিতের মত ১৮০টি বিভক্তি স্বীকার করিয়া এবং সেই বিভক্তিগুলিকে দশটি ভাগ করিয়া অনেক সোজা করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালায় ক্রিয়া বিভক্তি অত্যন্ত জটিল। চলন্তিকা কলাপ ব্যাকরণের ছাঁচে সেই বিভক্তিগুলি ঢালিয়া বিশেষ সুবিধা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ক্রিয়া বিভক্তি হইতে আমরা নানা জিনিষ বুঝিতে পারি—প্রথম কাল বুঝিতে পারি, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—তাহার মধ্যেও আবার কোন্ জায়গায় ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে, ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবে ও ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে তাহাও বিভক্তির দ্বারা জানা যায়। আজ্ঞা বিভক্তির দ্বারা জানা যায়। বিধি বিভক্তির দ্বারা জানা যায়। আশীর্ব্বাদ বিভক্তির দ্বারা জানা যায়। একটা ক্রিয়া যদি অন্য ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে তাহাও বিভক্তির দ্বারা জানা যায়। সুতরাং বিভক্তি দিয়া আমরা অনেক জিনিষ জানিতে পারি। এইসব কথা বাঙ্গালায় বুঝাইবার চেষ্টা চলন্তিকাই প্রথম করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বাহাদুরী আছে, কিন্তু এ চেষ্টাটা কোথায়

গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা বলা যায় না এবং তিনি যে-পথ ধরিয়াছেন সে-পথও যে ঠিক তাহাও বলিতে পারি না। চলন্তিকা ক্রিয়ারূপ প্রকরণে তিঙন্ত পদের সঙ্গেই অসমাপিকা কৃদন্ত পদ দেখাইয়াছেন। ইহা ইংরাজি গ্রামারের অনুকরণ, কিন্তু ব্যাকরণের বিরুদ্ধ। ধাতু হইতে শব্দ গড়িতে গেলে কৃৎ প্রত্যয় করিতে হয়। এইরূপে (১) শব্দ হইতে নূতন শব্দ করিতে হইলে তদ্ধিত প্রত্যয় করিতে হয়, (২) শব্দ হইতে ধাতু গড়িতে গেলে নামধাতু প্রত্যয় করিতে হয়, (৩) আবার ধাতু হইতে ধাতু গড়িতে গেলে ণিচ্, সন ও যঙ্ প্রত্যয় করিতে হয়, (৪) আবার ধাতু হইতে শব্দ গড়িতে গেলে কৃৎ প্রত্যয় করিতে হয়। ব্যাকরণের এই চারটি ডাল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ব্যাকরণের জটিলতা অনেক কমিয়া যায়। ইংরাজিতে অসমাপিকা ক্রিয়া ধাতুরূপের মধ্যে দিয়াছে আর ব্যাকরণে অসমাপিকা ক্রিয়া কৃৎপ্রকরণে দিয়াছে—তিঙন্তে নহে। বাঙ্গালায়ও বোধ হয় তাই করিলে ভাল হইত—অনেক গোলযোগ নিবারণ হইত।

চলন্তিকা একটি কাজ করিয়াছেন সেটি আর কেহ করেন নাই—এই কাজটিতে সূক্ষ্মদৃষ্টির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বাঙ্গলার সমস্ত ধাতুরাশিকে বানান অনুসারে ২০ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং সংস্কৃতে যেমন দশগণের দশরকম রূপ হয় বাঙ্গালায় সেইরূপ কুড়িগণের কুড়িটি রূপ করিয়াছেন— এটা বাঙ্গালা ব্যাকরণে খুব নূতন, আমার বোধ হয় অন্য ব্যাকরণে এইরূপ গণভাগ করিলে সুবিধা হইত—এটা খুব ভাল হইয়াছে। পরবর্তী শাব্দিকেরা এ গণভাগ লইবেন কি না জানি না, তবে লইলে একটা অতি জটিল জিনিষ সোজা হইয়া যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সংস্কৃত ভাষায় সন্ধি একটা বিষম জিনিষ। প্রায়ই সংস্কৃত ব্যাকরণে গোড়ায় সন্ধি দিয়া আরম্ভ করে, পাণিনি কিন্তু সন্ধিকে সকলের শেষে দিয়াছেন। সন্ধিটি উচ্চারণের কথা—শিক্ষাশাস্ত্রের কথা—ব্যাকরণের কথা নয়। কিন্তু একটা বিষয় সকলের চোখে পড়ে না। সন্ধি দুই প্রকার (১) পদান্ত সন্ধি, ও (২) পদমধ্যগত সন্ধি। পদান্তসন্ধি সংস্কৃতে আছে, বাঙ্গালায় নাই। পদমধ্যগত সন্ধিও বাঙ্গালায় নাই। যে সমাস করা শব্দগুলি আমরা সংস্কৃত হইতে লইয়াছি সেইগুলিতেই আছে। আমরা নূতন করিয়া বাঙ্গলায় যে-সকল সমাস করি তাহাতেও সন্ধি করি না। সুতরাং সন্ধির নিয়ম করিয়া বাঙ্গলা ব্যাকরণকে ভারী করা ঠিক নয়। যখন পদান্ত সন্ধি নাই তখন ব্যাকরণের গোড়াতেই সন্ধির নিয়ম দেওয়া একেবারে বৃথা। যদি দিতে হয়, যেখানে সংস্কৃত হইতে লওয়া সমাস-করা পদ আছে সেইখানে দেওয়াই ভাল—না দিলেও ক্ষতি নাই; কারণ সমাস ত আর বাঙ্গালায় হয় নাই, সংস্কৃত অবস্থায় হইয়াছিল। বাঙ্গালায় বিসর্গসন্ধির স্থান কোথায় আমি জানি না, বোধ হয় একেবারেই নাই; তবে চলন্তিকা ব্যাকরণ নয় অভিধান। অভিধানে সংস্কৃত কথা লইয়াও নাড়াচাড়া করিতে হয়, সুতরাং সংস্কৃত সমাসের ভিতর সন্ধির গোটাকতক সূত্র করিতেও পারেন।

চলন্তিকায় অনেক পারিভাষিক শব্দ দিয়াছেন। অঙ্কের, রসায়নের, ভূগোলের, গণিতের, ডাক্তারীর, কবিরাজীর অনেক রকম পারিভাষিক শব্দ দেওয়া আছে। কড়া পারিভাষিক শব্দ ত চলন্তিকায় থাকিতেই পারে না যাহা চল্‌তি তাহাই থাকিবে। কিন্তু থাকার একটা কথা আছে। রসায়নশাস্ত্রটা আমরা ইংরাজি হইতে লইয়াছি, উহার পরিভাষা আমরা কি ইংরাজিই রাখিব, না, উহার তর্জ্জমা করিয়া লইব। দুইদিকেই গোল। যদি ইংরাজিই রাখি আমাদের উচ্চারণের দোষে সে এমন বিশ্রী হইয়া যাইবে যে তাহাকে আর ইংরাজি বলিয়াই টের পাওয়া যাইবে না, আর যদি তর্জ্জমা করিয়া লই আমরা ভিন্ন কেহই বুঝিতে পারিবে না। দু'দিকে গোল হইলেও আমার বোধ হয় প্রথমটাই ভাল, আর পৃথিবীতে চলিয়াও আসিতেছে তাই। যে ভাষায় একটা পারিভাষিক শব্দের উৎপত্তি হয় অন্য ভাষায়ও সেই শব্দটা ব্যবহার করে।

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি সব কলেজ খুলিয়া গেল, অপু কোনো কলেজে ভর্ত্তি হইল না। অধ্যাপক মিঃ বসু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইতিহাসে অনার্স কোস লওয়াইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। অপু ভাবিল—কি হবে আর কলেজে পড়ে? সে সময়টা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে কাটাব, বি-এর ইতিহাসে এমন কোনো নতুন কথা নেই যা আমি জানি নে। ও দু-বছর মিছি-মিছি নষ্ট, লাইব্রেরীতে তার চেয়ে অনেক পড়ে ফেলতে পার্‌বো এখন। তা ছাড়া ভর্ত্তির টাকা, মাইনে, এসব পাই বা কোথায়?

একটা কিছু চাকরি না খুঁজিলে চলে না। খবরের কাগজ বিক্রয়ের পুঁজি অনেক দিন ফুরাইয়া গিয়াছে, মায়ের মৃত্যুর পর সে কাজে আর উৎসাহ নাই। একটা ছোট ছেলে পড়ান আছে, তাতে শুধু দুটো ভাত খাওয়া চলে দুবেলা—কোনো মতে ইক্‌মিক্ কুকারের আলুসিদ্ধ, ডালসিদ্ধ ও ভাত। মাছ, মাংস, দুধ, ভাল তরকারী তো অনেক দিন আগে দেখা স্বপ্নের মত মনে হয়—যাক্ সে সব, কিন্তু ঘরভাড়া, কাপড় জামা, জল খাবার এসব চলে কিসে? তাহা ছাড়া অপুর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, কলিকাতায় ছেলে-পড়ান বাবার মুখে শৈশবে শেখা উদ্ভট শ্লোকের পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর মত চপল, আজ যদি যায়, কাল দাঁড়াইবার স্থান নাই।

কয়েক দিন ধরিয়া খবরের কাগজ দেখিয়া দেখিয়া পাইওনিয়র ড্রাগ ষ্টোর্সে একটা কাজ খালি দেখা গেল দিনকতক পরে। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে বড় দোকান, পিছনে কারখানা। তখনও ভিড় জমিতে সুরু হয় নাই, অপু ঢুকিয়াই এক স্থূলকায় আধাবয়সী ভদ্রলোকের একেবারে সামনে পড়িল। ভদ্রলোক বলিলেন, কাকে চান্?

অপু লাজুক মুখে বলিল—আজ্ঞে, চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখে—তাই—

—ও! আপনি ম্যাট্রিক পাশ?

—আমি এবার আই-এ—

ভদ্রলোক পুনরায় তাকিয়ায় ভর দিয়া হাল ছাড়িয়া দিবার সুরে বলিলেন—ও আই-এ পাশ নিয়ে আমরা কি কর্‌ব, আমাদের লেবেলিং ও মাল বট্‌লিং করার জন্যে লোক চাই। খাট্‌নিও খুব, সকাল সাতটা থেকে সাড়ে দশটা, মধ্যে দু ঘণ্টা খাবার ছুটি, আবার বারোটা থেকে পাচটা, কাজের চাপ পড়লে রাত আটটাও বাজবে—

—মাইনে কত?

—আপাতক পনেরো, ওভার-টাইম খাটলে দু' আনা জলখাবার – সে সব আপনাদের কলেজের ছোক্‌রার কাজ নয় মশায়—আমরা এম্‌নি মোটামুটি লোক চাই।

ইহার দিনকতক পরে আর একটা চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া গেল ক্লাইভ ষ্ট্রীটে। দেখিল, সেটা একটা লোহা-লক্কড়ের দোকান, বাঙ্গালী ফার্ম্ম। একজন ত্রিশ বত্রিশ বছরের অত্যন্ত চুল ফাঁপানো টেরি-কাটা লোক ইস্ত্রি-করা কামিজ পরিয়া বসিয়া আছে, মুখের নীচে দিকের গড়নে একটা কর্কশ ও স্থূলভাব, এমন ধরণের চেহারা ও চোখের ভাবকে সে মাতাল ও কুচরিত্র লোকের সঙ্গে মনে মনে জড়িত করিয়া থাকে। লোকটি অত্যন্ত অবজ্ঞার সুরে বলিল—কি, কি এখানে?

অপুর নিজকেই অত্যন্ত ছোট বোধ হইল নিজের কাছে। সে সঙ্কুচিত সুরে বলিল—এখানে একটা চাক্‌রী খালি দেখে আস্‌চি—

লোকটার চেহারা বড়লোকের বাড়ির উচ্ছৃঙ্খল অসচ্চরিত্র, বড় ছেলের মত। পূর্ব্বে এ ধরণের চরিত্রের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে লীলাদের বাড়ী বর্দ্ধমানে থাকিতে। নিজের অজ্ঞাতসারে একটা ঘৃণা ও অসন্তোষে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। এই টাইপটা সে চেনে।

লোকটা কর্কশ সুরে বলিল—কি কর তুমি?

—আমি আই-এ পাশ—করি নে কিছু—আপনাদের এখানে—

—টাইপরাইটিং জান? না?…যাও যাও, এখানে হবে না—ও কলেজ-টলেজ এখানে চলবে না—যাও—

সেদিনকার ব্যাপারটা বাসায় আসিয়া গল্প করিতে তাহার বন্ধু ক্যাম্বেল স্কুলের ছাত্রটির এক কাকা সব শুনিয়া বলিলেন—ওদের আজকাল ভারী দেমাক, যুদ্ধের বাজারে লোহার দোকানদার সব লাল হয়ে যাচ্ছে, দালালেরা পর্য্যন্ত দু-পয়সা নিলে। তাহার পর তিনি লোহালক্কড়ের কোন্ দালাল কি উন্নতি করিয়াছে তাহার একটা ফর্দ্দ দাখিল করিলেন, হঠাৎ পয়সা আসিবার সম্বন্ধে নানা আজগুবি গল্প করিলেন।

অপু বলিল—দালাল আমি হতে পারি নে?

—কেন পার্‌বেন না, শক্তটা কি? আমার শ্বশুর একজন বড় দালাল, আপনাকে নিয়ে যাব একদিন—সব শিখিয়ে দেবেন, আপনাদের মত শিক্ষিত ছেলে তো আরও ভাল কাজ করবে—

সপ্তাহ-খানেক পরে অপু মহা উৎসাহে ক্লাইভ ষ্ট্রীট অঞ্চলের লোহার বাজারে দালালী করিতে বাহির হইল। প্রথম দিন-চার-পাঁচ ঘোরাঘুরিই সার হইল, কেহ ভাল করিয়া কথাও বলে না, একদিন একজন বড় দোকানী জিজ্ঞাসা করিল বোল্ট আছে? পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ জ? অপু বোল্ট কাহাকে বলে জানে না, কোন্ দিকের মাপ পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ জ তাহাও বুঝিতে পারিল না। নোটবুকে টুকিয়া লইল, মনে মনে ভাবিল একটা অর্ডার তো পাইয়াছে, খুঁজিবার মতও একটা কিছু জুটিয়াছে এতদিন পরে।

কোথায় পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ জ? বোল্টু পাওয়া যায়, সে জানে না, এ-দোকান ও দোকানে জিজ্ঞাসা করে। দিন-চারেক বৃথা খোজাখুঁজির পর তাহার ধারণা পৌছিল যে জিনিষটা বাজারে সুলভপ্রাপ্য নয় বলিয়াই দোকানী হয়ত অত সহজে তাহাকে অর্ডার দিয়াছিল। একদিন একজন দালাল বলিল—মশাই সওয়া ইঞ্চি বেড়ের সীসের পাইপ দিতে পারেন যোগাড় করে আড়াই শো ফুট? যান্ না অর্ডারটা নিয়ে আসুন এই পাশেই ইউনাইটেড মেসিনারি কোম্পানীর আপিস থেকে।

পাশেই খুব বড় বাড়ি। আপিসের লোকে প্রথমে তাহাকে অর্ডার দিতে চায় না, অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল—মাল আমাদের এখানে ডেলিভারী দিতে পারবেন তো?…

একথার মানে সে ঠিক না বুঝিয়াই বলিল—হ্যাঁ তা দিতে পারব।

বহু খুঁজিয়া কলেজ ষ্ট্রীটের যে দোকান হইতে মাল বাহির হইল, তাহারা মাল নিজের খরচে কোথাও ডেলিভারী দিতে রাজী নয়, অপু নিজের ঘাড়ে ঝুঁকি লইয়া গরুর গাড়িতে সীসার পাইপ বোঝাই দেওয়াইল—রাজা উডমান্ট্ ষ্ট্রীটে দুপুর রৌদ্রে মাল আনিয়া হাজিরও করিল। ইউনাটেড মেসিনারী কোম্পানী গাড়ির ভাড়া দিতে একদম অস্বীকার করিল, মাল তো এখানেই ডেলিভারী দিবার কথা ছিল, তবে গাড়ি ভাড়া কিসের? অপু ভাবিল না হয় নিজের দালালীর টাকা হইতে গাড়ির ভাড়াটা মিটাইয়া দিবে এখন। এখন কাজে নামিয়া অভিজ্ঞতাটাই আসল, নাই বা হইল বেশী লাভ?

সে বলিল—আমার ব্রোকারেজটা?

—সে কি মশাই আপনি সাড়ে পাঁচ আনা ফুটে দর দিয়েচেন, আপনার দালালী নেন্ নি? তা কি কখনো হয়!…

অপু জানে না যে, প্রথম দর দিবার সময়ই তাহার মধ্যে দালালী ধরিয়া দিবার নিয়ম, সবাই তাহা দিয়া থাকে, সেও যে তাহা দেয় নাই, একথা কেহই বিশ্বাস করিল না। বার-বার সেই কথা তাহাদের বুঝাইতে গিয়া নিজের আনাড়িপনা ও কাঁচামিই বিশেষ করিয়া পড়িল ধরা। সীসার পাইপওয়ালা গোমস্তা তাহাদের বিল বুঝিয়া পাইয়া চলিয়া গেল—তিনদিন ধরিয়া রৌদ্রে ছুটাছুটি ও পরিশ্রমই অপুর সার হইল, একটি পয়সাও তাহাকে দিল না কোনো পক্ষই। খোট্টা গাড়োয়ান পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমার ভাড়া কৌন্ দেগা?

একজন বৃদ্ধ মুসলমান দালানের এক পাশে দাঁড়াইয়া ব্যাপার দেখিতেছিল, অপু আপিস্ হইতে বাহিরে

আসিলেই সে বলিল বাবু আপনি কত দিন এ কাজে নেমেচেন—কাজ তো কিছুই জানেন না আপনি দেখচি—

অপু সে কথা স্বীকার করিল। লোকটি বলিল—আপনি লেখাপড়া জানেন, ওসব খুচরো কাজ করে আপনার পোষাবে না। আপনি আমার সঙ্গে কাজে নাম্‌বেন?···বড় মেসিনারীর দালালী, ইঞ্জিন, বয়লার এই সব। এক এক বারে পাঁচ শো সাত শো টাকা রোজগার হবে—বাবু ইংরেজি জানিনে তাই, তা যদি জান্‌তাম, এ বাজারে এতদিন গুছিয়ে···নামবেন আমার সঙ্গে?

অপু হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল। আনন্দের আতিশয্যে সে গাড়োয়ানকে ভাড়াটা যে দণ্ড দিতে হইল, সেটাও গ্রাহ্যের মধ্যে আনিল না। মুসলমানটির সঙ্গে তাহার অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল—অপু নিজের বাসার ঠিকানা দিয়া দিল, স্থির হইল, কাল সকাল দশটার সময় এইখানে মুসলমান দালালটা তাহার অপেক্ষা করিবে।

অপু রাত্রে শুইয়া মনে মনে ভাবিল—এতদিন পরে একটা সুবিধা জুটেচে,—এইবার হয়ত পয়সার মুখ দেখ্‌ব।

মাসখানেক কিছুই হইল না। একদিন দালালটি তাহাকে বকিল—দুটোর পরে আর বাজারে থাকেন না, এতে কি হয় কখনো বাবু? যান কোথায়?

অপু বলিল—ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়তে যাই—দুটো থেকে সাতটা পর্য্যন্ত থাকি। একদিন যেও তোমায় দেখাবো কত বড় লাইব্রেরী।

রোজ রোজ বাজারের হৈ চৈ, মাড়োয়ারীদের ভিড়, চারিধারের অত্যন্ত হুসিয়ারি দর-কসাকসি, শুধু টাকা, টাকা, টাকা সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা—এসব অপুর কেমন ভাল লাগে না। লাইব্রেরীতে আসিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে।

ইতিহাস খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ে, কোনো এক দরিদ্র ঘরের ছোটছেলের কাহিনী পড়িতে বড় ইচ্ছা যায়···সংসারে দুঃখকষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ···তাদের জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ ধরণের সংবাদ জানিতে মন যায়।

মানুষের সত্যকার ইতিহাস কোথায় লেখা আছে? জগতের বড় ঐতিহাসিকদের অনেকেই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজনৈতিক বিপ্লবের ঝাঁঝে, সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, মন্ত্রীদের সোনালী পোষাকের জাঁকজমকে দরিদ্র গৃহস্থেরই কথা ভুলিয়াছেন। পথের ধারের আমগাছে তাদের পুঁটুলি-বাঁধা ছাতু কবে ফুরাইয়া গেল, সন্ধ্যায় ঘোড়ার হাট থেকে ঘোড়া কিনিয়া আনিয়া পল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ছেলে তার মায়ের মনে কোথায় আনন্দের ঢেউ তুলিয়াছিল—ছ হাজার বছরের ইতিহাসে সে-সব কথা লেখা নেই—থাকিলেও বড় কম। রাজা যযাতি কি সম্রাট অশোকের শুধু রাজনৈতিক জীবনের গল্প সবাই শৈশব থেকে মুখস্থ করে—কিন্তু ভারতবর্ষের, গ্রীসের, রোমের যব, গম ক্ষেতের ধারে, ওলিভ্ বন্যদ্রাক্ষা, মার্টল ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় যে প্রতিদিনের জীবন, হাজার হাজার বছর ধরিয়া প্রতি সকাল সন্ধ্যায় যাপিত হইয়াছে—তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার গল্প, তাদের বুকের স্পন্দনের ইতিহাস সে জানিতে চায়।

কেবল মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ঐতিহাসিকদের পাতায়, সম্মিলিত সৈন্যব্যূহের এই আড়ালটা সরিয়া যায়, সারি বাঁধা বর্ষার অরণ্যের ফাঁকে দূর অতীতের এক ক্ষুদ্র গৃহস্থের ছোট বাড়ি নজরে আসে। অজ্ঞাত-নামা কোনো লেখকের জীবন-কথা, কি কালের স্রোতে কূলে-লাগা এক টুকরা পত্র, প্রাচীন মিশরের কোন্ কৃষক শস্য কাটিবার কি আয়োজন করিতে লিখিয়াছিল,—বহু হাজার বছর পরে তাদের টুকরা ভূগর্ভে প্রোথিত মৃন্ময়পাত্রের মত দিনের আলোয় বাহির হইয়া আসে।

কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠ ধরণের, আরও তুচ্ছ জিনিষের ইতিহাস চায় সে। মানুষ মানুষের বুকের কথা জানিতে চায়। আজ যা তুচ্ছ, হাজার বছর পরে তা মহাসম্পদ। ভবিষ্যতের সত্যিকার ইতিহাস হইবে এই কাহিনী, মানুষের মনের ইতিহাস, তার প্রাণের ইতিহাস।

আর একটা দিক তার চোখে পড়ে। একটা জিনিষ বেশ স্পষ্ট হইয়া ওঠে তার কাছে—মহাকালের এই মিছিল। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাসে [illegible]

ভ্রমশূন্য লিখিয়াছেন কি অন্যকেহ ভ্রমশূন্য লিখিয়াছেন, এ বিষয়ে তার তত কৌতূহল নাই, সে শুধু কৌতূহলাক্রান্ত মহাকালের এই বিরাট মিছিলে। হাজার যুগ আগেকার কত রাজা, রাণী, সম্রাট, মন্ত্রী, খোজা, সেনাপতি, বালক, যুবা, কত অশ্রুনয়না তরুণী, কত অর্থলিপ্সু রাজপুরুষ—যারা অর্থের জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধুর গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া তাহাকে ঘাতকের কুঠারের মুখে দিতে দ্বিধা বোধ করে নাই—অনন্ত কালসমুদ্রে ইহাদের ভাসিয়া যাওয়ার, বুদ্বুদের মত মিলাইয়া যাওয়ার দিক্‌টা। কোথায় তাদের বৃথা শ্রমের পুরস্কার, তাদের অর্থলিপ্সার সার্থকতা ?

এদিকে ছুটাছুটিই সার হইতেছে—কাজে কিছুই হয় না। সে তো চায় না বড়মানুষ হইতে—খাওয়া-পরা চলিয়া গেলেই সে খুশি—পড়াশুনা ধরার সে সময় পায় ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কিন্তু তাও তো হয় না, টুইশানী না থাকিলে একবেলা আহারও জুটিত না যে।

একদিন মুসলমান দালালটি বাজারে তাহার কাছে দুইটি টাকা ধার চাহিল। বড় কষ্ট যাইতেছে, পরের সপ্তাহেই দিয়া দিবে এখন। অপু ভাবিল সে তো তাহার দুঃখদিনের সঙ্গী, হয়ত বাড়ীতে ছেলে-মেয়ে আছে, রোজগার নাই এক পয়সা। অর্থাভাবের কষ্ট যে কি সে তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়াছে এই দুই বৎসরে—নিজের। বিশেষ স্বাচ্ছল্য না থাকিলেও একটি টাকা বাসা হইতে আনিয়া পরদিন বাজারে লোকটাকে দিল।

ইহারই দিন-সাতেক পরে অপু সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া ঘরের দোরে কাহার ধাক্কার শব্দ পাইল। দোর খুলিয়া দেখিল মুসলমান দালালটি হাসিমুখে দাঁড়াইয়া।

—এস, এস আবদুল, তারপর খবর কি ?

—আদাব বাবু, চলুন ঘরের মধ্যে বলি। এ ঘরে আপনি একলা থাকেন, না আর কেউ—ওঃ—বেশ ঘর তো বাবু।

—এস বসো। চা খাবে ?

চা-পানের পর আবদুল আসিবার উদ্দেশ্য বলিল। বারাকপুরে একটা বড় বয়লারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ঠিক সেই ধরণের বয়লারেরই আবার এদিকে একটা খরিদ্দার জুটিয়া গিয়াছে, কাজটা লাগাইতে পারিলে তিনশো টাকার কম নয়—একটা বড় দাঁও। কিন্তু মুস্কিল দাঁড়াইয়াছে এই যে এখনই বারাকপুরে গিয়া বয়লারটি দেখিয়া আসা দরকার এবং কিছু বায়না দিবারও প্রয়োজন আছে—অথচ তাহার হাতে একটা পয়সাও নাই। এখন কি করা ?

অপু বলিল—খদ্দের মাল ইন্‌স্পেক্‌শনে যাবে না ?

—আগে আমরা দেখি, তবে তো খদ্দেরকে নিয়ে যাব ?···দেড় পার্সেণ্ট করে গেলেও সাড়ে চারশো টাকা থাকবে আমাদের—খদ্দের হাতের মুঠোয় রয়েচে—আপনি নির্ভাবনায় থাকুন—এখন টাকার কি করি ?

অপু পূর্ব্বদিন টুইশানীর টাকা পাইয়াছিল, বলিল—কত টাকা দরকার ? আমি তো ছেলে-পড়ানোর মাইনে পেয়েচি—কত তোমার লাগবে বল।

হিসাবপত্র করিয়া আট টাকা পড়িবে দেখা গেল। ঠিক হইল আবদুল এবেলা বয়লার দেখিয়া আসিয়া ওবেলা বাজারে অপুকে সব খবর দিবে। অপু বাক্স খুলিয়া টাকা আনিয়া আবদুলের হাতে দিল।

বৈকালে সে পাটের এক্সচেঞ্জের বারান্দাতে বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত আগ্রহের সহিত আবদুলের আগমন প্রতীক্ষা করিল। আবদুল সেদিন আসিল না, পরদিনও তাহার দেখা নাই। ক্রমে একে একে সাত আটদিন কাটিয়া গেল—কোথায় আবদুল ? সারা বাজার ও রাজা উড্‌মাণ্ট ষ্ট্রীটের লোহার দোকান আগাগোড়া খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান মিলিল না। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের একজন দোকানদার শুনিয়া বলিল—কত টাকা নিয়েচে আপনার মশাই ! আবদুল তো ?···ও মশাই জোচ্চোরের ধাড়ী—আর টাকা পেয়েচেন,···টাকা নিয়ে সে দেশে পালিয়েচে—আপনিও যেমন !···

প্রথমে সে কথাটা বিশ্বাস করিল না। আবদুল সে

রকম মানুষ নয়, তাহা ছাড়া এত লোক থাকিতে তাহাকে কেন ঠকাইতে যাইবে ?

কিন্তু এ ধারণা বেশীদিন টিকিল না। ক্রমে জানা গেল আবদুল দেশে যাইবে বলিয়া যাহার কাছে সামান্য যাহা কিছু পাওনা ছিল, সব আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছে দিন-সাতেক আগে। কাঁটাপ্রেকের দোকানের বৃদ্ধ বিশ্বাস-মহাশয় বলিলেন—আশ্চর্য্যি কথা মশাই, সবাই জানে আবদুলের কাণ্ডকারখানা, আর আপনি তাকে চেনেন নি তু-তিন মাসেও? সেটা জুয়োচোরের ধাড়ী, হার্ডওয়ারের বাজারে সবাই চিনে ফেলেচে, এখানে আর সুবিধে হয় না, তাই গিয়ে আজকাল জুটেচে মেসিনারির বাজারে। কোনো দোকানে তো আপনার একবার জিগ্যেস করাও উচিত ছিল! হার্ডওয়ারের দালালী করা কি আপনার মত ভালমানুষের কাজ মশাই? আপনার অল্প বয়েস, অন্য কাজ কিছু দেখে নিন্ গে। এখানে কথা বেচে খেতে হবে, সে আপনার কর্ম্ম নয়, তবুও ভাল যে আটটা টাকার ওপর দিয়ে গিয়েচে—

আট টাকা বিশ্বাস-মহাশয়ের কাছে যতই তুচ্ছ হোক অপুর কাছে তাহা নয়। ব্যাপার বুঝিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিল—গোটা মাসের ছেলে-পড়ানোর দরুণ সব টাকাটাই যে সে তুলিয়া দিয়াছে আবদুলের হাতে! এখন সারা মাস চলিবে কিসে! বাড়ি ভাড়ার দেনা। গত মাসের শেষে বন্ধুর কাছে ধার—এ সবের উপায়?

দিশাহারাভাবে পথ চলিতে চলিতে সে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে শেয়ার মার্কেটের সামনে আসিয়া পড়িল। দালাল ও ক্রেতাদের চীৎকার, মাড়োয়ারীদের ভিড় ও ঠেলাঠেলি থর্নিক্রফ্ট ছ' আনা, থনিক্রফট ছ' আনা, নাগরমল সাড়ে পাঁচ আনা—বেজায় ভিড়, বেজায় হৈ চৈ, বিলাসপুর চিনির কারখানার শেয়ারের বর্ত্তমান দর লইয়া সবাই বেজায় ব্যস্ত। কেমন যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। লালদিঘীর পাশ কাটাইয়া লাটসাহেবের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া সে একেবারে গড়ের মাঠের মধ্যে কেল্লার দক্ষিণে একটা নির্জ্জন স্থানে একটা বড় বাদামগাছের ছায়ায় আসিয়া বসিল।

আজই সকালে বাড়ীওয়ালা একবার তাগাদা দিয়াছে, কাপড় একেবারে নাই, না কুলাইলেও ছেলে-পড়ানোর টাকা হইতে কাপড় কিনিবে ঠিক করিয়াছিল, রুম-মেট তো ধারের জন্য তাগাদার উপর তাগাদা করিতেছে। আবদুল শেষকালে এভাবে ঠকাইল তাহাকে? চোখে তাঁহার জল আসিয়া পড়িল—দুঃখদিনের সাথী বলিয়া কত বিশ্বাস করিত যে সে আবদুলকে!

রাত্রি অন্ধকার হয়, বড় দুর্য্যোগ আসে, ক্ষীণ প্রদীপের শিখা কাঁপিতে থাকে অনভিজ্ঞ, তরুণ হৃদয় একেবারে বিভ্রান্ত, দিশাহারা হইয়া পড়ে। তারা জানে না আবার সকাল হইবেই, আবার সূর্য্য উঠিবেই, তখন মনেও হইবে না যে কোনো কালে আকাশভরা দিনের আলো মেঘের আড়ালে ঢাকা ছিল।

অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল। ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে দুপুর, বেলা দেড়টা আন্দাজ কেহ কোনো দিকে নাই, আকাশ মেঘমুক্ত, দূরপ্রসারী নিঃসীম নীল আকাশের গায়ে কালো বিন্দুর মত চিল উড়িয়া চলিয়াছে···দূর হইতে দূরে সেই ছেলেবেলাকার মত ছোট হইতে হইতে ক্রমে মিলাইয়া চলিয়াছে···হঠাৎ একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিল—আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে এক অপূর্ব্ব অদ্ভুত ভাব অপুর মনে আসিল, ঠিক এ ধরণের ভাব কখনো আর তাহার হয় নাই। কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য? মা তো তাহাকে মুক্তি দিয়া গিয়াছে—সে-ই তো নিজে নিজের চারিদিকে গণ্ডী রচনা করিয়া রাখিয়াছে, কেন এঁদের হাতে স্বেচ্ছায় খাঁচার পাখীর মত বন্দী···এই চারিধারের পরিপূর্ণ মহিমার মধ্যে···এই কম্পমান শ্রাবণ দুপুরের খর রৌদ্র···মাথার উপরে নিঃসীম অনন্ত নক্ষত্রশূন্য নীল আকাশ।...বিদ্যুৎ সূর্য্য··· রাত্রির তারা···প্রেম···মৃত্যুপারের দেশ মা অনিল··· চিররাত্রির অন্ধকারে যেখানে সাঁই সাঁই রবে ধূমকেতুর দল আগুনের পুচ্ছ দুলাইয়া উড়িয়া চলে··কোন্ সৃজনী শক্তির অসীম তেজে লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের দেশে নীহারিকাপুঞ্জ দীপ্যমান হইয়া ওঠে, গ্রহ ছোটে, তারারা মিটমিট করে, চন্দ্রসূর্য্য লাটিমের মত আপনার বেগে আপনি ঘুরিয়া বেড়ায়···তুহিন শীতল ব্যোমপথে দূরে দূরে কোথায় দেবলোকের মেরুপর্ব্বত···

চিন্তাটা মনে আসিতেই জগতের চেহারা একমুহূর্ত্তে যেন একেবারে বদলাইয়া গেল তাহার চোখে—এ কোন্ বিচিত্র জগৎ! কিসের দু-দিনের দৈন্য, দু-দিনের লাভলোকসান লইয়া মন-কসাকসি? কিসের থর্নিক্রফ্ট্ আর নাগরমল?

সে এসব চায় না—সে চায় সত্যের শক্তি, যা আসে ঐ বিদ্যুৎ থেকে, নিঃসীম শূন্য থেকে, যার শক্তি ঐ বিরাট সৃজনী শক্তির সঙ্গে এক। শৈশবে নদীর তীরে তার যে দীক্ষা হইয়াছিল, বিরাট অনন্তদেব আশীর্ব্বাদ করুন, অনন্তের সে স্পর্শ যেন প্রাণে তার পৌঁছায়।—

কখন বেলা পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছিল, কখন একটু দূরে একটা ফুটবল টিমের খেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল—একটা বল দুম্ করিয়া তাহার একেবারে সামনে আসিয়া পড়াতে তাহার চমক ভাঙিল। উঠিয়া সে বলটা দুহাতে ধরিয়া সজোরে একটা লাথি মারিয়া সেটাকে ধাবমান লাইন্স্‌ম্যানের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

(১৯)

একদিন পথে হঠাৎ প্রণবের সঙ্গে দেখা। দুইজনেই ভারী খুশী হইল। সে কলিকাতায় আসিয়া পর্য্যন্ত অপুকে কত জায়গায় খুঁজিয়াছে, প্রথমটা সন্ধান পায় নাই, পরে জানিতে পারে অপূর্ব্ব পড়া-শুনা ছাড়িয়া দিয়া কোথায় চাকরিতে ঢুকিয়াছে। প্রণব রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বৎসরখানেক হাজত ভোগের পর সম্প্রতি খালাস পাইয়াছে, হাসিয়া বলিল—কিছুদিন গবর্ণমেণ্টের অতিথি হয়ে এলুম রে, এসেই তোর কত খোঁজ করেচি—তারপর কোথায় চাকরি করিস্ বল তো—বাসা কোথায়?

অপু হাসিমুখে বলিল—খবরের কাগজের আপিসে, সোজা নয়, রয়টারের বাংলা করার ভার আমার ওপর—বুধবারের কাগজে 'আর্ট ও ধর্ম্ম' বলে লেখাটা আমার দেখিস পড়ে।

প্রণব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তুই ধর্ম্মের সম্বন্ধে লিখতে গেলি কি নিয়ে রে! কি জানিস তুই—

—ওখানেই তোমার গোলমাল—ধর্ম্ম মানে তুমি যা

ওটার প্রয়োজনীয়তা ছিল আদিম মানুষের সমাজে, আর একটা ধর্ম্ম আছে যা কিনা নিজের নিজের, আমার ধর্ম্ম আমার, তোমার ধর্ম্ম তোমার, এইটের কথাই আমি—যে ধর্ম্ম আমার নিজের তা যে আর কারুর নয়, তা আমার চেয়ে কে ভাল বোঝে?

—বৌ-বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে ওসব কথা হবে না, আয় গোলদিঘীতে দাঁড়িয়ে লেকচার দিবি।

—শুনবি তুই? চল তবে—

গোলদিঘীতে আসিয়া দুজনে একটা নির্জ্জন কোণ বাছিয়া লইল। প্রণব বলিল—বেঞ্চের উপর দাঁড়া উঠে।

অপু বলিল—দাঁড়াচ্ছি, কিন্তু লোক জমবে না তো?…তা হ'লে কিন্তু আর একটি কথাও বলব না।

তারপর আধঘণ্টাটাক অপু বেঞ্চির উপর দাঁড়াইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়া গেল। সে এবিষয়ে অত্যন্ত নিষ্কপট ও উদার—যা মুখে বলে, মনে মনে তাহা বিশ্বাস করে। প্রণব শেষপর্য্যন্ত শুনিবার পর ভাবিল—এসব কথা নিয়ে খুব তো নাড়াচাড়া করেছে মনের মধ্যে? একটু পাগলামির ছিট্ আছে, কিন্তু ওকে ঐজন্যই এত ভালবাসি—

অপু বেঞ্চ হইতে নামিয়া বলিল—কেমন লাগ্‌ল?…

—তুই খুব sincere, যদিও একটু ছিটগ্রস্ত—

অপু লজ্জামিশ্রিত হাস্যের সহিত বলিল—যাঃ—

প্রণব বলিল—কিন্তু কলেজটা ছেড়ে ভাল কাজ করিস্‌নি, যদিও আমি জানি তাই সেদিন বিনয়কে বলছিলাম যে অপূর্ব্ব কলেজে না গিয়েও যা পড়াশুনা করবে, তোমরা দুবেলা কলেজের সিমেণ্ট ঘসে ঘসে উঠিয়ে ফেললেও তা হবে না। ওর মধ্যে একটা সত্যিকার পিপাসা রয়েচে যে—

নিজের প্রশংসা শুনিয়া অপু খুব খুশি—বালকের মত খুশি। উজ্জ্বলমুখে বলিল—অনেকদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা, চল তোকে কিছু খাওয়াইগে—কলেজ মেট্‌দের আর কারুর দেখা পাইনে—আমোদ করা হয় নি কতদিন যে—মা মারা যাওয়ার পর থেকে তো—

প্রণব বিস্ময়ের সুরে বলিল—মাও মারা গিয়েচেন?

—ওঃ, সে কথা বুঝি বলিনি? সে তো প্রায় এক

সামনেই একটা চায়ের দোকান। অপু প্রণবের হাত ধরিয়া সেখানে ঢুকিল। প্রণবের ভারী ভাল লাগিল অপুর এই অভ্যস্ত ধাঁটি ও অকৃত্রিম, আগ্রহ-ভরা হাত ধরিয়া টানা। সে মনে মনে ভাবিল—এ রকম warmth আর sincerity ক'জনের মধ্যে পাওয়া যায়? বন্ধু তো মুখে অনেকেই আছে—অপু একটা জুয়েল।

অপু বলিল—কি খাবে বল?…এই বেয়ারা, কি আছে ভাল?

খাইতে খাইতে প্রণব বলিল—তারপর চাকরির কথা বল্—যে বাজার, কি করে জোটালি?

অপু প্রথমে লোহার বাজারের দালালীর গল্প করিল। হাসিয়া বলিল—তারপর আবদুলের মহাভিনিষ্ক্রমণের পরে হার্ডওয়ার আর জমলো না—ঘুরে ঘুরে বেড়াই চাকরি খুঁজে, বুঝলি?…একদিন একজন বললে বি-এন-আর আপিসে অনেক নতুন লোক নেওয়া হচ্চে—গেলুম সেখানে। খুব লোকের ভিড়, চাকরি অনেক খালি আছে, ইংরিজি লিখ্তে পড়তে পারলেই চাকরি হচ্চে। ব্যাপার কি, শুনলাম মাস-দুই হ'ল ষ্ট্রাইক্ চল্চে—তাদের জায়গায় নতুন লোক নেওয়া হবে—

প্রণব চা-য়ে চুমুক দিয়া বলিল—চাকরি পেলি?

—শোন্ না, চাকরি তখুনি হয়ে গেল, প্রিন্সিপ্যালের সার্টিফিকেটটাই কাজের হ'ল, মোটামত এক সাহেব ছিল, তখুনি ছাপানো ফর্ম্মে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দিয়ে দিলে, তারপরে বাইরে এসে ভারী আনন্দ হ'ল মনটাতে। চল্লিশ টাকা মাইনে, যেতে হবে গঞ্জাম জেলায়, অনেক দূর, যা ঠিক চাই তাই—বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে একটা চায়ের দোকানে বসে মনের খুশিতে উপরি উপরি চার কাফ চা খেয়ে ফেললাম—ভাবলাম এতদিন পরে পয়সার কষ্টটা তো ঘুচল?… আর কি খাবি? এই বেয়ারা, আর দু'টো ডিম ভাজা—না-না খা—

—দুদিন চাকরি হয়েচে বলে বুঝি—তোর সেই পুরনো রোগ আজও—হাঁ তারপর?

—তারপর বাড়ি এসে রাতে শুয়ে শুয়ে মনটাতে ভাল বল্লে না—ভাবলাম ওরা একটা সুবিধে আদায় করবার জন্যে ষ্ট্রাইক করেচে, দুমাস তাদেরও ছেলেমেয়ে কষ্ট পাচ্চে, তাদের মুখের ভাতের দলা কেড়ে খাব শেষ কালে?…সারারাত সে একটা যুদ্ধ ভাই—একবার ভাবি যাই চলে, অতদূর কখনো দেখিনি, তা ছাড়া মা মারা যাওয়ার পরে কলকাতা আর ভাল লাগে না, যাই না—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মনে হ'ল এ ভারী স্বার্থপরের কাজ হচ্চে—এ ধরণের স্বার্থপর হতে পারব না কখনো—

—তারপর বুঝি—

—পরদিন দশটার সময়ে ফের ওদের আপিসে গেলাম—ছাপান ফর্ম্মখানা ফেরৎ দিয়ে এলাম, ব'লে এলাম আমার যাওয়ার সুবিধে হবে না—

প্রণব বলিল—তোর মুখ আর চোখ look full of music & poetry. প্রথম থেকে আমি জানি এ একজন আইডিয়ালিষ্ট ছোক্রা—তোদেরই দিয়েই তো এসব হবে—তোর এ খবরের কাগজের কাজ কখন?

—রাত ন'টার পর যেতে হয়, রাত তিনটের পরে ছুটি। ভারী ঘুম পায়, এখনও রাত-জাগা অভ্যেস হয় নি তবে সুবিধে আছে, সকাল দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে নি, সারাদিন লাইব্রেরীতে কাটাতে পারি—

খাওয়া-দাওয়া ভালই হইল। অপু বলিল—জল খাস্নে—চল্ কলেজ স্কোয়ারে সরবৎ খাব—বেশ মিষ্টি লাগে খেতে, লেমন স্কোয়াশ খেয়েছিস্—আয়,—

কলেজের অত ছেলের মধ্যে এক অনিল ও প্রণব ছাড়া সে আর কাহাকেও বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, অনেক দিন পরে মন খুলিয়া আলাপের লোক পাইয়া তাহার গল্প আর ফুরাইতেছিল না। বলিল, গাছপালা যে কতদিন দেখিনি, ইট আর সিমেণ্ট অসহ্য হয়ে পড়েচে। আমাদেব আপিসে একজন কাজ করে, তার বাড়ি হাওড়া জেলা, সেদিন বল্চে বাড়ির বাগানে আগাছা বেড়ে উঠেচে, তাই সাফ্ করচে রবিবারে, রবিবারে। আমি তাকে বলি কি গাছ মিত্তির-মশাই? সে বলে—কিছু না, ঝুপি গাছ। আমি বলি—বলুন না কি কি গাছ? রোজ সোমবারে সে বাড়ি থেকে এলে তাকে এই কথা জিগ্যেস করি—সে হয়ত ভাবে, আচ্ছা পাগল!…রাত্রে, ভাই, সারারাত প্রেসের ঘড়ঘড়ানি, গরম, প্রিণ্টারের তাগাদার মধ্যে

আমার কেবলই মিত্তির-মশায়ের বাড়ির সেই ঝুপি বনের কথা মনে হয়—মনে ভাবি কি কি না জানি গাছ। এদিকে চোখ ঘুমে ঢুলে আসে, রাত একটার পরে শরীর এলিয়ে পড়তে চায়, শরীরের বাঁধন যেন ক্রমে আলগা হয়ে আসে, কুঁজোর জল চোখেমুখে ঝাপটা দিয়ে ফুলো ফুলো, রাঙা রাঙা, জ্বালা করা চোখে আবার কাজ করতে বসি—ইলেকট্রিক্ বাতি যেন চোখে ছুঁচ বেঁধে—আর এত গরমও ঘরটাতে!

পরে সে আগ্রহের সুরে বলিল—একদিন রবিবারে চল্ তুই আর আমি কোনো পাড়াগাঁয়ে গিয়ে মাঠে, বনের ধারে ধারে সারাদিন বেড়িয়ে কাটাব—বেশ সেখানেই লতা-কাটি কুড়িয়ে আমরা রাঁধব—বিকেল হবে—পাখীর ডাক যে কতকাল শুনিনি!...দোয়েল কি বৌ-কথা-ক, এদের ডাক ত ভুলেই গিয়েচি, রবিবার দিনটা ছুটি, চল্ যাবি?...এখন কত ফুল ফুটবারও সময়—আমি অনেক বনের ফুলের নাম জানি, দেখিস চিনিয়ে দোবো—

ইহারই দিন-পনেরো পরে একদিন প্রণব আসিয়া বলিল—তোকে নিয়ে যাব ব'লে এলাম—আমার মামাতো বোনের বিয়ে হবে সোমবারে, শুক্রবার রাত্রে আমরা যাব, খুলনা থেকে ষ্টীমারে যেতে হয়, অনেক দিন কোথাও যাস্নি, চল আমার সঙ্গে। দিন-চারপাঁচের ছুটি পাবি নে?

ছুটি মিলিল। তাহার কাজে ও লেখায় এডিটার সন্তুষ্ট ছিলেন, এক সপ্তাহ ছুটি দিতে আপত্তি করিলেন না।

ট্রেনে উঠিবার সময় তাহার ভারী আনন্দ। অনেক দিন কলিকাতা ছাড়িয়া যায় নাই, অনেক দিন রেলেও চড়ে নাই। রাত্রে কিছু দেখা না গেলেও সে জানালার কাছে বসিয়া ছেলেমানুষের মত উৎসাহে জানালার বাহিরে মুখ বাহির করিয়া রহিল। সকালবেলা ষ্টীমারে উঠিবার সময় ভৈরবের ওপার হইতে তরুণ সূর্য্য ওঠার দৃশ্যটা তাহাকে মুগ্ধ করিল। নদী খুব বড় ও চওড়া, ষ্টীমার প্রণবের মামার বাড়ির ঘাটে ধরে না, পাশের গ্রামে নামিয়া নৌকায় যাইতে হয়। অপু এ অঞ্চলেই কখনো আসে নাই—অপরিচিত দেশ, সে এমন ধরণের সব প্রশ্ন প্রণবকে করিতে লাগিল, যাহাতে মনে হইবার কথা যে এ অঞ্চলে দুই হাত দুই পা বিশিষ্ট মনুষ্যজাতি বাস করে কিনা, সে বিষয়ে তাহার যেন সন্দেহ আছে। নদীর ধারে সুপারির সারি, বাঁশ, বেত বন, অসংখ্য নারিকেল। টিনের চালাওয়ালা গোলা গঞ্জ। অদ্ভুত ধরণের নাম, স্বরূপকাটি, যশাইকাটি।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ ও খাড়া পশ্চিম, দুদিক হইতে প্রকাণ্ড দুটা নদী আসিয়া পরস্পর মিলিত হইয়াছে, অপূর্ব্ব দৃশ্য। বিস্তীর্ণ জলরাশি বাঁদিকের উঁচু পাড় ছুঁইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বাঁকিয়া গিয়াছে, ও-দিক হইতে বড় দল খাড়া তীরের মত সোজা আসিতে আসিতে কিসে বাধা পাইয়া হঠাৎ যেন থামিয়া গিয়াছে, দুই নদীর জল যেখানে একত্র মিলিল, সেখানটাতে জলের রং ঈষৎ সবুজ, এবং সঙ্গমস্থানেরই ও-পারে আধ মাইলের মধ্যে প্রণবের মামার বাড়ির গ্রাম গজানন্দকাটি।

নদীর ঘাট হইতে বাড়িটা অতি অল্প দূরে। এ গ্রামের মধ্যে ইহারাই অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ।

অনেকবার অপু এ-ধরণের বাড়ির ছবি কল্পনা করিয়াছে, এই ধরণের বড় নদীর ধারে, শহর বাজারের ছোঁয়াচ ও আবহাওয়া হইতে বহু দূরে, কোনো এক অখ্যাত ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ের সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ, আগে অবস্থা ভাল ছিল, অথচ এখন নাই, নাটমন্দির, পূজার দালান, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ সবই থাকিবে, অথচ সে-সব হইবে ভাঙা, শ্রীহীন, আর থাকিবে প্রাচীন ধনী-বংশের শান্ত মর্য্যাদাবোধ, মান-সম্মান, উদারতা। প্রণবের মামার বাড়ির সঙ্গে সব যেন হুবহু মিলিয়া গেল।

ঘাট হইতে দুই সারি নারিকেল গাছ সোজা একেবারে বাড়ির দেউড়ীতে গিয়া শেষ হইয়াছে, বাঁয়ে প্রকাণ্ড পূজার দালান, ডাইনে হলুদ রঙের কল্সী-বসানো ফটক ও ফুলবাগান, দোলমঞ্চ রাসমঞ্চ, নাটমন্দির। খুব জলুস নাই কোনোটারই, কার্ণিস্ খসিয়া পড়িতেছে, একরাশ গোলা পায়রা নাটমন্দিরের মেজেতে চরিয়া বেড়াইতেছে, এক-আধটা ঝটাপট্ করিয়া ছাদে উড়িয়া

মুখো পাল্কী অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। দেখিয়া মনে হয় এক সময়ে ইঁহাদের অবস্থা খুবই ভাল ছিল, বর্ত্তমানে পসার-হীন ডাক্তারের দ্বারসংযুক্ত অনাদৃত পিত্তলের পাতের মত শ্রীহীন ও মলিন।

'পুলু এসেচে, পুলু এসেচে'—'এই যে পুলু'—'এটী কে সঙ্গে?' 'ও! বেশ, বেশ', ষ্টীমার কি আজ লেট্?' ওরে নিবারণকে ডাক ব্যাগটা বাড়ির মধ্যে নিয়ে যা', 'আহা থাক্ থাক্, এস এস দীর্ঘজীবি হও।'

প্রণব তাহাকে একেবারে বাড়ির মধ্যে লইয়া গেল। অপু অপরিচিত বাড়ির অন্দরমহলে যথারীতি অত্যন্ত লাজুক মুখে ও সঙ্কোচের সহিত ঢুকিল। প্রণবের বড় মামীমা আসিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। অপুকে দেখিয়া বলিলেন—এ ছেলেটিকে কোত্থেকে আন্‌লি পুলু? এ মুখ যেন চিনি—

প্রণব হাসিয়া বলিল—কি করে চিন্‌বেন মামীমা? ও কি আর বাঙ্গাল দেশের মানুষ?

প্রণবের মামীমা বলিলেন—তা নয় রে কতবার পটে আঁকা দেখেচি, ঠাকুরদেবতার মুখের মত মুখ—এস এস দীর্ঘজীবী হও—

প্রণবের দেখাদেখি অপুও পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

—এস এস, বাবা আমার এস—দেশ কোথায় বাবা?

তার পরে উপরের ঘর। ডাব, চিনির সরবৎ, সন্দেশ, ছানা। ছেলেমেয়ের ভিড় পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যার পরে সারাদিনের গরমটা একটু কমিল। দেউড়ির বাহিরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, চারিদিকে শাঁখ বাজিল। উপরের খোলাছাদে শীতলপাটী পাতিয়া অপু একা বসিয়াছিল, প্রণব ঘুম হইতে সন্ধ্যার কিছু আগে উঠিয়া কোথায় গিয়াছে। কেমন একটা নতুন ধরণের অনুভূতি—সম্পূর্ণ নতুন ধরণের, কি সেটা? কে জানে হয় তো শাঁখের রব বা আরতির বাজনার দরুণ ·· কিংবা হয়ত—

মোটের উপর এ এক অপরিচিত জগৎ। কলিকাতার কর্ম্মব্যস্ত, কোলাহলমুখর ধূমধূলিপূর্ণ আবহাওয়া হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এক ভিন্ন জীবন-ধারার জগৎ।

নারিকেল শ্রেণীর পত্রশীর্ষে নবমীর জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে এইমাত্র ফুটিল, অপু লক্ষ্য করে নাই। কি কথা যেন সব মনে আসে। অনেক দিনের কথা।

পিছন হইতে প্রণব বলিল—কেমন, গাছপালা গাছ-পালা করে পাগল, দেখলি তো গাছপালা নদীতে আসতে? কি রকম লাগ্‌ল বল শুনি—

অপু বলিল—সে যা লাগল তা লাগ্‌ল—এখন কি মনে হচ্ছে জানিস্ এই আরতি শুনে? ছেলেবেলায় আমার দাদু ছিল, ভক্ত বৈষ্ণব, তাঁর মুখে শুন্‌তাম "বংশী বটতট কদম্ব নিকট, কালিন্দী ধীর সমীর"—যেন—

সিঁড়িতে কাহাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। প্রণব ডাকিয়া বলিল—কেরে? মেনী? শোন—

একটি তেরো চৌদ্দ বছরের বালিকা হাসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। প্রণব বলিল—কে, কে, রে? মেয়েটি পিছন ফিরিয়া কাহাদেরদিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিল—সবাই আছে, ননীদি, দাসী-দি, মেজ-দি, সরলা—তাস খেল্‌ব চিলেকোটার ঘরে—

অপু মনে মনে ভাবিল—এ বাড়ির মেয়েছেলে সবাই দেখতে ভারী সুন্দর তো?

প্রণব বলিল—এটি মামার ছোট মেয়ে, এরই মেজ বোনের বিয়ে। ক বোনের মধ্যে সে-ই সকলের চেয়ে সুশ্রী আর ভারী চমৎকার মনটি—মেনী ডাক তো একবার অপর্ণাকে?

মেনী সিঁড়িতে গিয়া কি বলিতেই একটা সম্মিলিত মেয়েলি কণ্ঠের চাপা হাস্যধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই একটি ষোল-সতেরো বছরের নতমুখী সুন্দরী মেয়ে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রণব বলিল—ও আমার বন্ধু, তোরও সুবাদে দাদা—লজ্জা কাকে এখানে রে? এইটি মামার মেজ মেয়ে অপর্ণা—এরই—

মেয়েটি চপলা নয়, মৃদু হাসিয়া তখনই সরিয়া গেল, অথচ কেমন একটা ধীর, শান্ত ভাব। মুখের ভাব দেবীমূর্ত্তির মুখের মত পবিত্রতা মাখানো, স্নিগ্ধ ধরণের সৌন্দর্য্য। কিছুদিন আগে পড়া একটা ইংরাজী উপন্যাসের একটা লাইন বার-বার তাহার মনে আসিতে

গাহিল—Do they breed goddesses at Slocum Magna? Do they breed goddesses at Slocum Magna?

এ রাতটার কথা অপুর চিরকাল মনে ছিল।

পরদিন প্রণবের সঙ্গে অপু তাহার মামার বাড়ির সবটা ঘুরিয়া দেখিল। প্রাচীন ধনীবংশ বটে। বাড়ির উত্তরদিকে পুরাতন আমলের আবাস বাটী ও প্রকাণ্ড সাত-দুয়ারী পূজার দালান ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে, ওপারে অন্যতম সরিক রামদুর্ল্লভ বাঁড়ুয্যের বাড়ি। পুরাতন আমলের বসতবাটী বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত, রামদুর্ল্লভের ছোট ভাই সেখানে বাস করিতেন। কি কারণে তাঁহার একমাত্র পুত্র নিরুদ্দেশ হইয়া যাওয়াতে তাঁহারা বেচিয়া কিনিয়া কাশীবাসী হইয়াছেন। কাছারীর নায়েব গোমস্তারা কেহ কেহ সেখানকার বাহিরের ঘরগুলিতে বাস করে। কোনো তরফেই বেশী আয় না থাকায় উভয় সরিক মিলিয়া একযোগে কাছারী করিয়াছেন, খরচ-পত্রের আধাআধি ব্যবস্থা।

এসব কথা প্রণবের মুখেই ক্রমে ক্রমে শোনা গেল।

স্নানের সময়ে সে নদীতে স্নান করিতে চাহিলে সকলেই বারণ করিল—এখানকার নদীতে এ সময়ে কুমীরের উৎপাত খুব বেশী, পুকুরে স্নান করাই নিরাপদ। কুমীর দেখা যায়? অভাব কি? সে যদি দুপুরে একবার কষ্ট করিয়া গ্রামের প্রান্তের বড় চড়ার ধারে যায়, দেখিতে পাইবে মাঝে মাঝে কাঠের গুঁড়ির মত কুমীর বালির উপর পড়িয়া আছে।

বৈকালে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক কাছারী-বাড়ীর বারান্দাতে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, দিন-পনেরো পূর্ব্বে নিকটস্থ কোন গ্রামের জনৈক তাঁতির ছেলে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, সম্প্রতি তাহাকে রায়মঙ্গলের এক নির্জ্জন চরে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ছেলেটি বলে তাহাকে নাকি পরীতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, প্রমাণস্বরূপ সে আঁচড়ের খুঁট খুলিয়া কাঁচা লবঙ্গ, এলাচ ও জায়ফল বাহির করিয়া দেখাইয়াছে, এ-অঞ্চলের ত্রিসীমানায় এ সকলের গাছ নাই—পরী তাহাকে আদর করিয়া কোথা হইতে এগুলি আনিয়া নাকি উপহার দিয়াছিল।

অপু ভাবে—পরীর দেশই বটে, ঠিক একটা পরীরই দেশ। অনেক দিন তাহার অদৃষ্টে এত যত্ন আদর বা এত ভাল খাওয়া-দাওয়া জোটে নাই। প্রণবের মামী-মা কাছে বসিয়া দুপুরে দুজনকে খাওয়াইলেন, এত মাছ, এত দুধ, এমন সুন্দর, ঘরের তৈয়ারী দুগ্ধশুভ্র চন্দ্রপুলি—জীবনেও কখনো তাহাদের দরিদ্র গৃহস্থালীতে এ সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে নাই। মায়ের সংসারে চালের গুঁড়া, গুড় ও সরিষার তৈলেরই কারবার ছিল বেশী,—চিনি, ক্ষীর, মসলা, কর্পূর, ঘৃত, এসব তো ছিল হাতের নাগালের বাহিরের জিনিষ।

(ক্রমশঃ)

দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৯) বলিদ্বীপ—তাম্পাক্-সেরিঙ্

৩১শে আগষ্ট ১৯২৭, বুধবার

ক্লুঙকুঙ্ বলিদ্বীপের শিল্পকলার আর প্রাচীন জীবনের একটা কেন্দ্র। প্রাচীন ধরণের মূর্ত্তি আর অন্য ধাতুর জিনিস আর কাপড়-চোপড় এ অঞ্চলে এখনও খুব তৈরী হয়। এই শহরের দক্ষিণে কতকগুলি মন্দির আছে, সেগুলি আমাদের দেখা হ'ল না। ডচ্‌দের দ্বারা যখন বলি-বিজয় হয়, তখন এই ক্লুঙ্‌কুঙের রাজা সপরিবারে রাজপুতদের জৌহরের মতন 'পুপুতান' ক'রে আত্মাহুতি দেন, এ কথার উল্লেখ পূর্ব্বে ক'রেছি। ইচ্ছে থাকলেও এখানে এক রাত্রের বেশী কাটাতে পারা গেল না।

সাড়ে সাতটায় তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে আমরা Tampak Sering তাম্পাক্-সেরিঙ্ যাত্রা করলুম। তাম্পাক-সেরিঙ-এর ডাক বাঙলায় কবি আছেন; আমরা ঐ স্থানটি দেখে আস্‌বো, আর কবিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে Gianjar গিয়াঞার-এ আস্‌বো। সারা দিনের মোটর ভাড়া হ'ল পঁচিশ গিলডারে। তাম্পাক-সেরিঙ পাহাড়ের মধ্যে চমৎকার একটী স্থান, নির্জ্জন, শান্তির আবাস-ভূমি। একটী ছোট পাহাড়ের উপরে 'পাসাঙ্গ্রাহান'টী, আশে পাশে খুব গাছ পালা, স্থানটী বেশ ঠাণ্ডা। পাসাঙ্গ্রাহানের সামনে একটা পোস্তার মতন আছে, সেখান থেকে নীচে মাঠ রাস্তা গ্রাম এসবের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। পাহাড়ে' নদী একটী আছে, আর বলিদ্বীপের বিশেষত্ব পাহাড়ের গা কেটে কেটে ধানের ক্ষেতের স্তর। প্রচুর নারকেল বন। পাসাঙ্গ্রাহান থেকে নীচের উপত্যকায় একটী চমৎকার স্নানের জায়গা দেখা গেল। বলিদ্বীপীয়েরা বড়ই স্নান-প্রিয়। দ্বীপের মধ্যে যেখানে জলের স্রোতের সুবিধে পেয়েছে, সেখানেই ইটের দেয়ালে ঘেরা স্নানাগার বানিয়েছে। কতকগুলি মকর-মুখ বা সাদা নল দিয়ে স্বাভাবিক তোড়ে জল এসে পড়ে, একটা চৌবাচ্চা বা হৌজে; তাতে এক বুক বা এক কোমর বা এক হাঁটু জলে নলের সাম্নে ব'সে লোকেরা স্নান করে—বাড়তি জল নরদমা বা নালা দিয়ে ক্রমাগত বেরিয়ে যাচ্ছে। এই রকম স্নানাগার মেয়েদের জন্য আর পুরুষদের জন্য আলাদা আলাদা। বলিদ্বীপের সভ্যতার পরিচায়ক একটি সুন্দর জিনিস হ'চ্ছে এই স্নানাগারের ব্যবস্থা।

পাসাঙ্গ্রাহানের সামনে যে জলধারাকে অবলম্বন ক'রে স্নানাগার করা হ'য়েছে, সেটীর নাম 'তীর্থ আম্পুল' বা 'আম্পুল তীর্থ'। এটীকে স্থানীয় লোকেরা অতি পবিত্র ব'লে মনে ক'রে থাকে। বিশেষ উৎসব উপলক্ষে দূর থেকে বহু স্নানার্থী এখানে নাকি এসে থাকে। এই তীর্থের পবিত্রতা সম্বন্ধে একটী 'স্থল-পুরাণ' বা স্থানীয় কাহিনী আছে, সেটি বড়ো সুন্দর। একটী সুন্দরী রাজকন্যা তাঁর পিতার একজন যুবক অনুচরকে ভালো বেসেছিলেন। এই অনুচরটীও মনে মনে রাজকন্যাকে ভালো বাসতেন, কিন্তু তাঁর এই বোধ ছিল যে বংশ-গৌরবে তিনি রাজার মেয়ের অনুপযুক্ত, রাজকন্যাকে বিবাহ ক'রলে রাজার মর্য্যাদার হানি হবে; এইজন্য তিনি রাজকন্যার প্রণয়কে প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্য হেতু প্রত্যাখ্যান করেন। রাজকন্যা কিন্তু এতে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হন, আর পিতার এই পারিষদের পানীয়ে বিষ মিশিয়ে দেন। যুবক এই বিষ পান করেন, আর তখনই ব্যাপারখানা বুঝতে পারেন। পাছে তাঁর মৃত্যুতে রাজকন্যার নাম জড়িয়ে রাজকন্যার কোনও অপযশ রটে, সেইজন্য তখনি এই তীর্থ-আম্পুলের কাছে বনে গোপনে প্রাণত্যাগ করবার জন্য পালিয়ে আসেন। তাঁর চরিত্রে প্রীত হ'য়ে দেবতারা এই তীর্থের জল খাইয়ে তাঁর প্রাণদান করেন। সেই থেকে এই তীর্থের পবিত্রতা।

এই সুন্দর শান্তিপূর্ণ স্থানে ক'দিন কাটিয়ে কবির শরীর আর মন দুইই ভালো আছে দেখে আমরা আশ্বস্ত

হ'লুম। পাসাঙ্গ্‌হানে কবির সঙ্গে স্থরেন বাবু আর কোপ্যারব্যার্গ ছিলেন, আর ছিলেন ডক্টর Goris খোরিস্‌। সংস্কৃতজ্ঞ এই যুবক পণ্ডিতটির সঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই বাঙলির শ্রাদ্ধক্ষেত্রে দেখা হ'য়েছিল। এই দু তিন দিন ইনি কবির সঙ্গে আছেন। ইংরেজী ভালো ব'লতে পারেন না, কিন্তু কবিকে দুচারটি বিষয়ে যে প্রশ্ন করেন, তাথেকে এঁর আন্তরিকতা আর মানসিক গভীরতা দেখে কবি খুব খুশী হ'য়েছেন। ডক্টর খোরিস বলিদ্বীপীয়দের মতন পোষাক পরে র'য়েছেন দেখলুম, গায়ে কোট জামা, মাথায় রঙীন রুমাল বাঁধা, পরণে রঙীন লুঙ্গী, পায়ে চাপলি জুতো।

তাম্পাক্‌-সেরিঙ—গ্রাম ও স্নানাগার
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত)

খাস তাম্পাক-সেরিঙ স্থানটী পাসাঙ্গ্‌হান থেকে কিছু দূরে, গ্রাম ছাড়িয়ে, একটি পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর ধারে। এখানকার দ্রষ্টব্য, সমগ্র বলিদ্বীপের মধ্যে একটী অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার—পাহাড়ের গা কেটে তৈরী কতকগুলি মন্দির। মন্দির না ব'লে, সমাধি-স্থান আর বিহার বলাই ভালো। পাসাঙ্গ্‌হান থেকে আমরা মোটরে ক'রে গ্রামের ভিতর দিয়ে গেলুম। বড়ো সড়কে গাড়ী রেখে, রাস্তার বাঁ দিক দিয়ে একটী চলা-পথ ধ'রে আমরা চ'ল্‌লুম। খোরিস আর কোপ্যারব্যার্গ আমাদের পথ প্রদর্শক হ'য়ে চ'ল্‌লেন, সঙ্গে স্থানীয় লোকও জনকতক জুটে গেল। উঁচু নীচু পথ, দু এক জায়গায় পাথরের ধাপ ক'রে দেওয়া। ঘন গাছ-পালা, দু পাশের বাঁশ-ঝাড় আর অন্য গাছের ডাল কখন কখন মাথায় ঠেকে। খানিকটা এই ভাবে গিয়ে, আমরা পাহাড়ে' নদীটীর পাশে এসে পৌছুলুম। চমৎকার দৃশ্য এখানকার; বড়ো বড়ো পাথরের চাবড়ার আশ-পাশ দিয়ে নদীটী নৃত্যচ্ছন্দে

বলিদ্বীপের স্নানাগার
(শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক গৃহীত)

ঝঙ্কার তুলে চ'লেছে; কতকগুলি বড়ো বড়ো গাছ আছে; কাছে সামনেই নদীর ওপারে পাহাড়ের গা, তার পাথর কেটে কুলুঙ্গীর মতন জায়গা ক'রে নিয়ে পাঁচটী মন্দিরের কাঠামো পাহাড়ের গায়ে খোদা হ'য়েছে। পাহাড়ের পিছনে নারকেল বন, আর চারিদিক সবুজে ভরা—

ধানের ক্ষেত, বাগান। একটা বাঁশের সাঁকো দিয়ে নদীটা পেরিয়ে আমরা এই মন্দিরের মধ্যে এসে পৌছুলুম

বলিদ্বীপের অভিজাত বংশের কন্যা

আধুনিক বলিদ্বীপীয় রীতির ছোটো ছোটো কতকগুলি ইমারত আছে, পাহাড়ের সামনেই একটু উঠানের মতন স্থান সেই খানে। পাহাড়ের গায়ে যে পাঁচটা মন্দিরের চিত্র খোদাই করা হ'য়েছে, সেগুলি প্রমাণ আকারের; ডচ পণ্ডিতদের মতে সেগুলি স্থানীয় রাজাদের সমাধি। প্রাচীন যবদ্বীপীয় অক্ষরে দুএক ছত্র ক'রে লেখা আছে, আমরা তা প'ড়তে পারলুম না। চিত্রিত মন্দিরগুলি যবদ্বীপের প্রাচীন যুগের মন্দিরের মতো। বলিতে অন্যত্র আর এমনটা নেই। এই খোদাই-করা মন্দিরের চিত্র খ্রীষ্টীয় দশম শতকের ব'লে ডচ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন। এই পাহাড়টার নাম হ'চ্ছে Goenoeng Kawi গুনুঙ কাউই (বা কবি)। সমাধিমন্দিরগুলির পাশে পাহাড় কেটে কতকগুলি অনুচ্চ গুহা তৈরী করা হয়েছে। গুহাগুলি ছোটো, অল্প পরিসর, অনুচ্চ। স্থানীয় প্রবাদ

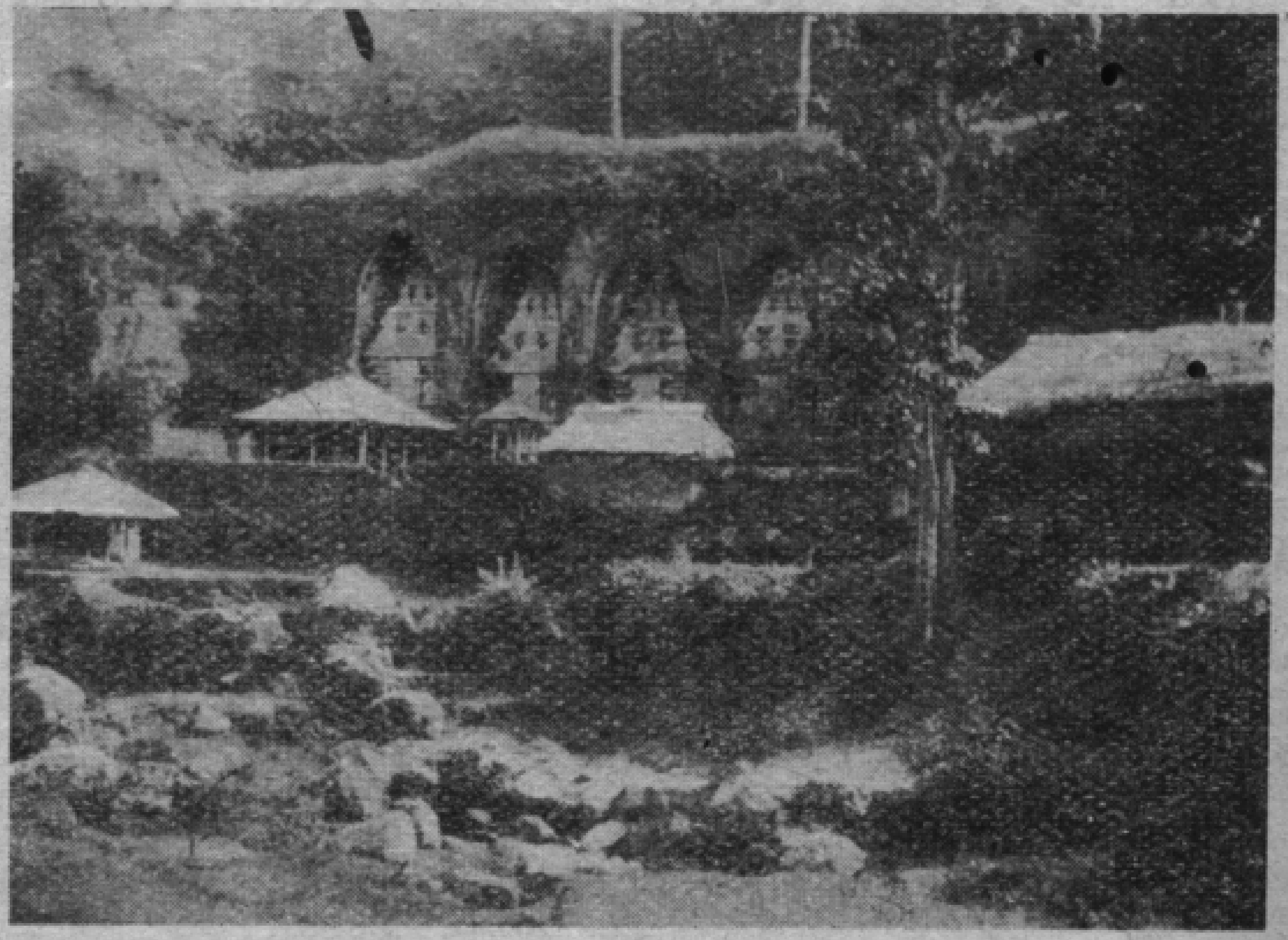

তাম্পাক্-সেরিঙ্-এর মন্দির
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্তৃক গৃহীত)

অনুসারে, এই গুহাগুলি একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সমাধি-মন্দির। ডচ্ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন যে এগুলিতে একটা বৌদ্ধ বিহার ছিল।

তাম্পাক্-সেরিঙ-এর গুহার সামনে
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্তৃক গৃহীত)

গুহাগুলির সামনে কেবল ধানের ক্ষেত; পাহাড়ের গায়ে, স্তরে স্তরে ক্ষেতে ধান হয়ে র'য়েছে; পাহাড়ে'

নদীটীর অবিশ্রান্ত কলধ্বনির সঙ্গে ঢেউ-খেলানো ধানের শীষের মধ্য দিয়ে হাওয়া যেন ঐক্যতানে বাঁশী বাজিয়ে চ'লেছে। অতি মনোরম দৃশ্য ; পাহাড়ের ধারে যেন সজীব সবুজের আর জলের এক অপূর্ব্ব সমাবেশ—এ দেখে আমরা মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম।

পাসাঙ্গ্রাহানে ফিরে এসে স্নান সেরে নিলুম। গতকল্য গিয়াঞারের Regent রেখণ্ট, ইনি স্থানীয় রাজা বা জমীদার, ঐ অঞ্চলের ডচ Controleur কন্ট্রোলারের সঙ্গে তাম্পাক-সেরিঙ্-এ এসে কবিকে নিমন্ত্রণ ক'রে গিয়েছেন, তাঁর বাড়ীতে কবিকে গিয়ে অতিথি হ'তে হবে—অন্ততঃ একদিনের জন্য। কবি, কোপ্যারব্যার্গ, ফ্রেউএস, আর আমি, এই ক'জনে গিয়াঞারের দিকে যাত্রা ক'রলুম, গিয়াঞারে সেই দিন আর রাতটি কাটিয়ে পরের দিনে আরও দক্ষিণে Badoeng বাতুঙ্ বা Den Pasar দেন্-পাসার-এ যাত্রা ক'রবো। সুরেনবাবু, ধীরেনবাবু ডক্টর খোরিস, আর বাকেরা আমাদের সঙ্গে গিয়াঞারে না এসে Oeboed উবুদ্-এ গেলেন, সেখানকার রাজার সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌বেন ; এঁরা গিয়াঞারে থাকবেন না। পথে Pedjeng পেজেঙ্ ব'লে একটী গ্রাম প'ড়ল। শুন্‌লুম, এই গ্রামে খ্রীষ্টীয় অষ্টম নবম শতকের কতকগুলি সংস্কৃত তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, গ্রামটী নাকি প্রাচীনকালে এখানকার সভ্যতার একটী কেন্দ্র ছিল।

পুরী বা প্রাসাদ দ্বারে দণ্ডায়মান গিয়াঞারের রেখণ্ট্
(পদতলে উপবিষ্ট পানের চৌকা বাটা হাতে তাম্বুলকরঙ্কবাহী, তৎপার্শ্বে তরবারী-বাহক, এবং পশ্চাতে অন্য একজন ভৃত্য)

গিয়াঞারের রাজার পুরা নাম আর পদবী হ'চ্ছে—Hida Anake Agoeng Ngoerah Agoeng হিডা আনাকে আগুঙ্ ঙূরাঃ আগুঙ্। বেশ সুপুরুষ গৌরবর্ণ ব্যক্তি, কারাঙ্-আসেম-এর রাজার সঙ্গে তুলনা ক'রলে বেশ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ব'লেই বোধ হয়। তবে বুদ্ধিতে আর শিক্ষায় কারাঙ্-আসেম-এর রাজাকেই আমাদের বেশী ভালো লেগেছিল। গিয়াঞার-এর পুরী বা

রাজবাটীতে এসে উপস্থিত হ'লুম, দুপুরের দিকে। রাজবাড়ীটী বেশ প্রকাণ্ড, কতকগুলি মহল নিয়ে। সাবেক বলিদ্বীপীয় প্রথায় প্রস্তুত। গিয়াঞার গ্রামখানির কেন্দ্রস্থান হ'চ্ছে এই রাজপুরী। রাজবাটীটি একটী চৌরাস্তার উপরে। সামনেই রাস্তার ওপারে একটা প্রকাণ্ড কাঠের তৈরী খড়ে ছাওয়া আটচালা, তার ছাত আবার মন্দিরের মেরুর মতন থাকে থাকে উঠে গিয়েছে। এই আটচালাটা শুনলুম বিশেষ উৎসব উপলক্ষে মোরগের লড়াইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। মোরগের লড়াই বলিদ্বীপীয়দের একটী প্রধান ব্যসন। প্রত্যেক যুবক বা বিশিষ্ট লোকের একাধিক লড়াইয়ে' মোরগ আছে। বলিদ্বীপের গ্রামে প্রত্যেক বাড়ীতে এই সব মোরগ অতি যত্নের সঙ্গে পোষে, আর এদের মস্ত মস্ত চুবড়ীর মত খাঁচায় ঢেকে রেখে দেয়; নইলে ছাড়া পেলেই পরস্পর মারামারি ক'রবে; বলিদ্বীপের গ্রামগুলি এই সব মোরগের আওয়াজে নিত্য মুখরিত। বাজী রেখে লড়াই হ'ত, আর এই বাজীতে আগে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হ'ত, আর হার-জিত নিয়ে খুনোখুনিও হ'ত। তাই ডচেরা আগেকার মতন আর যখন-তখন লড়াইয়ের খেলা হওয়া আইন ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়েছে, খালি বৎসরে কতকগুলি বিশেষ পর্ব্বদিনে খেলা হ'তে পারে। কিন্তু ডচ পুসিসের চোখের আড়ালে লোকে লুকিয়ে-চুরিয়ে খুবই এই লড়াই করায়। আমাদের এই মোরগের লড়াই দেখার সুযোগ হয় নি। সমস্ত মালাই জাতির মধ্যে এই লড়াই একটা অত্যন্ত সাধারণ, জনপ্রিয় বস্তু। যবদ্বীপেও খুব ছিল, এখন অল্প কিছু ক'মেছে শোনা যায়; খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের গোড়ায় যবদ্বীপের এক বিখ্যাত রাজার উপনাম-ই ছিল Hayam Woeroek হায়াম্ বুরুক্ বা লড়াইয়ে' মোরগ। রাজবাটীর কোণাকুণি, চৌরাস্তার ওপারে, স্থানীয় বাজার; খানিকটা খোলা জায়গায় বলিদ্বীপের সহজ-সুন্দরী মেয়েরা ফল-ফুলুরী মাছ শাক-শবজীর পসরা নিয়ে বসে; আর চারি দিকে দোকান—চীনাদের দোকানই বেশী, আর তাছাড়া দু একখানা গুজরাটী খোজাদেরও দোকান আছে।

রাজা আমাদের স্বাগত ক'রে নামিয়ে নিলেন। তাঁর প্রাসাদের বহির্বাটীতে বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য কতকগুলি ঘর আছে, কবির আর ব্রেউএসের আর আমার থাকবার ব্যবস্থা হ'ল এক একখানি ঘরে। ঘরগুলি বলিদ্বীপীয় কায়দায় তৈরী, মিশ্র ইউরোপীয় ভাবে সাজানো। আলাদা কল-ঘর গোসলখানা সব আছে। মোটরে তোরণ-দ্বার পার হ'য়ে একটা আঙিনা; তার মাঝে একটী ফোয়ারা, সঙ্গে ফুলগাছ; আঙিনায় ঢুকে বাঁদিকে দালানযুক্ত কতকগুলি ঘর, স্লেটের টালি ঢাকা, এগুলি নিয়ে রাজার বৈঠকখানা আর খাস কামরা। গিয়াঞারের রাজাকে কারাঙ-আসেমের চেয়ে বেশী অবস্থাপন্ন ব'লে মনে হ'ল।

একটু বিশ্রাম ক'রে মধ্যাহ্ন ভোজন সারা গেল। স্থানীয় ডচ্ কন্ট্রোলার শ্রীযুক্ত Boersma বুর্স্‌মা উপস্থিত ছিলেন। বেশ লোক ইনি।

তারপরে এখানেও কারাঙ-আসেমের মতন পদণ্ডদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। রাজার নির্দ্দেশ মত গ্রামের পদণ্ডরা এসে উপস্থিত হ'লেন। ব্রেউএস পূর্ব্ববৎ দোভাষীগিরি ক'রলেন। এখানকার পুরোহিতদের নানা প্রশ্নের মধ্যে, আমাকে আসন পেতে ব'সে সন্ধ্যা-আহ্নিক আর পূজার সাধারণ অনুষ্ঠানগুলি দেখাতে হ'ল। আমাদের বৈদিক সন্ধ্যার মতন কোনও অনুষ্ঠান এদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে আর প্রচলিত নেই—তান্ত্রিক পূজাই এঁদের অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। পদণ্ডরা গায়ত্রী মন্ত্রের নাম শুনেছেন, কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্র কেউ জানেন না। ব্রাহ্মণের পক্ষে গায়ত্রী জানাটা অত্যন্ত আবশকীয় একথা স্বীকার ক'রলেন; আর আমাকে এঁরা অনুরোধ ক'রলেন যে আমি মন্ত্রটা এঁদের লিখে দিলে এঁরা ভারী অনুগৃহীত হবেন। বলিদ্বীপের অক্ষর জানি না—দেবনাগরীতে গায়ত্রী লিখে তারপরে এঁদের কাছে সুপরিচিত ডচ্ বানানে রোমান প্রত্যক্ষর লিখে দিলুম—Ong। Tat sawitoer warenyam। bhargo dewasya dhimahi। dhijo jo nah pratjodajat॥ প্রত্যেক শব্দের আর সমগ্র মন্ত্রটীর অর্থ ইংরিজিতে লিখে ব্রেউএসকে বুঝিয়ে দিলুম। ব্রেউএস তার মালাই অনুবাদ ক'রে

অর্জ্জুনের তপোভঙ্গের জন্য অপ্সরাগণের প্রয়াস

বলিদ্বীপের পট—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহ হইতে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

লিখে, এঁদের বুঝিয়ে দিলেন। এইভাবে ডচ্ পণ্ডিতের মধ্যস্থতায় সাবিত্রী-দান হ'ল। এঁরা কতকগুলি তাল-পত্রের পুঁথি দেখালেন; আমরা তা প'ড়তে পারলুম না। বেশ পরিষ্কার মাজা তাল-পাতায় লোহার 'লেখন' দিয়ে অক্ষরগুলি লেখা। ঠিক উড়িয়া বা তেলুগু বা সিংহলী পুঁথির মতন। চারখানি পত্রের একখানি ছোটো পুঁথি পদণ্ডরা আমায় উপহার দিলেন। সংস্কৃত পুঁথি এই রাজার কাছে কিছু নেই, সব বলিদ্বীপীয় আর প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার পুঁথি।

রাজা ব'সে ব'সে সব শুন্‌ছিলেন আর দেখছিলেন। মহাভারতের কথা উঠ্‌ল। তিনি ব'ল্‌লেন, মহাভারতের সমগ্র আঠারো পর্ব্ব বলিদ্বীপে নেই, অন্ততঃ ভাষায় নেই; ভারতবর্ষ থেকে তাঁকে আমি সমগ্র মহাভারত পাঠিয়ে দিতে পারি কি না। সভা, বন, মৎস্য, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, অনুশাসন, রাজধর্ম্ম—এইগুলি ওদেশে পাওয়া যায় না। রাজাকে দেখলুম যে, তিনি সাধারণ দেবতাবাদে বিশ্বাসী। দার্শনিক চিন্তার ধার ধারেন না। দশ লোকপালের কথা হ'ল; ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ—এঁদের মন্ত্র বা স্তব রাজার বা তাঁর পুরোহিতদের জানা নেই; রাজা আমাকে অনুরোধ ক'রলেন যেন আমি দেশে ফিরে গিয়ে 'ইন্‌দ্রাস্‌টাউআ' (ইন্দ্রস্তব) 'ইয়ামাস্‌টাউআ' (যমস্তব) 'কেব্রাস্‌টাউআ' (কুবেরস্তব) আর 'উআরুনাস্‌টাউআ' (বরুণ স্তব) লিখে পাঠিয়ে দিই। দেশে ফিরে আমি এই সব দেবতার ধ্যান আর প্রণাম রোমান অক্ষরে লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম; আর সংস্কৃত মহাভারত তো ওখানে কেউ প'ড়তে পারবেন না, তাই ছবিওয়ালা বাঙলা মহাভারত আর রামায়ণ পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। রাজা আমাদের মাঝে মাঝে দুএকটি প্রশ্ন ক'রেছিলেন—খুব গভীর ভাবের প্রশ্ন সেগুলি নয়। 'ইন্দ্র-লোক কোথায়?' 'নক্ষত্রগুলি কি?' এই ধরণের প্রশ্ন। প্রশ্ন ক'রে ইনি উত্তরের অপেক্ষা রাখেন না—অন্য প্রসঙ্গ এনে ফেলেন। ভাবে মনে হ'ল, পুরাণোক্ত বর্ণনাকে তিনি

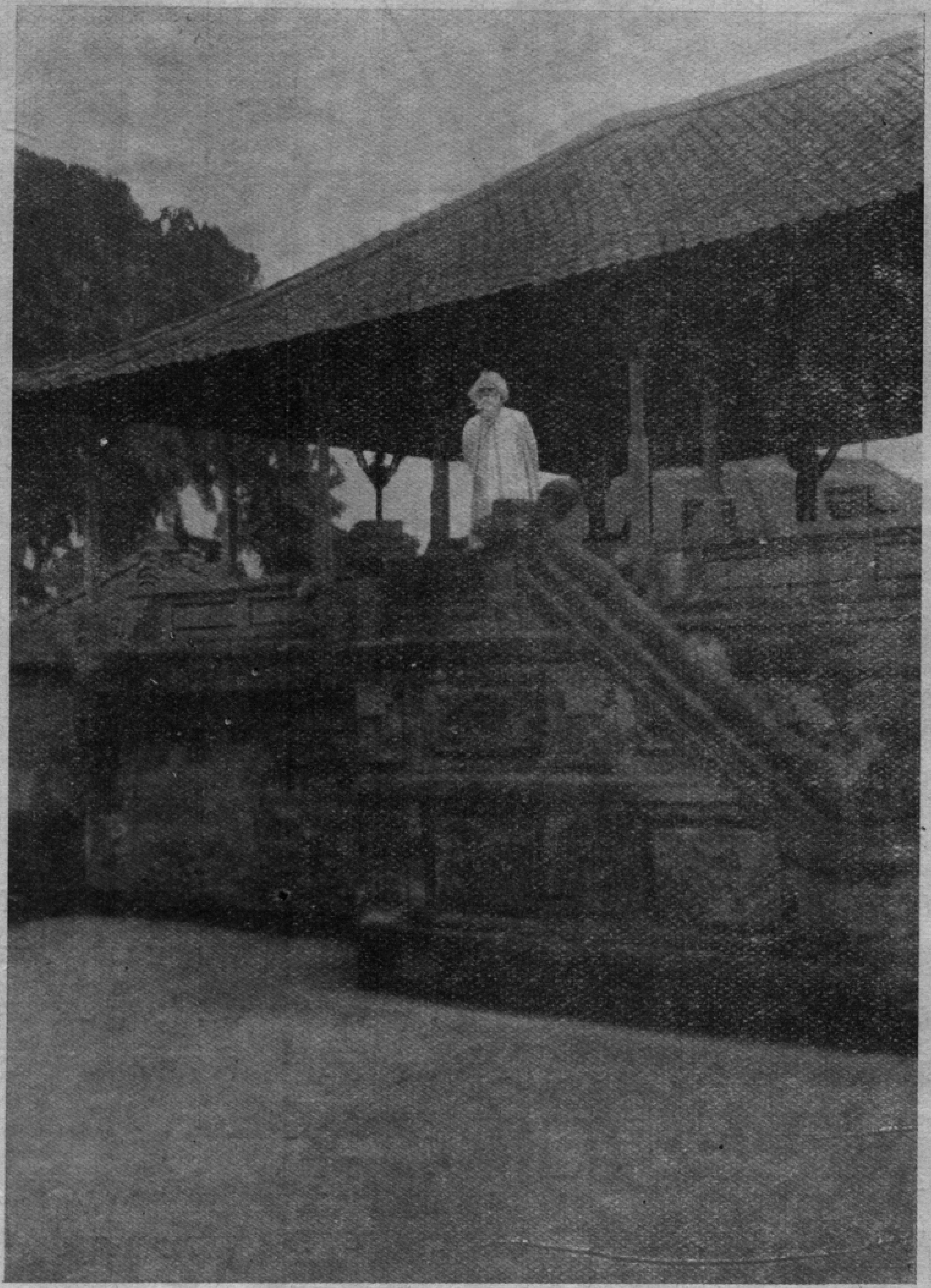

গিয়াঞারের পুরীতে রবীন্দ্রনাথ
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্ত্তৃক গৃহীত)

তোপেঙ বা মুখস-পরা অভিনেতার দল

বাস্তব সত্য ব'লেই গ্রহণ ক'রেছেন—তাইতেই তিনি সুখী, অন্য জিজ্ঞাসা তাঁর মনে আসে না।

রাজবাড়ীর আঙিনার লাগোয়া সদর তোরণ-দ্বারের পাশেই বড় রাস্তার উপরে একটী একতালার সমান উঁচু Pavilion বা ছতরী আছে—বেশ প্রশস্ত স্থান এটী, চারিদিকে খোলা—এখানে ব'সে ব'সে সামনের চৌরাস্তায় লোক-চলাচল দেখা যায়, রাস্তার ওধারে মোরগ-লড়াইয়ের আটচালা আর বাজারও বেশ দেখা যায়। আমাদের আলাপ-টালাপের পরে এই Pavilionএ পদণ্ডদের খাওয়ানো হ'ল। কলাপাতায় ভাত তরকারী দিয়ে গেল, এঁরা বাঁ হাতে পাতাটা ঠোঙার মতন ক'রে তুলে ধ'রে ডান হাতে খেতে লাগ্‌লেন। পদণ্ডদের 'সেবা'র পরে, ছতরীটা সাফ ক'রে দেওয়া হ'ল, কবির জন্য একখানা চেয়ার দিলে, তিনি ছতরীর উপরে উঠে ব'সে রাস্তার লোকজন একটু দেখতে লাগলেন। এদেশের গণ্ড-গ্রামের জীবন প্রবাহের সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় করবার এইই ছিল প্রকৃষ্ট উপায়—ভীড়ের মধ্যে নেমে গিয়ে দেখা তাঁর বয়স আর স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিকালটা এই ভাবে আলোচনায় আর বিশ্রামে কেটে গেল।

সন্ধ্যায় বাকেরা, ধীরেনবাবু, সুরেনবাবু, কোপ্যারব্যার্গ আর খোরিস্ উবুদ থেকে ফিরে এলেন। কবিকে দেখাবার জন্য গিয়াঞরের রাজা সন্ধ্যায় নাটক বা যাত্রার আয়োজন ক'রেছিলেন। মুখস প'রে এই নাটকের অভিনয় হয়, এই মুখস-পরা অভিনয়ের নাম Topeng তোপেঙ। যাত্রার অভিনয় হ'ল, আমরা যে বাইরে-বাড়ীর মহলে ছিলুম, তার পাশে আর একটী মহলের প্রশস্ত আঙিনায়। অভিনয় দেখবার জন্য গ্রামের ছেলে বুড়ো মেয়েদের খুবই ভীড় হ'য়েছিল। একপাশে তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে 'গামেলান্' বাদকেরা ব'সে; অভিনেতাদের জন্য মাঝে খানিকটা

জায়গা খালি রাখা ; লম্বালম্বি সার দিয়ে কতকগুলি চেয়ার পাতা, রাজা, কবি,আর অন্য অভ্যাগতদেরর বসবার জন্য ; আর অভ্যাগতদের পিছনে আর সামনে আসরের পাশে স্থানীয় লোকেরা আর রাজার অনুচরেরা দাঁড়িয়ে'। মিষ্টি গামেলানের বাজনা শুরু হ'তে আমরা গিয়ে ব'সলুম। নাটক্ অভিনয় হ'ল, অনেকটা আমাদের যাত্রার মতন। খালি এই পার্থক্য যে, অভিনেতারা মুখস প'রে। মুখস প'রে যাত্রা বা নাটক করার রীতি ভারত থেকেই গিয়েছে। হয় তো বা মুল অস্ট্রিক জাতির মধ্যেই এই ধরণের চিত্তবিনোদন বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপায় উদ্ভূত হ'য়েছিল। এখনও পশ্চিমের রামলীলায় রাক্ষস আর বানরদের মুখে এই রকম মুখস পরবার, আর রাম সীতা লক্ষ্মণের মুখে বর্ণ-চুর্ণ মাখিয়ে অভিনয় করার প্রথা প্রচলিত আছে। আসাম অঞ্চলে মুখস প'রে অভিনয় এখনও হ'য়ে থাকে,—ধর্ম্মোৎসবের অঙ্গ হিসাবে, বৈষ্ণব সত্রগুলিতে ; আসামী ভাষায় মুখসকে 'ছোঁ' আর মুখস প'রে নাট্যাভিনয়কে 'ভাওনা' বলে ; বাঁশের চাঁচাড়ীর কাঠামের উপর এই সব মুখস-চিত্রিত হয়। আবার ওদিকে সুদূর কেরল দেশে মালাবারেও মুখস প'রে বা মুখের উপরই রঙচঙ লাগিয়ে মুখস এঁকে 'কথা-কলি' ব'লে একরকম নাটকের অভিনয় প্রচলিত আছে ; মুখস প'রে বা মুখসের পরিবর্ত্তে মুখে রঙ মেখে নাচও কেরলের সংস্কৃতির একটী বিশিষ্ট বস্তু। বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপের মুখসগুলি কাঠের তৈরী হয় ; হালকা শক্ত কাঠে কুঁদে তৈরী, তাতে নানান্ রকম রঙ চঙ করা থাকে, চোখ দুটোতে ছেঁদা থাকে তাই দিয়ে অভিনেতা দেখতে পায়, আর মুখসের ভিতরদিকে একটা ক'রে চামড়ার জীভ মতন থাকে, অভিনেতা সেটা নিজের মুখের ভিতরে পুরে মুখসটী ঠিক ক'রে আটকে রাখে। যবদ্বীপ বলিদ্বীপের এই সব কাঠের মুখস এদের শিল্পের একটা চমৎকার নিদর্শন-বস্তু হ'য়ে থাকে। মুখস পরে অভিনয় জাপানের প্রাচীন 'নো' নাটকের একটি অতি বিশিষ্ট ব্যাপার ; জিনিসটী চীনে ও আছে, আর চীনের নাটকে মুখে নানান্ রঙ মেখেও মুখসের কাজ চালায়।

যে নাটকটী হ'চ্ছিল, শুনলুম তার আখ্যান-বস্তু যবদ্বীপের প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে—মজপহিত নগরের রাজা হর্ষ-বিজয়ের চরিত্রের কোন ঘটনা অবলম্বন ক'রে। সবটা ভালো বুঝতে পারলুম না। নাটকের আরম্ভে জন আষ্টেক সঙ্ এল,এরা বেশ হাস্যরসের অবতারণা ক'রতে লাগ্‌ল—এদের কথাবার্ত্তা একটুও বুঝতে পারছিলুম না, তবে এদের কথায় শ্রোতৃবর্গের ঘন ঘন হাসি থেকে বুঝলুম যে অভিনয়ের উদ্দেশ্যসিদ্ধি ভালোই হ'চ্ছে—যদিও আমাদের কাছে একটু বেশী অঙ্গভঙ্গি যুক্ত, একটু খোঁচা মেরে আর চিমটী কেটে হাসানো গোছ লাগ্‌ছিল। নাটকের কথাবার্ত্তা চ'ল্‌ছে ; সঙ্গে সঙ্গে গামেলান বাজনার ও বিরাম নেই। দর্শক আর শ্রোতারা নিবিষ্ট চিত্তে শুন্‌ছিল। একটা বিষয় বেশ লক্ষ্য ক'রলুম—আর ব্যাপারটী কবিরও দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিল—এত মেয়ে-পুরুষ কাচ্ছা-বাচ্ছা এসেছে, কিন্তু হৈচৈ চেঁচামেচি কিছুই নেই, ছেলেপুলেরাও বেশ গম্ভীর ভাবে ভব্যতার সঙ্গে ব'সে বা দাঁড়িয়ে। আসরে বাজে গোলমাল মোটেই নেই। জা'তটাকে বেশ সুসভ্য আর আত্মসমাহিত ব'লে বোধ হ'ল, এদের চরিত্রের এই গুণটী বারবার রবীন্দ্রনাথের সাধুবাদ অর্জ্জন ক'রলে।

যাত্রা চ'ল্‌তে লাগল, ঘণ্টাখানেক পরে আমরা আহার ক'রতে গেলুন। রাজার অতিথি হয়ে এসেছেন একজন ডচ্ চিত্রকর—Charles Eugene Henri Sayers। গুণী যুবক ; বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপ বড়ো ভালো লেগেছে, বাডুঙ-এ গত দুমাস ধ'রে আছেন, বলিতে আরও ছ-সাত মাস থাকবেন, খুব ছবি আঁকছেন। এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে বেশ খুশী হওয়া গেল।

আহারের মধ্যে দ্রেউএস্ রাজাকে ধন্যবাদ দিয়ে আর কবিকে সংবর্দ্ধনা ক'রে মালাই ভাষায় একটি বক্তৃতা দিলেন। রাজা তার উত্তর দিলেন, দ্রেউএস আমাদের জন্য ইংরিজিতে তরজমা ক'রে দিলেন। রাজার প্রধান বক্তব্য—বলিদ্বীপের লোকেরা আর ভারতের লোকেরা একই বংশের ; ভারতের সঙ্গে এই সংযোগ তাঁদের কাছে গৌরবের বস্তু ; কবির আগমনে এই গৌরববোধ আর

যেন প্রসার লাভ করে। কবিকে এর উত্তরে কিছু ব'লতে হ'ল—তিনি ব'ললেন যে তাঁর এই বলি আর যবদ্বীপভ্রমণ পিতৃপুরুষদের ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধের জন্যই তিনি ক'রতে এসেছেন ; যে প্রাচীন ভারত এই সমস্ত দূর দেশকে ভারতের আপনার জন ক'রে তুলেছিল, তাঁর ভ্রমণ সেই ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনের জন্য, আর সেই

পুঙ্গব-পুত্রী
(লেগোঙ -নৃত্যে এইরূপ পোষাক পরে)

ভারতকে বোঝবার জন্য—আর সেই সংস্কৃতিকে আবার এদেশে আর ভারতবর্ষে সুদৃঢ় ক'রে তেলবার জন্য।

খাওয়ার পরে রাজার বৈঠকখানা আর অতিথিশালার বা'রবাড়ীতে আর একটী অনুষ্ঠান হ'ল—Legong লেগোঙ নামে এক রকমের নাচ। দুটী ছোটো ছোটো মেয়ে খুব জমকালো কিংখাবের পোষাক প'রে আর মাথায় সোনার আর ফুলের মুকুট প'রে নাচ্‌লে। এই নাচে মেয়ে দুটীর হাতে দু'খানি জাপানী পাখা ছিল। একটুখানি quaint বা অদ্ভুত ভাবের লাগলেও এই পাখা হাতে গম্ভীর ভাবে ক্ষুদে' ক্ষুদে' দুটী মেয়ের নাচ, মোটের উপর বেশ সুরুচিকর আর সুন্দর জিনিস ব'লে বোধ হ'ল। এই নাচ নাকি বারো বছরের উপরের মেয়েরা নাচে না।

সুরেনবাবু, ধীরেনবাবু, কোপ্যারব্যার্গ, খোরিস, এঁরা নাচ দেখে মোটরে ক'রে গেলেন ক্লূঙ্‌কুঙ-এ, সেখানকার পাসাঙ্গাহানে থাকবেন, আর ক্লূঙ্‌কুঙ থেকে সুরেনবাবু বিশ্বভারতীর কলাভবনের জন্য কিছু প্রাচীন আর আধুনিক শিল্পদ্রব্য কিনবেন। রাজা তারপরে রাত্রির মতন কবির কাছথেকে বিদায় নিলেন। আমরা যখন শুতে গেলুম তখন রাত বারোটা।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৭, বৃহস্পতিবার।—

সকালে কবি রাজবাড়ীর উঁচু ছতরীতে ব'সে লিখতে লাগলেন, আর নীচেকার বহমান জীবনস্রোতও দেখতে লাগলেন। বেশ ঝির ঝিরে হাওয়া বইতেছিল, ব'সে সময় কাটাবার পক্ষে জায়গাটী বেশ। রাস্তার লোকেরা সসম্ভ্রমে ভারতবর্ষথেকে আগত মহাগুরু ব'লে তাঁরদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে যাচ্ছিল। কিন্তু এদের সহজ ভদ্রতাজ্ঞান এমনি যে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখবার জন্য এরা মেটেই ভীড় ক'রছিল না। রাজার সঙ্গে একত্র প্রাতরাশ সারা গেল। ভারতবর্ষ আর বলির হিন্দুধর্ম্ম, বলিদ্বীপের সাহিত্য, এই সব বিষয়ে আলাপ হ'ল। খেতে খেতে শুন্‌লুম, হিন্দু শূদ্রদের মধ্যে গোমাংস ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ নয়,তবে উচ্চ জাতির লোকেরা খায় না। বলিদ্বীপেব ভাষায় প্রাচীন যবদ্বীপের কবি-ভাষার মতন নানা সংস্কৃত ছন্দ প্রচলিত। কবির কাছে রাজা সংস্কৃত শ্লোক শুনতে চাইলেন। কবি দুএকটা শ্লোক পাঠ ক'রতে রাজা শ্লোকগুলির কি ছন্দ তা জানতে চাইলেন। একটা শ্লোক ছিল 'শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত' ; শুনে রাজা ব'ল্‌লেন 'সরূদূলা-উইক্রীডিটা' ; আর আরও দু চারটে সংস্কৃত ছন্দের নাম ক'রলেন। কতকগুলি ছন্দের নাম যেন নোতুন লাগ্‌ল, কবিও ব'ললেন যে এই ছন্দগুলির নাম তিনিও শোনেন নি। হয় তো এগুলি যবদ্বীপেরই কবিদের সৃষ্ট।

রাজা আমাদের এক এক খণ্ড ক'রে বলিদ্বীপের তাঁতে বোনা লুঙ্গীর মতন রঙীন সুতোর বস্ত্র উপহার দিলেন। ক্লুঙকুঙ-এ একটা স্কুল খুলতে যাবেন ব'লে রাজা কবির কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তার পরে আমি স্ট্রেউটএস-এর সঙ্গে বাজারে একটু ঘুরলুম। সকালবেলার ভরা বাজার, বলিদ্বীপের জীবনযাত্রার সচল চিত্রাবলী যেন। সামনে রাজার এক পারিষদের বাড়ী। এই পারিষদটী আবার মন্দিরের একজন 'পামাঙ্কু'; মাথায় ঝুটী-বাঁধা এই ব্যক্তিটী গম্ভীরভাবে বাড়ীর দাওয়ায় ব'সে আছে। অঙ্গ খুলী কতকগুলি ছেলেমেয়ে ঘোরা-ঘুরি ক'রছে। বাড়ীর বাহির দেওয়ালে একটা জিনিস দেখলুম—একটি মোরগের দেহ ডানায় পেরেক দিয়ে দেওয়ালে লটকানো। শুনলুম অসুখ বিসুখ হ'লে ভূত শান্তির জন্য মোরগ বলিদান দিয়ে এই রকম ক'রে দেওয়ালে লাগিয়ে দেয়। এইরূপে অপদেবতার বশী-করণ বা বিতাড়নের ব্যবস্থা কোনও বাড়ীতে যে হ'য়েছে তা ঘ্রাণেন্দ্রিয় সাহায্যে দূর থেকেই বুঝতে পারা যায়। বাঙলাদেশে আর বিহারে কোথাও কোথাও গ্রামে মহামারীরূপে কলেরা দেখা দিলে একটা ছাগল মেরে তার চামড়ায় খড় পুরে উঁচু বাঁশের মাথায় টাঙিয়ে রাখার রীতির কথা মনে প'ড়ল।

দুপুর হ'তে চলে, ক্লুঙকুঙ থেকে সুরেনবাবু আর অন্য সবাই এলেন। তারপরে আমরা দক্ষিণ বলির প্রধান নগর Badoeng বাদুঙ বা Den Pasar দেন্ পাসার অভিমুখে যাত্রা ক'রলুম। পথে Oeboed উবুদ গ্রামে স্থানীয় Poenggawa পুঙ্গব বা জমীদার মহাশয়ের বাড়ী হ'য়ে গেলুম। এই জমীদার বা ক্ষুদ্র রাজাটী বলিদ্বীপের একজন প্রধান শিক্ষিত ব্যক্তি। এঁর পুরা নামটী হ'চ্ছে Gade Rake Tjokorde Soekawati গডে রাকে চকর্দে সুখবতী। ইনি ডচ ভাষা বেশ ভালোই জানেন, আর বাতাবিয়ায় যে রাজকীয় ব্যবস্থাপক সভা আছে, আমাদের দিল্লীর সভার মতন,—তাতে ইনি বলিদ্বীপের প্রতিনিধিরূপে যান। বলিদ্বীপের রীতিনীতি চাষবাসের কথা পোষাকের কথা নিয়ে ইনি ডচ ভাষায় কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলির ইংরিজি অনুবাদও প্রকাশিত হ'য়েছে। দিন দুই পরে উবুদে এঁরই বাড়ীতে এঁর এক পিতৃব্যের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া হবে—তিন চার মাস আগে তাঁর মৃত্যু হ'য়েছে, এতদিনে দেহের অগ্নিসংকার হবে, তদুপলক্ষে একটা বিরাট উৎসব জ'মবে। আমরা বাদুঙ থেকে দু তিন দিন ধ'রে মোটরে ক'রে এসে এইসব ব্যাপার দেখবো। পুঙ্গব সুখবতীর সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে বাঙলির পুঙ্গবের বাড়ীতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে বলিতে আমাদের প্রথম অবতরণের দিনই আলাপ হ'য়েছিল। এঁর বাড়ী দেখেলে চডের; ইনি আমাদের স্বাগত ক'রলেন, তবে তাঁর বাড়ীর ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষ্যে তিনি বড়ো বেশী ব্যস্ত ছিলেন। ডক্টর খোরিস এঁর বাড়ীতে অতিথি হ'য়ে ছিলেন, ইনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন, কোথায় কি হ'চ্ছে। উবুদের পুঙ্গব-গৃহে এই রূপে খানিক বিশ্রাম ক'রে আমরা বাদুঙ অভিমুখে প্রস্থান ক'রলুম। বেলা পৌনে দুটো আন্দাজ বাদুঙে পৌঁছানো গেল।

ক্রমশঃ

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

(৩৩)

এই পার্টির কথা মায়া জীবনে কোনোদিন ভুলিতে পারে নাই। ঘণ্টা দুই তিনের ভিতর তাহার সারা জীবনের ধারা যেন এইখানেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া গেল। কিন্তু সমস্যার কোনো সমাধানই হইল না, মায়া বুঝিল এতদিন সে যাহা ধ্রুবসত্য বলিয়া জানিয়াছে, চিরদিন যাহা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহার কিছুই আর পূর্ব্বের মূর্ত্তিতে তাহার চোখে পড়িতেছে না। দেবকুমারের দৃষ্টি এখনই যেন তাহার দৃষ্টিকে অনুরঞ্জিত করিতেছে। তাহার স্বাধীন সত্তা এখনই যেন অবলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। বুদ্ধির দিক হইতে সে বুঝিতেছিল, সে নিজের অপমান করিতেছে, কিন্তু হৃদয়ের দিক হইতে এই পরাজয় স্বীকারেই তাহার এক আশ্চর্য্য আনন্দ হইতেছিল। মানুষের প্রিয় যাহা কিছু সকলের জন্যই তাহাকে মূল্য দিতে হয়। মায়ার কাছে নিজের স্বাধীনতার মূল্য অনেকখানিই ছিল, তাহা বিসর্জ্জন দিয়া সে যেন দেবকুমারের ভালবাসা পাইবার অধিকার অর্জ্জন করিল।

অজয় ভদ্রতার খাতিরে চা খাইতে আসিয়াছিল বটে, এবং খানিকটা মজা দেখিতে পাইবার আশায়ই যেন খানিকক্ষণ বসিয়াও ছিল, কিন্তু তাহাকে নিরাশই হইতে হইল। দেবকুমার নিতান্তই সাধারণভাবে গল্প করিতে লাগিল। প্রেমিক প্রেমিকার আলাপের যেরকম ধারণা অজয়ের মনে ছিল, তাহার সঙ্গে কিছুই মিলিল না। চাক্ষুষ এসব কোনোদিনই সে দেখে নাই। হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরে তাহার জন্ম, কলিকাতায় বাস করিলেও তাহাদের পরিবারে কোনোরকম আধুনিকতা প্রবেশ করে নাই। কাজেই এবিষয়ে তাহার সমস্ত ধারণাটাই নভেল, নাটক এবং বায়োস্কোপ হইতে সংগৃহীত ছিল। মায়া এবং দেবকুমার তাহার কৌতূহলের কোনো খোরাকই জোগাইবার লক্ষণ দেখাইতেছে না দেখিয়া সে খানিক পরে কাজের ছুতা করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

সে যাইতেই দেবকুমার বলিল, "আমি কিন্তু অভদ্রের মতই বসে আছি, নড়বার নাম নেই। হয়ত আপনার কাজের অসুবিধা হচ্ছে এবং বিরক্তও হচ্ছেন। তা যদি হয় ত বলুন, কিছু সঙ্কোচ করবেন না।"

মায়া বলিল, "আমারও কাজের সীমা নেই। সন্ধ্যার সময় আবার কি কাজ থাকবে? অন্যদিন ত সময়ই কাটে না। একটা যে কেউ এলেও বর্ত্তে যাই।"

দেবকুমার বলিল, "আপনার কথার গোড়াটা শুনে সবে একটু খুশি হতে আরম্ভ করেছিলাম, এমন সময় আপনি সব মাটি করে দিলেন।"

মায়া হাসিয়া বলিল, "Fishing for compliments-টা দেখছি স্ত্রীজাতির একচেটিয়া গুণ নয়। আপনাদেরও সেটা দিব্যি আছে দেখছি। যা নিজে জানেনই, তা আর একবার আমার মুখ থেকে শুনে কি হবে?"

দেবকুমার বলিল, "পৃথিবীতে কতকগুলো কথা আছে, যা হয়ত খুবই জানা, তবু বার-বার লোকের মুখে শুনতে ইচ্ছে করে। অবশ্য সব লোকের মুখে নয়।"

মায়া উত্তরে কিছু না বলিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর কথা বদলাইয়া বলিল, "আপনার কাজ আরম্ভ করছেন কবে?"

দেবকুমার বলিল, "এখন করলেই হয়। খরচ ত বাপের টাকা অনেক করা গেল, উপার্জ্জনটা নিতান্তই অতঃপর সুরু করতে হয়। কতদূর পেরে উঠব তা জানি না, তবে সবাই বলে রেঙ্গুনে উকীল ব্যারিষ্টারের কপাল খুব দরাজ, এই যা ভরসা।"

মায়া বলিল, "তা সত্যি, এখানে নিতান্ত হাবা বোকা মানুষেও যে-পরিমাণ টাকা রোজগার করে তা দেখলে

অবাক হয়ে যেতে হয়। তখন আর মনে হয় না যে মানুষের বুদ্ধি বা culture-এর কোনো দাম আছে।"

দেবকুমার বলিল, "আচ্ছা, খুব গাদাখানেক টাকা পেতে আপনার কি ইচ্ছে করে? আপনার অবশ্য তা আছেই, তবু এর চেয়েও বেশী হ'লে ছিল ভাল, একথা কখনও মনে হয়?"

মায়া সংক্ষেপে বলিল, "না, যখন গরীব ছিলাম, তখনও টাকার অভাব কিছু অনুভব করিনি। এখন হয়ত নানাদিকে আমি তখনকার চেয়ে সুখী, কিন্তু তার অন্য কারণ রয়েছে।"

দেবকুমার বলিল, "তবু টাকা জিনিষটা খুবই যে দরকারী, তা ত আর আপনি অস্বীকার করেন না?"

মায়া বলিল, "না, তা মোটেই করি না। লেখাপড়া শেখা, ইচ্ছামত কাজ বেছে নেওয়া, দেশের বা দশের উপকার করা, এসবের কোনোটাই ত টাকা না হ'লে করা যায় না। মনটা-সুদ্ধ অভাবে শুকিয়ে আসে, নিজের খাওয়া-পরা আর থাকার ভাবনা ছাড়া আর কিছু মানুষ তখন ভাবতেই পারে না।"

দেবকুমার বলিল, "আপনার মুখে এ কথাটা শুনে খুব ভাল লাগল। আপনি নিজে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকেও তার যথার্থ দামটা যে ভোলেন নি, এইটাই আশ্চর্য্য। ওদেশে পথে-ঘাটে ঘরে-বাইরে, খালি টাকার জন্যে লোলুপতা দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। বিশেষতঃ অল্পবয়সী মেয়েদের-সুদ্ধ টাকার পিছনে পাগল হয়ে ছুটতে দেখলে বড় খারাপ লাগে।"

মায়া বলিল, "চলুন, এবার আমার বাগানটা আপনাকে দেখিয়ে আনি। রোদটা বেশ পড়ে গিয়েছে। সমাজতত্ত্ব আলোচনা ক'রে ক'রে আপনিও হাঁপিয়ে গিয়েছেন।"

দেবকুমার হাসিয়া উঠিয়া পড়িল। বলিল, "আপনার বয়সের পক্ষে আপনি মানুষ চেনেন বড় বেশী দেখছি। সমাজতত্ত্বের আলোচনাটা যে আমার খুব মুখরোচক নয় তা এরই মধ্যে ধরে ফেলেছেন? কিন্তু কি করব বলুন? যাবার মতলব মোটেই নেই, তাই আজেবাজে বকে আপনাকে entertain করবার চেষ্টায় আছি। আপনার gardening খুব ভাল লাগে না কি?"

মায়া বলিল, "খুব। দেশে থাকতে কত গাছ যে লাগিয়েছিলাম তার ঠিক নেই, ফলের গাছ, ফুলের গাছ। এবারে গিয়ে দেখলাম, ফুলের গাছগুলো একটাও নেই, ফল এবং তরকারির গাছগুলো তবু আছে। এখানে বাগান একটা আগেই ছিল, আমি সেটা বদলে নিজের পছন্দমত করেছি। তবে মালীটি মাঝে মাঝে সর্দ্দারি করে আমায় খুব জ্বালিয়ে তোলে।"

কথা বলিতে বলিতে দুইজনেই বাগানের মধ্যে আসিয়া পড়িল। দেবকুমার বলিল, "আমাদের দেশ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে ফুলের বাগানের তদারক করতে উড়ে রাখার কথা কেউ স্বপ্নেও মনে স্থান দিত না। ফুলের সঙ্গে যাদের আকৃতি এবং প্রকৃতিগত সাদৃশ্য সব চেয়ে বেশী, তাদেরই একাজটা মানায়। আপনার বাগানটি দেখতে বেশ, তবে খানিকটা Eurasian."

মায়া বলিল, "style-এর শুদ্ধতা রক্ষা করার মত জ্ঞান ত আমার নেই, কাজেই এরকম ভুল হওয়া অনিবার্য্য। যেখানে যা ভাল লাগে, তাই করি, চোখে কেমন দেখায় এইটাই মাত্র বিচার করি।"

দেবকুমার বলিল, "সেইটাই আসল প্রয়োজন যদিও। আমার কাছে gardening বিষয়ে কতকগুলি বই আছে ছবি সমেত, সেগুলো আপনাকে এনে দেব। ছবিগুলো দেখতে মন্দ নয়। আমাদের দেশেও বাগান করার এক সময় খুব চলন ছিল, মুসলমানদের আমলে। আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, কাশ্মীর প্রভৃতি বেড়ালে, দিশী gardening-এর আন্দাজ পাওয়া যায়। ওদিকে কখন যাননি বুঝি?"

মায়া বলিল, "কখন আর গেলাম? ছিলাম পাড়াগাঁয়ে, সেখান থেকে সোজা বর্ম্মায়। ওসব বুড়ো বয়সের জন্যে তোলা রইল।"

দেবকুমার বলিল, "বুড়ো বয়সে কেন, অল্প বয়সেই যাবেন। এখনই ত সময়, বেশী বয়সে কি আর ওসব খেয়াল থাকে?"

মায়া বলিল, "এখন যেতে চাইলেই বা নিয়ে যাবে

কে ? বাবা ত তাঁর ব্যবসা ছেড়ে একদিনের জন্যেও নড়তে চান না, তিনি আবার যাবেন বেড়াতে।"

দেবকুমার বলিল, "না হয় একলাই যাবেন। আর আপনার বাবা ছাড়া নিয়ে যাবার অন্য লোক ও কেউ জুটে যাওয়া বিচিত্র নয়।"

মায়ার গালের কাছটা একটু লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "অনেক ত ঘোরা হ'ল, এখন একটু বসা যাক, চেয়ার দিয়ে গিয়েছে।"

দেবকুমার বলিল, "আমি যাচ্ছি না একেই, তার উপর আপনি আমায় আরও প্রশ্রয় দিচ্ছেন। এরকম করলে আমি রোজ এসে উৎপাত করব।"

মায়া বলিল, "ভালই ত, আমি তাতে মোটেই দুঃখিত হব না।"

দেবকুমার বলিল, "দেখুন একথাটা আমি কিন্তু seriously-ই নিলাম, আপনি যদিও খুব সম্ভব ভদ্রতা করে বলেছেন।"

মায়া লজ্জিত হইয়া ভাবিল, ঠিক এমনভাবে কথাটা না বলিলেও হইত। কিন্তু বলিয়াছে যখন তখন ফিরান আর যায় না। মনের ভিতর কে যেন তাহাকে এই কথাটা বলাইতেই চাহিতেছিল। দেবকুমার আসিলে সে যে খুশি হয়, তাহা দেবকুমার জানিলে দুঃখটা কি ?

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, অন্ধকার হইয়া আসিল। এদিকটা সব সময়েই নীরব, এখন যেন নীরবতাটা আরও গভীরতর হইয়া আসিল। মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দও যেন স্পষ্ট হইয়া কানে বাজিতে লাগিল।

দেবকুমার বলিল, "চা খেতে এসে ত রাত হয়ে গেল। অন্য মানুষ হ'লে মনে করত যে, রাত্রের খাওয়াটাও খেয়ে যাবার মতলব। আপনি অবশ্য তা মনে করছেন না ?"

মায়া বলিল, "না, জাহাজে আপনার খাওয়ার নমুনা ত দেখেছি, কাজেই অত পেটুক আপনাকে মনে হচ্ছে না।"

দেবকুমার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আপনার বাবা বাড়ী এসে আমাকে বসে থাকতে দেখলে নিশ্চয়ই পাগল মনে করবেন। আপনি কি শহরের

মায়া বলিল, "যাই বই কি ? বন্ধুবান্ধবের বাড়ী যাই, সিনেমায় যাই, ভাল opera কি ballet এলে তাতেও যাই।"

দেবকুমার খুব উৎসাহিত হইয়া বলিল, "একটা খুব ভাল Russian ballet এসেছে, যাবেন ? বলেন ত টিকিট করে রাখি।"

মায়া বলিল,"বাবার সময় হবে কি না তাত জানি না। তাঁকে জিগগেষ করে জানাব।"

দেবকুমার একটু দমিয়া গেল, বলিল, "তা ঠিক, আমারই ভুল হয়েছিল। ওদেশে ত বাপ-মার অনুমতি নেওয়া জিনিষটা একটা প্রাগৈতিহাসিক কাণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে, এখানে যে তা মোটেই নয়, তা মনে ছিল না। আমি টেলিফোন নিয়েছি, আমার রুম্‌-এ। আমায় তাহ'লে কাল দয়া করে জানাবেন।"

মায়া বলিল, "আচ্ছা, বাবার এসবে এখনও উৎসাহ আছে, সময় থাকলে তিনি কখনও না বলবেন না।"

দেবকুমার বলিল, "আপনাকে এতক্ষণ জ্বালানোর শাস্তি-স্বরূপ এরপর আমায় হেঁটে রেঙ্গুন ফিরতে হবে বোধ হয়। এ দেশে গাড়ী ট্যাক্সি কিছুই পাওয়া যায় না ত ?"

মায়া বলিল, "আমার গাড়ীতে যান, আমি ড্রাইভারকে বলেই রেখেছি। এদিকে মোটর-বস্‌ ট্রাম সবই আছে, কিন্তু তাতে যাবার কিছু দরকার নেই।"

দেবকুমার বলিল, "আপত্তি করা উচিত ছিল, কিন্তু করব না। আপনার ড্রাইভার যদিও মনে মনে আমাকে খুব গাল দেবে।"

মায়া বলিল, "গাল দেবার জন্যে ত তাকে রাখা হয়নি, কাজ করবার জন্যে রাখা হয়েছে। তা ছাড়া বিকেলের দিকে আমাদের বাড়ী অতিথি অভ্যাগত কেউ এলে তাঁদের যে আমরা বাড়ী পৌঁছে দিতে বলব, তা তাদের জানাই আছে।"

দেবকুমার এবং মায়া দুইজনেই গাড়ী-বারান্দার দিকে অগ্রসর হইল। দেবকুমার নীচু গলায় বলিল, "আমি যদি কবি হতাম, তাহলে এই রাত্রিটার বিষয়ে একটা কবিতা লিখতাম। কিন্তু সে ক্ষমতাটা নেই। আমার

আমার যা পাবার ত পাওয়া হয়ে গিয়েছে, তবে বঞ্চিত হ'ল অন্যরা, যারা এটার ভাগ কবিতার মধ্যে দিয়ে পেতে পারত।"

মায়া বলিবার কিছু খুঁজিয়া পাইল না। তাহার মনের কথাই দেবকুমারের মুখ দিয়া বাহির হইতেছে যেন!

গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। মায়া বলিল, "আপনি সত্যি যেন ভাববেন না, এতক্ষণ থেকে আপনি আমায় একটুও বিরক্ত করেছেন। আমি এত বেশী একলা থাকি যে কেউ দয়া করে এলে অত্যন্ত খুশি হই।"

দেবকুমার বলিল, "দয়াটা আপনিই তাদের করেন, এবং সেটা বুঝতেও পারেন না। আচ্ছা, এখন আসি।" সে নমস্কার করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

মায়া খানিকক্ষণ নীচেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। অজয় বা তাহার পিতা যে বাড়ীতে নাই, ইহাতে সে খানিকটা যেন স্বস্তি পাইতেছিল। তাহার মনের অবস্থাটা এমনি হইয়াছিল যে, কাহারও সঙ্গে কথা বলাই তাহার অসম্ভব বোধ হইতেছিল।

নিজের শুইবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল আয়া তখনও বিছানা করিতেছে। মায়াকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু চলা গিয়া দিদিমণি?"

মায়া বলিল, "হাঁ।" সে অন্যমনস্কভাবে ব্রোচ, নেক্‌লেশ প্রভৃতি খুলিয়া রাখিতে লাগিল। আয়া একটু পরে বলিল, "বহুৎ আচ্ছা দেখ্‌নে কো হ্যায়। ছোক্‌রা বোল্‌তা বারিষ্টার বন্‌কে আয়া?"

মায়া জোর করিয়া হাসিল, বলিল, "যা, যা, তোর অত খবরে কাজ কি? বারিষ্টার ত কত লোকেই হয়।" আয়ার কাজ আর শেষই হয় না। চাদর ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "সাদি হোনে সে বহুৎ আচ্ছা।"

মায়া চম্‌কিয়া উঠিল। চাকরবাকরেও হঠাৎ এ-কথা বলিতে সুরু করিল কেন? তাহার যে দেবকুমারের সঙ্গে বিবাহ হইতে পারে তাহা মনে করিবার উহাদের কি কারণ ঘটিয়াছে? মায়া ত যথেষ্ট সাবধান হইয়াই চলিয়াছিল, দেবকুমারের ব্যবহারেও কোথাও কোনো ত্রুটি হয় নাই। তাহা হইলে এমন কথা উহাদের মনে আসিল কেমন করিয়া?"

সে আয়াকে তাড়া দিয়া বলিল, "কি বাজে বকিস্? ফের্ এসব কথা শুন্‌লে তোর চুল ছিঁড়ে দেব। যত বড় বুড়ো হচ্ছিস, তত আক্কেল কমছে।"

আয়া হাসিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। যাইবার আগে একখানা চিঠি মায়ার হাতে দিয়া বলিল, চিঠিখানা খানিক আগে আসিয়াছে, বাহিরের বাবু থাকার জন্য সে দিতে পারে নাই।

উপরের হাতের লেখাটা দেখিয়া চিনিল, প্রভাসের চিঠি। খুলিতে বিশেষ উৎসাহ বোধ হইল না। চিঠিখানা ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখিয়া সে আস্তে আস্তে কাপড়চোপড় ছাড়িতে লাগিল। তাহার মনো-জগতে এখন প্রবাসের স্থান কোথায়? সাবিত্রী, তাঁহার স্মৃতি-মন্দির স্থাপন, দেশের কাজ করা, সবই যেন মায়ার জীবন হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। সেখানে এখন একাধিপত্য। কয়েকটা মাত্র দিন আগে যে মানুষের অস্তিত্ব সে জানিত না বলিলেই হয়, এখন তাহাকে ছাড়া আর কিছু মায়া ভাবিতেই পারে না। কিন্তু সে ভাবনায় আনন্দ যত, বেদনা তত। মায়া কি করিবে, কোন্ পথে যাইবে?

কাপড়চোপড় ছাড়া হইয়া গেল। নিজে আর সে-সব গুছাইয়া রাখিতে তাহার ইচ্ছা করিল না, আয়ার জন্য ইলেক্‌ট্রিক বেল্ বাজাইয়া, চিঠিখানা হাতে করিয়া সে নিজের পড়ার ঘরে চলিয়া গেল।

প্রভাস বেশী কিছু লেখে নাই। সে সময়মত ছুটি পায় নাই। কয়েক দিন পরে মাস-দেড়েকের ছুটি লইয়া বাড়ী যাইবে। ছোট ভাই সুভাসের বিবাহ সেই সময়। বিবাহ এবং তদানুসঙ্গিক সব গোলমাল চুকিয়া গেলেই সে মায়ার কাজ লইয়া পড়িবে। Plan সব ঠিক হইয়া গেলেই সে বর্ম্মা যাত্রা করিবে। তাহার দেশ-বেড়ানোও হইবে, মায়ার কাজও হইবে। অনেকদিন হইতেই তাহার দেশবিদেশ বেড়াইবার

ইচ্ছা কিন্তু এতদিন সময়ও পায় নাই, অর্থও ছিল না। এখন দুইটার ব্যবস্থাই এক রকম হইয়াছে, কাজেই ভাবনা নাই। মায়া এবং নিরঞ্জনের সঙ্গে মুখোমুখি পরামর্শ করিয়া কাজ করাই ভাল, না হইলে চিঠি লেখালেখি করিয়া অনর্থক সময়ও যাইবে, এবং কাজও ভাল করিয়া হইবে না।

মায়ার আর একটা ভাবনা আসিয়া জুটিল। মায়ের স্মৃতি-মন্দির স্থাপনের মধ্যে নিরঞ্জনকে না জড়ানই তাহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রভাসের চিঠিতে বুঝিল তাহা হইবার নয়। রেঙ্গুনে আসিলে, সে তাহাদের বাড়ীতেই আসিবে এবং নিরঞ্জনকে বাদ দিয়া কোনো কথাই সেই বলিবে না, এবং সম্ভবও হইবে না। কাজেই যেমন করিয়া হোক, কথাটা তাহাকে আগে পাড়িয়া রাখিতেই হইবে।

তাহার শরীর মন অকারণেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আর কিছু ভাবিতে তাহার ইচ্ছা করিতেছিল না। সে চিঠিখানা দেরাজে রাখিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল। সে রাত্রে আর আহারাদি করিতেও উঠিল না।

(৩৪)

নিরঞ্জন সকালে আপিসঘরে বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। আগের দিন রাত্রে ফিরিতে তাঁহার অত্যন্ত দেরি হইয়া গিয়াছিল, আসিয়া আর মায়ার সঙ্গে দেখা হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন, সে শুইতে চলিয়া গিয়াছে, কাজেই আর ডাকেন নাই।

ছোকরা আসিয়া খবর দিয়া গেল চা দেওয়া হইয়াছে। কাগজপত্র রাখিয়া নিরঞ্জন খাবার ঘরে চলিলেন। মায়া নামিয়া আসিয়াছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল দেবকুমার এসেছিল ত?'

মায়া চোখ নীচু করিয়াই উত্তর দিল, "হাঁ, এসেছিলেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "এমন কাজের তাড়া পড়েছে যে কিছুতেই আগে আস্‌তে পারলাম না। আজও ঐ রকম রাত হবে। এ সপ্তাহটাই বোধ হয় যাবে

মায়া বলিল, "হাঁ, অজয় এসেছিল। দেবকুমার বাবু বল্‌ছিলেন খুব ভাল একটা Russian ballet এসেছে। তিনি যাবেন, আমরাও যাব কিনা তাঁকে জানালে তিনি টিকিট করে রাখবেন কালকের জন্যে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "সময় পাওয়া শক্ত। দেখি আপিসে গিয়ে যদি ব্যবস্থা করতে পারি।"

খানিকক্ষণ আর কিছু কথাবার্ত্তা হইল না। নিরঞ্জন খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলেন, এবং মায়া চা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। প্রভাসের কথা বাবাকে না বলিলেও নয়, অথচ কেমন করিয়া যে সে কথাটা পাড়িবে, তাহা ভাবিয়াই পাইতেছিল না।

অবশেষে আর কিছু ভাবিয়া না পাইয়া বলিল, "কালকে আমাদের গ্রামের প্রভাস-দার একটা চিঠি পেয়েছি।"

নিরঞ্জন মুখ তুলিয়া বলিলেন, "ও প্রভাসের? সে তোকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে বুঝি? কি লিখেছে সে?"

মায়া বলিল, "না, আগে ত লিখতেন না, এবার গিয়ে তাঁকে একটা কাজের ভার দিয়ে এসেছিলাম, তারই জন্যে লিখেছেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কি কাজ? গ্রামে গিয়ে তাই বুঝি আসতে দেরি হচ্ছিল?"

আর না বলিলে নয় যখন, তখন মায়া বলিয়াই ফেলিল। "মায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্যে গ্রামে একটা কিছু করব, ঠিক করেছিলাম। আমার হাতে কিছু টাকা জমেছে। তাই কি রকম জিনিষ হ'লে সব চেয়ে ভাল হয়, সেটা জান্‌তে প্রভাস-দাকে বলে এসেছিলাম। সেই বিষয়ে লিখেছেন, এখানে কিছুদিন পরে একবার আসবেন এবং মুখোমুখি সব আলোচনা করবেন, তাঁর ইচ্ছে।"

কথাটা বলিয়াই মায়া একবার ভয়ে ভয়ে পিতার মুখের দিকে তাকাইল। তিনি বিরক্ত হইবার কোনো লক্ষণ না দেখাইয়া বলিলেন, "তা বেশ ত। কবে আসছে?"

মায়া বলিল, "দিন পনেরো কুড়ি পরে বোধ হয়। তাঁর ছোট ভাইয়ের বিয়ে এই সময়, সেটা হয়ে গেলেই

নিরঞ্জন বলিলেন, "উৎসাহ থাকতে থাকতে করে ফেলা ভাল। বেশী দেরি করলে শেষ অবধি আর হয়েই ওঠে না। আমার ইচ্ছা ছিল, আমার বাবার নামে ভাল একটা টোল খুলব, কিন্তু হাতে তখন বেশী ত পয়সা থাকত না? সর্ব্বদাই দেখতাম যে মৃতের চেয়ে জীবিতের claim-টাই বড়। শেষ অবধি আর হ'লই না। যখন টাকা হ'ল, তখন ওটা মনের মধ্যে অনেক জিনিষের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে, আর কিছু করে উঠ্‌তে পারলাম না। কিন্তু কত টাকাই বা তোর কাছে আছে? আচ্ছা প্রভাস আসুক, তারপর সবাই মিলে পরামর্শ করে ঠিক করব। করতে হ'লে ভাল করেই করা উচিত।"

মায়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহা লইয়া যদি আবার গোলমাল কিছু হইত, তাহা হইলে বেচারীর আর যন্ত্রণার সীমা থাকিত না। সে এখন কোন কিছুতেই মন দিতে পারে না, বাপের সহিত মায়ের স্মৃতি লইয়া তর্ক করার অবস্থা তাহার মোটেই নয়। পড়াশুনায় একেবারেই মন দিতে পারে না। কলেজে নিতান্ত না গেলে নয়, তাই যায়। কিন্তু সেখানে কি যে হয় না-হয়, কিছুই যেন তাহার মাথায় ঢোকে না। বাড়ীতেও বই হাতে করিয়া সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকে, তবু মন দিতে পারে না। নিজের অজ্ঞাতসারেই দেবকুমারের চিন্তা আসিয়া তাহার মন জুড়িয়া বসে। সে কখন কি বলিয়াছিল, কি মনে করিয়া বলিয়াছিল, তাহাই শতবার ভাবে। মানসদৃষ্টিতে সেই-সব দৃশ্য আবার দেখিয়া পুলকিত হয়। মনোরাজ্যের মধ্যে যেখানে মানুষের স্মৃতির চিত্রশালা, সেইখানে ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রেমের আলোকে প্রিয়ের মুখ আরও উজ্জ্বল সুন্দর করিয়া দেখে।

নিরঞ্জন উঠিয়া যাইবার পর মায়া অনেকক্ষণ খাবার টেবিলেই বসিয়া রহিল। Russian ballet-এ যাইতে পারিবে কি না, তাহা সকালের মধ্যেই দেবকুমারকে টেলিফোন করিয়া জানাইতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু নিরঞ্জন আপিস গিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিবেন কি না, তাহা জানিতে না পারিলে, সে দেবকুমারকে কি জানাইবে? কিন্তু দেবকুমার হয়ত জানিবার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। কোনো খবর না পাইলে সে মায়াকে মনে করিবে কি? একটা কোনো রকম খবর ত দেওয়া উচিত? মায়া ধীরে ধীরে টেলিফোনের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

দেবকুমারের সাড়া পাইতে মোটেই দেরি হইল না। ভাবে মনে হইল সে রিসিভার হাতে করিয়াই যেন বসিয়াছিল। খুব উৎসাহিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর? আজ যাচ্ছেন ত?"

মায়া বলিল, "বাবা আপিসে না-যাওয়া পর্য্যন্ত কিছু বল্‌তে পারছেন না। তাঁর কাছ থেকে খবর পেলেই আপনাকে জানাব।"

দেবকুমার বলিল, "খবরটা আপিই ত তাঁর আপিস থেকে জেনে আপনাকে জানাতে পারি। কোকাইন ঘুরে রেঙ্গুনের খবর আবার রেঙ্গুনে ফিরে আসার কি দরকার? অনর্থক খানিকটা সময় যাবে।"

মায়া বলিল, "আচ্ছা, তাই করবেন, আমাকে সাড়ে দশটার মধ্যে জানালে ভাল, কারণ তারপর ত আমি কলেজ চলে যাব।"

দেবকুমার বলিল, "নিশ্চয়, আমি এখনি যাচ্ছি তাঁর কাছে।"

মায়া টেলিফোন রাখিয়া উপরে উঠিয়া গেল। প্রভাসের চিঠিখানার একটা সংক্ষিপ্ত জবাব লিখিয়া রাখিল। দেবকুমার কখন যে তাহাকে টেলিফোন করিবে স্থির নাই। আয়া আসিয়া স্নান করিবার জন্য বার-দুই তাড়া দিয়া গেল, কিন্তু মায়া নড়িবার নাম করিল না। আয়াকে বলিয়া দিল, তাহার শরীর বিশেষ ভাল লাগিতেছে না, স্নান করিলেও পরে করিবে। সে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল, কখন ডাক আসে। দেবকুমারের ঘর নিরঞ্জনের আপিসের কাছেই, কাজেই খবর নিতে খুব বেশী দেরি হইবার কথা নয়।

টেলিফোনের ঘণ্টা টিং টিং করিয়া উঠিল। মায়ার ইচ্ছা করিতে লাগিল, ছুটিয়া নীচে যায়, কিন্তু তাহা হইলে চাকরবাকরে মনে করিবে কি? কোনমতে ধৈর্য্য ধরিয়া সে খাটের উপর বসিয়া রহিল। কিন্তু

কেহই তাহাকে ডাকিতে আসিল না। মায়া নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নিরঞ্জন হয়ত এখনও আপিসে পৌঁছান নাই, দেবকুমার তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। নয়ত তাহার নিজেরই কোনো কাজ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারি জন্য দেরি হইতেছে।

ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল, সময় হইয়া আসিতেছে, কলেজ যাইতে হইলে আর দেরি করা চলে না। নিতান্তই অনিচ্ছাসত্ত্বে এবং নিরুৎসাহভাবে উঠিতে যাইতেছে এমন সময় আর একবার টেলিফোনের ঘণ্টা শোনা গেল। এবং মিনিট-খানেকের মধ্যেই ছোক্‌রা আসিয়া খবর দিল যে, নীচে টেলিফোনে দিদিমণিকে ডাকিতেছে।

মায়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল। দেবকুমার তাহার সাড়া পাইবামাত্র বলিল, "দেখুন, আপনার বাবা ত যেতে পারবেন না। কিন্তু থামুন, এখনি চট্ রিসিভারটা ফেলে দেবেন না। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন, আপনাকে নিয়ে যেতে। আপনি কি যাবেন? তাহ'লে এখুনি গিয়ে টিকিট করে রাখি।"

মায়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা যাব।" সে আর কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া আসিল।

নিরঞ্জন সব বিষয়েই সাহেবীআনার ভক্ত। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত কন্যা সম্বন্ধে একটু যেন বাঁধাবাঁধি করিতেন। অবশ্য মায়া আলাপ করিত সকলের সঙ্গেই, কিন্তু ইহার বেশী ঘনিষ্ঠতা করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই। হঠাৎ দেবকুমারকে এতখানি নিকটে আসিবার সুবিধা একরকম যাচিয়া দেওয়াতে মায়া অবাক হইয়া গেল। পিতা কি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন? এই কি তাঁহার আশীর্ব্বাদ? মায়ার বুকের ভিতরটা দুরদুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কলেজে যাইতে তাহার মন কিছুতেই যেন রাজী হইল না। শরীর খারাপের ছুতা করিয়া সে গিয়া শুইয়া পড়িল। অনেক বেলায় তবে উঠিয়া স্নানাহার করিল। একবার আশা করিল, দেবকুমার আবার হয়ত টেলিফোন করিবে। কিন্তু আর কোনো আহ্বান আসিল না।

মায়ার ষোড়শ জন্মদিনে নিরঞ্জন তাহাকে এক প্রস্থ হীরার অলঙ্কার উপহার দিয়াছিলেন। উহা বহুমূল্য বলিয়া মায়া বিশেষ কখনও পরে নাই, ব্যাঙ্কেই জমা থাকিত। আজ সখ করিয়া মায়া তাড়াতাড়ি সেগুলি আনিতে লোক পাঠাইয়া দিল। তাহার বন্ধুবান্ধবরা সর্ব্বদা ঠাট্টা করিত যে, বর না আসিলে মায়া এগুলি কখনও পরিবে না। সেই কথা মনে করিয়া মায়ার মুখটা একটু লাল হইয়া উঠিল।

বেলাটা শীঘ্রই কাটিয়া গেল। দেবকুমার টেলিফোন করিয়া জানাইল সে সাড়ে চারটার সময় মায়াকে আনিতে যাইবে। আজ ম্যাটিনি পারফরম্যান, কাজেই তাড়া একটু আছে।

মায়া সাজসজ্জা আরম্ভ করার আগে ছুটিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি চা ঠিক করিতে বলিয়া আসিল। দেবকুমার আসিলে তাহাকে একেবারে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় না।

তাহার পর আসিল সাজের পালা। এত যত্ন করিয়া মায়া কোনোদিন সাজে নাই। কোথাও কোন খুঁৎ সে রাখিল না। হীরার গহনার সঙ্গে ভাল মানাইবে বলিয়া খুব চওড়া ঢালা জরির পাড়ের শাদা মাদ্রাজী শাড়ি এবং সেই কাপড়ের ব্লাউস পরিল। খোঁপায় পরিবার হীরা-বসান একটা বড় গোল ফুল ছিল। সেইটা খোঁপায় পরিল বলিয়া আর মাথায় কাপড় দিল না। আয়নার ভিতর চাহিয়া দেখিয়া খুশি না হইয়া সে পারিল না। অগ্নিশিখার মতই তাহাকে দেখাইতেছে। ঘড়িতে চারটা বাজিতেই সে চা ঠিক করিতে হুকুম দিয়া জুতা মোজা পরিতে আরম্ভ করিল। ঠিক সাড়ে চারটা বাজিতেই দেবকুমারের ট্যাক্সি গেটের ভিতর প্রবেশ করিল।

ক্রমশঃ

পুস্তক পরিচয়

লালকালো—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু। শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন চিত্রিত। কলিকাতা। ১৩৩৭। মূল্য দুই টাকা।

এটি কালো পিঁপড়ে ও লাল পিঁপড়েদের যুদ্ধের গল্পের বহি। বুদ্ধের মন দিয়া ইহা বিচার্য্য নহে। যে-সব শিশু পড়িতে জানে না, তাহারাও ইহার অপূর্ব্ব ছবিগুলির জন্য ইহা দখল করে। যাহারা পড়িতে জানে, তাহারা গল্প ও ছবি উভয়েরই জন্য বহিখানা ঘিরিয়া দল বাঁধিয়া পড়িতে বসিয়া যায়। ইহার ছবি, ছাপা, কাগজ, বাঁধাই—সবই মনোহর।

ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের 'অধর মুখার্জ্জি' লেক্‌চর। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় লিখিত ভূমিকা সহ। শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, অধ্যাপক, বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। ১৯৩০। ডিমাই আট পেজী ১২১+১৲ পৃষ্ঠা। কাপড়ের বাঁধাই। সোনার জলে নাম লেখা। মূল্যের উল্লেখ নাই। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট।

এই পুস্তকখানি ছোট কিন্তু অতিশয় মূল্যবান্। ইহাতে ভারতের মধ্যযুগের বহুসংখ্যক সাধকের ও তাঁহাদের উপদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। তাহা পড়িয়া এই ইচ্ছা প্রবল হয়, যে, ক্ষিতিমোহনবাবু এই বিষয়ে একটি বড় বহি লিখুন। তিনি হয়ত লিখিতেও পারেন—যদিও তিনি এখনও ক্রমাগত অনুসন্ধান করিতেছেন। কিন্তু তিনি লিখিলেও প্রকাশ করিবে কে? আমরা বলি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রকাশ করুন। এই বিশ্ববিদ্যালয় যখন এই সৎ ও মহৎ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন, তখন আরও অগ্রসর হওয়া তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—

"ভারতের একটি স্বকীয় সাধনা আছে; সেইটি তা'র অন্তরের জিনিষ। সকল প্রকার রাষ্ট্রিক দশা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে তা'র ধারা প্রবাহিত হ'য়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ধারা শাস্ত্রীয় সম্মতির তটবন্ধনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এর মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রভাব যদি থাকে তো সে অতি অল্প। বস্তুত এই সাধনা অনেকটা পরিমাণে অশাস্ত্রীয় এবং সমাজ শাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এর উৎস জনসাধারণের অন্তরতম হৃদয়ের মধ্যে, তা সহজে উৎসারিত হয়েছে, বিধিনিষেধের পাথরের বাধা ভেদ ক'রে। যাঁদের চিত্তক্ষেত্রে এই প্রস্রবণের প্রকাশ, তাঁরা প্রায় সকলেই সামান্য শ্রেণীর লোক, তাঁরা যা পেয়েছেন ও প্রকাশ ক'রেছেন তা "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"।

"ভারতের এই আন্তরিক সাধনার ধারাবাহিক রূপ যদি আমরা স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেতুম তাহলে ভারতের প্রাণবান্ ইতিহাস যে কোন্‌খানে তা আমাদের গোচর হতে পারত। তাহলে জানা যেত ভারতবর্ষ যুগে যুগে কি লক্ষ্য করে চলেছে, এবং সেই লক্ষ্য সাধনে কি পরিমাণে তা'র সিদ্ধি। সুহৃদ্বর ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘকালের সেই চিত্তপ্রবাহের পথটিকে তা'র ভিন্ন ভিন্ন শাখায় প্রশাখায় অনুসরণ করে এসেছেন। আমরা দেখতে পেয়েছি এই প্রবাহটি গভীররূপে সত্য এবং একান্তভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয়। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সাধনার যে স্বাভাবিক শক্তি অন্তর্নিহিত রয়েছে ক্ষিতিমোহনের এই রচনায় তাকে আবিষ্কার করা গেল। এই প্রকাশের অভিব্যক্তির যে ধারা অন্তর-বাহিরের বাধার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এই গ্রন্থের সীমারেখায় তার একটা রূপচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এখন তার উদ্ভাবনের, তার প্রাগ্রসর যাত্রার সম্পূর্ণ একটি ইতিহাস পাবার অপেক্ষা রয়ে গেল, না পেলে ভারতবর্ষের ধ্রুব স্বরূপটির পরিচয় ভারতবর্ষের লোকের কাছে অসম্পূর্ণ, এমন কি ভ্রমসঙ্কুল হয়ে থেকে যাবে।"

ক্ষিতিমোহনবাবু স্বয়ং তাঁহার "নিবেদনে" বলিয়াছেন:—

"যাঁহারা আলোচনা করিবেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন লিখিত সব শাস্ত্র ও গ্রন্থ অপেক্ষা এই সব নিরক্ষর সাধকদের এক একটি বাণী কত মহান্, কত গভীর। ইঁহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান বা সম্প্রদায়গত কোনো ভেদ-বুদ্ধি নাই। ইঁহারা অধিকাংশই নিরক্ষর এবং সকল সাধনার মৈত্রী ও যোগই ইঁহাদের আপন সাধনার ধন। সেই যোগ সাধনাই ভারতের সাধনা, বাহিরে ইহার যত প্রতিকূল লক্ষণই দেখা যাক না কেন।"

মহুয়া—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲; বাঁধান ২।৵০ ও ২৸০।

বিবাহ উপলক্ষ্যে উপহার দিবার নিমিত্ত, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে কতকগুলি প্রেমের কবিতা সংগ্রহ করিয়া এবং তাহার সহিত তাঁহার কতকগুলি নবরচিত ঐ শ্রেণীর কবিতা সংযুক্ত করিয়া, একখানি বহি বাহির করিবার কথা হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই কয়েকটির জায়গায় অনেকগুলি নূতন কবিতা লেখা হইয়া যায়, এবং সেই সব কবিতাই "মহুয়া" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "লেখার বিষয়টা ছিল সংকল্প করা—প্রধানতঃ প্রজাপতির উদ্দেশে—আর তাঁরই দালালী করেন যে-দেবতা তাঁকেও মনে রাখ্‌তে হ'য়েছিলো।"

ইহা প্রেমের কবিতার বহি। প্রেম বলিতে নানা জনে নানা জিনিষ বুঝে, এবং এই বহিখানির সকল কবিতাও এক রকমের নয়। কিন্তু সবগুলি কি সুরে বাঁধা, তাহার আভাস "উজ্জীবন" শীর্ষক নিম্নমুদ্রিত প্রারম্ভিক কবিতাটিতে আছে—

ভস্ম-অপমান শয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
রুদ্র-বহ্নি হ'তে লহো জ্বলদর্চ্চি তনু।
যাহা মরণীয় যাক্ ম'রে,
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্ত্তি ধ'রে।
যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব,
যাহা স্থূল, দগ্ধ হোক্, হও নিত্য নব।
মৃত্যু হ'তে জাগো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥

মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি,'
অমৃত সে-মৃত্যু হ'তে দাও তুমি আনি'।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ,
উন্মুক্ত করুক্ অগ্নি-উৎসের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক্ প্রখর,
বিচ্ছেদেরে ক'রে দিক্ দুঃসহ সুন্দর।
মৃত্যু হ'তে জাগো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥
দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে-পথ,
সে-দুর্গমে চলুক্ প্রেমের জয়রথ।
তিমির তোরণে রজনীর,
মন্দ্রিবে সে রথচক্র নির্ঘোষ গম্ভীর।
উল্লঙ্ঘিয়া তুচ্ছ লজ্জা ত্রাস,
উচ্ছলিবে আত্মহারা উদ্বেল উল্লাস।
মৃত্যু হ'তে ওঠো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥

অবলা থাকাই যে নারীর ললাটে লেখা বিধিলিপি নহে, তাহা নবযুগের নারীরা বুঝিতেছেন। কিন্তু বহু কাব্যে নারীর প্রেম মাধবীলতার সহকার তরুকে আশ্রয়ের মত বলিয়া আভাস দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইলে নবযুগের সবলারা কি প্রেমহীনা হইবেন? উত্তরের জন্য কবির "সবলা" শীর্ষক কবিতা পাঠ করুন। যথা—

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার,
হে বিধাতা?
পথপ্রান্তে কেন রবো জাগি,
ক্লান্ত ধৈর্য্য প্রত্যাশার পুরণের লাগি'
দৈবাগত দিনে?
শুধু শূন্যে চেয়ে রবো? কেন নিজে নাহি লবো চিনে
সার্থকের পথ?
কেন না ছুটাবো তেজে সন্ধানের রথ,
দুর্দ্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি' দৃঢ় বল্গা-পাশে?
দুর্জ্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হ'তে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি' পণ?
যাবো না বাসর-কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,—
আমারে প্রেমের বীর্য্যে করো অশঙ্কিনী,
বীরহস্তে বরমাল্য লবো একদিন
সে-লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে?
কভু তা'রে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তা'র,—
ফেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্ব্বল লজ্জার।
দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে;
তরঙ্গ গর্জ্জনোচ্ছ্বাস, মিলনের বিজয়ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে।
মাথার গুণ্ঠন খুলি' কবো তা'রে মর্ত্ত্যে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার।
সমুদ্র পাখীর পক্ষে সেই ক্ষণে উঠিবে হুঙ্কার
পশ্চিম পবন হানি',
সপ্তর্ষি আলোকে যবে যাবে তা'রা পন্থা অনুমানি'।
হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা
রক্তে মোর জাগে রুদ্র বীণা!
উত্তরিয়া জীবনের সর্ব্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে
সর্ব্বোত্তম বাণী যেন ঝরে জীবনের কণ্ঠ হ'তে
নিবারিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্ব্বচনীয়
তা'রে যেন চিত্ত মাঝে পায় মোর প্রিয়।
সময় ফুরায় যদি, তবে তা'র পরে
শান্ত হোক্ সে-নির্ঝর নৈঃশব্দ্যের নিস্তব্ধ সাগরে॥

র. চ.

জীবন পথে—শ্রীকামিনী রায় প্রণীত। কবি কামিনী রায়ের পরিচয় নুতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। বাংলা সাহিত্যের সহিত যাহাদের পরিচয় আছে তাহারাই তাঁহার কবিত্বের আস্বাদ বহুরূপে পাইয়াছে। আজ যাঁহারা অনেকে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের শৈশবে সাহিত্যের সহিত প্রথম পরিচয় হয় কবি কামিনী রায় মহাশয়ার "গুঞ্জন" গানের ভিতর দিয়া, এ সাক্ষ্য আমরা দিতে পারি।

আজকাল সাহিত্যক্ষেত্র হইতে ইনি দূরে সরিয়া আছেন, তাই অনেকে ইঁহাকে নামে জানিলেও ইঁহার কবিত্ব-প্রতিভার সাক্ষাৎ স্পর্শ পায় না। এই নব প্রকাশিত সনেটগুচ্ছটির অধিকাংশই যদিও ১৫।২০ বৎসর আগে রচিত তবু ইহারই সাহায্যে বাণীমন্দিরে তাঁহার স্থান নুতন পুজারীরা বুঝিতে পারিবেন। এতদিন "সাহিত্য-রসিক দুই তিনটি বন্ধুও নিতান্ত আপনার কয়েকটি আত্মীয় ভিন্ন এগুলির অস্তিত্বও বিশেষ কেহ জানেন নাই।... ... ১৯২৭ সনে বিলাত ভ্রমণ কালে শ্রীযুক্তা জেসিকা ওয়েষ্টব্রুক নাম্নী জনৈক ইংরেজ মহিলা তাঁহার কোনো বাঙ্গালী বন্ধু কর্ত্তৃক 'আলো ও ছায়া'র কবিতা অনুবাদ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া আসিয়া, এই সনেটগুলিরই অনুবাদ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।" তাঁহার অনূদিত ১১টি সনেট এদেশের একটি বিখ্যাত মাসিকপত্রে কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি কবির দাম্পত্য জীবনের মিলন বিরহ, সুখ দুঃখ ও শোকাশ্রু লইয়াই বিশেষভাবে রচিত বলিয়াই সম্ভবত তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি তাহা প্রকাশিত করিতে চান নাই। কিন্তু কবির জীবন লইয়া রচিত হইলেও কবিতাগুলি মানব-জীবনের নানা অবস্থারই ছবি, কবির নিপুণ ও সংযত তুলিকাপাতে সরস ও গভীর রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জাপানী চিত্রী তাহার চিত্রবীথি যেমন একের পর এক ঘুরাইয়া খুলিয়া খুলিয়া দেখায়, কবিও যেন তেমনি করিয়া তাঁহার জীবন-কাব্য খুলিয়া দেখাইয়াছেন। এক একটি চিত্র জাপানী চিত্রের মত আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, আবার চিত্রমালারও এক একটি মণির মত। পূর্ব্বরাগ, মিলন, বিরহ, অভিমান, সংশয়, সংগ্রাম, পুনর্ম্মিলন, শোক, সান্ত্বনা দাম্পত্য জীবনের অসংখ্য রূপ এই ক্ষুদ্র কয়টি কবিতার ভিতর হাসি ও অশ্রুর বন্যা বহাইয়াছে।

"দুটি তরী, বাঁধা পাশাপাশি,
ভেসে যাই স্বপন সাগরে,
লক্ষ্য করি অনন্ত জীবন;

নেত্র পথে উঠিতেছে ভাসি
নব তারা, নব-নভস্তরে,
অতলে ডুবায়ে পুরাতন।"

পুরাতন সকল সংগ্রামকে জয় করিয়া নারী তাহার সকল ভার সাথীর হস্তে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। "কর স্পর্শে করিও সঞ্চার নব দৃষ্টি, দীপ স্পর্শে দীপ যথা জাগে।" কারণ "বহু ভার বহে নারী, ··· ··· কেবল নিজের ভার দুর্ব্বহ তাহার।" কিন্তু এ নিশ্চিন্ত স্বপ্নসুখ টুটিয়া গেল।

"হাতে রহিয়াছে হাত, শিথিল বন্ধন,
কণ্ঠের মালতী মালা ক্ষীণগন্ধ, ম্লান,
সহসা থামিয়া গেছে অসমাপ্ত গান,
নয়নে জমিছে মেঘ, ভেঙ্গে আসে মন ;—
একি স্বপ্ন শেষ, কিবা একি দুঃস্বপন ?
জীবনের বসন্ত কি হল অবসান ?"

দৃষ্টি সংশয়ে আকুল হইয়া উঠিল কিন্তু

"তবু হাতে থাক্ হাত, চলি পাশাপাশি,
এক পথে, এক দুঃখে দুঃখী দুইজন।
আর কিছু নাই হোক্, করুণাবন্ধন
বাঁধুক দোঁহারে।"

সংশয় নারীকে হতাশায় ফেলিল না—

"কল্পনার পুরে
প্রতিষ্ঠিত যেই প্রেম, সে যে বহুদূরে
মানবের গৃহ হ'তে ; চন্দ্রমা তপন
ধরা হতে যথা দূর ; করি প্রাণপণ
যে ছোটে ধরিতে, সে তো মরে শুধু ঘুরে।

নারীই আবার শ্রান্ত সঙ্গীর সহায় হইয়া উঠিলেন ;—

————আজ শ্রান্ত তব শির
রাখ এ দুর্ব্বল স্কন্ধে ; তপ্ত অশ্রু সাথ
গলিয়া বাহির হোক্ বেদনা কঠিন ;
আজ অন্ধকার রাত্রে তব সঙ্গিনীর
দৃষ্টি হোক্ তব দৃষ্টি ; হাতে দিয়া হাত
চল ধীরে, দেখা দিবে কাল শুভদিন।

তারপর সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল ; মৃত্যুর দূত আসিয়া সহযাত্রীকে হরণ করিয়া লইল. দীর্ঘদিনের মিলিত জীবনের গগনে—

"কত রৌদ্র, কত মেঘ, বজ্র বরিষণ
কত বিদ্যুতের হাস, চন্দ্রালোক কত."

দেখা দিয়াছিল তাহার প্রতিচিত্র পিছনে ফেলিয়া সাথী বিদায় লইলেন। বিচ্ছেদের আগুনে পুড়িয়া প্রেমের মূর্ত্তি শুদ্ধ হইয়া দেখা দিল, অভিমান সংশয় সংগ্রামের ধূলির চিহ্নমাত্র নাই।

"আজ-অশ্রু-আবরিত ক্ষীণ দৃষ্টি লয়ে
নিয়োজিয়া ভগ্ন তনু ব্রত তপস্যায়,
সেই সুদিনের তরে চেয়ে আছি পথ,
মোর দীর্ঘ তপস্যায় করুণার্দ্র হয়ে
দেবতা করুন পূর্ণ এই মনোরথ
লোকান্তরে হই তব সখী যোগ্যতরা।"

সমস্ত বইখানি না তুলিয়া দেখাইতে পারিলে ইহার ঠিক মূল্য নিরূপণ করা যায় না। জানি না আংশিকভাবে দেখাইয়া সুবিচার সনেটগুচ্ছটির সৌরভে আকৃষ্ট হন তাহা হইলে এ সামান্য চেষ্টা সার্থক হইবে।

কবির পূর্ব্বতন রচনার তুলনায় এই কবিতাগুলির সংযম ও গভীরতা বেশী, বাঁধন দৃঢ়তর এবং তুলিকাপাত সুমার্জ্জিত বলিয়া মনে হয়। কবিতাগুলিতে অন্য কবির রচনা-ভঙ্গীর ছায়া বিশেষ নাই।

শ্রীশান্তা দেবী

শতনরী—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত এবং ২০৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বাগচী এণ্ড সন্স হইতে শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—সাধারণ সংস্করণ আড়াই টাকা, রাজসংস্করণ তিন টাকা।

'শতনরী' করুণানিধানের কাব্য-চয়নিকা। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া যাঁহারা গত বিশ বৎসরের মধ্যে কবি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, করুণানিধান তাঁহাদের অন্যতম। করুণানিধান সত্যকারের কবি। কাব্য রূপের দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব হয় ত ধরা পড়ে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবির প্রভাব একান্তভাবে অনুভব করিয়াও প্রকৃত কবিতা রচনা করা ক্ষমতার কাজ। সেই ক্ষমতা আছে বলিয়াই রসসৃষ্টি হিসাবে করুণানিধানের কবিতাগুলি সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

"সিমন্তিনীর শিবিকা দুয়ারে
চোখে জলভার, ঘিরিল তোমারে
তোরণ-মঞ্চে অদূরে শানাই
ধরিল তোড়ী।"

—সুন্দর !

প্রসাদী, ঝরাফুল, শান্তিজল, ধান-দূর্ব্বা প্রভৃতি কাব্য হইতে সকল ভাল কবিতাই এই চয়ন-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার প্রেমের কবিতাগুলি ভাল, কিন্তু তাঁহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কবিতাগুলি অনুপম।

"স্বপন দেখিছে ভূর্জ্জবনানী সবুজ টোপর পরি
ঝর্ণাতলায় ঝরিছে কাহার রতনের শতনরী।"

চমৎকার !

করুণানিধান নিপুণ শব্দশিল্পী। এই শব্দসঙ্গীত তাঁহার সকল কবিতার মধ্যেই বিচিত্র ঝঙ্কারে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যামোদী-মাত্রেই শতনরী পাঠে আনন্দ উপভোগ করিবেন।

আজ এবং আগামী কাল—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত এবং ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হইতে এম-সি-সরকার এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

একখানি প্রবন্ধ-পুস্তক। অধিকাংশ প্রবন্ধই সাময়িক বাদবিসংবাদ-প্রসূত। 'সাহিত্য' ও 'সমাজ'—এই দুই ভাগে বইখানি বিভক্ত। রাসিয়ার নব সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব গভীর নয়। কাজেই আমাদের দেশে যখন এই অপরিচিত বিষয়টি লইয়া আলোচনা চলে, তখন উভয় পক্ষের তর্কই কতকটা ভাসাভাসা রকমের থাকিয়া যায়। তৎসত্ত্বেও লেখকের সহানুভূতি আছে বলিয়া সামাজিক প্রবন্ধগুলি অনেকটা উপভোগ্য হইয়াছে। সাহিত্য-সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে করি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ধর্ম্ম নামক যে রচনাটি মাসিক ও সাময়িক পত্রগুলিতে কিছুদিন ধরিয়া বিক্ষোভের সৃষ্টি

বিতর্কের মধ্য দিয়া যদি কোন সত্যে উপনীত হইতে পারি ত সে তর্কে আপত্তি নাই। প্রবন্ধগুলিতে সে চেষ্টা লক্ষিত হয় না। শুধু বিতণ্ডা-মূলক বলিয়াই নয়, সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট ধারণাই ইহাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই। কথার কেরামতি দিয়া সেই অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। 'বীরবলে'র অননুকরণীয় ভঙ্গী অনুসরণ না করিতে যাওয়াই ভাল। বহিরঙ্গের সৌষ্ঠবে বইখানি সত্যই সুন্দর হইয়াছে।

রাখালী—জসিম উদ্দীন প্রণীত ও ৩৫ দেওয়ান বাজার, ঢাকা হইতে আবদুল মজিদ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

কবিতার বই। নানারূপ ছন্দের কারচুপি ও লেখার কায়দায় মন যখন শ্রান্ত হইয়া পড়ে তখন এই রকম সহজ সরল গ্রাম্য কবিতা সত্যই ভাল লাগে। পল্লীগীতি-হিসাবে 'রাখালী'র কবিতাগুলিতে বৈশিষ্ট্য আছে। মেয়েলি গানের সুরে 'সিঁদুরের বেসাতি,' বারমাসির সুরে 'বৈদেশী বন্ধু' অথবা বন্ধের গানের সুরে 'সুজন বন্ধুরে', বাংলা ছড়া ও পল্লীগাথার সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য কবিতাগুলিও গ্রাম্যজীবন লইয়া রচিত। প্রথম কবিতা 'রাখালী'।

"এই গাঁয়েতে একটি মেয়ে চুলগুলি তার কালো কালো
মাঝে সোনার মুখটি হাসে আঁধারেতে চাঁদের আলো।
* * *
মুখখানি তার কাঁচা কাঁচা, না সে সোনার না সে আবীর
না সে করুণ সাঁঝের গাঙে আধ-আলো রঙীন রবির।"

—এ ছবি সকলেই উপভোগ করিবে।

সব কবিতা এইরূপ উপভোগ্য হইয়া না উঠিলেও বইখানি পড়িয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শ্রীমতী—শ্রীজগদীশ গুপ্ত প্রণীত ও ২০৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী কর্তৃক প্রকাশিত, ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ১৮২ পৃষ্ঠা। কাপড়ের মলাট— দাম দেড় টাকা।

জগদীশবাবু ছোটগল্প লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁর নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। "শ্রীমতী" তাঁর লেখা সাতটি গল্প লইয়া দেখা দিয়াছে। এগুলি ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ছাপা হইয়াছিল। লেখকের গল্প বলার ভঙ্গীতে বৈশিষ্ট্য আছে—ভাষাও শিষ্ট ও মার্জ্জিত। সব লেখা উঁচুদরের না হইলেও, প্রায়ই সুখপাঠ্য। আলোচ্য গল্পগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর রচনা নাই—ইহার চেয়ে ঢের ভালো গল্প তিনি লিখিয়াছেন। সে যাই হোক, 'আহুতি', 'ঘেন্নার কথা', 'অবাক্ জোৎস্না' ভালো লাগিল। 'কার্য্যকারণ' গল্পের humour খুব উপভোগ করিয়াছি।

বইখানিতে ছাপার ভুল বেশী চোখে পড়িল না, কিন্তু চন্দ্রবিন্দুকে এমন নির্ম্মমভাবে কে নির্ব্বাসনে দিল? স্বস্থানে বার-বার তার দেখা না পাইয়া পড়িবার সময় মন তিতিবিরক্ত হইয়া ওঠে।

স, ব

ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জে হিন্দুর দুর্গতি— (প্রথম খণ্ড) নরহত্যা, গৃহদাহ, লুণ্ঠন প্রভৃতি অত্যাচারের বিস্তৃত বিবরণ। হিন্দুমিশন কর্তৃক সংগৃহীত। মূল্য দুই আনা।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও তাহার প্রতিকার—ঢাকা হিন্দুমিশন হইতে গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই পয়সা।

এই পুস্তিকা দুইখানিতে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় মুসলমান উপদ্রবের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে ও তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই পুস্তকগুলিতে যে সকল বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার সমর্থক বহু জবানবন্দী হিন্দুমিশনের নিকট আছে। সুতরাং ইহাদের সাময়িক মূল্য ছাড়া ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। পুস্তক দুইখানি ১৯ নং ভরতচন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা (বাংলা বাজার) এই ঠিকানায় হিন্দুমিশনের সভাপতি—শ্রীযুক্ত স্বামী সত্যানন্দের নিকট হইতে প্রাপ্তব্য।

ন.

শব্দতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

শুনেছি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি রায়বাহাদুরের পরম উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা শব্দকোষ প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গেছে; তিনি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করবার জন্য বহুকাল থেকে একজন প্রকাশক খুঁজ্‌ছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত একজন প্রকাশকও উদ্‌যোগী হয়ে অমন মহামূল্যবান পুস্তক প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন নি। যিনি এই সৎকর্ম্মে অগ্রসর হবেন, তিনি বঙ্গবাসীর ও বঙ্গভাষীর পরম বন্ধুর কাজ কর্‌বেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের বাঙ্গলা ভাষার অভিধানেরও দ্বিতীয় সংস্করণ করা শীঘ্রই আবশ্যক হবে; তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষীদের কাছে শব্দ-সাহায্য প্রার্থনা ক'রেছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কোনো ব্যক্তি এদিকে দৃক্‌পাত করেন নি। অধ্যাপক মারে সাহেব যখন নিউ অক্‌স্‌ফর্ড্ ডিক্‌শনারী সঙ্কলন কর্‌বার জন্য ইংরেজীভাষী লোকদের কাছে শব্দ-সাহায্য প্রার্থনা ক'রেছিলেন তখন ইংলণ্ড্ স্কট্‌ল্যাণ্ড্ আয়ার্ল্যাণ্ড্ ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ও য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ থেকেও লক্ষাধিক লোক তাঁকে শব্দ ও শব্দের ইতিহাস ও প্রয়োগ সংগ্রহ ক'রে দিয়েছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় দু-একজনকে ছাড়া আর কোনো লোককে এই কর্ম্মে ব্রতী দেখ্‌তে পাই না। প্রবাসীর বেতালের বৈঠকে মধ্যে মধ্যে দু-চারটা শব্দের সন্ধান দেওয়া হয়েছে।

গত বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত অমিয়ময় দাস মহাশয় "বঙ্গভাষার সহিত পালিভাষার সংমিশ্রণ" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন।

বোলপুর বিশ্বভারতীর সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ একখানি বিরাট্ বাঙ্গলা অভিধান সঙ্কলনে নিযুক্ত আছেন; তিনি নিরন্তর পরিশ্রমের সহিত অনন্যকর্ম্মা ও তদ্গতচিত্ত হ'য়ে শব্দ প্রয়োগ ইতিহাস সংগ্রহ করছেন দেখেছি ও শুনেছি। তাঁরও ঐ মহতী কীর্ত্তি প্রকাশিত হবে শুনছিলাম।

এখন যিনিই অভিধান প্রকাশ করবেন তাঁকে প্রত্যেক শব্দের নিরুক্ত ইতিহাস ও প্রাচীনতম প্রয়োগ দিতে হবে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাসের অভিধান প্রাচীনতর প্রকৃতিবাদ অভিধান অবলম্বনে গঠিত হ'লেও তিনি প্রকৃতিবাদে প্রদত্ত সংস্কৃত শব্দের নিরুক্তগুলি ত্যাগ ক'রেছেন। অনেক শব্দ কেবল হিন্দী ইত্যাদি ব'লে ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু হিন্দী প্রভৃতি ভাষাতেই বা ঐ শব্দ কোথা থেকে এল' তার সন্ধান করেন নি।

যোগেশ-বাবুর শব্দকোষে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দেবার কিছু কিছু চেষ্টা আছে। কিন্তু তাঁর সংস্কৃত-পক্ষপাত তাঁকে অনেক জায়গায় তথ্যনির্ণয়ে বাধা দিয়েছে।

এখন যিনিই অভিধান প্রকাশ করবেন তাঁকে বর্ত্তমান সমস্ত অভিধান বিচার ক'রে সকল অভিধানের উৎকৃষ্ট গুণ ও বিশেষত্বটি আত্মসাৎ করতে হবে এবং সর্ব্বোপরি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধীয় অপূর্ব্ব পুস্তকের শরণাপন্ন হতে হবে পদে পদে।

এখন যদি কেউ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা করতে চায়, তবে তাকে নিম্নলিখিত বইগুলি হাতের কাছে রাখতে হয়—(১) বাঙ্গলা শব্দকোষ, (২) বাঙ্গলা ভাষার অভিধান (৩) প্রকৃতিবাদ অভিধান, (৪) সুবল মিত্রের অভিধান, (৫) সুনীতি-বাবুর বই এবং সম্ভব হ'লে (৬) শব্দকল্পদ্রুম ও (৭) বিশ্বকোষ। ভবিষ্যৎ অভিধানকারদের কর্ত্তব্য হবে এই বোঝা হাল্কা করা; সকল অভিধানের বিশেষত্ব দ্বারা নিজের অভিধানকে ভূষিত করা।

রামচন্দ্রের সেতুবন্ধের সময় কাঠবিড়ালীর সাহায্যও তিনি সমাদর ক'রে গ্রহণ ক'রেছিলেন। আমি শব্দসমুদ্র থেকে রত্ন আহরণ করতে অক্ষম; কিছু বালি আর কিছু শুক্তি সংগ্রহ ক'রে উপস্থিত করছি; যদি কারো কিছু কাজে লাগে কৃতার্থ হব। আমার চণ্ডীমঙ্গলবোধিনী নামক দুইখণ্ড পুস্তকে ও আমার সম্পাদিত শূন্যপুরাণের টীকায় ভবিষ্যৎ অভিধানকার এইরূপ কিছু উপকরণ সংগৃহীত পাবেন; তারও কিছু গ্রাহ্য হ'লে ধন্য হব। আমি আজ যে-সব শব্দ উপস্থিত করব তার কিছু কিছু হয়ত কোনো-না-কোনো অভিধানে বা সুনীতি-বাবুর শব্দভাণ্ডারে সংগৃহীত ও যাচাই হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি শব্দ প্রত্যেক গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারিনি; যথাসম্ভব পুনরুক্তি পরিহার করতে চেষ্টা করেছি; তবু পুনরুক্তি থাকবে; সেগুলি মার্জ্জনীয় হবে আশা করি। আজ আমি যা উপস্থিত করছি, এর মধ্যে আমার নিজস্ব কিছু নেই; আমি নানা স্থান থেকে মাধুকরী ক'রে এগুলিকে একত্র সহজপ্রাপ্য ক'রে দিচ্ছি মাত্র। আমি প্রধানতঃ যোগেশ-বাবুর শব্দকোষ সামনে রেখেই অভাব পূরণের চেষ্টা করছি।

[সঙ্কেত ব্যাখ্যা—সং=সংস্কৃত; প্রাং=প্রাকৃত; পাং=পালি; ফাং=ফার্সী প্রা পার=প্রাচীন পারসীক; নূ-ফাং=নূতন ফার্সী; সর্ব্বানন্দ=সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্ব।]

অগ্রিম—অগ্র+তম > অগ্র+ম > অগ্রিম (অনুনাসিক বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী অ-আ স্থানে এ অথবা ই হয়।—পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর নিয়ম সন্ধ্যাক্ষরতত্ত্ব ও ১৩২১ সালের প্রবাসীতে "ব্যাকরণ বিভীষিকা" সমালোচনা দ্রষ্টব্য)।

অঙ্গুস্তানা—সং অঙ্গুষ্ঠত্রাণ > ফাং অঙ্গুস্তানা। সং অঙ্গুষ্ঠ > আবেস্তা বা প্রাচীন-পারসীক অঙ্গুশ্ত > পহ্লবী বা মধ্য-পারসীক অঙ্গুস্ত্ > নূতন-ফারসী অঙ্গুষ্ত্। ফাং অঙ্গুষ্ত্+আনা (< সং—পান=রক্ষণ)।

অথর্ব্ব—সং অথর্ন্ > প্রা-পার আথর্ন > নূ-ফাং অতুরবান (আতর্=অগ্নি+ √ রন+সেবা করা, স্তব করা,=অগ্নিপূজক, যাজ্ঞিক।

অধর—অধঃ+তর > অধ+র।

অধম—অধঃ+তম > অধ+ম। (এখানে কিন্তু অগ্রিম শব্দানুযায়ী অধিম হয়নি)।

অন্তর—(সং)=শেষ, দূর। প্রঃ—দারুণ বরিখা, জিউ ভেল অন্তর। —বিদ্যাপতি।

অন্তিম—অন্ত+তম > অন্ত+ম > অন্তিম (অগ্রিম শব্দ দেখুন)।

অন্দর—সং অন্তঃপুর > * অন্তেউর > প্রাং অন্দেউর (শকুন্তলা)। প্রা-পার অঁতরে, Lat. inter, Gk. entos, ফারসী অন্দর্।

অপরূপ—সং অপূর্ব্ব > প্রাং অপূরব (বিক্রমোর্ব্বশী); অপুরুব (বিদ্যাপতি); সং অপরূপ।

অম্বল—সং অম্ল > * অম্ল > পালি-প্রাকৃত অম্বিল (অম্ল শব্দে ইকার যোগ সুখোচ্চারণের জন্য—anaptyxis) > অম্বল।

অসার—(সং) উচ্চারণে ওসাড়=বিস্তার। সং উপসার > প্রাঃ ওসার (ওসারিঅ পাণ্ডুপত্তা……লদাঅো,—শকুন্তলা)। মালদহে ওসরা=দালান, রক, পিঁড়া বা বারান্দা—সং অবসরক > পালি ওসরক। সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্বে—বস্ত্রবিষয়ে অরম্ ওরাল ইতি খ্যাতে।—কাপড়ের ওসার বা প্রস্থ?

অসুর—অসু (প্রাণ) + র (অস্ত্যর্থে) = প্রাণবান্, প্রাণশক্তিতে বীর্য্যবান্। অ (না) + সু (উত্তম) + র = অনুত্তম, মন্দ।—যাস্ক।

আই—সং অত্তা (মাতা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী) > প্রাং আতা, আআ > আই। তুলনীয়—মাতা > মাঈ; ভ্রাতা > ভাই।

অত্তা শব্দটি মূলে দ্রবিড়, সংস্কৃতে ধার নেওয়া।—অধ্যাপক গুণে ও অধ্যাপক এম কলিন্স্।

আইন—ফাং আয়ীন < পহ্লবী আঈন, আঈনহ্ (=বিধি, প্রকার, রীতি) < সং অয়ন=পথ। পহ্লবী আঈনহ্=ফাং আয়না= সং আদর্শ বা আরসী।

আউল—সং আকুল > আউল। অথবা আরবী আউলিয়া= পীর, সাধু।

আওয়াজ—সং আতোদ্য > প্রাং আওজ্জ > আওয়াজ। অথবা আবাদ্য > আওয়াজ।

আঁকাড়—সং আকর্ষণ > পালি আকড্ঢণ > আঁকাড় ধাতু।

আকাল—তামিল-তেলেগু আকাল=ক্ষুধা; গোন্দ ভাষায় আকাল=দুর্ভিক্ষ। সং অকাল থেকে আকাল, না দ্রবিড় শব্দ?

আকাল ধাতু=(কেশ) আকুলায়িত বা আলুলায়িত করা। প্রঃ—আকাইলেক কেশ তোর সুচিত্রক মাঝা। —শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

আখর, আঁখর—সং অক্ষর > প্রাং অক্খর > আখর, আঁখর (যুক্ত বর্ণের একতমের লোপে পূর্ব্ব স্বর অনুনাসিক হয়)।

আগা—অগ্র > প্রাং অগ্গ > আগা।

আগুন—সং অগ্নি > প্রাং অগ্‌গী, পালি গনি > বাং আগুনি, আগুন। অগ্নি > প্রাং অগ্‌গি > সিন্ধী অগ্‌গ্, হিং আগ। বিধুশেখর শাস্ত্রী বল্‌তে চান—সং অগ্রণী > প্রাং অগ্‌গণী > সং অগ্নি।

আংঠি—সং অঙ্গুষ্ঠিকা। সং অঙ্গুষ্ঠ > প্রাং অংগুঠ্‌ঠ > মরাঠী আংগঠা, গুজরাটী অংগুঠো, হিন্দী অংগুঠা, পঞ্জাবী অংগূঠ, সিন্ধী আঙ্‌ঠো। (অঙ্গুস্তানা দ্রষ্টব্য)।

অঙ্গুলি—ঋগ্বেদে অঙ্গুলি নেই; অঙ্গুরি শব্দ আছে, অর্থ অঙ্গুলি। পরে অঙ্গুরি শব্দের অর্থান্তরপ্রাপ্তি হয়েছে = অঙ্গুলি বলয়।

আচার—ফাং এবং পর্ত্তুগীজ achar = চাটুনি।

আঞ্জুমান—ফাং অঞ্জুমন্ (= সভা, সমিতি) < আবেস্তায় হঞ্জমন < সং সংযমন, সংগমন (তুলনীয়—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং।—ঋগ্বেদ শেষ সূক্ত)।

আঁট—সং আর্ত্ত > প্রাং অট্টতি = মোচড় দেয়, পাক দেয়।

আটা—সং অট্ট, গ্রীক ateo = খাদ্য।

আটাশ—সং অষ্টাবিংশ > পালি অট্‌ঠবীস।

আঁঠু, হাঁটু—সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্বে অণ্ড্। হিন্দী ঠিহুন। বঙ্কিমচন্দ্র আঁটু মাতা (মাথা) লিখে গেছেন।

আড়—(১) সং অর্দ্ধ > প্রাং অড্‌ঢ, অড়্‌ঢো। (২) (√ অড্‌ড = নির্ব্বাহ, অভিযোগ; √অড়্ = ব্যাপন—তা থেকে আড় = অন্তরাল ?)

আতস—ফাং আতিষ্ < প্রাং-পার আতরুশ্। বৈদিক হুতাশ, হুতাশন।

আতা—ফল-বিশেষ। পর্ত্তু আতা। কানিংহামের মতে আতা দেশী ফল—সং আতৃপ্য; হব্‌সন্-জবসনের মতে বিদেশী, পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক ভারতে আনীত।*

আঁতুড়—অন্তঃকুটি > অন্তউড়ি > ওড়িয়া অন্তুড়ি (সুনীতি-বাবু)। কবিকঙ্কণে আঁতুড়ি। সংস্কৃত পদ্মপুরাণে আত্রেয়ী = সূতিকাগার।

আতুর—রোগী। সং √ তূ (তর) = আক্রমণ, পরিভব।

আদা—সং আর্দ্র ক। বৈদিক আদার (শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার) প্রাং অদ্দঅ, অল্লঅ < সং আর্দ্রক থেকে। হিন্দী আদরক।

আঁধার—সং অন্ধকার > প্রাং অন্ধআর, অংধার > হিন্দী মরাঠী অংধের। আন্ধারিয়া—সং অন্ধকারিত > * অন্ধআরিঅ > প্রাং অন্ধারিঅ।

আনচান—হিন্দী আনধান, যশোরে আনথানা।

আনা—সং আনক > প্রাং আনঅ = টাকার ষোল ভাগের এক ভাগ।

আনাড়ী—সং অজ্ঞানী > প্রাং অন্নানী (কুমারপালচরিত ৩।৩৭)।

আনারস—১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিল থেকে পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে প্রথম আনীত হয়। (শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, পুরাতন কাহিনী)

আন্দাজ—ফারসী শব্দ। নূতন ফারসী অন্-দাখ্-তন্ > অন্দাজ (= নিক্ষেপ। < প্রা-পার হম্ + √তচ্ < সং সং + ত্যজ্। বৈদিক ত্যজঃ = আক্রমণ।

আপস, আপোষ—সং আত্মনঃ > * আত্তস্ত > প্রাং আপস্ স > হিং আপস-মেঁ = ওড়িয়া আপস -রে।

* অজন্টাগুহা চিত্রাবলীতে আতার ছবি আছে বলিয়া ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে গ্রিফিথসের তদ্বিষয়ক বহিতে দেখিয়াছিলাম মনে হইতেছে। তাহা ঠিক্ হইলে আতা দেশী ফল।—প্রবাসীর সম্পাদক

আপসা—সং আস্ফালন। প্রয়োগ—বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য—

কিলাইতে কিলাইতে হাত হাপ্‌সাইল'।
চিতর করিয়া ফেলাইয়া যমক নেদাবার লাগিল'॥
—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

আফ্‌গান—ফারসী অফ্-ঘান্ (সাহায্য-প্রার্থনা) < প্রাঃ-পার অবিয়-গান (চীৎকার করা) < সং অভি-গান। ফাং আফ্‌গান = শোকার্ত্ত বিলাপ।

আব—সং অভ্র > পালি-প্রাং অব্ভ > আব।

আবলুস—মূলে গ্রীক শব্দ; আরব কর্ত্তৃক পারস্যে আনীত; ফাং আবনুস।

আবার—সং অপর > প্রাং অবর > হিন্দী ওড়িয়া আবর (আউর)।

আম—সং অম্ল > সং অম্র, আম্র > পালি-প্রাকৃতে আম্ব > আম, আঁব।

আমড়া—অম্ল > অম্র, আম্র। সং আম্রাতক > প্রাকৃত অম্বার ও অপভ্রংশ-প্রাকৃত অম্বাড়উ। সর্ব্বানন্দ অম্বাড়, মরাঠী, হিন্দী অম্বাড়া, কৃষ্ণকীর্ত্তনে আম্বড়া।

আমদানী—সং আগমন > * আগমন্, * আঅমন > ফারসী আমদন (ফারসী ধাতুর অন্তে দন্ বা তন্ থাকে)—আ (অভিমুখে) + মদন (গমন)।

আমরুত—হিন্দী। পেয়ারা। প্রাচীন-পারসীক আমৃদ্দ > সং অমৃত (ফল)।

আমলা—সং আমলক > প্রাং আমলঅ, অপভ্রংশ আবেলউ।

আমেজ—নূতন-ফারসী আমীজ = মিশ্রণ—আ-মিখ্-তন্ = মিশ্রিত করা। প্রা-পার আ + √মিশ্ = সং আ + √মিশ্র্।

আয়া—সং আর্য্যা।

আয়ান—সং অভিমন্যু > প্রাং অহিমন্নু > আইহন (শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন)।

আর—অপর > অবর > আর। ওড়িয়া আবর; অসমীয় ও মেদিনীপুরে আউর; পঞ্জাবী অর; হেমচন্দ্রকোষে আরু। ওড়িয়া আরু।

আরজ, আর্‌জি—ফারসী অর্‌জ (ع) < পহ্লবী অরুজ, অরেজ < আবেস্তা অরেজহ্ < সং অর্হ, অর্ঘ = মূল্য, শাসন।

আরতি—সং আর্ত্তি (= অভিলাষ) < আ + রতি = অনুরাগ।

আরা, আড়া—করাত। সং আরা, ফাং অরহ্।

আরাম সং আরাম, প্রা-পার রামন, ফাং আরাম = উদ্যান, বিশ্রাম, আনন্দ।

আরুড়ী, আড়ুলী—সর্ব্বানন্দে অরড় = প্রপাত। নদীর উচ্চ তট, ভাঙন-ধরা খাড়া তটভূমি।

আল, আলটী—ছল। বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ৩৬ পৃষ্ঠা।

ঔষধ করিবার আলে জন জন পালায়।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।
আলটী করিল' বেনে তথির কারণে।—কবিকঙ্কণচণ্ডী, বঙ্গবাসী-১৮০।২।

আলাদ—সং অলগর্দ্দ > সর্ব্বানন্দ অলাধ = জলকেয়ুটিয়া (ভরত)।

আলি, আলী—তামিল আলী = নারী।

আলু—গোল আলু ও লাল আলু ব্রেজিল থেকে পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক বঙ্গে আনীত হয়।

আলপিন—পর্ত্তু alfinete.

আল্লা—মূলে ক্যাল্ডীয় আলহা = পরমেশ্বর, আলহি = ঐশ্বরিক।

আসা—পচা। প্রঃ—তিল আসা, জলে পাট আসা।

আসান—ফারসী ও পহ্লবী আসান < জেন্দ আ+শ্পেন < সং আ+স্বন্=সহজে।

আসোয়ার, সোয়ার—I E ekwos+ * √ bher. bhr, bher, bhor ⊳ Indo-Iranian (c. 1800 B. C.) as was + √ bhar, bhr. bhar ⊳ (1) Indo-Aryan Vedic অশ্ব + √ভৃ (সংস্কৃত বা প্রাকৃতে এই দুইয়ের সম্মিলিত পদ কখনো ব্যবহৃত হয় নি); (2) আবেস্তা অস্প অস্পো; ইরাণী প্রা-পার অস+ √ বরী, বার ⊳ অস-বার্-ই (c. 500 B. C.) (found in OP Cuneiform inscription ; এই শব্দ প্রাচীন পারসীকদের পঞ্জাব দখলের সঙ্গে সঙ্গে (৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) ভারতে আসে। সাঁচীতে প্রাকৃত ভাষায় ব্রাহ্মী-লেখে অসবারি রূপে পাওয়া যায়। > মধ্য-পার বা পহ্লবী * অস্‌বার ⊳ ফাং আসবার, সবার।

আস্‌মান—ফারসী আস্‌মান ⊲ প্রা-পারসীক অস্‌মানম্ [দরিয়াবুস (ডেরায়াস) ও ক্ষয়ার্ষ (জেরাক্‌সেস্) কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ পার্সিপোলিস-শিলালেখে] ⊲ আবেস্তা অশ্মম্=আকাশ। সং অশ্মন্=প্রস্তর। প্রথমে লোকে মনে করত আকাশটা পাথরে তৈরী। তুলনীয় ঋগ্বেদে পর্ব্বত=মেঘ। তাই থেকে পুরাণে পর্ব্বতের পাখায় ভর ক'রে ওড়ার কাহিনী রচিত হয়েছিল।

আহিড়ী—সং আখেট ⊳ প্রাং আহেড় > হিন্দী অহের, কবিকঙ্কণে আহুড়ি=ব্যাধ, শিকারী।

আম্হি—সং অস্মাভিঃ ⊳ প্রাং অম্‌হহি। সং অস্মদ্ ⊳ পালি অম্‌হ। বৈদিক অস্মে (বয়ম্) > পালি-প্রাকৃত অম্‌হে > প্রাচীন বাঙ্‌লা আহ্মে, অহ্মে, আহ্মি। সং অস্মান্ > প্রাচীন-পারসীক অহ্‌ম; সং অস্মাকম ⊳ প্রাং-পার অহ্‌মাকম্।

অষ্ট—সংস্কৃত অষ্টন্ শব্দ দ্বিবচনে প্রয়োগ হয়—অষ্টৌ। কেন? আদিম সমাজের লোকেরা গণ্ডা গণনা করত ৪ অথবা ৫ দিয়ে; গোরু-ছাগল প্রভৃতি পশুর ৪ পা আর মানুষের হাতে ৫ আঙুল ছিল তাদের গণনার এক এক থোক সংখ্যা। তার ফলে চতুর্দ্দিক, চার বেদ, চার ঋতু, ইত্যাদি। চতুর্ (৪) ছিল একটা unit বা standard সংখ্যা, এক অষ্ট (অষ্ট=√অশ্ ধাতু=ব্যাপন, রাশি করা; অষ্ট=প্রাপ্ত)। অতএব দুই অষ্ট (৪+৪) অষ্টৌ—দ্বিবচন।

আশি, আশী—সং অশীতি > প্রাং আসীঈ।

(ক্রমশঃ)

হিমাদ্রি

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

হে হিমাদ্রি, তুমি চির অগম্য বেদের!
ভারতের শিরোদেশে তুমি নিত্যকাল
মূর্ত্ত সমস্যার মত; কতনা যুগের
সহস্র মনস্বী যত চিন্তাক্লিষ্ট ভাল
বসেছে তোমার পায়ে। একদিন শেষে
না লভি উত্তর কোনো তব রহস্যের
নত মাথে চলি গেছে উত্তরের দেশে
উত্তরি' উত্তুঙ্গ গিরি।
ওগো হিমাচল,
আমি তোমা বুঝিয়াছি—লভিয়াছি তল
ধ্যান সরোবর নীরে; তারি নয়নের
অলৌকিক আলোকের অপূর্ব্ব আভায়
রহস্য-নিভৃত তব কান্তি শোভা পায়।
সত্যের শুভ্রতা পরে প্রেমের আলোকে
সৌন্দর্য্যের শতদল ফুটিল দ্যুলোকে॥

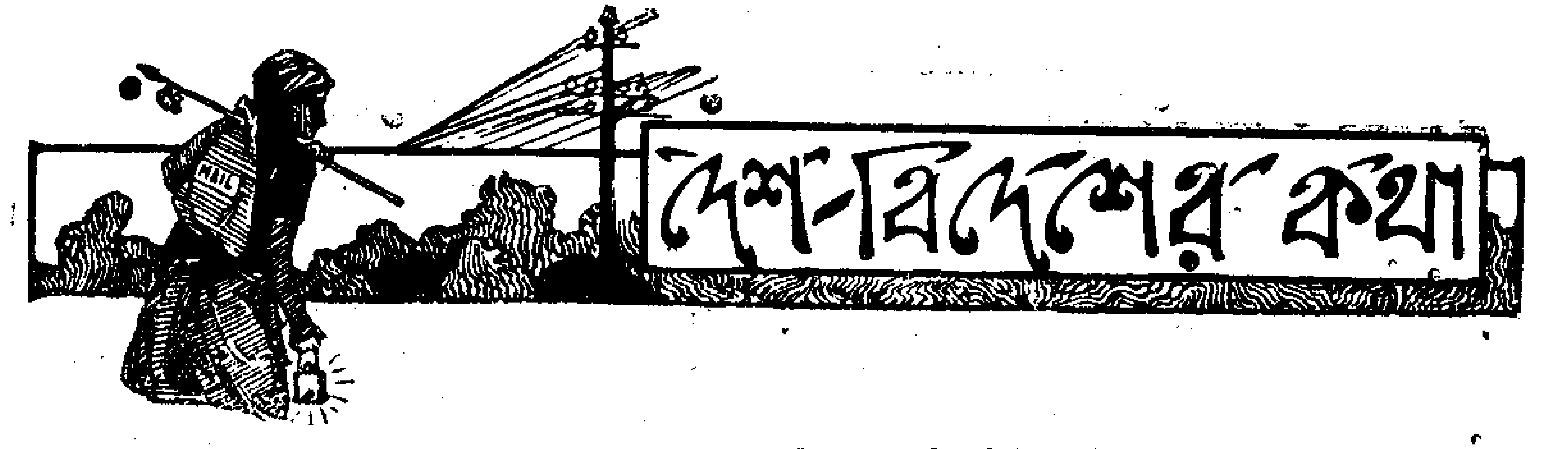

দেশ-বিদেশের কথা

ভারতবর্ষ

কাশী ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের পঞ্চম অধিবেশন—

বিগত ৭ই ভাদ্র রবিবার কাশী ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন সমারোহপূর্ব্বক সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কাশীর বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ অধিকারী এম-এ মহাশয়ের সুযোগ্যা পত্নী শ্রীমতী সরযূবালা দেবীকে সভানেত্রীরূপে মনোনীত করা হয়। শ্রীমতী মানময়ী দেবীর সংস্কৃত বন্দনার পর শ্রীমতী ছায়ারাণী সান্যাল ও কুমারী সুকৃতি সান্যালের সুললিত সঙ্গীত হইলে, সভানেত্রী ও শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সম্ভাষণ, সম্পাদিকা শ্রীমতী স্নেহলতা চৌধুরী প্রবন্ধ এবং স্ত্রীমহামণ্ডলের বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন। তাহার পর কুমারী অনুরূপা দেবীর মধুর সঙ্গীত হয়। অতঃপর দুইটি ছোট বালিকা "দেশের মেয়ে" কবিতাটি আবৃত্তি করে। তারপর শ্রীমতী নির্ম্মলা সান্যালের নারীশিল্প ও তাহাদিগের স্বাবলম্বী হওয়া সম্বন্ধে, শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর মানুষের তর্কবাদের ফলাফল এবং অমলা দেবীর বর্ত্তমানে দেশের অবস্থায় নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলে পর শ্রীমতী মানময়ী দেবী হরিকীর্ত্তন করেন। অতঃপর সিন্দুর চন্দন এবং তাম্বুলাদি দ্বারা সমবেত মহিলাগণের সম্বর্দ্ধনা অন্তে সভাভঙ্গ হয়।

দিল্লীর অন্যতম আদি প্রবাসী বাঙ্গালী স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র বসু—

আমরা শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোমের নিকট হইতে দিল্লীর অন্যতম প্রবাসী বাঙ্গালী খ্যাতনামা স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র বসুর নিম্নোদ্ধৃত জীবন-কাহিনীটি পাইয়াছি।

দিল্লীর আদি প্রবাসী-বাঙ্গালীদের অন্যতম অক্ষয়চন্দ্র বসু মহাশয় গত ১লা ভাদ্র সোমবার ৬৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বসু মহাশয় কৃতী পুরুষ ছিলেন। একজন উচ্চশ্রেণীর য়্যাড্‌ভোকেট বলিয়া এ অঞ্চলে তাঁর খুব সুনাম ছিল। কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি আর অনেক বড় ছিলেন। তিনি আজীবন সত্যাশ্রয়ী ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। এ জন্য এদেশের লোক তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। বসু মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষেরাই ছিলেন দিল্লীর আদি প্রবাসী বাঙ্গালী। ইঁহাদের আদি নিবাস চন্দননগর। ইঁহাদের দিল্লী-উপনিবেশের কাহিনী সংক্ষেপতঃ এই।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বসু মহাশয়ের পিতামহ স্বর্গীয় চুণীলাল বসু মহাশয় যতদুর শোনা গিয়াছে দেশপর্য্যটন উপলক্ষে দিল্লী পর্য্যন্ত আসেন ও পরে "স্কিনার্স হর্স" নামক সেনাবিভাগের আপিসে কর্ম্মগ্রহণ করেন। চুণীলালের জ্যেষ্ঠপুত্র তারকনাথ বসুও পিতার অনুবর্ত্তী হন। তিনি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লী আসিয়া পিতার কাজে বহাল হন। তারকনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমাচরণের বয়স তখন ১৫।১৬ বৎসর। তিনি দেশে ঠাকুরমার নিকট থাকিতেন। হঠাৎ একদিন তিনি ঠাকুরমার উপর রাগ করিয়া দিল্লী পলাইয়া আসিলেন। তখনকার দিনে বাঙ্গালা দেশ হইতে এ অঞ্চলে যাতায়াতের পথ একেবারেই সহজ ছিল না। এই উমাচরণই ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র বসু মহাশয়ের পিতা। উমাচরণ দিল্লীতে আসিয়া ভাল করিয়া লেখাপড়া শেখেন এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ন্মেণ্টের খাজাঞ্চিখানায় কর্ম্মে বহাল হন। নানা বিপদ আপদের মধ্য দিয়া ইঁহারা এখানে স্থায়ী হন।

ইহলোক ত্যাগ করিয়া মানুষ পরলোকে চলিয়া গেলেই তাঁহার সম্বন্ধে প্রশংসায় শতমুখ হইয়া উঠা সাধারণ নিয়ম। বসু মহাশয় জীবদ্দশাতেই সকলের নিকট সকল বিষয়ে প্রশংসাভাজন ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারিক জীবন, সমাজ জীবন ও পারিবারিক জীবন এমনই উদার, উন্নত ও স্নেহময় ছিল যে তাহা প্রবাসী বাঙ্গালীদের আদর্শ হওয়ার যোগ্য।

প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা কেবল স্বজাতির বিশিষ্টতা লইয়া গৌরব করেন এবং এ দেশীয় সকল ব্যাপারেই উদাসীন থাকেন। বসু মহাশয় কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি অ-বাঙ্গালীদের সঙ্গে সকল বিষয়ে অন্তরের সহিত মিশিতেন। তিনি ছিলেন তাঁহাদেরই একজন যাঁহাদের উন্নত চরিত্র বাঙ্গালীকে এ দেশবাসীর নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র করিয়া তুলিতে পারে। তাঁহার শক্তি ও অর্থ কেবল নিজের স্বার্থেই ব্যয়িত হইত না। লোকহিতকর সকল অনুষ্ঠানের সঙ্গেই তাঁহার আন্তরিক সহযোগিতা ছিল। তাঁহাকে পাইলে সকল অনুষ্ঠানই সাফল্যলাভ করিত। তাঁহার গোপনদান অনেক ছিল। বহু দরিদ্র ছাত্রকে তিনি অর্থসাহায্য করিতেন—তার ভিতর বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী এবং মুসলমান ছাত্রও ছিল। সকলকেই তিনি সমানভাবে দেখিতেন।

তিনি নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন ও একজন দক্ষ আইনবেত্তা ছিলেন। দিল্লীতে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আইনের ক্লাস খোলা হইলে বসু মহাশয় "ডীন অফ্ দি ফ্যাকাল্টি অফ্ ল" এই সম্মানের পদ পাইয়াছিলেন এবং তিন বৎসর যোগ্যতার সহিত এই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

তিনি আজীবন প্রবাসী ছিলেন। কিন্তু বহুকাল এদেশে থাকিয়াও নিজের বাঙ্গালীত্ব ভুলিয়া যান নাই। তিনি সেকালের একজন খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালীর সমাজজীবন যাহাতে অটুট থাকে, বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা যাহাতে বজায় থাকে, তজ্জন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন করিতেন, অর্থব্যয়ও করিতেন। বাঙ্গালী ছাত্রদের স্থাপিত দিল্লীর অতি প্রাচীন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টি তাঁহার অত্যন্ত আদরের ছিল। নিজের ছেলেদের মত করিয়াই এটিকে তিনি পোষণ করিতেন।

দিল্লীর বাঙ্গালী সমাজ ঠিক যেন একটি বৃহৎ পরিবার—এমনই তা সখ্যসূত্রে আবদ্ধ। আর বসু মহাশয় ছিলেন তার কর্ত্তৃস্থানীয়। বস্তুতঃ যে-সকল গুণ থাকিলে শীর্ষস্থানীয় হওয়া যায়, তার মধ্যে বোধ করি তার কোনটিরই অভাব ছিল না। স্নেহের আবেষ্টন দিয়া তিনি সকলকেই ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে প্রবাসী বাঙ্গালীদের যে ক্ষতি হইল, কোনরকমেই তা পূর্ণ হইবার নয়।

"পিয়েটা"
কার্লো ক্রিভেলী

ডেট্রয়েট ইনষ্টিটিউট্ অফ আর্ট

ইতালীয় চিত্রকলার পরিচয়

শ্রীমন্মথ চৌধুরী

১

মনোরম রমণীমূর্ত্তি, ঠিক মানুষের মত দেখিতে মানুষ, শিশুর মত দেখিতে শিশু, ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা, জীব-জন্তু, সবই নৈসর্গিক; মোটের উপর ক্যানভাসের উপর রং-এ ও রেখায় আবদ্ধ সাধারণ দৃশ্যজগতেরই একটি প্রতিচ্ছবি—এই হইল ইতালীয় চিত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা। কিন্তু জনপ্রচলিত হইলেও এ ধারণা ভুল। ইহার জন্য দায়ী সপ্তদশ শতাব্দীর বারোক চিত্রকলা ও তাহার অনুকরণে সৃষ্ট অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর অ্যাকাডেমিক চিত্র। এই আর্টের উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতিকে প্রকৃতির মত করিয়া দেখান। আর্টের প্রধান যে উদ্দেশ্য রূপসৃষ্টি, সেদিকে তাহার মন ছিল না। ইতালীয় চিত্রকরেরাও প্রকৃতিকে ধরিতে চাহিয়াছেন সত্য, কিন্তু ক্যামেরার দৃষ্টিতে নয়। রস-জ্ঞানের ভিতর দিয়া চিত্রে তাহার পুনর্জ্জন্ম ঘটিয়াছিল। একথা অবশ্য সত্য যে ইতালীয় চিত্রকরের সেই শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি—সত্যনিষ্ঠা, বারোক শিল্পীরাও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বতন ইতালীয়দের সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে যে রসবোধের সংযোগ ছিল, বারোকেরা তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্রকলার মধ্যে যখন আমরা ব্যবধান টানি, তখন পাশ্চাত্য বলিতে আমরা বারোক ও বারোক অনুকারী চিত্রকলা বুঝি—ক্ল্যাসিকাল ইতালীয় নয়।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আগেকার যে ইয়ুরোপীয় চিত্রকলা, তাহার সঙ্গে ভারতীয়, চীনা, জাপানী, কোন প্রাচ্য চিত্রকলার প্রভেদ নাই। এ চিত্রকলায় বস্তুর স্থূলতাকে সম্পূর্ণভাবে দেখাইবার কোন চেষ্টা নাই; পারস্পেক্টিভের জ্ঞান তাহাতে খুব বেশী দেখি না; চিত্রের রচনা একটি মাত্র প্লেনেই সম্পূর্ণ। ইহার ফলে এই আর্টে প্রতিকৃতির দিক চিত্রের ডেকোরেটিভ বা আলঙ্কারিকদিককে পরাভূত করিতে পারে নাই, বরঞ্চ ইহার বিপরীতটাই চিরকাল বজায় রহিয়াছে; অর্থাৎ

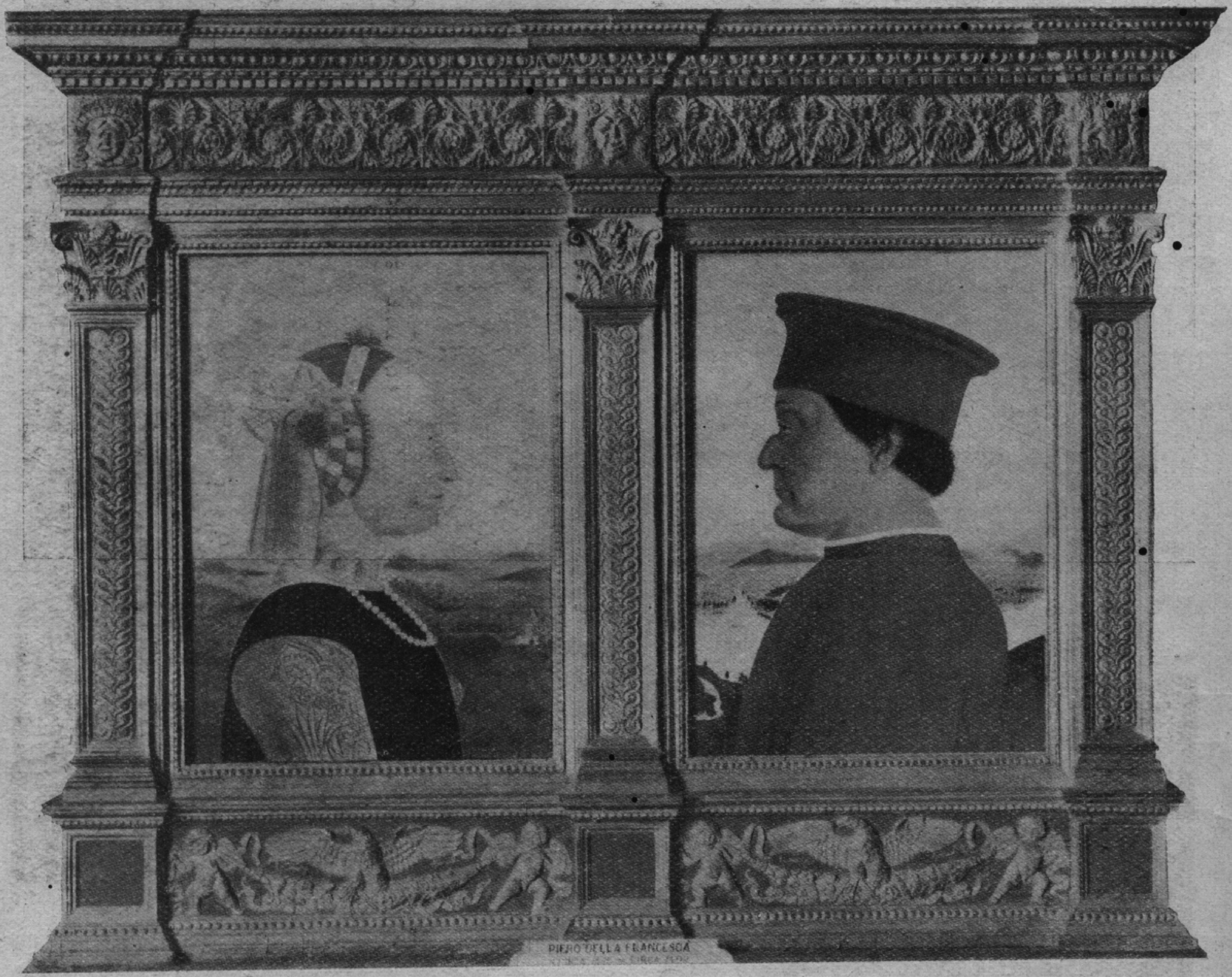

উর্বিনোর ডিউক ও ডাচেস্—পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চেস্কা
উফিৎজি, ফ্লোরেন্স

ছবির আলঙ্কারিক দিকের প্রয়োজন অনুযায়ীই তাহাতে রেখাপাত হইয়াছে, রেখার অর্থজ্ঞাপনের দিকটা সম্পূর্ণরূপে বিচার করা হয় নাই। এইখানে অবশ্য একটা প্রশ্ন আসে যে, ছবির আলঙ্কারিক সৌন্দর্য্য কি কেবল একটি মাত্র সারফেসেই সম্ভব? বিভিন্ন প্লেনে এ কি ডেকোরেশন সম্ভব নয়? স্থপতি শিল্পের যে সৌন্দর্য্য, দেখিতে পাই তাহা কেবল একটি মাত্র প্লেনের উপর নির্ভর করে না, তবে এই ধরণের রচনা চিত্রে রূপসৃষ্টি করে কিনা তাহা ইতালীয় চিত্র হইতে বিচার্য্য। প্রাচ্য কিম্বা মধ্যযুগের ইয়ুরোপীয় চিত্রের অলঙ্কার আলপনার মত, একটি মাত্র সারফেসে রেখা এবং বর্ণ সংযোগে তাহার সৃষ্টি, ছবির এত আঙুল লম্বা এত আঙুল চওড়া তুলোটের কিংবা এত ইঞ্চি লম্বা এত ইঞ্চি চওড়া ক্যানভাসের সীমায় তাহা আবদ্ধ। এই বিশেষ রকমের অলঙ্কার অবশ্য বিভিন্ন প্লেনে রচনা করা সম্ভব নয়।

প্রাচ্য কিম্বা প্রাচীন ইয়ুরোপীয় চিত্রকলায় অলঙ্কারের স্থান উপরে থাকিলেও চিত্রকরের উদ্দেশ্য ছিল তুলিতে একটা কিছুর প্রতিচ্ছবি আঁকা। গুহাবাসী মানব হইতে আরম্ভ করিয়া চীনা, জাপানী, ভারতীয়, ইতালীয়, আধুনিক ইউরোপীয়, সকল চিত্রকরের উদ্দেশ্য একই—প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি আঁকা। কিন্তু অজ্ঞানে সকলেই তাহা সুন্দর ভাবে করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং সেই জন্যই

তাহারা চিত্রকর। প্রকৃতিকে সুন্দরভাবে আঁকিতে হইবে, ইহা সকল আর্টেরই গোড়ার কথা। প্রকৃতিকে আঁকা ইচ্ছানুগত হইতে পারে, কিন্তু সুন্দরভাবে আঁকা চিত্রকরের ইচ্ছার বাহিরে। চিত্রকরের রসবোধ সে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মূলে। আর্টে শুধু সত্যের কোন মূল্য নাই, যদি না তাহা সুন্দর হয়। হয়ত যাহা সুন্দর নয়, তাহা চরম সত্য নয়। প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি আমাদের আনন্দ দেয় না, অথচ কয়েকটি অর্থশূন্য রেখা এবং কতকগুলি রং-এর সমাবেশ আমাদের মুগ্ধ করে। চিত্রকলার উদ্দেশ্য যখন প্রতিচ্ছবি আঁকা এবং আমাদের রসবোধ যখন শুধু প্রতিচ্ছবিতে তৃপ্ত হইবার নয়, তখন আর্ট সৃষ্টি করিতে হইলে এ দুয়ের যোগাযোগ প্রয়োজন, সুতরাং শ্রেষ্ঠ চিত্রকলা আমরা তাহাকেই বলিতে পারি যাহাতে প্রতিচ্ছবির মধ্যে রসভোগের সম্পূর্ণ উপাদান পাওয়া গিয়াছে।

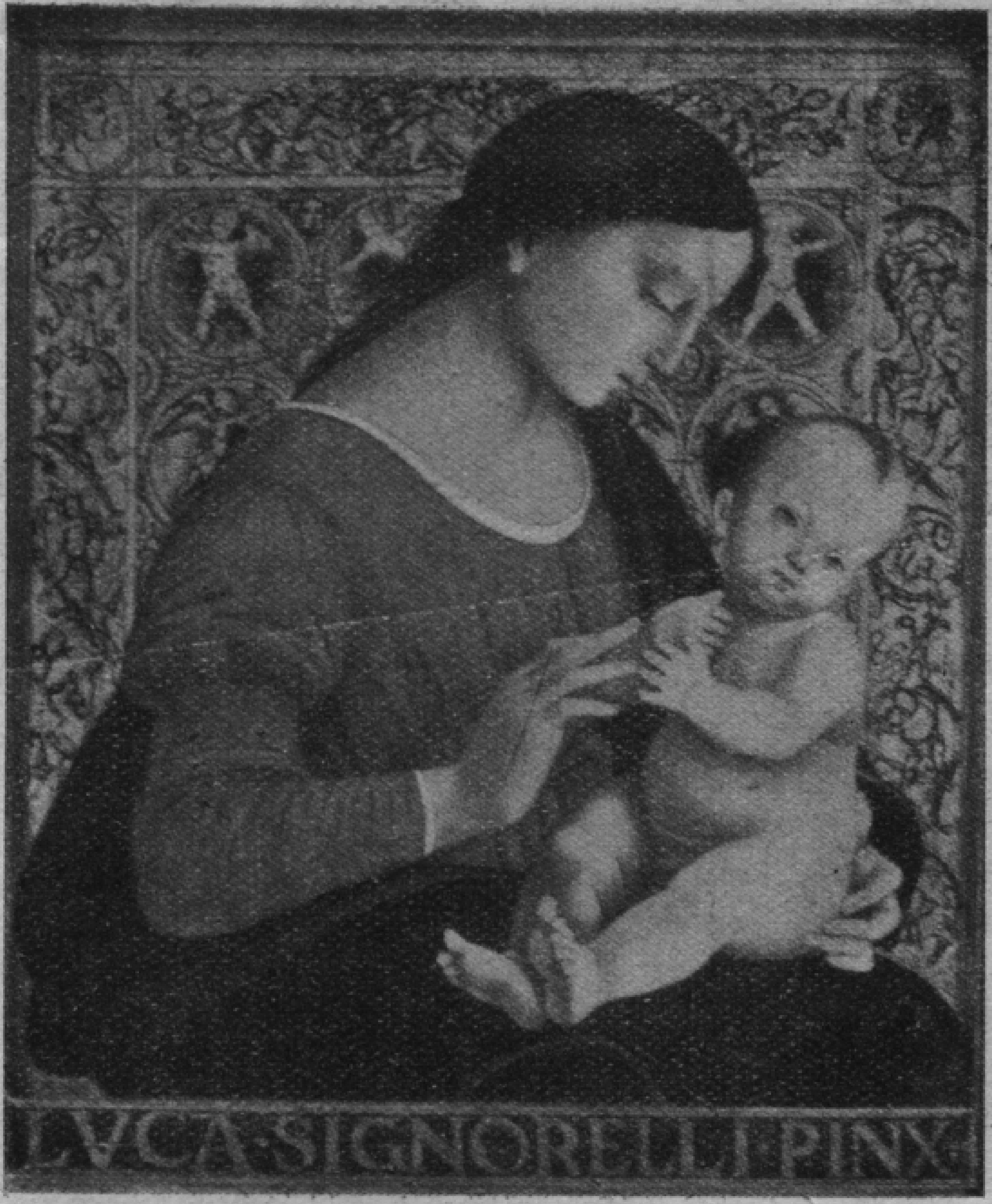

যীশু ও মেরী—লুকা সিনিওরেলি
ইউলিয়ুস বাকে সংগ্রহ, নিউইয়র্ক

তাই মনে হয়, প্রতিচ্ছবির সঙ্গে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির কোন বিরোধ নাই। তাহা করিতে গিয়া কেবলমাত্র প্রতিচ্ছবির সেই আদর্শ রূপটির সন্ধান করিতে হইবে যাহার সঙ্গে রসবোধের কোন অমিল নাই। মানবমূর্ত্তির সৌন্দর্য্য আমরা উপভোগ করি কি করিয়া? সে কি মানুষ বলিয়া, না তাহার দেহের রূপে

বেয়াত্রিচে দেস্তে—আম্ব্রোজো ডা প্রেডিস্
আম্ব্রোজিয়ানা গ্রন্থাগার, মিলান

আমাদের রসজ্ঞান পরিতৃপ্ত হয় বলিয়া? সুতরাং মানব দেহের সেই রূপ যাহারা খুজিয়া পাইয়াছে, তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলিতে পারি। গ্রীক মূর্ত্তিকে অনেকে বাস্তব মূর্ত্তি বলেন, প্রাচ্য ভাস্কর শিল্পের সঙ্গে তুলনা করিয়া। কিন্তু ঐ সকল মূর্ত্তিতে যে মানুষ দেখি সে প্রকৃতির মানুষ নয়; সে আদর্শ সুন্দর মানুষ। মানুষের রসজ্ঞানে তাহার জন্ম, শিল্পীর রচনায় তাহার প্রকাশ।

প্রাচ্য চিত্রকলার যে পদ্ধতি তাহাতে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির আদর্শে ছবি আঁকা সকল সময়ে সম্ভব নয়। সে-সকল চিত্রে আলো-ছায়া নাই, দৃশ্য-বিজ্ঞান নাই, স্থূলতা (plasticity) নাই। তাহাতে প্রকৃতির অনুকরণের

একমাত্র অবলম্বন রেখা। যেখানে রেখার ভঙ্গিতে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবের ভ্রম সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে, সেইখানেই উহা চরম উৎকর্ষে পৌছিয়াছে। বাস্তবিক

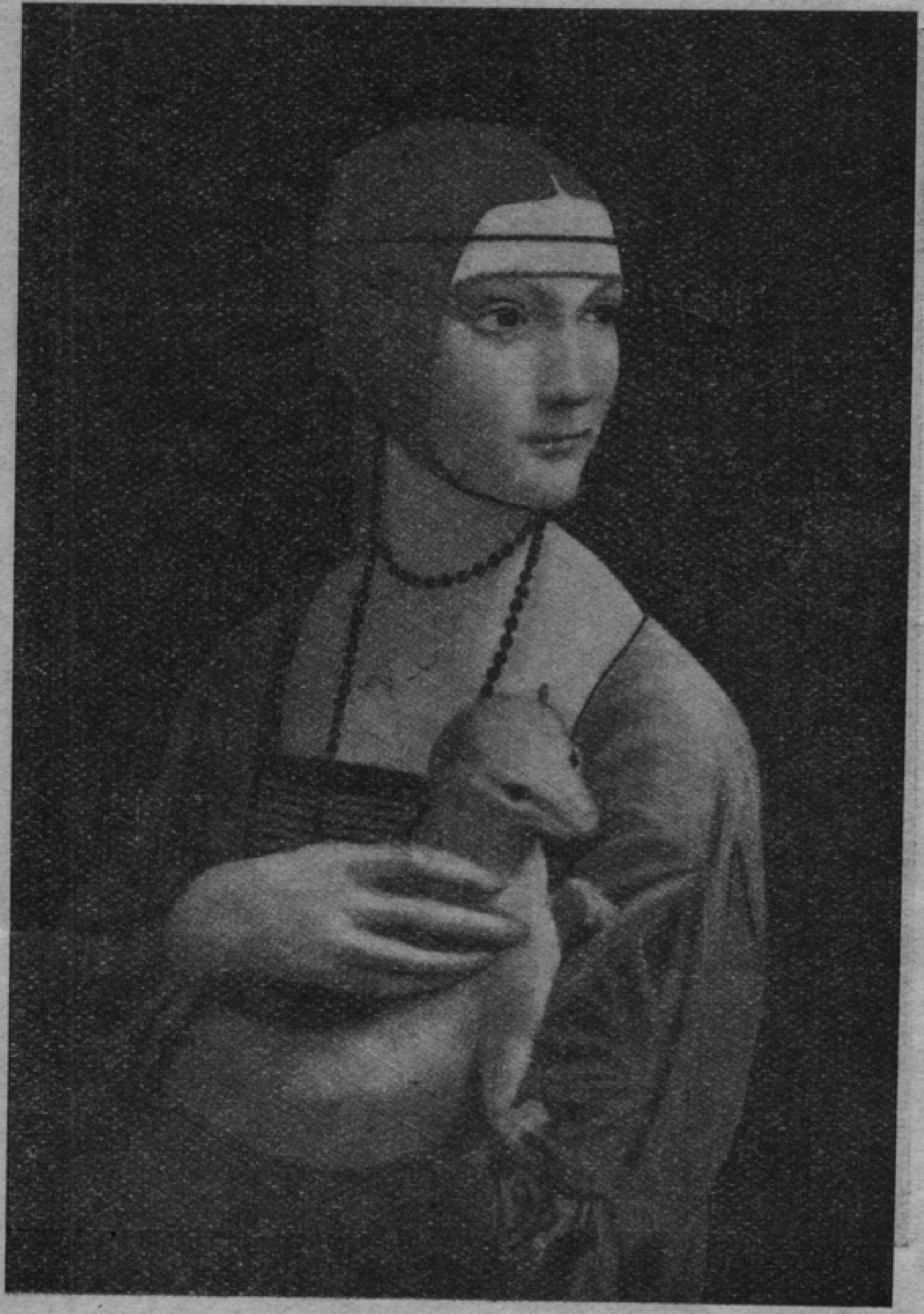

তরুণীর প্রতিকৃতি—লিয়োনার্ডো
চারটোরিস্কি সংগ্রহ, ক্রাকভ

পক্ষে প্রাচ্য কিম্বা প্রাচীন ইয়ুরোপীয় চিত্রকলার অবাস্তবতার জন্য তাহাদের শিল্প-পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশী দায়ী সে-সকল যুগের গতানুগতিকের শৃঙ্খল।

ইতালীয় চিত্রকলার যে বৈশিষ্ট্য তাহাকে কেবল আর্টের একটা ধারা বলিয়া শেষ করিয়া দেওয়া চলে না। এই আর্টের বৈশিষ্ট্য ইউরোপীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছায়া। মধ্যযুগের কিম্বা প্রাচ্য আর্টের সঙ্গে এ আর্টের প্রভেদ শুধু পদ্ধতিতে কিম্বা শিল্পবিজ্ঞানে নয়। রেনেসান্সের সত্যনিষ্ঠা, জ্ঞানপ্রতিভা, মনের উদারতা এই আর্টকে অন্য রূপ দিয়াছে। সত্যকে প্রকাশ যদি আর্টের উদ্দেশ্য হয়, তবে মানুষকে মানুষের মত আঁকিতে বাধা কি, এটাই এই নূতন যুগের আর্টের মূল কথা। Convention কিংবা tradition তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। কিন্তু এই যুগের আর্টের রসের দিক্‌টা বিজ্ঞানের দান নয়—তাহা শাশ্বত। তাই ইতালীর শিল্পীরা মানুষের আদর্শ লইয়াছিলেন গ্রীক মূর্ত্তি হইতে। বিজ্ঞানের আধিপত্য স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ আর্ট ও রসসৃষ্টির কথা ভুলিয়া গিয়া সঙ্গীতে কাওলাতীর মত চিত্রকলাতেও দৃশ্যবিজ্ঞান ও তদনুরূপ বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া সুরু করিয়াছিল। কিন্তু যখন এই ভ্রান্তি ঘটিল, তখন ইউরোপীয় আর্টের শ্রেষ্ঠ যুগ অতীত।

জোভানা টোর্ণাবুয়োনি—গিরলাণ্ডাইও
পিয়েরমণ্ট মর্গ্যান সংগ্রহ, নিউইয়র্ক

২

ইতালীয় চিত্রকলার বিশিষ্টতার সূচনা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে। কিন্তু ইতালীর সকল জায়গার চিত্রকলা কালক্রমে ধারাবাহিক রূপে চলিয়া আসে নাই। ফ্লোরেন্স,

একটি সিবিল—পেরুজিনো
সালা ডেল কাম্বো, পেরুজিয়া

সেণ্ট জন দি ব্যাপ্‌টিষ্ট—লিওনার্ডো
লুভ্‌র্‌, প্যারিস

একটি সিবিল—পেরুজিনো
সালা ডেল কাম্বো, পেরুজিয়া

যীশু—লিওনার্ডো
ব্রেরা গ্যালারী, মিলান

সিয়েনা, আম্ব্রিয়া, ভেনিস সকলেই স্থানীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াছে। আবার এক জায়গার আর্ট যখন উন্নতির কতগুলি ধাপ ছাড়াইয়া গিয়াছে, তখনও অন্য আর এক জায়গার চিত্রকলা নূতন আলো দেখে নাই। ফ্লোরেন্স এবং সিয়েনা এক সঙ্গে রওনা হইলেও সিয়েনার গতি ফ্লোরেন্সের বহুপূর্ব্বেই রুদ্ধ হইয়াছিল। আবার ভেনিস তার নিজস্বতা সত্তেও ফ্লোরেন্সের কীর্ত্তিকে আরও কিছু দূর অগ্রসর করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই ভাবে ইতালীর বিভিন্ন স্কুলের এবং বিভিন্ন কালের চিত্রকে একত্র করিয়া আমরা যে আর্ট পাইয়াছি, সেই সমষ্টিটুকুর বিশেষত্বকে আমরা ইতালীয় চিত্রকলার কীর্ত্তি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

যীশু, মেরী ও জোসেফ—মাইকেল এঞ্জেলো
উফিৎজি, ফ্লোরেন্স

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ফ্লোরেন্স এবং সিয়েনাতে নূতন আর্টের দিকে প্রথম প্রচেষ্টা হয়। ফ্লোরেন্সে জোত্তো এবং সিয়েনাতে ডুট্‌চো আর্টকে মধ্যযুগের বাইজেণ্টাইন প্রথার বন্ধন হইতে মুক্তি দেন। জোত্তো এবং তাঁহার গুরু চিমাবুয়ে বস্তুর স্থূলতার (plasticity) দিকে নজর দেন। চিত্রে এই নূতনত্বের প্রবর্ত্তন করিয়াও যে জোত্তো আর্টের দিক হইতে চিত্রকে নিখুঁত রাখিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। ইতালীর সমগ্র রেণেসান্স চিত্রকলার পূর্ব্বাভাস তাঁহার চিত্রে দেখিতে পাই। তবে তিনি স্থূলতাকে অথবা তিন ডাইমেনশনকে চিত্রে টানিয়া আনিলেও তিন ডাইমেনশনে চিত্ররচনা করিবার সমস্যা তাঁহার চিত্রে দাঁড়ায় নাই। সুতরাং ঠিক আলপনার মত না হইলেও তাঁহার চিত্র একেবারে প্যাটার্ণ বর্জ্জিত নয়।

সিয়েনার চতুর্দ্দশ শতাব্দীর চিত্র সেইখানকার পরবর্ত্তী যুগের চিত্র হইতে শ্রেষ্ঠ। ডুট্‌চো স্থূলতা লাভ করিয়াছেন এক অভিনব উপায়ে। রং-এর মূল্য সিয়েনীয়রা বেশ বুঝিতেন। ডুট্‌চো সোনালি পশ্চাৎ পটের উপর রং দিয়া তিনটি মূর্ত্তি এমন ভাবে আঁকিয়াছেন, যে, মনে হয় যেন দূর পশ্চিম আকাশে সূর্য্যাস্তের সময় তিনটি মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু ইতালীর অন্যান্য স্থানের চিত্রকরেরা যে-ভাবে স্থূলতাকে চিত্রে ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সিয়েনীয়রা সে ভাবে কখনই করে নাই। তাহাদের চিত্রে প্যাটার্ণ চিরকালই বজায় ছিল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যে নূতনত্বের আভাস মাত্র দেখিতে পাই, ফ্লোরেন্সে পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাহার পূর্ণ বিকাশ হয়; চিত্রকলার শিল্পের-দিকটা প্রকৃত উন্নতি লাভ করে। বিজ্ঞানের তথ্যকে তখনই রূপসৃষ্টির কাজে লাগান হয়। রেখা, শূন্য এবং ছায়ার বিজ্ঞানের তখনই সম্পূর্ণ চর্চ্চা

আরম্ভ হয় ; দেহতত্ত্বের জ্ঞান যথেষ্ট বাড়িয়া যায় ; প্রাণবান ও প্রাণহীন সকল বস্তুরই সূক্ষ্ম আলোচনা সুরু হয়। এই নবলব্ধ জ্ঞান এবং পদ্ধতির সফলতা চিত্রের রচনাকে পরিবর্ত্তিত করিতে বাধ্য করে। প্যাটার্ণ নির্ম্মাণ ছাড়িয়া চিত্রকরকে বিভিন্ন প্লেনে চিত্ররচনায় মন দিতে হয়। মাসাচ্চো, পলাউওলো, ডা ভিঞ্চি প্রভৃতি চিত্রকরেরা ফ্লোরেন্সে নূতন চিত্রকলার স্থায়ী ভিত্তি নির্ম্মাণ করেন।

ভেনিসে এই সময়ে মানটেনিয়া প্রভৃতি বড় চিত্রকরেরা চিত্রকলায় নূতনত্বের আমদানী করিতেছিলেন। ভেনিসের আর্টে বাইজেনসিয়ামের প্রভাব অনেকদিন পর্য্যন্ত এবং অনেক বেশী পরিমাণে ছিল। ভেনিস সেই যুগে বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল—প্রাচ্যের সঙ্গে তাহার আদান-প্রদান ছিল। এই সকল কারণে ভেনিসের চিত্রকলায় সেই ঐশ্বর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার রংএর উজ্জলতাও কোনদিনই কমে নাই। ভেনিসের সমুদ্রও ভেনিসের আর্টে উপর তাহার ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। ভেনিসীয় চিত্রে একটা দৃষ্টির প্রসারতা আছে। জোর্জ্জোনের চিত্রকলায় তাহার সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম প্রকাশ।

নারীর সৃষ্টি—মাইকেল এঞ্জেলো
সিষ্টাইন চ্যাপেল, রোম

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইতালীর সর্ব্বত্রই নূতন আর্ট ফুটিয়া উঠে। সকল চিত্রকরই নূতন বিজ্ঞান, নূতন অভিজ্ঞতা এবং নূতন পদ্ধতিকে কাজে লাগাইতে আরম্ভ করেন। ফ্লোরেন্সের প্রাধান্য তখন কমিয়া আসিয়াছে। এই যুগের শ্রেষ্ঠ দুইজন শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো এবং রাফায়েল রোমে আহূত হন এবং কয়েক বৎসরের পরিশ্রমের ফলে রোমকে চিঙ্কেচেন্তোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রে ভূষিত করেন। মিলানে লিওনার্ডো তাঁহার অসাধারণ মনীষার পরিচয় দেন। পারমায় করেড্জো জন্মগ্রহণ করেন। ভেনিসে জর্জ্জোনের রোমান্স এবং বেলিনির সূক্ষ্ম শিল্পচাতুর্য্য মিলিয়া টিশিয়ানের শিক্ষা সমাপ্ত করে।

এই শতাব্দীর মধ্যভাগে রোম, ফ্লোরেন্স ও মিলানের গৌরব লুপ্ত হইয়া আসে,কিন্তু ভেনিসে টিশিয়ান, টিনটরোট্টো এবং পল ভেরোনিজে চিত্রকলার উচ্চ আদর্শ বজায় রাখেন। অবশেষে বলোনিয়াতে একটি নূতন প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। গড়নের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ভেনিসীয় রংএর চাকচিক্য মিশানোই এই স্কুলের উদ্দেশ্য ছিল। কারাভাডজোর নেতৃত্বে একটু রূপান্তরিত হইয়া এই ধারাটি আবার রোমে এবং নেপ্‌লসে ফিরিয়া যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন স্কুলের বিশেষত্ব মুছিয়া গিয়া ইতালীয় চিত্রকলা এক হইতে আরম্ভ করে। এই যুগে কোন নূতন পদ্ধতি কিংবা নূতন জ্ঞানের আবির্ভাব হয় নাই। পুরাতন প্রথা অনুযায়ীই শিল্প রচনা হইতে থাকে। ইতালী তখন সমগ্র ইয়ুরোপের শিক্ষা-কেন্দ্র হইয়া উঠে। নেদারলেণ্ডস্ হইতে রুবেন্স্, স্পেন হইতে ভেলাসকেথ এবং ফ্রান্স হইতে পুসেঁ ইতালীতে তাঁহাদের শিক্ষা সমাপ্ত করিতে আসেন।

৩

চিমাবুয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া মাইকেল এঞ্জেলো পর্য্যন্ত ফ্লোরেন্সের চিত্রকলা ক্রমবিকাশের পথে চলিয়াছে। চিমাবুয়ে যে প্ল্যাষ্টিক রচনার আভাস দেন, তাহার পূর্ণ পরিণতি হয় মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্রে।

দান্তে---রাফায়েল অঙ্কিত ফ্রেস্কোর অংশ
সেন্টপিটার্স, রোম

মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৩—১৫৬৩) ছিলেন মুখ্যত ভাস্কর। তাঁহার চিত্রকলাতেও ভাস্কর্য্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। তিনি চিত্রে আলো-ছায়ার দিকে বেশী নজর দেন নাই। তাঁহার বেশীর ভাগ চিত্রই ফ্রেস্কো অর্থাৎ দেয়াল চিত্র। চিত্রকর হিসাবে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান সিষ্টাইন চ্যাপেলের চিত্রিত ছাদ।

ভাস্কর শিল্পের অতিরিক্ত প্রভাব মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্রকলাকে সকল সময় চিত্রকলা হিসাবে সম্পূর্ণতা দিতে পারে নাই। লিওনার্ডো (১৪৫২-১৫২১) স্থূলতাকে চিত্রে প্রতিফলিত করিয়াছেন, কিন্তু চিত্রকে ভাস্কর্য্যের মত করিয়া নয়। মাইকেল এঞ্জেলোর মত তিনি স্থূলতার দিকে অতিরিক্ত জোর দেন নাই বটে, কিন্তু আলো-ছায়ায় রচনার যে আভাস তিনি দিয়াছেন তাহার পরিণতি হইয়াছে রেমব্রান্টের চিত্রকলায়। তাঁহার মধ্যে বাস্তবকে সম্পূর্ণভাবে আঁকিবার চেষ্টা এবং নিজস্ব শিল্পরচনার ক্ষমতা সকল সময় মিল রাখিয়া চলিতে পারে নাই। তাই তাঁহার বহু ছবি অসম্পূর্ণ। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র লা জোকোণ্ডাকেও তিনি সম্পূর্ণ মনে করেন নাই। লিওনার্ডোর চিত্রের আর একটি বিশেষত্ব তাহার মনস্তত্বের দিক। পরবর্ত্তী যুগে অবশ্য মনস্তত্বকে এত উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে

গ্যালাটিয়া—রাফায়েল
ফার্ণেজিনা, রোম

যে, চিত্র নাটকে পরিণত হইয়াছে। ছবির মুখ্য উদ্দেশ্য চিত্রের দ্বারা আমাদিগকে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করান। মনস্তত্বকে অবশ্য কোন ছবিই সম্পূর্ণ বাদ দিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার স্থান চিত্রে ততখানিই, যতখানি মানুষ হিসাবে মানুষের দেহের প্রয়োজন। বারোক এবং তাহার

পরবর্তী চিত্রকলা শুধু প্রতিচ্ছবিকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেয় নাই। দৃশ্যের দৃষ্টিগত অর্থকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার দিকে মন দিয়াছে। লিওনার্ডোই একমাত্র চিত্রকর যিনি মনস্তত্ত্বকে উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন।

বটিচেলীর (১৪৪৪-১৫১০) আর্টে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য চিত্রকলার যাহা শ্রেষ্ঠ তাহার সমাবেশ ঘটিয়াছে। তাঁহার আর্ট সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব। তাঁহার চিত্রকলার বিজ্ঞানের ভারে ভারাক্রান্ত নয়। চিত্রকরের স্বাভাবিক সংস্কারের প্রেরণায় তিনি চিত্র আঁকিয়াছেন। স্থুলতাকে তিনি ফুটাইয়াছেন, কিন্তু আলো-ছায়া দিয়া নয়। তাঁহার রেখার ভঙ্গি ও সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। চীনা, জাপানী ও ভারতীয় চিত্রকরের

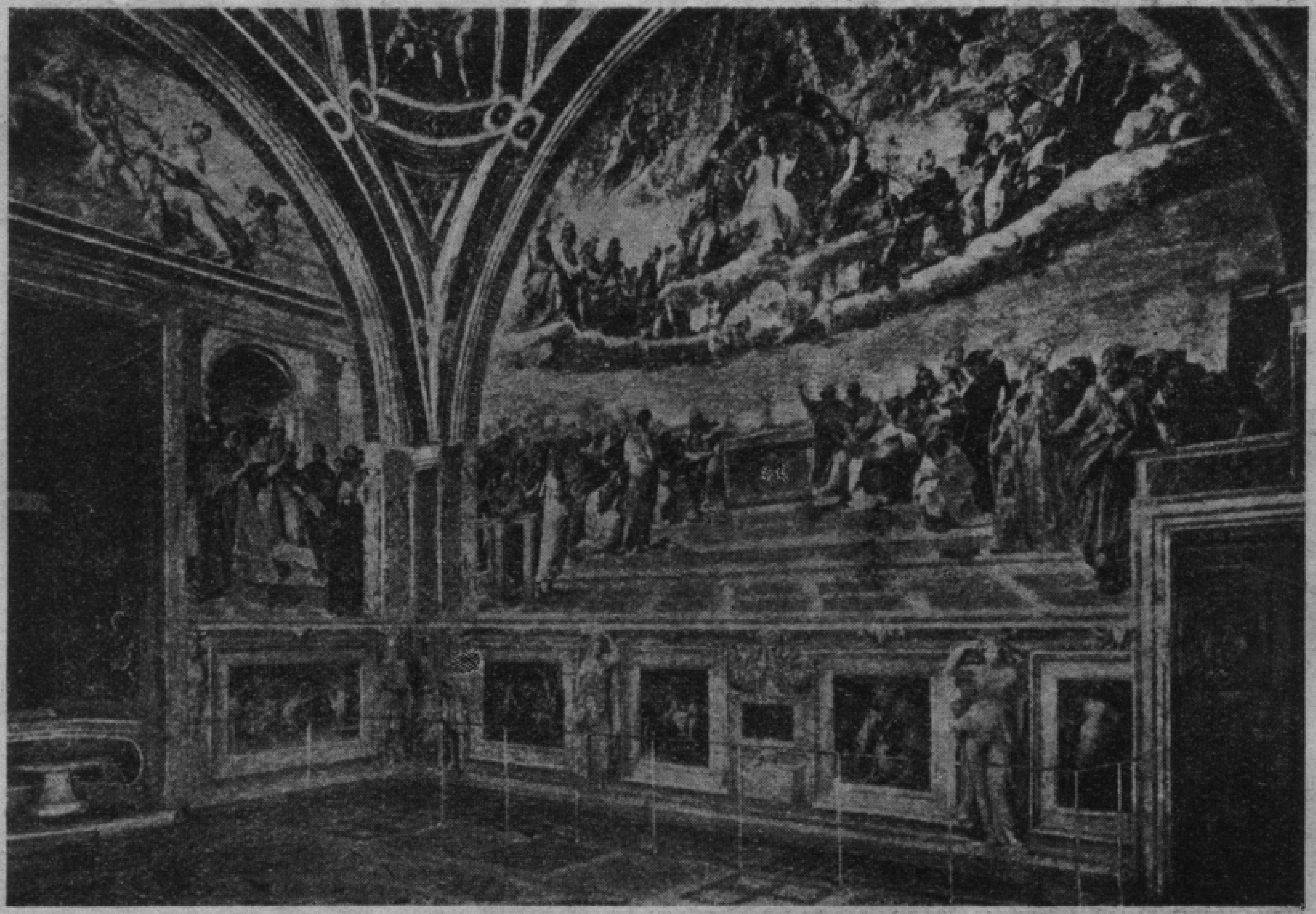

রাফায়েল অঙ্কিত ফ্রেস্কো
ষ্টান্‌জা দেলা সেনিয়াতুরা (ভ্যাটিকান), রোম

রেখা হইতেও তাঁহার রেখা মনোরম। "ভিনাসের জন্ম" নামক চিত্রে তাঁহার চিত্রকলার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। বটিচেলীর রচনা তিন ডাইমেনশনে নয়, অথচ তিনি বাস্তবকেও ভুলিয়া যান নাই। প্রাচ্যজাতির কাছে বোধ হয় বটিচেলীর চিত্রকলাই ইতালীর চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া মনে হইবে। রেখাকে ছাড়িয়া যে চিত্র, তাহার সৌন্দর্য্যবোধ আমাদের কাছে সহজে হয় না।

ষ্টান্‌জা দেলা সেনিয়াতুয়ার ফ্রেস্কোর একটি অংশ---রাফায়েল
ভ্যাটিকান, রোম

আস্ট্রিয়ার চিত্রকলা ফ্লোরেন্সের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চে-

স্কাকে (১৪১৬ ?—১৪৯২) ফ্লোরেন্সের চিত্রকর বলিলেও ভুল হয় না। চিত্রকর হিসাবে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। উফিৎজির Triumph, উরবিনোর যিশু, এই দুইখানি চিত্রই তাঁহার যশের পরিচয় দেয়।

সিনিয়োরেলি (১৪৪১-১৫২৩ পিয়েরোর শিষ্য। ফ্লোরেন্সের প্রথা অনুযায়ী তিনি দেহতত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও

যীশুমাতা—করেড্জো
গ্যালারী, পারমা

তিনি আম্ব্রিয়ার চিত্রকরের যে বিশেষত্ব মুক্ত রচনা, তাহাতে দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার চিত্রিত Flagellation-এ তাঁহার গুরুর স্নিগ্ধ বর্ণবিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

পেরুজিনো (১৪৪৬ ১৫২৩) আম্ব্রিয়ার বিশেষত্বকে খুব ভাল করিয়া ফুটাইতে পারিয়াছেন। দূরের দৃশ্য, ইতালীর অসমতল ভূমির তরঙ্গ, পশ্চাতে সুনীল আকাশে মিলিয়া যাওয়া সবুজ উপত্যকার সারি, পেরুজিনোর চিত্রকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে।

রাফায়েল (১৪৮৩-১৫২০) যখন অপরিণত বয়স্ক যুবক, তখন ইতালীর আর্ট জগতে লিওনার্দো, মাইকেল এঞ্জেলো, ফ্রা বার্টোলোমিয়ো প্রভৃতি চিত্রকরেরা অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। প্রথমে পেরুজিনোর এবং পরে বার্টোলোমিয়োর কাছে রাফায়েল শিক্ষালাভ করেন। স্বাভাবিক প্রতিভা তাঁহাকে চিত্রকর হিসাবে উচ্চ স্থান দিয়াছিল। কিন্তু ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহাকে অসাধারণ আখ্যা দেওয়া যায় না। ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রোমে যান এবং সেইখানকার গ্রীক প্রভাবে তাহার চিত্রবিদ্যা নবজন্ম লাভ করে। ভ্যাটিকানে তিনি Dispute of the Sacrament চিত্রিত করেন এবং তাহা হইতেই তাঁহার মনের প্রসারের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিকৃতি অঙ্কণে তিনি খুব সিদ্ধহস্ত ছিলেন। Baldassare Castiglione নামক চিত্রে কিম্বা The Mass of Bolsena তে এই বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভেনিসের চিত্রকলায় নূতন যুগের প্রথম প্রকাশ হয় পাডুয়ার চিত্রকর মানটেনিয়ার চিত্রে। রোমের প্রভাব মানটেনিয়ার মনে খুব বেশী ছিল, তাই তাঁহার মনুষ্যমূর্ত্তি প্রাচীন রোমের মূর্ত্তির মত। মানটেনিয়ার চিত্রের কঠিনতাটুকু জোভানি বেলিনি (১৪৩১-১৫১৬) বাদ দিতে পারিয়াছিলেন। ভাস্কর শিল্পের প্রভাব তিনি একমাত্র তাঁহার চিত্রের মানব মূর্ত্তিতে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যকে তিনি মধুর ভাবে আঁকিয়াছেন। বেলিনির প্রতিভা অসাধারণ ছিল। তাঁহার শিল্পপদ্ধতি এবং বর্ণবিন্যাস অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ভেনিসের চিত্রকলাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। The Agony in the Garden, নেপলসের Transfiguration এবং ন্যাশান্যাল গ্যালারীর Madonna of the Meadow, Doge Leonardo Loredano,—এইগুলি তাঁহার বিখ্যাত চিত্র।

টিশিয়ানের (১৪৭৭-১৫৭৬) চিত্রকলার প্রারম্ভ যেখানে, সেখানে বেলিনির চিত্রকলার শেষ; এবং টিশিয়ানের সমাপ্তি যেখানে সেইখানে রেমব্রাণ্ট-এর আর্টের সূচনা। টিশিয়ান ও জর্জ্জোনে (১৪৭৮-১৫২৪) সমসাময়িক, কিন্তু টিশিয়ান জর্জ্জোনের শিষ্য ছিলেন। জর্জ্জোনের প্রভাব তাঁহার মধ্যে যথেষ্টই ছিল। জর্জ্জোনে ইতালীর চিত্রকলাকে Classicism হইতে Romanticism এ লইয়া যান। বেলিনিই প্রথমে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রাণের যোগ দেখাইয়াছিলেন। জর্জ্জোনে ভেনিসের রংএর বিচিত্রতা তুলিতে ফলাইয়াছেন। The Tempest এবং Fête Champetre তাহার দুইখানি বিশিষ্ট এবং বিখ্যাত চিত্র। টিশিয়ানের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি তার Bacchus ও Ariadne। টিশিয়ানের চিত্রকলার আরও দুইটি ধারা ছিল, একটি আলেখ্য অঙ্কণ, অপরটি ধর্ম্মবিষয়ক চিত্র। Piêta ধর্ম্মচিত্রে তাহার শ্রেষ্ঠ দান—ধর্ম্মভাবের দিক হইতে ইহাকে জোত্তো হইতে মাইকেল এঞ্জেলো পর্য্যন্ত যে কোন চিত্রকরের চিত্রের সহিত তুলনা করা চলিতে পারে।

তৃণাঙ্কুর

শ্রীমতী শান্তি সেন

আসন্নমৃত্যুর ছায়া দুর্য্যোগের মেঘের মত বাড়ীখানিকে ছাইয়া রাখিয়াছে। অস্ফুট বিলাপধ্বনি ও অশ্রুপাত ক্রমেই যেন নিবিড় হইয়া উঠিতেছে, জীবনযাত্রার আনন্দটুকু ক্ষণকালের জন্যও একবার উঁকি মারে না। দেখিয়া শুনিয়া তিন চার বছরের মেয়েটিও পর্য্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

সবাই বলিতেছে, আহা এমন লক্ষ্মীশ্রী এম্‌নি হ'য়ে গেল, এই বয়সেই,—

বলিবারই কথা। যে রূপ দেখিলে চোখ ফিরিয়া আসে না, সেই রূপেরও যে এই পরিণতি হইতে পারে, কল্পনাও করা যায় না। দেহখানি যেন বিছানার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; তবু মুখখানা টল্‌ টল্‌ করিতেছে। চোখ দুটি উজ্জ্বল দেখায়।

পড়শী বউয়েরা আসিয়া দেখিয়া যায়, যাইবার সময় নিজেরাই বলাবলি করে,—"মুখখানি কি মিষ্টি ভাই,—আর কি মিষ্টিই-বা কথাগুলো, আঃ—"

—কিন্তু বাঁচবে না।

—ওই ছোট্ট মেয়েটি বুঝি ওরই—আহা—বেচারা"

এম্‌নি আরও কত কথা—

রাস্তায় নামিয়াও তাহারা তাকায়, দেখে,—জানালার ভিতর দিয়া রোগী শূন্যদৃষ্টিতে বাহিরের পানে তাকাইয়া আছে।

শহর ছাড়াইয়া বহুদূরে খোলা মাঠের উপর বাড়ীখানি।

সৌধ সমাজ হইতে একেবারেই যেন বিচ্ছিন্ন। চারিদিকে ফাঁকা মাঠ,—কেবল ধূ ধূ করিতেছে। বাড়ী এদিকে আরও আছে, কিন্তু কোনোটাই কোনোটাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে নাই,—খুব দূরে দূরে। একটা রাস্তা সেই দূরের বাড়ীগুলিকে একখানি মালার মত গাঁথিয়া চলিয়া গিয়াছে। কাছেই একটা পাহাড়ী নদী। শীর্ণ দেহের ধমনীর মত নদীটা মাঠের বুক চিরিয়া বালুরাশির উপর দিয়া গড়াইতে গড়াইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে আর দেখাই যায় না। কাঁকর পাথরের পার দুইটি রৌদ্রে ঝক্‌ ঝক্‌ করিতে থাকে। ওপারে কতগুলি খড়ের ঘর। তারই আশেপাশে বহুদূরব্যাপী বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। আকাশটা যেন ঘরগুলির গা বাহিয়া নামিয়া আসিয়া সবুজ ক্ষেতগুলির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। লাল

স্থরকীর সোজা রাস্তাটার দুই ধারে সারি দেওয়া বড় বড় গাছ। কৃষ্ণচূড়া, অশ্বত্থ, আম, জাম, তেঁতুল আর তারই মাঝে মাঝে ছাতার মত ছাঁটাকাটা গোল-ধরণের কতগুলি বকুল গাছ। গাছগুলির মাঝখান দিয়া চওড়া লাল রাস্তাটা একেবারে সরু হইয়া কোথায় যেন সবুজের আড়ালে মিশিয়া গিয়াছে। ঠিক যেন সীমন্তে উজ্জ্বল সিঁদুর রেখা

মেয়েটি বিছানায় শুইয়া শ্রান্ত চোখে সারাদিন তাকাইয়া থাকে। নাম বকুল। দেখিতেও যেন বকুলের মতই,—স্থকোমল ও স্থন্দর।

পাশাপাশি দুইখানা ঘর। মাঝখানে সরু একটা গলি। স্থমুখের একখানি ঘরে বকুল একটা তক্তাপোষের উপর সারাদিন শুইয়া থাকে। বিছানার উপর শিয়রের দিকে একখানা আর্‌সী,—মাঝে মাঝে আর্‌সীতে নিজের শীর্ণবিবর্ণ মুখখানা এক-একবার দেখিয়া লইত। দেখিতে দেখিতে মুখের উপর একটা বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিত। বুক ভাঙিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিত।

ঘরের ভিতর ঔষধপত্র ফলফুলারি দেয়ালের তাকে স্থন্দর করিয়া সাজানো। রোগীর যা-কিছু দরকার সবই আছে। সেই দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তার মনটা হতাশায় ভাঙিয়া পড়ে। দিনের পর দিন কেবল ওষুধ আর ওষুধ,—শিকড় আর মাদুলীর ছড়াছড়ি। অসহ্য বোধ হয়। চোখের স্থমুখে দেয়ালের গায়ে টাঙ্গানো সস্তা দামের ছোট একখানি মহাদেবের ছবি। বহুদিনের বহু শুষ্ক মালায় যেন ঢাকিয়া গিয়াছে। ছবিখানির দিকে কাতরদৃষ্টিতে তাকাইয়া কত প্রার্থনা করে,—কতই-বা মিনতি জানায়। চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল বাহির হইয়া আসে।

পাশের ঘরে তার ছোট্ট মেয়ে, ছবির কলকণ্ঠে বকুলের তন্ময়তা ভাঙিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল, ছবি রান্না করিতেছে, খুব উৎসাহের সহিত ডাল নামাইয়া ভাত চড়াইতেছে, আবার মাছ ভাজিবার মত মুখে মুখেই ছ্যাৎ ছ্যাৎ শব্দ করিতেছে। তাহার রান্নার জল বুঝি ফুরাইয়া গেল। এঁটো হাত ধুইবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠিল। উঠিতেই মায়ের দিকে নজর পড়িল, লজ্জায় দুই হাতে মুখখানা ঢাকিয়া ছবি ছুটিয়া গিয়া মায়ের কাপড়ের আঁচলে মুখ লুকাইল, তারপর মুখ বাহির করিয়াই দেখে, মায়ের চোখে জল। লজ্জা চলিয়া গেল, ব্যস্তভাবে ছবি বলিল,—"মা, তোমার খিদে পেয়েছে—তুমি এখন খাবে?"

বকুল মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না।"

ছবি তাড়াতাড়ি নিজের ফ্রকটা তুলিয়া মায়ের চোখের জল মুছিয়া দিল। বলিল,—"কাঁদ্‌ছ কেন?"

তারপর তাহার চুলগুলিতে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল,—"কেঁদনা, তুমি ঘুমোও।"

বকুল ছবির হাতটা সরাইয়া দিয়া বলিল,—"উঁহুঁ, আমি বেশ আছি তুমি যাও, খেলা করোগে।"

ছবি চলিয়া গেল। বকুল পাশ ফিরিয়া শুইল। শুইয়া নানা কথাই মনে আসে,—জীবনের দিনগুলি হয়ত শেষ হইয়া আসিতেছে, আস্থক—কিন্তু দুঃখ হয় মেয়েটার জন্য—

বকুল জানালাটা অল্প একটু খুলিয়া দূরের পানে তাকাইয়া রহিল। ঐ ফাঁকটুকু দিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। অদূরে ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছের রূপালী ঝালরের মত ছাড়া ছাড়া ডালপালাগুলি। সেই ডালের আড়াল হইতে কয়েকখানা বাড়ী একটু একটু নজরে আসে। তার পিছনে কালো মেঘের মত একখণ্ড পাহাড়। ভারি স্থন্দর দেখায়।

দূরে গাঁয়ের পথ ধরিয়া ছোট জাতের মেয়েরা যাতায়াত করে। কাহারও মাথায় ঝাঁকা, কাহারও মাথায়-বা বাজারের সওদা। মেয়েগুলি বিড়ি টানিতে টানিতে চলিতেছিল। বহু দূরের লোক যেন পুতুল। একটু একটু নড়ে,—আসে কি যায় অনেক সময় বুঝাই যায় না। দেখিতে দেখিতে তার চোখ শ্রান্ত হইয়া আসিল। আবার চিন্তারাশি মনের ভিতর ভিড় করিয়া দাঁড়াইল,—মরিয়া গেলে মেয়েটার কি দুর্দ্দশাই না হইবে!—কে দেখিবে? এইটুকু মেয়ে, কত অসহায়—

ব্যথায় বুকটা টন্ টন্ করিয়া ওঠে।

বকুল স্বামীকে বলিল,—"তোমার আর কি—তোমার ত আবার সবই হবে—যায় ত এই মেয়েটার মা যাবে—আর আমার বাপমার—"

আবার চোখে জল আসিয়া গেল।

স্বামী বুঝি-বা মনে ব্যথা পাইল। কি যেন বলিতেও গেল।

বকুল বাধা দিয়া বলিল,—"যাও যাও, আর বেশী বোলো না—আর বোঝাতে হবে না—সবই বুঝেচি—"

কথাগুলি শুনিয়া বকুলের মাও চোখে জল রাখিতে পারিলেন না। বাঁ-হাতে নিজের চোখ মুছিয়া, কাপড়ের আঁচল দিয়া মেয়ের চোখের জল মুছিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "ছিঃ বকুল, কেঁদ না—অসুখ কি আর লোকের হয় না? কত খারাপ রোগীও ত ভাল হ'য়ে উঠচে—তোমার শুধু জরটা ছেড়ে গেলেই ত হয়। যাবে—সব সেরে যাবে"।

তারপর তিনি ম্লানমুখে শূন্যদৃষ্টিতে জানালাটার পানে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার অন্তরের সূক্ষ্ম দৃষ্টিটি অতি সন্তর্পণে থামিয়া থামিয়া একেবারে মেয়ের মৃত্যু পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিল। মৃত্যুর অস্পষ্ট ছায়াটা অন্তরের উপর ছবি আঁকিতে লাগিল—সে কি এক ভয়ানক দৃশ্য—বকুলের পাংশু ম্লান মৃতদেহ—সেই মৃতদেহের চারি পাশে স্বজনবর্গের ভিড় ও কাতর আর্ত্তনাদ।

ভাবিতেও মা শিহরিয়া উঠেন। মুখে বিষাদ ও নৈরাশ্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল।

বকুল মা'র মুখের পানে তাকাইয়া দেখিল—হয়ত কিছু বুঝিতেও পারিল।

ছবি কেবলই তার মায়ের কাছে যাইতে চাহিত, ফাঁক পাইলেই ছুটিয়া যাইত। মাসীকে বলিত, "ছাড় মাসী,—ছাড়,—আমি বাবার কাছে যাই।" তারপর কোন রকমে ফাঁকি দিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া আসিত। বলিত,—"মা ভাল আছ?"

বকুল মাথা নাড়িত।

ছবি আব্দার করিয়া বলিত, "আমি তোমার কাছে শোবো—"

বকুলের বিরক্তি বোধ হয়। বলে, "না-আমার অসুখ ভাল হ'লে শোবে।"

ছবি মানিত না। একপাশে শুইয়া পড়িত। বলিত, "তোমাকে বিরক্ত কোরব না মা, চুপ করে শুয়ে থাকব।"

সেদিন কাতরকণ্ঠে বকুল বলিল, "আমার ভাল লাগ্‌ছে না—তুমি এখন যাও।"

ছবি ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িল। অপরাধীর মত নামিয়া গেল। যাইবার সময় একটু দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবাকে ডেকে দি? ওষুধ দেবে। ওষুধ খেলেই ভাল হ'য়ে যাবে। লক্ষ্মীমেয়ে—ওষুধ খেয়ো, কেমন? ডাকি বাবাকে—"

বকুল মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু—যাও—বিরক্ত কোরো না।"

ছবি ম্লানমুখে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। তারপর আবার ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, তুমি একলা রয়েছ? আমি আসি?"

কিন্তু বকুলের কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া আবার চলিয়া গেল

ছবির যেন সোয়াস্তি নাই। একবার ওর কাছে, আবার তার কাছে এই করিয়াই দিন কাটায়। সারাদিন এঘর-ওঘর করে। কিযে চায় নিজেও হয়ত বোঝে না। জন্মের পর হইতেই মায়ের অসুখ, মায়ের স্নেহ যে কি—জানেও না। রস না পাইয়া তার ভিতরটা হয়ত শুকাইয়া মরে। স্নেহের নীড়ে স্থান না পাইয়া নিজকে কোথাও যেন জড়াইয়া রাখিতে পারে না। তাই বুঝি-বা ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়ায়।

বকুল বুঝিয়াও নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিত, ইচ্ছা হইলেও কিছু করিতে পারিত না। মাঝে মাঝে ডাকিত, "ছবি এস ত, আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও।"

ছবি মায়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দিত।

বকুল ছবির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিত। চোখ ভরিয়া জল আসিত, বলিত, "এখন যাও, আবার এসো।"

ছবি চলিয়া না যাইয়া কি করে?

বকুল স্বামীকে বলিত, "এই কি আমার কপালে

ছিল? উঃ, আমার কষ্ট যদি বুঝতে, মেয়েটা মা মা করে, আর আমি! কিন্তু আমি—আমি কি করব? আমার কি সাধ্য আছে! তোমরাই আমাকে শেষ করলে, তোমাদের সংসারেই আমি ফুরিয়ে গেলুম—তারপর নিজের দিকে একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া বলিত, "ইস, কি হ'য়ে গেছি!"

স্বামী বলিত, "কি কর্‌ব,—আমাদের অদৃষ্ট, না হ'লে কি এমন হয়!"

মা বলিতেন, "তাতে আর কি হয়েচে—ভাল হ'লেই চেহারা সেরে যাবে। ছিঃ, তার জন্তে কি কাঁদে?"

বকুল বলিত, "হাঁ, আর হয়েছে, বুঝতেইত পাচ্ছি। কত আশাই ছিল, কিন্তু হ'ল কই! আর মিছে কেন বল"—কণ্ঠ ধরিয়া যাইত, চোখে জল আসিত আর বলিতে পারিত না। প্রবল কাশিতে অস্থির হইয়া পড়িত।

কাশিটা খুব বাড়িয়াছিল। রাতদিন কেবল ঐ থক্-থক্—থক্-থক্—রাত্রিতে ঘুম হয় না। সারারাত্রি এপাশ ওপাশ করিতে করিতেই কাটিত। একটু ঘুম আসে ত কাশি আসিয়া তন্দ্রাটুকুও ভাঙিয়া যায়। সন্ধ্যা হইলেই তার ভয় হইত, বলিত,—"কালরাত্রি আস্‌চে! আমি আর পারি না। অসহ্য—"

সারারাত্রি বিনিদ্র কাটাইলে সকালবেলার দিকে চোখ আপনি বুজিয়া আসে। কিন্তু ঘুমাইবার যো নাই। দিনের জাগরণে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া গৃহস্থের কোলাহল সুরু হয়,—আর তন্দ্রা টুটিয়া যায়।

পিসীমার সোরগোলে বাড়ীতে যেন হাট বসিত। ঠাকুর চাকরের একটুও ত্রুটি হইবার সাধ্য নাই। চীৎকার করিয়া বলেন, "ঠাকুর, তোমার দিন দিন কি বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাচ্ছে? বলি এক—কর্‌বে আর, সারাদিন তোমার পেছন পেছন থাকতে পারি তবে হয়! আমারও ত একটা পেট আছে। ষোল আনা ক'রে তবে ত খেতে হবে! যত মরণ হয়েছে আমার—"

চীৎকার শুনিয়া ছবি ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিত। ভ্রূ কোঁচকাইয়া পিসীমার সাদা কাপড়ের আঁচলটা টানিয়া বলিত, "চুপ কর দিদিমণি, চেঁচিও না, মার ঘুম ভেঙে যাবে। অসুখ করেচে, জান না?"

পিসীমা ছবির কথায় বিরক্ত হইতেন। ফিরিয়া যাইতে যাইতে বলিতেন, "আহা লো—দরদী আমার! নে,—ছাড় কাপড়। এত করি-ধরি তবুও কারুর মন পাই না। এতটুকু মেয়ে সেও বল্‌তে ছাড়ে না, কপাল আর কি—" তারপর আপন মনে আরও কি বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতেন।

কথাগুলি বকুলের কান পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছাইত। বুকে গিয়া কঠিন হইয়া বাজিত। কিন্তু কি আর করিবে! মেয়ে নিরুপায়!—সামর্থ্য নাই বলিয়াই মেয়েটাকে কাছে রাখিতে পারে না। নয়ত তার বুকের ধন, সেই-ই বুকে করিয়া রাখিত। কিন্তু সে বাঁচিয়া থাকিতেই তার সন্তান সকলের কাছে তুচ্ছ হইয়া যাইবে, ইহা যেন সহ্য করিবার নয়। ছবিকে ডাকিত, "ছবি, আয় আমার কাছে আয়—"

ছবি তখন তার মাসী বেলার সহিত কথা বলিতেই ব্যস্ত। পিসীমার কথাগুলি মুখভঙ্গী করিয়া বলিতে তাহার বড় উৎসাহ।

ছবির ভাব দেখিয়া তার মাসী হাসিত। ছবির দুই গাল শক্ত করিয়া ধরিয়া একবার মুখে আবার গালে লাগাইয়া বলিত, "পাকা মেয়ে—"

ছবি বিরক্ত হইত। নিজেকে ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করিত; কিন্তু পারিত না। বেলা আরও জোরে চাপিয়া ধরিত। কিন্তু আদরের আতিশয্য ছবি সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিত। বেলা ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিত। ছবিকে ভুলাইতে চেষ্টা করিত। কিন্তু কিছুতেই ছবির আর কান্না থামিত না।

আবার নূতন একটা গোলযোগ বাধিয়া যাইত। কান্না শুনিয়া পাশের ঘর হইতে ছবির বাবা নরেন ছুটিয়া আসিত। বিরক্তভাবে ছবিকে বলিত, "কি—রে—কি—হয়েচে, কাঁদ্‌ছিস কেন? আয়—এদিকে আয়—আমার আর সহ্য হয় না—"

ছবি তার বাবার কাছে গিয়া বলিত, "মাসী আমায় মেরেছে।"

বেলা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িত, বলিত, "চেপে ধ'রে আদর কচ্ছিলাম—তাই কাঁদছে—"

নরেন অসন্তুষ্ট হইত। মুখখানা একটু কেমন করিয়া বলিত, "তোমাদের কারুরই কোনো খেয়াল নেই—বাড়ীতে রোগী, অথচ সারাদিন হৈ-চৈ লেগেই আছে।"

নরেন ছবিকে লইয়া চলিয়া যাইত।

বেলা একলা ঘরে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিত। ভ্রূ দুইটি সঙ্কুচিত হইয়া আসিত, দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিত।

দূরে বকুলের কাতরকণ্ঠ শুনিতে পাইত। খুব যেন বেদনার সহিত বলিতেছে, "হা ভগবান—আমার মরণও হয় না—তুমি কেন আবার গেলে"… …আর কিছু বুঝা যায় না।

সন্ধ্যা।

সন্ধ্যার বিবর্ণ পাণ্ডুর আলোতে আকাশ ও পৃথিবী ঝাপ্‌সা হইয়া আসে। দূরের পাহাড় ও মাঠের শেষের গাছগুলি একাকার হইয়া একটা কালো রেখার মত দেখাইতে থাকে। নদীটা অন্ধকারের বুকে গা ঢাকা দিয়াছে। বকুলের বিশাল পৃথিবীও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত।

বাহির হইতে নিজেকে টানিয়া আনিয়া আপনার ক্ষুদ্র পৃথিবীতে গুটাইয়া লইত। সে পৃথিবীতে আশা নাই—উৎসাহ নাই—কিছু নাই।

ব্যাধি-জর্জ্জরিত দেহের বিষাক্ত কীট বাহিরে বিচরণ করে, আর কোন্ অদৃশ্য জ্বালা কীটের চেয়েও তীব্র হইয়া অন্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে।

নরেন জানালা বন্ধ করিয়া দিল। বকুল বলিল, "ওটা আবার খোলা রাখ্‌লে কেন—ওটাও বন্ধ কর—"

—"না, থাক্ ওটা,—তুমি ঘুমোও" বলিয়া নরেন শিয়রের কাছে বসিয়া পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

বকুল তবুও ছট্‌ফট করিতে করিতে বলিল, "আর পারি না—এর চেয়ে মৃত্যুও আমার ভাল—"

নরেন বলিল, "ছিঃ- ওকথা বোলো না। আবার ভাল হয়ে যাবে—আবার সংসার করবে। ভাল হ'য়ে ওঠ—তারপর তুমি যা বল্‌বে—তাই করব।"

দরকার? কিন্তু আমাকে নিয়ে তুমি কতদিন আর বসে থাক্‌বে—তুমি যাও, বসে থাক্‌লে তোমার যে—"

—ক্ষতি হবে? হোক। তবু তুমি ভাল হয়ে ওঠ। তোমার চেয়ে আজ আমার আর কিছুই বড় নয়।

তারপর দুইজনেই চুপ। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। বকুলের একটু তন্দ্রা আসিতেছে। নরেন তন্দ্রাচ্ছন্ন মুখের পানে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল।

মা আসিয়া বলিলেন, "তুমি শোওগে নরেন, একটু ঘুমিয়ে নাও, ততক্ষণ আমি বসি।

নরেন উঠিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল। ঘরে জানালা দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল, বাহিরের দিকে তাকাইয়া নরেন দেখিল, একাদশীর চাঁদ উঠিয়াছে, মাঝে মাঝে এক এক খণ্ড মেঘ আসিয়া চাঁদটাকে আড়াল করিয়া দেয়, আবার সব ম্লান হইয়া যায়। ভাবে—এম্‌নি করিয়াই হয়ত মৃত্যু জীবনকে আড়াল করিয়া ফেলে, মুখের হাসি ম্লান করিয়া দেয়।

নরেন ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু দুশ্চিন্তায় ঘুম আর আসে না। দিনের অস্পষ্ট চিন্তাগুলি অন্তরে নানা রেখাপাত করিতে থাকিল। বকুলের মৃত্যু যেন চোখের সুমুখে পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছে। অন্তরে প্রবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। বকুলের মৃত্যুর জন্য কে কতখানি দায়ী অন্তর দিয়া সে বিচার করিতে গিয়া পারে না। কেবল অস্বস্তিতে এপাশ ওপাশ করিতে থাকে।

রাত্রি ন'টা বাজিল। ছবিকে লইয়া ছোক্‌রা চাকরটি অনেকক্ষণ বাহির হইয়াছে—আর ফিরে নাই।

পিসীমা কেবলই ঘর বাহির করিতেছেন। বার-বার বলিতে থাকেন, "কোথায় রে বেলা, মহীক্ক ত এখনও ছবিকে নিয়ে এলো না, তোরা আর ওকে একদণ্ড ঘরে দেখ্‌তে পারিস্ না,—রোজই বের করে দেওয়া চাই।"

বেলা পিসীমার কথা গ্রাহ্য করে না। বাহিরে আসিয়া বসিয়া পড়িল। এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিল। কি ভাবনা তার কে জানে?

ছোট্ট উঠানে লোহার তারে তখনও কাপড়গুলি

যায়। জ্যোৎস্নাটা নিস্তেজ রোদের মত, তারই পানে তাকাইয়া বেলা বসিয়া রহিল।

একটু বাদেই ছোক্‌রা-চাকরটা ছবিকে অতিকষ্টে লইয়া আসিল। ছবি ঘুমে চাকরটার কাঁধে এলাইয়া পড়িয়াছে।

বেলা বলিল, "সর্ব্বনাশ করেছিস মহীরু—ওকে ঘুম পাড়িয়েছিস্? পিসীমা যে—"

কথা শুনিবার মত ধৈর্য্যও চাকরটার নাই। তাড়াতাড়ি বলিল, "হেই দিদিমণি, ধর, ধর—বাব্বাঃ—"

বেলা ছবিকে লইয়া পিসীমার কাছে গেল।

পিসীমা ছবিকে দেখিয়াই রুষ্ট হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "যা ভেবেচি—হ'লও তাই। বিকেলে কিছু খাওয়াইনি, ভেবেচি সন্ধ্যেবেলাই একেবারে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখব। আমি পারব না—এত বারণ করি, অসময়ে বের করিস্ না—কারুর যেন গ্রাহ্যই হয় না।"

বেলা বলিল "বাঃ—আমি কি জানি? জামাই-বাবুই ত বল্লেন—"

"বল্লেন ত,—কিন্তু এখন?—এখন জাগাতে গেলেই ত মেয়ে সাত বাড়ী এক করবে! আমি পারব না—থাক—"

শুনিয়া নরেন বিছানায় উঠিয়া বসিল। ভাবিল, কি করিবে! উঠিতে কুণ্ঠায় ও সঙ্কোচে বাধে।

পিসীমাই ছবিকে কোলে বসাইয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন, "ছবু—ছবু, যাও, ভাত খেয়ে এসোগে—ওঠো—ওঠো।"

অনেক বলিতে বলিতে ছবির ঘুম ভাঙিল। পিসীমা বলিলেন, "যাও—ভাত খেয়ে এসো। শম্ভু নিয়ে যাও। খাইয়ে হাতমুখ ধুইয়ে—জামাটা ছাড়িয়ে দিয়ে যেও।"

শম্ভুঠাকুর 'হু' করিয়া ছবিকে লইয়া চলিয়া গেল। খাইতে বলিলেই যত নটখটি লাগে। তাহার উপর আবার ঘুমের চোখ। শম্ভু গ্রাস তুলিয়া ছবির মুখের কাছে ধরিতেই ছবি মুখ ঘুরাইয়া বসে। একবার বলে, "খাবি না"—আবার বলে, "হাত দিয়ে খাব—বাবা খাইয়ে দেবে"—এমন আরও কত কি বলিতে থাকে। কিছুই তাহার পছন্দ হয় না।

পিসীমার বড় অস্বস্তি বোধ হয়। আপন মনেই বলিতে বলিতে উঠিলেন, "নাঃ—মেয়েটার জ্বালায় আর পারা গেল না।" শেষে রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "খা শিগ্‌গির—পাজী মেয়ে! সব সময়ে কেবল মতলব,—টেনে ফেলে দেব।"

ছবি দুইহাতে শম্ভুর কাপড় শক্ত করিয়া ধরিল। ঠোঁট দুটি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল।

পিসীমা বলিলেন, "জোর করে খাইয়ে দাও, শম্ভু।"

শম্ভু খাওয়াইতে যাইতেই ছবিও চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বেলা ছবির কান্না শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। বলিল, "ছবি কাদ্‌চে কেন শম্ভু—"

পিসীমা রাগ করিয়া জবাব দেন, "কাঁদ্‌চে—আমি মেরেছি—একটু কান্না তোদের সহ্যি হয় না ত তোরা এসে খাইয়ে দিলেই পারিস্—"

বেলা বলিল, "তাই বলেছি না কি? দিদির ঘুম ভেঙে যাবে—দেখবেন, জামাইবাবু এখুনি এসে পড়বেন। আমার কি!"

পিসীমা আপন মনেই বলিলেন,—"তা আসুক—"

সত্যই নরেন উঠিয়া আসিল। রান্নাঘরে আসিয়া শম্ভুকে গম্ভীর স্বরে বলিল, "সরে বোসো শম্ভু—আমি খাইয়ে দিচ্ছি ছবিকে।"

পিসীমা মোলায়েম স্বরে বলিলেন, "তুমি আবার এলে কেন নরেন, সারাদিন পরে এই একটু শুয়েছ—"

নরেন রুক্ষস্বরে জবাব দিল, "আমি না এলে আবার কিছু হয় না কি? সব কাজেতেই দেখি আপনারা একটা গোলমাল বাধিয়ে নেন। আমার জন্যে কিছু নয়। সারাদিন পরে এই ত একটু ঘুমিয়েছে। যদি জাগে—তাহ'লে?"

—রোগীর ঘুমইত সব চেয়ে বড় ওষুধ।

পিসীমার রাগে দুঃখে মুখ লাল হইয়া উঠিল। কতক্ষণ পর্য্যন্ত মুখে কোনো কথা যোগাইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিতে সুরু করিলেন, "ওকে ত কেউ কিছু বলেনি—তবু ও কেন তোমাদের

অমন ধারা বিশ্বেস হয়? আর একটু কেঁদে উঠলেই সবাই দৌড়ে আস। আমি কি মারি?"

বকুলের অনেকক্ষণ তন্দ্রা ভাঙিয়া গিয়াছে। উৎকর্ণ হইয়া সবই সে শুনিল, কিন্তু চুপ করিয়া রহিল।

সন্তানের জন্য মায়ের অন্তর কাঁদিয়া ওঠে কিন্তু নিরুপায় মাতার চোখের জলেই সব শেষ হইয়া যায়। ভাবিতে ভাবিতে দম আট্‌কাইয়া আসে—আবার কাশি ওঠে। কাশির শব্দে নরেন ছবির খাওয়া ফেলিয়াই উঠিয়া আসিয়া বকুলের কাছে বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কষ্ট হচ্চে?"

বকুল বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে জবাব দিল, "আমার কষ্ট কে বুঝবে? কেন আর জিগেস কর—" বলিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে পাশ ফিরিয়া মুখ লুকাইয়া শুইল।

নরেন অপরাধীর মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মৃত্যুর ম্লানছায়া গাঢ়তর হইয়া আসিল। ডাক্তার, কবিরাজ, সন্ন্যাসী, ঠাকুরদেবতা সকলেই পরাস্ত হইল। সবাই বোঝে কোন আশাই নাই। কঙ্কালসার দেহখানি বিছানার সঙ্গে একেবারেই যেন মিশিয়া গিয়াছে—চোখ-ছুটির উজ্জ্বলতা আরও বাড়িয়াছে। হঠাৎ দেখিলে যেন কি রকমই মনে হয়—একটু ভয় ভয়ও করে।

সারাদিন কেবল অনর্গল বকে—বকিয়াই যায়। বলে, "কি নিষ্ঠুর গো—উঃ একটু কষ্টও হয় না? এ কেমন লোক!" বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলে, কাঁদিয়া বলে, "মাগো আমায় কোথায় পাঠিয়ে দিলে,—এখানে আমি থাক্‌তে পারব না—না—না—না—তারপর যেন স্বামীর উদ্দেশেই বলে, "ওগো, তুমি অমন কোরো না, সত্যি বল্‌ছি আমাকে ভুল বুঝো না—" যাহারা কাছে বসিয়া থাকে তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না।

ছবি গিয়া মায়ের কাছে দাঁড়ায়। একটু গায়ে একটু মাথায় হাত দেয়।

নরেন বলে, "ছবি, ওঘরে যাও। এখন বিরক্ত কোরো না।"

বকুল বলে, "থাক্ না ও—"

—না বিরক্ত করবে।

ছবি একদিকে চলিয়া যায়। কিন্তু গিয়াও থাকিতে পারে না। বার-বার দুয়ারের কাছে মুখ বাড়াইয়া দেখে, কি দেখে, সে-ই জানে, হয়ত তার সমস্ত অন্তর ওই ক্ষুদ্র দেহের ভিতর হইতে বাহির হইয়া মায়ের শয্যাপার্শ্বে পড়িয়া থাকিতে চায়, তাড়াইলেও যায় না।

বকুল এক-একবার তার পানে তাকায়, ছবি শুই একটি দৃষ্টিতেই যেন আত্মহারা হইয়া ওঠে। নিষেধ-মানা ভুলিয়া গিয়া আবার আগাইয়া আসে, বকুল হাত বাড়াইয়া বোধ করি বা তার হাতখানি ধরিতে চেষ্টা করে, কিন্তু শিথিল হাতখানি ঝরাফুলের মত বিছানায় পড়িয়া যায়, হতাশায় বুকের ভিতর কান্নার সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠে, ভাবে, আর হয়ত দেরি নাই! মৃত্যুর হিমস্পর্শ একটু একটু করিয়া দেহে ছড়াইয়া পড়িতেছে—কখন্ এক সময় সর্ব্বাঙ্গ একেবারে শীতল ও নিস্তরঙ্গ করিয়া রাখিয়া যাইবে।

ভাবিতেও যেন কষ্ট হয়, এত তাড়াতাড়ি! এখনও ত আশা মিটে নাই।—অপূর্ণতার বেদনা সারা বুকেই যেন খচ্‌খচ্ করিয়া বিঁধিতেছে। প্রভাতের প্রথম অরুণোদয়ে প্রভাতীর সুরেই কি বিদায়-সঙ্গীত গাহিয়া যাইতে হইবে? কিন্তু এই যে তৃণাঙ্কুর পৃথিবীর আঙ্গিনায় একটি ছুটি পাতা মেলিয়া শ্যামশষ্পের সারিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে ফেলিয়া কিছুতেই যে যাওয়া চলে না!··কিন্তু যাইতেই হয়!—ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় কিছু আসে যায় না।

কঙ্কালসার ভগ্নদেহে কতদিনই বা প্রাণ থাকে। ছিন্নতারে তড়িৎশক্তি ধরিয়া রাখা যায় না।

বকুলের প্রাণ যাই-যাই করিয়াও যায় নাই। রোগের যন্ত্রণা, অত্যাচারের মত প্রতিক্ষণ দুঃসহ বেদনা দিয়াই চলিয়াছে, এ যন্ত্রণার চেয়ে মৃত্যুও হয়ত বাঞ্ছনীয়। এ যেন কোন্ এক অকরুণ বিচারকের দণ্ডদান।—অসহ্য! হাত পা অবশ হইয়া গিয়াছে। চৈতন্য মাঝে মাঝেই লোপ পায়। এক-একবার স্বামীর দিকে তাকায়, আবার এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। দিনরাত্রি কি যেন ভাবে, কি যেন দেখে। অচৈতন্য অবস্থায়

বলে, "ছবি, আয়, আমার কাছে আয়" কণ্ঠ অত্যন্ত ক্ষীণ। কথাও খুব অস্পষ্ট। কাতরানির মত শোনায়। বলে, "এই শেষ। ওগো শুনচ—" স্বামীর দিকে তাকাইয়া বলে, "তোমাকেই বলচি,—অনেক কষ্ট দিলুম। অনেক—অনেক। কি করব—উপায় নেই, আমাকে—আমাকে তোমরা ক্ষমা কোরো।"

কাশি উঠিয়া দম বন্ধ হইয়া যায়। কাশিটা থামিয়া গেলে স্বামীর দিকে তাকাইয়া শুধাইল, "আমাকে ক্ষমা করতে পারনি? কেন? ক্ষমা কি নেই? ওগো, আমি বড্ড কষ্ট পেয়ে যাচ্ছি—তোমরা আমায় ক্ষমা কোরো—ক্ষমা—"

তারপর মুখখানা দুবার একবার বাঁকাইল।

নরেন হতাশ হইয়া পাগলের মত স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

মা বুকভাঙা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "বকুল—বকুল,—ও কি? কি হ'ল?"

ছবিও সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মা—মা—মাগো—"

কান্নাকাটি শুনিয়া পাড়ার মেয়েরা ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিল। কে যেন ছবিকে সেখান হইতে জোর করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

... ...

পরদিন ছবি ফিরিয়া আসিল। প্রশ্ন করিল,—"আমার মা কোথায় গেল?"

তার বাবা বুঝাইয়া বলিল, "তোমার মা মন্দিরে পূজো দিতে গেছে,—আবার আসবে—"

ছবি হয়ত তা'ই বোঝে। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। আবার ঘুরিয়া আসিল। বলিল, "মাসী, তোমরা অত কাঁদচ কেন?"

বেলা কিছুই জবাব দিল না।

ছবি পুনরায় প্রশ্ন করিল, "মাসী—ও মাসী—মাকে তোমরা দরজা বন্ধ ক'রে রেখেচ? মার খিদে পেলে কি হবে? দরজা খুলে দাও—খোল শিগ্‌গির—খোল—"

তারপর চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল,—"খুলবে না?" নিজে দরজাটায় জোরে ধাক্কা দিয়া, বলিল, "মা—মা—ওমা!"

সকলেই বিষণ্ণদৃষ্টিতে ছবির দিকে তাকাইয়া রহিল। মা ত আর সাড়া দিল না, বিরক্তও হইল না একটু।

মহিলা-সংবাদ

পাটনার প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়সবালের কন্যা শ্রীমতী ধর্ম্মশীলা কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যে এম্-এ পরীক্ষা দেন। তাহাতে তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। যখন তিনি এম্-এ পরীক্ষা দেন, তখন তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর। তিনি বাড়ীতে পড়াশুনা করিয়া বি-এ পর্য্যন্ত পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ হন। বিবাহের পর তিনি এম্-এ দেন। সম্প্রতি তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্যে উচ্চতম উপাধি লাভ করিবার জন্য এবং ব্যারিষ্টার হইবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার পিতা পাটনায় ব্যারিষ্টারী করেন। বিহার প্রদেশ শিক্ষালাভের জন্য ইংলণ্ড গিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিহারের নারীদের মধ্যে শ্রীমতী ধর্ম্মশীলাই প্রথম ইংলণ্ড যাইতেছেন।

শ্রীমতী অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ ১৯২৩ সনের ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯২৫ এর আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সপ্তম ও পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯২৭এ বি-এ পরীক্ষায় গণিতে অনার্স পাইয়া ১৯২৯ এ ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; পরে ইউনিভার্সিটি 'ল' কলেজে প্রথমবার্ষিক শ্রেণীর স্কলার্শিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করিয়া এই বৎসর ষ্টেট্ স্কলার্শিপ পাইয়া ইংরাজী

শ্রীমতী অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

শ্রীমতী ধর্ম্মশীলা জায়সবাল, এম-এ

শ্রীমতী শান্তি দাস, এম-এ

শ্রীযুক্তা অশোকলতা দাস

অক্সফোর্ড হইতে প্রেরিত স্কলার্শিপ টেষ্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার পর অক্সফোর্ডে ইহার স্থান হইয়াছে। ইনি হাওড়ানিবাসী মুন্সেফ শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা।

শ্রীযুক্তা অশোকলতা দাস ও তাঁহার কন্যা শ্রীমতী শান্তি দাস, এম-এ, উভয়েরই সত্যাগ্রহের জন্য চারি মাস করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

জনৈক সাবেক লাটের মিথ্যাবাদিতার নমুনা

যাহারা জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কথা বলে না, সত্য যাহাদের নিকট উপস্থাপিত করিলে যাহারা চোখ বুঝিয়া থাকে না, তাহাদের সঙ্গে তর্ক করা চলে। কিন্তু যাহারা ইচ্ছা করিয়া অন্ধ, অথবা—তার চেয়েও খারাপ—চোখ খুলিয়া রাখিয়া সাদাকে কাল ও কালকে সাদা বলে, তাহাদের সহিত তর্কযুক্তি পণ্ডশ্রম মাত্র। তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার একমাত্র উপায় বিরুদ্ধশক্তি প্রয়োগ দ্বারা তাহাদিগকে শক্তিহীন করা। আমরা অহিংসা-ব্রতী বলিয়া অবশ্য কেবল অহিংসশক্তি প্রয়োগেরই সমর্থন করি।

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের একজন সাবেক লাট লর্ড মেস্‌টন বিলাতী সেই দলের লোক যাহারা সাদাকে কাল ও কালকে সাদা বলিতে সমর্থ। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অশান্তির কারণ সম্বন্ধে এই সাবেক লাট-পুঙ্গব কণ্টেম্পোরারী রিভিউএর আগষ্ট সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন—

"Our offence is not this or that political formula, but our whole democratic conception of national life. Any project which promises to fasten that conception on India will be fought with every available weapon—reason, unreason, polished expostulation, revolutionary violence. For what faces us in India now is nothing less than orthodox Hinduism at bay. Its power and its ingenuity are equally formidable; and we have to make up our minds whether we are to yield or to join issue," তাৎপর্য্য। এই বা ঐ রাজনৈতিক সূত্র আমাদের অপরাধ নহে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধে আমাদের সমগ্র গণতান্ত্রিক ধারণাই আমাদের অপরাধ। যে-কোন পরিকল্পনা ঐ ধারণাকে ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবে বলিয়া মনে হইবে, তাহারই বিরুদ্ধে সর্ব্ববিধ অধিগম্য অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করা হইবে ; যথা—বুদ্ধি, অপবুদ্ধি, মার্জ্জিত অনুযোগ বা বাদানুবাদ, বৈপ্লবিক দৌরাত্ম্য। কারণ, এখন যাহা ভারতবর্ষে [বিরোধীভাবে] আমাদের সম্মুখীন, তাহা কোণঠাসা নিরুপায় অথচ আমাদের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইতে বাধ্য গোঁড়া হিন্দুয়ানী। ইহার শক্তি ও ইহার চাতুর্য্য সমান ভয়াবহ ; এবং আমাদিগকে এখন স্থির করিতে হইবে, যে, আমরা ইহার নিকট হার মানিব, না ইহার বিরোধিতা করিব।"

মেস্‌টন এদেশে সাধারণ সিবিলিয়ান ছিলেন ; দীর্ঘ কাল চাকরী করিয়া শেষে আগ্রা অযোধ্যা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হন। সুতরাং অজ্ঞতা তাঁহার মিথ্যা উক্তির কারণ নহে। তিনি জানিয়া শুনিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞ বিলাতী জনসাধারণকে ভ্রমে ফেলিবার জন্য মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার অপরাধ অমার্জ্জনীয়।

তিনি বলিতে চান, ব্রিটেন ভারতবর্ষে গণতন্ত্র অর্থাৎ ভারতীয় সমুদয় লোকদের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে চা[য়], কিন্তু গোঁড়া হিন্দুয়ানী তাহাতে বাধা দিতে[ছে]; ইহাই অশান্তির কারণ। ইহার প্রত্যেকটা কথাই মিথ্যা। ভারতীয় সকল প্রধান রাজনৈতিক দলের লোকেরা গণতন্ত্র চাহিতেছে, স্বরাজ চাহিতেছে ; তাহাদের মধ্যে মতভেদ অবান্তর বিষয়ে, মূল বিষয়ে সকলে একমত। স্বরাজের বিরোধিতা করিতেছে ভারতপ্রবাসী ও বিলাতী ইংরেজরা এবং তাহাদের গোলাম কতকগুলি ভারতীয়। ইংরেজরা নিজেদের প্রভুত্ব ও বাণিজ্যপ্রাধান্য রক্ষা করিতে চায়, কোন প্রকার ভারতীয় গণতন্ত্র চায় না।

অশান্তি ঘটিয়াছে কিসের জন্য ? কংগ্রেস সত্যাগ্রহ করিয়াছে বলিয়া। কংগ্রেস কি চায় ? পূর্ণস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র চায়, এবং সাবালক পুরুষ ও স্ত্রীলোক মাত্রকেই ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত নিরক্ষর নির্বিশেষে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দিতে চায়। কংগ্রেস হিন্দু মহাসভা নহে, যে, সত্যাগ্রহকে গোঁড়া হিন্দুদের সৃষ্ট অশান্তি বলিবে ; বরং কংগ্রেসে হিন্দু মহাসভার কোন কোন বিষয়ে মতভেদ আছে। হিন্দুদের ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল আছে, সনাতনধর্ম্ম মহাসভা আছে। তাহাদেরও সহিত কংগ্রেস অভিন্ন বা একমত নহে।

অশান্তিটা হিন্দুরাই জন্মাইয়াছে বা জীয়াইয়া রাখিয়াছে বলাও মিথ্যা কথা। সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টা সম্পর্কে বড় ছোট অনেক অহিন্দু নেতা এবং কর্ম্মীও জেলে গিয়াছেন।

গোঁড়া হিন্দুয়ানী অশান্তির জন্য দায়ী বলিলে অদ্ভুত মিথ্যা কথা বলা হয়। কংগ্রেসের সত্যাগ্রহী হিন্দু-নেতাদের মধ্যে একমাত্র পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়কে গোঁড়া বলিলেও বলা যাইত; কিন্তু তিনি এই সেদিন মাত্র সত্যাগ্রহ-প্রচেষ্টায় যোগ দিয়াছেন, এবং "খাঁটি" গোঁড়াদের মতে তিনিও যথেষ্ট গোঁড়া নহেন। কারণ, সকলেরই মনে আছে, তিনি সকল জাতির হিন্দুকে মন্ত্র দেওয়ায় "খাঁটি" গোঁড়ারা তাঁহার গায়ে পাঁক ও কাদা ছুঁড়িয়াছিল।

ইংরেজরা ভারতবর্ষে গণতন্ত্র স্থাপিত করিতে চায় এবং তাহাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত বিপ্লবীরা বোমা গুলি প্রভৃতি দ্বারা দৌরাত্ম্য করে, ইহা নিতান্ত গাঁজাখুরি মিথ্যা কথা। লর্ড মেস্টনের মাতৃভাষায় প্রচলিত একটা কথা অনুসারে শয়তানকেও তাহার ন্যায্য পাওনা দেওয়া উচিত। বিপ্লবীদিগকেও তাহাদের ন্যায্য পাওনা দেওয়া উচিত। প্রতিহিংসা ছাড়া তাহাদের অপকর্ম্মের যদি অন্য কোন উদ্দেশ্য—রাজনৈতিক উদ্দেশ্য—থাকে, তবে তাহা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা। তাহাদের কাজের দ্বারা অবশ্য এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু উদ্দেশ্যটা ইহার বিপরীত নহে।

—

মুসলমান ভারতীয় ও অন্যান্য ভারতীয়

আমাদের বিরোধীরা চায়, আমরা সব ভারতীয় একমত হইয়া একাগ্রতার সহিত তাহাদের শত্রুতা বিফল করিতে না পারি। এইজন্য তাহারা বার-বার বলিয়া আসিতেছে সমুদয় মুসলমান ভারতীয়দের রাজনীতি অন্য সব ভারতীয়দের রাজনীতি হইতে পৃথক্। কিন্তু প্রত্যহ নানা ঘটনা এইরূপ উক্তির অসত্যতা প্রমাণ করিতেছে। আব্বাস তৈয়্যবজী, আনসারী, আবুল কালাম আজাদ, শৈফুদ্দিন কিচলু, শেরওয়ানী, প্রভৃতি বড় বড় মুস্লিম ভারতীয় নেতা জেলে গিয়াছেন। বিহারে দুইজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলা দণ্ডিত হইয়াছেন। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশেই সকলের চেয়ে ওঁছা রকমের অনেক মুসলমান বাস করে। কিন্তু বঙ্গেও অনেক মুসলমান বাঙালী সত্যাগ্রহ উপলক্ষে জেলে গিয়াছেন। পাঠানপ্রধান উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সত্যাগ্রহ উপলক্ষে অনেক পাঠান হতাহত ও বন্দী হইয়াছেন। তথাকার বন্নু শহরে সত্যাগ্রহী পুরুষদিগকে শহর হইতে তাড়াইয়া দিয়া ফাটক বন্ধ করিয়া দেওয়ায় তথাকার মুসলমান মহিলারা মদের দোকানে পিকেটিং করেন। ৫ই আগষ্টের খবরে জানা যায়, একদল মহিলা গ্রেপ্তার হওয়ায় আর একদল তাঁহাদের স্থানে কাজ করিতেছেন। বোম্বাইয়ে ঊষা কীর্ত্তনের দলকে "প্রভাতফেরী" বলে। আজকাল প্রভাতফেরীরা প্রাতঃকালে জাতীয় সঙ্গীত গাইয়া বেড়ায়। সেদিন একদল মুসলমান মহিলার প্রভাতফেরী প্রাতঃকালে রাস্তায় রাস্তায় জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

সর্ব্বশেষ যে-ঘটনা মুসলমান ভারতীয়দের ভারতীয়ত্ব প্রমাণ করিয়াছে, তাহা এই, যে, বর্ত্তমান ভারতীয় কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির মধ্যে নূতন অর্দ্ধেক সভ্য মুসলমান এবং সভাপতি মুসলমান। ইহার আগেকার দুজন সভাপতিও ছিলেন মুসলমান। বর্ত্তমানে ভারতীয় কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সভ্যদিগের নাম—কার্য্যকারী অস্থায়ী সভাপতি লক্ষ্ণৌয়ের য়্যাডভোকেট খালিক্ উজ্ জমান, লক্ষ্ণৌয়ের ব্যারিষ্টার পণ্ডিত হরকরণ নাথ মিশ্র, বোম্বাই ক্রনিক্লের সম্পাদক সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেল্‌ভী, কোষাধ্যক্ষ বোম্বাইয়ের বেলজী নাপ্‌পু, রাজমহেন্দ্রীর কে ভি আর স্বামী, বীজাপুরের এস্ ভি কৌজাল্গী, এলাহাবাদের এ এম্ খ্বাজা, অমৃতসরের ইস্মাইল গজনভী, কলিকাতার শরৎচন্দ্র বসু, পাটনার অধ্যাপক আবদুল বাকী, দিল্লীর আসফ আলী, দিনাজপুরের মৌলানা আবদুল বাকী। তদ্ভিন্ন কমিটির যে তিন জন সভ্য গ্রেপ্তার হইতে বাকী ছিলেন তাঁহারাও সভ্য; যথা কাশীর ডক্টর শ্রীভগবান দাস, এলাহাবাদের শ্রীমতী কমলা নেহরু এবং বোম্বাইয়ের শ্রীমতী হংসা মেহতা। জমায়েত উল উলেমা মুসলমান ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞদিগের কেন্দ্রীয়

সভা। তাহার সভাপতি মুফতী কিফায়েৎউল্লা এবং সম্পাদক মৌলানা আহমদ সাইয়েদ ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডাঃ আনসারীকে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা কংগ্রেস কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটিতে কাজ করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তখন সকল নূতন সভ্যের নিয়োগ হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য ডাঃ আনসারী বলেন, তাঁহারা ইহার পরের কমিটিতে সভ্য নিযুক্ত হইবেন।

অতএব, মুসলমান ভারতীয়দের রাজনীতি অন্যান্য ভারতীয়দের রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, ইহা সত্য নহে।

—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুমুসলমান ছাত্র

ঢাকা-হলের বার্ষিক পত্র "শতদলে"র ভূমিকায় প্রভোষ্ট শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন :—

"এই বৎসরের আর একটি ঘটনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের দাঙ্গার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু-মুসলমান ছাত্রেরা একযোগে তিনরাত্রি শহরে শান্তিরক্ষায় সাহায্য করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুমুসলমান ছাত্রদের মধ্যে কোনও মনোমালিন্য ছিল না। এতে আশা হয় যে, সুশিক্ষার গুণে ও পরস্পরকে বন্ধুভাবে জানবার সুযোগ পেলে আমাদের দেশের এই কলঙ্ক শীঘ্রই দূরীভূত হ'বে।"

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অজিতনাথ ভট্টাচার্য্যের পৈশাচিকভাবে প্রাণবধের বৃত্তান্ত সকলের গোচর করেন। এই অজিতনাথের মৃত্যুর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু-মুসলমান ছাত্রেরা সম্মিলিতভাবে সাত দিন অনধ্যায়ের সঙ্কল্প করে।

—

ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহের অবস্থা

ভারত-গবর্ন্মেণ্ট প্রতি সপ্তাহে অহিংস আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টার অবস্থা সম্বন্ধে একটি মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই মন্তব্যগুলি পরে পরে সাজাইয়া পড়িলে দেখা যাইবে, সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টা ভারত-সরকারের মতে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতেছে। এইরূপ মন্তব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অন্য কতকগুলি সরকারী জ্ঞাপনী ছাপা হইতেছে যাহা হইতে জানা যায়, কোন-না-কোন অর্ডিন্যান্স নূতন নূতন জেলায় জারী ও প্রয়োগ করা হইতেছে। অর্ডিন্যান্সগুলি সত্যাগ্রহ-প্রচেষ্টার প্রাণবধ করিবার জন্য প্রণীত হইয়াছে। সুতরাং নূতন নূতন স্থানে কোন-না-কোন অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করার মানে সেই সব জায়গায় সত্যাগ্রহ বাঁচিয়া আছে এবং তাহাকে পিষিয়া ফেলা দরকার। তাহা হইলে কতকগুলি প্রশ্ন উঠিতেছে :—(১) যে-সব নূতন জায়গায় কোন অর্ডিন্যান্স জারী হইতেছে, সেখানে আগে সত্যাগ্রহ ছিল কি না? (২) যদি ছিল, তাহা হইলে আগেই সেখানে অর্ডিন্যান্স প্রযুক্ত হয় নাই কেন? (৩) যদি আগেই ছিল না, এখন সত্যাগ্রহ নূতন করিয়া সেখানে দেখা দিতেছে, তাহা হইলে ইহা সত্য কি না, যে, সত্যাগ্রহ সব জায়গায় মরিতেছে না, কোথাও কোথাও রক্তবীজের মত গজাইতেছে? (৪) যদি আগে সেই সব জায়গায় ছিল, তাহা হইলে আগেই তথায় অর্ডিন্যান্স জারী না করিয়া এখন জারী করিবার কারণ কি এই, যে, এখন সেখানে সত্যাগ্রহ প্রবলতর হইতেছে? (৫) যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে কি, যে, অনেক জায়গায় সত্যাগ্রহ প্রবলতর হইতেছে? (৬) যদি এই অনুমান সত্য না হয়, যদি ইহাই সত্য হয়, যে, ঐসব জায়গায় আগে হইতে সত্যাগ্রহ ছিল ও আগে প্রবল ছিল, এখন দুর্ব্বল ও ম্রিয়মাণ হইতেছে, তাহা হইলে ম্রিয়মাণের, অর্দ্ধমৃতের, উপর অর্ডিন্যান্সঅস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন কি? যাহা নিজেই মরিতেছে, তাহাকে খোঁচাইয়া কতকটা জীবিতবৎ করিয়া তুলিবার আবশ্যক কি?

অথবা ইহার মধ্যে গূঢ় রাজনৈতিক বিচক্ষণতা থাকিতেও পারে। সত্যাগ্রহ যখন যেখানে প্রবল থাকে তখন তাহাকে তথায় আঘাত করিলে প্রতিক্রিয়াবশতঃ তথায় কর্ম্মীদের মধ্যে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইতে পারে এবং নূতন কর্ম্মীও জুটিতে পারে। কিন্তু যখন উহা কোথাও খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন আঘাত করিলে জীবনীশক্তির হ্রাসবশতঃ কোন প্রতিক্রিয়া হয় না, তখন উহার মরণ নিশ্চিত। এইরূপ ভাবিয়া কি গবর্ন্মেণ্ট নূতন নূতন জায়গায় কোন-না-কোন অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করিতেছেন?

সমস্তই অনুমান, ঠিক কিছুই বলিতে পারি না। কারণ, খবরের কাগজগুলিকে—বিশেষতঃ বঙ্গে—দরকারী খবর-বিহীন করিয়া তুলায় কোন একটা বেসরকারী-সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে যথেষ্ট উপকরণ নাই। প্রত্যেক জায়গায় স্থানীয় সত্যাগ্রহীরা অবশ্য সেখানে সত্যাগ্রহের অবস্থা জানেন।

—

কংগ্রেস কমিটিগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করা

একদিকে, সত্যাগ্রহ দুর্ব্বল হইতেছে, এই কথা বলিয়া অন্যদিকে নূতন নূতন জায়গায় অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করা যেমন হেঁয়ালির মত বোধ হয়, তেমনি আর একটা হেঁয়ালি সরকারকর্ত্তৃক ঘোষিত সত্যাগ্রহের ক্রমবর্দ্ধমান দুর্ব্বলতার সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটি, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি এবং জেলা কংগ্রেস কমিটি-সমূহকে ক্রমে ক্রমে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা। মহাত্মা গান্ধী যে-দিন লবণ-আইন ভঙ্গ করিতে সঙ্কল্প করেন, যে-দিন নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি অহিংস আইনলঙ্ঘন অনুমোদন করেন, যে-দিন মহাত্মাজী লবণ প্রস্তুত করেন, যেদিন তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আরও হাজার হাজার লোক লবণ প্রস্তুত করে, যে-দিন নানা প্রদেশে বেআইনী লবণ বিক্রী হয়, যে-দিন অর্ডিন্যান্সের নিষেধসত্ত্বেও মদের দোকানে ও বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ হয়, যে-দিন অরণ্য-আইন ভগ্ন করা হয়, যে-দিন চৌকীদারী ট্যাক্স দিতে কোথাও লোকে অস্বীকার করে, যে-দিন নিষেধসত্ত্বেও লোকে সভা করে ও মিছিল বাহির করে—ইহার মধ্যে কোন্ তারিখে কংগ্রেস বেআইনী সমিতি ছিল না, বৈধ সমিতি ছিল? যাহা অনিষ্টকর, তাহাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার সমীচীনতা সম্বন্ধে নানা দেশে প্রবাদ আছে। সে প্রবাদ কি তাহা হইলে মানুষের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে?

হইতে পারে, গবর্ন্মেণ্ট প্রথমে ভাবিয়াছিলেন সত্যাগ্রহ অচিরে আপনা আপনিই মারা যাইবে, সেইজন্য প্রথমে কিছু করেন নাই। কিন্তু যখন উহা প্রবল আকার ধারণ করিল, নানা জায়গায় লাঠি ও গুলি চলিল, এবং তাহাতেও লোকে বাগ মানিল না, তখন কেন কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক ও জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলিকে সর্ব্বত্র যুগপৎ বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল না? এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর আমরা দিতে অসমর্থ এবং সরকার বাহাদুরের নিকট হইতেও পাইব না। কেবল অনুমান করা যাইতে পারে। এক অনুমান এই, যে, সত্যাগ্রহ বাস্তবিক দুর্ব্বলতর না হইয়া কোন-না-কোন আকারে (যেমন বিদেশীবর্জ্জনের আকারে) প্রবলতর হইতেছে বলিয়া সরকার খুব কড়া ব্যবস্থা করিতেছেন। আর এক অনুমান এই হইতে পারে, যে, উহা দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় উহাকে এখন আঘাত করিলে কোন প্রতিক্রিয়া হইবে না বলিয়া উহাকে মরণ-ঘা মারা হইতেছে।

—

রফা ও সন্ধির কথা এবং কংগ্রেসকে আঘাত

একদিকে পণ্ডিত তেজ বাহাদুর সাপ্রু ও শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম জয়াকর শান্তি স্থাপনার্থ কংগ্রেস-নেতাদের ও বড়লাটের মধ্যে রফা ও সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন, অন্যদিকে ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর সংখ্যায় কংগ্রেস-নেতাদিগকে জেলে পুরা হইতেছে। ইহাও এক রহস্য। এই দুটা চা'লের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যাইতেছে না। কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন, ব্যক্তিগতভাবে লর্ড আরুইন শান্তিস্থাপনপ্রয়াসী, কিন্তু তাঁহার শাসনপরিষদের অধিকাংশ সভ্য কড়া শাসনের পক্ষপাতী, তাঁহারা সন্ধি ও রফা চান না, কংগ্রেসকে পিষিয়া ফেলিতে চান, এবং তিনি তাহাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না; এইজন্য পরস্পর অসঙ্গত দুই রকমের ব্যবহার হইতেছে। ইহা যে নিশ্চয়ই অমূলক অনুমান তাহা বলিতে পারি না। আর একটা অনুমান এই:—জেলে অবস্থানকালে লণ্ডনের ডেলী হেরাল্ডের প্রতিনিধি মিঃ স্লোকুম্বের সহিত মূলাকাতে গান্ধীজী পুরা স্বাধীনতা না চাহিয়া স্বাধীনতার সার অংশ চাহিয়াছিলেন, তাহার পর জেলে যাইবার আগে মোতীলালজীও কতকটা ঐ রকম সর্ত্তের উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহাতে শাসনপরিষদের কড়া শাসনের

পক্ষপাতী সভ্যদের ধারণা হইয়া থাকিবে, যে, আরও অধিকসংখ্যক কংগ্রেসনেতাকে জেলে পাঠাইলে কংগ্রেস-পক্ষের স্বর আরও নরম হইবে এবং তাহাদের সন্ধিসর্ত্তও অ' . নরম হইবে, এইজন্য কড়া শাসন চালান হইতেছে। এই অনুমানও সম্পূর্ণ অমূলক না হইতে পারে।

যে অনুমানই, বা উভয় অনুমানই, সত্য বা অসত্য হউক, আমাদের বিবেচনায় শাসনকর্তাদের দু-একটা বিষয়ে ভ্রম হইতেছে। কংগ্রেসের নেতারা ভয়ে বা অন্য কারণে ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য আবশ্যক ন্যূনতম রাষ্ট্রিক অধিকারের কম কিছু চাহিবেন না, চাহিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহাদের উপর বেশী চাপ দেওয়া সুবিবেচনার কাজ নয়। আর একটা কথাও মনে রাখিতে হইবে। যে-কোন কারণেই হউক, নেতারা যদি এমন কিছু চান, যাহা কংগ্রেসওয়ালাদের অধিকাংশের মনঃপূত নহে, তাহা হইলে তাঁহারা নেতাদের সর্ত্তের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন। সেরূপ সাহস, স্বাধীন-চিত্ততা ও দৃঢ়তা তাঁহাদের অনেকের আছে। তাহা যদি ঘটে, তাহা হইলে দেশটা ঠাণ্ডা হইবে কেমন করিয়া? [১৯শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর প্রাতে লিখিত।]

—

হিংসাত্মক ও অহিংস সংগ্রামে কত সময় লাগে

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, তিনি ভারতবর্ষের জন্য স্বাধীনতার সার অংশ চান। অর্থাৎ তিনি দেশের জন্য এমন অধিকার চান, যাহা নামে স্বাধীনতা না হইলেও কার্য্যতঃ স্বাধীনতার সমতুল্য। নামে ও কাজে উভয়েই স্বাধীনতা পাইতে হইলে যতটুকু শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচয় দিতে হয়, নামটা বাদ দিয়া শুধু কার্য্যতঃ স্বাধীনতা পাইতে হইলে তার চেয়ে কম যোগ্যতার প্রমাণ দিলে চলিবে না। ভারতীয়েরা কিছু অল্প শক্তির পরিচয় দিলেও স্বাধীনতার সার অংশ পাইতে পারিবে মনে করা ভুল। কারণ, সার অংশটাই আসল জিনিষ, নামটা তত দরকারী নয়; "যেহেতু আমরা নামটা চাহিতেছি না অতএব, হে বিধাতা, কিয়ৎপরিমাণে-শক্তিহীন আমাদিগকে আসল জিনিষটা দিয়া ফেলুন"—

ইতিহাসে দেখা যায়, যে-সকল জাতি অতীতকালে স্বাধীন হইতে চাহিয়াছে তাহারা হিংসাত্মক যুদ্ধ করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীই ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম অহিংস-সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন, এবং দেশের সমুদয় প্রধান নেতা অহিংস চেষ্টার পক্ষপাতী। যে-সকল প্রধান নেতা কংগ্রেসের অবলম্বিত অহিংস সত্যাগ্রহ নীতি অবলম্বন করেন নাই এবং তাহার বিরোধী, তাঁহারা স্বরাজ লাভের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতে বলেন, তাহাও অহিংস। হিংসাত্মক চেষ্টার পক্ষপাতী ভারতীয়দের মধ্যে কেহ নাই, বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে কাজ করেন ও নিজেদের মত ব্যক্ত করেন, এরূপ নেতা ও অনুচরদের কেহই স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভের জন্য হিংসাত্মক চেষ্টা করিবার পক্ষপাতী নহেন।

কোন দলের বর্ত্তমান অহিংস চেষ্টা সফল হইবে কি না, বলিতে পারি না। আমরা কেবল ইহাই বুঝিতে চাহিতেছিলাম, যে, ঐ চেষ্টা সফল বা আপাততঃ বিফল হইতে কত সময় লাগিতে পারে। অবশ্য, ঐতিহাসিক নজীর হইতে এ বিষয়ে কিছু বলা যায় না। হিংসাত্মক স্বাধীনতা-যুদ্ধ সব স্থলে সমানকালব্যাপী হয় নাই। কিন্তু যদি মনে করা যায়, যে, অহিংস-সংগ্রাম হিংসাত্মক যুদ্ধ অপেক্ষা দীর্ঘকালব্যাপী হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা হইলে সেরূপ অনুমান অমূলক না হইতেও পারে। অবশ্য, অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট কংগ্রেসের অহিংস-যুদ্ধ ব্যর্থ করিয়া দিতে পারেন, কিম্বা উহা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতেও পারে।

কিন্তু হিংসাত্মক যুদ্ধ এবং বর্ত্তমান ভারতীয় অহিংস যুদ্ধের মধ্যে একটা প্রভেদ সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন। হিংসাত্মক যুদ্ধে বড় বা ছোট নানা শ্রেণীর সেনানায়ক এবং সাধারণ সৈনিকদিগকে বিপক্ষ যদি বন্দী করিতে চায়, কিম্বা অন্য কোনরূপে তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে অসমর্থ করিতে চায়, তাহা হইলে সাধারণতঃ অনায়াসে সে উদ্দেশ্য সফল হয় না। সে উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে বিপক্ষকে সাধারণতঃ যুদ্ধ করিতে

অহিংস-সংগ্রামে গবন্মেণ্ট ইচ্ছা করিলেই যত জন ইচ্ছা নেতাকে ও সাধারণ কর্ম্মীকে অনায়াসে বন্দী করিতে পারেন এবং করিতেছেন। "তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে চাই বা করিলাম", পুলিস এই কথা বলিবামাত্র যে-কোন নেতা বা সাধারণ কর্ম্মী বিন্দুমাত্রও বাধা না দিয়া ধরা দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও দিবেন। আদালতে বিচারের সময়েও তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থন করেন না। এই সব কারণে, যথেষ্টসংখ্যক জেল নাই, বর্ত্তমান জেলসকলে যথেষ্ট জায়গা নাই, নূতন যথেষ্টসংখ্যক জেল নির্ম্মাণ করিবার টাকা নাই, এবং বর্ত্তমান জেলসকলে ও পরে নির্ম্মেয় জেলসকলে যথেষ্ট জায়গা থাকিলেও সমুদয় সত্যাগ্রহী কয়েদীকে খাইতে পরিতে দিবার টাকা গবন্মেণ্টের নাই বলিয়াই সকল সত্যাগ্রহীকে গবন্মেণ্ট কারারুদ্ধ করিতে পারেন নাই। হিংসাত্মক যুদ্ধেও অবশ্য টাকার দরকার হয়; কিন্তু কেবল টাকার দ্বারা হিংসাত্মক যুদ্ধ চালান যায় না, অন্যান্য যাহা আবশ্যক তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতীয় অহিংস সংগ্রামে গবন্মেণ্ট জেল নির্ম্মাণ করিবার এবং জেলে কয়েদীদিগকে খাওয়াইবার টাকার জোগাড় করিতে পারিলেই সত্যাগ্রহী সকল নেতা ও অন্য কর্ম্মীদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া কাজের বাহির করিয়া ফেলিতে পারেন। টাকার জোগাড় হইলে পুলিসের লোক বাড়াইবার বা বর্ত্তমান পুলিসের লোকদের লাঠি চালাইবার কোনই দরকার হয় না। আমরা বিলাতী কাগজের মতামত পড়িয়া যাহা বুঝিতে পারি, তাহাতে মনে হয়, বিলাতের অধিকাংশ লোক ইহা চায় না, যে, আমরা হিংসাত্মক বা অহিংসাত্মক সংগ্রামে শক্তির পরিচয় দিয়া স্বরাজ পাই; আমরা ইংরেজের কাছে অনুগ্রহ চাহিলে সংখ্যায়-ন্যূন কতকগুলি ইংরেজ কিছু দিতে রাজী হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই কিছুও দিবার বাস্তবিক ক্ষমতা তাহাদের আছে কি না জানি না। যাহা হউক, ওরূপ কিছু জল্পনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল অবান্তর এই কথাটা বলিতে চাই, যে, ইংরেজ জাতি নিজেদের ধন-ভাণ্ডার হইতে ভারতে যথেষ্ট জেল নির্ম্মাণের জন্য ও তাহার ভাবী কয়েদীদের খোরাক পোষাকের জন্য যথেষ্ট টাকা ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিলেই অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে বর্ত্তমান সত্যাগ্রহীদিগকে কাজে অক্ষম করিয়া ফেলিতে পারে। তাহা হইলে, আমেরিকা ও অন্য কোন কোন দেশে লাঠি প্রয়োগের যে নিন্দা হইতেছে, ইংরেজদিগকে তাহাও আর সহ্য করিতে হয় না।

আমরা অবশ্য জানি, ভারতবর্ষ অর্জন ও স্বহস্তে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইংরেজ-জাতি দ্বারা এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে লব্ধ ধনই ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে, গ্রেট ব্রিটেনের ধনভাণ্ডারের টাকা ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু ইতিহাসে কেবল যে পুনরাবৃত্তিই হয়, তাহা নহে; নূতনও কিছু কিছু ঘটিতে পারে।

অথবা নূতন কিছু ঘটিবার কথাই বা ওঠে কেন? আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি স্বাধীন হইবার জন্য যখন ব্রিটেনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তখন ইংরেজ-জাতি উপনিবেশগুলির টাকার সাহায্যে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায় নাই, নিজেদের টাকার দ্বারাই চালাইয়াছিল। ভারতীয় অহিংস-সংগ্রামে ভারতীয়দিগকে অহিংস উপায়ে পরাস্ত করিবার জন্য আমরা যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছি, ইংরেজ-জাতিকে তাহার নিমিত্ত যাহা খরচ করিতে হইবে, আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে তার চেয়ে অনেক বেশী খরচ করিতে হইয়াছিল। আমাদের সঙ্কেত অনুযায়ী উপায় অবলম্বিত হইলে, ইংরেজ-জাতি অহিংস চেষ্টার বিরুদ্ধে অহিংস উপায় অবলম্বন করিলে, তাহাদের কোন নৈতিক অখ্যাতিও কেহ করিতে পারিবে না।

এই অহিংস সংগ্রামে ইংরেজের বা ভারতীয়দের জয় বা পরাজয় কত দিনে হইবে, তাহা অবশ্য কেহ বলিতে পারে না।

আমেরিকানরা স্বাধীনতা লাভের জন্য যে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে উভয় পক্ষেই অস্ত্রের ব্যবহার ও রক্তপাত হইয়াছিল; তাহা হিংসাত্মক যুদ্ধ। কিন্তু তাহা হিংসাত্মক হইলেও এবং তখনকার ব্রিটিশজাতি এখনকার চেয়ে কম ধন ও শক্তির অধিকারী হইলেও, যুদ্ধ অনেক বৎসর চলিয়াছিল। ১৭৭৫ সালের ১৯শে এপ্রিল এই

যুদ্ধ আরম্ভ হয়, এবং ১৭৮১ সালের ১৯শে অক্টোবর ইংরেজ-সেনাপতি কর্ণওয়ালিস আত্মসমর্পণ করার পর যুদ্ধের অবসান হয়। সন্ধি হইতে আরও দুই বৎসর লাগিয়াছিল। যাহা হউক, যুদ্ধ চলিয়াছিল সাড়ে ছয় বৎসর।

বিপক্ষকে কাবু করিতে পারিলে হিংসাত্মক সংগ্রামে জয়লাভ করা যায়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রবর্ত্তিত অহিংস সংগ্রামে সফলকাম হইতে চান, ইংরেজ-জাতি ও গবর্ন্মেণ্টের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন দ্বারা। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের এপর্য্যন্ত কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তিনি মনে করেন, সত্যাগ্রহীদের নানাবিধ দুঃখে ইংরেজ-জাতির হৃদয় দ্রবীভূত হইবে। কিন্তু ভারত-বর্ষের সমুদয় ঘটনার প্রকৃত সংবাদ ইংলণ্ডে না পৌছায়, অন্ততঃ শীঘ্র না পৌছায়, এই উপায়ে হৃদয় পরিবর্ত্তন হইবে কি না, অথবা কখন হইবে, বলা যায় না।

ভারতীয় উদারনৈতিক ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের লোকেরা সত্যাগ্রহ নীতি অবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা যুক্তিতর্কের দ্বারা ইংরেজকে বুঝাইয়া স্বরাজ পাইতে চান। যুক্তিতর্ক প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে; এপর্য্যন্ত ইংরেজকে কেহ ইহা বুঝাইতে পারে নাই, যে, ভারতবর্ষের স্বরাজ পাওয়া উচিত। যে অল্পসংখ্যক ইংরেজ ভারতবর্ষের স্বরাজ পাওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা বেসরকারী লোক। যখন বর্ত্তমান প্রধান-মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ড বেসরকারী লোক ছিলেন, তখন তিনি ভারতীয় স্বরাজের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তিনি ও তাঁহার দলের লোকেরা "গবর্ন্মেণ্ট" হইয়া পড়িবার পর আর বলিতেছেন না, যে, তাঁহারা ভারতবর্ষকে স্বরাজ দিবার জন্য নিশ্চয়ই পার্লে-মেণ্টে আইনের খসড়া পেশ করিবেন। অতএব তর্ক-যুক্তির পথে কখন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে, বলা যায় না।

সত্যাগ্রহ এবং তর্কযুক্তি ছাড়া আর একটা অহিংসাত্মক পথ আছে। তাহা ভিক্ষা। কিন্তু তাহাতে বিশ্বাসবান্ কোন ভারতীয় রাজনৈতিক দল আছে বলিয়া আমরা জানি না। ব্যক্তিগতভাবে কাহারও কাহারও এরূপ বিশ্বাস থাকিতে পারে। উদারনৈতিক দলের বিশ্বাস এইরূপ বলিলে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। তাঁহাদের প্রসিদ্ধতম নেতা শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শ[illegible] সেদিন বিলাতে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ট্রাব্ল ("trouble") উৎপন্ন না করিলে রাষ্ট্রিক উন্নতি লাভ করা যায় না। ট্রাব্লের মানে বিরক্ত উত্ত্যক্ত করা, অসুবিধায় ফেলা, কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি। তিনি ঠিক্ কি অর্থে উহা ব্যবহার করিয়া-ছিলেন জানি না, কিন্তু ইহা বলিয়াছিলেন, যে, বর্ত্তমান সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টা ঠিক্ রকমের ট্রাব্ল্ নহে; অথচ ঠিক্ রকমের ট্রাব্লটি যে কি, তাহা তিনি বলেন নাই। বিলাতী জিনিষ না কিনিলে ইংরেজদিগকে অসুবিধায় ফেলা হয় বটে। এই চেষ্টাকে কেহ হিংসাত্মক বলিতে পারেন না। কিন্তু বর্জ্জনকারীদের মনে ইংরেজ বণিকদের উপর রাগ থাকিলে ইহা আধ্যাত্মিক অর্থে সম্পূর্ণ অহিংসাত্মক না হইতে পারে—যদিও তাহা হইলেও সাধারণ অর্থে ইহা নিশ্চয়ই অহিংসাত্মক। বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের পথে চলিলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সিদ্ধি কত দিনে হইবে, বা চেষ্টার বিফলতা কত দিনে বুঝা যাইবে, কেহ বলিতে পারে না।

—

বিলাতীপণ্যবর্জ্জন ও স্বরাজ

কাহারও কথায় বা কাজে যদি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পায়, যে, স্বরাজ লব্ধ হইলেই বিলাতীপণ্যবর্জ্জন নীতি পরিত্যক্ত হইবে ও হওয়া উচিত, তাহা হইলে তিনি ভ্রান্ত। স্বরাজ লব্ধ হইবার পর "বয়কট" কথাটার ব্যবহার পরিত্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু স্বদেশী পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, ক্রয় ও ব্যবহার কখনও পরিত্যক্ত হইতে পারে না। এবং স্বদেশী যে-যে রকম জিনিষ কেহ কিনিবেন, তিনি বিদেশী সেই সেই রকম জিনিষ নিশ্চয়ই কিনিবেন না; সুতরাং স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার বিদেশী জিনিষ পরিহারের উল্টা পিঠ চিরকালই থাকিতে পারে। অতএব স্বরাজ পাইলেই আমরা স্বচ্ছন্দে খুব বিলাতী জিনিষ কিনিতে থাকিব, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ-ভাবে ইংরেজদের মনে এরূপ ধারণা জন্মান কাহারও উচিত নহে।

—

রাষ্ট্রীয় প্রগতির হিংস্র ও অহিংস পন্থা

কোন পত্রিকাসম্পাদক যদি বলেন, স্বরাজ লাভের ... হিংস্র পন্থা অবলম্বন করা উচিত, তাহা হইলে তাঁহার ...স্তি হইবে। আবার তিনি বা অন্য কোন সম্পাদক ... বলেন, ঐ উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ বা নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন ... অবলম্বন করা উচিত, তাহা হইলেও তাঁহার শাস্তি ...বে। প্রেস-সম্পর্কীয় অর্ডিন্যান্সে হিংস্র ও অহিংস ... উভয় উপায়কে কতকটা একই শ্রেণীতে ফেলা ...য়াছে। এইজন্য হিংস্র পন্থা হইতে কাহাকেও নিবৃত্ত ...রিবার নিমিত্ত, কোনও সম্পাদক তাহাকে অহিংস ...ত্যাগ্রহের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইবার চেষ্টা নিশ্চিন্ত মনে ...ত পারেন না। যদি এমন আইন হয়, যে, মদ ...ইবার জন্য কাহাকেও ঘোলের শরবৎ খাইতে ...তে পারিবে না, অর্ডিন্যান্সটা কিয়ৎপরিমাণে ...প। অবশ্য, উপমান ও উপমেয়ে সম্পূর্ণ মিল নাই। ...না, কাহাকেও মদ ছাড়িতে বলিলে অর্ডিন্যান্সের ...ট-সম্পর্কীয় ধারার কবলে পড়িতে হইতে পারে ...ট, কিন্তু শুধু শরবৎ পান করিতে বলিলে বোধ করি ...কান আইন লঙ্ঘিত হয় না।

যাহা হউক, হিংস্র পন্থার নিন্দা অবাধে ও অকপটভাবে করা যাইতে পারে। হিংস্র পন্থার বিরুদ্ধে আমরা আগে আগে অনেক কথা লিখিয়াছি। এখন আবার হিংস্র পন্থার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার কারণ, সম্প্রতি পুলিসের উচ্চ ও নিম্নপদের কয়েকজন কর্ম্মচারীকে মারিবার জন্য বোমা ও গুলি ছোঁড়া হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, দেশে এমন কতকগুলি লোক আছে যাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিম্বা গুপ্ত উত্তেজক চরের প্ররোচনাবশতঃ এইরূপ গর্হিত কাজ করিতেছে। এইরূপ অবৈধ কাজ করিবার কারণ ...না রকম হইতে পারে। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত প্রতি-হিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য কেহ ইহা করিতে পারে, কিম্বা কাহাকেও কোন লোকসমষ্টির পক্ষে আশঙ্কার কারণ অনুমান করিয়া ইহা করিতে পারে, অথবা সরকারী ...কদের মনে ভয় উৎপন্ন করিয়া স্বাধীনতা লাভ ...তে পারা যায় এইরূপ ধারণাবশতঃ কেহ কেহ এইরূপ কাজ করিতে পারে। এইরূপ অনুমান বা ধারণা কোনস্থলেই বিন্দুমাত্রও সত্য কি মিথ্যা, তাহার সহিত আমাদের এই আলোচনার কোন সম্পর্ক নাই।

সকল দেশেই অসভ্যতার যুগে যখন আইন আদালত ছিল না, তখন কেহ কাহারও দৈহিক বা অন্যবিধ অনিষ্ট করিলে অনিষ্টকারীকে শাস্তি দিবার ভার অত্যাচরিত উৎপীড়িত বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার আত্মীয়গণ লইত, এবং কেহ সাধারণভাবে অত্যাচারী মনে হইলেও তাহার শাস্তির জন্যও ব্যক্তিগত বা দলগত চেষ্টা হইত। কিন্তু সভ্যতার প্রগতিক্রমে যখন হইতে সভ্যদেশসমূহে আইন আদালত প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন হইতে শাস্তি দিবার ভার ব্যক্তির বা দলের হাত হইতে রাষ্ট্রের হাতে গিয়াছে, এবং তাহা ভালই হইয়াছে। শাস্তি দিবার ভার রাষ্ট্রের হাতে যাওয়ায় সকল রকমের সব অনিষ্টকারীর দণ্ড সব স্থলে হইয়া থাকে, কিম্বা যাহাদের দণ্ড হয় তাহারা সবাই দোষী, অথবা কেবল দোষীদেরই দণ্ড হয়, এমন নয়। কিন্তু, তাহা হইলেও, লোকস্থিতির জন্য, আইনের সাহায্যে আদালতের দ্বারা বিচারের পর যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। আইনের ও আদালতের দোষে যদি অনেক নিরপরাধ লোকের শাস্তি হয় এবং অনেক দুষ্টের শাস্তি হয় না দেখা যায়, তাহা হইলে শাস্তি দিবার ভার নিজেদের হাতে না লইয়া আইনের ও আদালতের পরিবর্ত্তন ও উন্নতির চেষ্টা করাই বিহিত। আইন আদালতের দোষত্রুটিবশতঃ যে-সব অপরাধীর শাস্তি হয় না, তাহাদের শাস্তির ভার বিশ্বের নিয়মের উপরও অর্পিত হইতে পারে। ব্যক্তিগত বা দলগত প্রতিহিংসার রীতিতে যে-সব দোষত্রুটি ঘটে, তাহার আলোচনা বা উল্লেখ খুব সংক্ষেপে করা যায় না।

ইহাও এখানে উল্লেখ করা দরকার, যে, দুষ্টের চারিত্রিক উন্নতিসাধন তাহাকে শাস্তি দিবার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, শাস্তিতত্ত্বজ্ঞদিগের মধ্যে এইরূপ মত প্রচলিত হইতেছে। সেইজন্য অনেক দেশে প্রাণ-দণ্ডের ব্যবস্থা উঠিয়া যাইতেছে। শাস্তি দিবার সরকারী ব্যবস্থা যখন প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে যাইতেছে, তখন তাহার বেসরকারী কোন উপায় সভ্যজগতের মতের গতির

বিপরীত হওয়া ভাল নয়। আপত্তিকারীরা অবশ্য বলিতে পারেন, ভারতবর্ষের সরকারী ব্যবস্থা এখনও এই মতের অনুযায়ী হয় নাই এবং এদেশে অনেক নিরপরাধ লোকও আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অন্য উপলক্ষ্যে হতাহত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা যাহাই হউক, আমরা শ্রেষ্ঠ যাহা তাহারই আলোচনা ও অনুবর্ত্তন করিতে চাই।

লৌকিক ব্যবহারে কোন জাতি বা কোন গবর্ন্মেণ্টের দ্বারাই এ পর্য্যন্ত শাস্ত্রের ও মহাপুরুষদের উচ্চতম উপদেশ পালিত হয় নাই। তথাপি তাহা পালনীয় মনে করি বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। মহাভারতে উপদেশ আছে, প্রেমের দ্বারা অপ্রেমকে পরাজয় করিতে হইবে; বুদ্ধদেবের উপদেশও তাই। যীশু খ্রীষ্টের উপদেশও সেইরূপ।

রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনার মধ্যে এইরূপ কথা তোলায় অনেকে হাসিবেন। কিন্তু হাসিলেও, মহাপুরুষেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া স্মরণ করিতে হইবে।

বিশেষ করিয়া তাহা স্মরণ করিতে হইবে এইজন্য, যে, জগতের ইতিহাসে এই প্রথম ভারতবর্ষে অহিংসার পথে স্বাধীনতালাভের চেষ্টা হইতেছে। মহাপুরুষদের বাণী মহাত্মা গান্ধীর জীবনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, এখন আর তাহা পুস্তকের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ নাই। সত্যাগ্রহ অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এবং হাজার হাজার সত্যাগ্রহী ভীষণ যন্ত্রণা সত্ত্বেও প্রতিশোধের চেষ্টা করেন নাই বলিয়া ভারতবর্ষ বিদেশে সম্মানিত হইতেছে। এবং ভারতবর্ষের আদর্শ সম্মানিত হইতেছে বলিয়াই আমাদের যাহারা বিরোধী তাহারা জগতকে ইহা বুঝাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে, যে, হিংসাত্মক কাজ ভারতে যাহা কিছু হইতেছে, তাহা সত্যাগ্রহীদের দ্বারাই হইতেছে। শ্রেষ্ঠ পথ যাহা, তাহা শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়াই অবলম্বনীয়। তাহার উপর, মহাত্মা গান্ধী যখন তাহার সাধ্যায়ত্ততা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, তখন তাহা আরও অবলম্বনীয়।

উপরে যাহা লিখিলাম, তাহা মহাপুরুষদের উপদেশ ও আচরণ অনুসারে লিখিলাম। নিজের সাধনা এবং জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এই সব কথা লিখিতে পারিলে অধিকতর তৃপ্তিলাভ করিতাম, এবং আরও জোরের সহিত কথা কহিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা পারিলাম না বলিয়া মহাপুরুষদের বাণী ও দৃষ্টান্তের মূল্য কম হইয়া যাইতে পারে না।

যাঁহারা আপনাদিগকে প্র্যাক্টিক্যাল মনে করেন, কাজ উদ্ধার কিসে হয় কেবল তাহাই দেখিতে চান, মহাপুরুষদের উপদেশ শুনিতে চান না, তাঁহারা বলিবেন, "অহিংস চেষ্টার দ্বারা দেশ স্বাধীন হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখান।" তাহার উত্তরে আমরা বলি, অতীত ইতিহাসে যাহা ঘটে নাই, তাহা ঘটিতে পারে না, কেন মনে করেন? দু-হাজার, এক হাজার, পাঁচশত, একশ, পঞ্চাশ বৎসর আগে যাহা ঘটে নাই, আজকাল সের অনেক ব্যাপার ঘটিতেছে। সুতরাং অহিংস চেষ্টা সফল হইবে না, অতীত ইতিহাস হইতে তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। যাহা করিতে চাই, আত্মা তাহাতে সায় দেয় কি না দেখুন। শান্ত সমাহিত ধীরভাবে চিন্তার দ্বারা যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিব, নিশ্চয়ই সেই পথে সিদ্ধিলাভ হইবে—যদিও তাহাতে বিলম্ব হইতে পারে।

যাঁহারা ঐতিহাসিক প্রমাণ চান, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, দু-এক জন, দু-দশ জন, বিশ-পঞ্চাশ জন বিদেশী বা স্বদেশী সরকারী কর্ম্মচারীকে বধ করিয়া কোনও পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা গিয়াছে, তাহার একটাও ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন কি? ইংরেজদের দৃষ্টান্তই ধরুন। তাহারা যত যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের অনেক সেনানায়ক ও সাধারণ সৈনিক মারা পড়িয়াছে। কিন্তু কোন যুদ্ধেই মৃত লোকদের স্থান পূরণের জন্য ভয়ে অন্য কেহ অগ্রসর হইতেছে না, এরূপ শুনা যায় নাই। ইংরেজরা অন্য জাতিদের চেয়ে সাহসী, বলিতেছি না। যে-কোন জাতি যুদ্ধ করে, তাহাদেরই অনেক লোক মরে, আবার মৃত লোকদের জায়গায় অন্যেরা আসিয়া দাঁড়ায়। ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে মারিয়া যাঁহারা ইংরেজ মহলে আতঙ্ক জন্মাইতে চান, তাঁহারা জানিবেন, ইংরেজ কর্ম্মচারীরা মনে করিবে

তাহারা "যুদ্ধক্ষেত্রে আছে এবং তদনুরূপ সতর্কতা ও সাহস অবলম্বন করিবে। ইংরেজরা শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়াই এরূপ ধারণা করিতে পারিবে, তাহা নয়। সরকারী বাঙালী কয়েকজন লোকেরও ত এপর্য্যন্ত ভীতি-উৎপাদক (টেরারিষ্ট) দলের হাতে প্রাণ গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের জায়গায় কাজ করিবার জন্য বাঙালীর অভাব হয় নাই। অতএব ভয় জন্মাইয়া কাজ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত যদি কেহ বোমা বা গুলি ছোঁড়েন, তিনি জানিবেন তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। অবশ্য, ভীতি-উৎপাদক দলে এমন লোক থাকিতে পারেন, যাঁহারা ফলাফলের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না, কেবল প্রতিহিংসার দ্বারাই চালিত হন। তাঁহাদিগকে শুনাইবার মত "কেজো" যুক্তি কিছু নাই। শাস্ত্রের ও মহাপুরুষদের বাণী আগেই শুনাইয়াছি। কেবল একটা কথা বলিবার আছে। বোমা ছুঁড়িলে প্রায় দু একজন নিরপরাধ লোক হত বা আহত হয়, গুলিতেও তাহা হইতে পারে। এবং তাহা অপেক্ষাও শোচনীয় ব্যাপার এই যে, এইরূপ প্রত্যেক ঘটনার পর অপরাধী আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত বিস্তর নিরপরাধ লোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং অনেককে প্রহার ও তদপেক্ষা দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যাহারা বধের চেষ্টা করে, তাহারা স্বয়ং হত হইলে বা আত্মহত্যা করিলেও তাহাদের দলে কেহ ছিল কি না আবিষ্কার করিবার চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টার ফলে বিস্তর নিরপরাধ লোক যন্ত্রণা ভোগ করে। এই সব কথার আধুনিক দৃষ্টান্ত পাঠকেরা সংবাদপত্রে পড়িয়াছেন।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, হিংসাত্মক যুদ্ধ দ্বারা অনেক পরাধীন দেশ স্বাধীন হইয়াছে, এবং অনেক লোক হিংসাত্মক যুদ্ধের বিরোধী হইয়া থাকিলেও যুদ্ধ ও যুদ্ধের আয়োজন পরিত্যাগ এপর্য্যন্ত কোন মহাজাতি করে নাই। যেরূপ হিংসাত্মক যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে, তাহার আয়োজন ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় হইতে পারে কি না, বলিবার মত জ্ঞান আমাদের নাই; কিন্তু ভীতি-উৎপাদক দলের সেরূপ আয়োজন নাই, তাহা সকলেই জানে।

হিংসাত্মক যুদ্ধ দ্বারা স্বাধীন হইবার মত অবস্থা ভারতবর্ষের হইলেও, অহিংস চেষ্টা অন্য কোন কোন কারণে বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। স্বাধীনতার জন্য হিংসা করিলেও হিংসা হিংসাই, তাহা মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ নহে। সুতরাং তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়—বিশেষতঃ যখন অন্য পথ রহিয়াছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্যও মানব-প্রকৃতির কোন অমূল্য সম্পদ্ বিসর্জন দেওয়া উচিত নয়। হিংসাত্মক যুদ্ধ করিলে অপর পক্ষের প্রতিহিংসা-বৃত্তি উত্তেজিত হয়, সুতরাং তাহাকে প্রতিহত করিবার জন্য নিজেদের প্রতিহিংসা-বৃত্তিকেও প্রবলতর করিবার চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু প্রতিহিংসায় অন্যের চেয়ে বড় হওয়াটা আমরা ভারতবর্ষের আদর্শ মনে করি না। অহিংস সাহসে, আধ্যাত্মিক শৌর্য্যে শ্রেষ্ঠ হওয়াকেই আমরা ভারতবর্ষের আদর্শ মনে করি। বোম্বাইয়ের এস্‌প্ল্যানেডের মাঠ হইতে অপ্রতিরোধী সত্যাগ্রহীদিগকে তাড়াইবার নিমিত্ত পুলিসের লাঠির "ন্যূনতম বল" প্রয়োগের বর্ণনা শিকাগো ডেলী নিউসে পড়িয়া আমেরিকার ক্রিশ্চিয়ান্ সেঞ্চুরী নামক বিখ্যাত কাগজ লিখিয়াছেন, 'পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচ্য আধ্যাত্মিক শৌর্য্যের গায়ে ঠেকিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে।' আধ্যাত্মিক শৌর্য্যে আমরা সকল জাতির অগ্রণী হইতে চাই।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় যুদ্ধের দ্বারা স্বাধীন হইতে হইলে তাহার বিরুদ্ধে বলিবার মত আর একটা কথা আছে। ভারতবর্ষের যে-সব প্রদেশ এবং প্রত্যেক প্রদেশের যে-সব শ্রেণীর লোক জ্ঞানে ধর্ম্মে কৃষ্টিতে (কালচ্যারে) সভ্যতায় অগ্রসর, তাহারা সৈন্যদল হইতে দীর্ঘকাল বাদ পড়ায় যুদ্ধের জ্ঞান তাহাদের নাই। অতএব এখন যুদ্ধের দ্বারা স্বাধীন হওয়া সম্ভব হইলে এমন সব লোকের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে, যাহারা মানব-প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ অনেক গুণে অগ্রণী হইবার যোগ্য নহে। তাহাদের প্রাধান্যে দেশ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক হিসাবে পিছাইয়া পড়িবে ও প্রকৃত স্বাধীনতা হারাইবে। কিন্তু অহিংস উপায়ে স্বাধীন হইবার চেষ্টার নেতা গান্ধীজীর মত শ্রেষ্ঠ পুরুষ, এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথের পথিক অন্য অনেকে। তাহাতে দেশের নৈতিক আধ্যাত্মিক কোন ক্ষতি নাই। অথচ যুদ্ধের যে প্রধান প্রশংসা সাহসিকতা এবং যে-কোন মুহূর্ত্তে প্রাণ দিবার জন্য প্রস্তুত থাকা, তাহা সত্যাগ্রহে আছে। যুদ্ধে হিংসা ছাড়া প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, চুরি, লুট, নারীর উপর অত্যাচার আছে; সত্যাগ্রহে তাহা নাই।

অতর্কিতে কাহাকেও মারিয়া ফেলিবার চেষ্টাকে যুদ্ধের সহিত, এমন কি খণ্ডযুদ্ধেরও সহিত, তুলনা করা আর এক কারণে চলে না। বড় রকমের যুদ্ধ এবং খণ্ডযুদ্ধ প্রায়ই আগে ঘোষিত হয়, এবং কথায় বা কাজে ঘোষিত হইবার পর উভয় পক্ষের নেতা কে, কেন যুদ্ধ হইতেছে, ইত্যাদি বিষয় জানিতে বাকী থাকে না। কিন্তু অতর্কিতে কাহাকেও মারিবার আগে, বা পরেও, যুদ্ধঘোষণা হয় না; কাহার নেতৃত্বে কি কারণে এই প্রকার বধ-চেষ্টা হইতেছে, তাহাও জানা পড়ে না।

সুতরাং বড় যুদ্ধে ও খণ্ডযুদ্ধে সাহসের পরিচয় যেরূপ পাওয়া যায় অতর্কিত বধ-চেষ্টায় সেরূপ পাওয়া যায় না।

—

ঢাকা উপদ্রবের সরকারী তদন্ত

গত মে ও জুন মাসে অনেকদিন ধরিয়া ঢাকায় অরাজকতা অপেক্ষা অধম যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সরকারী তদন্ত করিবার জন্য গবর্মেণ্ট দুজন সিবিলিয়ানকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দুজন সরকারী কর্ম্মচারীর দ্বারা তদন্তের ব্যবস্থায় সর্ব্বসাধারণ সন্তুষ্ট হয় নাই—ঢাকার হিন্দুরা ত হয়ই নাই, তাঁহারাই সকলের চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এইরূপ তদন্তের ব্যবস্থা হওয়ায় অনেকে প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছেন, ইহা চুণকামের বন্দোবস্ত। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পড়িয়া মনে হয়, যাঁহারা রিপোর্টের দ্বারা ঢাকার অপকর্ম্মসকল চুণকাম করা হইবে অনুমান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনুমান সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। রিপোর্টটা বস্তুতঃ তাহা অপেক্ষাও অনিষ্টকর।

যে-সব ব্যাপার হিন্দু ও মুসলমানের ঝগড়া বলিয়া প্রকাশ পায়, তাহার সম্বন্ধে আমাদের কিছু লিখিতে ইচ্ছা হয় না। তাহার একটা কারণ, অনেক ঝগড়া স্বাভাবিক নয়, দুষ্টলোক কৃত্রিম উপায়ে ঝগড়া বাধাইয়া দেয়। কিরূপ উপায়ে বাধাইয়া দেয়, তাহা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় না, বর্ত্তমান অবস্থায় হইতেও পারে না।

তদন্ত কমিটি রিপোর্টে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, যে, সব সাক্ষ্য তাঁহারা শুনেন নাই বা পান নাই। বস্তুতঃ অনেক লোক, কমিটির দ্বারা নিরপেক্ষ তদন্ত হইবে না বলিয়া, সাক্ষ্য দেয় নাই। সাক্ষ্য লইবার প্রণালীও পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। অথচ এইরূপ অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া কমিটি পুলিস ও শাসক-দিগকে নির্দ্দোষ বলিয়াছেন, শুধু নির্দ্দোষ বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের গুণগান ও কৃতিত্ব ঘোষণা করিয়াছেন, মুসলমানদের দোষ ওকালতী দ্বারা যতটা সম্ভব ক্ষালন করিবার বা কমাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সমস্ত দোষ হিন্দুদের উপর—বিশেষতঃ যাহারা কংগ্রেসওয়ালা ও সত্যাগ্রহের সমর্থক তাহাদের উপর—আরোপ করিয়াছেন। যতগুলি হিন্দু বাড়ী আক্রমণের ও তাহাদের বন্দুক কাড়িয়া লইবার অভিযোগ কমিটির গোচর হইয়াছিল, সবগুলিই কমিটি উড়াইয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ কমিটির মতে হিন্দুরা সর্ব্বদোষাকর—তাহারা যে মোটের উপর মুসলমানদের চেয়ে ধনী ও তাহাদিগকে টাকা ধার দিতে সমর্থ, এটাও তাহাদের একটা দোষ।

আমরা যাহা লিখিতেছি, অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের প্রতিলিপি পড়িয়া তাহা লেখা। ঐ কাগজে রিপোর্টটি আদ্যোপান্ত বাহির হইয়াছে কি না, জানি না। মূল রিপোর্ট গবর্মেণ্ট আমাদিগকে দেন নাই। উহার সঙ্গে সমুদয় সাক্ষ্য প্রকাশিত হইয়াছে কি না, জানি না। কমিটি কি সাক্ষ্য পাইয়াছিলেন, তাহা না জানিলে রিপোর্ট সাক্ষ্যের অনুযায়ী হইয়াছে কিনা বলা যায় না। আমরা দু এক জনের লিখিত সাক্ষ্যের নকল পাইয়াছিলাম। তাঁহারা গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারী। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কাহারও কাহারও লিখিত জবানবন্দী হইতে অনেক বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এই সকল সাক্ষ্যের সহিত রিপোর্টের মিল নাই।

রিপোর্টটা যে নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, তাহা দেখান কঠিন নয়। কিন্তু তাহা দেখাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা খুব সুযুক্তিপূর্ণ কিছু লিখিলেও গবর্মেণ্টের সিদ্ধান্ত ও কাজে একচুলও তফাৎ হইবে না। বাকী থাকে সর্ব্ব-সাধারণ। হিন্দুদিগকে বুঝাইবার আবশ্যক নাই, যে, রিপোর্টটা পক্ষপাতদুষ্ট ওকালতী। মুসলমানদের মধ্যেও কতক লোকের ধারণা সেইরূপ হইতে পারে। বাকী মুসলমানেরা বুঝিবে না, যে, তাহাদের কোন দোষ ছিল। এ অবস্থায় রিপোর্টটার সব দোষত্রুটি দেখাইবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক ও বিড়ম্বনামাত্র। তাহা করিতে গেলে রিপোর্টটার চেয়েও লম্বা কিছু একটা লিখিতে হইত। অনর্থক এত সময় ও এতগুলা পৃষ্ঠা নষ্ট করিতে চাই না।

সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে কমিটি যে দুজনকে দোষ দিয়াছেন, তাঁহারা দুজনেই দেশী লোক। তাঁহারা কিন্তু পুলিশ ও শাসন বিভাগের বড় কর্ত্তা নহেন। বড় কর্ত্তা ইংরেজ—সুতরাং তাঁহাদের দোষত্রুটি অবহেলা হইতেই পারে না। নিন্দিত দুজন দেশী কর্ম্মচারীর মধ্যে একজন পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি নন্দী পরিবারকে ঢাকা হলে পৌঁছাইয়া দেন। এটা যে একটা দোষ, তাহা অবশ্য রিপোর্টে কমিটি লেখেন নাই। আমরা ঢাকার উপদ্রব সম্বন্ধে যে-সব চিঠি বাংলায় ও ইংরেজীতে ছাপিয়াছিলাম, তাহাতে ছিল, যে, একজন পুলিশ কর্ম্ম-চারীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "আপনি কেন দাঙ্গাকারীদের উপর গুলি চালান নাই?" তাহাতে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, "আমার উপরওয়ালা উপস্থিত ছিলেন এবং গুলি চালান নাই; সুতরাং আমি কি প্রকারে গুলি চালাইতে পারি?" ইনি কোন্ পুলিস কর্ম্মচারী? একজন নাকি বলিয়াছিলেন, "আপনারা ত জানেন, কাহার প্ররোচনায় এই সব ব্যাপার ঘটিতেছে।"

কে এই কথা বলিয়াছিলেন? এইরূপ গুরুতর কথা বলার জন্য তিনি তিরস্কৃত বা দণ্ডিত হইয়াছেন কি?

রিপোর্টটা পড়িলে এই ধারণা হয়, যে. ভবিষ্যতেও কোন উপদ্রব হইলে লোকে—বিশেষতঃ হিন্দুরা—ধনপ্রাণ রক্ষার নিশ্চিত আশা করিতে পারে না। আমরা সম্ভবতঃ নিরপেক্ষ লোক নহি। সেইজন্য, রিপোর্টটার কোন নিরপেক্ষ পাঠকেরও এইরূপ ধারণা হয় কি না, জানিতে ইচ্ছা করি।

রিপোর্টের হিন্দু ও মুসলমান পাঠকদের প্রতি আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপেই বলিতেছি। হিন্দুদের বিরুদ্ধে অনেক কথা লেখা হইয়াছে। হিন্দুরা তাহা শান্তভাবে পাঠ করুন। তাঁহাদের যত দোষ দেখান হইয়াছে, তাহার মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহা সংশোধন করিতে হিন্দুরা চেষ্টা করুন। ভীরুতা, কপটতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার আশ্রয় না লইয়া মুসলমানদের সহিত সদ্ভাবে বাস করিতে চেষ্টা করুন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের মনে মুসলমানদের উপর সন্দেহ ও বিদ্বেষ আছে, তাঁহাদের সন্দেহ ও বিদ্বেষ মহাভারতের উপদেশ অনুসারে হিতৈষণা দ্বারা দূর করিতে চেষ্টা করুন। এবং কে ছোট কে বড়, তাহা ভুলিয়া গিয়া একতা ও সাহসের দ্বারা সমুদয় আততায়ী হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে চেষ্টা করুন। মনে করিবেন না, কেবল মুসলমানই বা মুসলমান মাত্রেই আততায়ী।

মুসলমানদের প্রতি আমাদের যাহা বক্তব্য তাহাও সংক্ষেপে বলিতেছি, যদিও সঙ্কোচের সহিত বলিতেছি। রিপোর্টে তাঁহাদের সব দোষ ক্ষালন করিবার বা কমাইবার চেষ্টা বরাবর করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে কম দোষই দেওয়া হইয়াছে—প্রায় হয় নাই বলিলেই চলে। তাঁহারা বস্তুতঃ এতটা নির্দ্দোষ কি না, তাহা তাঁহারাই স্থির করুন। যদি কিছু দোষ হইয়াছে মনে করেন, তাহা হইলে তাহা সংশোধনের চেষ্টা করুন। দোষ হইয়া থাকিলে, ইংরেজরা নির্দ্দোষ বলিলেই দোষ-মুক্ত হওয়া যায় না। কাহারও দোষ হইয়া থাকিলে, ইংরেজরা যাহাই বলুক, দোষের ফল ফলিবেই। কমিটির রাজনৈতিকবুদ্ধিপ্রসূত রিপোর্টে কেহ দোষী বা নির্দ্দোষ হউন বা না-হউন তাহাতে কিছু আসে যায় না। বাস্তবিকই কেহ দোষী বা নির্দ্দোষ, তাহাই তাঁহার নিজের ভাবিয়া দেখা দরকার। হিন্দুদিগকে যেমন ও যেভাবে মুসলমানদের সহিত সদ্ভাবে বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছি, মুসলমানদিগকেও সেইরূপ অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারাও হিতৈষণার দ্বারা হিন্দুদের সন্দেহ ও বিদ্বেষ দূর করিতে চেষ্টা করুন। সমুদয় আততায়ীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা তাঁহারাও করুন; মনে করিবেন না, কেবল হিন্দুই আততায়ী বা হিন্দুমাত্রেই আততায়ী।

কমিটি নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন, ঢাকায় কয়েকদিন আইন ও শৃঙ্খলা ছিল না। কেন ছিল না? অশেষ প্রশংসিত প্যাক্সব্রিটানিকা বা ব্রিটানিকী শান্তি কোথায় গিয়াছিল? হিন্দু দোষী বা মুসলমান দোষী, অথবা উভয়েই দোষী হইলে কে বেশী দোষী, তাহা সকলের চেয়ে গুরুতর কথা নয়। সকলের চেয়ে গুরুতর কথা এই, যে, ঢাকা দীর্ঘকাল অরাজক ছিল। ইহার জন্য কে দায়ী? মেদিনীপুর জেলার অতি অজ্ঞাত কোন গ্রামে রাজনৈতিক কিছু একটা ঘটিলে স্বয়ং পুলিস ইন্‌স্পেকটার জেনারাল সদলবলে অতি শীঘ্র উপস্থিত হইতে পারেন, আর বঙ্গের দ্বিতীয় রাজধানী ঢাকায় এতদিন ধরিয়া লুটখুন গৃহদাহ মারপিট অবাধে চলিতে পারিল, যথেষ্ট পুলিস ছিল না বা শীঘ্রই বাহির হইতে আসিয়া পৌছিল না, ইহা কিরূপ কথা?

—

ব্রিটিশ রাজত্বে অবনত শ্রেণীর অবস্থা

ইংরেজরা যে-সকল কারণে ভারতবর্ষের প্রভুত্ব ছাড়িয়া দিতে চান না, তাহার মধ্যে একটা কারণ এই বলেন, যে, ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপিত হইলে অবনত শ্রেণীর লোকদের বড় দুর্গতি হইবে, "উচ্চ" জাতির লোকেরা তাহাদের উপর উৎপীড়ন করিবে, তাঁহারাই (ইংরেজরাই) অবনত শ্রেণীর লোকদের বন্ধু ও সহায়। ইংরেজপক্ষের এই যুক্তির ও স্বরাজ্যবিরোধী অন্য সমুদয় যুক্তির উত্তর আমরা অনেকবার দিয়াছি। ভারতে ও বিদেশে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত অবনত শ্রেণীরই একজন প্রধান ব্যক্তি যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। ইনি ডক্টর আম্বেদকর, পি-এইচ ডি। সম্প্রতি নাগপুরে সমগ্রভারতীয় অবনত শ্রেণী-সমূহের যে কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল, ইনি তাহার সভাপতিত্ব করেন। ইনি সত্যাগ্রহ-বিরোধী। বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভায় ইনি এক জন সভ্য ছিলেন, এবং সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিবার নিমিত্ত ঐসভার যে কমিটি নিযুক্ত হয়, ইনি তাহারও সভ্য ছিলেন। সুতরাং ইংরেজদের তাঁহার কথা উড়াইয়া দিবার যো নাই। তিনি সভাপতি-রূপে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি বলেন, ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের তুলনা পৃথিবীর কোথাও মিলে না এবং এই দারিদ্র্যের কারণ ব্রিটেনের ভারতশাসননীতি। তাঁহার মত সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সত্য কি না, তাহার বিচার এখানে করা চলিবে না; কেবল তাঁহার মতের

উল্লেখ করিতেছি। তিনি প্রমাণ সহকারে ইহাও বলেন, যে, ভারতবর্ষের দারিদ্র্য বাড়িয়াই চলিতেছে। তাহার পর বলেন :—

"In this progressive impoverishment of the people, who are those that suffer most? I am sure that of the half of the agricultural population which is admitted not to know from one half years' end to another what it is to have a full meal, the Depressed Classes must form the largest part. Their abject poverty must make them ready victims of famines to which they must be paying the largest toll."

তাৎপর্য্য। "জনগণের এই ক্রমবর্দ্ধনশীল দারিদ্র্যে কাহারা সকলের চেয়ে দুঃখ পায়? অর্দ্ধেক বৎসরের শেষ হইতে আরেক অর্দ্ধবৎসরের শেষ পর্য্যন্ত যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না বলিয়া সবাই স্বীকার করেন, চাষীদের সেই অর্দ্ধেকসংখ্যক লোকদের মধ্যে অধিকাংশ অবনত শ্রেণীর লোক, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের ঘোর দারিদ্র্যবশতঃ দুর্ভিক্ষে তাহারাই বেশী মরে।"

অবনত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে শতকরা নিরক্ষরের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। অতএব ব্রিটিশ রাজত্বে ব্রিটিশ বন্ধুত্ব সত্ত্বেও তাহাদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর হয় নাই। অন্যান্য দিকে কি কি সুবিধা হইয়াছে, দেখা যাক্। ডক্টর আম্বেদকর তাঁহার সমশ্রেণীস্থ লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন :

"Before the British you were in a loathsome condition due to your 'untouchability'. Has the British Government done anything to remove your 'untouchability'? Before the British you could not draw water from the village well. Has the British Government secured you the right to the well? Before the British you could not enter the temple. Can you enter now? Before the British you were denied entry to the Police force. Does the British Government admit you in the force? Before the British you were not allowed to serve in the military. Is that career open to you now? Gentlemen, to none of these questions you can give an affirmative answer. Those who have held so much power over the country for such a long time must have done some good. But there is certainly no fundamental alteration in your position. So far as you are concerned, the British Government has accepted the arrangements as it found them and has preserved them faithfully in the manner of the Chinese tailor who, when given an old coat as a pattern, produced with pride an exact replica, rents, patches and all. Your wrongs have remained as open sores and they have not been righted, and I say that the British Government, actuated with the best of motives and principles, will always remain powerless to effect any change so far as your particular grievances are concerned. Nobody can remove your grievances as well as you can, and you cannot remove them unless you get political power in your own hands. No share of this political power can come to you so long as the British Government remains where it is."

তাৎপর্য্য। "ইংরেজ আমলের আগে আপনাদের 'অস্পৃশ্যতা' বশতঃ আপনারা ঘৃণ্য অবস্থায় ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার 'অস্পৃশ্যতা' দূর করিবার জন্য কিছু করিয়াছেন কি? ইংরেজ আমলের আগে আপনারা গ্রামের কূপ হইতে জল তুলিতে পারিতেন না। সরকার আপনাদিগকে কূপের উপর অধিকার দিয়াছেন কি? ইংরেজ আমলের আগে আপনারা দেবমন্দিরে ঢুকিতে পারিতেন না। এখন ঢুকিতে পারেন কি? ইংরেজ আমলের আগে আপনাদিগকে পুলিস বাহিনীতে ভর্ত্তি হইতে দেওয়া হইত না। সরকার আপনাদিগকে ঢুকিতে দেন কি? ইংরেজ আমলের আগে আপনারা সৈন্যদলে সিপাহী হইতে পারিতেন না। ঐ বৃত্তির দ্বার কি আপনাদের জন্য এখন অবারিত? ভদ্রমহোদয়গণ, এই সব প্রশ্নের কোনটিরই উত্তরে আপনারা "হাঁ" বলিতে পারেন না। যাহারা এত দীর্ঘকাল ধরিয়া দেশের উপর ক্ষমতার অধিকারী হইয়া আছে, তাহারা অবশ্যই ভাল কিছু করিয়াছে। কিন্তু আপনাদের অবস্থাতে কোন ভিত্তিগত পরিবর্ত্তন হয় নাই। আপনাদের সম্পর্কে, ব্রিটিশ সরকার দেশে যেরূপ বন্দোবস্ত বিদ্যমান দেখিয়াছিলেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া ঠিক তাহা রক্ষা করিয়াছেন—যেমন একজম চীনা দরজিকে নমুনা স্বরূপ একটা পুরাতন কোট দেওয়ায় সে অহঙ্কারের সহিত ছেদ, ছিদ্র, তালিসমেৎ ঠিক্ তাহারই মত একটি নূতন কোট তৈয়ার করিয়া দিয়াছিল। আপনাদের নানা দুঃখ ক্ষতের মত হইয়া আছে, তাহার কোন প্রতিকার হয় নাই; এবং আমি বলিতেছি, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট, শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ও নীতির দ্বারা চালিত হইলেও, আপনাদের বিশেষ দুঃখ সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে চিরকালই শক্তিহীন থাকিবে। আপনারা আপনাদের দুঃখ যেমন দূর করিতে পারেন, এমন আর কেহই পারে না: এবং আপনাদের নিজের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা না আসিলে আপনারা তাহা দূর করিতে পারেন না। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট যেখানে আছেন, যতদিন সেখানে থাকিবেন, ততদিন এই রাজনৈতিক ক্ষমতার কোন অংশ আপনারা পাইতে পারেন না। (অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রভুত্ব থাকিতে অবনত শ্রেণীর লোকেরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যথাযোগ্য অংশ পাইবে না)।"

ডক্টর আম্বেদকরের মতে কেবলমাত্র স্বরাজ দ্বারাই অবনত শ্রেণীর অভাব অভিযোগ দুঃখ দূরীভূত হইতে পারে;

"It is only a Government which is of the people, for the people and by the people, in other words, it is only the Swaraj Government that will make this possible."

স্বরাজের আমলে তিনি ব্যবস্থাপকসভাসমূহে অবনত শ্রেণীর লোকদের জন্য যথেষ্টসংখ্যক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি চান, এবং সমুদয় রাজকার্য্যে তাহাদের জন্য যথাযোগ্য অংশ চান। ইহার ব্যবস্থা করা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য নহে।

—

ঢাকায় মুসলমানদের অবস্থা

ঢাকায় যখন উপদ্রব চলিতেছিল, তখন সেখান হইতে প্রাপ্ত চিঠি হইতে এবং খবরের কাগজে প্রকাশিত ম্যাজিষ্ট্রেটের বর্ণনা হইতে জানিয়াছিলা

যে, সেখানকার অনেক মুসলমানের বড় অন্নকষ্ট হইয়াছে। কারণ, হিন্দুরা মুসলমানদের গাড়ী চড়ে না, মুসলমান রাজমিস্ত্রী, দরজি, মজুর ডাকে না, মুসলমানের নিকট হইতে কোন জিনিষ কেনে না। এখন অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, খবর পাই নাই। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমাদের মনে উদিত হইয়াছে। তাহা এই—যে-যে শ্রেণীর মুসলমানদের অন্নকষ্ট হইয়াছে বলিয়া খবর পাইয়াছিলাম, সে.ই সেই শ্রেণীর অনেক লোক লুট করিয়াছিল। লুণ্ঠিত সম্পত্তির মূল্য অনেক লক্ষ টাকা। নগদ টাকা, নোট, অলঙ্কার অনেক লুণ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সব টাকাকড়ি ও অন্য লুণ্ঠিত সম্পত্তি কোথায় গেল, কে লইল, যে, লুটের কয়েকদিন পরেই বিস্তর মুসলমানের অন্নকষ্ট হইল? এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ আছে কি, যে, যাহাদের অন্নকষ্ট হইয়াছে তাহারা লুটে দাঙ্গা হাঙ্গামায় যোগ দেয় নাই? লুট যেই করিয়া থাকুক, বহুসংখ্যক মুসলমানের অন্নকষ্টে প্রমাণ হইতেছে, যে, লুটের দ্বারা একটা সমগ্র সমাজ সঙ্গতিপন্ন হয় না, যদিও বদনামটা সমগ্র সমাজের হয়। আরও এই একটা কথা প্রমাণিত হইতেছে, যে, লুট করিয়া যদি বা কেহ কেহ ধনী হইয়া থাকে, তাহারা গরাব জাতভাইদের কোন সাহায্য করিতেছে না। সর্ব্বশেষে জিজ্ঞাস্য এই, ঢাকার কংগ্রেসবিরোধী ও হিন্দু-বিরোধী মুসলমানদের নেতা নবাব কেন গরীব জা'ত-ভাইদিগের দুঃখ দূর করেন না? তিনি ত. খুব ধনী ও খুব প্রভাবশালী।

—

বঙ্গের ও অন্যান্য প্রদেশের সংবাদপত্র

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী পিকেটার ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করায় কলিকাতার দুটি ইংরেজী দৈনিকের সম্পাদকদ্বয় দণ্ডিত হন। কিন্তু তাহা অপেক্ষা সত্যাগ্রহে উৎসাহজনক ক্তৃতা বঙ্গের বাহিরে অনেক কংগ্রেস-নেতা করিয়াছেন ও তাহা তথাকার খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, অথচ ঐ সব কাগজের কোন শাস্তি হয় নাই। সম্প্রতি দিল্লীতে ারুদ্ধ বিঠলভাই পটেল, বিধানচন্দ্র রায়, লালা দুনীচাঁদ রাজা রাওয়ের স্বদেশবাসীদের প্রতি অনুরোধ বঙ্গের রের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। কংগ্রেস কার্য্য-াহক কমিটির সভ্যদের গ্রেপ্তারের আগে পর্য্যন্ত ারা যে-সব প্রতিজ্ঞা ধার্য্য করেন, তাহাও প্রকাশিত ছে। প্রকাশকারী কাগজগুলির কোন শাস্তি হয় । এগুলি কলিকাতার কোন কাগজে দেখি নাই।

এই প্রভেদের কারণ কি? অর্ডিন্যান্সের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ বঙ্গে যেভাবে হইতেছে, অন্য অনেক প্রদেশে সেভাবে হইতেছে না।

—

সংবাদ প্রকাশিত না হওয়ার অনিষ্টকারিতা

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অনেক গ্রামে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইতেছে না; যাহা বাহির হইতেছে, তাহাও যথাযথ ও সম্পূর্ণ বাহির হইতেছে না। এই কারণে নানা প্রকার ভীষণ গুজব রটিতেছে।

—

বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী

বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর উদ্যোগে অনেক যোগ্য লোক স্বাস্থ্যরক্ষা ও পল্লীসেবা বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছেন। ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে ছবি দেখাইয়া কোন কোন বক্তৃতা করা হইতেছে। হিতসাধনমণ্ডলীর এই আয়োজন প্রশংসনীয়। বক্তৃতা হইতে শিক্ষালাভ করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট শ্রোতা হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহাতে দেশের উপকার হইবে।

—

দৌড়চক্র ও ব্যায়ামশালা

নানা প্রকারে দৈহিক বল চর্চ্চায় উৎসাহ দিবার নিমিত্ত কয়েক বৎসর হইল বঙ্গীয় ওলিম্পিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাহার এক অধিবেশনে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি ষ্টেডিয়াম বা দৌড়-চক্র ও ব্যায়ামশালা নির্ম্মাণের কথা বলেন। ইহার খুব প্রয়োজন আছে। শুধু কলিকাতায় নয়, বঙ্গের যত বেশী জায়গায় দৌড়চক্র ও ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই ভাল।

—

বাঙ্গলা ও আসামে অবনতশ্রেণীদের শিক্ষা

বাংলা ও আসামের অবনতশ্রেণীর লোকদের উন্নতিবিধায়িনী সমিতির ১৯২৯-৩০ সালের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। সকল শিক্ষিত ব্যক্তিকে আমরা ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহা কলিকাতায় :৩নং বাদুড়বাগান রো ঠিকানায় পাওয়া যায়। আলোচ্য বৎসরে সমিতির অধীনে ৪৩৯টি বিদ্যালয় ছিল। তাহার মধ্যে

একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী স্কুল, ৯টি মধ্য-ইংরেজী স্কুল, ৩০৭টি বালকদের প্রাথমিক পাঠশালা, ১৩টি বালকদের নৈশ পাঠশালা, এবং ১০৯টি বালিকাদের প্রাথমিক পাঠশালা। মোট ছাত্রসংখ্যা১৩,৩৪৯, ছাত্রীসংখ্যা ৪,৩০৮; মোট ছাত্রছাত্রী ১৭,৬৫৭।

আলোচ্য বৎসরে সমিতি সরকারী সাহায্য পাইয়াছিলেন মোট ৯৩০০ টাকা, সাসেক্স ট্রাষ্টের ১৮৩৯৮৶৯ সমেত সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা পাইয়াছিলেন ২২৪৪২৷৶৩, কিন্তু যে-সকল গ্রামে সমিতি কাজ করিতেছেন তথাকার লোকদের চাঁদা ও ছাত্রছাত্রীদের বেতনে উঠিয়াছিল ৪৩৬৫৮৷৹। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে, গ্রামের লোকদিগকে সমিতি কিরূপ স্বাবলম্বী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা ছাড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড-সমূহ সাহায্য দিয়াছিলেন ২৪১৬৬৷৹।

বর্তমান ১৯৩০-৩১ সালে সমিতির ব্যয় আনুমানিক ৯০১৩০ টাকা হইবে। আয় আনুমানিক ৮৪১০০ হইতে পারে, কমও হইতে পারে। সুতরাং ন্যূনকল্পে ছয় হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবার কথা। অতএব সকলকে বেশী বা অল্প, যিনি যত পারেন, দান করিতে অনুরোধ করিতেছি।

হিন্দু মুসলমান আদিমনিবাসী ৭৮টি জাতি বা শ্রেণীর বালকবালিকা সমিতির বিদ্যালয়সকলে শিক্ষা পায়। নমঃশূদ্র বালকবালিকাই সকলের চেয়ে বেশী—যথাক্রমে ৫৫৩৩ ও ২০৫৪। তাহার নীচে মুসলমান—যথাক্রমে ২২৩৭ ও ৫০৬। সমুদয় "উচ্চ" জাতির ছাত্রছাত্রীও অনেক আছে।

যদিও প্রায় তিন হাজার মুসলমান ছাত্রছাত্রী সমিতির বিদ্যালয়সকলে পড়ে, তথাপি চাঁদাদাতাদিগের মধ্যে একজন মুসলমান ভদ্রলোকেরও নাম দেখিতে পাইলাম না। সমিতির স্থায়ী ফণ্ডে যে ১৭০১১৷৹ উঠিয়াছে, কেবল তাহাতে লাহোরের স্যার মুহম্মদ শফী দশ টাকা দিয়াছেন দেখিলাম।

জেলে অল্পবয়স্কদের শিক্ষা

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বালক কয়েদীদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার বন্দোবস্তের ফল সন্তোষজনক হওয়ায় তাহা স্থায়ী করা হইবে, এবং আর চারিটি সেণ্ট্রাল জেলে ঐরূপ বন্দোবস্ত করা হইবে। ইহা ভাল। সমুদয় বালক কয়েদীর শিক্ষার ব্যবস্থা ত হওয়াই উচিত; সাবালক নিরক্ষর কয়েদীদেরও শিক্ষার বন্দোবস্ত করা কর্তব্য। যে-সব শিক্ষিত লোক কারারুদ্ধ হন, তাহাদের মধ্যে বাছিয়া কাহাকেও কাহাকেও জেলে শিক্ষক নিযুক্ত করিলে এই কাজ অনায়াসে হইতে পারে।

মোতীলাল নেহরু দয়া চান না

৩রা সেপ্টেম্বরের বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান ডেলী মেল কাগজে দেখিলাম, পশ্চিমভারতীয় জাতীয় উদারনৈতিক সভার কৌন্সিল ভারত-গবর্মেণ্টকে জানাইয়াছেন, যে, পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় তাঁহাকে জেলে আবদ্ধ রাখিলে তাঁহার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইবে বলিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে খালাস দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদেরও মত তাই।

উক্ত সংবাদের নীচে ডেলী মেলের পক্ষ হইতে লেখা হইয়াছে, পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু বড়লাটকে লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া কিছু করিবার আবশ্যক নাই এ কথা মোতীলালজীর উপযুক্ত। অনুগ্রহ লইতে কষ্ট ও অপমান বোধ হওয়া স্বাভাবিক—বিশেষতঃ তাহাদের অনুগ্রহ লইতে যাহারা বন্ধু নহে।

বোমা নিক্ষেপ সম্পর্কে বালিকা গ্রেপ্তার

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের উপর বোমা নিক্ষেপ উপলক্ষ্যে অনেক লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটি অল্পবয়স্কা বালিকাও আছে।

কাহার বিরুদ্ধে কিরূপ প্রমাণ আছে, তাহা প্রকাশ পায় নাই, পাইতে পারেও না। কিন্তু যদি অল্পবয়সের বালিকাকেও সন্দেহ করিবার যথেষ্ট প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে দেশের অবস্থা খুব সঙ্গীন হইয়াছে, সামাজিক পরিবর্তন খুব বেশী হইয়াছে এবং জনগণ ও গবর্মেণ্টের ধীরভাবে চিন্তা করিবার কারণ ঘটিয়াছে, বলিতে হইবে।

লবণের কথা

বিলাতী এক পাউণ্ড ওজনকে মোটামুটি আধ সেরের সমান ধরিলে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির মধ্যে পঞ্জাবে লোকে মাথাপিছু বৎসরে ৫ সের নুন খায়, বোম্বাইয়ে ৭ সের এবং মান্দ্রাজে ৯৷৹ সের। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রধানতঃ নিরামিষভোজী ও তণ্ডুলভোজী মান্দ্রাজীদে[র] প্রধানতঃ গোধূমভোজী ও কতকটা আমিষভো[জী]

দের চেয়ে বেশী নুন খাওয়া দরকার হয়। কিন্তু তাঁর যে প্রদেশের লোকেরা মাছমাংস যতই না, ইউরোপের লোকদের মত এত বেশী শী তাহারা নহে। অথচ সমগ্র ভারতে গড়ে -পিছু এক একজন লোক বৎসরে ৬ সের নুন খায়; ইংরেজরা মাথাপিছু ২০ সের, পোর্ত্তুগীজরা ১৭৷৷০ খায়। ভারতবর্ষের লোকদের স্বাস্থ্যের জন্য ঐ রোপীয়দের চেয়েও অনেক বেশী নুন খাওয়া দরকার, তাহারা খাইতে পায় না।

খরচ-খরচা বাদ লবণ শুল্ক হইতে ভারত-গবর্ন্মেণ্ট সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা পান। তাহা আদায় তে এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা খরচ হয়। ৫০ টাকা বাণিজ্যশুল্ক আদায় করিতে মোট ৭৫ লক্ষ মাত্র খরচ হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, লবণশুল্ক করা কিরূপ ব্যয়সাধ্য।

—

ঢাকা উপদ্রবের সরকারী তদন্তের রিপোর্ট কখন পাইব ?

৭শে আগষ্ট ১০ই ভাদ্রের অমৃতবাজার পত্রিকায় উপদ্রবের সরকারী তদন্তের রিপোর্ট বাহির হয়। রিখে বা উহার কাছাকাছি তারিখে "ষ্ট্যাডভ্যান্সে" র্টের উপর প্রবন্ধ বাহির হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর দ্রের একটি বাংলা সাপ্তাহিকে আমরা রিপোর্টের শ দেখিতে পাইলাম। এই সকল কাগজের রা সম্ভবতঃ রিপোর্টটি বিনামূল্যে পাইয়াছেন। তাহা পাই নাই। ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯শে ভাদ্র বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপোতে ঐ রিপোর্ট নি কিনিতে পাঠাই। পাওয়া যায় নাই। ঐ রী দোকানের কে একজন—তাঁহার স্বাক্ষর পড়িতে যায় না—লাল কালীতে লিখিয়া দিয়াছেন, "Not eady for issue. 5-9-30." কতকগুলি সম্পাদক বিনামূল্যে সরকারী রিপোর্ট পাইবেন, অন্য রা বিলম্বে পয়সা দিয়াও তাহা পাইবেন না, ভাল নয়।

... রাজস্ব হ্রাস

... প্রকাশ বিভাগের ডিরেক্টর প্রদেশ ... লিকে ঐ প্রদেশের রাজস্ব হ্রাস সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ জানাইয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, এপর্য্যন্ত রাজস্ব এককোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। ইহা প্রধানতঃ সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টার ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। আবগারী রাজস্বই সকলের চেয়ে বেশী কমিয়াছে—ষাট লক্ষ কমিয়াছে। অরণ্যের রাজস্ব ১৫ লক্ষ এবং ভূমির রাজস্ব ১৫ লক্ষ কমিয়াছে; ষ্ট্যাম্প হইতে রাজস্ব হ্রাস ১১ লক্ষ। ঘোড়দৌড়ে বাজীরাখা হইতে ১২ লক্ষ টাকা আয় হইবে, ধরা হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে আন্দাজী ৩ লাখ টাকা কম আয় হইবে।

বোম্বাইয়ে এপর্য্যন্ত সওয়া কোটি টাকা রাজস্ব কমিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশেও কমিয়াছে, কিন্তু কত তাহা এখনও জানা যায় নাই। সমগ্র ভারতে ছয় সাত কোটি রাজস্ব কমিবে, অনুমান করিলে আন্দাজটা বো করি বেশী হইবে না। অন্য দিকে পুলিস ও জেলের জন্য অতিরিক্ত খরচও সমগ্র ভারতে কয়েক কোটি কম হইবে না।

মহাত্মাজী যখন লবণ-আইন ভঙ্গ করিয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবেন স্থির করেন, তখন গবর্ন্মেণ্ট যদি জনসাধারণের দুঃখের কারণের বিদ্যমানতা স্বীকারের চিহ্নস্বরূপ মহাত্মাজীর অনুরোধ অনুসারে নুনের ট্যাক্স তুলিয়া দিতেন, তাহা হইলে রাজস্বের ক্ষতি সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা হইত। কিন্তু এখন তাহা অপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইতেছে। অধিকন্তু পুলিস ও জেলের ব্যয় খুব বাড়িয়াছে। শান্তি ও অশান্তির দিকটাও ভাবিবার বিষয়। নুনের ট্যাক্স তুলিয়া দিয়া মহাত্মাজীর সহিত রফা ও সন্ধির কথা চালাইলেই সত্যাগ্রহ বন্ধ হইতে পারিত, কারণ মহাত্মাজী অবুঝ জেদী লোক নহেন। সত্যাগ্রহ বন্ধ হইলে এত লোক প্রহৃত, হতাহত, কারারুদ্ধ হইত না, দেশে এত হুলস্থুল অশান্তি হইত না। কিন্তু তখন সরকার বাহাদুর নুনের ট্যাক্স তুলিয়া দিতে রাজী হন নাই, তাহার কারণ তাঁহারা মহাত্মাজীর প্রভাবের এবং লোকের অসন্তোষের দুঃখসহিষ্ণুতার ও সাহসের পরিমাণ আন্দাজ করিতে পারেন নাই, তাহা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন; আপনাদের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধেও তাঁহাদের ধারণা অতিরিক্ত রকম উচ্চ ছিল এবং এখনও আছে। অনেকে বলিতে পারেন, প্রবলপরাক্রান্ত গবর্ন্মেণ্ট কেমন করিয়া একজন প্রজার সঙ্গে রফা ও সন্ধির কথা চালাইবেন? সত্য। কিন্তু রফা সন্ধি ও শান্তির কথার আরম্ভ যিনিই করুন, কংগ্রেসনেতারা করেন নাই, এবং কথাবার্ত্তা ব্রিটেনের মন্ত্রীমণ্ডল ও বড়লাটের সম্মতিক্রমেই চলিতেছে। সুতরাং এখন এরূপ কথাবার্ত্তা চালাইতে যদি গবর্ন্মেণ্টের লাঘব না হইয়া থাকে, তাহা

আগে তাহা চালাইলেও লাঘব হইত না। গবর্ন্মেণ্ট বা কংগ্রেস, কোন পক্ষেরই আত্মাভিমানের আতিশয্য বাঞ্ছনীয় নহে। [১৯শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর লিখিত।]

—

বঙ্গে গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষা আইন

ভাদ্রের প্রবাসীতে দেখান হইয়াছে, শিক্ষামন্ত্রী ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়সের যত বালকের জন্য পাঠশালা খুলিবেন বলিয়াছেন, বঙ্গে তাহা অপেক্ষা ঐ বয়সের অনেক বেশী বালক আছে; যত বালিকার জন্য খুলিবেন বলিয়াছেন, তাহার সাড়ে তিন গুণেরও অধিক ঐ বয়সের বালিকা আছে। ঐ বয়সের যত বালক ও বালিকা এখন শিক্ষা পায়, তাহার উপর আরও ২৭ লাখ ও ১০ লাখকে শিক্ষা দিবেন, তাঁহার রোটারী ক্লাবের বক্তৃতার এরূপ অর্থও হইতে পারে না। কারণ এখন ১৯,৫৯,০৯৮ জন বালক প্রাথমিক পাঠশালাসমূহে শিক্ষা পায়। এই কুড়ি লাখের সহিত সাতাশ লাখ যোগ করিলে ৪৭ লাখ হয়। কিন্তু বঙ্গে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়সের বালক মোটে ৩৮,০১,৫৪২ জন আছে। মোট যত বালক আছে, তার চেয়ে ৯ লাখ বেশী বালকের শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্য শিক্ষামন্ত্রী করিতেছেন না।

এখন দেখা গেল, যে, যদিও সরকার বঙ্গের সকল জায়গা হইতে শিক্ষা-ট্যাক্স আদায় করিবেন, তথাপি সব জায়গায় নির্দ্দিষ্ট বয়সের সব বালকবালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না, সমুদয় বালকবালিকার কিয়দংশেরই জন্য পাঠশালা খুলিতে পারিবেন। তাহার মানে, কোন কোন জেলার কোন কোন স্থানে যথেষ্ট পাঠশালা খোলা হইবে না; অথচ সব-জেলার সব জায়গা হইতেই ট্যাক্স আদায় হইবে। যাহারা ট্যাক্স দিবে অথচ যাহাদের বালকবালিকারা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকিবে, কি নীতি বা নিয়ম অনুসারে কোন্ কোন্ জেলার কোন্ কোন্ স্থান হইতে এইরূপ সব লোক বাছিয়া বাছিয়া বাহির করা হইবে?

বঙ্গের এই প্রাথমিক শিক্ষা আইনটির বিরোধিতা আমরা প্রথম হইতে করিয়া আসিতেছি, অন্য কোন কোন সম্পাদকও করিতেছেন। কিন্তু কেবল বাঙ্গালী সম্পাদকেরাই ইহার বিরোধী নহেন। গোখলে কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত দারিদ্র্যব্রতী ভারতভৃত্য সমিতির (দি সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর) মুখপত্র সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া পুণা হইতে প্রকাশিত হয়। ভারতভৃত্য সমিতির সভ্যেরা উহার নিয়ম অনুসারে কোন

সাম্প্রদায়িক সভা সমিতির সভ্য হন না, এবং
তার তাঁহারা বিরোধী। এই কাগজ বঙ্গে
বন্দোবস্তের ও জমিদারী প্রথার বিরোধী।
বঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা আইনটার সম্বন্ধে অ
মধ্যে বলা হইয়াছে:—

It so happens that the great bulk of th
are Hindus and the tenants Muslims.
tion of the tenants' share by the land
are already none too popular with the te
make them more unpopular still. T
Education Minister toured East Benga
popular support for his Bill. East Ben
majority of Muslims, who seemed to
led to read into the Bill a communal
Muslims : getting the Hindus to pay for
of the Muslims.

তাৎপর্য্য। "বঙ্গের অধিকাংশ জমিদার হিন্দু,
মুসলমান। জমিদারদের দ্বারা রায়তদের নিকট হইতে
তাহাদের অংশের আদায়ের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই র
জমিদারশ্রেণীকে তাহাদের আরও অপ্রিয় করিবে। মুস
তাঁহার বিলের সমর্থন সংগ্রহার্থ পূর্ব্ববঙ্গে সফর কর
মুসলমানের সংখ্যা বেশী। বিলটি মুসলমানদের প
জয়, তাহার মধ্যে এইরূপ একটা মানে তাহাদের মাথা
থাকিবে—অর্থাৎ মুসলমানদের সুবিধার জন্য হিন্দুদিগ
হইবে।"

মুসলমান রায়তদের কাছে যে-সব হিন্দু জ
পান, তাহাদের শিক্ষার জন্য তাঁহারা কতকটা
ইহাতে আমরা কিছু অন্যায় দেখি না। কি
যাহাই বলুন, ট্যাক্স দেওয়াটা কাহারও প
নহে। সুতরাং জমিদারেরা নিজেদের ও প্র
দিতে বাধ্য হইবেন, কিন্তু প্রজাদের অংশ আ
তাঁহাদিগকে অপ্রিয় হইতে ও বেগ পাই
হয় ত রায়তদের অংশ তাহাদের নিকট
স্থলে আদায় হইবে না। কিন্তু তাহাতে
কোন ক্ষতি হইবে না; কারণ জমিদারদি
দিতে হইবে। অধিকাংশ জমিদার হিন্দু
রায়ৎ মুসলমান হওয়ায় এই শিক্ষা-ট্যাক্স হিন্দু
বিবাদের আর একটা স্থায়ী কারণ হইবে।
প্রজার অংশ আদায়ের [illegible] ব্রিটিশ সরকা
উচিত ছিল। ইহা যে [illegible]
নূতন কারণ হইবে, তাহ [illegible] বুদ্ধি
বেসরকারী ইংরেজ এব [illegible] র মত [illegible]
অনেক মুসলমান সভ্যের [illegible] মান শি
অংশ আদায়ের ভার [illegible] অথচ

হইতেই সহজে বিবাদ নিবারণের ব্যবস্থাটুকু ন না। ইহাতে আমরা বিস্মিত হই নাই। কিন্তু দর উল্লিখিত উক্তরূপ ব্যবস্থা করিলে বিলের সার্থক মুসলমানদের সদাশয়তায় প্রীত হইতাম।

ষ্ট অব্ ইণ্ডিয়া পত্রিকা আরও বলিতেছেন :—

seems to be a feeling that the action of uslim Minister was more in the nature of an neering stunt to secure him a personal at the polls."

র্য্যা। "এরূপ একটা ধারণা জন্মিয়াছে বোধ হইতেছে, মান শিক্ষামন্ত্রীর কাজটা কতকটা আগামী নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে একটা চা'ল।"

শেষে ঐ পত্রিকা বলিতেছেন :—

principle and the procedure of the Bill open to grave objection. Primary educa- ould be financed from the general revenues h all classes contribute according to their and not by means of a cess on land alone. ually objectionable to make the landlords ible for the collection of the cess from their It was impolitic to attempt to rush the ough the Council without referring it to a ommittee. It was equally impolitic to ignore s of the opposition of the Hindu members t the methods of the steam roller parti- n the question of the spread of primary n on which there can be no difference in ."

া। "এই বিলের মূলনীতি এবং ইহাকে আইনে পরিণত দ্ধতি উভয়ই গুরুতর আপত্তিজনক। প্রাথমিক শিক্ষার য সামর্থ্য অনুসারে সকল শ্রেণীর প্রদত্ত সাধারণ রাজস্ব উচিত, কেবল জমীর উপর ধার্য্য কর দ্বারা নহে। জমিদার- হাদের প্রজাদের নিকট হইতে এই কর আদায়ের জন্য সমান আপত্তিকর। সিলেক্ট কমিটিকে বিবেচনার জন্য হা কৌন্সিল দ্বারা তাড়াতাড়ি পাস করান রাজনীতির হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে মূলনীতিগত থাকিতে পারে না। অতএব বিশেষ করিয়া এরূপ ...তের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া বিরুদ্ধ ... অসমীচীন হইয়াছে।"

...গাম জ... ...রিগর ... ...জন্ত

এবং যে টাকাটা অন্যে দিবে এবং অন্যে আদায় করিয়াও দিবে, তাহা স্বেচ্ছায় খরচ করিবার সুখটা ভোগ করিতে পারিবেন। কিন্তু এ উপায়ে দেশে সুশিক্ষার বিস্তার ও সন্তোষ বৃদ্ধি হইবে না নিশ্চিত।

—

বিলাতী সংবাদপত্র ও ঢাকার উপদ্রব

রবীন্দ্রনাথ বিদেশে থাকিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন এবং বিলাতী কাগজে লিখিয়াছেনও, যে, বিলাতের সব সংবাদপত্র ঢাকার দীর্ঘকালব্যাপী ভীষণ উপদ্রব ও অরাজকতা সম্বন্ধে একেবারে চুপ। ইহা বিন্দুমাত্রও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। জালিয়ানওয়ালাবাগের ব্যাপারের সংবাদ ভারতসচিব মণ্টেগু আটমাস পরে পাইয়াছিলেন। ঢাকার খবরও হয় ত যথাসময়ে বিলাতে পৌঁছে নাই। খবর পৌঁছিয়া থাকিলেও, ঢাকার অরাজকতার দ্বারা ব্রিটানিকী শান্তির মহিমা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শান্তিরক্ষার ক্ষমতা প্রমাণিত না হওয়ায়, বিলাতী কাগজগুলার পক্ষে সে বিষয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করাই ভাল বোধ হইয়া থাকিতে পারে। ঢাকায় যে অরাজকতা হইয়াছিল, তাহা চট্টগ্রামের দৌরাত্ম্যের মত ব্রিটেনের সিংহাসন টলাইবার জন্য হয় নাই, তদ্দ্বারা ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি কাঁচা হইয়া যায় নাই; তাহা কেবল হিন্দুমুসলমানের ঝগড়া মাত্র। সুতরাং এদিক্ দিয়াও, বিলাতী কাগজওয়ালাদের মাথা-ব্যথার কোন কারণ হয় নাই। তাহারা হয়ত বরং ভ্রমবশতঃ ভাবিয়া থাকিবে ব্রিটিশ প্রভুত্বের ভিত্তি আরও কিছুদিনের জন্য পাকা হইল।

—

ধানের চাষের উন্নতি

কৃষিবিষয়ক গবেষণার সাম্রাজ্যিক কৌন্সিলের অধ্যক্ষ সমিতি ("The Governing Body of the Imperial Council of Agricultural Research") মোট ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বাইশ রকম কার্য্যপদ্ধতি মঞ্জুর করিয়াছেন। তাহার মধ্যে আসাম বাংলা বিহার ও ব্রহ্মদেশে ধানের চাষের উন্নতর গবেষণার জন্য বার লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। গবেষণা ভাল জিনিষ। কিন্তু সেগুলা কাজে লাগাইতে ...লে চাষীদের শিক্ষার দরকার। সকলের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য গবর্ণ্মেণ্ট ... রাজস্ব ব্যয় করিবেন না, অথচ কৃষিসম্বন্ধে গবেষ... চলিবে, এ নীতি ... লিনলিথ্‌গো কমিশ...

পরিচিত রাজকীয় কৃষিকমিশন গ্রামসমূহে বালকবালিকা ও প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার দ্বারা একেবারে তাহাদের মনের গতি বদলাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন, তাহাদিগকে প্রগতি ও উন্নতিতে বিশ্বাসবান্ করিতে বলিয়াছিলেন। তাহাদিগকে শিক্ষা দিলে তাহারা গবেষণালব্ধ সমুদয় জ্ঞান কাজে লাগাইতে পারিত। কিন্তু সরকার বাহাদুর এই অনাড়ম্বর অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় কাজটিতে মন না দিয়া মোটা বেতনের কর্ম্মচারীবহুল আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবস্থা আগে করিয়াছেন এবং একগজ লম্বা নামওয়ালা "দি গভর্ণিং বডি অব্ দি ইম্পীরিয়্যাল কৌন্সিল অব্ এগ্রিকাল্‌চ্যার‍্যাল রিসার্চ" প্রভৃতি খাড়া করিয়াছেন। ইংরেজীতে ইহাকে বলে অশ্বের সম্মুখে শকট স্থাপন।

—

বিদেশে বাঙ্গালীর কলঙ্ক

আমরা সংবাদপত্রে পড়িয়া লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হইলাম যে, রেঙ্গুনে চারিজন বাঙালী যুবক তথাকার বাঙালীদের বিদ্যালয়ের কেরানী ও দারোয়ানের হাত হইতে গুলি করিবার ভয় দেখাইয়া তিন হাজার টাকা ছিনাইয়া লইয়া মোটর যোগে পলাইতেছিল। কেরানী ও দারোয়ান ঐ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে লইয়া আসিতেছিল। যুবকেরা ধরা পড়িয়াছে।

—

কিশোরগঞ্জ সম্বন্ধে পুস্তিকা

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে হিন্দুর দুর্গতি বর্ণনা করিয়া হিন্দুমিশন দুই খণ্ড পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন। ঐ দুই খণ্ডে সমুদয় গ্রামের বৃত্তান্ত কুলায় নাই বলিয়া আরও একখণ্ড পুস্তিকা বাহির হইবে। প্রথম খণ্ডটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪, দ্বিতীয়টির ৮০। মূল্য সস্তা, দু আনা করিয়া। [illegible]কমাশুল আলাদা। বহি দুখানি সব বাঙালীর ও গবর্ণমেণ্টের পড়া উচিত। পাইবার ঠিকানা, ঢাকা, হিন্দুমিশন, ১৯নং জয়চন্দ্র ঘোষ লেন, বাংলাবাজার, [illegible]কা।

দ্বিতীয় খণ্ডে হিন্দুমিশন যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া[illegible] তাহা হইতে সামান্য কয়েকটি বাক্য [illegible] করি[illegible] [illegible]টিই পঠনীয়।

[illegible]এ কথা সত্য যে ২।১ জায়গায় কোন কোন ক্ষমতাবান মুস[illegible]
[illegible]ন স্বধর্ম্মাবলম্বীর এই স্বার্থের [illegible] হইতে দূরে রহিয়াছে[illegible]

[illegible]স্বেচ্ছায় বিপদের সম্মুখীন হইয়াও কোন কোন হিন্দু[illegible]
রক্ষা করিয়াছেন। একটা সমাজের সকলেই যে এক[illegible]
বিবর্জ্জিত হইতে পারে না ইহা তাহারই পরিচয়[illegible]
মহত্ত্বের জন্য তাঁহারা সমগ্র হিন্দুসমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জ[illegible]

নিম্নমুদ্রিত কথাগুলির প্রতি সকলের [illegible]
করিতেছি।

"এই বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী শতাংশের [illegible]
জানিতে পারি নাই। যাহা জানিয়াছি তাহারও [illegible]
[illegible]কভাগ প্রকাশ করিতে পারিয়াছি। একদিকে [illegible]
[illegible]াপ, অপরদিকে বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা, এই [illegible]
অনেক কথা কাট-ছাঁট দিয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছে[illegible]

"যে অঞ্চলে লুণ্ঠন চলিল, সে অঞ্চলে হিন্দু [illegible]
বুঝিল রাজা ও রাজশাসনের অবসান হইয়াছে। [illegible]
তাহাদের মানমর্য্যাদা, ধনদৌলত, এমন কি ধর্ম্ম [illegible]
মুসলমানের কৃপার উপর রহিয়াছে। মুসলমানগণ [illegible]
অপরাজিত শক্তি ও সামর্থ্য দ্বারা তাহারা অনায়াসে[illegible]
পর্য্যন্ত বিলীন করিয়া দিতে পারে। শুধু তাই [illegible]
তাহার উচ্চতর শিক্ষা, তীক্ষ্ণতর বুদ্ধি, উন্নততর [illegible]
ধনসম্পদ ইহার কিছুই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে [illegible]
সাহস ও শারীরিক শক্তি দ্বারা দস্যুকে বিতাড়িত [illegible]
ক্ষমতার অভাব হয়। অন্যদিকে মুসলমান বুঝিল, [illegible]
ও বুকে সাহস থাকে, তবে বিদ্যাবুদ্ধি ধনসম্পদ সবই[illegible]
পড়ে। হিন্দু বুঝিল, সংখ্যায় অল্প হইলে তাহার ধ[illegible]
তাহার সম্পদ রক্ষা হয় না। মুসলমান বুঝিল, [illegible]
হইলে তাহাদের শক্তিও অধিক হয়, সে লুণ্ঠন করি[illegible]
করিতে পারে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে।"

এখানে আমরা এইটুকু মাত্র বলিতে চাই, [illegible]
হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী হইলেও লুণ্ঠিত হইয়াছে[illegible]
শিখরা সংখ্যায় ন্যূন হইলেও রাজত্ব করিয়াছে[illegible]
লুণ্ঠিত হয় না।

নিম্নলিখিত কথাগুলি গবর্ণমেণ্টের পঠিত[illegible]

"গবর্ণমেণ্ট কি বুঝিলেন? গবর্ণমেণ্ট বুঝিলেন, [illegible]
লুণ্ঠনের আস্বাদ পায়, তখন হিন্দুবাড়ী লুট করিয়া[illegible]
থানা, ডাকঘর প্রভৃতিও লুট করিতে অগ্রসর হয় [illegible]
ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকেও আক্রমণ করে, পুলিশ[illegible]
আহ্বান করে, গুরখা সৈনিককেও আঘাত করি[illegible]
আরও বুঝিলেন, সরকারের চৌকিদার দ[illegible]
পারে।"

...ধুয়া ...ড়নাতেই তাহারা এরূপ করিয়াছে। কতকগুলি লোক লুণ্ঠনকারীদিগকে প্ররোচিত করিতেছিল। কিন্তু যখন দেখিল ... লুণ্ঠনকারীদের সাহায্য করে না, তখন তাহারা নিবৃত্ত হইল।"

এ বিষয়ে হিন্দুমিশনের পুস্তিকার মত ভিন্ন। তাহাতে লিখিত আছে,—"মূল উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ দেনা হইতে মুক্তি লাভ, বর্ত্তমান আর্থিক অনটন দূরীকরণ নহে।" এই মতের ...ক্ষে প্রমাণও পুস্তিকাতে আছে।

"প্ররোচনা" দীর্ঘকাল ধরিয়া বিস্তৃত ভূখণ্ডে চলিল, অথচ সরকার তাহা জানিতে পারিলেন না, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইল?

৪ঠা ভাদ্রের "সঞ্জীবনীতে" আরও আছে :—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী জানিতে চাহেন, কেন এই সকল দাঙ্গাকারীকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। এ সম্বন্ধে ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে, "যদি সকল মুসলমান দাঙ্গাকারীকেই গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হইত, তবে মুসলমানদের অভাবে জমি চাষ করা হইত না, দেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত।" এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, একদল লোকের এই ভরসা করিবার অবকাশ হইয়াছিল যে, দাঙ্গাকারীদের গবর্ণমেন্ট সাহায্য করিতে পারেন। সকল দাঙ্গাকারীদের গ্রেপ্তার না করার কারণ সম্বন্ধে ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যুক্তি দেখাইয়াছেন, সে যুক্তি অবলম্বন করিলে আইন অমান্যকারী ... লোককে মুক্তি দিবার প্রয়োজন হইবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ... উত্তরে কি বলিবেন?

ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কথিত কারণ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, লুণ্ঠনকারীরা দলে যত পুরু হইবে, গবন্মে‍ণ্ট ...তেই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে অসম্মত হইবেন; সুতরাং দলে পুরু হইলেই অবাধে লুণ্ঠন করা যাইবে, আইনটা সংখ্যান্যূন 'ধর্ম্মভীরু' লোকদের জন্য।

অনেক সত্যাগ্রহীকে সরকারী কর্ম্মচারীরা গ্রেপ্তার না করিয়া লাঠি দ্বারা শাস্তি দেন। লুণ্ঠনকারীদের জন্য অন্ততঃ সেই ব্যবস্থা কেন হইল না? আইনের জারিজুরি কি কেবল তাহাদের জন্য যাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, কিম্বা লাঠির উত্তরে, লাঠি না ধরিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ? এই প্রশ্ন ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের জন্য।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিকার

ঢাকার হিন্দু-মিশন এই নামের একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। মূল্য দুই পয়সা, ডাকমাশুল দুই পয়সা। ইহাও সকলের পঠনীয়। ইহাতে পৃথিবীর হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে বৌদ্ধদিগকে না ধরিলেও—না-ধরাই ভাল—দেখা যাইবে, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা বেশী। কিন্তু শুধু সংখ্যায় কি হয়, যদি সামাজিক সাম্য ও একপ্রাণতা না থাকে?

নারীহরণের প্রতিকার

যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার একটি গ্রামে একটি সধবা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারের বর্ণনা ১৮ই ভাদ্রের "সঞ্জীবনী"তে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, শ্রীপুর থানার দারোগা এজাহার লইতে একাধিকবার অস্বীকৃত হন। শেষে "এস্ ডি ও'র নিকট যাইতে উদ্যত হইলে নানাপ্রশ্নের পর রাত্রিকালে এজাহার নেন, তখন রাত্রি প্রায় ৭টা বাজিয়াছিল। উক্ত এজাহার লওয়ার পর দারোগাবাবু ঐ রাত্রিতে বরিশাট গ্রামে চলিয়া যান, কিন্তু সেখানে প্রায় ৩ দিন পর্য্যন্ত যাতায়াত করিলেও দারোগাবাবু আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করেন নাই। যাহা হউক, উক্ত মোকদ্দমায় যশোহর সেশ্যন আদালতে আসামীগণের ৬ ও ৫ বৎসরের কারাদণ্ড হইয়াছে।"

এই ঘটনাটি-সম্বন্ধে সম্পাদক লিখিতেছেন :—

পত্রপ্রেরক শ্রীপুর থানার দারোগার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাহা সত্য কি মিথ্যা তাহার অনুসন্ধান করিবেন, ইহাই আমাদের নিবেদন। কিয়দ্দিন হইল পুলিশের ইন্স্পেক্টার জেনারেল পরলোকগত মিঃ লোম্যান পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে নারীহরণ বিষয়ক এজাহারের তদন্ত করিতে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ন্যায়পরতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু থানার কোন কোন দারোগা তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য বিফল করিয়া থাকেন। শ্রীপুর থানার দারোগা কি করিয়াছেন—আমরা আশা করি শীঘ্রই কর্ত্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশ করিবেন।

বাঙ্গালাদেশে এখন বালক ও স্ত্রীলোকদের মুখেও স্বদেশপ্রেমের কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। সকলেই স্বদেশপ্রেমে মত্ত অথচ অবাধে নারীগণ অপহৃতা হইতেছেন। যে নারীরা পুলিশকে অগ্রাহ্য করিয়া সংগ্রাম করিতেছেন, তাঁহারা নারীকে রক্ষা করিবার জন্য ত দুর্দ্দান্ত লোকদিগের সম্মুখে যাইতেছেন না। নারীরা কি নারীর ধর্ম্মরক্ষা করিতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন না?

বঙ্গের পুরুষ ও নারী, বালক ও বালিকা অনেকে নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে রাষ্ট্রীয় কার্য্য করিতে গিয়া প্রহৃত, কারারুদ্ধ এবং দুই একস্থলে নিহত হইতেছেন। সুতরাং বঙ্গে সাহসের একান্ত অভাব হইয়াছে বলিতে পারি না। অথচ নারীর সতীত্ব ও সম্মান রক্ষার জন্য বঙ্গের যথেষ্ট লোক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেছেন না, ইহা সত্য কথা এবং লজ্জা ও দুঃখের কথা। এ অবস্থার কারণ কি, ঠিক্ বুঝিতে পারিতেছি না।

—

ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ

ইউরোপের নানা জায়গায় রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে-সব বক্তৃতা করিতেছেন, তাহা সবিশেষ আদৃত হইতেছে। হইবারই কথা। বালিনে তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলী প্রদর্শিত হইবার পর তাহার মধ্যে পাঁচখানি ছাব জাতায় চিত্রশালায় রক্ষিত হইবার পর ক্রীত হইয়াছে। কবির এতদিনে জেনিভা পৌঁছিবার কথা। বৎসরের অন্য সময়েও জেনিভায় পৃথিবীর সব মহাদেশ ও দেশের লোক থাকে। এই সেপ্টেম্বর মাসে লীগ অব্ নেশুন্সের মহাসভার অধিবেশন হওয়ায় তাহাদের সংখ্যা আরও বাড়ে। এমন সময়ে তাঁহার জেনিভায় উপস্থিতি ভারতবর্ষের পক্ষে হিতকর হইবে।

—

কংগ্রেসের সহিত সন্ধি হইল না

অদ্য দুঃখের সহিত দৈনিক কাগজে পড়িলাম, সাপ্রু ও জয়াকরের মধ্যস্থতায় কংগ্রেসের সহিত গবর্ন্মেণ্টের কথাবার্ত্তা ব্যর্থ হইয়াছে। এ বিষয়ে সাপ্রু ও জয়াকর মহাশয়েরা ধৈর্য্যের সহিত যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। কাগজে দেখিতেছি, কংগ্রেসনেতাদের দাবী নিম্নলিখিতরূপ ছিল ঃ—

Congress leaders in Jail after the Conference at Yarvada in a joint letter to Sir Tej Bahadur Sapru and Mr. Jayakar laid down as main terms for settlement (1) Recognition of India's right to secede from the Empire, (2) Complete National Government responsible to her people, (3) India's right to refer, if necessary, to an independent tribunal British claims and concessions in India including Public debt, (4) Release of Political Prisoners except those who have committed violence (5) Civil Disobedience to be called off but not picketing of foreign cloth and liquor-shops and manufacture of salt by the people.

[তাৎপর্য্য]

ইয়ারভাদা জেলে পরামর্শের পর কংগ্রেস নেতারা স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রু ও শ্রীযুক্ত জয়াকরের নিকট একটি পত্রে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি উপস্থাপিত করেন—(১) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সম্বন্ধবিচ্ছেদের অধিকার; (২) ভারতবর্ষের লোকের নিকট দায়ী জাতীয় শাসনতন্ত্র; (৩) ভারতবর্ষে যত ব্রিটিশ দাবীদাওয়া ও সুবিধা আছে (রাষ্ট্রীয় দেনা সহ) প্রয়োজন হইলে কোনও নিরপেক্ষ বিচারকের সম্মুখে এ সকল বিষয়ের বিচারের ভার অর্পণ করিবার অধিকার; (৪) যাহারা হিংস্র উপায় অবলম্বন করে নাই সেইরূপ সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তিদান; (৫) আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ হইবে, কিন্তু মদের ও বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেট করা বন্ধ হইবে না, এবং লোকে নিজে নিজের নুন তৈয়ারী করিবার অধিকার পাইবে।

আমরা এই দাবীগুলি অযৌক্তিক মনে করি না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে পৃথক হইবার অধিকার মডারেট-নেতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও চাহিয়াছেন। এই অধিকার থাকিলেই যে ভারতবর্ষ আলাদা হইবেই, এমন নয়। বিদেশী কাপড় বিক্রী অবাধে চলিতে থাকিলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য বেশী থাকিবে না, কারণ উহার অর্থনৈতিক দাসত্ব ঘুচিবে না। ভারতবর্ষের লোক নুন যথেষ্ট খাইতে পায় না, সুতরাং নুন অবাধে তৈরী করিবার অধিকার অন্যায় দাবী নহে।

আজ ২০শে ভাদ্র আশ্বিন সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গ শেষ করিতে হইল বলিয়া অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না।

—

বিজ্ঞাপন-দাতাদের প্রতি

কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসী ৫ই আশ্বিন নাগাদ প্রকাশিত হইবে। ঐ সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপনের নূতন ও বদল কপি আগামী ৩০শে ভাদ্রের মধ্যে আপিসে পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব।

প্রবাসী কার্য্যাধ্যক্ষ

১২০।২, আপার সারকুলার রোড় কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।